অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

১৩৬০

বসুমতী সাহিত্য মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য তিন টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত,
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা

—আশীর্ব্বাদ—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পত্র।

ওঁ

শান্তিনিকেতন।

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ—

অভিমতের দাবী সমেত যে বই আমার কাছে আসে, তা পড়বার মতো সময়, স্বাস্থ্য বা সাহস আমার নেই। আপনার বইগুলিতে একটুখানি উঁকি দিয়েই ছুটি নেব এইরকম স্থির করেছিলুম। অবশেষে পড়া আরম্ভ করে প্রায় কিছু বাকি রইল না,—তাতে আমার নিজের কাজেরও ক্ষতি হোয়েচে।

লেখায় আপনি ওস্তাদ। আপনার লেখনী প্রত্যক্ষের পথেই চলে, চলে বেশ সহজেই; বিকৃতকেই প্রকৃত বলে চালাবার উৎকট ভঙ্গী করে না। কোন কোন জায়গায় রং চড়িয়েছেন কিছু বেশী মাত্রায়, করুণকে অতি করুণ এবং ভালোকে অতি ভালো করবার ইচ্ছায়,—কিন্তু বাস্তবকে নিশ্চিত বাস্তব প্রমাণ করবার উত্তেজনায় তাকে ত্যাড়াবাঁকা অষ্টাবক্র করেন নি যে, সেটাতে আরাম পেলুম। শুনেছি পাঠকদের কাছে আপনার লেখা খ্যাতিলাভ করেছে, এটা সুসংবাদ। ইতি ১৬ই শ্রাবণ—১৩৩৮,

ভবদীয়

(স্বাক্ষর) **শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**

[...]থের স্মৃতি' 'বরদা ডাক্তার' 'জমা-খরচ' প্রভৃতি
[...]খানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপরোক্ত পত্রখানি লিখিত।

ভূমিকা

সর্ব্বজনপ্রিয় যশস্বী কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থাবলীর জন্য একটা 'ভূমিকা' লিখে দিতে হবে, আমার ওপর এই অনুরোধ এসেছে। তাঁর মত একজন শ্রেষ্ঠ লেখকের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা আমাকে লিখতে হবে, এটা আমার ওপর বাণীদেবতার অবিচার ও বিড়ম্বনা বলেই আমার মনে হয়। তবে লিখতেই যখন হবে, তখন তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু আমি জানি, অতি সংক্ষেপে সেইটুকুই এখানে লিপিবদ্ধ করব। তাঁর রচনাবলীর ভাল মন্দ বিচার করার সাহসও আমার নেই, শক্তিও নেই। সে ভার পাঠক-পাঠিকাদের ওপর। আমি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যৎসামান্য দু'একটি কথা বলে আমার কর্ত্তব্য শেষ করব।

বাংলা ১২৮৮ সালে, দক্ষিণ কলিকাতার এক ধনীগৃহের একমাত্র সন্তান রূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক। 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি'র দুটি স্তম্ভ— খ্যাতনামা কর্ণেল অলকট্ ও মিস্ আনি বেসান্ত যখন প্রথম ভারতে আসেন, তখন তাঁর পিতা বিবাগী হোয়ে তাঁদের সঙ্গে চলে যান ও ৮।১০ বছর ধরে ভারতের সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন ও কর্মচারীরা ফাঁকি দিয়ে আত্মসাৎ করেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের গ্রন্থকার তখন ৮।১০ বছরের বালক মাত্র। সুতরাং শিশুকালে 'রূপার ঝিনুক-বাটি' নিয়ে জন্মালেও হঠাৎ এই অবস্থান্তর ঘটায়, দুধ ত নয়ই—একটু জল খাওয়ার জন্যে নারিকেল মালাও তাঁর জোটে নি।

অল্প বয়সেই তিনি চাকরী করতে বাধ্য হন। তাঁর প্রথম চাকরী—জব্বলপুর গভর্ণমেন্ট কলেজে 'কিউরেটার'। সেটা বোধ হয় ইংরাজী ১৯০৩ সালে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র স্বর্গতঃ শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীতড়িৎ কান্তি বক্সী ছিলেন সে সময় উক্ত কলেজের কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপক। চাকরী করা তাঁর ধাতে সইল না। কিছু দিন পরে তিনি জব্বলপুর থেকে কোলকাতায় ফিরে আসেন ও য়্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল শ্রী এস, এম, বোসদের কটক জেলাস্থ জমিদারী 'রতন এষ্টেট'য়ের ক্যাশিয়ার ও য়্যাকাউন্টান্ট হোয়ে সেখানে যান। বছর খানেক কাজ করার পর তাঁর হাতে 'রাইটার্স ক্র্যাম্প' হয় ও লিখতে একেবারে অপারগ হওয়ায় কাজে ইস্তফা দেন। এই সময় সুবিখ্যাত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় (সেই সময় কটকে ছিলেন) ও 'উৎকল টাইমস্'য়ের সম্পাদক স্বর্গতঃ ক্ষীরোদ চন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে তিনি আরো কিছুদিন কটকে থেকে হাতের চিকিৎসা করান। কিন্তু হাত ভালো হ'ল না। তিনি আবার কোলকাতায় ফিরে আসেন।

এদিকে সংসারের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং বাধ্য হোয়ে তাঁকে কালীঘাট হাইস্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিতে হয়। সেখানে ৫বছর তিনি শিক্ষকতা করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁর হাত কতকটা ভাল হয়। বুড়া আঙুল বাদ দিয়ে কলম ধরলে তিনি লিখতে পারেন। তখন স্কুল কমিটীর অনুরোধে তিনি 'ক্যাশিয়ার ও য়্যাকাউন্ট্যান্ট'য়ের কাজ ল'ন। বছর ৫।৬ কাজ করার পর স্কুল কমিটীর সঙ্গে তাঁর কোন বিষয়ে মতবিরোধ ঘটায় তিনি স্কুলের কাজ ছেড়ে দেন এবং এইসময় থেকেই তিনি সাহিত্য-চর্চ্চা সুরু করেন।

তখন তাঁর বয়স ৪০। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের যোগ্য সম্পাদনে প্রসিদ্ধ 'বিচিত্রা' মাসিকপত্র, বিচিত্র রচনাসম্ভার নিয়ে সেই সময় সবেমাত্র আত্মপ্রকাশ করেচে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও লেখক। বাছা-বাছা লেখকগোষ্ঠী নিয়ে 'বিচিত্রা'র রচনাডালি সাজানো হয়। অসমঞ্জ বাবুর ভাঙ্গা হাতের প্রথম গল্প 'যাদুকরী' বিচিত্রার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হোল। তিনজন নাম-করা লেখকেব প্রথম হাতেখড়ি হোল এই 'বিচিত্রা'য়—অসমঞ্জবাবু, অন্নদাশঙ্কর ও বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অসমঞ্জবাবুর ছোট গল্প, অন্নদাশঙ্করের অনবদ্য ভ্রমণকাহিনী 'পথে-প্রবাসে', ও বিভূতিবাবুর অমর গ্রন্থ 'পথের পাঁচালী'। এঁদের মধ্যে বয়সে অসমঞ্জবাবু বড় ছিলেন। আগেই বলেচি, অসমঞ্জবাবুর বয়স তখন ৪০; অর্থাৎ সাধারণ বাঙ্গালী লেখক প্রায় যে বয়সে কলম ছাড়েন, তিনি সেই বয়সে কলম ধরেন। তারপর ৭২ বছর বয়স পর্য্যন্ত এই ৩২ বছর তিনি অক্লান্তভাবে সাহিত্য সেবা করে আসচেন।

বাংলার সমজদার পাঠক-পাঠিকাগণের কাছে তাঁর লেখার মূল্য নির্দ্ধারণ হ'য়ে গেছে; সুতরাং নতুন করে আমার সে বিষয়ে বলবার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা খুব পছন্দ করতেন। 'পথের স্মৃতি' প্রভৃতি তাঁর প্রথম ৫।৭ খানা গ্রন্থ পাঠ করে, কবি তাঁকে যে উচ্চ প্রশংসাসূচক পত্র লেখেন, তার অনুলিপি এই গ্রন্থাবলীতে দেওয়া হ'য়েচে।

কথা-সাহিত্যিক হ'লেও অসমঞ্জবাবু সর্ব্বপ্রকার রচনাতেই সিদ্ধহস্ত। তিনি উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা, নাটক, প্রহসন, গান, প্রবন্ধ, স্কুলপাঠ্য প্রভৃতি সব কিছুই লিখেচেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো কলম থেকে এত বিভিন্ন শাখার সুন্দর রচনা রচিত হয়েচে কি না, তা আমার জানা নেই। কলিকাতা 'বেতারে' সর্ব্বপ্রথম যে নাটক, বেতার-কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অভিনীত হয় তাহা অসমঞ্জবাবুরই রচিত। ঢাকা ইউনিভার্সিটীতে কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা সমর্থিত হোয়ে এবং চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে তাঁর নাটকই প্রশংসার সহিত অভিনীত হয়। লেখকের বহু গল্প হিন্দী ও গুজরাটীতে অনূদিত হোয়ে প্রকাশিত হোয়েচে। এলাহাবাদের 'মায়া' পত্রিকাতে তাঁর অনেক গল্প হিন্দীতে প্রকাশিত হোয়েচে।

আর দু'টি কথা বোলে—আমার এই অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা শেষ করব। একটি হচ্চে এই যে, অসমঞ্জবাবু কোনও সাহিত্যিক দলে মেশবার সুযোগ ও অবসর পেতেন না। সেই কারণেই হোক, কিংবা অন্য কারণেই হোক, তখনকার কতকগুলি দলীয় তরুণ বয়স্ক সাহিত্যিক তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না। যদি পরশ্রীকাতরতাই এর কারণ হয়, ত সেটা খুবই দুঃখের কথা। একটা রোগা লোক, যার না আছে বাড়ী, না আছে গাড়ী, না আছে চেহারার জৌলস, সে সাহিত্যজগতে এলো, দাঁড়ালো আর নাম নিলে, এটা যাঁরা বরদাস্ত করতে না পেরে, তাঁর ওপর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলবার কিছু নেই। আরও দুঃখের কথা, একটিমাত্র যে দলে তিনি যেতেন, আসতেন, বসতেন, সে দলেরও অধিকাংশই বাহিরে না হোলেও, ভেতর-ভেতর তাঁর প্রতি প্রীতির ভাব পোষণ করতেন না,—একথা আমরা তাঁর মুখে একাধিকবার শুনেচি। তিনি বল্‌তেন—"যশ-মান আমি ত চাইনি কিংবা চাইও না; আপনি আসচে, আমি তা'র কি করব? অথচ এর জন্যে অনেকেরই আক্রোশের পাত্র আমাকে হতে হচ্চে।"

'বসুমতী'র সুযোগ্য সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—স্বর্গতঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন ও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত ভালবাসতেন। তা ছাড়া আরো যে দুইজন প্রখ্যাত কবি ও

ঔপন্যাসিক তাঁর রচনাকে ও তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, তাঁদের একজন—কবি নজরুল ও অপরজন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র তাঁর মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন আগে, তখনকার দিনে পাঁচশতাধিক টাকা ব্যয় করে, বেলগাছিয়ার এক উদ্যান-বাটিকায় তাঁকে 'অভিনন্দন' দিয়া যান। সেই অনুষ্ঠানে কবিশেখর শ্রীকালিদাস যথেষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কবিশেখর কালিদাস রায় ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাধেশ রায় বরাবরই অসমঞ্জ বাবুর বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু। উক্ত অনুষ্ঠানে বহু কবি ও সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন সেদিনকার সভায় বলেছিলেন—"যাঁকে আজ শরৎচন্দ্র অভিনন্দন দিচ্ছেন, আমার 'কলেজ-লাইফ'যে ঐ রোগা লোকটির লেখা পড়েই আমরা লিখতে শিখেছি"······ ইত্যাদি। কিন্তু আজ সেই·········যা'ক, এ ক্ষুদ্র ভূমিকায় এ সব অপ্রীতিকর কথার উল্লেখ না করাই ভাল। সাহিত্য সৃষ্টির জন্যেই অসমঞ্জ বাবু সাহিত্য সাধনা করেচেন; অর্থ উপার্জ্জনের জন্য তিনি কখনো সাহিত্যের ব্যবসা করেন নি; তা করলে তিনি আজ প্রচুর অর্থের মালিক হতে পারতেন।

এইবার শেষ কথাটি বলে আমার বলা শেষ করব। এই জনপ্রিয় প্রবীণ সাহিত্যিক, সাহিত্য-চর্চ্চার মধ্য দিয়ে যে এক মহা-সাহিত্যের সন্ধান পেয়েচেন, এখন সেই সাহিত্যেরই সাধনায় তিনি রত। বর্ত্তমানে তিনি সংসারের মধ্যে থাকলেও, সাংসারিক সব-কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করে ভগবৎসাধনার পথে চলচেন। অবশ্য বাইরে তিনি সন্ন্যাসী সাজেন নি বটে, কিন্তু অন্তরে তিনি পুরা সন্ন্যাসী। বাইরেকার পরিচ্ছদ তাঁর সাদা, কিন্তু সারা অন্তর তাঁর গেরুয়ায় রঞ্জিত। তাঁকে বাইরে দেখে তাঁর ভেতর চেনবার উপায় নেই। অসমঞ্জ বাবুর পূর্ব্বে, তাঁর মত আরো যে কয়েকজন সাহিত্য, শিল্প ও শক্তিসাধক তাঁদের সাধনার শীর্ষে পৌঁছে, ভগবৎ সাধনার পথে তাঁদের যাত্রাপথ পরিবর্ত্তন করেচেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ, শ্যামাকান্ত বন্দ্যো, দিলীপ রায়, কাজি নজরুল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমার বক্তব্য শেষ করলাম। অজ্ঞতাবশতঃ হয় ত বক্তব্যের মধ্যে কিছু ভুলচুক থাকতে পারে। আশা করি, পাঠক-পাঠিকাগণ এই গ্রন্থাবলী পাঠ করে আনন্দ লাভ করবেন এবং প্রকাশকেরা লেখকের অন্যান্য খণ্ড অচিরে প্রকাশ করে, প্রবীণ সাহিত্যিকের গ্রন্থগুলিকে অমর করে রাখবেন।

২৪শে আগষ্ট ১৯৫৩

ডক্টর শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

পথের স্মৃতি

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

পথের স্মৃতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপন্যাসের লেবেল্ দিয়া আজ যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা গত জীবনের দুই একটি সামান্য এবং নগণ্য ঘটনার স্মৃতিমাত্র, তাহাও ম্লান এবং বিশৃঙ্খল। আজ দিনান্তে পথের এই সীমান্তে আসিয়া পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইলে, অতীতের কত কথা—কত ব্যথার, কত সুখের, কত দুঃখের স্মৃতিই যে, একটির পর একটি আসিয়া মনের পটে ফুটিয়া উঠে আর মনকে দোলাইয়া দিয়া মিলাইয়া যায়, তাহার অন্তও নাই—হিসাবও নাই। তাই, উপন্যাসের চিত্রচাতুর্য্য বা ধারাবাহিকতা কিছুই ইহাতে না থাকিলেও, জীবন-যাত্রা-পথের এই যে স্মৃতি—ইহার যতটুকুব পারি ততটুকুরই হিসাব লিপির ভিতর ধরিয়া রাখিবার জন্যই এই প্রয়াস। কিন্তু ইহাও বুঝিতেছি যে, এ কাহিনীব সহিত বাহিরের কোন সংস্রবই নাই, ইহা নিছক ব্যক্তিগত—একান্ত আমারই। অথচ ইহাই বলিবার জন্য কেন যে এই আয়োজন আর কেনই বা এত মনের আগ্রহ, তাহা মনের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি ছাড়া আর কে বলিবে?

অতীতের এই যে কাহিনী, ইহা যেমন সাধারণ তেমনি পুরাতন,—একেবারে সেকালের কথা, কিন্তু এই সেকালই বা আর কত কাল? বিক্রমাদিত্যের রাজত্বও নহে, বক্তিয়ার খিলিজীর আমলও নহে, অথবা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ও নহে। বড় জোর বছর চল্লিশ আগেকার কথা। আমার বয়স তখন বছর দশ কি বার। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যে কি পরিবর্ত্তনই না হইয়াছে! তখন এই কালীঘাট ছিল ঠিক একটি পাড়া-গাঁ। এখন এই কালীঘাটের যে অংশটা আজ সুন্দর সুন্দর ছবির মত নানা আকারের ও গঠনের বাড়ীতে সজ্জিত হইয়া সহরবাসীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই 'লেক্-রোড' পল্লীটাই তখন ছিল নিছক ধানের ক্ষেত। পৌষ মাসে 'বাউনি' বাঁধিবার জন্য ধানের শীষ আনিতে আমরা দলে দলে আসিয়া এই সবা ক্ষেত হইতে ধানশুদ্ধ শীষ ছিঁড়িয়া আনিয়া ঘর ভরাইয়া ফেলিতাম।

তখন যে কয় ঘর এখানে থাকিতেন, পরস্পর সকলেই আমরা পরস্পরকে চিনিতাম। কয় ঘর বাসিন্দাকে আঙুলেব পর্ব্বেই গণিয়া ফেলা যাইত। তখন 'গ্যাস' ছিল না. 'ড্রেণ' ছিল না, জলের কল ছিল না। এত বড় বড় রাস্তা-ঘাটও ছিল না, রং-বেরংয়ের এত 'পার্ক-স্কোয়ার'ও ছিল না, আর হরেক রকমেব এত যান-বাহনও ছিল না। পুবাতন রসা বোডটিব বুক চিরিয়া তখন সবেমাত্র ট্রামেব লাইন বসিয়াছিল। ছোট একখানি এঞ্জিন, তদনুরূপ ছোট একজোড়া ট্রামগাড়ী আপনার অঙ্গে জুড়িয়া, ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতে সুরু করিয়াছিল। আগে আগে তার ছুটিত এক জন ঘোড়সওয়ার। সে ঘোড়া ছুটাইয়া পথের লোক সরাইতে সরাইতে যাইত, কেউ না এঞ্জিন-চাপা পড়ে। কিন্তু তবুও লোক চাপা পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই এক জন করিয়া, ঘোড়সওয়ারকে ফাঁকি দিয়া ট্রামের এই এঞ্জিনের চাকার তলায় আসিয়া পড়িতে লাগিল। তখন বিদেশী কোম্পানী ঠিক করিল— এ রাস্তায় এঞ্জিন চলবে না। এঞ্জিন খুলিয়া তার যায়গায় তখন জুড়িয়া দেওয়া হইল এক জোড়া করিয়া ঘোড়া। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য গাড়ীও একখানি কমাইয়া দিয়া একখানি করিয়া গাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। আর এঞ্জিনকে পাঠান হইল তখন খিদিরপুরে যাইবার মাঠের পথে। এই ট্রাম দেখিতেই তখন কাতারে কাতারে পথের দুই পাশে কি লোকেরই না ভীড় হইত। চল্লিশ বৎসর আগে এমনই ছিল কালীঘাটের অবস্থা। কিন্তু পুরানো দিনের যে কথাটা বলিতে যাইয়া এই সব কথা আজ মনে পড়িতেছে, সেই কথাটাই বলি।

ছেলেবেলাকার এই কথাটা সে দিন বাঙ্গালা স্কুলে দৌহিত্রকে ভর্ত্তি করিতে গিয়া হঠাৎ মনে পড়িল, তখন,—যখন দেখিতে পাইলাম যে, নীচের

ক্লাশের একটি ছোট ছেলেকে, তাহার বাড়ীর লোক চ্যাংদোলা করিয়া স্কুলের ফটকে ঢুকিতেছে আর স্কুলে আসিতে অনিচ্ছুক সেই দুষ্টু ছেলেটি চীৎকারে গগন-পবন ফাটাইয়া তুলিতেছে। ইহা দেখিয়াই অতীতের ৪০ বছরের ঝাপসা দিনগুলি ভেদ করিয়া আমার মনশ্চক্ষুর সামনে আসিয়া পড়িল—আমাদের সেই হরিশ পণ্ডিতের পাঠশালা।

পণ্ডিত মহাশয়ের বিঘেখানেক ভদ্রাসনের উপর খান চারি পাঁচ গোলপাতার ঘর। তাহারই বাহিরের দিকে একখানি হেলে-পড়া জীর্ণ ঘরে আমাদের পাঠশালা বসিত। সকালে বিকালে দুই বেলা করিয়া পাঠশালা বসিলেও, সকালের পাঠশালাটাই জমিত ভাল।

আমি আর আমার জ্যাঠামশায়ের ছেলে বিনু'দা এক বাড়ী হইতে এই দুই জন আমরা পাঠশালায় যাইতাম। বিনু'দা আমার চেয়ে সামান্য দুই এক মাসের বড় হইলেও, সাংসারিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে বিনোদদা' ছিল অনেক বড়—এমন কি, লাফিয়েও তাঁর নাগাল পাওয়া আমার শক্তিসামর্থ্যের বাহিরে ছিল। এই জন্যই প্রায় সকল কাযেই আমি তাঁর শিষ্যত্বই করিতাম। তাঁহাকে ভয়ও করিতাম যেমন—তেমনই ভালও বাসিতাম।

মাঘ মাস। কন্‌-কনে শীত পড়িয়াছে। তখন জুতা মোজাও আমাদের ছিল না, উলের সোয়েটার ব্যাপারও চোখে দেখি নাই। ছিল শুধু সকলের একখানি করিয়া সুতির চারহাত লম্বা ছাপা দোলাই। তাহাই গায়ে ফেরতা দিয়া জড়াইয়া গলার কাছে ঠাকু'মা গেরো দিয়া বাঁধিয়া দিয়া, কাপড়ের কোঁচড়ে দু'টি মুড়ি, গোটা দুই চার নারকোল নাড়ু, মুটোখানেক ছাড়ানো বেদানার দানা দিয়া আমাদের পাঠশালায় পাঠাইয়া দিতেন। একজন কাবুলী প্রত্যহ বৈকালে আমাদের বাড়ী বেদানার দানা দিয়া যাইত। যেমন দুধের 'রোজ'—তেমনই এই কাবুলীর কাছে আমাদের বেদানার 'রোজ' ছিল। তাহার কাঁধের প্রকাণ্ড ঝুলির ভিতর আখরোট, বাদাম, পেস্তা, আঙ্গুরের বাক্স, আস্ত বেদানা, খোবানী প্রভৃতি সবই থাকিত। আমাদের বাড়ীর কর্ত্তারা মধ্যে মধ্যে অন্য মেওয়াও কিনিতেন বটে, কিন্তু এই ছাড়ানো বেদনার দানা তাহার কাছ হইতে প্রত্যহই লওয়া হইত। তখন সামান্য যে কয় জন কাবুলী কলিকাতায় থাকিত, তাহারা সকলেই পাড়ায় পাড়ায় এই রকম মেওয়া বেচিয়া বেড়াইত। এত অসংখ্য কাবুলীরও তখন এখানে আমদানী হয় নাই, আর জার্ম্মানীর তৈরী গায়ের কাপড় বিক্রী কিম্বা পরোপকারার্থে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ার কার্য্যটাও তখনও তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। তখনকার দিনের মত তেমন বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকার, বিরাট্ কাবুলীও আর এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের কাবুলীটির ভীষণ চেহারা আজও আমি বেশ স্পষ্ট মনে করিতে পারি। বাড়ীর আরও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভূত বলিয়া তাহার সামনে কেহ আসিতে ভরসাই করিত না। আমরা একটু বড় হইয়া উঠিয়াছিলাম—অল্পে অল্পে ভরসাও একটু একটু বাড়িয়া গিয়াছিল, তাই আমরা তাহার কাছেও যাইতাম, তার লাঠিতেও হাত দিতাম, দোতালার বারান্দার দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসাও করিতাম,—"খাঁ সাহেব, ওই হাঁদিবাবুকে তোমার ঝুলির মধ্যে পূরে নিয়ে যাবে?" কোন কোন দিন পিছন হইতে তাহার প্রকাণ্ড পাগড়ীটি হেঁচকা টানে খুলিয়া দৌড়িয়া পলাইবার দুঃসাহসও করিয়া বসিতাম। কিন্তু সে কিছুতেই রাগ করিত না, বরঞ্চ এ সব সে ভালই বাসিত। কিন্তু তাহা বলিয়া যে তাহার রাগ ছিল না, তাহা নহে। কোন কারণে কোথাও সে যদি রাগিয়া যাইত, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। তখন আর তাহার জ্ঞান থাকিত না। তখন সে মত্ত হস্তীর ন্যায় ভীষণ হইয়া পড়িত। তাহার সেই একটা দেহ ফুলিয়া যেন দুইটা হইয়া পড়িত এবং তাহার নাক, মুখ, চোখ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন আগুনের ফুলকী চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িতে থাকিত।

এমনই এক দিন আমি তাহার রাগ দেখিয়াছিলাম, এবং সে রাগের কারণ আমার বিনোদদা'। সে কথা পরে বলিব। এখন যাহা বলিতেছিলাম—

শীতকাল। মাঘ মাস। পাঠশালায় যাবার মোটেই ইচ্ছা নেই। ঠাকু'মা জোর করিয়া, দোলাই গায়ে বাঁধিয়া দিয়া, ঠেলিয়া ঠুলিয়া পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। অর্দ্ধেক পথ আসিয়াছি, বিনোদদা' ফিরিয়া দাঁড়াইল—কহিল,—"পাঠশালায় যাব না।"

আমি বলিলাম,—"না ভাই, তা'হলে 'পোন্‌শাই' মারবে নিশ্চয়ই।"

পণ্ডিত মশাইকে সংক্ষেপে আমরা 'পোন্‌শাই' বলিয়া ডাকিতাম।

বিনোদদা' মুখে জিভ দিয়া একটা শব্দ করিয়া বলিল,—"মার্‌লেই হ'ল আব কি!" তার পর সেলেট পেন্‌শিল রাখিবার জন্ম কাগজের ছোট থলিটির মধ্য হইতে কি বাহির করিতে করিতে বলিল,—"একটা জিনিষ দেখবি—এই ছ্যাখ।"

দেখিলাম, একটা সিকি। আমাদের কাছে তখন অমূল্য জিনিষ। কারণ, অন্ত বাড়ীর ছেলেদেব মত আমরা কখনও একটি পয়সাও হাতে পাইতাম না। ছেলেদের হাতে কাঁচা পয়সা দেওয়া কর্ত্তাদের কড়া নিষেধ ছিল! মধ্যে মধ্যে পালে পার্ব্বণে ঠাকু'মা এক আধটা করিয়া পয়সা সকলকে দিতেন বটে, কিন্তু একবারে একটা রূপার সিকি পাওয়া আমাদেব কাছে স্বপ্ন ছিল।

সিকি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলাম,—"কোথা পেলে ভাই? অর্দ্ধেক আমাকে দেবে?"

"ইল্লি, কত সুখ রে!"

"না দেবে—নাই দেবে। আমি পাঠশালায় যাই।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া বিনুদা' কহিল,—"আচ্ছা দোব। কাবেও বলবিনি বল্।"

"না, সত্যি বোলব না। কোথায় পেলে বল।"

"ঠাকু'মা বিছানায় ঢেলে গুণছিল, আমি হাতে চাপা দিয়ে লুকিয়ে ফেলেছি, দেখতে পায় নি। চ' কিছু কিনে খাই গে।"

"কি খাবে?"

"পাচকড়ি বেণের দোকান থেকে 'বিলিতী-জল' খাই গে চ'।"

"কি গো! এই শীতে—সকাল বেলা—'বিলিতী-জল'?"

"দূর গাধা, তাতে কি? আয়।" বলিয়া বিনুদা পাঁচকড়ি বেণের দোকানের দিকে অগ্রসর হইল। সুতরাং আমারও আর পাঠশালায় যাওয়া হইল না।

দুই আনা দিয়া দুই বোতল বিলিতী-জল (লেমনেড) দুই জনের খাওয়া হইল। বাকি পয়সা দুই আনা রাখিয়া দিয়া বিনুদা কহিল,—"থাক্, বিকেলে আবার কিছু খাওয়া যাবে।" কিন্তু পথে আসিতে আসিতে পদীর মার দোকানে গরম্-গরম্ ফুলুরী-বেগুনী ভাজা দেখিয়া বিনুদা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"পয়সা আর রেখে কি হবে, গরম বেগুনী খাওয়া যাক আয়।" দুই পয়সা দুই পয়সা—একুনে চার পয়সার বেগুনীও খাওয়া হইল। আমি কহিলাম,—"আর চার পয়সায় কি খাবে?"

সম্মুখেই একটি উড়িয়ার একখানি পাণের দোকান ছিল। একখানি থালায় সে ছাঁচী পাণের খিলি করিয়া সাজাইয়া সাজাইয়া রাখিতেছিল। বিনুদা আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"আয়, পাণ খাই।"

আমি তিন হাত সরিয়া গিয়া বলিলাম,—"না ভাই, পাণ খাব না, বাড়ীতে জান্‌তে পারবে।"

"দূর বোকাকান্ত! মুখ ভাল ক'রে ধুয়ে ফেল্‌লে জান্‌তে পার্‌বে কি ক'রে?"

যাহা হউক, দুই পয়সার ছাঁচী পাণও খাওয়া হইল। বাকী রহিল আর দুইটি পয়সা। পাণ চিবাইতে চিবাইতে আমি বলিলাম,—"চল ভাই, পাঠশালায় যাওয়া যাক্—এখনও বেশী বেলা হয় নি।"

একটি যাত্রীর পিছনে পিছনে একটি ভিখারী বুড়ী পয়সা চাহিতে চাহিতে ছুটিতেছিল। বিনোদদা' তাহাকে ডাকিল,—"এই বুড়ী, পয়সা নিবি?" বুড়ী কাছে আসিলে বিনোদদা' পয়সা দুইটি তাহার হাতে দিয়া দিল।

আহার, পান, মুখশুদ্ধি ও দান সব রকম কার্য্যই যখন সমাধা হইয়া গেল, তখন পুনবায় আমি বলিলাম,—"চল ভাই, এইবার পাঠশালায় যাই।"

"তুই যা, আমার এই বইগুলোও নিয়ে যা। আমি বেন্দা বোষ্টমের খিড়কীর কুলগাছে বইলুম। যাবার সময় ডেকে নিয়ে যাবি,—বুঝ্‌লি? নইলে মজা টের পাবি।"

সুতরাং একাই পাঠশালায় যাইলাম। কিন্তু যাহা ভয় করিতেছিলাম, তাহাই হইল। পাঠশালা-ঘবে প্রবেশ করিতেই পণ্ডিত মশাই জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পঞ্চু, বিনে কৈ রে?"

আমি বলিলাম,—"তার বড্ড পেটের অসুখ করেছে পোন্‌শাই।"

কে একটা ছেলে দাঁড়াইয়া বলিল,—"না পোন্‌শাই, মিছে কথা। আমি আসবার সময় দেখে এলুম, সে বেন্দা বোষ্টমের কুলগাছে চ'ড়ে ব'সে রয়েছে।"

"না পোন্‌শাই, মিছে কথা। কাল রাত থেকে তার পেটের অসুখ করেছে, তাই ঠাকু'মা আস্‌তে বারণ কল্লে।" বিনুদার শিষ্যত্বগুণে মিছে কথা বলিতে কিছুতেই বাধিত না।

হরিশ পণ্ডিত মুখের দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাই ঠাকু'মা আস্‌তে বারণ কল্লে?"

—"হ্যাঁ পোন্‌শাই।"

—"আর তাই, তার বদলে ঠাকু'মা তার বই-গুলো বুঝি তোকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে? ওগুলো ত বিনের বই দেখছি।"

যে ছেলেটা কুলগাছের কথা বলিয়া দিয়াছিল, সে পুনরায় দাঁড়াইয়া বলিল,—"মিছে কথা পোন্‌শাই। কুলগাছে ব'সে কুল খেতে তাকে দেখে এলুম পোন্‌শাই।"

তখন পণ্ডিত মশায়েব হুকুমে পাঁচ সাত জন কোমর বাঁধিয়া ছুটিয়া বাহির হইল বিনুদা'কে ধরিয়া আনিবার জন্য। কিন্তু এ অভিযান যে একবারেই বৃথা, তাহা আমিও যেমন জানিতাম, ইহাদের মধ্যে কেহ তদপেক্ষা কম জানিত না। বিনুদা'কে জোর করিয়া পাঠশালায় ধরিয়া আনিতে পারে, এমন ক্ষমতা ছেলেদের মধ্যে ত কাহারই ছিল না—এমন কি, স্বয়ং হরিশ পণ্ডিতেরও না। তবে বর্দ্ধমানের পণ্ডিতদের খ্যাতির কথা শুনিয়াছি। তেমন পণ্ডিত হইলে কি রকম হইত, বলিতে পারি না। তবে হরিশ পণ্ডিতও নেহাৎ ফেলা যান না। বর্দ্ধমান না হইলেও শুনিয়াছি বহুপূর্ব্বে নবাবের আমলে, ইঁহাদের হুগলী জেলায় বাস ছিল। বর্দ্ধমানেব প্রতিবাসী ত বটে!

যাই যউক, পাঁচ সাত জন ত কোমব বাঁধিয়া বিনুদা'কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ছুটিল। মজা দেখিবার জন্য আমিও সেই ফাঁকে তাহাদের সঙ্গে দৌড় দিলাম।

আমি মনে করিতেছিলাম, দূর হইতেই শত্রু-সৈন্য দেখিয়া বিনুদা গাছ হইতে নামিয়া পড়িয়া 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই মহাজন-বাক্য অনুযায়ী কার্য্য করিবে। কিন্তু ছেলের দলকে দেখিতে পাইয়াও সে কিছুমাত্র চঞ্চল না হইয়া কুলভক্ষণ কার্য্যেই রত রহিল। ছেলেরা যাইয়া গাছ ঘিরিয়া দাঁড়াইলে বিনুদা' গোটা চার পাঁচ কুলেব আঁট এক জনের মাথায় সজোরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"ধরতে এসেছিস, দাঁড়া, ধরাচ্ছি" বলিয়া দুই হাতে কুল ছিঁড়িতে লাগিল, আর সেই কুল সজোরে ছুড়িয়া তাহাদের মারিতে লাগিল। সে যেন কুল-গাছরূপ বন্দুক হইতে কুলের গুলি সকলের মাথায়, বুকে, পিঠে, পায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল। সৈন্যগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পাঠশালার দিকে পলাইতে লাগিল। আমি বলিলাম,—"বিনুদা', এইবার নেমে এসে শীগ্‌গির পালাও।"

বিনুদা' নিরুদ্বেগে জবাব দিল—"থাম্ থাম্, তুই যেমন ভীরু! কে ধরে—আসুক না একবার।"

"গোটাকতক ভাল দেখে কুল ফেলে দাও না ভাই, খাই।"

—"আর বড় পাচ্ছি না রে! বেটাদের মারতে গিয়ে গাছ একেবারে সাবাড় হয়ে গেছে।"

হঠাৎ দেখা গেল, পাঠশালা শুদ্ধ ভাঙ্গিয়া কুলতলার দিকে আসিতেছে,—সঙ্গে স্বয়ং হরিশ পণ্ডিত। বলিলাম,—"বিনুদা, শীগ্‌গির পালাও—শীগ্‌গির পালাও।" বলিলাম বটে, কিন্তু পলাইবারও উপায় রহিল না; কারণ, পণ্ডিত ম'শাই সৈন্য-সামন্ত সমেত তখন একেবারে প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছেন।

বেন্দা বোষ্টমের খিড়কীর পুকুরের উচ্চ পাড়ের উপর এই বৃহৎ কুলগাছটি ছিল। গাছটির মূল যদিও পাড়ের উপর ছিল, কিন্তু তাহার শাখা-প্রশাখা জলের উপর হেলিয়া পড়িয়াছিল।

পণ্ডিত ম'শাই কুলতলায় আসিয়া উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বিনে, ভাল চাস্ ত শীগ্‌গিব নেমে আয়।"

বিনুদার ভ্রূক্ষেপও নাই। যেমন ডালের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল, সেইরূপই বসিয়া রহিল। পণ্ডিত ম'শায়ের কথার উত্তরও করিল না বা তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তখন পণ্ডিত মশাই গর্জ্জাইয়া উঠিয়া বলিলেন,—"নামবি কি না বল্? নইলে এই কাঁটা শুদ্ধ কুলের ডাল তোর পিঠে ভাঙ্গবো, তা ব'লে রাখছি কিন্তু।"

কে যেন কাহাকে বলিতেছে! বিনুদা যেমন পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই চুপ-চাপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটি কথা কহিল না, একটুখানি নড়িল না বা কাহারও দিকে চাহিল না।

তখন পণ্ডিত ম'শাই হাঁক দিয়া বলিলেন,—"হাবু, ওঠ্‌ত গাছে।"

হাবু—ওরফে হাবুলচন্দ্র ছিল সর্দ্দার পোড়ো।

পণ্ডিত মশায়ের হুকুম হইয়া যাওয়া মাত্র হাবু মালকোঁচা বাঁধিয়া কুলগাছে উঠিয়া পড়িল। মস্ত বড় গাছটির যে উঁচুকার ডালটিতে বিনুদা আমার

পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল, হাবু এ-ডাল সে-ডাল বাহিয়া, সেই ডালটির কাছে আসিয়া পড়িতেই যেন গাছের উপর কোথা হইতে কাল-বৈশাখীর ঝড় আসিয়া লাগিল! সঙ্গে সঙ্গে সেই ডালটি ভয়ানক রকম হেলিতে দুলিতে ও নড়িতে আরম্ভ করিল। উপরের দিকে চাহিয়া দেখি যে, বিনুদা' প্রাণপণ শক্তিতে সেই ডালটা ধরিয়া নাড়া দিতেছে। সে কি ভীষণ ঝাঁকানি। দেখিতে দেখিতে ঝপাং-ঝপাং করিয়া জলের উপর এক প্রচণ্ড শব্দ হইয়া উপর হইতে কি আসিয়া পড়িল। চাহিয়া দেখি,—সর্দ্দার পোড়ো হাবু, গাছের উপর হইতে গভীর জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে; কারণ, সে সাঁতার জানিত না। ব্যাপার দেখিয়া পণ্ডিত ম'শাই নিমেষ মধ্যে মালকোঁচা বাঁধিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ছেলেব দল তখন সকলেই একটা কলবব করিয়া উঠিল। গাছের উপব চাহিয়া দেখি, বিনুদা' আব গাছে নাই। এই শুভ অবসরে কখন গাছ হইতে নামিযা পড়িযা বোষ্টমদেব পাঁদাড় দিযা ছুটিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সে দিনকার কুলগাছেব পালাব উপলক্ষ কবিয়া আমাদের পাঠশালাব পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। বিনুদা' বাটী আসিয়া ঠাকু'মাকে সত্য ও মিথ্যায় মিলাইয়া হরিশ পণ্ডিতের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিল। ঠাকু'মা বলিলেন,—"লেখাপড়া শেখ্‌বার জন্যেই ছেলেকে পাঠশালায় দিয়েছি—মেরে ফেলতে দিইনি।' ঠাকু'মার প্ররোচনায় সেই দিনই সন্ধ্যার পর জ্যাঠামহাশয় হরিশ পণ্ডিতকে তলব করিলেন। বিনুদা' বোধ হয় মনে মনে নিশ্চিতই জানিয়াছিল যে, পাঠশালায় আর আমাদের যাইতে হইবে না। সুতরাং জ্যেঠামশায়ের নিকট আসিয়া হরিশ পণ্ডিত সে দিন বিনুদার সম্বন্ধে যত দোষ দিতে লাগিলেন, বিনুদাও দরজার পাশে দাঁড়াইয়া হরিশ পণ্ডিতের সম্বন্ধে তত দোষ দিতে লাগিল। বিনুদা যে নির্ভীক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি কিন্তু, পাঠশালায় আর পড়িতে যাইতে হইবে না জানিতে পারিলেও, হরিশ পণ্ডিতের সামনে কখনও তাঁর দোষের কথা এমন ভাবে উল্লেখ করিতে সাহস করিতাম না।

জ্যেঠামশাই বলিলেন,—"তুই বরাবর বাড়ী ফিরে না এসে বোষ্টমদের কুলগাছে উঠ্‌তে গেলি কেন?"—বিনুদা' কিছুমাত্র না থামিয়া উত্তর করিল,—"তামাক চুরি ক'রে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলুম ব'লে পোনশাই বেত নিয়ে তেড়ে মারতে এলেন, তাই দৌড়ে পালিয়ে এলুম। পেছন পেছন ছেলেদের সব তাড়া দিয়ে ধরতে পাঠালেন। আর দৌড়তে পাল্লুম না, তাই কুলগাছে উঠে পড়লুম।" তামাক চুরি ক'রে নিয়ে আসার কথাটা যে একেবারেই মিথ্যা, তাহা আমরা তিন জন ছাড়া, জ্যেঠামশাই হয় ত বুঝিতে পারিলেন না। তখন আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, কি করিয়া হরিশ পণ্ডিতের সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এত বড় একটা জলজ্যান্ত মিথ্যা বিনুদা' বলিতে পারিয়াছিল। বাটী হইতে তামাক আনিতে হরিশ পণ্ডিত বলিতেন বটে; এমন কি, চাহিয়া না পাইলে, চুরি করিয়া আনিতেও তাঁহার আদেশ ছিল, কিন্তু সে আমাদের প্রতি নয়,—অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর যে সমস্ত ছেলে পড়িত,—তাহাদেরই প্রতি তাঁহার এই ধরণের আদেশ হইত।

জ্যেঠামহাশয়ের মুখ দেখিয়া বোধ হইল, বিনুদার তামাকের কথাটায় খুব কাজ হইয়াছে। হরিশ পণ্ডিত বলিলেন,—"হ্যাঁ রে বিনু, বাবা, এত বড় ঘরের ছেলে হয়ে মিথ্যাকথা,—আচ্ছা পঞ্চু কৈ, তাকে ডাক দেখি একবার, সে কখনও মিছে কথা বলবে না।" পোনশাই 'ডায়াগনসিস্' করিতে ভয়ানক ভুল করিয়া ফেলিলেন। পঞ্চুও যে দাদার ধারে ধারে যায়, ইহা তিনি একেবারেই জানিতে পারেন নাই। বিনুদার পাশেই দেওয়ালের আড়ালেই আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম,—"হ্যাঁ, তামাক ত আপনি রোজ আমাদের নিয়ে যেতে বলেন!" সঙ্গে সঙ্গে বিনুদা' কহিল,—"আর পড়া ত একেবারেই কিছু হয় না বাবা। অঙ্ক-টঙ্ক সব ত ভুলেই যাচ্ছি। পোনশাই খালি ঘুমুবে আর আমাদের তার পিঠে পায়ে সুড়সুড়ি দিতে হবে।"

সেই সময় আমি হরিশ পণ্ডিতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। অত বড় দুর্জ্জয় পণ্ডিত লজ্জায়, ঘৃণায় এবং কতকটা ভয়েও যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেলেন। স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য একটি মাত্র কথাও

তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। প্রায় মিনিট তিন চার ধরিয়া সকলেই নীরব থাকিবার পর জ্যাঠামহাশয় বলিলেন,—"আচ্ছা হরিশ, তুমি এস; —ওরা আর পাঠশালে যাবে না। বড় হয়ে উঠেছে, এখন স্কুলেই ভর্ত্তি ক'রে দোব ভাবছি।"

ইহারও কোন জবাব হরিশ পণ্ডিতের মুখ হইতে বাহির হইল না। তিনি নীরবে জ্যেঠা-মশাইকে নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই সময় এমন জোরে বিমুদা' আমার হাত টিপিয়া ধরিয়াছিল যে, তার ব্যথাটা তার পরের দিন পর্য্যন্তও হাতে আমার অল্প অল্প ছিল।

দিন পাঁচ সাত পরে শুনিলাম যে, বেচারা হরিশ পণ্ডিত জ্যেঠাম'শায়ের কাছ থেকে, আমাদের বেতন বাবদ, মাসে মাসে যে দুইটি করিয়া টাকা পাঠশালার সাহায্যের জন্য পাইতেন, জ্যেঠাম'শাই তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তখনকার দিনে দুইটি টাকার দাম ছিল দশ টাকা। সুতরাং হরিশ পণ্ডিতের ক্ষতি নেহাৎ সামান্য হইল না। বিমুদা'কে ডাকিয়া বলিলাম,—"কেন মিথ্যে করে' অত সব বল্লে?" বিমুদা' কহিল,—"বলবে না ত কি! বেটা ভারি দুষ্টু! আর আমি ত শুধু একলা বলিনি, তুইও ত বলেছিস্!"—"তুমি আগে বলেছ, তার পর ত আমি বলেছি।" সে বয়সে বোধ হয় এইটাই মনে করিতাম যে, পরে বলিলে বুঝি কোন দোষ হয় না।

যাহা হউক, পাঠশালার পাঠ ত উঠিল। কিছুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার কাহারও চাড় হইল না। চাড় হইবার মধ্যে এক জ্যেঠাম'শাইয়ের, বাবার এ সব বালাই ছিল না। বাবা এত বড় বড় কাজে ব্যস্ত থাকিতেন যে, আমাদের লেখাপড়ার মত সামান্য কাজে মনোযোগ দিবার তাঁহার সময় হইত না। জ্যেঠাম'শাইযের কোনই কাজ ছিল না; সেই জন্য তিনিই এই সব ছোট-খাটো কাজে দৃষ্টি রাখিতেন। এই কারণে আমরা সকলেই বাবার উপর সন্তুষ্ট এবং জ্যেঠা-মশাইয়ের উপর অসন্তুষ্ট ছিলাম।

জ্যেঠাম'শাই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়, সকালে দুপুরে বসিয়া বসিয়া হাতের লেখা আর অঙ্ক কষিতে; আমরা কিন্তু সে দিক্ দিয়াও যাইতাম না। না করি হাতের লেখা, না কষি অঙ্ক। চব্বিশ ঘণ্টা তখন আমাদের গুলি খেলিবার ধুম পড়িয়া গেল। জ্যেঠামশাই রোজই জিজ্ঞাসা করিয়া যান যে, লেখা অঙ্ক হইতেছে কি না। আর আমরাও দুই জনে ঘাড় নাড়িয়া তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া যাই। কিন্তু এক জন, যাঁহার কাছে আমাদের ফাঁকি কিছুতেই চলিত না—সে ঠাকু'মা। তাঁহার লিখিবার জন্য তাগাদায় আমরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁহার মুখের বুলিই ছিল,—"ওরে, হাতের লেখা পাকা, তবে ত সাহেবের চাকরী পাবি!"

একদিন বৈকালে গুলির থলেটা লইয়া বাহির হইতেছি, ঠাকু'মা হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। বরাবর দোতলার বারান্দায় গিয়া, মেজের উপর জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া বলিলেন, —"উদয় অস্ত, খালি খেলা—খালি খেলা, পোড়ার মুখো ছেলে কোথাকার! ব'স এইখানে। এই দুধের বাটি আ-ঢাকা রইলো, দেখিস্ যেন বেড়ালে না খেয়ে যায়, আমি কাপড় কেচে আসি। বৈঁচীর বৌ ওপরে এলে পরে তাকে দুধের কথা ব'লে তবে খেল্‌তে যাবি।"

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। আমি গুলির থলে হাতে করিয়া বসিয়া দুধ চৌকী দিতেছি। আর না ফিরিলেন ঠাকুমা, না আসিল তাঁর বৈঁচীর বৌ। এমন সময় বিমুদা' আসিয়া বলিল, "ওরে শীগ্‌গির, শীগ্‌গির,—'ঘর-পার' খেলবি ত গুলি নিয়ে আয়।" 'ঘর-পার' অর্থাৎ মাটীতে খুব বড় একটি ঘর আঁকিয়া এক রকম গুলি খেলা। 'ঘর-পার' খেলায়, সঙ্গীদের মধ্যে আমি ছিলাম প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। সুতরাং তখনই ছুটিয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা হইল, কিন্তু ঠাকুমার দুধ চৌকী দিতেছি—যাইবার উপায়ও নাই। বিড়ালটাকে দেখিতে পাইলে না হয় দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতাম।

বিমুদাকে এ কথা বলাতে, বিমুদা কহিল, তুই একেবারে আস্ত গাধা! একটা বেড়ালকে বাঁধবি, আর একটা এসে যদি খেয়ে যায়?"

"তবে কি করিব?"

"তবে কি করিবি? কৈ দুধের বাটি?" বলিয়া বিমুদা' চোঁ চোঁ করিয়া বার আনা রকম দুধ চুমুক দিয়া খাইয়া ফেলিল এবং বাকী দুধটুকু আমার সামনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল,—"খেয়ে ফেল্—ফেলে বাটিটা উপুড় করে রেখে দিয়ে চল। এখন বেড়াল এসে কচু খাবে।"

সে দিন সন্ধ্যার পর বাবা, জ্যেঠামশাই, ঠাকুমা প্রভৃতি বসিয়া আমাদের বৈকালের কাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সকলেই খুব একটা হাসির সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মনে মনে নিশ্চিন্ত হইলাম যে, ব্যাপারটা শেষে হাসির সঙ্গেই শেষ হইল। কিন্তু কে জানিত যে, এত হাসির পরেও আবার আমাদের চোখের জলের সঙ্গে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। সে রাত্রিতে জ্যেঠামশাই ও বাবা আমাদের দুই জনের কি দুর্দ্দশা যে করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিতে আজও মন লজ্জায় ভরিয়া আসে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন হইতে আমাদের দুই জনের বাঙ্গালা স্কুলে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু আমরা আসিলাম রায়পুকুর, আমার মাতুলালয়ে।

এই আসাটা একেবারেই আকস্মিক। হঠাৎ সকাল বেলায় কাপড় গামছা হাতে করিয়া খিড়কীর পুকুর-ঘাটে যাইতে যাইতে মা কহিলেন,—"গুলি নিয়ে বেরুচ্ছ কোথায়? কোথাও আজ আর যেও না, খাওয়া-দাওয়ার পরই আজ সব আমরা রায়পুকুর যাব।"

এই রায়পুকুরের কেবল নামই এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি এবং এই পর্য্যন্ত জানি যে, সেখানে আমার মামার বাড়ী। কিন্তু সে কোথায়, কেমন এবং সেখানে আমার মামাদের কে কে আছেন, সে সব কিছুই জানিতাম না। কারণ, শিশু অবস্থায় মায়ের সঙ্গে হয় ত বা সেখানে গিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর হইতে কখনও সেখানে যাই নাই। মা মাঝে মাঝে যাইতেন বটে, কিন্তু, সে শুধু দুই দিনের জন্য এবং একেলা; কারণ, ম্যালেরিয়ার ভয়ে, মায়ের সঙ্গে ঠাকুমা সেখানে আমায় কখনও যাইতে দিতেন না। সুতরাং মামার বাড়ীর সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। তবে জানিতাম যে, সেখানে রেলে করিয়া যাইতে হয়, নদী আছে, নদীতে নৌকা চাপিয়া বেড়ান যায়, অনেক খেজুরগাছ আছে, এই শীতকালে খুব খেজুর-রস পাওয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই মা যখন কহিলেন—রায়পুকুর যাইতে হইবে—তখন নিরতিশয় আনন্দ ও উৎসাহে মনটা ভরিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে কে যাবে মা?" উত্তরে মা কহিলেন,—"আর কেউ নয়—শুধু তুমি আর বিনু!" শুনিয়া বুকটা একেবারে নাচিয়া উঠিল। বিনুদাও যাবে! মনে হইল, সেইখানে সেই গুলির থলে হাতে বুকের সঙ্গে সঙ্গে দেহখানাকেও একবার নাচাইয়া ঘুরপাক খাওয়াইয়া লই, কারণ, এত সুখ যে ভাগ্যে ঘটিবে, ইহা স্বপ্নেরও অতীত। তা ছাড়া, মা, বিনুদা আর আমি—বাবাও নয়, জ্যেঠামশায়ও নয়, ঠাকুমাও নয়। একেবারে নিষ্কণ্টকে রায়পুকুর অভিযান ও অবস্থিতি। ছুটিয়া বিনুদাকে খবরটা দিতে যাইতেছিলাম, পিছন হইতে ঠাকুমার গলা পাইলাম,—"২৪ ঘণ্টা যেন হৈ হৈ ক'রে সেখানে দিন কাটিও না। বই-সেলেট, খাতা-পত্তর বেঁধে নিয়ে যাবে। সকাল-বিকেল হাতের লেখা ভাল ক'রে লিখবে। নিমাই গাঙ্গুলী বিদ্যে তেমন কিছুই শিখে নি, কিন্তু লিখে লিখে হাতের লেখা এমন পাকিয়েছিল যে, আজ যে আফিসেই যাচ্ছে, সেইখানেই সাহেবের নজরে প'ড়ে যাচ্ছে। বিদ্যে যতই শেখ না কেন, হাতের লেখা ভাল না হ'লে আর সাহেবের চাকরী পাবে না।"

সেকালে সেই ছোটবেলায় ঠাকুমার কাবুলিওয়ালার তাগাদায় এই হাতের লেখার উপরই বেশী ঝোঁক দেওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না; ফলে হাতের লেখাটা আমাদের খুবই ভাল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভবিষ্যৎকালে, ঠাকুমার 'সাহেবের চাকুরী' করিবার যে দুই পাঁচ বৎসর সৌভাগ্য হইয়াছিল, সেই অল্পসময়েই বুঝিয়াছিলাম যে, ও জিনিষটা একেবারেই লোকসানের সামিল হইয়া গিয়াছে। সব চেয়ে মূল্যবান্ ব'লে ঠাকুমা যাহার জন্য দিবারাত্র আমাদের ব্যস্ত করিয়া তুলিতেন, কর্ম্মক্ষেত্রে দেখিলাম যে, এক কড়া কাণা কড়িরও মূল্য তাহার নাই। মূল্য যাহার পাইয়াছিলাম, তাহা হাতের লেখার জন্য নহে, তাহা অন্য জিনিষের। শুধু হাতের লেখা ভাল—এমন যে কয়েকজন আমাদের আফিসে চাকুরী করিতেন, তাঁহারা সকলেই মাসিক পনের টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধসংখ্যা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা প্রাপ্তির জন্য চাকুরী-সমুদ্রের গভীর অতলে পড়িয়া মাসের পর মাস হাবুডুবু খাইতেন। আমার ঠিক উপরে যে দুইজন যথাক্রমে আড়াই শত এবং পৌনে চারি শত টাকা মাস মাস পকেট ভরিয়া লইয়া যাইতেন, তাঁহাদের লেখা এমন জঘন্য ছিল যে, তাহা আর বলিবার নহে।

ঠাকুমার সেই নিমাই গাঙ্গুলী সে লেখা দেখিলে বোধ হয় আঁৎকাইয়া উঠিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িত। কিন্তু সকলের মাথার উপর যিনি তাঁহার তেরশত টাকার চেয়ারখানি পাতিয়া বসিয়াছিলেন, আফিসের সেই বড়সাহেব এ বিষয়ে আর সকলকে একবারেই হারাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর একটি দেখিবার জিনিষ ছিল। তাঁহার লেখা পড়িবার অভ্যাস যাহাদের ছিল, তাহারা ভিন্ন সে দেবাক্ষর অন্য কেহ যদি পড়িবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে শীতকালেও তাহার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিবার সবিশেষ সম্ভাবনা থাকিত। অনেক দিন দেখিয়াছি, নিজের লেখা কোন কারণে পুনরায় পড়িতে গিয়া সাহেবকে বিষম নাস্তানাবুদ হইতে হইতেছে। 'কোন্ লিগা হৈ' বলিয়া তখন নিজেকেই মনে মনে কটু ভাষায় কোন রকম বিশ্রী গালি দিয়া উঠিতেন কি না, জানি না, তবে ক্রমেই মুখ তাঁহার লাল হইয়া উঠিত এবং কখনও কখনও কাগজখানাকে ক্রোধে হাতের মধ্যে পাকাইয়া 'ওয়েষ্ট পেপার ব্যাস্কেটে'র মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আবার কাগজ-কলম লইয়া নূতন করিয়া লিখিয়া দিতে বসিতেন। কিন্তু ইহা লইয়া মধ্যে মধ্যে একটু রসের সৃষ্টিও হইয়া যাইত। এমনই এক দিনের একটা ব্যাপার আজ পর্য্যন্তও ভুলিতে পারি নাই।

নন্দীমশায় ছিলেন 'পোরমিট্'-সরকার, অর্থাৎ 'জেটির গুদাম-সরকার। বছর চৌদ্দ আগে সতের টাকায় ঢুকিয়া তখন তিনি একুশ টাকা বেতন ভোগ করিতেছিলেন। সে-দিন ছিল বর্ষাকালের এক ঘন-মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দিন। সকাল হইতেই ঝম্ ঝম্ করিরা অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছিল। সাহেব সেদিন অফিসে আসিয়াই খুব তাড়াতাড়ি কি একখানা চিঠি লিখিয়া 'কপিয়িং ক্লার্ক' অক্রূর বাবুর কাছে কপি করিবার জন্য পাঠাইয়া শুনিলেন যে, তখনও তিনি আসেন নাই। সাহেব একটু চটিয়া গেলেন, কারণ, প্রায়ই অক্রূরবাবুর এই রকম 'লেট' হইত। সাহেব তখন নন্দীমশায়কে কোথায় পাঠাবার জন্য খোঁজ করিলেন, কিন্তু নন্দীমশায়ও তখন পর্য্যন্ত গর-হাজির। সাহেব গেলেন বিষম রাগিয়া। তখন গজ গজ করিতে করিতে আমার ঘরে আসিয়া কহিলেন যে, অক্রূর বাবু আর নন্দীমহাশয়ের যেন পাঁচ টাকা করিয়া 'ফাইন' করা হয়। হুকুম ত সাহেবের মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু তের শত টাকার সাহেব —এটা আর ভাবিয়া দেখিলেন না যে, অক্রূর বাবুর পঞ্চাশ টাকার মধ্যে না হয় পাঁচ টাকা 'ফাইন' দেওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু নন্দীমশায়ের এক কুড়ি একের পাঁচ টাকা যাইলে, তাঁহার পক্ষে কি দাঁড়াইবে! এই কথাই সাহেবকে বুঝাইয়া বলিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় নন্দীমশায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া হাজির,—সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার কাদা মাখা, কাপড়-চোপড় জলে একবারে ভিজিয়া গিয়াছে, মাথার চুলে ও মুখে, মুছিয়া ফেলা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে কাদার দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। সাহেবের সম্মুখে আসিয়া, সেলাম করিয়া নন্দীমশায় কহিলেন,—"Little late Sir, Excuse Sir."

সাহেব মুহূর্ত্তকাল নন্দীমহাশয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"No excuse, you must be fined to day for your late. বলিয়া সাহেব চলিয়া যাইতেছিল, নন্দীমশায় আর একবার সেলাম করিয়া কহিলেন,—"What doing Sir? from night অনবরত rain and rain, Roads filled-up with water, no tram, no share-horse carriage, running running come লালদীঘি পর্য্যন্ত and then leg slipped and falling down একেবারে চিৎপটাং on the road."

নন্দীমশায়ের বিদ্যা 8th class পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু সাহেবের সঙ্গে অনর্গল এইরূপ ইংরাজী বলিতে তাঁহার বাধিত না। সাহেব বাঙ্গালা ভালরূপই বুঝিতেন এবং বলিতেও পারিতেন, তাই নন্দী-মশায়ের এই অদ্ভুত ইংরাজী ও বাঙ্গালা-মিশ্রিত বুলি বুঝিতে তাঁহার কোথাও অসুবিধা ঘটিত না এবং এই জন্যই, মুখে তিনি নন্দীমশায়কে যাহাই বলুন না, অন্তরে তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া নন্দীমশায় পুনরায় কহিলেন—"This time excuse Sir, Pardon Sir, আর কখনো যদি late be, you fine, you beat, এমন কি, you গলা-ধাক্কা giving drive out. You father and you mother, this time excuse Sir."

সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলাম যে, আমারই মত অতি কষ্টে সাহেব হাসি চাপিয়া আছেন। খানিকক্ষণ সেই অবস্থায় সাহেব নন্দী-মশায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন,—"All right, Nandi, if you can make a copy of this, you may be

excused. Go and make a copy of this" বলিয়া সাহেব তাঁহার হস্তস্থিত সেই draft চিঠিখানি নন্দীমহাশয়ের হাতে দিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। নন্দীমশায় লেখাপড়ার ধার তত না ধারিলেও, তাঁহার হাতের লেখাটি ছিল খুব সুন্দর। সাহেবের draft খানি হাতে করিয়া তিনি তাঁহার টেবিলের ধারে যাইয়া বসিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরেই সাহেবের ঘর হইতে তাঁহার উচ্চ হাসির রোল শুনিতে পাইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই চাপরাসী আসিয়া কহিল, সাহেব ডাকিতেছেন। সাহেবের ঘরে ঢুকিয়া দেখি, নন্দীমশায় টেবলের সম্মুখে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন আর সাহেব নন্দীমশায়ের লিখিত তাঁহার সেই চিঠির কপিখানি হাতে লইয়া হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছেন। ব্যাপার হইয়াছে এই যে, সাহেব এক স্থলে লিখিয়াছিলেন, "I want more than One Hundred men for the dumping ground"—নন্দীমশায় ইহা ঠিক পড়িতে না পারিয়া লিখিয়াছেন—"I must marry then One Hundred one or two dancing girl." তখন আমিও আর হাসি রাখিতে পারিলাম না। সাহেব হাসিতে হাসিতে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"Nundi, you must be rewarded for this" আমি হাসিতে হাসিতে নন্দীমশায়কে টানিয়া লইয়া আমার ঘরে গিয়া বলিলাম,—"এ করেছেন কি? Dumping groundকে একেবারে Dancing girl? আজ কি মাথার কিছু বেঠিক ঘটেছে নন্দীমশায়?"

নন্দীমশায় কহিলেন,—"জানি না, ভাই! এ সব কি আমাদের কাজ, চিঠি-পত্র কপি করা? আর, কি ছাই হাতের লেখা, তাত জান; ও কি সহজে কেউ পড়তে পারে—না বুঝতে পারে?"

যাহা হউক, নন্দীমশায়ের এই Dancing girlই সে-দিন তাঁহার অশেষ মঙ্গল ঘটাইয়া দিল, সে-দিনকার জরিমানা ত তাঁহার মাফ হইলই, তা'র ওপর নগদ দশ টাকা বকসিস্ এবং পরের মাস হইতে এক টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধি।

তখনকার সাহেব-সুবোই ছিল এই রকম,—এই রকম আমোদপ্রিয়, এই রকম নিরহঙ্কার, অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত এই রকম মিশুক ও তাহাদের প্রতি এই রকম সদয়, এই রকম ভদ্র,—আর এখন—; কিন্তু কোন্ কথা বলিতে যাইয়া কোন্ কথায় আসিয়া পড়িতেছি?—যাক্।

ঠাকুমার তাগাদায় তখনই খাতা-পত্র বই-সেলেট ঠিক করিয়া বাঁধিয়া লইতে মনোযোগী হইলাম। দপ্তর ত বড়, তার আবার ঠিক করা। একখানা খাতা, গোটা দুই তিন সরের কলম, একখানা সেলেট আর একখানা বই।

তখন আমাদের একখানা মাত্র বই পড়া হইত, সেই একখানি বইয়ের মধ্যেই সব থাকিত। তাহাতেই বর্ণপরিচয়ের অ আ ই ঈ, A, B, C, D, ধারাপাত, শুভঙ্করী, তাহাতেই পত্র লিখিবার আদর্শ, জমীদারী, মহাজনী, তাহাতেই পুরাণ, কাব্য, তত্ত্বোপদেশ, এমন কি, চাণক্যের রাজনীতি পর্য্যন্ত সকলই ছিল। সর্ব্বজ্ঞানের দীপস্বরূপ এই বহিখানির নাম—জ্ঞানদীপিকা। দেশী মোটা কাগজে বটতলার ছাপাই এবং দেশী তুলট্ পিচবোর্ডের অপরূপ বাঁধাই, মূল্য দশ পয়সা। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা যাঁহারা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমার ন্যায় এই পুস্তকখানি নিশ্চয় পড়িয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের কাহারও সে সৌভাগ্য ঘটে নাই।

বোম্বাই প্রদেশের এক শ্রেণীর ফেরিওয়ালার কথা শুনিয়াছি, তাহাদের নাম 'চৌ-চৌ'-ওয়ালা। তাহাদের মস্তকের চ্যাঙ্গারির মধ্যে গৃহস্থের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল রকম জিনিষই থাকে। সূচ, সূতা, বোতাম, সেফটীপিন্, মোজা, গেঞ্জি, রুমাল, বই, খাতা, কলম, সাবান, সেণ্ট, পাউডার হইতে আরম্ভ করিয়া পেটেণ্ট ঔষধ, বিস্কুট, মিষ্টান্ন, ছাতা, ছড়ি, আলপিন, পেরেক, হুক্, জামা, জুতা, জুয়েলারী এবং কিস্‌মিস্, মনেক্কা, জর্দ্দালু, খোবানি—এমন কি, ঝুনা নারিকেল, তেঁতুল, মধু পর্য্যন্ত সকল রকম দ্রব্যই থাকিত। তাহাদের এই চ্যাঙ্গারিখানির নামই 'চৌ-চৌ'। আমাদের এই 'জ্ঞানদীপিকা' ছিল ঠিক যেন বোম্বাইয়ের সেই 'চৌ-চৌ'। তাই, কত কাল চলিয়া গিয়াছে, তবু আজও এই 'চৌ চৌ' বহিখানির কথা ভুলিতে পারি নাই। তাহার সেই 'পত্র লিখিবার ধারা'—আজ্ঞাকারী শ্রীনটবর দে সবিনয় নমস্কার নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের স্থির রাজলক্ষ্মী নিয়ত শ্রীস্থানে প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহাতে অত্রানন্দ পরং।—সেই টাকার খত—লিখিতং শ্রীরামকুমার বিশ্বাস কস্য কর্জ্জপত্রমিদং। সেই 'গঙ্গার বন্দনা'। সেই 'সান্দীপনি মুনির পাঠশালা'। সেই 'দাতা-কর্ণ', আর 'গুরু-দক্ষিণা'র সেই—

"বন্দ প্রভু নারায়ণ অখিলের পতি।
যাঁর পদ সেবেন কমলা সরস্বতী ॥
ব্রহ্মার জনম হৈল নাভি-শতদলে।
বিষ্ণুর উৎপত্তি হৈল চরণ-কমলে ॥"

এ সব আর জীবনে ভুলিতে পারিব না। Ransomএর History of England পড়িয়াছি মনে করিতে হয়, Bainএর Grammar কিম্বা Rose সাহেবের Hintএর কথা আর কিছুদিন পরে হয় ত ভুলিয়াই যাইব, কিন্তু এই চৌ-চৌ—'জ্ঞান-দীপিকা'র কথা অক্ষয় অমর হইয়া, যত দিন জীবন থাকিবে, ততদিন তাহার পরতে পরতে গাঁথা থাকিবে। প্রত্যহ ছুটীর সময় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া 'জ্ঞান-দীপিকা' হইতে সকলের সেই মিলিত কণ্ঠের আবৃত্তি—

"মাতার সমান নাই——শরীর-পোষিকা।
ভার্য্যার সমান নাই——শরীর তোষিকা ॥
বিদ্যার সমান নাই——শরীর-ভূষিকা।
চিন্তার সমান নাই——শরীর-শোষিকা ॥"

এবং তার পরই আজকালকার Kindergarten-এর old edition সেই বাড়ী যাবার গান—

"বেলা গেল এস ভাই পড়া হ'ল বাড়ী যাই।
সারি সারি সবে যাব, কোন দিকে নাহি চাব ॥"

এ আর জীবনে ভুলিব কি করিয়া!

দুইখানি পত্রের আদর্শ ছাড়া, পণ্ডিত মহাশয় প্রায় সারা বহিখানিই আমাদের পড়াইয়াছিলেন। সেই আদর্শ-পত্র দুইখানি তিনিও আমাদের পড়াইতেন না, আমরাও পড়িয়া তাহার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু এখন অর্থ যদি বা বুঝিতে পারি, কিন্তু একটিবার গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পত্র দুইখানি পড়িতে হইলে ক্লান্ত হইয়া পড়ি। তখন এতবার সেই পত্র দুইখানি পড়িয়াছি যে, তাহা কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল এবং তখনও যেমন তাহা কণ্ঠস্থ ছিল, এখনও এই জীবনের অপরাহ্নে ঠিক তেমনই কণ্ঠস্থ আছে, মায় তাহার শিরোনামাটি পর্য্যন্ত। আমার বাল্যের স্মরণশক্তি এমনই প্রবল যে, কত কাল কাটিয়া গিয়াছে, তবু তাহার আ-কার ই-কারটুকু পর্য্যন্ত আজ কিছুই ভুলি নাই, সে কালের মত ঠিকই আজ তাহা তেমনই মনে আছে। তাহা এই :—

"স্বামীকে স্ত্রীলোকের পত্র লিখিবার আদর্শ—

শ্রীচরণসরসি দিবানিশি সাধনপ্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদসরোরুহ স্মরণমাত্রে অত্র শুভম্বিশেষ। পরে নিবেদন, মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কালযাপন করিতেছেন, সেকালে এ দাসীর কালরূপলগ্নে পাদক্ষেপণ করিয়াছেন, সে কালহরণ করিয়া দ্বিতীয়কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুই কালের সুখোদয় বিবেচনা করিবেন। দ্বিতীয়কালের সাধনের ধন আদরামৃত তৃতীয়কালের কালানুসারে কালকূট দোষ হইবে, অতএব বহুকাল কালস্বরূপ মনে উদ্ভব হয় যে, আগতকাল আগতপ্রায়, এইরূপে আগত আগত ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়াগত উন্নত হইয়া অধোগত প্রায় হইয়াছে; অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীচরণযুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেন ইতি। ২৫ চৈত্র।

শিরোনামা

ঐহিক পারত্রিক নিস্তার কর্ত্তৃক ভবার্ণবানাধিক
শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য
পদপল্লবাশ্রয় প্রদানেষু।

স্ত্রীকে পত্র লিখিবার আদর্শ—

পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীরবতী নবসিত কলেবর রাঙ্গা সম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেবশর্ম্মণঃ। ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃকরণে বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রীকরকমলাঙ্কিত কমল পত্র পঠিত অত্র শুভম্বিশেষ। বহুদিবসাবধি প্রত্যাবধি নিরবধি প্রয়াস-প্রবাস নিরাশ তাহাতে কর্ম্মকাল বিনাশ অতিরিক্ত উত্যক্তন্তঃকরণে কালযাপন করিতেছি, অতএব মম নয়ন প্রার্থনা করে যে, সর্ব্বদা একতাপূর্ব্বক অর্পণ সুখোদ্ভব মুখারবিন্দ যথাযোগ্য মধুকরের ন্যায় মধু মাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয়, প্রয়াসা মীমাংসা প্রণীতা শ্রীশ্রীঈশ্বরেচ্ছা শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ পূর্ব্বক কালযাপন কর্ত্তব্য, ধনোপার্জ্জন তদর্থে তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃকা দুঃগিতা, এতাদৃশ উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই স্থির সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতেছি ইতি—

শিরোনামা—

গুণাধিকা স্বধর্ম্মপরিপালিকা
শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী।
সাবিত্রীধর্ম্মাশ্রিতেষু।"

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এ হেন 'জ্ঞান-দীপিকা'র রচয়িতার নাম গ্রন্থে প্রকাশ নাই; তাহা থাকিলে এখন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আসিতাম।

তবে যেটুকু সাধ্যের ভিতরে, সেটুকু করিলাম, অর্থাৎ এই আদর্শ রচনাটিকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গেলাম। এবং আরও সুখের বিষয় যে, আমার বহু পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের কোন কোন শ্রেষ্ঠ লেখকও ইহার গুণমুগ্ধ হইয়া ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের পর আমার আর কিছু না লিখিলেও চলিত, কিন্তু ইহা এতই আমার প্রিয় বস্তু যে, কিছু লিখিবার লোভ আমি কোনমতেই আর ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, যুগান্তর পরে সম্প্রতি আবার এই 'জ্ঞানদীপিকার' দর্শন পাইয়াছি এবং শুধু দর্শনই নয়, ইহার এক খণ্ডের অধিকারীও হইয়াছি। কয়েক মাস হইল, এক বটতলার পুস্তকবিক্রেতা 'হকারে'র কাছে হঠাৎ এক দিন ইহার দর্শনলাভ, সঙ্গে সঙ্গেই ধারণ এবং গ্রহণ। খুলিয়া দেখি, সেই জিনিষই বটে, সেই সবই, তবে বাহ্য আকৃতির কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবঘনশ্যামল রূপ, বিংশ শতাব্দীতে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও দশ পয়সা হইতে ছয় পয়সায় নামিয়াছে। এই ছয় পয়সার 'জ্ঞানদীপিকা'-খানি সে-দিন আমি বুকে করিয়া আনিলাম এবং ছয়টি অর্দ্ধ-মুদ্রা ব্যয়ে তাহাকে আমি মরক্কো চামড়ায় স্বর্ণাঙ্কিত করিয়া বাঁধাইয়া আজ বহুমূল্য সম্পত্তিজ্ঞানে সযত্নে রক্ষা করিয়াছি।

ঠাকুমার কথায় এ হেন 'জ্ঞানদীপিকা', খাতা ও সেলেটের সঙ্গে দপ্তরে বাঁধিয়া ফেলিলাম এবং মামার বাড়ী আসিবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমরা রায়পুকুর আসিয়াছি। এখানে আসিবার পর হইতেই বিনুদার দর্শন পাওয়া দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল। হঠাৎ প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে বিনুদা এক নূতন কর্ম্মে ব্রতী হইয়া পড়িল, অর্থাৎ ভয়ঙ্কর ঘুমাইতে লাগিল। এত ঘুমাইতে লাগিল যে, সে যুগের কুম্ভকর্ণ যদি বিনুদা'কে তাঁহার আমলে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি বিনুদা'কে তাঁহার একজন 'এসিষ্ট্যাণ্ট' করিয়া লইবার পক্ষে বোধ হয় কোন অমত করিতেন না।

তখনকার দিনের একতলা বাড়ী। দোতালার ছাদের উপর ছিল শুধু ছোট্ট একটি 'চিলে-কুঠুরী।' আসিয়াই বিনুদা সেই 'চিলে কুঠুরী' দখল করিয়া লইল এবং চব্বিশ ঘণ্টা সেই ঘরে খিল লাগাইয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে, এবং নির্ব্বিবাদে ঘুমাইতে লাগিল।

তখন বিনুদা'র চব্বিশ ঘণ্টার 'রুটিন' ছিল এইরূপ,—বেলা ৯টার সময় নিদ্রা এবং শয্যাত্যাগ। ৯টা হইতে ১১টার মধ্যে স্নানাহার ইত্যাদি সমাধা। ১১টা হইতে ৫টা—'চিল-কুঠুরীতে' গভীর নিদ্রা। ৫টা হইতে ৬টা—নিদ্রাত্যাগান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ। তাহার পর ৭টা হইতে পরদিন বেলা ৯টা পর্য্যন্ত—আবার নিদ্রা, মধ্যে কেবল রাত্রি ৮টা কি ৮৷৷০টার সময় ৩০ মিনিটের জন্য আহার। সুতরাং বিনুদা'র দর্শন দেবদর্শনের মতই সকলের কাছে সুদুর্ল্লভ হইয়া উঠিল। দাদামশাই বলিলেন, "ও শালাকে 'নোণা' লেগেছে, 'নোণা'-ভূতে পেয়েছে' ওকে আর কিছু খেতে না দিয়ে খালি থোড় সেদ্ধ ক'রে খাওয়া"।

মা একদিন রামচরণ চাকরকে কহিলেন, "দিয়ে আয় ত রামুদা', ওর ঘুঘুর বাসা পুড়িয়ে! মুখপোড়া ছেলের এ হ'ল কি—চব্বিশ ঘণ্টা খালি ঘুম! দিয়ে আয় 'চিলকুঠুরী'তে তালা লাগিয়ে।" বিনুদা' কিন্তু অচল—অটল। তা'র নিত্য-কর্ম্মের কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ হইল না, নিদ্রা সমভাবেই চলিতে লাগিল। তখন মা একদিন সত্য সত্যই 'চিলে-কুঠুরী' বন্ধ করিয়া দিবার জন্য তালা-চাবি লইয়া উপরে গেলেন এবং খানিক পরেই বিনুদা'কে লক্ষ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে বিষম বকাবকি করিতে লাগিলেন। বকাবকির মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল দেখিয়া ছুটিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গেলাম। যাইয়া দেখি, মা জানালার উপরকার কাঠের তাক্ হইতে আঁচলা আঁচলা করিয়া উই-মাটী আনিয়া ছাদের এক ধারে জমা করিতেছেন, আর সেই উই-মাটীর সঙ্গে উইয়ে খাওয়া একগাদা কাগজ টুকরা টুকরা হইয়া মিশাইয়া রহিয়াছে। বুঝিতে আর বাকী রহিল না। বিনুদা' পড়িবার নাম করিয়া তাহার বই খাতার দপ্তর উপরে আনিয়া কাঠের সেই তাকের উপর রাখিয়া দিয়াছিল, তাহার পর তাহাতে আর মোটেই হস্তস্পর্শ ঘটে নাই; সুতরাং রায়পুকুরের উই সুন্দর সুযোগ ও অবসর পাইয়া সেগুলির প্রতি নির্ব্বিবাদে সদ্ব্যবহার করিয়াছে!

মা বিষম রাগিয়া গিয়া বিনুদা'কে বকিতে লাগিলেন,—"হতভাগা কোথাকার! জানিস্, এ হ'ল রুইএর দেশ, একটুও তোর হুঁস্ নেই! লেখা

গেল, পড়া গেল, দিন-রাত খালি প'ড়ে প'ড়ে ঘুম !"

বিমুদা'কে কিন্তু বলিহারি ! এমন ব্যাপারেও কিন্তু শয্যাত্যাগ করিয়া উঠে নাই, তখনও কাত হইয়া শুইয়া মুখ বাড়াইয়া ছাদের উপর তাহার দপ্তরের দুর্দ্দশা দেখিতেছিল। মায়ের কথায় তেমনই শুইয়া শুইয়াই কহিল—"তুমি বেশী বোকো না খুড়ীমা। রুই ধরবে, তা' আমি কি করবো ? এই শীতকালেও তোমাদের দেশে যে এত রুই, তা' আমি কি ক'রে জান্‌বো ?"

"ওরে বাঁদর, এখানে যে ভীষণ রুই ! শীতকাল বলেই ত শুধু তোর দপ্তরে ধরেছিল, নইলে—"

"নইলে, কি খুড়ী মা ?"

"নইলে, বর্ষাকাল হ'লে, তুই যে রকম প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুচ্চিস্, তোকেই এতদিন রুই ধ'রে কুরে কুরে খেয়ে ফেল্‌তো !"

"হ্যাঁ, ফেল্‌তো !"

"হ্যাঁ ফেল্‌তো কি রে ? সেবার ক্ষিরী নাপতিনীর জ্বর হয়ে একটি দিন ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছিল, সন্ধ্যের আগে গিয়ে দেখি, তা'র আধখানা পিঠে একেবারে রুই লেগে ছেকে ধরেছে !"

"আর সে তবুও দিব্যি ঘুমুচ্চে ?"

"জ্বরে তা'র কি আর জ্ঞান ছিল ! সে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল। আমি গিয়ে তবে ত তাকে—"

"বাবা ! জ্যান্ত মানুষকে রুইয়ে ধরে ! ধন্যি দেশ খুড়ীমা তোমাদের !" বলিয়া বিমুদা লাফাইয়া উঠিয়া ঘর হইতে ছাদে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, —"কাল থেকে মাইরি বলচি খুড়ীমা, কিছুতেই আর শোব না !"

মা 'চিলে-কুঠুরী'তে তালা লাগাইয়া নীচে নামিয়া গেলেন। আমি বিমুদা'কে কহিলাম,— "চল, বিলের পুকুরে মাছ ধরতে যাই,—যা'বে ? এখন আর কি করবে ? ঘুমুতে ত আর পাচ্ছ না !" বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, এই কয়দিনে বিমুদার শরীরের কিন্তু আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্ত্তনটা ভালর দিকেই। বিমুদা'র শরীরে মাংস লাগিয়াছে, মুখখানা ঘোবালো হইয়াছে, হাত-পা-গুলা সুস্পষ্ট হইয়াছে এবং গায়ের রং আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, বিমুদা' যেন দুই চারিমাস বৈদ্যনাথ, মধুপুর কি দার্জ্জিলিং ঘুরিয়া আসিয়াছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে ও শরীরতত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে, বিমুদা'র সাংঘাতিক ঘুমের সঙ্গে ইহার কোন যোগাযোগ আছে কি না, হয় ত বলিতে পারিতাম। মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, কি ক'রে অত ক'রে ঘুমুতে পারতে বল ত ?"

"পারতে কি রে ? এখন কি পারি না নাকি ? পাল্লা দিয়ে ঘুমুতে পারিস্ আমার সঙ্গে ? আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘণ্টা দুই কেবল খাবারদাবার জন্যে বাদ দিয়ে বাইশ ঘণ্টা আমি ঘুমুবো ; পারবি আমার সঙ্গে ?"

"ঘুমে পারব না, কিন্তু মাছ ধরাতে নিশ্চয় তোমায় হারিয়ে দোব। কাল বিলের পুকুর থেকে কতগুলো মাছ ধরিছি, জান ? সাতাশটা পুঁটি আর চার চারটে ল্যাটা,—মাইরি বলছি !"

বিমুদা' কহিল,—"ছিপ আছে ?"

আমি বলিলাম,—"আছে।"

তখন ছিপ লইয়া দু'জনে বাহির হইয়া পড়িলাম। বিমুদা' কহিল,—"মাকাল ঠাকুরের নাম ক'রে বেরো, নইলে মাছের নামে অষ্টরম্ভা হবে।"

গ্রামের প্রান্তভাগে বিলের পুকুর। সিদ্ধেশ্বরী-তলা ছাড়াইয়া মাঝের পাড়া ঢুকিতেই পথের ধারে বামা ময়রার দোকানের দিকে চাহিয়া বিমুদা' কহিল,—"ওরে, এখানেও খাঁ-সাহেব !" দেখিলাম, দীর্ঘে-প্রস্থে ৫ হাত ও ২॥০ হাত মাপের এক বিরাট্‌কায় কাবুলী, বামাচরণের স্বল্পালোকবিশিষ্ট দোকান-ঘরখানিকে প্রায় অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কাবুলী দেখিলেই বিমুদা' তাহার সহিত আলাপ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না। একবার তাহার ঢিলা আস্তানায় হাত দিবে, একবার লাঠিগাছটি ধরিবে, একবার পাগড়ীর দিকে চাহিবে, একবার তাহার জুতা দেখিবে, তার পর হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে,— "কেয়া হায় তোমরা ঝুলিয়ামে ?"

এ কাবুলীটির পিঠে কোন ঝুলি-ঝোলা ছিল না। কম্বল-আলোয়ান বিক্রয় করা তখন তাহারা সুরু করে নাই—বিশেষ পাড়াগাঁয়ে। তবে সেই সুদূর পল্লীগ্রামে কেন যে এই কাবুলীটির সে সময় আবির্ভাব হইয়াছে, বলিতে পারি না।

সারাদিন ঘুরিয়া শ্রান্তিতে সম্ভবতঃ তাঁহার তৃষ্ণা পাইয়াছিল, তাই চারিটি পয়সা হাতে করিয়া বামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, কোনও 'মিঠাই' আছে কি না। বামাচরণ কহিল,—

"হায়, মিঠা হায়, মুড়কী নতুন গুড়ের খুব ভাল হায়, বাতাসাও হায়,—লেগা ?"

হায়, কাবুলী, তোমার মাথায় বাজ পড়ুক! কোথায় আফগানিস্থানের আঙ্গুর, বেদানা, আখরোট, পেস্তা, খোবানি, কিস্‌মিস্, আর কোথায় বাঙ্গালার মুড়ি-মুড়কী, খৈ-বাতাসা, গুড়-ছাতু! এ দুর্ভোগ কেন তোমার? কাবুল-কান্দাহার-হিরাটের পাহাড়-পর্ব্বত বাগ-বাগিচা ছাড়িয়া বাঙ্গালার এ ধানক্ষেতের জলায় কি তোমার সাজে!

কাবুলী জিজ্ঞাসা করিল,—"লাড্ডু হায় ?"

বামাচরণ কাবুলীর মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—"লাড্ডু নেই হায়, তবে, খুব ভাল খাস্তা-কা গজা হায়,—দেগা ?" বলিয়া শালপাতার একটি ঠোঙ্গায় চারিখানি গজা বাহির করিয়া আনিয়া কাবুলীওয়ালার হাতে দিল।

কাবুলী কহিল,—"পানি ?"

পানিও এক ঘটী বামাচরণ ভিতর হইতে আনিয়া দিল।

একটি প্রকাণ্ড কুকুর, কাবুলীর হাতের ঠোঙ্গার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া পাশে দাঁড়াইয়া লেজ নাড়িতেছিল। কাবুলী তাহাকে লাঠীর একটা ঠেলা দিয়া, জলের ঘটী ও গজার ঠোঙ্গা হাতে লইয়া সম্মুখস্থ আতাগাছের তলায় গিয়া বসিল।

এখন বামাচরণের এই খাস্তাব গজা সম্বন্ধে একটু বলিবার আছে। এই গজা বামাচরণ বৎসরে একবার মাত্র—আষাঢ় মাসে রথের সময়-প্রস্তুত করিত। রথের বাজারে গজা বিক্রয় হইয়া যাহা কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকিত, বামাচরণ তাহা ৺দুর্গাপূজার সময় আর একবার রসে ভিজাইয়া থালা সাজাইয়া বিক্রয় করিত। তাহার পরও যদি সে গজার কিছু ছিটেছাটে পড়িয়া থাকিত, বামাচরণ তাহার দ্বারা চৈত্রমাসে গাজনের মেলার খরিদ্দার বিদায় করিত। সুতরাং আষাঢ়ের সেই গজা, মাঘের শেষে একখানি মুখে করিয়া কাবুলীপুঙ্গবকে মহা সঙ্কটাবস্থায় পড়িতে হইল। তাহা চিবাইতে গিয়া তাহার মুখ-চোখ ভীষণ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সেই দারুণ শীতেও তাহার ঢিলা আলখেল্লার ভিতরটা বোধ হয় ঘামে ভিজিয়া উঠিল, কিন্তু তবুও বামাচরণের সেই খাস্তার গজার একটি টুক্‌রও সে তাহার সেই কাবুলী-দাঁতে ভাঙ্গিতে পারিল না। তখন রাগে বিড়-বিড় করিতে করিতে—সম্ভবতঃ বামাচরণকে গালি দিতে দিতে গজার ঠোঙ্গা সেইখানে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল।

কুকুরটি তখন পর্য্যন্ত একধারে দাঁড়াইয়া একটু প্রসাদ বা তদভাবে অন্ততঃ প্রসাদাধার ঠোঙ্গাখানি পাইবার লোভে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছিল। এক্ষণে হঠাৎ একেবারে ঠোঙ্গাশুদ্ধ সমস্ত প্রসাদ সামনে পাইয়া, আনন্দে অধীর হইয়া সেগুলি দখল করিল, কিন্তু তাহারও অবস্থা কাবুলীর মতই হইল, অর্থাৎ প্রায় মিনিট পাঁচ সাত ধরিয়া বসিয়া, শুইয়া, চিৎ হইয়া, কাৎ হইয়া, একবার এ-কষ একবার ও-কষে ফেলিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু না ভাঙ্গিল বামাচরণের খাস্তার গজা, না ভাঙ্গিল কুকুরের দাঁত। অবশেষে বিশেষরূপ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া সারমেয়-প্রবর স্থান ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চালিয়া যাইতে যাইতে এই ভাবিয়া বোধ হয় আবার ফিরিল যে, লেহন দ্বারা যদি কিছু সেই খাস্তার রসাস্বাদন করিতে পারে। সুতরাং আবার ফিরিয়া আসিয়া একখানি গজা লইয়া সে চাটিতে সুর করিল। কিন্তু পাথর চাটিয়াও হয় ত তাহার রস বাহির করা সম্ভব হইত, বামাচরণের সে গজা চাটিয়া রস বাহির করিতে যাওয়া যে কি বিড়ম্বনা, তাহা শুধু বামাচরণই জানিত। যাহা হউক, গজার আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া মন্থরগতিতে কুকুরটি চলিয়া গেল।

আতাগাছের ডালে বসিয়া আর একটি প্রাণী সতৃষ্ণ নয়নে এযাবৎ নীচের দিকে চাহিয়া ছিল, এইবার সেই কাক-প্রভু উড়িয়া আসিয়া গজার কাছে বসিল এবং মিনিট কয়েক ধরিয়া অনবরত চঞ্চু দ্বারা ঠোক্‌রাইয়া কিছুই সুবিধা করিতে না পারিয়া কা-কা করিতে করিতে উড়িয়া গেল। কাবুলী, কুকুর ও কাক, ককারান্ত নামের এই শক্তিশালী জীব তিনটিকে পরাজয় করিয়া বামাচরণের খাস্তার গজা অক্ষয় অব্যয় হইয়া সেই আতাতলায় সগর্ব্বে পড়িয়া রহিল,—আমরা ছিপ হাতে করিয়া বিলের পুকুরের দিকে চলিলাম।

বঁড়শীতে টোপ গাঁথিতে গাঁথিতে বিলের পুকুরে ত আসিলাম, কিন্তু মাছ ধরা আর হইল না। পুকুর-পাড়ে আসিয়া দেখি, সেই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে জনশূন্য ঘাটের উপর বসিয়া ভট্‌চার্য্যিদের

বৌ অজস্রধারে কাঁদিতেছে। শূন্য ঘড়াটি তাহার একধারে কাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জলের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল বলিয়া বৌটি আমাদের আগমন একেবারেই লক্ষ্য করিতে পারিল না, যেমন কাঁদিতেছিল, তেমনই কাঁদিতে লাগিল।

বিনুদা' আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া কহিল,—"কে বল্ দেখি?

আমি চুপি চুপি কহিলাম,—"ভট্‌চার্য্যিদের বৌ?"

বিনুদা' কহিল,—"আমাদের মামী হয়, খুড়ীমা ব'লে দিয়েছে। এমন ক'রে কেন কাঁদ্‌ছে বল্ দেখি?"

"কি জানি।"

মামাদের বাড়ীর খিড়কীর দরজা খুলিয়া পা বাড়াইলেই ভট্‌চার্য্যিদের একবারে উঠানে পা পড়ে। এক কালে হয় ত স্থানটা আমাদের মত তাহাদেরও খিড়কী ছিল, কিন্তু চারিদিককার মাটীর পাঁচীল ধূলিসাৎ হইয়া গিয়া এখন তাহা তাহাদের উঠানেরই সামিল হইয়া পড়িয়াছে।

বৌটি বিধবা। বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসর। ঘরে শাশুড়ী ভিন্ন আর কেহই নাই।

বিনুদা' একেবারে তাহার সম্মুখে যাইয়া কহিল, —"মামীমা কাঁদছ কেন?"

চমকিয়া উঠিয়া বৌটি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া কহিল,—"বড্ড অসুখ কচ্চে, তাই কাঁদছি বাবা! তোমরা বুঝি মাছ ধরতে এসেছ?"

"হ্যাঁ মামীমা। কি অসুখ কচ্চে তোমার?"

"খাবার জল নিতে এসেছিলুম, জলশুদ্ধ ঘড়াটা তুলতে গিয়া বুকের ভেতর বড্ড একটা ব্যথা আটকে গেল, তাই কলসীটাকে ফেলে রেখে বুকে হাত দিয়ে—"

বালক হইলেও, মামীমার এই কথার ভিতর যে কোন সত্যই ছিল না, তা' ভালরূপই বুঝিলাম, মনে মনে কহিলাম,—"মামী গো! বড্ড ব্যথটা আটকে গেল, তাই কলসীটাকে ফেলে রেখে বুকে হাত দিয়ে? সকাল থেকেই যে শাশুড়ীর বকুনি খাচ্ছিলে আর রান্নাঘরে ব'সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছিলে, তখনও কি 'ঘড়াটা তুল্‌তে গিয়ে'? রোজই যে চোখের জলে ভাস্‌তে হয় তোমাকে, রোজই কি ঐ ঘড়ার ব্যথা তোমার বুকে আটকায়? সত্যিকারের বেদনা তোমার কোথায় আর কিসের, সে যে আমাদের আর জানতে বাকি নেই মামীমা! মা-দিদিমার কাছ থেকে সে যে দু'বেলা শুনতে পাই, তা আর তুমি কোন্ ছলে লুকোবে বল? প্রকাশ্যে কহিলাম,—"মামীমা, এই দুপুরবেলায় জল নিতে এত দূর এসেছ?"

মামীমা কহিল,—"জল যে একবারেই নেই। আমি না এলে আর কে আসবে বাবা?"

"কেন,—দিদিমা?"

অর্থাৎ মামীমার শাশুড়ীর কথা বলিলাম।

মামীমা কহিল,—"সে বুড়ো মানুষ, এত দূর এসে কি জল নিয়ে যেতে পারে?"

"কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর রোজ যে কুলীনপাড়া —রাণাপাড়ায় বেড়াতে যায়, সে ত বিলের পুকুরের চেয়ে, মামীমা, আরও দূর! তা', তোমার এখনও খাওয়া-দাওয়া হয় নি বোধ হয়?"

"না বাবা, একবার ত খাব, এত সকালে খেয়ে কি করব মাণিক? তোমরা মাছ ধরবে না?"

"ধরব মামীমা। সারাদিন ত রান্নাবান্না কায-কর্ম্ম নিয়ে তোমাকে থাকতে হয়, সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ী আস না কেন মামীমা,—আসবে?"

"কি ক'রে যা'ব মাণিক?"

"কেন, তখন আর তোমার কাজ কি?"

"রাত্রে যে মায়ের জলখাবারের জন্যে পরটা তরকারী কত্তে হয়।"

"ও!—তা, হ্যাঁ মামীমা, খালি মায়েরই জন্যে? তোমার জন্য নয়?"

"তোমরা বোধ হয় এখন এখানে থাকবে,—না বাবা?"

বিনুদা' কহিল,—"হ্যাঁ মামীমা থাকব। কিন্তু দিদিমা বুড়ী যেন যমের বাড়ী যায়!"

"কা'র কথা বল্‌ছিস্ রে?"

"তোমার শাশুড়ীর।"

"কেন বল্‌ত?"

"হ্যাঁ,—সে এক্ষণি ম'রে যা'ক্।"

আমি কহিলাম,—"জলে নেমে দূরে থেকে ভাল জল তুলে এনে দোব মামীমা?

"না ধন, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কি ঘড়া ভ'রে

জল আনতে পার কখন?" বলিয়া মামীমা উঠিয়া ঘড়াটি লইয়া জলে নামিল।

বিনুদা কহিল,—"আয়, যাই, আর মাছ ধরব না।"

আমারও মাছ ধরিতে কেমন আর ইচ্ছা হইল না।

দুই জনে ছিপ গুটাইতে গুটাইতে ফিরিলাম।

রাণাপাড়ার পথ ঘুরিয়া আসিতে আসিতে থিয়েটারের আখড়াঘরের সামনে আসিয়া আমরা দাঁড়াইয়া পড়িলাম। আখড়াঘরে তখন মহলা চলিতেছিল, কারণ, দোলের সময় নূতন বই হইবে। দাদামহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, গ্রামে বহুকাল পূর্ব্বে সখের যাত্রার দল ছিল। সে সব উঠিয়া বন্ধ হইয়া গিয়া তাহারই সাজ-সরঞ্জাম যাহা ছিল, তাহাই অধিকার করিয়া যুবকের দল নূতন করিয়া এই থিয়েটার বসাইয়াছিল। সে যুগের সেই যাত্রাদলের অধিকাংশই এখন গত হইয়াছে, সামান্য দুই চারিজন এখনও আছে। শুনিয়াছি তাহাতে দাদামশায়ও ছিলেন, তিনি তবলা বাজাইতেন। 'মেঘনাদ-বধ' পালা হইত। তখনকার দিনে রায়পুকুরের 'মেঘনাদ-বধ' পালার নাম তল্লাটের মধ্যে না কি টি টি পড়িয়া গিয়াছিল। এই সাবেক দল এগার বৎসর ধরিয়া এই 'মেঘনাদ-বধ' সমানে করিয়া আসিয়াছিলেন এবং আরও এগার বৎসর হয় ত এই 'বধ' করিতেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহাদের মেঘনাদের সঙ্গে, আর যিনি রাম সাজিতেন, তাঁহার সঙ্গে, এক বিঘা তিন ছটাক জমী লইয়া এমন মামলা বাধিয়া গেল যে, যাত্রার মিথ্যা যুদ্ধ হইতে হইতে দু'জনের মধ্যে তখন সত্যই এক মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হইল এবং সে যুদ্ধে, হয় রামের অথবা মেঘনাদের পরাজয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাদলেরও পালা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া আরও এক জন, যে এই সময় গোলযোগ ঘটাইয়াছিল, তাহার নাম বরদা ঘটক। তিনি হনুমান সাজিতেন। তাঁহার বত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও কোন পাত্রী সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার পর দীর্ঘ এগার বৎসর ধরিয়া হনুমান্ সাজিবার পর, বাঁকুড়া জেলা হইতে তাঁহার পাত্রী জুটিল এবং অষ্টমবর্ষীয়া সেই বধূকে ঘরে আনিবার সঙ্গে সঙ্গেই বরদা ঘটক একেবারেই বেঁকিয়া বসিলেন যে, তিনি আর কিছুতেই হনুমান্ সাজিবেন না। এই সব নানা গোলযোগে তখনকার সেই যাত্রার দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; তাহার পর বহু বৎসর বাদে থিয়েটারের দলের এই নূতন সৃষ্টি।

এই নূতন দলের সৃষ্টি-কর্ত্তা—ভুবনদা'—সম্পর্কে আমার দাদামশাই, মামাদের বাড়ীর গায়েই বাড়ী। ভুবনদা সংসারে নিছক একা। এক সময়ে তাঁহার মা, বোন্, স্ত্রী, কন্যা, গোষ্ঠীশুদ্ধ সকলেই মারা যায়। সে সময় ভুবনদা পাগলের মত হইয়া গিয়া সংসার ছাড়িয়া হরিদ্বার না কোথায় ঐ দিকে বিবাগী হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। বৎসর দুই তিন পরে কোন সাধুর উপদেশে ভুবনদা' আবার গৃহে ফিরিয়া আসে, কিন্তু পূর্ব্ব-স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন লইয়া ভুবনদা' ফিরিয়া আসিল। সে যেন পূর্ব্বের সেই ভুবনদা মরিয়া গিয়া এক নূতন ভুবনদা ফিরিয়া আসিল।

তখন হইতে ভুবনদা সদানন্দ। মুখে সর্ব্বদাই তাহার হাসি, রসিকতা, প্রফুল্লভাব। গান-বাজনা আমোদ-আহ্লাদ লইয়াই দিনরাত থাকিত। তখন হইতেই সকলের সব কাজে ভুবনদা' অগ্রণী। বিয়ে-বাড়ীতে ভুবনদা', শ্রাদ্ধের আসরে ভুবনদা,' রোগে-শোকে আপদে-বিপদে ভুবনদা'। ধনীর সুখে-দুঃখে ভুবনদা', দরিদ্রের হাসি-কান্নাতেও ভুবনদা'। বামুন-কায়েতের ঘরেও ভুবনদা,' চাষা-ভুষোর ঘরেও ভুবনদা', হিঁদুর ঘরেও ভুবনদা,' মুসলমানের ঘরেও ভুবনদা'। মোট কথা, ভুবনদা' না হইলে কাহারও আনন্দ যেমন সম্পূর্ণ হইত না, আবার ভুবনদা'র অভাবে কাহারও দুঃখ-শোকের অন্ত হইত না। মায়ের নিকট বসিয়া ভুবনদা'র সম্বন্ধে কত কথাই যে শুনিয়াছি।

যাহা হউক, আখড়াঘরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিলাম, ভুবনদা'কে দেখিতে পাইলাম না। কোন স্থানে ভুবনদা' আছে কি না, তাহা চোখ দিয়া দেখিবারও দরকার হইত না, কাণ থাকিলেই ভুবনদা'র অবস্থিতি জানিতে পারা যাইত।

দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে ভিতর হইতে কে এক জন কহিল, "ছেলে দু'টি কে বল ত?" আর একজন মুখ বাড়াইয়া আমাদের দেখিয়া কহিল, "আমাদের ঘোষাল মশাইয়ের নাতি হে, আর ওটি হচ্ছে ওর খুড়তুতো না জাঠতুতো ভাই। ওরা যে আজ ক'দিন হ'ল এখানে এসেছে।" তখন তিন চারি জন ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল, "খোকারা, এস বাবা, ভেতরে এসে বোসো।" এক জন কহিল, "এস

ভায়ারা, গান-টান জান ত? আমার সখী সেজে নাচতে হবে। কালীঘাটের ছেলে দেখা যাবে, এইবার সখা হারে কি সখী হারে!"

বিন্নুদা' চুপি চুপি কহিল, "আয় না, ভেতরে গিয়ে বসি।"

আমি কহিলাম, "না ভাই, বাড়ী চল, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।"

"হোক্ গে। এখন বাড়ী গিয়ে করবি কি? এখন বাড়ী গেলেই কিন্তু আমার ঘুম পাবে, আয় না, খানিকটা শুনে যাই।" বলিয়া জোর করিয়া আমার হাত ধরিয়া বিন্নুদা' ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

তখন পুরা-দস্তুরই আখড়াই চলিতেছিল, কিন্তু কিসের যে পালাটা, তাহা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হইলাম না; অথবা তখন হয় ত বুঝিয়া থাকিব, এখন লিখিতে বসিয়া সে কথা আর মনে করিতে পারিতেছি না, কিন্তু পালা যাহাই হউক, তাহাতে না ছিল 'ভীম', না ছিল 'যুদ্ধ'। বোধ হয় 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' কি 'চৈতন্যলীলা' কি 'সীতার বনবাস' এই রকমের একটা কিছু।

মোট কথা, আমার তা মোটেই ভাল লাগিল না।

কালীঘাটে কত যাত্রা, কত থিয়েটার আমারা শুনিয়াছি, সব স্থলেই অয়েল-ক্লথ-মোড়া কাপড়ের গদা ঘাড়ে ভীম থাকিতই। আর যুদ্ধের ত কথাই ছিল না। হয়, তীরধনুক লইয়া, নয় ত বা তলোয়ার লইয়া, সে কি ভীষণ যুদ্ধই হইত! সমস্ত আসরটাকে একেবারে কাঁপাইয়া দিত; তাহার পর চূড়ান্ত হইয়া যাইত—গদা ঘাড়ে, রক্তবর্ণ চক্ষু ঘুরাইতে ঘুরাইতে হুঙ্কারনাদ ছাড়িয়া ভীমের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। কতবার, রাত দশটায় যাত্রা সুরু হইবে শুনিয়া বেলা পাঁচটার সময় গিয়া আসরে যায়গা দখল করিয়া বসিয়াছি! তাহার পর হুড়াহুড়ি গোলমাল করিতে করিতে কখন্ কোন অবসরে সেই আসরের ঠেলাঠেলির মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছি এবং কখন্ যে রাজা আসিয়াছে, রাণী আসিয়া বক্তৃতা করিয়াছে, 'চ্যা-ভ্যাঁ'র পাল আসিয়া সঙ্গীতের ভীষণ আলাপ করিয়া গিয়াছে, আর রাশীকৃত পাকা চুল-দাড়ি-গোঁফের মধ্য হইতে ছাই-মাখান সাদা সাদা চোখ বাহির করিয়া কোন্ ফাঁকে নারদ কমণ্ডলু হাতে আসিয়া অনবরত ডান হাত নাড়িতে নাড়িতে রাজাকে সদুপদেশ দান করিয়া গিয়াছে, সে সব কিছুই জানিতে পারিতাম না। তার পর হঠাৎ এক সময়ে ভীমের ভীষণ গর্জ্জনে ঘুম হইতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িতেই দেখিতাম—ভয়ঙ্কর ব্যাপার! তীর-ধনু, গদা-তলোয়ার মিলিয়া মহামারী যুদ্ধ! অত যে ঘুম, যেন দেশছাড়া হইয়া পলাইয়া যাইত, আর সেই ঠেলাঠেলির মধ্যে চেপ্টা হইয়া গিয়া অসীম উৎসাহের সহিত, অপলক চোখে হাঁ করিয়া তাহা দেখিতাম। তাহার পর যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেলে পরদিন বাড়ী আসিয়া যখন ভীমের কথা আর যুদ্ধের কথা বলিতাম, তখন ঠাকুমা হয় ত জিজ্ঞাসা করিত, "কিসের পালা হ'ল রে?" বলিতাম "সীতার বনবাস" কি "দক্ষযজ্ঞ"; বিন্নুদা' কহিত, "না—না, ভারি ত জানিস্—'অক্রুর-সংবাদ'।" ঠাকুমা বলিত, "অক্রুর-সংবাদ! তা'তে আবার যুদ্ধ কোথায়—ভীম কোথায়?" বিন্নুদা' বলিয়া উঠিত, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি ত ভারি জান! ভীম আছে।"

'অক্রুর-সংবাদে', 'সীতার বনবাসে' বা 'দক্ষ-যজ্ঞে' ভীম থাকুক বা নাই থাকুক, যুদ্ধ হউক বা নাই হউক, ইহাদের পালায় কিন্তু দেখিলাম যে, সে সবের বালাই একেবারে নাই। সুতরাং মোটেই তাহা ভাল লাগিল না। তবুও প্রায় ঘণ্টা-দুই সেখানে বসিয়া থাকিবার পর বাড়ী ফিরিবার জন্য যখন আমরা উঠিলাম, তাহার অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই শীতের সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল।

সদর দিয়া বাড়ী ঢুকিলে পাছে দাদামশাইয়ের চোখে পড়ি, সেই ভয়ে ঘুরিয়া খিড়কী দিয়া ঢুকিতে গেলাম। খিড়কীর দুয়ারের কাছে আসিয়া দেখি যে, সেই অন্ধকারের মধ্যে খিড়কীর দরজায় পিঠ দিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত মামী-মা একলাটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একলাটি মামীমাকে এইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, বিন্নুদা তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল,—"এমন ক'রে একলাটি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন মামীমা, কি হয়েছে?"

"কে? বিনু, পঞ্চু? তোরা একবারটি আয় না বাবা আমার সঙ্গে।" বলিয়া মামী-মা আমাদের লইয়া তাঁহার রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখি, দাউ দাউ করিয়া উনান জ্বলিয়া যাইতেছে আর পিঁড়ের উপর খানকতক বেলা পরোটা পড়িয়া রহিয়াছে। মামীমা কহিলেন,—"বড্ড ভয় পেয়েছিলুম বাবা! পাঁদাড়ের দিকে, ঠিক ঐ জানালাটার নীচে, হঠাৎ কিসের একটা শব্দ হ'ল, যেন—"

বিনুদা কহিল,—"দিদিমা বাড়ীতে নেই ?"

"না। মা সেই দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ও-পাড়ায় বেড়াতে গেছেন, এখনো আসেন নি।"

"তাকে ভূতে খেয়েছে। না খেয়ে থাকে ত ঠিকই খাবে, সে আর আসবে না। তুমি ঘরে তালা লাগিয়ে চল মামীমা, আমাদের বাড়ী চল," বলিয়া বিনুদা দাঁড়াইয়া উঠিল।

মামীমা কহিলেন,—"না বাবা, তা কি আমার যাবার যো আছে ? মা তা হ'লে কি আর রাখবেন: গাঙ্গুলীমশাই এসে ফিরে যাবেন, সে কি আর আমার হবার—

"গাঙ্গুলীমশাই কে, মামীমা ?"

"গাঙ্গুলীমশাইকে তুই দেখিস্ নি ? ও-পাড়ার সেই আশু-বিশুর ঠাকুরদা ?"

"তা সে কেন আসবে, মামীমা ?"

"তিনি আসেন।"

"রোজ আসেন ? কেন মামীমা ? তোমাদের কেউ হয় বুঝি ?"

"হ্যাঁ রে, দু'খানা পরোটা খাবি দু'জনে ? দোব ?"

"না মামীমা, খাব না। কে হয় বল না ? সে-ও বুঝি পরোটা খাবে, তাই এত বেশী ক'রে করেছ ?"

"হ্যাঁ। হ্যাঁ রে, তোদের কালীঘাট যেতে সেই বোশেখ মাস, না ? আচ্ছা, তোরা কাগজে ছোট ছোট ক'রে চিঠি লিখতে পারিস্ ?"

"পারি মামী-মা। যত ছোট চাও, তত ছোট ক'রে লিখে দিতে পারি। তোমায় লিখে দিতে হবে ?"

"এখন না ; যদি হয়, বলব।"

আমি কহিলাম,—"আমাকে বোলো মামী-মা, বিনুদার চেয়ে আমি খুব ভাল লিখে দোব, মায়ের কত চিঠি আমি লিখে দি।"

মামীমা পরোটাগুলি ভাজিতে লাগিলেন।

বিনুদা কহিল,—"আচ্ছা, মামীমা, তুমি ভীমের বক্তৃতা শুনেছ ?"

"শুনিছি কি না বলব এখন, আগে এই পরোটা দু'খানা খা দেখি" বলিয়া আমাদের হাতে গরম গরম দুইখানা করিয়া পরোটা আর খানিকটা করিয়া গুড় দিয়া মামী-মা আবার পরোটা ভাজিতে বসিলেন।

সেই সময় সদর-দরজা ঠেলিয়া কাসিতে কাসিতে কে আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ডাকিল,—"বিধু !"

চুপি চুপি মামীমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এই বুঝি গাঙ্গুলীমশাই ?"

মামীমা কহিলেন,—"হ্যাঁ।" তার পর বাহিরের দাওয়ায় যাইয়া ঘোম্‌টার ভিতর হইতে মৃদু-গলায় বলিল,—"মা এখনো আসেন নি।"

"ও!" বলিয়া তখন সেই আশু-বিশুর ঠাকুর-দাদা উত্তরের শোবার ঘরের শিকল খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পর শোলা-চকমকি লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। আমরাও পরোটা খাইয়া হাত ধুইয়া খিড়কীর দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিলাম।

দিদিমা, মা, মাসীমা তখন আগুনের মালসা মাঝে রাখিয়া, আগুন পোয়াইতে পোয়াইতে গল্প করিতেছিলেন। পাছে মা বা দিদিমা আমাদের এত দেরীতে বাড়ী ফেরার জন্য কোন রকম বকাবকি করেন, সেই জন্য পদার্পণ করিয়াই বিনুদা অপূর্ব্ব ভঙ্গীর সহিত চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল,—"খুড়ীমা, মামীমার কি হয়েছিল জান ?"

"কি ?"

"ভয় পেয়ে, একেবারে কাঠ হয়ে গিয়ে আমাদের খিড়কীর দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা এসে না পড়লেই হয় ত—"

দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া মা কহিলেন,—"গিন্নী বুঝি বেড়িয়ে এখনো ফেরেন নি ?"

"জানি না মা, ওর কথা আর বলিস্ নি !"

"আহা, বৌটা কি ভাগ্যি নিয়েই ভারতে এসেছিল গো !"

বিনুদা জিজ্ঞাসা করিল,—"আশু-বিশুর ঠাকুর-দাদা ওদের কে হয়, দিদিমা ?"

উত্তর আর এ কথার কেহই দিল না, শুধু পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া তিন জনেই মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। মা কহিলেন,—"যা, তোরা লেখা-পড়া কর গে যা, তার পর খেতে দোবো।"

বিনুদা কহিল,—"আমি আর কি দিয়ে লেখা-পড়া করব খুড়ীমা ? আমার ত—"

"ঐ পঞ্চুর বই ত আছে, এক বই দু'জনে

পড়্‌গে যা। আর সিলেট্‌খানা ত আর কুইয়ে খায় নি, তাতেই লিখ্‌গে যা।"

মোটা সলিতা দেওয়া রেড়ীর তেলের প্রদীপ দাউ দাউ করিয়া ঘরের মধ্যে জ্বলিতেছিল। মেঝেয় একখানা কম্বল বিছাইয়া, দপ্তর পাড়িয়া, দুই জনে লেখা-পড়া করিতে বসিলাম। আমি বই খুলিয়া বসিয়া বিনুদাকে কহিলাম,—"তুমি ততক্ষণ লেখ।"

মিনিট দশেক পরে, বিনুদা আমার হাত হইতে বহিখানি লইয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল এবং তাহার সেলেট্‌খানি সম্মুখে ধরিয়া কহিল,—"এই রকম ঘোড়া একটা আঁক দেখি, দেখ্‌বো কারটা ভাল হয়!"

তখন দুই জনে,—শুধু ঘোড়াই নয়,—ঘোড়া হইতে সুরু করিয়া, গাধা, বাঁদর, হাতী, মাছ, মানুষের মুণ্ড, গাছ, ফুল, পাহাড়, পর্ব্বত, থালা, ঘটি, বাটি প্রভৃতি চেতন, অচেতন এবং উদ্ভিদ অনেক রকম পদার্থ আঁকা-আঁকি করিবার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া সেলেটে ঘর আঁকিয়া 'চিকে-কাটাকাটি'—খেলা হইল এবং শেষে যখন ক্ষুধার একটু বেশী রকম উদ্রেক হইয়া উঠিল, তখন দপ্তর বাঁধিয়া ফেলিয়া দিদিমাকে চেঁচাইয়া বলিলাম—"আমাদের পড়া-লেখা সব হয়ে গেল, খেতে দাও এইবার।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভট্টাচার্য্যদের অন্দরের উঠান পশ্চিমের দিকে যেখানটায় আসিয়া শেষ হইয়াছে, ঠিক সেইখান থেকেই মামাদের এক-খানা ঘরের দেওয়াল উঠিয়াছে। সেই ঘরখানাতেই মা, বিনুদা ও আমি শুইতাম। ঘরখানির পূবদিক্‌কার জানালা খুলিলেই ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীর ভিতর সবটাই দেখা যাইত।

সকালে একটু বেলা হইলে ঘুম হইতে উঠিয়া রৌদ্র আসিবে বলিয়া শীতে হি হি করিতে করিতে পূবদিকের সেই জানালাটি খুলিতেই দেখিলাম যে, মামীমা হয় ত রাত থাকিতে উঠিয়া যে ধান সিদ্ধ করিয়াছেন, এখন সেই রাশীকৃত ধান উঠানে শুকাইতে দিতেছেন আর দাওয়ার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী একখানা মোটা চাদর গায়ে দিয়া পাণ সাজিতে সাজিতে মামীমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—"আবাগীর বেটী, এত ভোলা-মন তোর কিসে যে হয়, বল্‌তে পারিস্ আমাকে? পঁচিশ বছরের ধাড়ী! জানিস্ যে, সকালে উঠেই পাণ না খেলে সমস্ত দিন অম্বলে সারা হয়ে যাব! রাত্তিরে তাড়াতাড়ি গিয়ে বিছানায় শুতে পারলে যেন হয়! তোর শোয়ার মুখে আগুন আর তোর মুখে আগুন!"

কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়া, মামীমা, ধানগুলিকে পা দিয়া চারিদিকে নাড়িয়া দিতে দিতে কহিলেন,—"সকালের পাণ রোজই ত সেজে রাখি, খালি কাল রাত্রে ভুলে গেছি। বুকের ব্যথাটা কাল বড্ডই ধ'রে উঠলো, তাই—"

গর্জ্জন করিয়া ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, —"বুকের ব্যথা বুকের ব্যথা ত নিত্যই শুনি, কিন্তু যমও ত নেয় না, কবে যমের বাড়ী যাবি, কবে তোর বুকের ব্যথার শেষ হবে! আমি তা হ'লে সিদ্ধেশ্বরীর চার হাতে সন্দেশ দিয়ে আসি।" খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া, সাজা পাণ একটা মুখে দিযে চিবাইতে চিবাইতে পুনরায় কহিলেন,—"মিছরী ভিজিয়ে রেখেছ, না, তাও বুকের ব্যথার জন্যে ভুলে গিয়েছ গো রাজনন্দিনি?"

"ভুলি নি, রেখেছি।"

"ভুঁলিঁ নিঁ—রেঁখেঁছি! ইচ্ছা করে, ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ ক'রে মারি লাথি ঐ মুখে! কিচ্ছুটি বলবার যো নেই! বলিছি কি না, তাই মুখখানা অমনি তোলো হাঁড়ির মত হয়ে গেল! মানের মানিনী, দূর হ'—দূর হ'—যমের বাড়ী যা।"

"দূরই হব,—যমের বাড়ীই যাবো,—আর বড় বেশী দিন—"

ভীষণ ক্রোধে মুখ-চোখের অপরূপ ভঙ্গী করিয়া দাওয়া হইতে উঠানের দিকে ছুটিয়া আসিতে আসিতে ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, —"দাঁড়া ত হাড়হাবাতী নচ্ছারণী, গুণছুঁচ দিয়ে তোর মুখ সেলাই ক'রে দিই। মুখে মুখে আবার চোপা করিস্! আস্পদ্দার সীমে-পরিসীমে নেই! ফের যদি কথার উত্তর করবি ত চিম্‌টে পুড়িয়ে ঠোঁট চেপে ধরবো!"

মামী-মার মুখ হইতে আর কোন কথাই বাহির হইল না। নীরবে পা দিয়া ভিজা ধানগুলিকে নাড়িয়া দিতে লাগিলেন আর টস্-টস্ করিয়া ফোঁটা কতক জল তাঁহার ঘোমটার ভিতর হইতে ধানের উপর পড়িয়া সেই ভিজা ধানের জলের [illegible] মিশিয়া গেল।

সমস্ত অন্তরটা দারুণ বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল; দোলাইখানি গায়ে জড়াইয়া বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া দাঁড়াইলাম—এবং এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বামাচরণের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দেখি, ভুবনদা' দোকানের দাওয়ার উপর রৌদ্রে বসিয়া বিষম গল্প জমাইয়া ফেলিয়াছে। দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইয়াই কহিল,—"কি হে নাতি, খেজুর রস-টস্ খেতে পাচ্ছ ত? চল, নদীর ধারে ভাঁড়ে প্যাকাটি লাগিয়ে রস খাওয়াব এখন।"

যে-কথার আলোচনা চলিতে চলিতে ভুবনদা' আমাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথান্তরে আসিয়া পড়িল, সেই কথারই সূত্র ধরিয়া এক জন তামাক খাইতে খাইতে কহিল,—"যাই বল ভুবন খুড়ো, একেবারে অজ বোকাকান্ত হ'লেই ঐ রকম পকেট মারে! ব্যাটা ময়রা, জীবনে কখন ত কোলকাতায় যায় নি। গাড়ী-ঘোড়া আর বড় বড় বাড়ী দেখে কোথায় হয় ত হাঁ ক'রে ছিল দাঁড়িয়ে, আর সেই সময় দিয়েছে অমনি ঠিক ক'রে!"

আর এক জন ইহার সমর্থন করিয়া কহিল,—"হ্যাঁ—হ্যাঁ, যা বলেছ নিবারণদা, ঐ রকম হাঁদাকান্ত না হ'লে আর কোলকাতায় পকেট মারতে পারে? কৈ, নিক দেখি আমাদের পকেট থেকে, তা হ'লে বুঝি যে কত বড় পকেটকাটা। বছরের ভেতর তিনবার ত বড়বাজার ঘুরে আসতে হয়, একবারও ত দেখলুম না যে—"

বাধা দিয়া ভুবনদা কহিল,—"ওরে থাম্—থাম্—মাথা গরম করিস্ নি। ঘরে ব'সে সকলেই অমন জাঁক করে। এই শোন্ গর্দ্দভ। মণি ঘোষকে জানিস ত, কত বড় ঢুঁদে, কত বড় চালাক। ঐ তোর মত সে-ও জাঁক করে করেছিল কি জানিস্। একটা অচল কাঁসার টাকা পকেটে রেখে সারাদিন বড়বাজারটা ঘুরে বেড়িয়েছিল। মৎলব ছিল যে, যেমন পকেটে হাত দেবে, আর অমনি ধরে ফেলবে। আর নেহাতই যদি ধরতে না পারে ত অচল টাকার ওপর দিয়েই যাবে। তাই দু পা যায় আর পকেট টিপে দেখে যে, টাকাটা আছে কি না। এমনি হুঁসিয়ারীর সঙ্গে সমস্ত দিন ঘুরে,—সন্ধ্যার সময় একটা মোড়ের ধারে দাঁড়িয়ে বলছে—'এই ত, যেমন টাকা, তেমনিই রয়েছে, কৈ বাবা, নিতে ত পারলে না কেউ! আমার পকেট থেকে নেওয়া—এ বড় শক্ত চাঁদ!' যেমন বলা আর অমনি একজন ফিটু বাবুগোচের লোক তার সামনে এসে ব'লে গেল কি জানিস? বল্লে—'সাতবার সাত জনে টাকাটা তুলে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অচল কাঁসার টাকা ব'লে সাতবারই আবার পকেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে।' মণি ঘোষের চোখ ত তখন কপালে উঠে গেল," বলিয়া ভুবনদা নিবারণের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া উবু হইয়া বসিল।

আমি ভুবনদা'কে কহিলাম—"কাল বিকেলে কোথায় ছিলেন বলুন ত? আপনাদের আখড়ায় গেলুম, কেমন সব শুনে এলুম।"

"ফাঁকি দিয়ে বিনা পয়সায় বুঝি সব শুনে ফেলেছ? কিন্তু তা ত চলবে না নাতি, দাদামশায়কে বলুবে যে, পঁচিশটি মুদ্রা দোলের চাঁদা দিতে হবে, নইলে—"

আমি তাঁহার হাতখানি ধরিয়া টানিয়া বলিলাম,—"আপনি কি সাজেন বলুন না?"

"আমি? আমি তামাক সাজি—পাণ সাজি, আমাকে অনেক রকম সাজতে হয়, নাতি!"

কাঠের 'তাড়ু' দিয়া খোলার মধ্যে মুড়কী মাড়িতে মাড়িতে হঠাৎ বামাচরণ বলিয়া উঠিল,—"হাঁদাকান্ত আছি ত হাঁদাকান্ত আছি, তোমরা ত খুব চালাক?"

ভুবনদা তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল,—"তুই ব্যাটা বুঝি এখনও সেই কথাই ভাবছিস্?"

আমি পুনরায় ভুবনদা'র হাতখানাকে টানিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সত্যি ক'রে বলুন না—কি সাজেন?"

"আমার কি কিছু সাজলে চলে, নাতি? আমার কাজ কত! এই কাল লাটসাহেব ডেকে পাঠালে, তা একটিবার না গেলে ত ভাল দেখায় না, সুতরাং যেতেই হ'ল।"

আমি আশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"লাট-সাহেব? কে লাটসাহেব, ভুবনদা?"

"লাটসাহেব জান না, নাতি? ছোটলাট হে!"

ঠিক এমনই—ঠিক এমনই। এ-সবের একবর্ণ মিথ্যাও যেমন নয়, তেমনই একটি বর্ণও ইহার ভুলিয়াও যাই নাই। কতদিনের এই সব পুরানো কথা, একটির পর একটি আজ হুবহু আপনা হইতেই মনের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ইহার কোন কথাও আজ বাড়াইয়া বলিতেছি না, বানাইয়াও

না, তবে হয় ত একটু সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে হইতেছে।

ভুবনদা' কহিল,—"লাটসাহেব জান না, নাতি? ছোটলাট হে!"

"লাটসাহেব তোমায় ডেকেছিল?"

"তবে আর বল্‌ছি কি, নাতি! কাজ কি আমার কম? এই এদের সব জিজ্ঞেস কর না। সে দিন সন্ধ্যার সময় ঘরে ব'সে, বড্ডই ক্ষিধেটা পেয়েছে, দুটি মুড়ি খাচ্ছি, হঠাৎ একেবারে উজীরগড়ের রাজা এসে হাজির! সঙ্গে লোক-লস্কর, পা'ক-বরকন্দাজ, সেপাই-শান্ত্রী—একেবারে হৈ হৈ ব্যাপার! মহা মুস্কিল! সেই রাতে আবার তাদের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড়—তাদের সব শোয়ার—"

বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বড়লাটের সঙ্গে তোমার ভাব আছে, ভুবনদা?"

"হায়—হায়—ভাব আছে কি না? একবার দেখতে পেলে কি আর আমার রক্ষে আছে! সেবার পূজোর সময় কাশী যাব, সব ঠিকঠাক্, হঠাৎ বড়লাটের টেলিগ্রাফ:—'ভুবন, তোমার ওখানে খেজুর-রস খেতে যাচ্ছি।' ঘুরে গেল আমার কাশী যাওয়া! একেবারে দলবল শুদ্ধ এসে হাজির! তিন দিন ধ'রে কত কথা, কত গল্প, কত আমোদ-আহ্লাদ! কি করি বল? খুবই প্রণয়ঃ ভালবাসে, তবে ত সব আসে? বিলেতে একসঙ্গে এক কেলাসে সব পড়াশুনা করতুম কি না! 'শুভঙ্করী'তে ওরা আমার সঙ্গে পেরে উঠত না। সে সব কি আজকের কথা! নাতি, সে হ'ল তোমার গিয়ে সেই ১৬৬১ সন।"

ভুবনদার হাত হইতে নিবারণ হুঁকাটি লইয়া দুই একটি টান দিয়া কহিল,—"আচ্ছা খুড়ো, শুনেছিলুম, হাইকোর্টের জজিয়তি তোমায় দেবার জন্যে না কি—"

"সে কথা আর বলিস নি নিবারণ। আমিও নোব না, ওরাও ছাড়বে না। আরে, জজিয়তি নিলে কি আমার চলে? মুখের খাতির আছে ব'লে কি ঐ অল্প মাইনেতে—"

এমন সময় সেখানে আর এক জনের আবির্ভাব হইল, তাহার নাম খুদিরাম;—খুদিরাম মণ্ডল। জাতিতে কৈবর্ত্ত—চাষী। কিন্তু পাড়ার মধ্যে খুদিরামই সঙ্গতিশালী। থিয়েটারে সে মোটা টাকা চাঁদা দেয়।

খুদিরাম আসিয়া কহিল,—"খুড়োঠাকুর, আমার নামটা কেটে দিও। 'পেলে' আমি করব না, তবে চাঁদা যেমন দি, তাই দোব।" বলিয়া দাওয়ার উপর একধারে উবু হইয়া বসিল।

খুদিরাম যাত্রার পালাতে দূত সাজিত।

ভুবনদা কহিল,—"কেন, তোর আবার হ'ল কি?"

"না, ও পাট্ আমার দ্বারা হবে না। আমাকে শীগগিরই কোলকাতায় কালেজে গিয়ে চোখটা একবার ভাল ক'রে দেখিয়ে 'রেগজামিন্' করিয়ে আসতে হবে।"

"রেগজামিন্ করাবি এখন। সেই দোলের পর গেলেই ত চলবে।"

"না খুড়োঠাকুর, আমায় রব্যাহতি দাও। চাঁদা, না হয় আরও দু এক টাকা বেশী নিও, পাট্ কিন্তু আমার দ্বারা হবে না।"

"এই ক'টা দিন বাদে 'প্লে', আর এখন হঠাৎ—"

নিবারণ কহিল,—"হঠাৎই ওর হয়েছে। কাল ত তুমি 'মুদ্দো' নিয়ে ত্রিবেণী গিয়েছিলে, কাল ত আর আখড়ায় যাও নি, গেলে জানতে পারতে। অর্থাৎ—মোট কথা হচ্চে—খুদিরাম তোমার গিয়ে দূতের পার্ট করবে না, ওতে ভাল পোষাক পরতে পাবে না, বেশী বক্তৃতে নেই!"

খুদিরাম মাথা হেঁট করিয়া একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল।

ভুবনদা খুদিরামের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, কিসের পার্ট চাস্ তুই বল? হ্যাঁ রে খুদে?"

নিবারণ কহিল,—"ও একটা 'রয়েল পার্ট' চায়!"

ফোঁস্ করিয়া খুদিরাম বলিয়া উঠিল,—"অয়েল্ পাটের কথা আমি বলিচি?"

ভুবনদা কহিল,—"আচ্ছা, আচ্ছা, 'অয়েল্' গোছের পার্টই দেখে শুনে তোকে দেওয়া যাবে এখন। এই ব্যাপার?"

খুদিরাম কহিল,—"অয়েল্ পাট কে চায়? আমি ত—"

ভুবনদা বাধা দিয়া কহিল, "আচ্ছা—আচ্ছা, সকাল সকাল আকড়ায় যাস্—সব হবে'খন" বলিয়া আমার হাত ধরিয়া ভুবনদা, দাঁড়াইয়া উঠিল। খুদিরামের মুখখানা যেন একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

পথে আসিতে আসিতে কহিলাম,—"এখন বাড়ী গিয়ে কি করবে?"

"চান্-টান্ ক'রে পূজো-আচ্ছা করব ভাই।"

"রোজ অতক্ষণ ধ'রে যে পুজো কর, কি হয় তাতে ?"

"কিছুই হয় না, খালি একটু ভগবান্‌কে ডাকা হয়।"

"ভগবান্‌কে ডেকে কি হয় ?"

"হয় না কিছুই, তবে কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে কি না, তাই না ডেকে পারি না।"

মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিবার পর কহিল,—"না রে ভাই, হয় অনেক। এত হয় যে, শেষকালে আর রাখবার যায়গা থাকে না রে ভাই— রাখবার যায়গা থাকে না।"

"কি রাখবার যায়গা থাকে না ?"

"ওরে ভাই, ছেলেমানুষ তুমি, এখন সব কথা কি বুঝতে পারবে, দাদু আমার ? বড় হও আগে, জ্ঞান হোক, তখন যদি বেঁচে থাকি, ভুবনদার কাছে এসো একবার, ভাল ক'রে সব বুঝিয়ে দেবো। অনেক বেলা হয়েছে, যাও দাদা, বাড়ী যাও।"

সত্যই অনেক বেলা হইয়া গিয়াছিল। ভুবনদার হাত ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। সদর-দরজার কাছে আসিয়া দেখি, বিনুদা দাঁড়াইয়া আছে, হাতে একখানা খামে আঁটা চিঠি, কহিল,— "মামীমার চিঠি লিখে দিলুম, ডাকঘরে ফেলে দিতে যাচ্ছি।"

"মামী-মা লিখতে বললে বুঝি ?"

"হ্যাঁ। কাঁদতে কাঁদতে কত কথা বল্লে, সব লিখে দিইছি।"

"কাকে লিখলে ?"

"ওর মামাকে। মামা ছাড়া ত কেউ আর নেই।"

"কি লিখলে ভাই ?"

"যেন মামীমার খুব অসুখ—শীগগির যেন এক-বার এখানে আসে, নইলে হয় ত মামীমা ম'রে গেলে আর দেখা হবে না, এই রকম সব।—যাই, চিঠিখানা ফেলে দিয়ে আসি। চিঠির কথা যেন কেউ না জানতে পারে, বুঝিছিস ?" বলিয়া বিনুদা ডাক-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মামীমার মামার নিকট হইতে পত্রের কোন উত্তর আসিল না।

গাঙ্গুলীমশা'য়ের জ্বর হইয়াছে বলিয়া শাশুড়ী সকালে উঠিয়াই তাহাকে দেখিতে গিয়াছেন, এত বেলাতেও এখনো বাড়ী আসেন নাই। সে দিন ছিল মামীমার একাদশী। খাওয়া দাওয়ার কোন হাঙ্গামা ছিল না বলিয়া দুপুরবেলায় আমাদের বাড়ী আসিয়া বসিয়াছিলেন! মা, দিদিমা, মাসীমাকে নিজের দুঃখের কত কথাই কহিতেছিলেন! উঠিবার আগে কাঁদিতে কাঁদিতে যে কথাগুলি বলিয়া সে দিন মামীমা চলিয়া গেলেন, সেগুলি ফলার মত তখনও যেমন হৃদয়ে বিঁধিয়াছিল, এখনো সেইরূপই বিঁধিয়া আছে। অথচ, এখন ত তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি, কিন্তু তখন কি-ই বা সে-কথার গভীরতা বুঝিয়াছিলাম। অথচ ব্যথা যে বুকে খুবই বাজিয়াছিল, তাহাও সত্য।

হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মামীমা কহিলেন,—"কি ভাগ্য নিয়েই যে জন্মেছিলুম, সারা জীবনটা আমার কাঁদতে কাঁদতেই গেল! জগতে বাপ-মা যে কেমন, তা জানতে পাল্লুম না! জ্ঞান হয়ে দেখলুম, মামা-মামীর সংসারের একধারে একটুখানি যায়গা নিয়ে প'ড়ে আছি। সেই ছোট-থেকেই কত খাটুনিই আমাকে দিয়ে তারা খাটিয়ে নিত আর সকলের পাত কুড়িয়ে দু'বেলা দু'মুটো ভাত দিত! সেই বয়স থেকেই, দিদি, বুকের মধ্যে আমার কান্নার সমুদ্দুর সৃষ্টি হয়েছিল!"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া, আঁচলে চোখ মুছিয়া, আবার কহিতে লাগিলেন,—"সেই যে আট বছর বয়সে হাত-পা বেঁধে এই রায়পুকুরের জলে তারা ভাসিয়ে দিয়ে গেল, তারপর এক বছরের ভিতরেই যে আমার সব সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, সে সব আর কোন খবরই নিলে না। আমি মরিচি কি বেঁচে আছি, তা'ও একবারটি এসে দেখে গেল না। চিঠি দিলে পর্য্যন্ত দু'ছত্র লিখে তার জবাব দেয় না। কি আর বলবো দিদি! জগতে এসে না হলুম মেয়ে, না হলুম মা, না হলুম স্ত্রী! আমার যে কি দুঃখু—"

আর মামীমা বলিতে পারিলেন না, অজস্রধারে অশ্রু গড়াইয়া তাঁহার মুখ-চোখ বুকের কাপড় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

দিদিমা কহিলেন,—"কেঁদো না বৌমা, কোঁদো না। সবই ত সহ্য কচ্ছ মা! কেঁদে আর কি হবে বল ?"

"হবার আর কিছু চাই না, খুড়ীমা। এইটুকু

চেয়েছিলুম যে, যত দিন না মরণ আসে, স্বামী-শ্বশুরের ভিটেখানাতে যেন কোন রকমে প'ড়ে থাকতে পাই, কিন্তু তা'ও বুঝি আর পারি না! এই বয়সে আমার—"

মামীমার দুই চক্ষু ভরিয়া আবার জল জমিয়া আসিল, কিন্তু তাঁহার শাশুড়ীর উচ্চ ডাকে তাহা আর গড়াইয়া পড়িবার অবকাশ পাইল না। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিতে মুছিতে মামীমা উঠিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

ইচ্ছা হইল, মামীমার সঙ্গে যাই, কিন্তু গেলাম না!

খানিক পরে শোবার ঘরের পূর্ব্বদিকের জানালার ধারে গিয়া বসিলাম। দেখিলাম, দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া মামীমা দাঁড়াইয়া আছেন আর ঘরের মধ্যে এক পা—চৌকাঠে এক পা দিয়া দাঁড়াইয়া ভট্টাচার্য্য-গিন্নী মামীমার দিকে ঠায় একদৃষ্টে চাহিয়া আছে,—মনে হইল, মদন-ভস্মের মত বুড়ী বুঝি মামীমাকে আজ ভস্ম করিবার আয়োজন করিতেছে।

প্রায় মিনিটখানেক এইরূপে মামীমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিবার পর ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী অস্বাভাবিক ধীর গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ক'খানা ছিল?"

"দশখানা।"

"আর দুধ?"

"সব দুধটাই ত ক্ষীর ক'রে রেখে দিয়েছিলুম।"

চিবাইয়া চিবাইয়া শ্লেষের স্বরে ভট্টাচার্য্য-গিন্নী কহিলেন,—"রেখে দিয়ে তার পর পাড়া বেড়াতে গিয়েছিলি, এতে আর তুই কি করবি? তোর আর কি দোষ?"

"অত ভারি ঢাকা ঠেলে ফেলে যে খেয়ে যাবে, তা কি ক'রে জানবো, পরোটা, দুধ, সবই খেয়ে গেছে?"

একেবারে বারুদ জ্বালিয়া উঠার মত চাপা গলায় গর্জ্জাইয়া উঠিয়া ভট্টাচার্য্য-গিন্নী কহিলেন,—"না লো, সব খেয়ে যাবে কেন? যেমন গুচিয়ে রেখে দিয়েছিলি, তেমনি আমার জন্যে থরে থরে সব রয়েছে," বলিয়া লাফাইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও সেইখান হইতে ঝন্ ঝন্ করিয়া উচ্ছিষ্ট শূন্য থালা, বাটি, রেকাবী উঠানে ছুড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে কহিলেন, "ওলো চোক্‌খাগী, দেখছিস্ ত লো—সবই রয়েচে! আজ মুড়ো খ্যাংরা মেরে তোকে আগা-পাশ-তলা ঝেঁটিয়ে আমি বিদেয় কর্ব্ব, তবে আমার নাম বিধু বামনী" বলিয়া তেমনি দুম্ দুম্ করিয়া রণচণ্ডীর মত নাচিতে নাচিতে উঠানে নামিয়া একগাছা ঝাটা লইয়া মামীমার দিকে ছুটিয়া গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া এ-বাড়ী ছুটিয়া আসিতে গিয়া দেখি যে, দালানের মধ্যে মা আমার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছেন।

বুঝিলাম, মায়ের ফিট্ হইয়াছে। এরকম তাঁহার মাঝে মাঝে হইত। খুব রাগ বা কষ্ট হইলে বা কাহারও কোন দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিলে, তাহাই মনের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে মায়ের ফিট্ হইয়া যাইত। মায়ের এই ফিট হওয়ার মধ্যে ভাবনার কিছুই ছিল না, ইহা এমনই আমাদের মধ্যে সাধারণ ঘটনা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভাবিবার ব্যাপার যাহা, সেই কথাটাই দালানে মায়ের পাশে বসিয়া খালি খালি মনে পড়িতে লাগিল।

এখন তাই ভাবি যে, এ জিনিষটা এখনো যেমন আছে, তখনো—সেই চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তেমনই ছিল। এই রকম ভট্টাচার্য্য-গিন্নীর অভাব আজিও যেমন নাই, কোন কালেই সেরূপ ছিল না। আদিকালে, দ্বাপর যুগে, আয়ান ঘোষের বাটী থেকে সুরু করিয়া, কলির এই বিংশ শতাব্দীতেও ইহার অস্তিত্ব সমভাবেই আছে। যেখানে এই রকম শাশুড়ী নাই, সেখানে সেই রকম ননদ আছে। আর যেখানে সেই রকম ননদ নাই, সেখানে এই রকম শাশুড়ী আছে। আর যেখানে এ দুই-ই বর্ত্তমান, সেখানের ত কথাই নাই। বধূ সেখানে তাহার চিরকালের গলা আর দড়ি বা আফিং বা কেরোসিন, যাহা হয় কিছু একটা আশ্রয় করিয়া নিস্তার পায়! আর যেখানে এ চিরন্তন প্রথার ব্যতিক্রম হয়, সেখানে সেই বধূ ধিক্কারে, অভিমানে, ক্রোধে, দুঃখে গণিকা-পল্লীর অধিবাসিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। হায়, আমাদের দেশ! হায়, আমাদের ঘরের শাশুড়ী-বউ!

পরদিন দুপুরবেলা আমাদের জানালার নীচে দাঁড়াইয়া মামীমা চুপি চুপি ডাকিলেন,—"পঞ্চু, একবার আসবি বাবা?"

তখনি ছুটিয়া গেলাম। মামীমা কহিলেন,—"একখানা আমায় চিঠি লিখে দিবি এখন?"

মামীমা সদর-দরজায় খিল দিয়া আসিয়া আমাকে লইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। গায়ের

কাপড়ের ফাঁকে দেখিলাম, মামীমার সর্ব্ব-অঙ্গে দাগ.ড়া দাগ.ড়া হইয়া বিষম ফুলিয়া উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে কাটিয়া গিয়া রক্ত জমাট্ হইয়া যেন ঠেলিয়া উঠিয়াছে। কিছুই আর জিজ্ঞাসা করিলাম না, চিঠি লিখিতে বসিলাম।

একটি একটি করিয়া মামীমা যাহা বলিয়া দিলেন, সমস্তই লিখিলাম। তাহার মোট অর্থ এই যে, দোলের দিন পর্য্যন্ত পথ চাহিয়া থাকিব। সে দিনের দুপুরের গাড়ী পর্য্যন্ত দেখিয়া নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিব, দোলের শুভদিন আর কিছুতেই এড়াইয়া যাইতে দিব না। দোলের পর এলে আর আমাকে পাবেন না, তখন পাবেন আমাকে বিলের পুকুরের জলের মধ্যে।

মামী-মা কহিলেন,—"পয়সা দিই বাবা, চিঠিখানা রেজেষ্টারী ক'রে দিতে পারবি?"

"পারবো মামী মা, কিন্তু সত্যি তুমি তা হ'লে ম'রে যাবে?"

"দূর বোকা ছেলে কোথাকার! সত্যিই কি আর ম'রে যাব?"

তখন কাপড়ের ভিতর করিয়া চিঠিখানা লইয়া গিয়া ডাকঘরে রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়া আসিলাম।

ফিরিয়া আসিবার সময় পথে বিমুদার সঙ্গে দেখা। বিমুদা কহিল,—"আয়, আকড়ায় যাই, খুব ধুম, গান-বক্তৃতে হচ্ছে!"

আখড়া-ঘরে গিয়া দেখি, সত্যই খুব ধুম লাগিয়া গিয়াছে। কারণ, দোলের দিন থিয়েটার হইবে, মধ্যে আর কয়েকটা দিনমাত্র বাকী; পালাও প্রায় তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে, শুধু সেই খুদিরামকে লইয়াই একটু গোলযোগ বাধিয়াছে। তাহার সেই দূতের ভূমিকা অন্য একজনকে দিয়া, তাহাকে 'সভাসদে'র যে পার্ট দেওয়া হইয়াছে, তাহাই তাহার মুখ দিয়া উচ্চারণ করাইতে, তাহার নিজেরও যেমন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছে, অন্য সকলেরও তেমনি হইতেছে। তবে আশার মধ্যে এই যে, খুদিরামের উৎসাহ ও চেষ্টা অপরিসীম।

কয়দিন গোলমালে কাটিয়া গেল। দোলের দিন সকালে উঠিয়াই বিমুদা বাঁশের এক অপূর্ব্ব পিচকারী বানাইয়া ফেলিল।

দিদিমা কহিলেন,—"পয়সা দোবো এখন দু'জনকে, ফাগ. কিনে আনিস্।" তারপর চুপি চুপি কহিলেন,—"তোদের দাদামশায়ের গায়ে খুব ক'রে রং দিয়ে দিস্।"

খানিক পরে দাদামশাই ডাকিয়া কহিলেন,—"এই নাও হে কর্ত্তারা, তোমাদের দোলের পার্ব্বণী" বলিয়া দুই আনা করিয়া পয়সা দুই জনের হাতে দিয়া তিনিও চুপি চুপি কহিলেন,—"তোর দিদিমাকে আবিরে একেবারে চুবিয়ে দিবি, তা হ'লে আরও এক আনা ক'রে দু'জনকে দু' আনা দোবো।"

আমরা উভয়েই পরামর্শমত কায করিলাম, অর্থাৎ আবির গুলিয়া দিদিমার গায়েও খুব দিলাম, দাদামশাইকেও তফাৎ হইতে পিচকারী দিয়া ভিজাইয়া দিলাম। অধিকন্তু, বিমুদা একটা আস্ত আলুর আধখানা কাটিয়া তাহাতে উল্টা করিয়া গাধা লিখিয়া, দাদামহাশয়ের জামা-কাপড়ের আষ্টে-পৃষ্ঠে সেই গাধার ছাপ মারিয়া দিয়া আসিল।

সেদিন আবার থিয়েটার। বেলা ১টা ১॥০টা পর্য্যন্ত আবির খেলিয়া দুই জনেই ভূত সাজিয়াছি। বিমুদা'কে কহিলাম,—"চল ভাই, ভাল ক'রে চান ক'রে এসে খেয়ে দেয়ে নিই।"

আহারাদির পর বাকী দিনটা সিদ্ধেশ্বরীতলায় থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা দেখিতেই কাটিয়া গেল। যাহারা রাত্রে সাজিবে, কি উৎসাহেই যে তাহারা মালকোঁচা বাঁধিয়া খাটিতেছিল! সকলের চেয়ে বেশী আনন্দ ও উৎসাহ দেখিলাম সেই 'সভাসদে'র —অর্থাৎ খুদিরামের।

হঠাৎ বিমুদা কহিল,—"ওরে, মামীমার পায়ে ফাগ দিয়ে পেন্নাম করা ত হয় নি।" আমি কহিলাম—"না, চল যাই, ঠোঙ্গাতে এখনো অনেক ফাগ আছে।"

ফাগের ঠোঙ্গা হাতে লইয়া তখনি মামীমাদের বাড়ী আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, মামীমাকে দেখিতে পাইলাম না। ভট্টাচার্য্য-গিন্নী দাওয়ার একধারে বসিয়া চিরুণী দিয়া তাঁহার নেড়া মাথা পরিষ্কার করিতেছিলেন।

বিমুদার কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দিদিমার পায়ে ফাগ দিয়ে পেন্নাম করবে?" বিমুদা কহিল—"ছাই করবে।"

তখন ফাগের ঠোঙ্গাটি কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া ভট্টাচার্য্য-গিন্নীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মামীমা কোথায়?"

মুখখানাকে যতদূর সম্ভব বিকৃত করিয়া ভট্টাচার্য্য-গিন্নী কহিলেন,—"জানি না কোন্ চুলোয় গিয়েছেন! ঘণ্টা দুই হ'ল ত বিবি কলসী নিয়ে

বেরিয়েছেন, বোধ হয়, বিলের পুকুর কেটে জল আনছেন। এত লোকের ওলাউঠা হয়, আবাগীর বেটীর হয় না!"

দু'ঘণ্টা হ'ল বিলের পুকুরে মামীমা জল আনতে গেছেন, এখনও ফেরেন নি! হঠাৎ আমার মামীমার সেই চিঠির কথা মনে পড়িয়া গেল,—দোলের শুভদিন আর কিছুতেই এড়াইয়া যাইতে দিব না। সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল! তখনি বিমুদা আর আমি ছুটিয়া বিলের পুকুরের ধারে আসিয়া পড়িলাম, কিন্তু মামীমা কোথায়! জনহীন ঘাটের একধারে একটা পিতলের কলসী শুধু পড়িয়া রহিয়াছে! চতুর্দ্দিকে বিলের পাড়ে পাড়ে ঘুরিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, কোথাও জনমানবের চিহ্নমাত্র পাইলাম না। বিহ্বলের মত মুখ হইতে শুধু বাহির হইল,—"বিমুদা!"

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বিমুদা স্তম্ভিতের মত সেইখানে সেই কচুবনের মধ্যে বসিয়া পড়িল, আর আমি জেওলগাছের একটা ডাল ধরিয়া পাথরের মুর্ত্তির মত সেই ফাগের ঠোঙ্গা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অপরাহ্ণের আকাশে কালবৈশাখীর মেঘ জমিয়া তখন চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিতেছে। হঠাৎ প্রবল বাতাস বহিতে সুরু করিয়া দিল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলাম, জানি না; একটা দমকা বাতাসের ঝাপটা আসিয়া যখন হাতের ফাগের ঠোঙ্গাটি উড়াইয়া লইয়া গিয়া বিলের তরঙ্গমধ্যে নিক্ষেপ করিল, তখন আমার হুস্ হইল। দেখিলাম ফাগের ঠোঙ্গাটা জলের যেখানটায় গিয়া পড়িয়াছিল, সেখানকার জল ফাগে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। তখন কিছু ভাবিতে পারি নাই—বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন মনে হয় যে, মামীমার পদতলে ফাগ লইয়া ভক্তির যে অঞ্জলি দিতে আসিয়াছিলাম, ভগবান্ আমাদের সেই ফাগের অঞ্জলি এমনি করিয়াই তাঁহার কাছে পৌঁছাইয়া দিলেন! তখন সেই ছেলেবেলায় মনে যাহা হইয়াছিল, হয় ত তাহা বুঝি নাই, কিন্তু এখন হইলে মামীমার সেই পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, তাহাতে মাথা ঠেকাইয়া বলি,—"মা গো আমার! জননী আমার! এ ভালই হোল! এ তোমার ভালই হোল! এই তোমার দরকার ছিল। বিলের এই নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা, শীতলতা ও গভীরতার মধ্যেই তুমি থাক মা,—এই তোমার স্থান!" তখন বোধ হয়, এক ফোঁটা জল চোখ দিয়া বাহির হয় নাই, আজ প্রৌঢ়বয়সে এই কাহিনী লিখিতে বসিয়া চোখে আর জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিলে বাড়ী ফিরিবার কথা মনে হইল। আর একবার বিলের জলের দিকে চাহিলাম, তাহা তেমনি তরঙ্গময়, সমস্ত স্থান তেমনি নির্জ্জন, তেমনি তখন প্রবল ভাবে বাতাস বহিতেছে। মনে মনে বলিলাম,—"ভালই হোল!" সেই প্রবল বাতাসের ঝাপটাও কাণে আসিয়া কহিল,—'ভালই হোল', তরঙ্গের পর তরঙ্গ আছাড় খাইয়াও বলিতে লাগিল,—'ভালই হোল', অন্ধকারও যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ঝিঁঝিঁ পোকার ন্যায় কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—'ভালই হোল'—'ভালই হোল'।

নবম পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাসের গোড়াতেই আমরা কালীঘাট ফিরিয়া আসিলাম। রায়পুকুর ম্যালেরিয়ার দেশ হইলেও, শীতের সময়টা আমরা ছিলাম বলিয়া কিম্বা কি কারণে বলিতে পারি না, আমাদের ম্যালেরিয়া ধরেই নাই, উপরন্তু স্বাস্থ্যের আমাদের বেশ উন্নতিই হইয়াছিল। কিন্তু গাড়ী হইতে বাড়ীর দরজায় না নামিতে নামিতেই ঠাকুমা গাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"ইস্! ছেলেদুটোর চেহারায় যে আর কিছুই নেই! জানি যে ম্যালোয়ারীর দেশ! যা'ক্, ভালয় ভালয় হাড় ক'খানা নিয়ে বাছারা যে ফিরে এসেছে, এই ঢের।"

দুই তিন দিন পরেই কিন্তু বাছাদের ঘাড়ে মা সরস্বতীর জোয়াল আবার জঁাকিয়া বসিল, অর্থাৎ একরাশ নূতন বইয়ের সঙ্গে রকমারি ধরণের তিন চারিখানি খাতা বাঁধিয়া বাঙ্গালা স্কুলে প্রত্যহ দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত হাজিরা দিতে হইতে লাগিল।

এখানে আসিয়া দেখিলাম, যেন এক নূতন ভাব। এখানকার তুলনায় হরিশ পণ্ডিতের পাঠশালা আমাদের পক্ষে সহস্রগুণ ভাল ছিল। বাঙ্গালা স্কুলে আসিয়া হরিশ পণ্ডিতের পাঠশালায় যে কত মাধুর্য্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম। সে ছিল যেন ফাঁকা ময়দানের মধ্যে কঞ্চির বেড়া ঘেরা ছোট্ট একটি সুশীতল কুঞ্জবন, আর এ যেন ইঁট পাথরে গাঁথা, রেলিং ঘেরা, কোলাহলময় মস্ত এক

হট্টমন্দির। এখানে হরিণী-ভাবের কণামাত্রও কোথাও কিছুই নাই, এখানে হেড মাষ্টার জনার্দ্দন সিম্লায়ের জনার্দ্দনী-ভাবই সর্ব্বত্র বিরাজমান। এ সে অযোধ্যাও নহে, এখানে সে রামও নাই।

· এ-হেন জনার্দ্দন সিমলাইয়ের বাঙ্গালা স্কুলে চারিটি বৎসর আমাদের আসা যাওয়া করিতে হইয়াছিল। বৎসর চারিটিই বটে, কিন্তু ইহার ভিতর কত রকমের কত ব্যাপারই যে ঘটিয়াছিল।

তখন প্রায় দুইটি বৎসর আমাদের এখানে কাটিয়া গিয়াছে। নূতনের উপর পুরাতনের ছাপ পড়িয়া আমরা তখন সুন্দররূপে দলে মিশিয়া গিয়া দশ জনের একজন হইয়া উঠিয়াছি। মাসটা বোধ হয় আষাঢ় কি শ্রাবণ, অর্থাৎ ঘোর বর্ষার সময়। কয় দিন হইতেই অনবরত বৃষ্টি হইতেছিল। পথঘাট জলে-কাদায় একাকার, বৃষ্টির পর বৃষ্টি, তাহার আর বিরাম নাই। এমনই দুর্য্যোগের মধ্যে এক এক দিন—কিন্তু থাক, 'এক দিনে'র আর আবশ্যক নাই। 'এক দিনে'র ভণিতা করিয়া যাহা আজ টানিয়া-বুনিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া বলিতে যাইতেছি, কি তাহার দরকার? কত 'এক দিনে'র কথাইত আজ একটির পর একটি করিয়া আসিয়া মনের উপর চাপিয়া বসিতেছে, কিন্তু সব যদি আজ কালি-কলমের মুখে টানিয়া আনি, সে ত তাহা হইলে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বকেও ছাপাইয়া উঠিবে, আর সে অষ্টাদশ পর্ব্বের সহিত বাহিরের কোন সংস্রবই নাই—তাহা নিছক নিজেদেরই কথা, সুতরাং তাহা পড়িবার ধৈর্য্যই বা কাহার, আর লিখিবার ধৈর্য্যই বা কোথায়? তবে,—স্মৃতির দুয়ার খুলিয়া আয়োজন-আড়ম্বর করিয়া অতীতের কাহিনী আওড়াইবার বাহাদুরী যখন করিতে বসিয়াছি, তখন কিছু কিছু আমাকে বলিতেই হইবে, তাই মোটা-মোটা গোটাকতক কথা বলিয়া আমার আরব্ধ কাহিনীকে কোন রকমে শেষের দিকে আগাইয়া আনিয়া সমাপ্তির রেখা টানিয়া দেওয়াই ভাল।

চারিবৎসর বাঙ্গলা স্কুলে পড়িবার পর তথাকার সব কয়টি বিদ্যার ধাপ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই জ্যেঠামহাশয় আমাদের বাঙ্গালা স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন এবং কি উপায়ে যে ইংরাজী স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর স্থানে একেবারে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন, তাহা তিনিই জানেন। তখন আমাদের যে বয়স হইয়াছিল, সে বয়সে আজ কাল সকলে 'ম্যাট্রিক' পাশ করে, অর্থাৎ আমার বয়স তখন ষোল-সতের বৎসর হইয়াছিল। ক্লাসের মধ্যে আমাদের চেয়ে অল্প বয়সের ছেলে বোধ হয় দুই এক জনই মাত্র ছিল, আমাদের সমবয়সই বেশী ছিল এবং আমাদের চেয়ে বয়স অনেক বেশী এমন দুই এক জনেরও অভাব ছিল না। এই দুই এক জনকেও ঠিক ছেলে বলা চলে না; কারণ তাহাদের দাড়ি ও গোঁফের রেখা স্পষ্টই দেখা দিয়াছিল। তাহার পর দুই বৎসর বাদে যখন আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলাম, তখন পাড়াগাঁ হইতে যে একটি ছেলে আসিয়া আমাদের ক্লাসে ভর্ত্তি হইল, তাহার নাম জগন্নাথ কোলে। ছেলেটি ভর্ত্তি হইল বটে, কিন্তু তাহার শিশু-পুত্রটির অসুখের জন্য ছেলেটিকে অর্থাৎ লোকটিকে প্রায়ই স্কুল কামাই করিতে হইত। শুনিয়াছি, জগন্নাথের সেই ছেলেটি না কি পাঠশালায় 'আঙ্ক' 'আস্ক' পড়িত। হয় ত তাহার ছেলেটির পাঠশালায় পড়ার এই কথাটির মূলে কোন সত্য ছিল না,—হয়ত ইহা ক্লাসের দুষ্ট ছেলেদের মিথ্যা রটনা মাত্র, কিন্তু এ কথা ঠিকই যে আমাদের অঙ্কের মাষ্টার গুরুচরণ বাবু প্রায় প্রতিদিনই জগন্নাথকে ভুলক্রমে 'আপনি' বলিয়া ডাকিয়া ফেলিতেন।

সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িবার সময় বিনুদা' এক দিন এক মহাকাণ্ড ঘটাইয়া বসিল। তখন বৈশাখ মাস,—প্রত্যহ মর্ণিং-স্কুল হইতেছিল। এক দিন বছর সাতেক আগে পাঠশালায় আসিতে আসিতে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিনুদা' যেমন বলিয়াছিল,—"আজ আর পাঠশালায় যাব না," সেদিনও তেমনই স্কুলের পথে আসিতে আসিতে অদূরে আমাদের সেই খাঁ-সাহেব কাবুলীওয়ালাকে আসিতে দেখিয়া বিনুদা' কহিল,—"আজ আর স্কুলে যাব না।" তাহার পর পথের ধার হইতে ছোট ছোট অনেকগুলি ঢিল কুড়াইয়া কোটের পকেটে বোঝাই করিয়া কহিল,—"আয়, একটা মজা করা যাক।"

আমি কহিলাম,—"কি মজা?"

"এই দেখ্ না" বলিয়া রাস্তার ধারে সরকারদের পোড়ো বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল এবং কোঁচার কাপড় খুলিয়া মাথায় ফেটি দিয়া জড়াইয়া কহিল—"তুইও এই রকম ক'রে বাঁধ, নইলে বেটা চিন্‌তে পারবে।"

এই বাড়ীটা ভূতের বাড়ী বলিয়া কেহ তাহাতে বাস করিত না, বহুকাল হইতেই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল।

খানিক পরেই আমাদের খাঁ-সাহেব তাহার মেওয়ার ঝুলি কাঁধে করিয়া সেই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতেই বিনুদা' পিছন হইতে ধাঁ করিয়া তাহার পাগড়ীতে একটা ঢিল ছুড়িয়া মরিল। খাঁ-সাহেব চলিতে চলিতেই একবার চারিদিকে তাহার রক্ত চক্ষু ঘুরাইয়া দেখিল, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। দুই পা যাইতে না যাইতে আবার একটি ঢিল তাহার বামকর্ণমূলে যাইয়া সজোরে লাগিল। এবার সে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সঙ্গে সঙ্গে একটি, দুইটি, তিনটি ঢিল তাহার বুকে, নাকের ডগায় ও কপালে যাইয়া পড়িল, অপরাধীকেও এবার সে সঙ্গে সঙ্গেই তেমনই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তখন হুঙ্কার নাদ ছাড়িতে ছাড়িতে বিনুদা'র দিকে সে ছুটিয়া আসিতেই, বিনুদা' গোটা চারি পাঁচ ঢিল এক সঙ্গে তাহার ক্রোধোদ্দীপ্ত রক্ত মুখ লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া, নিমেষে আমাকে টানিয়া লইয়া সরকারদের সদর দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল ও সরকার-বাড়ীর সেই বিরাটকায় কবাটে তাহার লোহার খিল লাগাইয়া দ্রুতপদে সিঁড়িবাহিয়া একতালার ছাদে এমন এক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, যেখানে খাঁ-সাহেব রাস্তা হইতে তাহাকে দেখিতে পায়। তাহার পর এই ভীষণ যুদ্ধ! বিনুদা' উপর হইতে যত ঢিল ছোড়ে, খাঁ-সাহেবও রাস্তা হইতে কুড়াইয়া তত ঢিল ছোড়ে! প্রভেদের মধ্যে এই যে, বিনুদা' স্থির, ধীর, ক্রোধশূন্য, অব্যর্থ-লক্ষ্য—আর খাঁ-সাহেব ভীষণ অস্থির, ক্রোধোন্মত্ত, নৃত্যশীল, সুতরাং প্রতি-পদেই ব্যর্থ-লক্ষ্য। শেষে, বিনুদা' ছোড়ে একটা ত, খাঁ-সাহেব ছোড়ে দশটা। মিনিট পাঁচ-সাত এই ভাবে চলিবার পর খাঁ-সাহেবের রাস্তার ঢিল যখন ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল, ক্রোধও তখন তাহার একেবারে চরমে উঠিল, এবং মত্ত-হস্তীর ন্যায় তখন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়া সে লাফালাফি দাপাদাপির সহিত সমস্ত স্থানটা যেন একেবারে চষিয়া ফেলিতে লাগিল। কিন্তু রাস্তার ঢিল ত সব ফুরাইয়া গিয়াছে। তখন ক্রোধান্ধ খাঁ-সাহেব হাতের কাছে আর কিছু না পাইয়া তাহার ঝুলি হইতেই আয়ুধ সংগ্রহ করিতে লাগিল। প্রথমে বেদানা, তাহার পর তাহাও নিঃশেষ হইয়া যাইলে, ক্রমান্বয়ে আখ্‌রোট্, বাদাম এবং অবশেষে আঙ্গুরের বাক্স ছুড়িয়া বিনুদা'কে মারিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বৃথা চেষ্টা—তাহার কারণ, বিনুদা' অভ্রান্ত লক্ষ্যে একটা ঢিল ছুড়িয়া, খাঁ-সাহেবের দিকে চাহিয়া অঙ্গ-ভঙ্গীসহ ভ্যাংচাইতে ভ্যাংচাইতে নৃত্য করে, আর যেই সে কিছু একটা হাতে লইয়া ছোড়ে, অমনি সেই মুহূর্ত্তেই বিনুদা' সিঁড়ির ছাদের আড়ালে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, আর খাঁ-সাহেবের যত বেদানা, আখ্‌রোট্, আঙ্গুরের বাক্স পিছনের বাড়ীর দোতলার দেওয়ালে বাধিয়া সবই আবার ছাদে আসিয়া জমা হয়।

এইভাবে প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টার তুমুল যুদ্ধের ফলে খাঁ-সাহেবের সমস্ত মেওয়া তাহার সেই ঝুলির ভিতর হইতে দ্রুতগতিতে আসিয়া ছাদের উপর জমা হইয়া গেল।

রাস্তায় লোক জমিয়া গিয়াছিল অসংখ্য। সকলে মিলিয়া খাঁ-সাহেবকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে কি শান্ত হইতে চাহে! আমার বোধ হয়, তখন সে যদি একবার বিনু'দাকে সামনে পাইত, তাহা হইলে হিরণ্যকশিপুর মত নিশ্চয়ই বুকে চাপিয়া বিনুদা'কে চিরিয়া ফেলিত। যাহা হউক, আরও প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা ধরিয়া বিফল আস্ফালনে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিবার পর খাঁ-সাহেব স্থান ত্যাগ করিল এবং স্থান ত্যাগ করিবার আরও ঘণ্টাখানেক পরে ছাদ হইতে মেওয়াগুলি কুড়াইয়া কোঁচড ভরিয়া আমরা সরকার-বাড়ীর খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

গাঙ্গুলীপাড়া ঘুরিয়া বরাবর আমরা ঘোষেদের বাগানের পুকুরপাড়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় আসিয়া বসিলাম। কাপড়ের পোঁটলা খুলিয়া দেখা হইল, তিন বাক্স আঙ্গুর, আটটি বেদানা ও গণ্ডা আষ্টেক আখরোট খাঁ-সাহেব আমাদের জলযোগের জন্য ভেট 'দিয়াছে। আখরোটগুলি সেইখানে বসিয়া খাঁ সাহেবের নাম করিতে করিতে খাওয়া হইল। আঙ্গুরের একটা বাক্স লইয়া খুলিতে যাইতেছিলাম, বিনুদা' কহিল—"ও আর খুলিস্ না, ওগুলো থাক্, কাল স্কুলে নিয়ে গিয়ে কোলেকে দিতে হবে।"

"জগন্নাথকে?"

"হ্যাঁ। আহা, তার ছেলেটির অসুখ, ডাক্তারে বেদানার রস খাওয়াতে বলেছে, বেচারা পয়সা অভাবে খাওয়াতে পারে না।" খানিক থামিয়া বিনুদা' কহিল—"স্কুলের মাইনেই দুমাসের বাকী পড়েছে, দিতে পারে নি। দুটো টাকা ত তার জন্যে যোগাড় করিছি, কাল দিয়ে দেবো।"

"তুমি দেবে?"

"কি করি বল্? ছেলেটির অসুখ, তার ওপর কোলের বাপের অসুখ। ওর বাপ অসুখে না প'ড়ে থাকলে কি ওদের এমন টানাটানি হয়!"

"তা তুমি দু'টাকা কোত্থেকে যোগাড় করলে?

"করিছি কোন রকমে" বলিয়া আঙ্গুরের বাক্স ও বেদানাগুলি লইয়া কাপড়ে আবার বাঁধিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ক'রে করলে, আমায় বলবে না? ঠাকুরমার কাছ থেকে?"

ঠাকুমার কাছে ত চেয়েছিলুম, ঠাকুমা দিলেও না, উল্টে তার বাক্সটা বাবার ঘরে রেখেছে।"

"তবে?"

"কা'কেও বল্‌বি না বল্?"

"না।"

"দুটো করে গরু ধরে রোজ টালিগঞ্জের 'পাউণ্ডে' দিয়ে আসি। তাহাতেই চারিদিনে দুটাকা পেয়েছি। কাল তিনটে গরু ধরেছিলুম। একলা কি তিনটেকে সামলে নিয়ে অতদূর যেতে পারি? তাও, সদর রাস্তা দিয়ে ত আর নিয়ে যেতে পারি না, কত ঘুরে তবে নিয়ে যেতে হয়। কালকের একটা গরু ছিল ভারী দুষ্ট, ব্যাটা এমনি আমাকে গুঁতিয়ে ফেলে দিয়ে পালাল, যে——এই দেখ্ না, উরুতটা একেবারে কতখানি ছ'ড়ে গেছে"—বলিয়া বিনুদা তাহার উরুতের ছড়া দাগটা কাপড় সরাইয়া দেখাইল।

বেলা প্রায় ১০টা হইয়াছিল। ঘাসের উপর হইতে বই ও খাতা তুলিয়া লইয়া বাটী আসিবার জন্য দুইজনে উঠিয়া পড়িলাম। পথে আসিতে আসিতে বিনুদাকে কহিলাম—"আচ্ছা, কাবলী ব্যাটা ত ভারি বোকা; আঙ্গুর বেদনা ছুড়ে কেউ কখন—"

"বোকা নয়, রেগে গেলে ওর মাথা ওই রকম বিগড়ে যায়, তখন আর ওর কোন জ্ঞান থাকে না। অন্য কোন কাবলী হ'লে কি আর বেদানা-আঙ্গুরের বাক্স ছুড়ে মারে। দাস্থ হালদার সে দিন ওর কথা সব বললে কিনা, তাই ত জান্‌তে পারলুম। ও অন্য কিছুতেই রাগবে না, ধ'রে মারলেও না, কিন্তু ওর ওই পাগড়ীতে ঢিল মেরেছ কি আর রক্ষে নাই।"

"যাই হোক, আমাদের চিনতে পারে নি ত? তা হলেই কিন্তু সর্ব্বনাশ।"

"দূর বোকা, চিনতে পারলে কি আর আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ঐ রকম মারামারি করত? তা হলে তখনি এসে বাবাকে সব বলতো।"

"কিন্তু আর কেউ যদি জ্যাঠামশাইকে ব'লে দেয়?"

"কে বলে বলুক না, তা হ'লে তাকে দেখে নেবো না একবার?"

কিন্তু যাহা ভয় করিতেছিলাম, তাহাই হইল। সকালের এই কথা কি করিয়া বৈকালে জ্যেঠামশায়ের কাণে গিয়া উঠিল। কিন্তু সে দিন এ সম্বন্ধে তিনি আমাদের কিছুই বলিলেন না। অন্য দিন, কোন না কোন কাযে আমাদের সহিত যে দুই চারিটা কথা কহিতেন, সে দিন তাহাও কহিলেন না। পরদিন বেলা ১০টার সময় স্কুল হইতে আমরা বাটী ফিরিতেই তিনি আমাদের দুইজনকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া গম্ভীর গলায় কহিলেন—"কোথায় গিয়েছিলে? স্কুলে? বিদ্যে শিখতে? বিদ্যে ত অনেক শেখা হয়েছে, আর দরকার কি?" ভূমিকার ভণিতা শুনিয়াই ত চক্ষুস্থির! এইবার কি কাণ্ডই বা করেন জ্যেঠামশাই! তাঁহার বেতের সরু ছড়িগাছটা কোথায়, মাথা হেট করিয়া আড়ে আড়ে চহিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম। আর আতঙ্কে বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া, সেইরূপ ধীর-গম্ভীর গলায় কহিলেন,—"বুড়ো ছেলেদের গায়ে হাত দিতে লজ্জা হয়—আর তার দরকার নেই। সুতরাং মার-ধোর আমি করব না, তবে এ বাড়ীতে আর তোমাদের স্থান হবে না, খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনে বিদেয় হয়ে চলে যাবে। দু'খানা ক'রে কাপড়, একখানা গামাছা, আর একটা মাসের খোরাক দশটা করে' টাকা সরকার মশাইয়ের কাছ থেকে দু'জনে চেয়ে নিয়ে দূর হয়ে যাবে। তার পর নিজেদের উপায় নিজেরা ক'রে নিও, যাও।" বলিয়া হাত ধরিয়া আমাদের ঘরের বাহির করিয়া দিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কি ভয়ানক! এর চেয়ে দুই দশ ঘা বেত মারিলেও যে ছিল ভাল। ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া বিনুদা'র মুখের দিকে চাহিয়া সর্ব্বাঙ্গ আমার জ্বলিয়া উঠিল, এমন সাংঘাতিক সময়ও বিনুদা' তখন ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছে! ছিঃ ছিঃ ঘৃণায় লজ্জায় মন ভরিয়া উঠিল! শুধু বাড়ী হইতে দূর হইয়া চলিয়া যাইতে বলিলেও কোন কথা ছিল না, কিন্তু দুইখানা করিয়া কাপড়, একখানা গামছা আর দশটা টাকা!

মনে হইল, শুধু বাড়ী হইতে নহে, পৃথিবী হইতে দূর হইয়া যাওয়াই আমাদের ভাল।

সন্ধ্যার পর ঠাকুমা আসিয়া জোঠামশাইকে কহিলেন,—"হাঁ রে, ঐ অমন করে ছেলেদের কখনও বল্‌তে আছে? বাছারা আমার সমস্ত দিন যেন মন মরা হয়ে রয়েছে!"

"বলবে না ত কি? কাবুলির সঙ্গে মারামারি! সাহসের সীমে-পরিসীমে নেই!"

"হ্যাঁ, যা' কথা নয় তাই! ওরা হ'ল দুধের বাচ্ছা, ওরা গেল কাবলীর সঙ্গে মারামরি করতে? কোন্ মুখপোড়া তোকে লাগিয়েছে বল্ ত একবার?"

যাক্, এ ধাক্কাও আমাদের কাটিয়া গেল, কিন্তু বিনুদা' যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে ধাক্কার ত আর শেষ নাই! অথচ আমি কোন দোষের ভাগী না হইলেও শাস্তির ভাগী আমাকে হইতে হয়। দিন পাঁচ ছয় যাইতে না যাইতেই বিনুদা এক নূতন কাণ্ড যাহা করিয়া বসিল, তাহার ফলে সেই ষোল-সতের বৎসরের জীবনের স্রোতটাই এক নূতন পথে ঘুরিয়া গেল।

সে দিন ছিল শুক্রবার। হেড-মাষ্টারের অসুখ বলিয়া স্কুলে আসেন নাই এবং খবর দিয়াছেন যে, পরদিনও আসিবেন না। স্কুল বসিবার পূর্ব্বে বিনুদা' সেই জগন্নাথ কোলেকে কহিল,—"ভাই খোকার বাবা, আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে।"

জগন্নাথ কহিল,—"দেখ বিনু, ভাল হচ্ছে না কিন্তু।"

"রাগ করেন কেন মশাই? আপনার সঙ্গে সমীহ ক'রে কথা না কইলে অমান্যি করার পাপ হবে যে!—এখন কথা হচ্ছে যে, কাল 'হোঁদল-কুৎ-কুৎ' মহাশয় ন আগচ্ছং, শুনেছ ত?"

"হ্যাঁ। আজও ত আসেন নি। জ্বর হয়েছে বুঝি?"

"হ্যাঁ। কালও আসবেন না, সুতরাং কাল ক্লাসটিকে 'এক্‌সেলেণ্ট' ক'রে লতা-পাতা ফুল দিয়ে —বুঝতে পেরেছ ত? and so, তোমাদের ওদিককার সব বাগান থেকে ফুল তুলে আনবার ভার তোমার ওপর!"

বেলা ১০টার সময় স্কুলের ছুটী হইয়া গেলে সকল ছেলে মিলিয়া এ বিষয়ে চূড়ান্ত পরামর্শ হইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া শুনিলাম যে, আমার উঠিবার বহু পূর্ব্বে বিনুদা' স্কুলে চলিয়া গিয়াছে।

স্কুলে আসিয়া দেখি যে, লাল-নীল কাগজের মালা, নিশান, বাখারির 'আর্চ', লতা, ক্রোটন, ঝাউয়ের পাতা, আর হরেক রকমের ফুল দিয়া সাজাইয়া ক্লাসটিকে যেন যাত্রার আসরের মত করা হইয়াছে। সুদীর্ঘ টানা টেবলের স্থানে স্থানে ফুলের স্তবক, তাহারই মধ্যে মধ্যে এক পয়সা দামের লাল-নীল বাতি জ্বালাইয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দুই দশখানা ছোট সাইজের পিক্‌চারেরও অভাব ছিল না।

সেকেণ্ড ক্লাস ছিল দোতালার একবারে একধারে। সুতরাং রাত থাকিতে স্কুলে আসিয়া, দরজায় খিল লাগাইয়া সকলে যে এই সব কাণ্ড করিয়াছে, তাহা নীচে লাইব্রেরী হইতে মাষ্টাররাও কিছুই জানিতে পারেন নাই, অন্য ক্লাসের ছেলেরাও না।

স্কুল বসিবার ঘণ্টা পড়িতেই বিনুদা কহিল,— "খবরদার! যা বলা-ক'য়া আছে, কিছুতেই খিল খোলা না হয়!"

শুধু বিনুদা'কেই বা কি বলিব, ক্লাসের প্রায় সকল ছেলেই ছিল এক ছাঁচের—বিনুদা'র মতই গুণধর! তবে কেহ উনিশ, কেহ বা বিশ।

বিনুদার কথায় শিবু বলিয়া একটি ছেলে বলিয়া উঠিল,—"খিল খোলা ত নয়ই, আর গুরুচরণ বাবু এলেই কিন্তু অমনি পালা আরম্ভ।" দেখিলাম, তাহার হাতে গিরীশ ঘোষের একখানি 'বিল্বমঙ্গল' খোলা রহিয়াছে।

শনিবার প্রথম ঘণ্টাতেই ছিল গুরুচরণ বাবুর 'জিওমেট্রী'। ঘণ্টা পড়িবার মিনিট দুই তিন পরেই তিনি আসিয়া দরজা ঠেলিলেন। অমনই শিবু তাহার পালা আরম্ভ করিল,—"দেখে নেবো—দেখে নেবো! এত বড় স্পর্দ্ধা! এক দণ্ড বিলম্ব হয়েছে বলে দুপুর রাত অবধি দোর খুলে দিলে না, এর তাৎপর্য্য ছিল—এর তাৎপর্য্য ছিল।"

ওদিকে গুরুচরণ বাবু ক্রমাগত ধাক্কা দিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—"ওরে খিল্ দিয়েছিস কেন রে সব? খোল্ খোল্—দরজা খোল্।"

এ দিকে বিনুদা ও আর এক জন তখন গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়া দিয়াছে,—

"বসেছিল বঁধু হেঁসেলের কোণে।
বল্লে না ফুটে, খামকা উঠে,
হামা দিয়ে গিয়ে সেঁধুল বনে।"

খোকার বাবা তখন টেবল চাপড়াইয়া সঙ্গত জুড়িয়া দিয়াছিল।

সঙ্গে সঙ্গে শিবুও আবার আরম্ভ করিল,—"মিষ্টি মুখে বিদেয় নিয়ে এলেই হ'ত, বল্লেই হ'ত—তাই তোমারো পোষাল না, আমারও পোষাল না—"

গুরুচরণ বাবু মিনিট দুই তিন ডাকাডাকি করিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। বেচারা ছিলেন বড় ভাল মানুষ। সেইজন্য ছেলেরা তাঁহাকে একবারেই মানিত না, বিশেষতঃ ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেরা। ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেরা শুধু গুরুচরণ বাবুকে কেন, এক হেড-মাষ্টার ছাড়া আর কোন মাষ্টারকেই মানিত না। কি সাহসই যে তখনকার সেই সব ছেলের ছিল!

গুরুচরণ বাবু চলিয়া যাইবার মিনিট পাঁচেক পরে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বিনয় দত্ত আসিয়া বাজখাঁই আওয়াজে ধম্‌কাইতে ধম্‌কাইতে দরজায় সজোরে ধাক্কা দিতে লাগিলেন। কিন্তু কেই বা তাঁহার কথা শুনে। বিল্বমঙ্গল তখন রজ্জুভ্রমে সাপ ধরিয়া পাঁচীল ডিঙ্গাইতেছিল, অর্থাৎ টানা পাখার দড়ি ধরিয়া শিবু তখন ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। পায়ের শব্দে বুঝা গেল যে, বিনয় দত্তও রণে ভঙ্গ দিয়া অন্তর্ধান হইলেন। ইহারই দুই চারি মিনিট পরে সিড়িতে জুতার এক পরিচিত মস্‌মসানি শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল এবং শিবু দড়ি ছিঁড়িয়া খোকার বাপের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল, আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড হাতের দুই একটা ধাক্কায় দরজার খিল সশব্দে ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িতেই ঘরের মধ্যে একবারে সাক্ষাৎ যমের আবির্ভাব! পিছনে দারোয়ান, হাতে রেজেষ্টারী বহি। কাহাকেও কোন কথা নহে, কোন অনুযোগ নহে, কোন প্রশ্ন নহে,—হাতের রেজেষ্টারীখানি খুলিয়া হেড-মাষ্টার, উপস্থিত সকলেরই নামের পাশে পেন্সিলের একটা করিয়া দাগ দিয়া ক্লাস হইতে একে একে সকলের নাম ডাকিয়া বাহির করিয়া দিলেন। বলিবার মধ্যে অতি সংক্ষেপে শুধু এইটুকু মাত্র বলিলেন,—"প্রত্যেকের ১০৲ টাকা করে 'ফাইন্'। ৭ দিনের মধ্যে 'ফাইন্' শুদ্ধ যে না আসবে, সে যেন আর না আসে, বুঝবে যে তাকে **Rusticated** করা হয়েছে।"

হায়! হায়! কি অশুভক্ষণেই যে বিনুদার ভাই হইয়া জন্মিয়াছিলাম, দুর্ভোগের আর অন্ত নাই! এক বিপদ কাটে ত আর এক আসিয়া হাজির হয়! আজিকার এই খবর যদি জ্যেঠামশায়ের কাণে গিয়া পৌছায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আর রক্ষা থাকিবে না। এবার ঠাকুরমার ঠাকুরদাদা আসিলেও আমাদের বাঁচাইতে পারিবেন না। কোন রকমে 'ফাইন্‌টা' যোগাড় করিয়া যদি সোমবার দিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলেও না হয়—কিন্তু, দশ দশটা টাকাই বা পাই কোথায়? মনে হইল, জ্যেঠামশায়ের সে দিনের সেই এক মাসের খোরাকীর দশটা টাকা পাইয়া আজ যদি বাড়ী হইতে দূর হইতে পাই, তাহা হইলে অন্ততঃ 'ফাইন্'টা দিয়া এখন ত বাঁচি, তারপর প্রত্যহই কালীবাড়ীর প্রসাদ খাইয়া আর নাটমন্দিরের চাতালে শুইয়া মরি যদি ত তাহাতেও দুঃখ নাই!

কিন্তু দুর্ভাবনা যত আমারই, বিনুদা'র কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নাই। বোধ হয় পূর্ব্বজন্মের পাপ আমারই বেশী, নইলে, যে এই অনাসৃষ্টির মূল, সে দিব্য নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার, আর আমার মাথায়ই বা চিন্তার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কেন। মনে মনে ঠিক করিলাম যে, এ ধাক্কা কাটিলে আর বিনুদা'র কোন সংস্রবেই থাকিব না। ভগবান্‌কে ডাকিলাম —হে ভগবান্, যেন জ্যেঠামশায়ের কাণে এ সব না যায়!

কিন্তু হায়-রে-হায়! ভাগ্য যাহার মন্দ, বর্ষাকালেও ভরানদী তাহার শুকাইয়া যায়, পূর্ণিমায়ও তাহার আকাশে চাঁদ উঠে না! ছয় দিনের দিন বিধাতাপুরুষ আসিয়া লোহার আঁচড়ে কপালে যা দাগিয়া গিয়াছেন, এখন ভগবান্‌কে ডাকাডাকি করিয়া কি আর তাহার রদ্ হয়!

আমরা তখনও স্কুল হইতে ফিরি নাই, তাহার পূর্ব্বেই জ্যেঠামহাশয় সমস্ত ব্যাপার আদি অন্ত জানিয়া শুনিয়া বসিয়া আছেন!

এই রকমই হয়। কু-টাই রটে, আর সে রটনা বাতাসের আগে এই রকম করিয়াই আসিয়া পড়ে। সু-টা কিন্তু কাহারও চোখে কাণে পৌছায় না—তাই চাপাই পড়ে। এই বোধ হয় বিধির বিধান, নহিলে, সাতকড়ি বাঁড়ুয্যের গরুকে লোক যে মাসের মধ্যে বিশ দিন ধরিয়া লইয়া গিয়া থানায় দিতে যায়, আর আমরা যে সেই বিশ দিনই কত ফিকির মৎলব, ঝগড়া—গালাগালি—মারামারি করিয়া তাহার সেই গরুকে ছাড়াইয়া আনি, এ খবর বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের কাণে কি এক দিনও যায় না?—বলিলে পরে বলেন,—"তাই না কি?" আর, সে দিন—দিনের

বেলা নহে—রাত্রিতে—কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, কত লুকাইয়া, সাবধান হইয়া তাঁহার খিড়কীর গাছ হইতে দুইটি এঁচোড় পাড়িয়া আনিয়াছি, আর অমনই বাঁড়ুয্যে মশাই খবরটি পাইয়াছেন। আশ্চর্য্য! কাজটা কু কি না, তাই সেই নির্জ্জন অন্ধকারের মধ্যেই দেখিবার লোক ঠিক মোতায়েন ছিল! আর,—সব বিষয়েই কি এই একই নিয়ম! দেখিয়াছি ত, যে, কত দিন জরির পাঞ্জাবী গায়ে, পায়ে পাম্-সু পরিয়া, গাড়ী চড়িয়া বাবার সঙ্গে বেড়াইতে আসিয়াছি, পথে যদি এক জনও চেনা লোকের সহিত দেখা হইয়াছে, আর যে দিন ঝি-চাকরের অসুখ-বিসুখ হইলে, বাজার হইতে এক হাতে তরকারীর দশ-সেরী পোঁটলা আর এক হাতে মাছের খালুই ঝুলাইয়া, পথ ছাড়িয়া বে-পথ দিয়া আসিয়াছি, সে দিন সেই বে-পথেই কি রাজ্যের চেনা-লোক ঠিক হাজির! তাই বলিতেছিলাম যে, এই রকমই হয়।

যাহা হউক, খিড়কী দিয়া বাড়ী ঢুকিতে গিয়া যেমন ঠাকুমার মুখে শুনিলাম যে, জ্যেঠামহাশয় সবই জানিতে পারিয়াছেন ও বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া আছেন, অমনই সেই অবস্থাতেই প্রত্যাবর্ত্তন এবং পলায়ন। কিন্তু পলায়নেই সব সময় ত আর রক্ষা পাওয়া যায় না; পলাইলে ধরিবার লোকও থাকে। সুতরাং গ্রেপ্তার হইয়া সন্ধ্যার পর যখন উভয়ে জ্যেঠামহাশয়ের কাছে আনীত হইলাম, তখন—বিনুদা'র কথা আমি জানি না, রাগে আমি তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাই নাই—কিন্তু আমার অবস্থা ঠিকই যূপবদ্ধ ছাগলের মত,—ঠিকই, ঠিকই—তাহার আর কোন ভুল নাই। কিন্তু জ্যেঠামহাশয় এ-দিনেও আমাদের কোন গালাগালি নহে, বকাবকি নহে, এক জোড়া কাপড় দিয়া বিদায় করা নহে; সে দিনের মত হাত ধরিয়া ঘরের বাহির করাটুকু পর্য্যন্ত আজ কিছুই করিলেন না। তবে যে শাস্তির ব্যবস্থা আজ তিনি করিলেন, তাহা চরম, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডেরই সমান। আমরা নির্ব্বাসিত হইলাম।

দশম পরিচ্ছেদ

আমাদের নির্ব্বাসন হইল শ্রীরামপুরে। বলিলাম বটে যে, নির্ব্বাসন হইল, কিন্তু ইহা নির্ব্বাসন কি মুক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; যেহেতু এই শ্রীরামপুরই আমাদের আদি বাসভূমি। যে বাটীতে জ্যেঠামহাশয় আমাদের পাঠাইয়া দিলেন, সেই বাটীতেই আমার পিতা, পিতামহ জন্মিয়াছিলেন, আমার প্র-পিতামহ, বৃদ্ধ-প্রপিতামহ, অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ এই বাটীতেই জন্মিয়া তাঁহাদের সারা-জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে কাটাইয়া আবার এই বাটীর আকাশেই তাঁহাদের শেষ নিশ্বাস মিশাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই মহাতীর্থে আসা আমাদের নির্ব্বাসন অথবা আমাদের মুক্তি, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

পিতামহরা ছিলেন দুই ভাই। আমার পিতামহ যখন শ্রীরামপুর ত্যাগ করিয়া কালীঘাটে চলিয়া আসিলেন, তখন জ্যেষ্ঠ পিতামহ যেন আরও বেশী করিয়া পিতৃপুরুষের ভিটাখানিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন। এখন তিনি ত স্বর্গগত, কিন্তু তাঁহারই মত এখনও পর্য্যন্ত আমার বড় জ্যেঠামহাশয় ও তাঁহার দুই পুত্র—আমার দুই দাদা—চির-কালের পৈতৃক ভিটাখানিকে তেমনই ভাবে রক্ষা করিয়া তাহার জরাজীর্ণ কঙ্কালসার কোলের মধ্যে অসীম তৃপ্তিতে বাস করিয়া আসিতেছেন।

বড় জ্যেঠামহাশয় তখন 'পেন্সন্' ভোগ করিয়া অবসর জীবন ভোগ করিতেছিলেন। বড় দাদা শ্রীরামপুর মডেল স্কুলের হেড্ মাষ্টার। ছোট দাদা এফ-এ পাশ করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বাটীতেই বসিয়া ছিল। বাড়ীতে স্ত্রীলোকের মধ্যে শুধু আমার দুই বৌদিদি। বড়দাদার কাছে থাকিলে লেখাপড়াও আমাদের ভাল হইবে এবং কালীঘাটের কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিব, এই উদ্দেশ্যেই জ্যেঠামহাশয় আমাদের শ্রীরামপুরে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু কালীঘাটে থাকিয়া বিনুদা' যাহাও একটু পড়াশুনা করিত, শ্রীরামপুরে আসিবার পর হইতে তাহাও একবারে বন্ধ করিয়া দিল। এখানে আসিয়া বিনুদা' বেশ এক বড় আড্ডার আড্ডাধারী হইয়া উঠিল। আমি কিন্তু বাড়ী হইতে বড় একটা বাহিরই হইতাম না। পড়াশুনা করিয়া যেটুকু সময় থাকিত, সেটুকু ছোটদার বৈঠক-খানাতেই আমার বেশ কাটিত।

ছোটদার ছোট্ট বৈঠকখানাটিও একটি ছোট-খাট আড্ডা ছিল, তবে তাহা সাহিত্যিকের আড্ডা, যেহেতু, ছোটদা নিজে এক জন সাহিত্যিক ছিল। তখনকার অনেক কাগজেই ছোটদার লেখা কবিতা ও গল্প বাহির হইত।

ছোটদার সাহিত্যের আসরে থাকিতে থাকিতে, তাহাদের সাহিত্যের আলোচনা শুনিতে শুনিতে আমিও যে একটি ক্ষুদে সাহিত্যিক হইয়া পড়িলাম, তাহা বলিলে নেহাৎ মিথ্যা বলা হয় না। যেহেতু ছোটদার কাছে যতগুলি ছোট বড় পত্রিকা আসিত, তাহার সবগুলাই আমি আদ্যোপান্ত গিলিতাম। এ বিষয়ে স্বয়ং ছোটদার নিকট হইতেও খুব উৎসাহ পাইতাম। ছোটদা' বলিত,—"এখন থেকে একটু-আধটু লেখবার চেষ্টা কর্। সাহিত্যিকের আসন যেখানে, সেখানে এম-এ, বি-এ-ও নাগাল পায় না। রাজা-জমীদারও তার কাছে পৌঁছুতে পারে না।"

আমার মনে পড়ে, ছয় মাস শ্রীরামপুর মডেল স্কুলে পড়িবার পর বাৎসরিক পরীক্ষায় যখন বিনুদা' ও আমি দুই জনেই পরিপাটীরূপে ফেল্ হইয়া আর এক বছরের জন্য সেকেণ্ড ক্লাসে থাকিবার 'এগ্রিমেণ্ট' করিলাম, সেই সময় স্কুলের সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া লেখার সম্বন্ধে একটু বেশী উৎসাহিত হইয়া পড়িলাম এবং সেই উৎসাহের জোরে, বোধ হয়, দিন তিনেকের ভিতরই একটি ছোট গল্প ও 'প্রাণের ব্যথা' নামে একটি বড় কবিতা লিখিয়া 'অপ্রকাশ' কাগজে পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই—ডাকঘরের গোলযোগে তাহা পৌঁছায় নাই, পৌঁছাইলে তাহা 'অপ্রকাশে' প্রকাশ না হইয়া যাইত না।

প্রকাশ না হইলেও গল্পের 'ফাইল' আর কবিতার খাতা আমার দিন-দিনই বেশ ভারী হইয়াই উঠিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ এক দিন এক মহা অশুভক্ষণে আমার সাহিত্য-সাধনা আরম্ভেই শেষ হইয়া গেল।

স্কুল সে দিন কিসের জন্য বন্ধ ছিল। দুপুর-বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ছোটাদার বৈঠকখানায় টেবিলের ধারে বসিয়া, দরজার দিকে পিঠ করিয়া, 'শেষ সাধ' নামে একটি কবিতা লিখিতে-ছিলাম। আমার সকল কবিতার মধ্যে এইটাই সব চেয়ে উৎরাইয়া গেল। কবিতাটি এতই চমৎকার হইয়া পড়িল যে, নিজের মনে বারবার তাহা পড়িয়া আমি নিজেই তন্ময় হইয়া পড়িলাম।

সমস্তটা লেখা হইলে পর, গোড়া হইতে কবিতাটি আর একবার পড়িলাম :—

শেষ সাধ।
প্রাণপাখী যবে মোর—হে আমার প্রিয়া!
ছাড়িয়া এ সুবর্ণ-পিঞ্জর,
যা'বে উড়ে অসীম নীলিমা-মাঝে—মহা শূন্যপথে,
ফেলিও না অশ্রু ঝর্ ঝর্,
বদ্ধ রেখো অশ্রু-গঙ্গা বুকের ভিতর!
বিষাদ-কালিমা মাখি' কোন নর কোন নারী
সে সময় নাহি যেন আসে!
তরুণ গীতের ধ্বনি—বিষাদের মর্ম্মন্তুদ বাণী
যেন নাহি কর্ণে মোর পশে!
তুমি শুধু দিও শিহরণ ঐ তব অঙ্গের পরশে!
হে অন্তরবাসিনী মোর, তুমি শুধু তুমি শুধু থেকো
মোর পাশে বসি একাকিনী।
কাণে কাণে কয়ো দুটি কথা—

চটাস্ চট্! হঠাৎ ধাঁ করিয়া আমার দুই কাণের উপর বিরাশী সিক্কার ওজনের এমন দুই প্রচণ্ড থাপ্পড় আসিয়া পড়িল যে, সমস্ত মাথাশুদ্ধ একবারে ঘুরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর সাম্‌নেকার সমস্ত আলো নিভিয়া গিয়া চারিদিক্ গভীর অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল, আর সেই অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্টই দেখিলাম, অন্তরের সমস্ত কবিতা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিসা-ফুল আকারে অন্তর হইতে বাহির হইয়া সেই গাঢ় অন্ধকারে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে মিলাইয়া গেল। কাণে বোধ হয় তালা লগিয়া গিয়াছিল, তাই জ্যেঠামহাশয়ের প্রথম কথাগুলি কিছুই কাণের ভিতর প্রবেশ করে নাই; মিনিটখানেক পরে একটু যখন হুঁস্ হইল, তখন শুনিতে পাইলাম, তিনি বলিতেছেন,—"কালীঘাট থেকে এখানে পাঠালুম লেখাপড়া করতে, না, এগ্‌জামিনে ফেল্ হয়ে কবিতে লিখতে,—পাজী, শূওর, ষ্টুপিড গাধা! সেটা কোথায়? ডেকে আন্ তাকে শীগ্‌গীর!" বলিয়া ঘাড়ে দুইটা রদ্দা দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। আর কবিতার খাতাখানি লইয়া নির্দ্দয়-ভাবে ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন।

বিষ খাব কি শ্রীরামপুরের রেলের লাইনে মাথা দিয়া শুইব, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে বিনুদার সন্ধানে বাহির হইলাম।

বিনুদার আড্ডা ছিল অনুকূল মিস্ত্রিরের 'জিমন্যাষ্টিকে'র আখড়ায়। সুতরাং সেই ঠিকানাতেই চলিলাম।

দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, শ্যাম গোঁসাইয়ের বাড়ীর দরজায় বিনুদা' এক জন ফেরীওয়ালার সঙ্গে

দাঁড়াইয়া কি আলাপ করিতেছে। শ্যাম গোঁসাই-য়ের বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগে একটা বাগান, আর সেই বাগানটা পার হইলেই অনুকূল মিত্তিরের আখড়া। শ্যামগোঁসাইয়ের বাড়ীর পাশ দিয়াই ছিল আখড়ায় যাইবার পথ।

কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বিনুদা' ইঙ্গিতে আ,মায় আখড়ায় যাইতে বলিল। ফেরীওয়ালা তখন তাহার মাথার হাঁড়ী দুইটি নামাইয়াছে; দেখিলাম, কৃষ্ণনগরের সরভাজা আর সরপুরিয়া, বিনুদা' তাহার সহিত দর করিতে সুরু করিল। বুঝিলাম, বেচারার আজ কপাল ভাঙ্গিয়াছে, সুতরাং আর সেখানে না দাঁড়াইয়া এক পা এক পা করিয়া শ্যাম গোঁসাইয়ের বাড়ী ঘুরিয়া, বাগান অতিক্রম করিয়া আখড়ায় আসিয়া পড়িলাম।

মিনিট দশেক পরেই বিনুদা' কৃষ্ণনগরওয়ালার সেই 'অরিজিন্যাল্' হাঁড়ি দুইটি শুদ্ধই সমস্ত সরভাজা আর সরপুরিয়া লইয়া হাজির। অনুকূল মিত্তির জিজ্ঞাসা করিল,—"কি রে বিনু, ব্যাপার কি, চুং-ফাই না কি?"

কথার জবাব না দিয়া বিনুদা হাঁড়ি দুইটি তক্তপোষের তলায় ঠেলিয়া রাখিয়া দিয়া চাদরখানা টানিয়া দিল। অনুকূল মিত্তির জিজ্ঞাসা করিল—"কি;রকমটা হ'ল বল্ দেখি?"

"দেখলুম, লোকটা শ্রীরামপুরের নয়। বারো আনা ক'রে সের দর ঠিক হোল। তার পর, জানি যে, শ্যাম গোঁসাইও এখন ঘুমুচ্ছে, সুরেশ ত দোকানে, সদর দরজাও খোলা। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই সব অমনি ওজন করিয়ে ৩৵১৫ দাম ধার্য্য হ'ল। তার পর আর কি, সিন্-ফিন্-ক্রাং। বললুম, 'হাঁড়িশুদ্ধ ই দাও, দামটা আর হাঁড়ি দুটো ফিরিয়ে এনে দিয়ে যাচ্ছি।' তার পর বরাবর বাড়ী ঢুকে, খিড়কী দিয়ে 'প'য়ে আকার!"

বিনুদার মুখের দিকে চাহিয়া আমি কহিলাম,—"প'য়ে আকার ত দিলে, এ দিকে 'জ'য়ে একার যে এসে হাজির কালীঘাট থেকে; তোমায় ডাকচেন, শীগ্‌গির চল।"

"সত্যি?" বলিয়া বিনুদা' আমার মুখের দিকে ঠায় চাহিয়া রহিল এবং তাহার পর প্যারী ঘোষের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া কায়েতের ছেঁদায় আঙ্গুল টিপিয়া, একান্তমনে তামাক টানিতে লাগিল।

কথাটা একটু অস্পষ্ট রহিয়া গেল, খুলিয়া বলা আবশ্যক।

আখড়ায় যাহারা যাহারা আসিত, কেহই তামাকের অপমান করিত না, কিন্তু হুঁকার ব্যবস্থা ছিল একটি। ঐ একটি হুঁকায়, অনুকূল মিত্তিরের অদ্ভুত বুদ্ধিবলে, ছেঁদা ছিল দুই দিকে দুইটি। একটি 'ক'-কারের, অপরটি 'ব'-কারের, অর্থাৎ ছোট ছেঁদাটি ছিল কায়স্থের এবং বড়টি ছিল ব্রাহ্মণের। কায়স্থ যখন খাইত, তখন ব্রাহ্মণকে টিপিয়া ধরিত, আর ব্রাহ্মণের বেলা, কায়স্থকে চাপিয়া তবে খাইতে হইত। শূদ্রের বালাই আখড়ায় ছিল না, থাকিলেও নিশ্চয়ই আটকাইত না।

হুঁকায় দুই চারিটা টান দিয়া বিনুদা কহিল,—"কখন্ এসেচে র‍্যা, বাবা?" বলিয়া হুঁকাটি আমার সম্মুখে ধরিয়া কহিল,—"খা।"

"তামাক আমি খেয়েছি কখনো?"

"আমিও কি প্রথম যে দিন খেতে সুরু করি, তার আগে কোন দিন খেয়েছিলুম? নে—নে—পুড়ে যাচ্ছে!"

আমি বিনুদার হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া অনুকুল মিত্তিরের হাতে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বিনুদা কহিল,—"সদর রাস্তা দিয়ে এখন যাওয়া চলবে না, বাজারের পথ দিয়ে ঘুরে যেতে হবে।"

আমি কহিলাম,—"তুমি তাই যাও, আমি কিন্তু সরভাজাওয়ালার অবস্থা না দেখে যাব না।"

অনুকুল মিত্তিরের দিকে চাহিয়া বিনুদা' উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"ওগুলো থাকলো, সন্ধ্যার পর সিদ্ধি খেয়ে বেশ চলবে এখন।" বলিয়া বিনুদা চলিয়া গেল।

শ্যাম গোঁসাইয়ের বাড়ীর সামনে আসিয়া দেখিলাম, পথে লোক জমিয়া গিয়াছে, আর শ্যাম গোঁসাই হাত-মুখ নাড়িয়া বলিতেছে,—"আমার ছেলে এখন গিয়ে বাড়ীতেই নেই, আর তুই বেটা বলবি যে, আমার ছেলে নিয়ে গেছে?"

"আরো মশাই, জলজ্যান্ত নিয়ে গেল, আর বলব না?"

"তবু বলবি, নিয়ে গেল? আরে সে এ সময় বাড়ীতেই থাকে না। সে রইল এখন দোকানে—আর সে কিনা তোর—"

"আচ্ছা, আপনার ছেলের গায়ের রং কি রকম বলুন ত বাবু।"

"গায়ের রং? গায়ের রং ত ফর্সা।"

"আর বয়েস?

"আরে, এ ব্যাটা কোথাকার রে? হাজারবার

বলছি যে, আমার ছেলে কিছুতেই নয়, তবু বেটা—"

"আচ্ছা, বয়স কত বলুনই না ঠাকুর।"

"এ ত মহা অধর্ম্মের ভোগে পড়লুম দেখছি! আরে, বয়স তার আর কতই হবে, বছর কুড়ি কি বছর একুশ।"

'ঠিকই হয়েছে ঠাকুর মশাই। গরীবকে আর মারবেন না। হাঁড়ি দুটো আর দামটা দিয়ে দিন দয়া ক'রে। দাম হয়েছে ৩৵১৫। এগারটা পয়সা না হয় বাদ দিয়ে ঐ পুরো তিনটে টাকাই দিন। অনেক দূর থেকে ছিরামপুর আজ এসেছি কর্ত্তা, গরীবকে মারবেন না, দোহাই আপনার।"

পাছে হাসি আর আটকাইয়া রাখিতে না পারি, সে জন্য আর দাঁড়াইলাম না, এক পা এক পা করিয়া—চলিয়া আসিলাম। বাজারের মোড়ের কাছে আসিয়া দেখি, বিনুদা' আমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে।

বাড়ী ঢুকিতেই ছোটদা কহিল,—"আজ ভারি বেঁচে গেলি বিনু। বড়কাকা যে রকম তোর ওপর আজ রেগে এসেছিলেন!"

"বাবা কোথায়, ছোটদা?"

"এই চ'লে গেলেন। কি কায আছে, তাই বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না" বলিয়া ছোটদা বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। বিনুদা কহিল—"আখড়ায় যাই, সেগুলো সব খেতে হবে।"

আমি কহিলাম,—"তোমরা খাও গে, ও পাপের জিনিষ আমি খাব না, আর তা' ছাড়া আমি এখন পড়বো।"

"আরে, পড়া ত চিরকালই রয়েছে, সে ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না। খেয়ে দেয়ে এসে যত পারিস পড়লেই ত হবে।"

"না' ভাই, অনেক পড়া আছে, আমি যাব না।"

"তুই দেখছি একেবারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর না হয়ে আর ছাড়বি না" বলিয়া বিনুদা' বাড়ী না ঢুকিয়াই আবার আখড়ার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

একলাটি ছোটদার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলাম। মনটা আমার যে খুবই খারাপ ছিল, তাহার আর কোন সন্দেহই ছিল না। কাণের উপর জ্যেঠামহাশয়ের থাপ্পড়ের ব্যথা অবশ্য তখন আর ছিল না, কিন্তু কবিতার খাতাখানির দুর্দ্দশা, সে ত আর ভুলিবার নহে! ভুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম, মনকে কত রকমে বুঝাইয়া প্রবোধ দিতে লাগিলাম, কিন্তু কেবলই একটা খোঁচা আসিয়া অনবরত মনকে বিঁধিতে লাগিল।

ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল, বাড়ীর ভিতর হইতে সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়া উঠিল, আমার মনের মধ্যেও যেন সন্ধ্যা ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। আমার আর উঠিতেও ইচ্ছা হইল না, কোথাও যাইতেও ভাল লাগিল না। উঠিয়া আলোটা পর্য্যন্ত জ্বালিতেও পারিলাম না।

ছোটদা বেড়াইয়া ফিরিল। বৈঠকখানায় পা দিয়াই কহিল,—"কি রে পঙ্কু, খাতাখানার জন্যে খুব কষ্ট হয়েছে, না? কি আর করবি বল্! সাহিত্য-কাননে ঢুকতে হ'লে অনেক কাঁটাই পায়ে বেঁধে, অনেক রকমের অনেক জ্বালাই সইতে হয়। তবুও ত সত্যিকারের লেখা এখনো লিখ্‌তে শিখিস্ নি,—নে, উঠে আলোটা জ্বাল্।" মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, গল্প-কবিতা এখন আর নয়, অন্ততঃ বছর দুই পরে যা হয় দেখা যাইবে। কিন্তু এখানে বলিয়া রাখাই ভাল যে, দুই বৎসর পরে ত নয়-ই, জীবন-পথের শেষের দিকে আসিয়া আজ দাঁড়াইলেও, এ রোগ এ পর্য্যন্ত আমাতে আর পুনরাক্রমিত হয় নাই। ব্যাধির সুরুতেই ব্যাধির শেষ হইয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, সময় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া খানিক পরে পড়িবার জন্য বই লইতে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিলাম, সদর খুলিয়া বিনুদা' হন্ হন্ করিয়া ছোটদার বৈঠকখানার দিকেই আসিতেছে। ঘরের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হয়েছে বিনুদা, অমন ক'রে আসছ কেন?"

কাছে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিনুদা' কহিল,—"অনুকূল মিত্তিরের বাপ হয়ে গেল, ছোটদা! আমাকে শ্মশানে যেতে হবে, তাই বলতে এলুম। বৌদিদের ব'লে দিস্ পঙ্কু, আমি খাবও না আর বাড়ীও রাত্রে আসব না" বলিয়াই বিনুদা' যেমন আসিয়াছিল—তেমনি হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

বিনুদা চলিয়া যাইবার মিনিট দশ বারো পরে পাড়ার গোবিন্দ কবিরাজ উগ্রমূর্ত্তি হইয়া আসিয়া

ছোটদার কাছে নালিশ করিল—"তোমার বিনুর কাণ্ডটা একবার দেখলে সুরেন! আমি হ'লুম জাত্-কোবরেজ, 'সূচিকা-ভরণ' কোথায় দিতে হয় না হয়, সে আমি বুঝবো, তুই আমার ওপর তম্বি চালিয়ে কায করাবি? আর তাই করিনি ব'লে ঘুসি পাকিয়ে মারতে এলি? একবার কর্ত্তার কাছে ব'লে যাই বিনের গুণাগুণটা! কর্ত্তা কোথায়, সুরেন?"

"বিনে ঘুসি তুলে আপনাকে মারতে এল, কোব্‌রেজ মশাই?

"তবে আর বল্‌ছি কি ছাই! জগবন্ধু মিত্তিরের তখন নাভিশ্বাস উঠেছে, তখন কি আর কোন ঔষধ-পত্তর খাটে। আর তোমার বিনে বলে কি না—সূচিকাভরণ দাও। আমি বললুম—তোরা আজকের ছোঁড়া, তোর কথা শুনে আমায় কাজ করতে হবে? রামরুদ্র গুপ্ত মড়াকে বড়ি খাওয়ালে মড়া উঠে বস্‌তো, তার পৌত্র আমি,—আমি তোর কথা শুনে কাজ করব, তুই হলি একটা কচি ছেলে! সূচিকা-ভরণ কোথায় কাজ করবে? না—

'সূচিকাভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সূচিকাগ্রেণ দাতব্যঃ সন্নিপাতকুলান্তকঃ' ॥"

ছোট্‌দা কহিল,—"তা, এর জন্যে বিনে আপনাকে ঘুসি মারতে গেল, কোবরেজ মশাই?"

চক্ষু কপালে তুলিয়া অপরূপ মুখভঙ্গীর সহিত গোবিন্দ কবিরাজ কহিল,—"মারতে গেল কি, সুরেন?—আর একটু হ'লে ত মেরেই বসেছিল? আর ওর হাতের এক ঘুসি খেলে আমার নাক-মুখের হাড় কি আর—" তার পর কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত নামাইয়া কহিল,—"এই সে দিন 'জীবন-নাস্তিক' খেলতে খেলতে হাত ভেঙ্গে যে এলি, পনর দিন ধ'রে পুরো এক বোতল মাষ-তেল মালিস ক'রে আমিই সে ভাঙ্গা হাত দিলুম ভাল ক'রে—ধরতে গেলে ও ত আমারি দেওয়া হাত! আর আমারই সেই হাতে ঘুসি পাকিয়ে আজ কিনা তুই আমাকেই মারতে এলি! এ কি কম দুঃখের কথা, সুরেন!"

যাহা হউক, গোবিন্দ কবিরাজের দুঃখের কথা শুনিবার অভ্যাস আমার খুবই ছিল, সুতরাং বসিয়া বসিয়া তাহা শুনিবার অপেক্ষা অনুকূল মিত্তিরের বাবাকে একবার দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা হইল এবং ছোট্‌দার অনুমতি লইয়া তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথেই 'বলহরি হরিবোল' ধ্বনি শুনিয়া বুঝিলাম যে, শব শ্মশানের পথেই লইয়া যাওয়া হইতেছে। বাড়ী না ফিরিয়া শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম।

শ্রীরামপুরের এক প্রান্তে গঙ্গার ঠিক উপরেই শ্মশান। তখন গঙ্গায় পরিপূর্ণ জোয়ার, কানায় কানায় জল টল টল করিতেছিল। শিরীষ-গাছের আড়ালে শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠিয়াছিল। জ্যোৎস্নায় গঙ্গার একূল-ওকূল, জল-স্থল, শ্মশান ও শ্মশানের চারিদিক্ তখন একেবারে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এক ধারে একটা চুলী হইতে কাহাদের একটা শ (শব), বোধ হয় অনেকক্ষণ হইতে জ্বলিয়া জ্বলিয়া তখন নিভিয়া আসিতেছিল। যাহাদের শ' (শব), তাহারা শিরীষ-গাছের তলায় বসিয়া মদ খাইতে খাইতে কি লইয়া বিষম বকাবকি সুরু করিয়া দিয়াছিল।

সকলের দিকে পিছন করিয়া একটু দূরে একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের নিম্নশ্রেণীর যুবতী চুলীর উপর কাঠ সাজাইয়া ছোট একটি ছেলেকে শোয়াইয়া অগ্নি জ্বালিবার আয়োজন করিতেছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গী আর কেহই ছিল না, চারি পাঁচ বছরের সেই ছোট ছেলেটিকে বোধ হয় সে একলাই বুকে করিয়া শ্মশানে আনিয়াছিল। বিনুদা' এক পা এক পা করিয়া তাহার কাছে গিয়া তাহার সঙ্গে কি দুই চারিটা কথা কহিল ও একখানি কাঠের চেলা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"পঞ্চু রে, ওদের ওই চুলী থেকে এই কাঠখানা ভাল ক'রে জ্বালিয়ে আনতে পারিস? আহা, একলা মেয়েমানুষ, কিছুতেই চুলী জ্বালাতে পারলে না!" কাঠখানা হাতে লইয়া কহিলাম,—"অন্য চুলীর আগুন নিয়ে ত ধরাতে নেই। ছেলেটি ওর কে বিনুদা?"

"ওরই ছেলে।"

"ওরই ছেলে! মা তার ছেলেকে নিজের হাতে পোড়াতে এনেছে!" হাতের কাঠ আমার হা'তেই রহিল, আর দেহটা আমার সঙ্গে সঙ্গে কাঠ হইয়া গেল!

"হ্যাঁ রে ভাই, ওরই ছেলে; মা'র অনুগ্রহ হয়েছিল, কেউ ছোঁয় নি; আহা!"

মুহূর্ত্ত পরে আমার কাঠের দেহে যখন চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন ভাবিলাম, যে স্থানে ইহার বাড়ী—সেখানে কি মানুষ নাই, সেখানের সকলেই কি পিশাচ? আর তাহারা মানুষই যদি হয়, ত, তাহাদের মাথায় পড়বার জন্য আকাশে কি বিধাতার বাজ নাই? বিনুদার দিকে চাহিয়া

জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা হয়ে কি ক'রে ও ছেলের মুখে—"

"আগুন দেবে বল্‌ছিস্? কি আর করবে বল্? মা হয়ে বুকে জড়িয়ে শ্মশানে ত ওকেই আনতে হয়েছে, চিতে সাজিয়ে তা'র ওপর শোয়াতেও হয়েছে; এখন যে কাজটুকু বাকী—সে আর কতটুকু? একবার একটু আগুন ধরিয়ে দিতে পারলে ওই একরত্তি ছেলেটা পুড়ে ছাই হ'তে কতক্ষণই বা আর লাগবে!" বলিয়া বিন্নুদা' কাঠখানি আমার হাত হইতে লইয়া পুনরায় সেই স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়া দাঁড়াইল; আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাইলাম। স্ত্রীকোকটীকে কহিলাম,—"তুমি বাড়ী যাও, যা করবার, আমরা করছি।"

স্ত্রীলোকটি কহিল,—"আমি যাব না।"

"তবে ঐ গঙ্গার কিনারায় ব'সে ব'সে গঙ্গা দেখ গে। এখান থেকে উঠে যাও, এ তোমায় দেখতে নেই।"

"এদ্দিন দেখে এখন দেখ্‌তে নেই? এখনই ত দেখবো বাবু! কেমন ক'রে আগুন দিতে হয়, আপনারা আমায় ব'লে দাও না, বাবু!"

এ যেন কে কাহাকে পোড়াইতে আনিয়াছে; এক বিন্দু অশ্রুও চোখ দিয়া গড়াইল না; কখনও যে গড়াইয়াছিল, তাহারও কোন চিহ্ন নাই। বড় বড় শুষ্ক চক্ষু দুইটির স্থির চাহনি, অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাকে ত মুখে আগুন দিতে আছে? বল না গো বাবু, আমি যে কিছু জানি না;—বাবু গো!"

আমি তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া সম্মুখস্থ গঙ্গার কিনারার দিকে টানিয়া লইয়া গেলাম ও সেইখানে একটা উঁচু ঢিপিতে ঘাসের উপর বসাইয়া দিয়া কহিলাম,—"নেহাৎই যদি ঘরে না যাও ত এইখানে তুমি ব'সে থাক।" তাহার পর চুলীর কাছে ফিরিয়া আসিলাম এবং প্রজ্বলিত খড়ের আঁটি হাতে লইয়া, মন্ত্রের বদলে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আমিই বালকটির মুখে আগুন দিয়া চিতায় অগ্নিসংযোগ করিলাম। আমার হাতের অগ্নি পাইয়া, কোন্ পূর্ব্বজন্মের আমার সেই পরমাত্মীয়ের ক্ষুদ্র চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! পিছন ফিরিয়া উঁচু ঢিবির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, স্ত্রীলোকটি সেখানে নাই; আমারই পিছনে দশ বারো হাত মাত্র দূরে সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল, যেন জ্বলন্ত চিতানলের সমস্ত শিখা তাহার চোখ দিয়া গিয়া তাহার বুকের মধ্যে সব জমা হইতেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সব শেষ হইয়া গেল! একটা চার বছরের রুগ্ন ছেলের সের চার পাঁচ হাড় পুড়িয়া ছাই হইতে কতক্ষণই বা লাগে, ঘণ্টা খানেকের ভিতরেই সব শেষ হইয়া গেল! ও-ধারে তখন অনুকূল মিত্তিরের বাপের চিতা সবে মাত্র ধরিয়া উঠিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটির কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এইবার কি করবে?" উত্তরে সে ঐ প্রশ্নই আমাকে করিল,—"কি করবো?"

"তোমার বাড়ী কোথায়?"

"পলাশতলা।"

শ্রীরামপুর সহরের একটু দূরে গঙ্গার ধারে এক স্থানে কয়েক ঘর কৈবর্ত্তের বাস ছিল, সেই স্থানটাকে পলাশতলা কহিত। কহিলাম,—"রাত বেশী হয় নি, চল, তোমায় তোমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।" উত্তরে কোন কথাই সে কহিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঘরে যাবে না?"

"না।"

"এইখানে থাকবে?"

"এখানে? না, এখানে আর থাকতে পারব না। কোথায় আমি যাব, বাবু?" শূন্যদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল।

কি বলিয়া আর ইহাকে সান্ত্বনা দিব? দেবতার এই বিরাট প্রবঞ্চনার পর, তাহার জননী-হৃদয় কিছুতেই যে আর প্রবোধ মানিবে না, তাহা বুঝিবার মত বয়স আমার হইয়াছিল, তাই সে দিকে চেষ্টা না করিয়া কহিলাম,—"তবে, তুমি আমার সঙ্গে এস, দুজনে স্নান ক'রে চল আমাদেরই বাড়ী যাই।" সহসা সে একবার ফোঁপাইয়া উঠিয়া জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে তার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিল। তার পর, নির্ব্বাপিত চুলীটির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আমার পশ্চাদনুসরণ করিল। চন্দ্র তখন শিরীষ গাছের অন্তরাল ছাড়িয়া মাথার উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল; গঙ্গার জলে অল্প অল্প ভাঁটার টান্ সুরু হইয়াছিল। অনেক দূরে

গঙ্গাবক্ষে জেলেরা ভাঁটায় মাছ ধরিতেছিল। তাহাদেরই একখানি জেলে-ডিঙ্গী হইতে কেহ তখন গান ধরিল—

"রিদয় ছিঁড়ে অক্ত-কমল
দিলেম আমি কালীর পূজায়,
তবুও যে গো সর্ব্বোনাশী
(ও তার) অক্ত-আঁখি ঘুইরে বেড়ায়।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"তার পর?"

স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে করিয়া সে রাত্রিতে আমাদেরই বাটীতে আনিয়াছিলাম। দুই দিন তাহাকে আমাদের বাটীতে রাখিবার পর, বর্দ্ধমান জেলায় ধুলোখালিতে তাহার বাপের কাছে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যাইবার পুর্ব্বদিন বৌদিরা তাহার নিকট হইতে তাহার দুঃখের কাহিনী বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিল। আমি এবং বিন্দুদাও সেখানে ছিলাম। শুনিতে শুনিতে বড়বৌদি জিজ্ঞাসা করিল—"তার পর?"

স্ত্রীলোকটি কহিল,—"তার পর বিধবা হয়ে বাপের কাছে ধুলোখালিতে চ'লে গেলুম। তখন খোকা আমার পেটে, সেইখানে গিয়েই খালাস হই। তার পর এই চার বছর সেই বুড়ো বাপের গলগ্রহ হয়েই ত ছিলুম। বাপের বাড়ীতে ত আর কেউই নেই মা, অথব্ব বাপ, খাটাখাটুনি খাটবার ত আর শক্তি নেই, কোন রকমে দু'পয়সা রোজগার ক'রে, এক বেলা রেঁধে তিন বেলা খেয়ে কষ্টে-স্বষ্টে এক রকম করে কাটাচ্ছিল। সেই অবস্থায় আমি গিয়ে পড়তে তাকে নাকালের একশেষ হ'তে হ'ল। আবার শুধু আমার পেটটিই নয়, ছেলেটাও ত ক্রমে বড় হয়ে উঠেছিল—দু'টি ভাত সে-ও ত খেতে আরম্ভ করেছিল।" বলিয়া আঁচল দিয়া খোকার মা তাহার চক্ষু মুছিতে লাগিল।

বড়বৌদি জিজ্ঞাসা করিল—'পলাশতলায় তোমার স্বামীর দু'এক বিঘে জমী-টমী ছিল না?"

"ছিল মা, দু'এক বিঘেই ছিল। তারই আশায় ত পাঁচ বছর পরে আবার এখানে ফিরে এলুম; ভাবলুম, ঐ দু'এক বিঘে জমিজমা যা আছে, তা বিক্রী-সিক্রী ক'রে বিশ-পঞ্চাশটা টাকা যা পাই, তাও যদি বুড়ো বাপের হাতে এনে দিতে পারি! এসে দেখলুম, ঘরখানা কোন-রকমে দাঁড়িয়ে আছে। তা'তেই মাথা গুঁজে এসে পড়লুম। জমীটুকুর সন্ধান করিতে গিয়ে শুনলুম গদাই দলুই সেটুকু দখল ক'রে নিয়ে ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছে। বলতে গেলুম, ঝাঁকি দিয়ে তেড়ে মারতে এল। ভয়ে পালিয়ে এসে নিজের ভাঙ্গা ঘরের দাওয়ায় ব'সে কাঁদতে লাগলুম, আর দেবতার কাছে নালিশ জানালুম। তা, দেবতার কি আর কাণ আছে মা, না তাঁর বিচার আছে, নইলে আমারই বুকের ওপর তাঁর হাতের শেল এমন ক'রে পড়ে কখন?"

বড়বৌদি কহিল,—"কাঁদিস্ না মা, কাঁদিস্ না। তার পর কি হ'ল?"

"তার পর, পাড়ার সকলের দোর দোর ঘুরলুম, কেউ যদি গদাই দলুইয়ের হাত থেকে জমীটুকু উদ্ধার ক'রে দেয়। কিন্তু কে দেবে মা? গদাই হ'ল পাড়ার মোড়ল, তারই বশ সকলে। কেউ কি আর আমার কথায় কাণ দিলে, সকলেই মুখ বাঁকিয়ে চ'লে গেল। তখন মরিয়া হ'য়ে একদিন গদাই দলুয়ের উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে খুব গালাগাল আর শাপ দিয়ে এলুম। গদাই তখন ঘরেতেই ছিল, চুপ ক'রে সব শুনলে, একটা কথাও কইলে না। সন্ধ্যার পর দাওয়ার ওপর চ্যাটাই বিছিয়ে খোকাকে নিয়ে শুয়ে আছি, গদাই আস্তে আস্তে উঠোনে এসে দাঁড়াল। ভয়ে চমকে উঠলুম। তার পর মুখ দিয়ে যে সব কথা উচ্চারণ করলে,—তা ছেলেরা এখানে রয়েছে, সে কথা আর কি করে বলি মা—শুনলে পরে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। উঠে যাবার সময় ব'লে গেল—'জমী ত দিয়ে দেবোই, তা ছাড়া তোকে গয়না-গাঁটি গড়িয়ে দেবো, ভাল ভাল কাপড় কিনে দেবো, তোর ভাঙ্গা ঘর সারিয়ে দেবো, দেখবি কত সুখে থাকবি তুই! দুদিন পরে আসব, ভেবে চিন্তে একটা জবাব দিস্।' ভয়ে, লজ্জায়, অপমানে তখন যেন আর আমার চৈতন্যই ছিল না। চোখ মেলে যখন চাইলুম, দেখলুম, গদাই চ'লে গিয়েছে। বেহুঁসের মত তেমনি শুয়ে শুয়েই ভগবানকে ডাকলুম,—"ঠাকুর, কেউ নেই আমার, তুমি আমার সব, তুমি আমায় রক্ষে কোরো, পাষণ্ডের হাত থেকে তুমি আমায় বাঁচাও, ঠাকুর'!"

"তার পরই বুঝি খোকার তোমার অসুখ করে?"

"না মা, তা হ'লে ত সোজাসুজিই হ'ত।

দুঃখের কি আর আমার অন্ত আছে মা? এখনও বরাতে যে কত দুর্দ্দশা আছে, তা ভগবানই জানেন," বলিয়া খোকার মা মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া নিজের মনে কহিল,—"আর ভগবান্ আমার কি-ই বা করবেন?"

ছোটবৌদি জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাপকে খবর দিয়ে সে সময় একবার আনলে না কেন?

"না মা, বুড়ো বাপকে যদি এই জন্যে আনাতুম, তা হ'লে ওরা গলা টিপেই তাকে মেরে রেখে দিয়ে যেত। পাড়াশুদ্ধু সব যে এককাট্টা মা। তাই, সেই রাতেই শুয়ে শুয়ে ভাবলুম, আর পলাশতলায় একটি দিনও থাকা নয়। খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখি, জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। সকালে উঠে, সেই জ্বর-গায়ে কোলে ক'রে সহরের মধ্যে চাকরী খুঁজতে এলুম। সে দিন আর কোন সুবিধে করতে পারলুম না, গোঁসাই বাবুদের মন্দিরে দু'টি পেসাদ খেয়ে সন্ধ্যার সময় আবার ঘরে ফিরে এলুম। ভয়ে ভয়ে সমস্ত রাত আর চোখে পাতায় এক করতে পারলুম না। তার পরদিনও কাজের চেষ্টায় বেরুলুম। সে দিন এক কাজ পেলুম। আমাদেরই গাঁয়ে পুজো করতে আসতেন, আমাদেরই ব্রাহ্মণ—চক্রবর্ত্তী মশাই, তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন,—'আমারই ত এক জন ঝিয়ের দরকার, তা তুই আমারই এখানে থাক'।"

বড় বৌদি কহিল,—"কে,—ওপাড়ার ওই—নাম ধরতে নেই ফারাণ চক্কোত্তি বুঝি?"

"হ্যাঁ মা, উনি হলেন আমাদেরই পুরুত ঠাকুর। ভাবলুম, ভালই হলো, ভাল জায়গাতেই আশ্রয় পেলুম। রোগা ছেলেকে নিয়ে সেই দিন থেকেই সেখানে থাকলুম। গোয়ালের পাশে কাঠ রাখবার ছোট একটু চালা ছিল, তাই ঘিরে ঘুরে পরিষ্কার ক'রে, সেইখানে রাত্রিতে আমাদের শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে। দিন পাঁচ সাত কেটে গেল। ছেলের আমার অসুখ দিন দিন বাড়িতেই লাগলো। কি জানি চোরা সান্নিপাতিক না কি হো'ল। বাছা আমার চোখ মেলে আর চাইলেই না, বেহুঁসের মত হয়ে ক'দিন ধ'রে পড়েই রইল। তার পর এক রাত্রিতে—রাত তখন অনেক—হঠাৎ কিছু একটার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল, মনে করলুম, গোয়ালে গোরুর পায়ের শব্দ। খানিক পরে বুকের ওপর কা'র হাত এসে পড়ল,—আঁৎকে উঠে আমি ব'সে পড়লুম। জাফ্‌রীর ফাঁকের জ্যোছনার আলোয় দেখি, চক্কোত্তি মশাই একেবারে আমার বিছানার ওপর! মাথা আমার ঘুরে উঠলো, শরীরটা যেন কি রকম হয়ে গেল! তখন চক্কোত্তি মশাই দু'হাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরেছে। চেঁচাতে গেলুম—গলায় রব ফুটলো না, মাথার ভেতরটা শিব্ শিব্ ক'রে উঠলো। তখন একটু সামনের দিকে স'রে গিয়ে, ঘুরে ব'সে চক্কোত্তি মশা'য়ের বুকের ওপর খুব জোরে মারলুম জোড়াপায়ের এক লাথি। কোথা থেকে যে তখন অত বল পেলুম, তা জানি না। দেখলুম চক্কোত্তি মশাই ছিটকে চালার বাইরে একেবারে ছাঁচতলায় গিয়ে পড়েছে। তার পর কি হ'ল, জানি না। জানলুম যখন, তখন দেখলুম খোকাকে কোলে ক'রে আমি রথ তলায় পথের ওপরে ব'সে আছি। ব'সে ব'সে কতখানাই যে ভাবতে লাগলুম! ভাবনাও যত হ'তে লাগলো, ভয়ও তত করতে লাগলো। সব চেয়ে ভয় হলো, বামুনের বুকে লাথি মেরে আমি কি করলুম, কি শাস্তিই না আমাকে এর জন্যে পেতে হয়! তা এখন দেখছি, ঠিকই হয়েছে মা, হাতে-হাতেই শাস্তি আমাকে ভগবান্ ত দিয়ে দিলেন।'

ছোটবৌদি' কহিল,—"দুটো ঘটনা সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছে ব'লে আজ তোমার মনে ও কথা উদয় হচ্চে। খোকা তোমার দু'এক বছর পরে মারা গেলে আর একথা ভাবতে না।"

"না মা, হতভাগী পাপিষ্ঠি আমি, এ ঠিকই বামুনের শাপেই—"

"ও কথা মনেই করো না। তোমার খোকার আর আয়ু ছিল না, তাই সে আর তোমার রইল না। আর বামুন 'তুমি কাকে বলছ? গলায় একগাছা পৈতে থাকলেই আর চক্কোত্তি হলেই কি বামুন হয়? তা হয় না মা, তা হয় না। অমন যে পাষণ্ড, সে কখনও বামুনও হয় না, আর তেমন বামুনের ঐ রকম কাজে তার বুকে একটা কেন, একশ' বছর ধ'রে অনবরত জোড়া পায়ের লাথি মারলেও তাতে পাপ হয় না। চিরকালই ত ওর স্বভাব ওই রকম। তার পর কি হ'ল?"

"তার পর অনেকক্ষণ ধ'রে খোকাকে তেমনি ক'রে কোলে ক'রে রথ-তলাতেই ব'সে রইলুম, আর আকাশ-পাতাল কতখানাই ভাবতে লাগলুম। সেই সময় ছেলের আমার অনবরত হিক্কে উঠতে

লাগলো। খানিক পরেই একবার খুব ছটফট্ করে বাছা আমার ঘুমিয়ে পড়লো। শেষ রাত্তির পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় সেইখানে ব'সে থাকবার পর হঠাৎ ভয় হ'ল যে, চক্কোত্তি মশাই এসে এখান থেকে যদি আমায় ধ'রে নিয়ে যায়! তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম। তখনও কাক ডাকে নি, লোক জাগে নি। বাছাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে গঙ্গার পথ ধ'রে চললুম। সমস্ত রাত্রির ঠাণ্ডা লেগে বাছার গা একেবারে হিম হয়ে গিছলো! কিন্তু তখন কি আর জানতে পেরেছি যে, ঠাণ্ডা-হিম মরা ছেলেকেই এতক্ষণ বুকে জড়িয়ে ছিলুম!" বলিয়া খোকার মা আবার আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

বিনুদা জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে যে তুমি সেদিন বল্‌লে যে, মার অনুগ্রহ হয়েছিল?"

"কি আর বলব বাবা আমার! সমস্ত দিন মরা ছেলেকে নিয়ে গঙ্গার ধারে ব'সে রইলুম, কত লোক এলো, কত লোক দেখে গেল, কিন্তু কেউ-ই ত কিছু করলে না, তাই সন্ধ্যা অবধি ব'সে থেকে, নিজের বুকের ধনকে নিজেই বুকে ক'রে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌লুম। ভগবান্ যেন সেদিনের মত এ দিনে আমায় কোথা থেকে বল দিলেন, নইলে আমি যে—"

সমস্ত শুনিয়া বিনুদা দাঁড়াইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোথায় যাবে বিনুদা?"

বড়বৌদি কহিল,—"জলখাবার দেবো, একেবারে খেয়ে বেরুবি বিনু!" বিনুদা কাহারও কথার জবাব না দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরই শুনিলাম যে, হারাণ চক্কোত্তীকে কে মারিয়া আধমরা করিয়াছে। রাতে বিনুদা বাড়ী আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কিছু শুনলে, বিনুদা?" বিনুদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, শুনে নাই এবং তাহার পরই এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার করিতে বসিল অর্থাৎ স্কুলের বইগুলি খুঁজিয়া লইয়া গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়িতে বসিল। সকালে কোন কোন দিন বিনুদাকে পড়িতে দেখিতাম বটে, কিন্তু রাত্রিতে এত চাড় করিয়া পড়িতে বসা,—শ্রীরামপুর আসিবার পর কোন দিনই আমি বিনুদার দেখি নাই। ধরিতে গেলে, বাড়ীতে বিনুদা একরকম পড়িতই না। পড়ার কথা তাহার মনে পড়িয়া যাইত স্কুলে আসিয়া এবং তাই, ঘণ্টা বাজিবার আগে ও টিফিনের ছুটীতেই বিনুদার যত পড়ার তাড়া লাগিয়া যাইত।

পরদিন প্রভাতে হারাণ চক্রবর্ত্তীর সকল সংবাদই জানিতে পারা গেল। তাহার বাড়ী চড়াও হইয়া তাহাকে কীল, চড়, ঘুসি মারিয়াছে, মাথার টিকি কাটিয়া দিয়াছে, ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কাপড়-চোপড় পৈতা ছিঁড়িয়া দিয়াছে এবং একখানা পা তাহার একবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং যে এই সকল কাণ্ড করিয়াছে, সে আর কেহই নহে—যে বিনুদা।

বড় জ্যেঠামহাশয় ও বড়দা' বাড়ী ছিলেন না, কি একটা বৈষয়িক কাজের জন্য দিন দুই হইল তাঁহারা বর্দ্ধমান গিয়াছিলেন, ফিরতে তাঁহাদের আরও দিন পাঁচ সাত বিলম্ব ছিল।

বড়বৌদি কহিল,—"বিনু, তুই শেষকালে হলি কি? মানুষ খুন আরম্ভ করলি?"

বিনুদা কহিল,—"করবে না ত কি? ও ব্যাটাকে খুন করতে পারলে তবেই ঠিক হ'ত!'

"আচ্ছা, তা তোর এত মাথা ব্যথা কেন?"

"আমার মাথা আছে, তাই মাথাব্যথা করে, আর কারও মাথা থাকলে ঠিকই তারও মাথাব্যথা করতো।"

বড়বৌদি রাগ করিয়া কহিল,—"তুই যা, এখান থেকে চ'লে যা, সেই কালীঘাট গিয়ে গুণ্ডোমী কর গে যা। দাঁড়াও, আজই আমি ঠাকুরপোকে দিয়ে সেখানে চিঠি লিখিয়ে দেওয়াচ্ছি! আচ্ছা তুই না ভদ্দরলোকের ছেলে?"

"ভদ্রলোকের ছেলে হতে পারি, বড়বৌদি, কিন্তু নিজে আমি মোটেই ভদ্রলোক নই, ভয়ানক অভদ্র।"

"কি বলছিস্ রে গাধা?"

হঠাৎ ছোটদা সেখানে পদার্পণ করিয়াই কহিল,—"গাধা কিন্তু কথাটা যা বলেছে তা মোটেই গাধার মত নয়, একেবারেই মানুষের মত। তোমাদের ভদ্র হওয়া মানে ত শান্ত শিষ্ট ভীরু এবং অক্ষম? অর্থাৎ বাইরে লোকের অত্যাচার সহ্য ক'রে এসে বাড়ীতে মেয়েদের কাছে খুব বীরত্ব প্রকাশ এবং পথে-ঘাটে অন্য জাতের কাছে লাঞ্ছনা খেয়ে, মুখ বুজিয়ে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে এসে বাঁচা।"

ছোটদার মুখের দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বড়বৌদি কহিল,—"তুমি আবার

কে গো—'বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে ?'—তুমি আবার কি কও ?"

"কই যে, বাঙ্গালীর অভিধান খুলে মিলিয়ে নাও, ভদ্রলোক মানে যা বললুম, তাই কি না। পথে-ঘাটে রেলে-ষ্টীমারে তোমরা যে যাও, কা'র ভরসায় ? জানবে যে, তোমাদের নিজেদের ভরসাতেই যাও। কেউ যদি হাত ধ'রে তোমাদের টেনে নিয়ে যায়, বাঁচাবার তোমাদের কেউ থাকবে না, বাঁচাও ত তোমরাই তোমাদের বাঁচাবে। লাঞ্ছনা, গালাগাল, অপমান, অত্যাচার, এমন ক'রে সহ্য করতে বুঝি জগতে আর কোন ভদ্রলোকরাই পারে না, বৌদি। একটা পাঞ্জাবী মেয়ের গায়ে একটা সাহেব হাত দিতে যা'ক দেখি, অমনি তা'দের পুরুষ তা'র কোমরের ছুরি খুলে কেমন না তাকে তেড়ে যায়! এক জন মারহাট্টার ওপর বিনা দোষে একটা গুর্খা এসে তার ভোজালি দেখিয়ে অত্যাচার ক'রে যাক্ দেখি, কেমন না সেই মারহাট্টা তার ভোঁতা নাকমুখকে একবারে থেঁতো ক'রে দিয়ে ছাড়ে!"

"তুমি যে যাত্রার দলের গায়েন হয়ে উঠলে, ঠাকুরপো ?"

"তবু ভাল বৌদি, ভদ্রলোক হয়ে উঠিনি। বাপ! ভদ্রলোক হ'তে হলেই গিয়েছিলুম আর কি। বিনে, খবরদার, কখন যেন ভদ্রলোক হয়ে যাস নি। আমাদের দেশের ভদ্রলোকদের, বৌদি, গুণ অগুণ.তি, ক'টা আর বলবো ? এরা আবার ধার্ম্মিক এমনি যে, ভারতের আর কোন জাতের মধ্যে এমন নেই। আর সকলে ধর্ম্ম করে ধর্ম্মের জন্যে, আর এরা ধর্ম্ম করে পরকে ফাঁকি দেবার জন্যে। সেই জন্য এদের পয়সা উপায়ের সমস্ত আয়োজনের পেছনে থাকে মস্ত এক ধর্ম্মের লেজুড়। পরণে গেরুয়া যদি দেখেছ আর মুখে হরি হরি শুনেছ, তাহলে কি আর রক্ষে আছে, দেশের যত ভদ্র-ভদ্রী অমনি ছুটে এসে পায়ের তলায় প'ড়ে লুটোপুটি! অন্য জাতের লোকেরা ভগবানকে পাবার জন্যে নিজেরা ডাকাডাকি করে, পরিশ্রম করে, এদের এতটা করবার শক্তি নেই, তাই এরা সাধুবাবার একটু পায়ের ধুলো বা একটুখানি ছাই-ভস্ম বা একরতি পুষ্প লাভ ক'রে রাতারাতি উদ্ধার হবার জন্য লালায়িত। এরা চায় ঠিক একেবারে যাকে বলে—ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ। সমস্ত জাতটার ভিতর ভীরুতারও যেমন অন্ত নেই, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মেরও তেমনই শেষ নেই। আমাদের মধ্যে, হরিকে যে যত কম জানে, মুখে হরি হরি তার ততই বেশী। এদের ফোঁটা, চন্দন, তুলসীর মালা আর টিকির বহরের সঙ্গে সঙ্গে এদের জুচ্চুরী, ঠকামী আর পিশাচবৃত্তি মাপ-কাঠিতে একেবারে ঠিক মাপা! এগুলো যেন এদের ফাঁকি-প্রবঞ্চনার জালের এক একটা গাঁট!"

বড়বৌদি চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তেমনই চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"আচ্ছা, ঠাকুরপো, সকলেই এই রকম ?"

"তাই কি আমি বলছি, বৌদিদি ? আমাদের ভেতর সত্যিকারের যারা ভাল, তেমন ভাল বুঝি কোথাও নেই, কিন্তু তা যে খুবই কম, বেশীর ভাগই ঐ তোমার হারাণ চক্রবর্ত্তীর মত জানবে। পাঞ্জাব যাও, বোম্বাই যাও, মাদ্রাজ যাও, সব যায়গাতেই দেখবে, জাতভায়ের ওপর পরস্পরের কত ব্যথা, কত সহানুভূতি। আর আমাদের ? আমরা অবশ্য সহানুভূতি পাই—সেটা আমাদের সুদিনে, কিন্তু দুর্দ্দিনে কোন অনুভূতিই আর আমরা হাতড়ে পাই না। ওই যে আগেই বলেছি যে, বেলকুল ফাঁকির ভিত্তির উপরেই আমাদের যা কিছু সব। দুঃখের কথা বলবো কি, বৌদি, ভদ্রঘরের ঝি-বৌদের পথে বেরোবার পর্য্যন্ত উপায় নেই। বেরিয়েছে কি হাজারটা কু-চোখের দৃষ্টি অমনই তা'দের ওপর এসে পড়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহ নিয়ে কি কুৎসিত আলোচনা! কি লাভ হয় এতে তাদের, জানি না, কিন্তু এই তারা করে। কিন্তু উন্নতিশীল, কাজের দেশের লোক যারা, তারা তাদের দেশের মেয়েদের ওপর এমন করে না। চীনেদের দেশে, সমুদ্রের উপর হাজার হাজার পান্‌সীতে সুন্দরী মেয়েরাই দাঁড় বেয়ে যাত্রী নিয়ে যায়, তাদের মাথা খোলা, বুক খোলা, বুকে কচি কচি ছেলে কাপড় জড়িয়ে বাঁধা, চুক্ চুক্ ক'রে দুধ খাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে কোন যাত্রীই হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে না। সে দাঁড় হাতে তার নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, যাত্রীরা তাদের কাজে থাকে, তার সঙ্গে একটা কথাও বলে না, নৌকা থেকে নামবার সময় খালি ভাড়াটা গুণে হাতে দিয়ে দিলে; সে সময় দু'জনের মুখে হয় ত একটু হাসি দেখা দেয়; কিন্তু সে হাসির ভেতর থাকে পবিত্রতা আর পরস্পরকে পরস্পরের একটু ধন্যবাদ জানান।"

ছোট-বৌদি সামনের ঘরেই দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, বড়বৌদি, তাহার দিকে চাহিয়া কহিল,—"ওলো ছোটবৌ, এই আমার যায়গায় এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুরপোর লেকচারগুলো শোন্, আমার এ সব বোঝবারও শক্তি নেই, শোনবার ও সময় নেই।"

ছোটদা কহিল,—"আমারও বেণাবনে মুক্তো ছড়াবার সময়ের অভাব বৌদি" বলিয়া ছোটদা চলিয়া গেল। ছোটবৌদি বাহিরে আসিয়া কহিল —"সত্যি, যা বল্‌লে, কথাগুলো সব ঠিক! চক্রবর্ত্তীর মত অমন বদ্ চরিত্তিরের লোক আর আছে না কি! বেশ করেছ ঠাকুরপো, মেরেছ।"

"তা হ'লে দেব-দেবী দুজনের একই কথা! তবে আজ থেকে, ছোটবৌ, বিনুর কাছ থেকেই পাঠ নিতে আরম্ভ কর" বলিয়া বড়বৌদি চলিয়া যাইতেছিল, বিনুদা তাঁহার পথ আগলাইয়া কহিল, —"সত্যি, বাবাকে এ সব লিখবে, বৌদি?"

"লিখবই ত!"

"তোমার পায়ে পড়ি বৌদি, লক্ষ্মীটি।"

"তা হ'লে আর এ রকম করবিনি বল্?"

"আচ্ছা, আর করব না।

"আমার পা ছুঁয়ে বল্।"

বিনুদা বড়বৌদির পা ছুঁইয়া বলিল, আর করিবে না। বড়বৌদি কহিল,—"এইবার থেকে আগডা-টাক্‌ডা বন্ধ ক'রে মন দিয়ে লেখাপড়া করবি বল্?"

"করব বৌদি।"

"করব বৌদি নয়, ঠিক করবি?"

"তোমার পা ছুয়ে বল্‌লুম বৌদি, এর ওপরও আবার ঠিক?"

"লক্ষ্মী ভাইটি আমার, আর কুসঙ্গে বেড়িও না। এখন ত আর ছেলেমানুষটি নও, এখন বড় হয়েছ, ওরকম মতিগতি ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে লেখাপড়া কর, সুবোধ সুশীল হও।"

"সত্যি বলছি বড়বৌদি, এইবার থেকে ঠিক সুবোধ সুশীল হব, ঠিক একেবারে দ্বিতীয় ভাগের সেই সুশীল বালকের মত, অর্থাৎ মন দিয়ে লেখাপড়া কোরব, কখন কাহাকে কটু কথা বলব না, কাহারও সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করবো না, কখন পরের দ্রব্যে হাত দেবো না, আর যখন বিদ্যালয়ে থাকবো, গুরুমশাই যাহা করিতে বলিবে, কদাচ তাহার অন্যথা করব না।"

ইহার পর হইতে সত্যই বিনুদা অতিমাত্রায় সুশীল বালক হইয়া পড়িল এবং সত্যই অনুকূল মিত্তিরের আখড়া পরিত্যাগ করিয়া অসীম উৎসাহ ও যত্নের সহিত পড়াশুনায় মন দিল। ফলে বৎসরখানেক পরে 'টেষ্ট' পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল, তখন দেখা গেল যে, বিনুদা স্কুলের মধ্যে প্রথম হইয়া পাশ করিয়াছে এবং তাহার পর নূতন আর এক দম লইয়া যে পড়িতে বসিল, সে দম ত্যাগ করিল একেবারে 'এন্‌ট্রান্স' পরীক্ষা দিয়া আসিবার পর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তখন চৈত্রমাসের শেষ। পাড়ার কৃষ্ণচূড়া গাছগুলি সব রাঙ্গা হইয়া উঠিয়া তাহাদের তলায় চারিদিক্ পর্য্যন্ত রাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে। অশোকের গাছে গাছে কাহারা যেন রংয়ের পিচকারী মারিয়া হোলী খেলিয়া গিয়াছে। কাল কোকিল লালের এত ছড়াছড়ি সহ্য করিতে না পারিয়া গায়ের জ্বালায় গাছে গাছে ডাকিয়া সারা হইতেছে। তাহাদের সে ডাককে ছাপাইয়া, পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে তখন চড়কের ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছিল, আর সেই শব্দে মনের ঢাকেও যেন কি এক বৈচিত্র্যের কাঠি পড়িয়া মনকে নাচাইয়া দোলাইয়া দিয়া যাইতেছিল।

আমাদের পরীক্ষা দেওয়া হইয়া গিয়াছিল। চৈত্রমাস বলিয়া জ্যেঠামহাশয় আমাদের কালাঘাট লইয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। বৈশাখের প্রথমেই আমরা কালীঘাট চলিয়া যাইব।

এমনই সময়ে এক দিন ছোটদা কহিল,—"কাল তারকেশ্বরে গাজনের মেলা দেখ্‌তে যাব, তোরা যেতে চাস্ না কি?"

কহিলাম,—"তোমার বড় অন্যায়, ছোটদা, যেতে চাই কি না, এ আবার তুমি জিজ্ঞাসা করছ?"

পরদিন নয়টার মধ্যে আহারাদি সারিয়া লইয়া আমরা তিন জনে তারকেশ্বর যাত্রা করিলাম। সেখানে পৌছিয়া, লোকের ভীড় দেখিয়া মনে হইল যে, বাঙ্গালাদেশের সমস্ত লোকই বুঝি সে দিন তারকেশ্বরে আসিয়া জড় হইয়াছে। সমস্ত দিন উৎসব ও মেলা দেখার আনন্দে কাটাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই জন-সমুদ্রের মধ্য

দিয়া ষ্টেশনের পথে আসিতে আসিতে ছোটদার সহিত তাহার অনেক দিনের এক বন্ধুর দেখা হইল। পথের এক ধারে দাঁড়াইয়া ছোটদা তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিল দেখিয়া আমরা পথের ওপাশে এক পাঁচ-পা-ওয়ালা গরু দেখিবার জন্য সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলাম। মিনিট দুই চারি পরে ফিরিয়া দেখি, যেখানে দাঁড়াইয়া ছোটদা কথা কহিতেছিল, সেখানে আর ছোটদা নাই। সেই জন-স্রোতের ইতস্ততঃ চারিদিকে চাহিয়া খুঁজিলাম, ছোটদাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। কিছুদূর পর্য্যন্ত আগাইয়া গেলাম, তাহার সন্ধান করিতে পারিলাম না। আবার অনেকটা পিছাইয়া আসিয়া খুঁজিলাম, তবুও তাহাকে পাইলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন আশে পাশে চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিতেছিল। রাত প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত এই ভাবে ষ্টেশন হইতে মন্দির এবং মন্দির হইতে ষ্টেশন ছোটদাকে খুঁজিয়া ফিরিলাম, কিন্তু কোন স্থানেই তাহাকে আবিষ্কার করিতে না পারিয়া শেষে উভয়ে ক্লান্ত হইয়া মাঠের উপর একটা বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলাম।

যেখানে গিয়া আমরা বসিলাম, তাহার অদূরেই কতকগুলি গেরুয়াধারী ভীড় জমাইয়া গান গাহিতেছিল। বিমুদা কহিল,—"চ, ঐখানে ব'সে ব'সে গান শুনি গিয়ে, ছোটদার সঙ্গে আর কখনও কোথাও আসা নয়।"

তখন লোকের ভীড় ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। যাহারা গান করিতেছিল, তাহারা সংখ্যায় ছিল ছয় জন। হাত পাঁচ সাত লম্বা একখণ্ড মোটা বাঁশের বাখারির শীর্ষদেশে ছোট একখানা সাইনবোর্ড বাঁধা, আসরের মাঝখানে মাটিতে পোতা ছিল। সাইনবোর্ডখানিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল,—"শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ সমাজ।" তাহার নীচে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা ছিল,—"শ্রীগৌরাঙ্গের সেবায় যথাসাধ্য দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করুন।" 'গৌরাঙ্গ'দের সকলকারই গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। জন দুই তিন ছাড়া আর সকলেরই বুকের উপর লম্বা দাড়ি ঝুলিতেছিল এবং সে দাড়ি তাহাদের দেহের মতই শীর্ণ, শুষ্ক এবং বিবর্ণ। প্রত্যেকেরই পরনে গেরুয়া এবং মাথায়ও তাহাদের গেরুয়ার একখানি করিয়া চাদর জড়ান, তবে তাহা এতই ময়লা যে, তাহা আর বলিবার নহে।

সকলেই দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া গান করিতেছিল। একজনের কোমরে গলার সহিত টানা দিয়া একটা হার্ম্মোনিয়ম ঝুলিতেছিল। শ্রোতৃগণের ভিতর হইতে যাহারা ধর্ম্মার্থে 'যথাসাধ্য দিয়া পুণ্য সঞ্চয়' করিতেছিল, তাহাদের দেওয়া পয়সাগুলি আসিয়া সম্মুখের একখানা বিছান গেরুয়া চাদরের উপর জমা হইতেছিল। গান শেষ হইলে একে একে শ্রোতারা যখন চলিয়া গেল, তখন শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গরা বসিয়া সারাদিন উপার্জ্জনের সেই পয়সাগুলি গণিতে লাগিল। সেই সময় একজন আমাদের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তোমাদের বাড়ী কোথায় গা বাবুরা?" বিমুদা কহিল,—"আমাদের বাড়ী এখান থেকে দু' ক্রোশ দক্ষিণে, হরিহরপুর। যাত্রার দলে চাকরী করবো ব'লে বেরিয়েছি।" যে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতেছিল, সে তাহার গেরুয়া চাদরে মুখের ঘাম মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কি গান গাইতে পার?"

বিমুদা কহিল,—"গাইতে শুধু আমিই পারি, আর ও বক্তৃতায় পাকা। শিবুহাটির দলে ও বরাবর কেষ্ট সাজতো। তবে সঙ্গে গেয়ে যেতে পারবে।" যে কষ্টে হাসি চাপিয়াছিলাম তাহা ভগবানই জানেন। সে লোকটি বলিল,—"ভাল ভাল। আচ্ছা, কি গান জান গাও দেখি এক-খানা" বলিয়া সে হার্ম্মোনিয়মে খুব মৃদু সুর দিতে লাগিল। বিমুদা একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই গান ধরিল,—

"কানাই, কি ভেবে তুই গৌর হলি
তাই আমারে বল্।
ওরে, ব্রজের লোকে পাগল যে সব—
নদে ছেড়ে চল্॥"

সকলেরই মনোযোগ তখন আমাদের দিকে আকৃষ্ট হইল। বিমুদা গাহিতে লাগিল,—

"বুঝি মা যশোদা অনাহারে,
আছেন ব'সে পথের ধারে,
ধবলী-শ্যামলী আজও ফেলছে চোখের জল॥"

গান শেষ হইলে, একজন কহিল,—"যাত্রাদলের চেয়ে তোমরা আমাদের কাছেই কাজ কর না কেন?"

বিমুদা কহিল,—"তা করলেও পারি, এখানে মাইনে কত পাব?"

"এখানে মাইনে হিসাবে কাজ নয়। রোজ যা উপায় হবে, তার সিকি যাবে হেড্ আফিসে, বাকী

বারো আনার মধ্যে খেয়ে দেয়ে যা থাকবে, সেইটে আমাদের ভেতর ভাগ হবে।”

আমি কহিলাম—“সমান ভাগ?”

“তা কি হয় কখনো! যারা নূতন, তারা ভাগে কিছু কম পাবে। তা’ তোমরা যদি মন লাগিয়ে থাক এইখানে, তা খাওয়া-দাওয়া বাদে পাঁচ ছ’টাকা ক’রে তোমাদের যে এখন পোষাবে, তার আর ভুল নেই। একটু পুরাণো হ’লে আরও বেশী হবে। আর বেশী হওয়া না হওয়া সেটা ত আমাদের ওপর নির্ভর করছে কি না। যত ঘুরতে পারবো, ততই উপায় বেশী হবে! ফি দলে আমাদের আট জন ক’রে থাকা নিয়ম। আট জনই আমরা ছিলুম।”

বিনুদা জিজ্ঞাসা করিল—“আর দু’জ’ন বুঝি ছেড়ে গেছে।”

একটা ছোট্ট খেলো হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে একজন কহিল,—“হ্যাঁ, একেবারে জন্মশোধ” বলিয়া হু-হু করিয়া হাসিতে লাগিল। যে বিনুদার সহিত কথা কহিতেছিল, সে কহিল,—“নবাবগঞ্জের মেলা থেকে আসতে আসতে পথে তাদের দু’জনেরই হ’ল কলেরা, তাইতে দু’জন সেই পথেতেই—”

ওদিকে এক জন তখন মাটীর কলসীতে সিদ্ধির সরবৎ প্রস্তুত করিতেছিল। সিদ্ধিটা বোধ হয় পূর্ব্বাহ্নেই বাটা ছিল, এখন শুধু তাহাতে জল ও মিষ্টি মিশাইয়া ঢালাঢালি করা হইতেছিল। সরবৎ প্রস্তুত হইলে সকলেই এক এক গ্লাস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। আমাদের দিকেও এক গ্লাস আসিল। জার্ম্মাণীর তৈরী পাতলা পিতলের চাদরের সেই গ্লাসটি আমাদের সামনে রাখিয়া এক জন কহিল,—“দুজনে ভাগাভাগি ক’রে একটু খেয়ে ফেল, পরিশ্রমের পর শরীর সুস্থ হ’বেখন,—ঘুম হবে, ক্ষিধে হবে—”

বিনুদা কহিল,—“সমস্ত দিন পেটে কিছু পড়েনি, ক্ষিধে ত এখনই ভয়ানক—”

“পেয়েছে? আচ্ছা, আনা দুয়েকের কিছু মিষ্টি এনে খাও তোমরা। দাও ত হে মাইতির পো, দু’আনা পয়সা দিয়ে দাও।—তা হ’লে, দলে থাকাই তোমারের ঠিক ত? মন দিয়ে থাক—দেখবে উন্নতি হয়ে যাবে।”

বিনুদা কহিল—“উন্নতির আশা যখন আছে, তখন এইখানেই আমরা থাকবো। তা হ’লে এখান থেকেই ত আমরা বহাল হব, না হেড্ আফিসে লিখতে-টিকতে হবে?”

“কিচ্ছু না; এখানকার চার্জ্জ ত আমার ওপরেই কি না! আমাদের একুশটা দল আছে, একুশ যায়গায় ঘুরছে। সব দলেতেই এক এক জনের ওপর চার্জ্জ থাকে।”

যাহা হউক, বিনুদা উঠিয়া যাইয়া রাস্তার ওদিক্‌কার একখানি দোকান হইতে কচুরীতে ও মিষ্টিতে মিলাইয়া দু’আনার খাবার কিনিয়া আনিল কিন্তু সমস্ত দিনের পর যে রকম ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাহাতে দু’আনার খাবারেই বা কি হইবে—চার আনার খাবারেই বা কি হইবে—তবে, রাত্রির আহারের জন্য ফলাহারের যে আয়োজন দেখিলাম, তাহাতে তখনকার সেই দু’আনাতেই মনকে বুঝাইয়া ভবিষ্যতের আশায় অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

বিনুদার পীড়াপীড়িতে সিদ্ধি অবশ্য এক চুমুক খাইতে হইল। বাকী প্রায় একটি গ্লাস সিদ্ধি বিনুদা’ চোঁ চোঁ করিয়া শেষ করিয়া রাখিল। মোট কথা, আমরা দলভুক্ত হইয়া গেলাম।

ঘণ্টাখানেক পরেই ফলাহারের ব্যবস্থা যাহা হইল, তাহা প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, তাহার নিন্দা করা চলে না। দই, চিঁড়া, কলা, চিনি এবং তৎসঙ্গে আর একটি দ্রব্য মিশিয়া ফলাহারের যে উপাদেয়ত্ব এবং নূতনত্ব উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা নারিকেল-কোরা। সুতরাং মন্দ কি করিয়া বলা যায়?

ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শীর্ণকায় যে লোকটি, তাহার একটি পায়ে প্রকাণ্ড গোদ ছিল। খাইতে বসিয়া সে ছোট্ট একটি শালপাতার ঠোঙ্গা হইতে এক রত্তি ঘি আঙ্গুলে চাঁচিয়া লইয়া ফলাহারের সহিত মাখিয়া লইল। তাহার পাশে যে বসিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল,—“পাড়ুইয়ের আমাদের ঘিটুকু খাওয়ার কামাই নেই! কিন্তু ফলারের সঙ্গে ঘি, এ বাবা এই নতুন দেখলুম!”

ফলাহার মাখিতে মাখিতে পাড়ুই কহিল—“মুরুক্ষ তোমরা, জানবা ক্যামনে? ঋণং কিরিত্বোয়া গ্রেতং পিভেৎ। তা’ কাঁচা খাও, বাক্কে খাও,—খালেই অইল। গ্রেত না খাবা ত শরীলে কি ছাই তাওৎ পাবা?”

ঘৃত খাইয়া খাইয়া পাড়ুইয়ের শরীরে তাকত্ যাহা হইয়াছিল, তাহা দেখিলে কিন্তু চম্‌কাইয়া উঠিতে হয়। ঘৃতের লোভে তাহার শরীরের সর্ব্ব-স্থানের মাংস, হাড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উদরে

আসিবার পথে, বোধ হয়, পথ ভুলিয়া সব ওই একটি পায়ে আসিয়া তাহার জমা হইয়াছিল এবং উদরটিও অধিকারীর বিনানুমতিতে সম্মুখের দিকে খুব বেশী রকম অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল।

আহারান্তে শুইবার আয়োজন হইল। পার্শ্বেই কাহাদের একখানি দরমা দিয়া ঘেরা চালা ছিল, সেইখানেই সারি সারি আট জনের শয্যার ব্যবস্থা হইল। ব্যবস্থা আর কি,—এক এক জন এক একখানি ময়ূর-মার্কা ময়দার থলিয়া পাতিয়া তাহারই উপর নিজেদের সেই গেরুয়ার উত্তরীয়, যাহা গানের সময় সকলের মাথায় উঠিয়াছিল, তাহাই বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। ছোট ছোট বালিস অবশ্য সকলেরই একটা করিয়া ছিল। আমরা একখানিমাত্র থলিয়া পাইলাম। ইন্‌চার্জ্জ কহিল,—"কাল তোমাদের আর একখানা ক'রে থলিয়া দেওয়া হবে, আর চাদর কাপড়ও রং ক'রে দেবার ব্যবস্থা হবে। আজকের রাত্তিরটা ঐতে কোন রকমে দু'জনে কাটিয়ে দাও।"

বিনুদা কহিল,—"আপনারা শোন—আমরা একটু বাইরে থেকে আসছি।"

"এখন আবার বাইরে কেন? রাত হয়েছে, শুয়ে পড়; আবার ভোরে উঠ্‌তে হবে।"

সেই মাইতির পো কহিল,—"টুক্‌টু-টুক্‌টু একটু খাবে আর কি। তা, এখানেই খাও না তোমরা, তাতে কোন দোষ নেই।"

ইনচার্জ্জ কহিল,—"আচ্ছা যাও—যাও, শীগ্‌গির এস।"

কথা কহিতে না পারিয়া আমার পেট ফুলিয়া উঠিতেছিল। বাহিরে আসিয়া বিনুদা'কে কহিলাম, —"তুমি কি বল দেখি? এই বিদেশে এমন এক বিপদে পড়লুম, সে সব দুশ্চিন্তা তোমার কিচ্ছু নেই, তুমি কি না—"

"দুশ্চিন্তা ক'রে আর করবি কি? কাছে ত আর পয়সা কড়ি কিছু নেই যে, শ্রীরামপুরের টিকেট ক'রে চ'লে যাব। ছোট্‌দার আক্কেলটা একবার দেখলি ত?"

"তোমার আক্কেলেরই বা কসুর কি? যা'ক, এখন তা হ'লে কি করবে? একটা কিছু উপায় করতে হবে ত? না, সিদ্ধি খেয়ে, ফলার খেয়ে আর গেরুয়া প'রে গান গেয়ে এই কেষ্ট-গৌরাঙ্গের দলে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে?"

"আরে, আজ এই রাত্রে যেখানে হোক এক যায়গায় শুতে হবে ত? কিছু খেতেও ত হবে। তা,' এ কি মন্দটা আর হোল?"

চালার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, মাইতির পোর সঙ্গে আর ইন্‌চার্জ্জের সঙ্গে ভয়ানক বকাবকি হইতেছে। ইন্‌চার্জ্জ কহিতেছে,—"কলিতে কি কারোর ভাল কত্তে আছে? খেতে পেতিস্ না, এখানে এনে ঢুকিয়ে দিলুম, এখন আমায় চোখ রাঙ্গাবি বৈ কি! আমি হলুম এ দলের হেড্।—আমি যদি দু'এক টাকা এদিক্ সেদিক্ ক'রে নিই, তাতে তোর চোখ টাটাবে কেন? তাও যে নি, তোদের ভাগ তোদের ষোল আনা দিয়ে, তবে নি। একুশটা ত দল আছে, খবর নিগে যা,' কোন্ দলের হেড্ এ কাজ না করে। এই, তুই যে কৈবর্ত্ত হয়ে বামুনের মেয়েদের সব পায়ের ধুলো দিচ্ছিস্,—তাদের কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছিস, তা তার ওপর আমি কোন দিন লোভ করেছি?"

"আমি একলাই এ কাজ করি, আর কেউ করে না?"

"করুক না। যে যা পারে, উপায় ক'রে নিক্ না, তাতে আর কারো হিংসে করলে চলবে কেন?"

মাইতির পো ইহার পর আর কোন উত্তর করিল না। খানিক পরে সকলেরই নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল।

পরদিন প্রত্যুষে ইন্‌চার্জ্জ বিনুদাকে কহিল,—"আমরা এখনি গান আরম্ভ কোরবো। সকাল সকাল আজ রান্না-বান্না সেরে খেয়ে দেয়ে নিয়ে, ওবেলা সব আজ চ'লে যেতে হবে।"

বিনুদা জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাবেন?"

"ত্রিবেণীর মেলায় যেতে হবে। সেখানে ৫।৭ দিন চলবে। তোমাদের কাপড় চাদর সেইখানে গিয়ে সব ছুবিয়ে দোব। এখন তোমরা দু'জনে একটা কাজ করে রাখ্‌তে পারবে?"

"কি কাজ? পারব না কেন?"

"আর কিছু নয়, বাজারটা ক'রে রাখবে' বলিয়া দুইটা টাকা বিনুদার হাতে দিয়া বলিল,—"আট আনার চা'ল নেবে, ভাল শোল মাছ কি অন্য কোন মাছ যা পাও সেরখানেক, আর আলু, পটল, ঝিঙ্গে,—যা পাও। কাঠ দু'আনার, বাতাসা আধ্‌সের, পারবে ত?"

বিনুদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে পারিবে।

"বাজার-টাজার করা অভ্যেস আছে ত? দর ক'রে কিনতে পারবে?"

"খুব পারবো, বাড়ীতে বাজার-হাট ত আমিই করি।"

"বেশ, বেশ" বলিয়া ইন্‌চার্জ্জ কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিল।

খানিক পরেই শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ সমাজের গান আরম্ভ হইলে, বিনুদা আমাকে টানিয়া বাজার করিতে বাহির হইল এবং বাজারের বদলে বরাবর ষ্টেশনে আসিয়া শ্রীরামপুরের দুইখানি টিকিট কিনিয়া প্লাটফর্ম্মে দণ্ডায়মান ট্রেণের একখানি কামরার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া কহিল,—"খবরদার, গাড়ী থেকে এখন আর নাবিসনি যেন, বেটারা যদি দেখতে পায়, তা হ'লেই আবার—। গাড়ীটা ছাড়বে কখন, একবার জেনে এলে হ'ত।"

আমি গাড়ীর জানালা দিয়া সেই সময় দেখিতে পাইলাম ছোটদা প্লাটফর্ম্মের একধারে দাঁড়াইয়া চারিদিকে কি যেন খুঁজিতেছে। "ঐ যে ছোটদা' বলিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে যাইতেছিলাম, বিনুদা এক হ্যাচ্‌কায় বসাইয়া দিয়া কহিল,—"গাড়ী থেকে নামিস নি, এইখান থেকে চেঁচিয়ে ডাক্।"

তাহাই ডাকিলাম। ছোটদা গাড়ীর ভিতর উঠিয়া আসিয়া কহিল,—"আচ্ছা ছেলে ত তোরা! সমস্ত রাত খুঁজে বেড়িয়েছি, কোথা ছিলি বল ত?"

আমি কহিলাম,—"আচ্ছা ছেলে আমরা না তুমি, ছোটদা? রাত দশটা পর্য্যন্ত তোমায় খুঁজে খুঁজে—"

"আচ্ছা, সে সব হবে'খন। দাঁড়া, টিকেট তিনখানা আগে কিনে নিয়ে আসি, গাড়ী ছাড়বার আর দেরী নেই।"

বিনুদা কহিল,—"আমাদের টিকেট কিনেছি ছোটদা, খালি তোমারটা কিনে নিয়ে এস।"

"তোদের টিকিট কিনেছিস্ কি রকম! টাকা দিলে কে?"

"শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ।"

"শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ?"

"হ্যাঁ। তুমি টিকিট কিনে নিয়ে এসো, সে সব বলব এখন।"

অতঃপর ছোটদা গাড়ী হইতে নামিয়া টিকিট কিনিতে চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বোধ হয়, বাঙ্গালা স্কুলে পড়িবার সময়েই একদিন পণ্ডিত মহাশয় আমাদের 'স্বাস্থ্যে'র পড়া দিয়াছিলেন—পাঁচ পাতা! তাহাতে ক্লাসশুদ্ধ সব ছেলেই আমরা হৈ-চৈ করিয়া উঠিয়াছিলাম যে, পাঁচপাতা আমরা কিছুতেই মুখস্থ করিতে পারিব না। সকলের প্রতিবাদে পণ্ডিতমশাই তখন বলিয়া দিলেন—ঐ পাঠ সংক্ষেপে মুখস্থ করিতে। আমরা বলিলাম যে, সংক্ষেপেও আমরা পারিব না, পাঁচ পাতার সংক্ষেপ আর কতই হইবে, না হয় তিন পাতা কি আড়াই পাতা, অন্ততঃপক্ষে দুই পাতা ত বটেই! অবশেষে পণ্ডিত মশাই বলিয়া দিলেন যে, খুব সংক্ষেপ করিয়া লইয়া মুখস্থ করিলেই হইবে এবং তাহার পর আমাদের সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি নিজেই ঐ পাঁচপাতার সংক্ষিপ্তসার করিয়া আমাদের সকলকে যাহা লিখাইয়া দিলেন, তাহা এই:—'প্রত্যহ প্রভাতে একবার ও রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে একবার, এই দুইবার করিয়া দাঁত মাজিতে হয়! দাঁত মাজিবার পক্ষে দাঁতনই শ্রেষ্ঠ এবং দাঁতনের মধ্যে নিম্বই শ্রেষ্ঠ এবং খাদ্যদ্রব্যাদি খুব চিবাইয়া খাওয়া উচিত।' অনেক দিন পরে আমাদের পণ্ডিত মশায়ের সেই সংক্ষিপ্তসারের কথা আজ আমার মনে পড়িল। আমিও আজ আমাদের শ্রীরামপুর-ত্যাগের পর হইতে আট দশ বৎসরের ঘটনাবলীর কথা সম্বন্ধে এরূপ সংক্ষিপ্তসার করিয়া লইব এবং তাহা করিয়া লইতে হইলে এইটুকু আমাকে বলিলেই চলে যে, বিনুদা ও আমি উভয়েই বি-এ পাশ করিয়া মা সরস্বতীর এলাকা ত্যাগ করিয়াছি, ঠাকুরমা ও বাবা গত হইয়াছেন, জ্যেঠামহাশয় আমাদের উপর সংসারের ভার ফেলিয়া দিয়া কয়েক বৎসর হইতে কাশীবাস করিতেছেন। মা কখনও কালীঘাট, কখনও রায়পুকুর, কখনও বা কাশী, এই করিয়া বেড়াইতেছেন, আমাদের উভয়েরই বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু আমার বৌদিদি অর্থাৎ বিনুদার স্ত্রী বিবাহের বৎসর দুই তিন পরেই একটি কন্যা প্রসব করিয়া আজ চারি পাঁচ বৎসর হইল মারা গিয়াছে। তখন হইতে বিনুদাকে সকলে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে জিদ করিলেও বিনুদা আর বিবাহ করে নাই, তৎপরিবর্ত্তে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী এক গুরুর শিষ্য হইয়া দুই বেলা জপ-তপ সুরু করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে সংসার ত্যাগ

করিয়া বিবাগী হইয়া যাইবারই সকল সম্ভাবনা তাহাতে যে বর্ত্তমান, তাহা তাহার এখনকার কার্য্যাবলী দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ প্রত্যহ সকালবেলা কুস্তি করিয়া উঠার পর ধূলিধূসরিত অঙ্গে যোগাসনে বসিয়া যখন তাহার বাদামের সরবৎ সেবনের আয়োজন হয়, তখন তাহাকে দেখিলেই পরমহংস যোগিবর ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না এবং সে সময়ে শ্রীমদ্ বিনোদানন্দ স্বামী বলিয়া দুই হাতে কবচ বিতরণ করিলেও কাহারও তাহার উপর কোন রকম সন্দেহ করিবার কিছু থাকে না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমাকে জলখাবার দিয়া আমার স্ত্রী সন্ধ্যা সামনে আসিয়া বসিয়া কহিল,—"পাশের বাড়ীর সেই লোকটা আজও আবার সকালে ছাদে বেড়াতে বেড়াতে সেদিনকার মত চেয়ে চেয়ে হাসছিল।"

"লোকটার স্বভাবচরিত্র ত তা হ'লে বড্ডই খারাপ দেখছি। ও ওদের কে বল দেখি ?"

"বোধ হয় গিন্নীরই ভাই-টাই কেউ হবে, কর্ত্তার অসুখে দেখতে এসেছে।"

"ওর নিজেরও ত দেখছি মহা-অসুখ এবং সে অসুখে আমাদেরও যে ওকে একটু দেখবার দরকার হয়ে উঠলো।"

কথাটা ও-ঘর হইতে বিনুদা শুনিতে পাইয়াছিল, হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে রে, পঞ্চু ?

"পাশের বাড়ীর সেই লোকটা।"

"আজও আবার কিছু করেছে না কি ?"

"তাই ত শুনছি।"

শঙ্করমাছের লেজের চাবুকগাছটা হাতে লইয়া বিনুদা বরাবর নীচে নামিয়া গেল। সন্ধ্যা কহিল,—"ও কি গো! বড় ঠাকুর চাবুক নিয়ে গেলেন যে, মারবেন না কি ? যাও—যাও—ফিরিয়ে নিয়ে এস, ভাল ক'রে ওদের বুঝিয়ে বল্‌লেই ত হবে।" জল খাইয়া একটু পান মুখে দিয়া তাড়াতাড়ি আমি নীচে নামিয়া আসিলাম।

পাশের প্রকাণ্ড বাড়ীখানা জোড়াসাঁকোর মিত্তিরদের সম্পত্তি, বরাবর ভাড়া দেওয়াই থাকে। মাস দুই তিন হইল, নূতন ভাড়াটিয়া যিনি আসিয়াছেন, তিনি একজন পেন্‌সানভোগী সাবজজ্। ইহারা স্বামি-স্ত্রী দুই একজন দাস-দাসী লইয়া এই বৃহৎ বাটীখানি অধিকার করিয়া আছেন। শুনিয়াছি কর্ত্তার ছেলে নাই, একটিমাত্র কন্যা আছে, কিন্তু সে পিতার নিকট থাকিত না, কাশী না কোথায় ঐ দিকে মামার কাছে থাকিত।

নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম, চাবুকগাছটি হাতে করিয়া বিনুদা বরাবর ইহাদেরই বাড়ীর অভিমুখে যাইতেছে। আমিও পিছু পিছু যাইলাম এবং লোহার ফটক ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। বাহিরের ঘরখানি খোলাই ছিল, প্রবেশ করিতেই একটি আঠার-উনিশ বৎসরের মেয়ে ভিতর হইতে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বিনুদার দিকে চাহিয়া কহিল,—"শিকার কিন্তু আপনার পালিয়েছে। চাবুক নিয়ে আমার মামাকে মারতে এসেছেন ত ? তিনি এতক্ষণে বাংলাদেশের মাটী ছাড়িয়ে বোধ হয় সাঁওতাল পরগণায় গিয়ে পড়লেন। বসুন," বলিয়া গোল টেবিলের পাশের চেয়ার দুইখানি একটু টানিয়া দিল।

মেয়েটি শ্যামবর্ণা, কিন্তু চেহারায় তাহার এমন কিছু একটা জিনিষ ছিল যে, বার বার তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে। মেয়েটি বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, কি বিধবা, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। অবিবাহিতা খুব সম্ভব নহে। কারণ, হিন্দুর ঘরে আঠার-উনিশ বছরের মেয়ে অবিবাহিতা প্রায়ই থাকে না এবং ইহারা যে হিন্দু, তাহার পরিচয়ও পাইয়াছি; কয়েক দিন পূর্ব্বে রুগ্ন সাবজজ্ বাবুর জন্য প্রায়শ্চিত্ত কি চান্দ্রায়ণ এই রকম কিছু একটা ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহা জানি। কিন্তু সধবার আয়তিলক্ষণও কিছু দেখিলাম না। আবার পরিধেয় বস্ত্রাদিতে বিধবারও কোন চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না।

মাদ্রাজী সাড়ীর আচলখানি পাকাইয়া আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে মেয়েটি কহিল,—"খুব চম্‌কে গেলেন বোধ হয়,—না ? কি ক'রে আপনার মনের কথা জানতে পারলুম ? কিন্তু ঠিক বলেছি কি না বলুন ?"

মেয়েটি যে অতিমাত্রায় প্রগল্‌ভা, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। দুই জন সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে ভদ্রঘরের কোন যুবতী মেয়ে যে প্রথম দেখাতেই এইরূপ অসঙ্কোচে এমন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারে, ইতিপূর্ব্বে আমার জানা ছিল না, তাই চেয়ারে বসিয়া মনে মনে খুবই আশ্চর্য্য হইতেছিলাম। সম্ভবতঃ বিনুদার অবস্থাও আমার মত হইয়াছিল। মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া

বিনুদা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কর্ত্তার কে হন?"

"মেয়ে। কিন্তু আমাকে আপনি ব'লে ডাকতে পাঁরবেন না, আমার নাম ধরেই ডাকবেন, বিনু বাবু। আমার নাম সীতা।"

"সীতা?" বলিয়া খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিনুদা কহিল—"আপনি কি কাশীতে—"

"ধন্যবাদ। আপনি যে এরি মধ্যে আমায় একেবারে ভুলে যাবেন, এতটা আশা করিনি, কিন্তু দেখুন, আমি মোটেই ভুলিনি। তবে আপনার ভোলায় আর আমার ভোলায় তফাৎ আছে। বদমাইসদের হাত থেকে আমায় রক্ষে ক'রে আমার যে মহা উপকার আপনি করেছিলেন, তাতে কৃতজ্ঞ হয়ে চিরকাল আপনাকেই আমার মনে রাখার কথা, কিন্তু উপকৃতের কথা উপকারকের মনে না রাখলেও চলে, আর তা থাকেও না।"

"বাস্তবিকই প্রথমে আপনি আমায় চমকে দেছিলেন, সীতা!"

"নামটা ধ'রে কথা কইলেন, কিন্তু আপনিটা এখনও তবু ছাড়তে পারলেন না। এ রকম করলে কিন্তু আপনার সঙ্গে আর কথা কওয়া চলবে না।"

"তোমায় না চিনতে পারার দোষ অবিশ্যি একটু হয়েছে বটে, কিন্তু খুব বেশীও বোধ হয় হয়নি; কেন না, কাশীতে তোমায় যেমন দেখেছিলুম, তার তুলনায় তুমি এখন ঢের—"

"রোগা হোয়ে গেছি?"

"শুধু রোগা নয়, কালও হয়ে গেছ।"

সুমিষ্ট হাসির একটা রোল তুলিয়া সীতা কহিল, —"দুধে-আলতার রংটা আমার কাল হয়ে গেছে না কি, বিনু বাবু?"

"দুধে-আল্‌তা রংয়ের কথাই যে আমি বলছি, তা নয়, তবে তোমার রং কালও ত বলা যায় না।"

"তবে কি কি বলা যায়?"

"শ্যামবর্ণ,—না, শ্যামবর্ণও ত ঠিক নয়, অর্থাৎ—"

"অর্থাৎ যাকে বলে বিবর্ণ। থাক্—বর্ণ নিয়ে আর মাথা ঘামাবার এখন দরকার নেই, বিনু বাবু। এর পর যখন কোন কাব্য উপন্যাস লিখবেন, তখন এ নিয়ে বেশী করে ভাববেন। তবে রোগা হয়েছি বটে। রোগা হবার আর দোষ কি বলুন। বাবার এই অসুখ, দিন-রাত তাঁর কাছেই আমায় ব'সে থাকতে হয়। মা ত একেবারে হাত-পা-ভাঙ্গা হয়ে পড়েছেন। ভয়, ভাবনা আর উৎকণ্ঠায় আমিও যে কি হোয়ে আছি, তা আর আপনাকে কি বলবো। ভগবান্ যে কি করবেন!" সীতার মুখের প্রফুল্লতা নিমেষে মিলাইয়া গেল। তাহার বড় বড় স্নিগ্ধ চক্ষু দুইটিতে জল জমিয়া আসিল। দেওয়ালের ওদিকে ফিরিয়া আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া কহিল,—"এই খানিকক্ষণ একটু ঘুমিয়েছেন, তাই ত একটু ফুরসৎ পেয়েছি।"

"তোমার বাবার কি অসুখ সীতা?"

একটু পূর্ব্বে যাহার সুমিষ্ট সরস আলাপ এবং প্রফুল্লতায় মনে মনে মুগ্ধ হইয়া উঠিতেছিলাম, এক্ষণে তাহার বেদনাপ্লুত বিমর্ষ মুখের দিকে চাহিয়া অন্তরে ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম। সীতা কহিল,—"বাবার জ্বর আর পেটের অসুখ, কিন্তু সব লক্ষণই খারাপ। বোধ হয়, বাবা আর বাঁচবেন না, সেই জন্যে এক এক সময় আমার এত ভয় হচ্ছে যে, তা আর কি বলব। আপনারা এক একবার আসবেন, বিনু বাবু?" তারপর আমার দিকে চাহিয়া কহিল,—"আপনারা ব'লে কেন বললুম, তা বুঝেছেন বোধ হয়? অর্থাৎ আপনি আর আপনাব দাদা, দুজনে এসে যদি একটু আমাদের দেখে-শুনে যান, তা হ'লে তবু একটু ভরসা পাই, আসবেন পঞ্চু বাবু?"

আমি কহিলাম,—"আপনি কিছু ভাববেন্ না, আমরা রোজ এসে আপনার বাবাকে দেখে যাবো, কিন্তু আপনি আমার নামটাও জানতে পারলেন কি ক'রে?

সীতার মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিল, —"কাশীতে মামার কাছেই বরাবর থাকতুম কি না, সেখানে পণ্ডিতদের কাছে জ্যোতিষ-শাস্ত্রটা ভাল ক'রে পড়েছি," বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—"দেখুন, আমাদের বাড়ী যে নূতন ঝিটা এসেছে, সে আর আপনাদের ঝি এক বাসায় থাকে। কাশী থেকে এসে যে দিন পশ্চিমের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে বিনু বাবুকে দেখতে পেয়ে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাই, সেই দিনই আমাদের ঐ ঝিকে জিজ্ঞাসা করতে সব জানতে পারি। তার পর সকল কথাই আপনাদের তার কাছ থেকেই শুনিছি। বাবার অসুখ না হ'লে এরই মধ্যে এক দিন ঝিকে সঙ্গে ক'রে আপনাদের বাড়ী গিয়ে পড়তুম। কিন্তু আজ ঘরে বসেই আপনাদের দেখা পাবার সৌভাগ্য

আমি পেলুম। ভাগ্যিস্ মামাবাবু ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে আপনার স্ত্রীর দিকে চেয়ে চেয়ে হেসেছিলেন!"

আমি কহিলাম,—"কিন্তু এক জন ভদ্রলোকের পক্ষে সে কাজটা কি—"

"মোটেই ভাল নয়, কিন্তু আপনার স্ত্রী বা আপনারা—মামার সম্বন্ধে ভয়ানক ভুল বুঝে ফেলেছেন। মামার সম্বন্ধে সব শুনলে আর তাঁর ওপর আপনাদের রাগ থাকবে না, বরঞ্চ আমারই মত তখন হাসবেন" বলিয়া আবার অনুচ্চ হাসির একটা তরঙ্গ তুলিয়া সীতা কহিল,—"কিন্তু আমার ঐ রোগা মামাটিকে মারবার জন্যে কুস্তিগীর পালোয়ানের হাতের একটা চড়ই ত যথেষ্ট, শঙ্করমাছের চাবুকের কি দরকার ছিল বলুন ত?" তাহার কলহাস্যে ঘরখানি ভরিয়া উঠিল, পরক্ষণেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"বাবাকে ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে, একটু বসুন আপনারা, আমি আসছি।"

সীতা উপরে গেলে বিনুদাও উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমাকে কিছুক্ষণ থাকিতে বলিয়া একটা বিশেষ কার্য্যের জন্য বিনুদাও চলিয়া গেল। আমি একাকী বসিয়া ঘরের আসবাবপত্রগুলি ও সেগুলি সাজাইবার শৃঙ্খলা দেখিয়া মনে মনে গৃহস্বামীর রুচির প্রশংসা করিতে লাগিলাম। প্রায় মিনিট পনর পরে সীতা উপর হইতে নামিয়া আসিয়াই কহিল,—"একলা ব'সে আছেন, দাদাটি বুঝি পালিয়েছেন?" আমি কহিলাম,—"বিনুদার একটা জরুরী কাজ আছে ব'লে চ'লে যেতে হ'ল।"

"জরুরী কাজের ওঁর কামাই নেই। সে রাত্রেও আপনার বিনুদার জরুরী কাজ ছিল, কিন্তু আমাকে বিপদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না ক'রে আর যেতে পারেন নি। আপনি আপনার দাদার কাছ থেকে সে কথা শুনেছেন কি না, জানি না, কিন্তু জীবনে আমি তা আর কোন দিনই ভুলতে পারব না, পঙ্কু বাবু।"

"বিনুদার কাছ থেকে কিছুই শুনি নি, কি হয়েছিল বলুন ত।"

"শুনবেন? তবে বলছি।"

হঠাৎ সীতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ভিতরের দরজার চৌকাঠে পা রাখিয়া কি যেন শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল। পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া আবার চেয়ারখানি টানিয়া বসিয়া কহিল,—"বাবার অসুখের জন্যে সর্ব্বদাই মনটা আমার অস্থির হয়ে আছে। এক এক সময় আমার এত ভয় হয়, পঙ্কু বাবু যে, বাবা যদি না বাঁচেন। বাড়ীতে বেটাছেলে কেউ নেই, মেশোমশাই ভবানীপুরে থাকেন, সকালে বিকেলে তিনিই এসে দেখাশুনা করেন, কিন্তু আজ তিনিও যে কেন আসতে পারলেন না, বুঝতে পারছি না।—যাক, যা বলছিলুম, শুনুন, বলি। মামা অনেকদিন থেকেই কাশীতে থাকেন, তিনি সেখানকার কলেজের প্রফেসার, শুধু যে প্রফেসারী ক'রে ছাত্রদেরই পড়ান, তা নয়, নিজেও চিরকাল তিনি এক জন ছাত্র। শাস্ত্রের পুঁথিপত্তরের দপ্তরের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রেখে সর্ব্বদাই ঐ সব তত্ত্বেই তন্ময় হয়ে আছেন। প'ড়ে পড়ে' আর ভেবে ভেবে মামা আমার মাথাটিকে এক রকম খারাপ করেই ব'সে আছেন বল্লেই হয়। আমার মাথাটিকে এক রকম খারাপ করবার মতলবে ছিলেন, আমি দেখলুম, মামার বড় মাথা খারাপ হ'লে হয় ত চলবে, কিন্তু আমার এ ছোট্ট মাথাটি বিগড়ে গেলে কিছুতেই চলবে না, তাই আমি পাততাড়ি গুটিয়ে মামার পাঠশালা থেকে স'রে পড়েছি।" বলিয়া সীতা আর একদফা খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া কহিল,—"এমন ধারা অদ্ভুত লোক কেউ কখনও দেখে নি। তার সাক্ষী এই দেখুন না কেন, ক'দিন এখানে এসে, ছাদে বেড়িয়ে, আপনার স্ত্রীর দিকে চেয়ে, দেখুন ত, কত না হাসি-ইসারা ক'রে গেলেন! কিন্তু মজার কথা এই যে আমাদের এই বাসার পশ্চিম দিকে আপনাদের বাড়ী, কি মাঠ, কি আদিগঙ্গা, কি জঙ্গল, কি ধানের ক্ষেত, এ কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয় ত হাঁ করেই থাকবেন, কিছু বলতেই পারবেন না! এখানে এসে কোন দিন তিনি ছাদে পায়চারী করেছেন কি না, তাই হয় ত বলা তাঁর পক্ষে শক্ত হবে। সুতরাং ব্যাপারটা যে কি হয়েছে, তা বোধ হয় এইবার বুঝতে পেরেছেন অনেকটা?" বলিয়া সীতা হাসিতে লাগিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মামার কাছেই বুঝি বরাবর থাকতেন?"

"হ্যাঁ, একেবারে ছেলেবেলা থেকে। বাবা তখন ছিলেন মুন্সেফ, সাত যায়গায় ঘুরে বেড়াতেন, সেই জন্যে মামার কাছেই আমাকে বরাবর রেখে দিয়েছিলেন। মামার কাছেই মানুষ, যা সামান্য

একটু-আধটু লেখাপড়া শিখেছি, তাও ঐ মামাই শিখিয়েছেন।"

"অমন মামা যখন আপনাকে ছেলেবেলা থেকে কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তখন লেখাপড়াতে নিশ্চয় আপনি—"

"হ্যাঁ, একেবারে দিগ্‌গজ, অর্থাৎ বি, সি, ডি, এস্, এন্, ও পি, ভারতী, বিদ্যালঙ্কার, কাব্যশাস্ত্র-ঘড়ঘড়ি" বলিয়া সীতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"আচ্ছা, মধ্যে একদিন হার্ম্মোনিয়মের সঙ্গে কে গান গাচ্ছিল, সে নিশ্চয় আপনি?"

"মিছে কথাটা আর বলব না, ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিশ্চয় গাধা থাকে না, কণ্ঠ আমারই, পঙ্কু বাবু! পরশু বাবা একটু ভাল ছিলেন; সন্ধ্যার সময় দু'খানা ঠাকুরের নাম করতে বললেন, তাই সেদিন চীৎকার করেছিলুম। যাক, যা বল-ছিলুম, মামার কাছেই কাশীতে থাকি। সকাল-সন্ধ্যায় মন্দির ঘুরে বেড়ান আমার একটা রোগ আছে। সে দিন কি একটা কাজে মামাবাবু গিয়েছিলেন বিন্ধ্যাচল, আমি সীতারাম চাকরকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার খানিক পরেই বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখতে গেলুম। বাড়ীতে কেউ নেই ব'লে মামী আর যেতে পারলেন না। কিসের জন্যে সে দিন মন্দিরে লোকের ভীড়ও যেমন হয়েছিল অত্যন্ত বেশী, আর আরতি দেখে মন্দির থেকে যখন বেরুলুম, তখন রাতও হয়ে গেছলো তেমনি অনেক। মন্দিরের মত বিশ্বেশ্বরের গলিতেও সেদিন লোকে লোকারণ্য। খানিকটা আসার পর পেছন ফিরে দেখি, সীতারাম নেই। জার্ম্মাণ সিলভারের একখানা দোকানের এক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। ভাবলুম, ভীড়ের মধ্যে বোধ হয় পেছিয়ে পড়েছে, কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, সীতারামকে দেখতে পেলুম না।"

"কাশীর পথঘাট সব নিশ্চয়ই আপনার চেনা ছিল, অত দিন যখন ছিলেন?"

"সব না হোক, অনেক পথই জানা ছিল, বিশেষ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পথ খুব ভালই জানতুম। তা ব'লে অতটা পথ একলা চ'লে আসতেও ভরসা হ'ল না। প্রায় মিনিট পনর সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে সীতারামের জন্যে আবার মন্দিরের দিকেই খানিকটা এগিয়ে গেলুম: কিন্তু তার আর দেখা পেলুম না। তখন কি আর জানতুম যে সীতারামই এক জন গুণ্ডো!"

"সে আপনাদের বাড়ী কত দিন ছিল?"

"একেবারে নতুন, সবে কুড়ি পঁচিশ দিন সে এসেছিল।"

"তার পর কি হোল?"

"তার পর তাকেই খুঁজতে গিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলুম। সেই সময় পাণ্ডা গোছের একটা মোটা-সোটা বেঁটে হিন্দুস্থানী আমার সামনে এসে বল্‌লে—'আপনার নোকর হারিয়েছে বুঝি? সে আপনাকে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে, হামার সাথে আসুন, কোন ভয় নেই'।"

"আর অমনি তার সঙ্গে গেলেন? এত দিন কাশীতে থেকে—"

"সেই কথাইত ভাবি। সে দিন তার ঐ কথা শুনেই কেন যে সেই অপরিচিত লোকটার সঙ্গে গেলুম, একবার একটু ভেবেও দেখলুম না—"

চাকর আসিয়া টেবিলের উপর আলো দিয়া গেল। সীতা তাহাকে ডাকিয়া কহিল,—"অক্ষয়, রোজ তোমায় বলছি যে, আগে গঙ্গাজল দিয়ে তার পর আলো দেবে, এ কথাটা আর তোমার কিছুতেই মনে থাকে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তার পর কি হোল?"

"তার পর তার সঙ্গে সঙ্গে আসতে আসতে এই কথাটাই খালি ভাবতে লাগলুম, যে, কাজটা ঠিক হচ্ছে কি না। কিন্তু ভাবতেও লাগলুম, তার সঙ্গে আসতেও লাগলুম, কে যেন আমায় তার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। শেষ কালে হঠাৎ যখন আমার চমক ভাঙ্গল, তখন দেখি—এমন একটা গলির মধ্যে তার সঙ্গে এসে পড়েছি, যেখানে এর আগে আর কখনও আসিনি। গলিটা একেবারেই নির্জ্জন, কোন দিকেই মানুষের সাড়া নেই। চারিদিকে চেয়ে দেখে একটাও লোক দেখতে পেলুম না। কাশীর এক শ্রেণীর লোকের কথা তখন আমার মনে প'ড়ে গেল। ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলুম। বোধ হয় চীৎকার করতেই গেছলুম, সেই সময় সে পেছন ফিরে আমার হাত ধরতেই গলার রব গলার মধ্যেই আটকে গেল। হাতটা ধ'রে লোকটা বললে,—'বিবিসাহেব, বড্ড ডর লাগছে না'?"

"উঃ", বাঙ্গালীর মেয়েরা পথে ঘাটে কি রকম

দুর্ব্বল, কি রকম অসহায়, তা আর বলবার নয়

"ইংরেজ হোলেই বা সে অবস্থায় কি করত, পঞ্চু বাবু? আপনি ভাবছেন সে লোকটা একলা? তখনি কোত্থেকে আরও দুজন লোক এসে তিন জনে মিলে আমায় ঘিরে ফেল্লে। এক জন একখানা চাদর দিয়ে আমার মাথার সঙ্গে ফেরতা দিয়ে মুখটা বেঁধে ফেলতে লাগলো। কিন্তু মুখ বাঁধবার তাদের কোন দরকারও ছিল না, আমি 'ফেণ্ট' যাবার মতই হয়ে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ সেই সময় ভগবান যে মূর্ত্তিতে এসে আমায় রক্ষে করলেন, জীবনে কখনও সে মূর্ত্তি আমি ভুলতে পারব না। তাঁর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম; বিনু বাবুই আমার সে সময়ে সাক্ষাৎ ভগবান্" বলিয়া সীতা তাহার জোড় হাত বার বার মাথায় ঠেকাইতে লাগিল।

"সেই সময় বুঝি বিনুদা' এসে পড়ল?"

"এসে পড়েন নি, ভগবান পাঠিয়ে দিলেন। খালি পা, গায়ে একটা হাতকাটা জামা, চাদরখানা মাথায় জড়ান। দূরে তাঁকে আসতে দেখেই প্রাণপণ শক্তিতে মুখের বাঁধনটা একটু আলগা ক'রে কোন রকমে ব'লে উঠলুম—'রক্ষে করুন।' শুনতে পেয়েই উনি ছুটে এলেন, আর এসেই মাথার চাদরটাকে খুলে কোমরে জড়িয়ে তিন জনকে তিনটে ঘুসি রগের ওপর এমন মারলেন যে, তিন জনেই ঘুরে পড়ল। তার পর আমায় একটু দূরে স'রে গিয়ে দাঁড়াতে ব'লে, তাদের ঘুসি মারতে লাগলেন আর রদ্দা দিতে লাগলেন। তাদের দু একটা ঘুসি-ঘাসাও ওঁকে খেতে হয়েছিল। কিন্তু কি মারই যে ওঁর কাছ থেকে তারা খেলে, তা আর কি বলবো। তারাও খুব ষণ্ডা, তাই বিনু বাবুর সে মার খেয়েও তারা বেঁচে রইল। কি অসীম শক্তি যে ওঁর গায়ে, তা সেদিন দেখেছিলুম বটে।"

"তার পর?"

"তার পর, আমার হাত ধ'রে তিনি যেন 'ছুট কাটিয়ে' নিয়ে এসে যখন সদর রাস্তায় এনে ফেল্লেন, তখন দেখি সামনেই চকের বাজার। সেখানে এসে, পথের এক ধারে দাঁড়িয়ে কত বকুনিই যে, আমাকে বকতে লাগলেন! তার পর বললেন যে, তাঁর বিশেষ জরুরী কোন কাজ আছে, তা হ'লেও আমাকে আমাদের বাড়ীতে পৌছে না দিলে অন্য কাজে তিনি যেতে পারবেন না; ব'লে—আমায় সঙ্গে করে বরাবর রামাপুরায় আমাদের বাসা পর্য্যন্ত এলেন।"

"হ্যাঁ, গেলবারে জ্যেঠামশায়ের হঠাৎ অসুখের খবর পেয়েই বিনুদা কাশী চ'লে গেলেন। জরুরী কাজে বোধ হয় আর কিছুই নয়, জ্যেঠামশায়ের অসুখ সম্বন্ধেই।"

"তাই হবে। কিন্তু কত ক'রে আপনার দাদাকে একটি দিন আমাদের বাসায় যাবার জন্যে বলেছিলুম, তা আর যান নি।"

এই সময়ে বাহিরে রাস্তায় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইবার শব্দ হইতেই সীতা বাহিরের দিকে দেখিয়া কহিল—"ডাক্তার বাবু এসেছেন, চলুন না পঞ্চু বাবু, একবার বাবাকে দেখবেন চলুন না।" ডাক্তার বাবুটি ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতেই আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং তিন জনেই উপরে আসিলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন রাত্রিতে হঠাৎ সীতার পিতার অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া বাটী আসিয়া শুইতে সে দিন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য সকালে উঠিতে পারি নাই, উঠি-উঠি করিয়াও শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছিলাম, সন্ধ্যা আসিয়া ঠেলা দিয়া কহিল,—"ওবাড়ীর চাকর ডাকতে এসেছে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।"

উঠিয়া বাহিরে আসিতেই সীতাদের অক্ষয় চাকর কহিল,—"মা একবার ডাকছেন।" তখনই চোখে মুখে জল দিয়া সীতাদের বাটী আসিয়া দেখিলাম, কর্ত্তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সীতার মা কাঁদিতে লাগিলেন। সীতা কাঠ হইয়া শয্যার এক ধারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। রাত্রিজাগরণ ও দুশ্চিন্তার জন্য তাহার মুখের উপর একটা মলিন ছায়া পড়িয়া তাহাকে একেবারে ম্লান দেখাইতেছিল। আমার আসিবার কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যাও খিড়কী দিয়া সীতার পাশে আসিয়া বসিল এবং তাহার হাত হইতে পাখাখানি লইয়া কর্ত্তার মাথায় ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

এই কয়দিনই সন্ধ্যা যখনই সময় পাইয়াছে, এ বাটীতে আসিয়া ইহাদের দেখিয়া শুনিয়া গিয়াছে।

দিন দুই পরে বৈকালের দিকে ও-বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যা কহিল,—"সময়টা ওদের বড্ডই খারাপ পড়েছে। এই আষাঢ়েই সীতার বিয়ের সব ঠিক-ঠাক, কিন্তু সে দিকেও আবার এক মহাবিপদ! এতদিনকার এত আয়োজন, এত বন্দোবস্ত, এত খরচপত্তর সবই ওদের বৃথা হোল!"

"সীতার কি এখনও বিয়ে হয়নি?"

"রোজ ওবাড়ী যাও, কিন্তু সে খবরও বুঝি রাখ না?"

"কার কাছ থেকে রাখবো? আর তাছাড়া, কুড়ি একুশ বছরের মেয়ের যে বিয়ে হয়নি, তা কেমন ক'রে জানবো?"

"বিয়ে কি এতদিন হবার বাকী থাকতো। ছেলে ওদের দেখাশুনো হয়ে সব ঠিক-ঠাক, এমন কি, দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ছেলে বললে,—'বিলেত-যাবো, ফিরে এসে বিয়ে হবে।' ছেলে নাকি হীরের টুক্‌রা ছেলে। মা বাপ কেউ নেই, সীতার বাপই একরকম তাকে মানুষ করেছেন। বিলেত যাবার জেদ যখন ধরলে, তখন ওরাই আবার খরচ-পত্তর ক'রে তাকে বিলেত পাঠালে, আর এই পাঁচ ছ' বছর সমানে সেখানে তার খরচ জুগিয়ে আসছে, কিন্তু হঠাৎ কাল ঐ খবর এসেছে।"

"কি খবর?"

"যে, সে সেখানে কিসের খুব বড় পাস্‌টাস্ ক'রে সেখানেই মস্ত কি এক চাকরী পেয়েছে আর এক মেম বে করেছে।"

"বল কি গো?"

"হ্যাঁ, তাই ত বলছি, মেয়েটার ভাগ্যি নেহাৎই মন্দ, নইলে বাপের অবস্থা ত এ দিকে এই, এখন যায়—তখন যায়, ওদিকে যার ভরসায় এত দিন আইবুড়ো থেকে—"

"এত ব্যাপার, কি ক'রে জানবো বল? আর এই সব খুঁটিনাটি খবর মেয়েরা একদিন গিয়ে যা টের পায়, বেটাছেলে এক মাস গিয়েও তা জানতে পারে না। এ সব জানতেও তোমরা যেমন 'ফাষ্ট', খবর গেজেট কত্তেও তেমনই তোমরাই 'ফাষ্ট'। আচ্ছা ওরা একটা অনিশ্চিতের আশায় মেয়েকে এই এতবড় ক'রে রাখলে, ওদেরই বা কি রকম বুদ্ধিশুদ্ধি বুঝি না ত।"

"ওদের বুদ্ধির আর দোষ কি। ছেলেটি কর্ত্তারই না কি এক বন্ধুর ছেলে। বাপ যখন মারা যায়, তখন মা-মরা ঐ ছেলেটিকে কর্ত্তার হাতেই গছিয়ে দিয়ে যায়। তখন তার বয়স সাত বৎসর, সীতা তখন জন্মায়ও নি। তখন থেকে তাকে মানুষ-টানুষ ক'রে লেখাপড়া শিখিয়ে নিজের ছেলের মত করেই ত ঘরে রেখেছিল। সে ছেলে যে এমন নেমক হারাম—"

"যাক্—সীতার বিষয় আজ একটা ঠিক পেলুম। এত দিন ত বুঝতেই পারিনি যে, ওর বিয়ে হয়েছে, কি হয় নি, বরঞ্চ বিধবা বলেই এত দিন মনে করে এসেছি।"

এই সময় ও-বাড়ীতে সীতার মামার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তাঁহাকে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। বুঝিলাম, তিনি টেলিগ্রাম পাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বৈকালে যাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম। আমি যাইতেই তিনি কহিলেন,—"আপনার কথা সবই দিদির কাছে শুনলুম, কাশীতেও এক রাত্রে এক মহা গুরুতর বিপদ থেকে যিনি সীতাকে রক্ষা করেছিলেন, শুনলুম সেই বিনু বাবু আপনারই দাদা। আশ্চর্য্য হই যে, আপনারাই আবার এই বিপদে—কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কিই-বা আছে? পূর্ব্বজন্মে আপনারা হয় ত—পূর্ব্বজন্ম বিশ্বাস করেন ত? বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে, না ক'রে উপায় নাই। এক সময়ে আমিও—আচ্ছা, ওসব কথা এখন যাক, কোবরেজী আপনি কি রকম মনে করেন, চাটুয্যে মশায়ের এ-অবস্থায় কোবরেজীই সুবিধে হবে ব'লে বোধ হয় না কি?"

অল্প দুই চারিটি কথাতে বুঝিতেই পারিলাম, লোকটি অত্যন্ত অন্যমনস্ক এবং কতকটা অস্থির-চিত্তও বটে। প্রশস্ত ঘরখানির মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে কহিলেন,—"দেখুন পঞ্চু বাবু, একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। বিশৃঙ্খলভাবে এলোমেলো কতগুলো ভাবলে কোন ফল হবে না। মনে করুন, যদি—হাঁ, ভাল কথা, কৈ বিনু বাবু ত একটিবার এলেন না?

"বিনুদা সকালে এসেছিলেন, আর এখনই আসতে পারেন হয় ত! যদি বাড়ী থাকেন, তা হ'লে আপনার আসার খবর পেলেই—"

"আচ্ছা চাটুয্যে মশা'য়ের সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়? কোন সুরাহার আশা দেখচেন কি?

এ কথার যে কি উত্তর দিব, তাহাই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। কিন্তু উত্তর যাঁহাকে দিতে হইবে, দেখিলাম, উত্তর পাইবার জন্য তিনি কিছুমাত্র ব্যস্ত নন, তিনি শুধু প্রশ্ন করিয়াই খালাস। কেন না,

পরক্ষণেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, সতীর কোন্ অঙ্গটা কালীঘাটে পড়েছিল, পঞ্চু বাবু?" তবুও আমি কর্ত্তার সম্বন্ধেই ভাবিতে লাগিলাম। চোখের সামনে নিত্য নিত্য তাঁহার অবস্থার যে পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, তাঁহার কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা এবং আত্মীয়-অনাত্মীয়ের এই ঐকান্তিক যত্ন ও আগ্রহকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া তিনি যে ক্রমশঃ অনারোগ্যের পথেই আগাইয়া আসিতেছেন, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই, সুতরাং সুরাহার কথাই বা কেমন করিয়া বলি? কিন্তু কিছু আমাকে বলিতেও হইল না, নিজেই তিনি কহিলেন,—"দেখুন, হয় বাঁচবেন—না হয় বাঁচবেন না। বাঁচেন যদি, তা হ'লে ত কোন কথাই নাই, আর যদি নাই বাঁচেন, তা হ'লে—তা হ'লে—আর কিছুই নয়, মেয়েটার জন্মেই একটা ভাবনা। একটা নতুন হাঙ্গামা আবার বেধে উঠেছে। জগতের ব্যাপার কিছুই বোঝবার যো নেই, পঞ্চু বাবু! এ যে কি রহস্যভরা, কি গভীর, কি অতল! আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য! কেউ কেউ আবার এমন দিগ্‌গজ যে, সৃষ্টিরহস্যের কণামাত্র বুঝতে না পেরে ব'লে বসলেন কি না যে, সৃষ্টি অসম্পূর্ণ, জগৎ-পদ্ধতিতে দোষ আছে, ক্রুটী আছে, উপরন্তু তিনি নিষ্ঠুর, তিনি পক্ষপাতী।"

"ও সব বাজে লোকের কথা ছেড়ে দিন, এখন—"

"না—না—নেহাৎ বাজে নয়, যাঁরা বলেছেন, তাঁরা পণ্ডিতও বটেন, কিন্তু মনে হয়, অত্যন্ত বিচারমূঢ় আর অকৃতজ্ঞ! আমি পঞ্চু বাবু এই কথা বলি যে, আমরা নিজেরা যখন 'পারফেক্ট' হ'তে পারি না, উন্নত সংস্কারে যখন এসে পৌঁছুতে পারি না, তখন সেই সর্ব্বশক্তিমানের বিচারই বা করতে যাই কি ব'লে আর তাঁকে পক্ষপাতী নিষ্ঠুর ব'লে তাঁর সৃষ্টির দোষই কি ব'লে দিতে সাহস করি?"

এই সময় সীতা নীচে নামিয়া আসিয়া বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিল। কয়দিনের পর আজ তাহার মুখে-চোখে পূর্ব্ব-প্রফুল্লতা যেন একটু ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটু আনন্দের—একটু উৎসাহের স্বরে সীতা কহিল,—"আজ বাবার অবস্থা অনেকটা ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে। এ বেলা ত দেখেন নি পঞ্চু বাবু, চলুন না একবার দেখবেন," বলিয়া উৎসাহের ব্যস্ততায় নিজেই সর্ব্বাগ্রে ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল।

উপরে আসিয়া কর্ত্তাকে দেখিলাম। কয়দিনের পর আজ তাঁহাকে একটু ভাল বলিয়াই বোধ হইল বটে, কিন্তু ইহা যে নির্ব্বাণের আগে প্রদীপের হঠাৎ উজ্জ্বলতা, তাহা শুধু আমিই মনে মনে বুঝিলাম এবং আমার বুঝিবার যে কোনই ভুল হয় নাই, তাহা সেই রাত্রিশেষেই প্রমাণিত হইল। হঠাৎ সন্ধ্যার পর হইতেই কর্ত্তার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া শেষ-রাত্রিতেই তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

সীতা যে খুব কান্নাকাটি করিল, তাহা নহে; কিন্তু বিষাদে—রাজ্যের সমস্ত বিষাদ একসঙ্গে আসিয়া যেন তাহার সর্ব্বদেহে আশ্রয় করিল। অসম্ভব গাম্ভীর্য্য আসিয়া তাহার পূর্ণপ্রস্ফুটিত মুখচ্ছবির সমস্ত কোমলতা, সমস্ত লাবণ্য, সমস্ত মাধুরী যেন হরণ করিয়া লইল। কয়দিন পর্য্যন্ত বড় একটা তাহার দেখা পাওয়া গেল না, নিজের শয়ন-ঘরখানির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া সীতা যেন জগৎ-সংসার হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিল।

মামা সীতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বলিলেন,—"দুঃখ করবার কি আছে মা, তুই জানিস্ ত, যে, সুখ-দুঃখ দুই-ই অবিদ্যামূলক, আর বিদ্যা অবিদ্যা তাঁরই লীলার বিকাশ।" তাহার পর নীরবে পায়চারী করিতে করিতে খানিক পরে বিনুদার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"বিনু বাবু, যা হয়ে গেল, তা হয়ে গেল, তা নিয়ে আর খেদের আছে কি! ন্যায়ের কথা জানেন ত,—সংযোগ হলেই তার বিয়োগ হয়,—'মরণান্তং হি জীবিতম্।'—তবে এখন দুঃখ-টুঃখ নয়—ভাবনা একটু মেয়েটার জন্যে, সেই জন্যেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—" বলিতে বলিতে তিনি ত্রস্তে রাস্তার দিকে বাহির হইয়া গেলেন এবং মিনিট দুই তিন পরে কোমরে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন,—"এখন কথা হচ্ছে যে, প্রার্থনা করাটা কি মিথ্যা, সত্যই কি প্রার্থনা করা চিত্তের একটা ব্যাধি?"

বিনুদা কহিল,—"দেখুন, সত্য মিথ্যা—"

"ঠিক বলেছেন বিনু বাবু, সত্য মিথ্যা বিচার করে কে? কিছুতেই না—কিছুতেই না—ওসব পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মাথার বিকৃতি! প্রাণের ভেতর থেকে যখন তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা আপনিই

বেরিয়ে পড়ে, তখন নিশ্চয়ই—যাক, বিমু বাবু, এখনকার অবস্থার ব্যবস্থা হচ্ছে এই যে, এখানকার কাজের যখন শেষ হয়েই গেল, তখন আর এদের এখানে থেকে কি হবে, সকলকে নিয়ে বেনারস চ'লে যাই। আপনাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে বিমু বাবু, কেন না, এদের সব নিয়ে যেতে আমি একলা পেরে উঠবো না।" তাহার পর একটু হাসিয়া কহিলেন,—"আমি এমনিভাবে বলছি, যেন হুকুম করছি, কি বলেন পঞ্চু বাবু? কিন্তু বাস্তবিকই আমার অন্য কিছু মনে হয় না, মনে হয় যেন, আপনাদের ওপর একটা দাবী সত্যিই আছে।"

বিমুদা কহিল,—"সত্যিই ত আছে, মামা। সকল মানুষের ওপরেই সকল মানুষের একটা দাবী আছে, সাহায্যের দাবী, সমবেদনার দাবী, ভালবাসার দাবী। আর তা আছে বলেই—"

"ঠিকই বলেছেন বিমু বাবু, আছে বৈ কি। আছেও যেমনই, পরস্পরের জন্যে পরস্পরের মনে একটা সাড়াও তেমনই দেয়। তা যদি না দিত, তা হ'লে না হয় বুঝতুম—যাক্, তা হ'লে বিশ্বনাথের ইচ্ছাই যখন, এদের সব নিয়ে গিয়ে একবারে তাঁর মন্দিরতলায় রাখেন, তখন, কি বলেন—অ্যাঁ? পঞ্চু বাবু, আপনাকেও যেতে হবে, যাবেন ত?"

আমি এতক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে কেবল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম যে, ইনি কি কথাকে টানিয়া কোথায় যে আনিয়া ফেলেন, তার আর কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। সীতা যে প্রথমদিন পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছিল যে, সর্ব্বদাই ঐ তত্ত্বেই তন্ময়, এখন দেখিতেছি, সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তরে কহিলাম,—"বিমুদা গেলেই আমার আর যাবার দরকার হবে না। আর তা' ছাড়া, দু'জনে আমরা গেলে বাড়ীতে থাকবার আর কেউ নাই।"

"আচ্ছা—আচ্ছা, বিমু বাবু গেলেই হবে'খন, উনি একলাই এক শ'। অমনি ওঁর বাবাকে দেখে আসাও হবে। এখন তাঁকে একটু ঘন ঘন দেখাও দরকার। এখন ধরতে গেলে, বিমু বাবুই বাপ আর তিনি ছেলে হয়ে দাঁড়িয়েছেন, কি বলেন, বিমু বাবু? জগতে সব জিনিষেরই প্রায় এই রকম অবস্থা-পরিবর্ত্তন ঘ'টে থাকে।"

যাহা হউক, কয় দিন এখানে থাকিয়া কর্ত্তার পারলৌকিক কার্য্যাদি শেষ করিয়া সকলে কাশী চলিয়া গেল। বিমুদাও সঙ্গে গেল। যাইবার জন্য জ্যেঠামহাশয়ও চিঠি দিয়াছিলেন। আমাকেও একবার যাইবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন, কিন্তু এই সময়ে এখানে আমার একটা ভাল চাকুরীর কথা হইতেছিল বলিয়া আমি কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে পারিলাম না। সীতাও আমা'র ও সন্ধ্যার যাইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছিল, ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলাতে ও আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময় সকলে মিলিয়া আমরা যাইব কথা দেওয়াতে তবে নিরস্ত হয়। যাইবার দিন গাড়ীতে উঠিতে গিয়া সীতা সন্ধ্যার হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া কহিল যে, আশ্বিন মাসে না যাইলে সে নিজে আসিয়া এমনি করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইবে এবং—বলিয়া চোখ মুখের ভঙ্গী করিয়া সন্ধ্যাকে কি একটা ইসারা করিল। তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া কহিল,—"আপনার সঙ্গে ত আমি কথা বল্‌ব না, যত দিন না আপনি দিদিকে নিয়ে কাশী যাবেন।"

দিন পাঁচ সাত পরে কাশী হইতে বিমুদার পত্র আসিল। লিখিয়াছে যে, জ্যেঠামশায়ের শরীর তেমন ভাল নহে বলিয়া বিমুদা এখন সেইখানে কিছু দিন ধরিয়া থাকিবে, আর আশ্বিনমাসে যাহাতে আমরা যাই, সে জন্য জ্যেঠামশায় অনেক করিয়া বলিয়াছেন। পত্র পড়িয়া সন্ধ্যা কহিল—"বড়ঠাকুরের কাজই এক আলাদা, নিজেদের কথাই এক ঝুড়ি লিখলেন, কিন্তু সীতাদের কোন কথাই লিখলেন না। মেয়েটার জন্য সত্যিই বড্ড মন কেমন করে।"

আমি কহিলাম,—"আচ্ছা, সীতা আর তুমি ত প্রায়ই সমবয়সী; বড় জোর দু'এক বছরের সে না হয় তোমার চেয়ে ছোট, কিন্তু সীতার সম্বন্ধে এমনি ভাবে তুমি কথা বল যে, তার চেয়ে তুমি যেন কতই ন' বয়সে বড়।"

"সে কথা ঠিকই, কিন্তু সীতা যে আমার চেয়ে দু'এক বছরেরই ছোট, তা কিন্তু আমার কিছুতেই মনে হয় না। তার কথাবার্ত্তা, তার চেহারা, তার ছেলেমানুষী স্বভাব দেখে মনে হয়, সে যেন আমার চেয়ে অনেক—অনেক বছরের ছোট।"

"তার মানে, দেহের বয়স তার একুশ হ'লেও, মনের বয়স তার একুশের অর্দ্ধেক, অর্থাৎ মনটা তার কচি মেয়ের মতই কাঁচা, তোমাদের

মত পাকার রং ধরেনি। কিন্তু এ-ও আবার দেখেছি যে, এক এক সময় সীতা এমন গম্ভীর হয়ে পড়ে, এমন সব পণ্ডিতী কথা বলতে সুরু করে যে, তখন তাকে আদ্যিকালের বুড়ো টোলের পণ্ডিত মশাই বলেই মনে হয় সন্ধ্যা।"

"যাই হোক, তাকে কিন্তু আমি বড্ডই ভালবেসে ফেলেছি।"

"আমিও।"

"ঠাট্টা নয়, তুমিও এবং আরও এক জনও।"

"সে জন কে বল দেখি?"

"বড়ঠাকুর।"

"কিন্তু বড়ঠাকুর ত তোমার ওবাড়ীতে বড় বেশী একটা যেত না, সীতার সঙ্গে বেশী কথাও কইত না।"

"তুমিই কি বিয়ের পর বছরখানেক আমার কাছে বেশী আসতে, না বেশী কথা বল্‌তে?"

"তার মানে, তুমি কি বল্‌তে চাও যে, সেই বছরখানেকই তোমাকে আমি ভালবাসতুম, এখন আর বাসি না?"

"খুব বাস গো মশাই—খুব বাস, খুব—খুব—খুব। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, পূজোর সময় সব কাশী যেতেই হবে, যাবে ত?"

"আমি তোমার সঙ্গে কথা কব না—আড়ি।"

"কথা না কও, কিন্তু, কাশী ঠিক যেতে হবে। না গেলে আমারও তোমার সঙ্গে আড়ি।"

এই সময় মতির মা ঝি আসিয়া একখানা খামে আঁটা পত্র দিয়া গেল—শিরোনামায় সন্ধ্যার নাম লেখা। সুতরাং অনধিকারবোধে নিজে না খুলিয়া পত্রের মালিকের হস্তেই তাহা দিলাম। পত্রখানি পাঠ করিয়া সন্ধ্যা কহিল,—"এই দেখ, বোন্‌টি আমার কত ভালবাসে আমায়, কত কথাই লিখেছে," বলিয়া চিঠিখানি আমার কোলের উপর ফেলিয়া দিল। দীর্ঘ পত্রখানির সবটাই পড়িলাম। পড়িয়া বুঝিলাম যে, সীতা সর্ব্বরকমেই আমাদের আপনার করিয়া লইতে চাহে। পত্রের শেষের দিকে লিখিয়াছে, পঞ্চু বাবুকে আমার নাম করিয়া বলিবেন যে, পূজার সময় এখানে আপনাকে না আনিলে তাঁর জরিমানার ব্যবস্থা হইবে।"

সন্ধ্যা কহিল,—"দেখলে, সীতা আমাকে কত ভালবাসে।"

"সীতাই শুধু ভালবাসে, আর ত কেউ বাসে না।"

বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া আমি নীচে নামিয়া গেলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে কয়টা মাস কাটিয়া গেল। পূজা আসন্ন হইয়া আসিল। জ্যেঠামহাশয়কে পূর্ব্বে পত্র দিয়ে দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে আমরা কাশীযাত্রা করিলাম। বিনুদা আমাকে দেখিয়া কহিল,—"এসেছিস্‌, ভালই হয়েছে। বাবা তোদের জন্যে বড্ড অস্থির হয়ে পড়েছিলেন।"

পরদিন প্রভাতেই বিনুদাকে সঙ্গে লইয়া সীতাদের বাড়ী আসিলাম। উপর হইতে দেখিতে পাইয়াই ছুটিয়া নীচে আসিয়া সীতা কহিল,—"ফাইন্ হব-হব হয়ে আসছিল, এসে প'ড়ে বড্ড রক্ষে পেয়ে গেলেন। দিদিকে এনেছেন ত? নইলে আবার ডবল ফাইন্ দিতে হবে। তার পর? আছেন কেমন সব বলুন ত? দিদি ভাল আছেন?" তাহার পর বিনুদার দিকে চাহিয়া কহিল,—"বিনু বাবু হলেন আমাদের একেবারে কুটুম্ব, বসতে না বললে ত আর কিছুতেই বসবেন না। আর উনি এ বাড়ীতে বড় একটা আসেনও না। আগে দুবেলাই আসতেন, আজকাল আসা-টাসা একেবারেই ত্যাগ করেচেন। মামা বাবু এক একদিন জোর-জবরদস্তি ক'রে ধ'রে নিয়ে আসেন, তাই, নইলে হয় ত মোটেই এ-মুখো হ'তেন না। কি? কট্‌মট্‌ ক'রে চেয়ে রয়েচেন যে বড়? বলুন না—আসেন?"

বিনুদা একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া কহিল,—"আগের মত আজকাল আর বেশী তেমন আসতে পারি না বটে, কিন্তু না পারার কারণও ত তুমি জান, সীতা। আজকাল কাজের——"

"আর আপনার অন্ত নেই,—রান্না-বান্না, বাসন-মাজা, জলতোলা—আর কি, বিনু বাবু?—ছেলে ধরা, বাজার-হাট করা।" অনেক দিন পরে সীতার সেই অনুচ্চ সরল হাসির লহরী কাণ ভরাইয়া দিয়া ঘরময় তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। বিনুদা মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল,—আসতে ত রোজই পারি সীতা, কিন্তু ইচ্ছা হয় না; কারণ,

অতিথির আদর যেমন হওয়া উচিত—তেমন হয় না। যাও দু'একদিন অন্তর আসি, তা'ও আর আসব না।" সীতা সাশ্চর্য্যে বিন্দুদার মুখের দিকে ঠায় চাহিয়া রহিল। বিন্দুদা কহিল,—"এতে লাভের মধ্যে তিনটে জিনিষ হচ্চে। প্রথম অতিথির অপমান হচ্চে, তার পর, হার্ম্মোনিয়মটাও প'ড়ে প'ড়ে খারাপ হয়ে যাচ্চে, আর তোমারও গলা বন্ধ হয়ে যাচ্চে।"

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সীতা কহিল,—"উঃ; আমার এমন ভয় হয়েছিল, বাস্তবিক বলচি! কিন্তু আর যাই হোক্, গলা আমার কিছুতেই বন্ধ হচ্চে না, সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত। এমন চেঁচাতে পারি আমি যে, আপনাদের গলাও তার কাছে হার মানবে।"

"হ্যাঁ, তার প্রমাণ ত সেই সে-রাত্রে পাওয়া গেছে, যে রাত্রে গুণ্ডোদের হাতে পড়েছিলে।"

"তা' কি করব বলুন, তখন যে চেঁচাতে পারি নি। তার কারণ হচ্চে—"

"কি হচ্চে?"

"তারা যে গলায় চুপিলী দিয়েছিল।"

কৌতুক-দৃষ্টিতে সীতার মুখের দিকে চাহিয়া বিন্দুদা জিজ্ঞাসা করিল,—"চুপিলী?"

"হ্যাঁ। চোররা যেমন মন্তর প'ড়ে চোখে নিদিলা দিয়ে চুরি করে; ওরাও তেমনি গলায় যে চুপিলী দেয়, আর চেঁচাতে পারা যায় না, একেবারেই রব বন্ধ হয়ে যায়।"

"কিন্তু তোমার সে চুপিলীর জের কি এখনো রয়েচে, সীতা?"

"কি মুস্কিল! যে দিন আসেন, সেই দিনই ত গান গাই।"

"মিথ্যা কথা বললে যে পাপ হয়, তা বোধ হয় নিশ্চয় জান।"

আমি কহিলাম,—"আচ্ছা, অত গণ্ডগোলে কাজ কি, দু'একখান গান গাইলেই ত আর বিন্দুদার বলবার কিছু থাকবে না।" আমার দিকে চাহিয়া, সীতা, কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া কহিল,—"আপনিও কম দুষ্টু নন।"

অক্ষয় ভিতর হইতে হার্ম্মোনিয়ম দিয়া গেলে, সীতা সুর দিতে দিতে কহিল,—"বিন্দু বাবুর সবই অদ্ভুত। এমন সুন্দর সকালবেলাতে ষাঁড়ের চেঁচানি শোনবার সাধ যে কেন, তা বুঝতে পারি না।"

বিন্দুদা কহিল,—"তুমি যদি বিন্দু বাবু হ'তে আর আমি যদি সীতা হতুম, তা হ'লে তুমিও এই রকম অদ্ভুত হ'তে, সীতা।"

যাহা হউক, সীতা গান ধরিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব মস্ত বড় একটা কীর্ত্তন গাহিয়া, সীতা জোরে হার্ম্মোনিয়মটাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল,—"হয়েচে ত, আর কখনো গান শুনতে চাইবেন? কাণের ভেতর জ্বালা করচে?"

"হ্যাঁ,—পিপাসার জ্বালা, অর্থাৎ—"

আমি কহিলাম,—"আচ্ছা, এ সব কীর্ত্তন আপনাকে কে শিখিয়েছেন?"

"এ সব মামাবাবুর কীর্ত্তি। গান শেখাবার জন্যে মামা যাঁকে ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর ইচ্ছামত গান ত মামা তাঁকে শেখাতে দিতেন না। নিজেই সব গান বেছে পছন্দ ক'রে দিতেন।"

বিন্দুদা কহিল—"মামা কোথায় সীতা?"

"মামা যে কোথায়, তা বলা যে বড় শক্ত বিন্দু বাবু; সে ত আপনিও জানেন। বাড়ীতে যে নেই, এইটুকুই শুধু বলা যেতে পারে। বাজারের নাম ক'রে কোথায় যে গেছেন, তা মামা বাবু ছাড়া আর কার' ত বলবার শক্তি নেই। বাজারে গিয়া থাকতেও পারেন, গঙ্গার কোন একটা ঘাটে গিয়ে ব'সে থাকতেও পারেন, রাস্তায় সাপ-খেলা বাঁদর-খেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেও পারেন। কিম্বা কোন সাধুসন্ন্যাসীর আড্ডায় গিয়ে ব'সে ব'সে তত্ত্ব-আলোচনা ক'রে ক্ষিদে বাড়াতেও পারেন," বলিয়া ঘরের মধ্যে একটা সরল সুমিষ্ট হাসির প্রতিধ্বনি তুলিয়া সীতা চুপ করিল।

আমি হার্ম্মোনিয়মটাকে টানিয়া তাহার দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিলাম,—"কিন্তু আপনি যে ঐ একখানি গেয়েই এই সব বাজে কথা আরম্ভ করলেন বড়? আর গাইবেন না নাকি?"

সীতা প্রথমে একটু হাসিয়া তাহার পর কৃত্রিম ক্রোধের সহিত কহিল,—"নিশ্চয় গাইব, দাঁড়ান ত, দশখানা, বিশখানা, পঞ্চাশখানা, একশখানা—আপনাদের কাণ একেবারে ঝালাপালা ক'রে দেবো। চিল-চীৎকারের চোটে ছুটে যদি না পালাতে হয় ত আমার নামই—" বলিয়া সীতা আর একখানি গান ধরিল। ইহা ভজন-শ্রেণীর গান, বড়ই মধুর, বড়ই ভাবময়। শুনিয়াছিলাম, সঙ্গীত ঠিকমত গাওয়া হইলে তাহার সুর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। আমার মনে হইল, সীতার সুমিষ্ট কণ্ঠ, তাহার শিক্ষা এবং অন্তর্নিহিত ভাবের সহিত মিলিত হইয়া সেই ভজনের

সুরখানিও যেন প্রাণময় হইয়া সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। লক্ষ্য করিলাম, গাহিবার কালে সীতার মুখের ভাব, চোখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এ যেন একটু আগের সীতার সে মুখ-চোখ নহে। গানের ভাবের সহিত মিলিত হইয়া তাহার অন্তরাত্মাও যেন গানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রায় মিনিট পনর ধরিয়া গাহিবার পর সীতা গানখানি শেষ করিয়া শাড়ীর আঁচল দিয়া কপালের ঘাম মুছিল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ হইতে কোন কথাই বাহির লইল না। এই সময় বাহির হইতে মামা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার এক হাতে একটা রুই মাছ আর এক হাতে একটা খাবারের চোবড়া। আমাকে দেখিয়াই চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিলেন,—"এই যে, এসে পড়েছ, বাবাজী। ক'দিনই মনে কচ্ছিলুম যে—বৌমাদের সব এনেচো ত? সীতা, এগুলো ভেতরে নিয়ে যা ত মা। বিনু, পালিও না যেন, আমি এখনি আসচি।"

মাছ ও খাবারের চোবড়াটি হাতে করিয়া লইয়া সীতা জিজ্ঞাসা করিল,—"আবার আপনি কোথায় যাবেন, মামা?"

"এক কাণ্ড ক'রে এসেছি মা, এখনি আবার ছুটতে হবে।"

"কি, মামা বাবু?"

"দশ আনার খাবার নিয়ে একখানা নোট দিলুম, বাকী টাকা কৈ সে ত দেয়নি। পঞ্চু, অনেক কথা আছে, চ'লে যেয়ো না, এখনি আমি আসচি।" বলিয়া মামা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। সীতা কহিল,—"আমার কথা ত' আর নয়, মামা বাবুর কথা নিশ্চয়ই ঠেলতে পারবেন না। বসুন, পালিয়ে যাবেন না। অন্ততঃ মিনিট পাঁচেক, আমি ভেতর থেকে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত"—বলিয়া সীতা ভিতরে চলিয়া গেল ও কিছুক্ষণ পরেই দুইখানি রেকাবীতে খাবার সাজাইয়া দুই হাতে ধরিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; কহিল,—"অতিথির সৎকার গান এবং পান অর্থাৎ সামান্য একটু জলপান। তা' হবে না, পঞ্চু বাবু, ঠেলে রাখচেন কি, তা হ'লে আর কখখনো আপনার সঙ্গে—"

"কথা কইবেন না?"

"না।"

"তা হ'লে ত খেতেই হবে, কিন্তু অত বড় ভয়টা আর দেখাবেন না।"

মৃদু হাসিয়া সীতা কহিল,—"বিনু বাবু এ বিষয়ে অসম্ভব লক্ষী, কখনো একটি কথাও বলতে হয় না ওঁকে। বলতেও যেমন হয় না, এ সব কাযে তৎপরও উনি তেমনি। দেখুন, লক্ষী ছেলেটির মত রেকাবিটি কত শীগ্‌গির খালি ক'রে আনচেন। বাস্তবিক বলচি, আমার এইটি বড্ড ভাল লাগে। আমার ইচ্ছে করে, রোজ বিনু বাবুকে সামনে বসে ভাল ক'রে খাওয়াই।—আর কিছু খাবার এনে দি বিনু বাবু"—বলিয়া সীতা ভিতরের দিকে যাইবার উপক্রম করিতেই বিনুদা বলিল,—"ছেলেমানুষী কোরো না, সীতা।"

"এখন করি, বুড়ো হ'লে আর করব না"—বলিয়া সীতা দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল এবং আরও কিছু খাবার আনিয়া বিনুদার বার বার নিষেধ সত্ত্বেও তাহার রেকাবীতে একটি একটি করিয়া দিয়া দিল।

মামা বাবু তখনো ফিরিলেন না। জলযোগ শেষ করিয়া আমরা বাড়ী আসিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সীতা কহিল,—"বসুন না বিনু বাবু, ঘরে গিয়ে সেই ত গঙ্গার দিকে চেয়ে ব'সে থাকবেন? জানেন পঞ্চুবাবু, সে দিন মামার সঙ্গে জ্যেঠামশাইকে দেখতে গেছলুম, গিয়ে দেখি—গঙ্গার দিকে মুখ ক'রে বিনু বাবু ওদিকের বারান্দায় বসে' আছেন। পেছনে গিয়ে দাঁড়ালুম, কাসলুম, বিনু বাবুর হুঁস নেই, পা দিয়ে দু-একবার দুম্ দুম্ শব্দ করলুম, বিনু বাবু সেই গঙ্গার শোভা দেখতেই বিভোর। ভাবলুম, মামা বাবুর আজকাল শিষ্য হয়ে পড়েছেন, এই রকম হবারই ত কথা। আবার ভাবলুম, বাঙলা দেশ থেকে এসে কাশ্মীর নতুন শোভা দেখে হঠাৎ কবি হয়েও উঠতে পারেন।"

বিনুদা কহিল,—"না সীতা, ও জিনিষটা আমার ধাতে একেবারেই খাপ খায় না, খায় বরঞ্চ ঐ ওর" —বলিয়া আঙুল দিয়া আমায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া কহিল—"ওর এক গল্প বলি, শোন সীতা। তখন আমরা শ্রীরামপুরে থেকে পড়াশুনা করি। ওর এক কবিতার খাতা ছিল, মাঝে মাঝে তাতে কবিতা লিখতো। সে দিন ছিল স্কুলের ছুটী। সমস্ত দুপুর ব'সে ব'সে ও এক কবিতা লিখচে, কবিতার নাম— 'শেষ—' কি রে পঞ্চু, নামটা কি দিয়েছিলি?"

আমি বিনুদার হাত ধরিয়া একটা হেঁচকা টান দিয়া কহিলাম,—"যত সব বাজে কথা তোমার। বেলা কত হয়ে উঠলো দেখচো?'

সীতা কহিল,—"কি হ'ল তার পর, বলুন বিমু বাবু, আমার দিব্বি।"

আমি বিমুদাকে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া বাহিরে আনিলাম। চলিতে চলিতে সীতার দিকে ফিরিয়া বিমুদা কহিল,—"বলবো এক দিন সীতা, ওর কাব্য-সাধনার সেই গল্প এক দিন করবো।"

এই যে মেয়েটি সীতা, পথে আসিতে আসিতে ইহার কথাই ভাবিতে লাগিলাম। ইহার আত্মীয়তা, সারল্য, সদা প্রফুল্লভাব—ইহার সরস বাক্‌পটুতা, শিক্ষা-দীক্ষা এবং সর্ব্বোপরি আমাদের সহিত ইহার এইরূপ নিঃসঙ্কোচ মেলামেশাতে বাস্তবিকই আমরা ক্রমেই মুগ্ধ হইয়া উঠিতে-ছিলাম। আমাদের সহিত ইহার পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহার সত্যই আমাদের পরস্পরকে দিন দিন নিকট হইতে নিকটে টানিতেছিল। তাই বোধ হয়, ইহাদের সম্পর্কে আনন্দও যেমন পাইতাম, কোন কিছুর নিরানন্দও তেমনি ঠেলিয়া রাখিতে পারিতাম না। হিন্দুর ঘরের এই একুশ বছরের অবিবাহিতা মেয়েটির জটিল ভবিষ্যৎ ভাবিতে গিয়া নিরানন্দটাই বার বার আসিয়া অন্তরকে আঘাত করিয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাবনাও সে জন্য বিশেষ কাহারও ছিল না। বিশেষ যাহাকে লইয়া এই দুর্ভাবনা, তাহার ত সে জিনিষটি বাহিরে কিছু প্রকাশ পাইত না। সীতা সে প্রকৃতিরই মেয়ে নহে—যাহার বাহির দেখিয়া ভিতর বুঝা যায়। তাহার সদানন্দ, হাস্য-কৌতুকের ভিতরে কোন দুঃখ—কোন বেদনা আছে কি না, তাহা অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না।

বেলা অনেক হইয়া গিয়াছিল। পথে আসিতে আসিতে বিমুদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, বিলেত থেকে সে ছেলেটি ত আর দেশে ফিরল না, তা হ'লে সীতার বিয়ে—"

"অন্য ছেলে দেখাশুনো হচ্চে, বোধ হয়, অগ্রাণ মাসে এইখানেই হ'তে পারে।"

"কে ছেলে, বিমুদা?"

"মামার কলেজেরই এক প্রফেসারের ভাইপো।"

"তাদের মত হয়েছে?"

"প্রফেসারের মত আছে, তবে খুব বেশী বয়েস ব'লে মেয়েরা একটু অমত কচ্চে।"

বাটী ফিরিয়াই শুনিলাম, জ্যেঠামহাশয়ের জ্বর হইয়াছে। আজকাল জ্যেঠামহাশয়ের শরীর প্রায়ই এইরূপ খারাপ হয়। দু'দশ দিন ভাল থাকেন, আবার অসুস্থ হইয়া পড়েন। হয় একটু জ্বর, কি গা-গতর ব্যথা, কিম্বা সর্দ্দি, অথবা পেটের অসুখ, একটা না একটা উপসর্গ লাগিয়াই আছে। সে দিন বৈকালের দিকে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"পঞ্চু, তালি-তালা দিয়ে আর চলবে না, শীগ্‌গিরই আমাকে যেতে হবে, বাবা। তোরা যে একবারটি কলিকাতায় যাবার জন্যে আমায় লিখতিস, কিন্তু আমার কি এখন বিশ্বনাথের পা ছেড়ে কোথাও আর একটি দিন যাবার যো আছে রে। কোন্ ফাঁকে যে মরণ এসে মাথার শিয়রে দাঁড়াবে, তা কি বলা যায়!" মুক্ত জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আমি নীরবেই বসিয়া রহিলাম। সম্মুখেই বর্ষার গঙ্গা, পাহাড়ের ঘোলাজল বুকে করিয়া বিদ্রোহীর মত উদ্দামগতিতে ছুটিয়াছে। আরাম-কেদারাখানির উপর বসিয়া জ্যেঠামহাশয় নিবিষ্টমনে গঙ্গা দেখিতে দেখিতে আবার কহিলেন,—"আমার বোধ হয়, মরবার আগে মরণের একটা সাড়া পাওয়া যায়। আমি তা পেয়েছি বাবা, আর তা পেয়েছি বলেই বার বার তোদের এখানে আসতে লিখছিলুম। কিন্তু একটা নতুন কাযের তাড়া এসেছে, এই কাযটা কোন রকমে আমায় সেরে যেতে হবে। তোরা আজ ও-বাড়ী গিয়েছিলি কি? সীতার মামাকে একবার—"

এই সময় নীচে হইতে পরিচিত কলহাস্যের একটা ধ্বনি কাণে আসিয়া পৌঁছিল। জ্যেঠামহাশয় কহিলেন,—"আমার সীতা মা এসেছে বুঝি। দু'দিন এ বাড়ীতে আসে নি, তাই মায়ের আমার মুখখানা বারবারই মনে পড়ছিল।" তাঁহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সীতা আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"আবার আপনার জ্বর হ'ল জ্যেঠামশাই, আপনাকে নিয়ে কি করি বলুন ত?"

জ্যেঠামহাশয় সীতার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"করবার যা রয়েছে, তা ত করতে পারচিস্ না বেটী। এখন এরা সব এসেচে, দলে ভারি হয়েচিস্, সকলে মিলে ঠেলে ঠুলে ঐ মণিকর্ণিকায় নিয়ে গিয়ে ফেল্ না মা, তা হলেই ত সব চেয়ে বড় করার কাযটা হয়ে যায়।"

সীতা কহিল,—"জ্যেঠামশাই, আপনিও বড্ড দুষ্টু হচ্চেন।"

"দেখ্, পঙ্কু, মামার সঙ্গে প্রথম প্রথম এসে সীতা আমায় ডাকতো কি ব'লে জানিস?—কর্ত্তা বাবু। রোজ ব'লে ব'লে আর ধম্‌কে তবে তা ছাড়িয়েছি।—হ্যাঁ গো লক্ষ্মি, আজকে তোর বিষ্ণুপুরাণ আনিস্ নি, ক' দিন যে শোনা বন্ধ রয়েচে।"

"না জ্যেঠামশাই, আজ দিদিকে নিয়ে বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখতে যাব ব'লে মামীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম, কিন্তু আপনার জ্বর হয়েচে, আজ আর ত যেতে পারব না" বলিয়া সীতা জ্যেঠামহাশয়ের পা দু'খানি লইয়া হাত বুলাইতে লাগিল।

তখন সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব ছিল না। ও-পারের প্রান্তর, গাছপালা, দিগন্তরেখা ক্রমেই অন্ধকারে ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল। চারিপার্শ্বের দেবমন্দির হইতে সান্ধ্য-নহবতের মধুর সুর মনের মধ্যে অপূর্ব্ব পবিত্রতা এবং স্বর্গীয় ভাব জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম এই যে, দুইটি সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া পড়িল কি করিয়া? ছয় মাস আগে কে ভাবিয়াছিল যে, সীতাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক এমনভাবে নিবিড় হইয়া উঠিবে? কিন্তু জানি যে, এমন ধারাই হয়। পরম আত্মীয়ও পর হইয়া যায়, আবার সম্পূর্ণ অজানিত পরও এই রকম আপনার হয়। লীলাময়ের রাজত্বে কি যে হয়, আর কি যে হয় না, মানুষ তাহার কি ঠিক করিবে? সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে, জগৎ ও জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই অনন্ত লীলাময় শ্রীভগবানের চরণে মাথা আপনি নত হইয়া পড়িল। সেইখানে বসিয়া মনে মনে বার বার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দিন চারি পাঁচ পরে একদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিয়া একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিলাম। এ অভ্যাসটা আমার কোন কালেই ছিল না, সুতরাং শয্যায় শুইয়া দেবীর কৃপালাভ করিতে সাধনা যথেষ্টই করিতে হইতেছিল। সাধনায় দেবীর প্রসন্নতা-লাভ যদিও সম্ভব হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু অন্তরায় হইল আসিয়া বিন্দুদার পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা পদ্মা। সে তাহার বাপের কাছে বড় একটা ঘেঁসিত না, আমার সহিতই তাহার যত ভাব-ভালবাসা, কথা-বার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা। পদ্মা আসিয়াই আমার পিঠের উপর শুইয়া পড়িয়া কহিল,—"কাকু, কি করচ?" ভাবিলাম, উত্তর দিলেই আর রক্ষা থাকিবে না, তাহা হইলেই অনবরত প্রশ্নের উপর প্রশ্ন আসিয়া ঘুমকে আমার বর্ষার বিস্তৃত গঙ্গা পার করাইয়া ও-পারের ব্যাস-কাশীর প্রান্তরে পাঠাইয়া দিবে। সুতরাং চোখ বুজিয়া চুপ করিয়াই রহিলাম। পুনরায় প্রশ্ন হইল—"কাকু, তুমি ঘুমিয়েছ? কেন ঘুমিয়েছ?" নিরুত্তর থাকিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, এদের বুদ্ধি-বিবেচনা এতই কম কেন। যাকে ঘুমন্ত বলিয়াই ঠিক করিয়া লইল, সে আবার তার এই 'কেন'র উত্তর, ঘুমন্ত অবস্থায় কি ক'রে যে দিতে পারবে, তা এরা বুঝতে পারে না কেন? যাহা হউক, পরিত্রাণ আর পাইলাম না। পিঠের উপর ঘোড়া হইয়া বসিয়া পদ্মা আমার মাথার চুলগুলি খামচাইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকু, তোমার মাথা আমার চেয়ে এত বড় কেন? বল না, কেন? ও কাকু!" আমি দেখিলাম, আর বিনা উত্তরে চলে না, অন্ততঃ খুব সংক্ষিপ্ত একটা সাড়া দিতেই হইবে, তাই চোখ বুজাইয়া কহিলাম—"হুঁ!"

"আমাদের ঘোড়া নেই কেন কাকু?"

"হুঁ।"

"কাকু আমায় একখানা নৌকো কিনে দেবে, ঐ রকম বড়? ঐ দেখ না কত বড় নৌকো যাচ্ছে। কোথায় যায়, কাকু?"

"হুঁ।"

"দিনের বেলায় চাঁদ ওঠে না কেন?—কোথায় বাঁশী বাজচে?"

"হুঁ।"

ইহার পর হঠাৎ পদ্মার কি সুমতি হইল, আমার পিঠের উপর হইতে নামিয়া জানালার ধারে গিয়া বসিল এবং বসিয়া নিজের মনে বকিতে লাগিল—"দুম্ দুম্ ফটাস্ দুম্—দুম্ দুম্ ফটাস্ দুম্—কে রে?—জুজুবুড়ী ধরলে—দাঁড়া, দাঁড়া, যাচ্চি—" একটুখানি নীরব থাকিবার পর হঠাৎ পদ্মা কোকিল ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দিল—"কুহু—কুহু—কুহু—কু—কু—উ—উ—উ"

একটু ধমক দিয়া বলিলাম,—"কি হচ্চে পদ্মা?"

"কাকু, কোকিল আসে না কেন?"

"আসবে। পাজি মেয়ে কোথাকার, ঘুমুগে যা!"

ধমক খাইয়া পদ্মা খোলা বারান্দার ওদিকে চলিয়া গেল এবং সেইখানে গিয়া নিজের মনে গান করিতে লাগিল—"শ্যামাপদ ঘুড়িতে আকাশের মন উড়িয়ে গেল—গোলো-লো-লো-ও-ও-ও।" পরক্ষণেই দুম্ দুম্ শব্দে বোঝা গেল, গায়িকা সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া যাইতেছে। হাঁফ ছাড়িয়া পাশের বালিসটাকে বুকে চাপিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, ঝনাৎ করিয়া দরজার শব্দে তন্দ্রাটুকু ছুটিয়া গেল। চাহিয়া দেখি,—একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর—পদ্মার সহিত আমারই শ্রীমান্‌টির শুভাগমন হইয়াছে। আসিয়াই দুই জনে গোলমাল সুরু করিয়া দিল।

পদ্মা কহিল,—"ওরে ভাই বুবু, বাঘ দেখেছিস্—ডোরা কাটা?"

"দেখেচি, দেখেচি—তুই ত দেখিস নি। মানুষ দেখলেই বাঘ খেয়ে ফেলে।"

"কেন, ভাই, ভাত খায় না কেন?"

"ভাতও খায় না, খাবারও খায় না। ভাল্লুক দেখেছিস পদ্মা? শ্বশুরবাড়ী যায় কেমন। তুই কিছুই জানিস না—তুই যে ছেলেমানুষ।"

"ছেলেমানুষ বৈ কি,—আমি ত বড়।"

"আমার চেয়ে বড়? মারবো এক্ষুণি ষ্টুপিড।"

"হ্যাঁ, বড় ত। কাকীমাকে জিজ্ঞেস করবে চল না।"

"মারবো বলচি, পদ্মা—মারবো—বো—ও—ও—ও—ও।"

বাপ রে বাপ, কাণের পোকা বাহির হইবার উপক্রম হইল। উঠিয়া পড়িবার মতলব করিলাম। এ দিকে বুবু পদ্মার সহিত আপোষ করিয়া লইয়া কহিল,—"আয় পদ্মা, যাত্রা করি। তুই গান গা, আমি বাজাই,—কেমন ভাই?" দেখিলাম, গতিক মোটেই ভাল নয়। ঘরে একটা কেরোসিনের খালি টিন ছিল, বুবু দুই হাতে সেইটি বাজাইতে সুরু করিয়া দিল, আর পদ্মা তাহার গান ধরিল—"শ্যামাপদ ঘুড়িতে আকাশের মন উড়িয়ে গেল।" আকাশের মন উড়ুক, না উড়ুক, আমার ঘুম একেবারেই উড়িয়া গেল। উঠিয়া পড়িয়া, বুবুকে একটি চড় পদ্মাকে একটি চড় বসাইয়া দিতেই তাহারা ছুটিয়া নীচে পলাইয়া গেল! আমি আবার আসিয়া শয্যায় শুইলাম, কিন্তু বেলাও বোধ হয় তখন তিন প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। খানিকক্ষণ শুইয়া থাকিতেই তন্দ্রা আসিল ও ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। স্বপ্ন দেখিলাম, যেন—বাড়ীতে সমারোহ ব্যাপার, ভূরি-ভোজনের মহা আয়োজন। আহারীয় দ্রব্যাদিতে ভাঁড়ার, ঘর-দোর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উঠানের এক ধারে প্রকাণ্ড চুল্লীতে, জ্যেঠামহাশয় নিজেই লুচি ভাজিতে বসিয়াছেন। তাঁহার এক পাশে বুবু বসিয়া, লুচি ভাজিবার ঝাঁঝরি দিয়া ঘিয়ের টীনটি বাজাইতেছে, আর এক পাশে একখানি উপুড় করা ঝুড়ির উপর বসিয়া পদ্মা গান ধরিয়াছে—'শ্যামাপদ ঘুড়িতে আকাশের মন উড়িয়ে গেল।' দোতলার দালানের এক ধারে বিনুদা যেন খাইতে বসিয়াছে, সীতা সামনে বসিয়া বিনুদাকে খাওয়াইতেছে আর বলিতেছে,—'আমার এইটি বড্ডই ভাল লাগে, ইচ্ছে করে, রোজ বিনু বাবুকে সামনে ব'সে এই রকম ক'রে খাওয়াই।" বিনুদা কহিল,—'খাওয়ালেই ত পার।' সীতা কহিল—'পারি? আচ্ছা, পঞ্চু বাবুকে জিজ্ঞাসা করি' বলিয়া, অদূরে যেখানে বারান্দার রেলিং ধরিয়া আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, সীতা সেইখানে আসিয়া আমায় ডাকিতে লাগিল, "পঞ্চু বাবু, পঞ্চু বাবু, ও পঞ্চু বাবু!"—স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া পড়িতেই দেখি, সীতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে—"পঞ্চু বাবু, পঞ্চু বাবু, ও পঞ্চু বাবু! বাবা দিনের বেলাতেই এত ঘুম!"

কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছিয়া কহিলাম—"ঘুমুচ্ছিলুম কোথা? একটু খালি তন্দ্রা এসেছিল। তার পর, কতক্ষণ এসেচেন? কার সঙ্গে এলেন, মামা বাবু এসেচেন নিশ্চয়।"

সীতা কহিল—"মামা বাবু, মামীমা এবং খোদ আমি, সকলেই এসেছি। খাবার-দাবার আয়োজন করুন, সকলে আজ এইখেনে খাব আমরা।"

"এর আর বেশী কথা কি। আয়োজন আজ যথেষ্ট,—উঠোনে বোধ হয় জ্যেঠামশাই নিজেই লুচি ভাজতে লেগেচেন, দেখে এলেন না?"

"স্বপ্ন দেখছিলেন না কি, পঞ্চু বাবু!"

"বাস্তবিকই তাই, কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ওই ইজি-চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসুন।"

ঈষৎ হাসিয়া সীতা কহিল,—"এখনো এতটা

এগুই নি, পঙ্কু বাবু। পুরুষমানুষরা সামনে মেজের ওপর ব'সে থাকবে, আর আমি মেমসাহেব হয়ে পা তুলিয়ে ইজিচেয়ারে ব'সে কথা কইব, এখনো এতটা নিজেকে তৈরী করতে পারি নি।"

"এতে আর দোষটা কি?"

"দোষের কথা ত বলচি না। নিজের গুণ এখনো অতটা বাড়েনি, তাই বলচি" বলিয়া মেজের উপরেই সীতা বসিয়া পড়িয়া, বাহিরে বারান্দার দিকে চাহিয়া কহিল,—"আপনাদের বাসাটি দেখলে সত্যিই লোভ হয়, একেবারে ঘরে বসেই মা-গঙ্গাকে চব্বিশ ঘণ্টা দর্শন—আচ্ছা, আসুন, এক কাজ করা যাক, আমাদের সঙ্গে আপনারা বাসাবদল করুন।"

"বাসা-বদলেরই বা দরকার কি? মা গঙ্গার দর্শন নিয়ে কথা ত? আপনি এসে এইখেনেই থাকুন না কেন, তা হ'লেই চব্বিশ ঘণ্টা দর্শন হ'তে পারবে।"

"তা থাকলেও হয়, কিন্তু থাকতে দেবেন ত? শেষকালে হয়ত লাঠি নিয়েই তাড়া করবেন, অন্ততঃপক্ষে শঙ্করমাছের চাবুক।"

"আপনি দেখছি কিছুই ভোলেন না, আপনার স্মরণশক্তি খুব!"

"খুব। নইলে আর বি-সি-ডি—এম্-এন-ও-পি পাশ করতে পারি? তা ব'লে আর একচোখটা ওরকম ক'রে দেখাবেন না, পঙ্কু বাবু, ঝগড়ার ভয়টা বড্ড বেশী আমার" বলিয়া তাহার স্বভাবমধুর কণ্ঠে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি দুচোখ বুজাইয়া কহিলাম—"এইবার ত হয়েচে?"

"হয়েচে—হয়েচে, আপনি চোখ চান। দু'চোখ বুজিয়ে ঐ রকম ক'রে ভ্যাংচাতে ত আপনাকে বলিনি।"

হাসিয়া কহিলাম,—"খালি ত চোখ বুজিয়েছিলুম' আপনাকে ভ্যাংচালুম কৈ?"

"বিশ্বাস না হয়, আরসী ধ'রে দেখুন।"

"চোখ বুজিয়ে, আরসীতে দেখবো কি ক'রে?"

"তবে আমার কথাই বিশ্বাস ক'রে নিন।"

"না, আপনার সঙ্গে আর পারবার জো নেই। আপনাকে দেখচি একদিন বিশ্বনাথের আরতি দেখতে নিয়ে গিয়ে একলা ফেলে পালিয়ে আসতে হবে!"

"দাঁড়ান, জ্যেঠামশাইকে গিয়ে ব'লে দিচ্চি যে, আপনি আবার কবিতার খাতা করেচেন।"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম—"বেশ, চলুন বলবেন।"

সীতাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"বেশ, আপনিও চলুন। কিন্তু মামা বাবু সেখানে গল্প জুড়েচেন!"

"আপনারা কতক্ষণ এসেছেন।"

"ঘণ্টাখানেকের ওপর। এতক্ষণ ত মামীমা, দিদি, আমি, তিন জনে ব'সে গল্প কচ্ছিলুম। আচ্ছা, দিদির আজ কিসের ব্রত বলুন ত, রেকাবীতে ধান, দুর্ব্বা, ফুল, চন্দন সাজাতে ব'সে গেলেন? জিজ্ঞাসা করলুম, কিছু না ব'লে শুধু হাসতে লাগলেন।"

"ব্রত? আশ্বিন মাসে? তবে আমি এক গরীব ভিখিরী প'ড়ে আছি, সেই জন্যে তিনি যদি কোন সদাব্রতের ব্যবস্থা—"

"আপনি আরবারে ভাল মানুষ ছিলেন, এবার দেখছি ভয়ানক দুষ্ট হয়েচেন। দাঁড়ান, দিদিকে ব'লে দিচ্চি।"

"ব্রতের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তাই বলচি। এ সময় আর কিসের ব্রত হবে বলুন? কোন পাল-পার্ব্বণ পুজোও ত আজ নেই। লক্ষ্মীপুজো—সেও ত এখনো দেরী আছে। তবে, আজ বোধ হয়—ফতেয়া-দোয়াজ-দম্ হ'তে পারে।"

"চলুন, আর ফাজলামী করতে হবে না আপনার।"

তেতলায় জ্যেঠামহাশয়ের ঘরে আসিয়া দেখিলাম, মামা বাবু অনর্গল বকিয়া যাইতেছেন। বিষয়টা দৈব ও পুরুষকার লইয়া। যেখানে মামা বাবু পাটীর উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারই পায়ের কাছে ধুলার উপরে বসিয়া পড়িয়া সীতা জ্যেঠামশাইকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—"আপনার পদ্মা আজ আমাকে এক শক্ত প্রশ্ন করেছে, জ্যেঠামশাই।'

"কি প্রশ্ন, মা?"

"প্রশ্ন এই যে, বাঘ ভাত আর দুধ খায় না কেন, মানুষ খায় কেন?"

জ্যেঠামশাই কহিলেন,—"তাই ত মা, প্রশ্ন শক্তই ত বটে!"

মামা বাবু নিজের মনে বারকয়েক ধীরে ধীরে কহিলেন,—"মানুষ খায় কেন? হুঁ—'আত্মান্তরিক্ষং পিশিতৈর্নরাণাং......।' তা সীতা, তুই বললি না কেন—'ধর্ম্মো হয়ং দাশরথে নিজো নঃ'......?"

সীতা মামা বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে

হাসিতে কহিল,—"এ কথা কাকে বলবো, মামা বাবু, পদ্মাকে ?"

"ওহো, তা'ও ত বটে। আচ্ছা, এই শ্লোকাংশ দুটো কিসে থেকে বললুম, বল্ দেখি। তুই কিন্তু তা খানিক খানিক পড়েছিলি—মনে করতে পারিস ?"

খুব পারি, মামা বাবু বলবো ? ভট্টির রাম আর মারীচের কথা।"

"ঠিক মনে আছে ত! তোর খুব স্মরণশক্তি রে!"

"কিছু আগে পঞ্চু বাবুও ত এই কথা বলছিলেন" —বলিয়া সীতা হাসিতে লাগিল। হঠাৎ মামা বাবু উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে করিতে কহিলেন,—"যাক, এখন কথা হচ্চে, গুরুচরণ বাবু যা' তখন জিজ্ঞেস করছিলেন, কাশীতে একখানা বাড়ী থাকা খুবই দরকার। এই মনে করুন, আপনি যে বত্রিশটা ক'রে টাকা ফি মাসে ভাড়া দিচ্ছেন—ওহো-হো! যাঃ!"

জ্যেঠামশাই তাড়াতাড়ি কহিলেন,—"কি বলুন দেখি ?"

"আরে, ভয়ানক ভুল ক'রে ফেলেছি ত! আজ সকালে গৈবী যাব বলেছিলুম, সেখানে এক বাঙ্গালী সাধু এসে রয়েচেন, ক'দিন থেকে কথা রয়েচে যে, আজ—ঐ যাঃ! ও মা সীতা, আজ শুক্রবার না ? মিশনের সেই ছেলেটি—"

"তিনি সকালে এসেছিলেন মামা বাবু, আপনি তখন পুজো কচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দু' টাকা দিয়েছি।"

"বেশ করেচিস্ মা, আমি ত একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। যাক্—কি বলছিলুম, বামাচরণ বাবু ? হাঁ, বাড়ী—বাড়ী কাশীতে একখানা ক'রে রাখা খুবই ভাল বৈ কি। পারেন যদি, তা হ'লে আর ছাড়বেন না, বিশেষ এ বাড়ীখানি বড়ই পছন্দসই, একেবারে গঙ্গার ওপর।"

"হ্যাঁ, গঙ্গাস্নানের পক্ষে খুবই সুবিধে।"

"সে কথা আর বলতে। আমার একটু দূর হয় ব'লে, কলেজের তাড়ায় রোজ অবিশ্যি ঘটে ওঠে না। গঙ্গাস্নান ত পরের কথা, কত দিন সন্ধ্যাহ্নিকই করতে সময় হয়ে ওঠে না। এই চাকরীই হয়েছে আমাদের সর্ব্বকর্ম্মনাশা—এই জন্যেই শাস্ত্রের বিধি যে ব্রাহ্মণের পক্ষে—" তাহার পর হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"তবে, একটা কথা আছে বামাচরণ বাবু, কলিতে ভগবান্‌কে বছরে একদিন ডাকলেই কার্য্য হয়, এইটুকুই যা ভরসা।"

"তাই হয় না কি ?"

"হ্যাঁ। শুনুন তবে। এক দিন দেবতাদের সভায় নারদ হঠাৎ এসে আনন্দে অধীর হয়ে ভয়ানক রকম নাচতে গাইতে সুরু ক'রে দিলেন। দেবতারা বল্লেন,—'এ কি, নারদের আজ হঠাৎ এত আনন্দ হবার কারণ কি ?' নারদ বল্লেন—'আনন্দ হবে না, কলিযুগ আস্‌চে যে!' দেবতারা কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তাতে এত আনন্দের কি আছে, নারদ ?' নারদ বল্লেন—'আনন্দ নয় ? সত্যযুগে এক বৎসর হরিস্মরণ ক'রে ধর্ম্মাদি কার্য্যকল্পে যে ফল হ'ত, ত্রেতায় তা এক মাস করলেই পাওয়া যেত, তার পর দ্বাপরে সেই ফল পক্ষকালের কর্ম্মেই পাওয়া যায়, আর কলিতে, নিজেদের সংযত রেখে মাত্র এক দিনের অনুষ্ঠানেই সেই সমান ফল পাওয়া যাবে। যে কলিতে এত সুবিধে, সেই কলি যখন শীগ্‌গিরই আসচে, তখন আনন্দ করব না' ?"

সীতা কহিল,—"দেখুন, জ্যেঠামশাই, আমাদের মুনিঋষিরা শাস্ত্রের ভিতরও কি রকম চাতুরী চালিয়েছেন! সাধারণ লোককে ধর্ম্মেকর্ম্মে মতি দিতেই শুধু তাঁদের এই সব সহজ ব্যবস্থা। কেন না, ব্যবস্থা কঠিন হ'লে সাধারণতঃ বড় একটা কেউ ত আর এগুবেন না! নয় কি না, মামা বাবু, বলুন।"

"তা ত সত্যিই মা। কলির দুর্ব্বল মানুষদের পক্ষে একটু সোজা ব্যবস্থা না দিলে তারা পেরে উঠবে কেন, পাগ্‌লী—?" বলিয়া মামা বাবু গুন্ গুন্ করিয়া কি একটা গান গাহিতে লাগিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"শাস্ত্রকাররা এই রকম চারিদিকে নজর রেখে ব্যবস্থা করেছিল বলেই ত হাজার রকমের ঝড়-ঝাপটা খেয়েও এই সনাতন ধর্ম্মটার শেকড় এখনো এত শক্ত রয়েচে, কিন্তু য়ুরোপের দিকে চেয়ে দেখ, এ জিনিষটা ওদের কত শিথিল হয়ে পড়েচে। পাদরীরা আজ—ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল ব'লে দেশ জুড়ে কি ভয়ানক হাহাকার তুলেছে।"

জ্যেঠামশাই কহিলেন,—"কিন্তু আর এক দিকে যে তেমনি ওরা যথেষ্ট উন্নতি করেচে।"

"কোন্ দিকে ?"

"বিজ্ঞান।"

"হ্যাঁ, তা করেচে বটে" বলিয়া মামা বাবু মৃদু

হাসিয়া কহিলেন,—"ওরা আধুনিক হাজার রকমের যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে, লক্ষ রকম অঙ্ক কসে হিসেব ক'রে যে সব তত্ত্ব নূতন ব'লে বা'র করেচে, আমাদের মুনিঋষিরা হাজার দু'হাজার বছর আগে, শুধু ধ্যানে বসেই সে সব জানতে পেরেছিলেন, আর বলেও দিয়ে গিয়েচেন। লোকে শাস্ত্র না পড়লে এ সব খবর কি ক'রে জানবে বলুন? আড়াই শ' বছর আগে মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব য়ুরোপে বা'র হ'ল, কিন্তু আমাদের এ এমনি দুর্ভাগ্য দেশ যে, সেই একই কথা হাজার বছর আগে জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য্য বেচারা যে ব'লে গেলেন, সে কথা কে-ই বা শোনে আর কে-ই বা ভাবে! তার পর আর্য্যভট্ট"—বলিয়া মামা বাবু আরও কি সব বলিতে যাইতে-ছিলেন, জ্যেঠামশাই বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সময়টা এইবার একবার দেখুন দেখি, পাঁচটা বাজেনি কি?"

মামা বাবু পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ, সওয়া পাঁচটা, এইবার আপনি আয়োজন করুন।" জ্যেঠামশাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"পঞ্চু, ব'স এইখানে, কোন যায়গায় এখন বেরিও না" বলিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন এবং খানিক পরে ধান-দুর্ব্বা-চন্দনাদি সমেত একখানি রেকাবী হাতে করিয়া আসিলেন, তাঁহার পিছনে পিছনে সন্ধ্যাও প্রবেশ করিল। সন্ধ্যার হাতে দুইখানি কার্পেটের আসন।

মামা বাবু সীতার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"ওই আসনখানায় বস্ ত মা।"

"কেন, মামা বাবু?"

জ্যেঠামশাই হাতের রেকাবীখানা আসনের সামনে মেজের উপর রাখিয়া কহিলেন,—"বসতে বলচেন, বস্ না, বেটী।"

সীতা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া, কতকটা বিস্ময় এবং কতকটা কৌতূহল লইয়া আসনখানির উপর আসিয়া বসিলে, জ্যেঠামশাই সম্মুখের আসনখানিতে বসিয়া সীতার মাথায় ধান-দুর্ব্বা-পুষ্প, কপালে চন্দন ও হাতে একখানি গিনি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাহিরের দালান হইতে সেই সময় শাঁখ বাজিয়া উঠিল। জ্যেঠামশাই কহিলেন,—"আজ তোকে আশীর্ব্বাদ করলুম, মা। ঘরের লক্ষ্মীকে ঘর ছেড়ে আর কত দিন রাখবো বল? পঞ্চু, বাবা, কিছু আশ্চর্য্য হয়ে গেছিস, না? বলবার ইচ্ছে থাকলেও, এর আগে কোন কথা তোদের কাছে প্রকাশ করতে পারি নি, সবই এইবার শুনবি।"

মামা বাবু সীতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"স্বামীজীর নিষেধে তোর কাছেও কোন কথা, আজকের এই আশীর্ব্বাদের আগে জানাতে পারি নি, মা। কিন্তু যার হাতে তোকে আজ দিতে যাচ্চি, এমন হাত খুবই ভাগ্যে মেলে। তা' হ'লে বামাচরণ বাবু, বিনুকে এইবার নীচে থেকে ডাকুন, আমিও আমার কায শেষ করি,—বাবাজীও আমার একটু চমকে যাক্!" বলিয়া মামা বাবু রামপ্রসাদী সুরে কি একটা গানের কলি গুন্ গুন্ করিয়া বার বার গাহিতে লাগিলেন। ইহাদের এই আয়োজনটি ভিতরে ভিতরে যে এত দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা আজিকার দিনের আগে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারি নাই। সেই যে দিন প্রথম কাশী আসি, তাহার পরদিন বৈকালে জ্যেঠামশাই আমাকে যে বলিয়াছিলেন,—'একটা নতুন কাযের তাড়া এসেচে, এইটে কোন রকমে আমায় সেরে যেতে হবে,' ভাবিতে লাগিলাম, সে কি এই কাযই? কিন্তু তাহার পর কেন যে তিনি আর সেই কথা আমাদের কাহাকেও বলিতে পারেন নাই, তাহার কারণও শুনিলাম। মামার গুরুদেব স্বামীজী মহারাজ বিনুদার ও সীতার কোষ্ঠী মিলাইয়া দেখিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে,—আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বে বর কন্যা কেহই যেন এ বিবাহের কথা জানিতে না পারে। না পারিলে এ যোগাযোগ খুবই মঙ্গলের, কিন্তু জানিতে পারিলে, ইহা সেরূপ মঙ্গলের না-ও হইতে পারে। এই কারণেই ব্যাপারটি আমাদেরও কাছে পর্য্যন্ত এমন করিয়া গোপন রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে আসিয়া, দশাশ্বমেধ ঘাটের পৈঠার উপর বসিয়া বিনুদা কহিল,—"এ আমি আগেই জানতে পেরেছিলুম, পঞ্চু।" আমি সাশ্চর্য্যে কহিলাম,—"এ যে তোমার জানতে নেই; কি করেই বা জানতে পেরেছিলে বিনুদা?"

"সে দিন কথায় কথায় হঠাৎ মামার মুখ থেকেই একটু আভাস বেরিয়ে পড়েছিল। যদিও থতমত খেয়ে, টপ ক'রে কথাটাকে তিনি ঘুরিয়ে নিলেন, কিন্তু তাই থেকেই আমি বুঝে নিছিলুম।"

"কিন্তু স্বামীজী যে বলে দিয়েছিলেন—"

"কি?"

"যে, আশীর্ব্বাদের আগে তোমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ এ বিষয় জানতে পারলে—"

"অমঙ্গল হবে ?"

"হ্যাঁ।"

"ছাই হবে, তুমিও যেমন !"

"তা যাক্ গে। কিন্তু বৌদি মারা যাবার পর তখন অত ক'রে যে জেদ ধরলে যে, কিছুতেই বিয়ে করবে না, আর করলেও না, কিন্তু আজ আশীর্ব্বাদের সময় হঠাৎ যে একেবারে নীরবে মাথাটি নুইয়ে দিলে, এইটেই এখনও আমি ঠিক বুঝতে পারচি না !"

"কি করি বল্। আজ বাদে কাল হয় ত বাবা ম'রে যাবেন, তাঁর মনে এ সময়ে একটা কষ্ট দেওয়া—বুঝলি না ?"

যাহা হউক, বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। প্রথম অগ্রহায়ণেই দিনস্থির হইয়াছিল। কিন্তু আমার ছুটী শেষ হইয়া আসিতে আমি আর থাকিতে পারিলাম না। অগ্রহায়ণ মাসে পনর দিনের ছুটী লইয়া আবার আসিবার পরামর্শ করিয়া সন্ধ্যাকে কাশীতে রাখিয়া আমি একেলাই কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। আসিবার দিন প্রভাতে সীতাদের বাটী দেখা করিতে যাইলাম। মামা বাবু বাটী ছিলেন না, সীতার মা কহিলেন,—"পৌছেই ও বাড়ীতে যেমন চিঠি দেবে, তেমনি এ-বাড়ীতেও একখানা চিঠি দিতে ভুলো না, বাবা।" তাহার পর মামীমার সহিত দু'একটা কথা কহিয়া সীতার খোঁজ করিলাম, মামীমা কহিলেন—"তোমার সাড়া পেয়েই সে পালিয়েছে।" সেদিনের আশীর্ব্বাদের পর হইতেই সীতা আর একটি দিনও আমাদের সম্মুখে আসে নাই। তথাপি তাহার ঘরের সামনে আসিয়া দরজা ঠেলিলাম; দেখিলাম, ভিতর হইতে তাহা বন্ধ। বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিলাম—"এখন আর আপনি' নয়—এখন 'বৌদি'। কিন্তু কত দিন এই রকম পালিয়ে পালিয়ে থাকেন, তাও দেখবো। অবিশ্যি আজ কাশী থেকে যদিও চল্লুম, কিন্তু আবার ত শীগ্‌গিরই আসচি।" এই সময় মামীমা বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে কহিলেন—"পাগলী লজ্জায় বুঝি খিল দিয়েছে ?" তাহার পর সীতার উদ্দেশ্যে কহিলেন—"দুদিন বাদে এ লজ্জা কোথায় রাখবি মা ?" বলিয়া তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন, আমিও নীচে নামিয়া আসিলাম।

সেই দিন রাত্রিতে ট্রেণে উঠিয়া পরদিন কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলাম। আফিস বন্ধ থাকায় কায-কর্ম্ম এত জমিয়া গিয়াছিল যে, তাহা আর বলিবার নহে। কাযের তাড়ায় সমস্ত কার্ত্তিক মাস কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল, তাহা জানিতেও পারিলাম না। অগ্রহায়ণ মাস পড়িতেই, পনর দিনের ছুটী লইয়া আবার কাশী আসিলাম। যথা-দিনে বিনুদার সহিত সীতার বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। সীতা আমার ভ্রাতৃজায়ারূপে এ বাটীতে আসিয়া আমাদেরই মধ্যে তাহার নিজের স্থান অধিকার করিয়া লইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বিনুদার বিবাহের কথা বলিয়া আমার এই 'পথের স্মৃতি'র শেষ পঙ্‌ক্তি টানিয়া দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হয় নাই। হয় নাই যখন, তখন ইহার সূত্র আরও কিছুদূর টানিয়া লইয়া যাইতেই হইবে। টানিয়া লইয়া যাইবার অবশ্য আপত্তি কিছু নাই, তবে একটা কথা ভাবিতেছি। ভাবিতেছি যে, লিখিতে বসিয়া এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কথা বহু দিনের পর প্রথম-জোয়ারের জলের মত একসঙ্গে হু হু করিয়া মনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার এক আনা রকম অংশও ত এ পর্য্যন্ত আমার লেখা হইল না, অথচ ইহারই মধ্যে রাশি রাশি কাগজ ত মসীলিপ্ত করিয়া ফেলিলাম। এই হিসাবে বলা চলিলে, কবে যে আমার সব-বলার শেষ হইবে, তাহা ভাবিলে হতাশই হইতে হয়। বিশেষতঃ বিনুদার বিবাহের পর, বছর পাঁচেকের মধ্যে এত সব রকমারি ঘটনা আমার জীবনের উপর দিয়া ঘটিয়া গিয়াছে যে, কেবল ঐ পাঁচবৎসরের ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে গেলেই এইরূপ আর একখানি পুস্তকের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। সুতরাং স্মৃতির দুয়ার বন্ধ করিয়া রাখা যাউক, কাহিনী আমার পথেতেই পড়িয়া থাকুক, শুধু হাতেই সূত্রটুকুকে আর একটু টানিয়া বাড়াইয়া, যেটুকু না বলিলে নহে, কেবল সেইটুকু-মাত্র বলিয়া এ কাহিনীর শেষ করিয়া দিই।

সম্মুখে 'পথের স্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিখানি খুলিয়া, কলম হাতে লইয়া ইহার নূতন পরিচ্ছেদ লিখিবার চেষ্টায় ওইরূপ কত কি যে ভাবিতেছিলাম, তাহার

আর অন্ত নাই। সন্ধ্যাব তখনও অনেক বিলম্ব ছিল। সে দিন সমস্ত দিনই 'গুমোট' কবিষা রাখিয়াছিল, অথচ বৃষ্টিরও কামাই ছিল না। মধ্যাহ্নে খুব এক পশলা বৃষ্টি হইযা বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে বৌদ্র উঠিতেছিল বটে, কিন্তু আকাশে মেঘের ঘটাও কম ছিল না। মধ্যে মধ্যে সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়া মেঘেব খণ্ডগুলি আকাশের এক দিক্ হইতে আর এক দিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আমার লেক বোডের বাটীর নির্জ্জন গৃহমধ্যে পুঁথিপত্র সম্মুখে লইযা বসিষা, মুক্ত জানালাব ফাঁকে মেঘ ও রৌদ্রের এই খেলা দেখিতে দেখিতে লেখাব কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। হঠাৎ চোখের সম্মুখ হইতে দিনের আলো যেন একেবারেই পড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে সেই চলন্ত মেঘের রাশি সাবা আকাশে ছড়াইয়া পড়িল, চারিদিক্ অন্ধকারে একবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, গুরু-গুরু মেঘেব গর্জ্জনে আকাশ প্রান্তব দিগ-দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। একটা মহাপ্লাবনেব পূর্ব্বস্থচনা বুঝিযা প্রকৃতি যেন আড়ষ্ট হইযা পড়িল। আমি তন্ময হইয়া বাহিরেব দিকে দেখিতে লাগিলাম। আজিকাব এই দৃশ্য দেখিয়া বহুকাল পূর্ব্বেব একটী দিনেব কথা আমাব মনে উদয হইল। সেও শ্রাবণেব এমনই এক মেঘাবৃত দিন। আমাব প্রসাদপুবেব পল্লীবাস-গৃহেব জানালাব ধাবে তখন আমি বসিষা ছিলাম। অদূববর্ত্তী শিলাই নদীব তীরে তীবে, তাহার দুই পাবেব দিগন্তব্যাপী শ্যামল প্রান্তবের মাথায় মাথায় সে দিনও এই রকম মেঘের ঘটা ঘটিযাছিল। এই রকমই, দেখিতে দেখিতে, সাবা পৃথিবী সে দিনও অন্ধকারে ছাইযা গিযাছিল, বহুদূবে প্রান্তব সীমায় গ্রামের বেখাগুলি অন্ধকাবে ঝাপ্‌সা হইযা আসিতেছিল, আব সেই অন্ধকারের মধ্যে আকাশ হইতে দেবরাজ ইন্দ্র যেন অনবরত তাঁহাব বোষদীপ্ত নযনেব বিদ্যুৎ-দৃষ্টিতে চক্ষু ঝলসিয়া দিযা বজ্রনির্ঘোষে মুহুর্মুহুঃ ধবিত্রীকে শাসাইযা ভয দেখাইতেছিলেন। সে দিনও এই বকম জানালাব ধাবে বসিযা দেখিতে দেখিতে প্রকৃতিব এই দৃশ্যেব ভিতর নিজেকে এমনই ভাবেই ডুবাইযা ফেলিয়াছিলাম। আজি দেওয়ালেব গায় সন্ধ্যাব ঐ ফ্রেমে-আঁটা বড় ছবিখানির চক্ষু দুইটিই অনিমেষে আমার দিকে চাহিয়া আছে, সে দিন সে অবস্থায় স্বয়ং সন্ধ্যাই আমার সেই ধ্যানদৃষ্টি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সে দিন সন্ধ্যা আমাব পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"কি ভয়ানক দুর্য্যোগ! যেন পৃথিবী রসাতলে যাবার আযোজন হচ্ছে!"

আমি বাহিরের সেই দুবন্ত দুর্যোগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কহিলাম,—"কি সুন্দর সন্ধ্যা, কি সুন্দর! জীবন আমার সার্থক! ঠাকুর আমার এমনি করেই মাঝে মাঝে দেখা দেন! আজ কোন কাজ নয়, সন্ধ্যা! সব কাজ ফেলে রেখে আজ এইখানে আমাব কাছে এসে ব'সে প্রাণ ভ'রে ভগবানকে অনুভব ক'বে নাও।"

সন্ধ্যা কহিল—"তোমার সবই অনাছিষ্টি। এই দুর্য্যোগের ভেতব তুমি ভগবান দেখছো?"

"সত্যি সন্ধ্যা, এই বকম সময়েই আমি তাঁর বিরাট মূর্ত্তি আকাশেব গায দেখতে পাই।"

"তা তোমাব ভগবানকে দেখিযে দেয এই! যে বকম আকাশ ভেঙ্গে জল নামছে, সব একেবারে ভাসিয়ে দেবে। দেখছ না কি ব্যাপাব?"

"কিন্তু ব'সে ব'সে শুধু বৃষ্টি দেখলেই ত আর হবে না, কাশী গিয়ে একবাব 'বড়কী'কে দেখে আসতে ত হবে। আবাব আজ তার চিঠি পেলুম।"

এখানে বলিযা বাখি যে, প্রথম প্রথম, সম্পর্ক হিসাবে সীতাকে সন্ধ্যা দিদি বলিযাই ডাকিতে গিয়াছিল, ফলে সীতাব নিকট হইতে সন্ধ্যা কয়েকটি অন্তবটিপনী খাইযা নিবৃত্ত হইযাছিল। এ দিকে সন্ধ্যাও সীতাকে পূর্ব্বেব ন্যায দিদি বলিয়া ডাকিবার অধিকার কিছুতেই আর দেয় নাই। শেষে উভয়ে একটা আপোষ মীমাংসা কবিষা লইয়া, সন্ধ্যা সীতাকে 'বড়কী' এবং সীতা সন্ধ্যাকে 'ছোটকী' বলিয়া ডাকিবাব ব্যবস্থা কবিয়া লইয়াছিল।

সন্ধ্যা কহিল,—"একবাব যাও! 'বড়কীর' শরীব যদি খুব খারাপ হযে থাকে, তা হলে দিনকতক এইখেনেই না হয় সে এসে থাকুক। বুকের রোগ হোক যা হোক পেসাদপুরেব জল-হাওয়া ভাল, নতুন যায়গা সেরে যাবে এখন।"

"তা ত যাবে এখন, কিন্তু বিনুদাব কথা জান ত? সে কাশী ছেড়ে কোথাও আব আসবে না।"

"বড়ঠাকুব না হয না-ই আসবেন, সেইখানেই থাকবেন।"

"বৌদিকে ছেড়ে? সে সেই আগেকার বিনুদা হ'লে সম্ভব হ'ত বটে।"

"বাস্তবিক, বড়ঠাকুরের এ হ'ল কি? যে লোক এক দণ্ড ঘরের মধ্যে থাকতো না, সে লোক যে সব কাযকর্ম্ম ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এই রকম চব্বিশ

ঘণ্টা ঘরের কোণে বড়কীকে চোখের সামনে রেখে ব'সে থাকবে, বাস্তবিক এ স্বপ্নেরও অগোচর। আহা, বড়কীর কত সাধ আমাদের কাছে একসঙ্গে থাকে। কত দুঃখ করেই যে সে চিঠি লেখে। তার এক একখানা চিঠি পড়লে আমার চোখ ভ'রে কান্না আসে।"

তখন মুসলধারায় বৃষ্টি নামিয়া পড়িয়াছিল। মাতাল বাতাস বৃষ্টির সঙ্গে মিতালী করিয়া তখন 'শিলাই'য়ের পরপারস্থিত আউসধানের শীষগুলিকে লইয়া একবারে নাস্তানাবুদ করিয়া দিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া সন্ধ্যা কহিল—"তা হলে, কবে যাবে বল দেখি?"

"আজকের এ বাদল যদি কা'ল থামে, ত কা'লই যাব, সন্ধ্যা। পদ্মাটাকেও একবার দেখবার জন্যে আমার মনটা অস্থির হয়েছে।"

আকাশে যত জল জমা ছিল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেবতা সব জল ঢালিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইলেন। পরদিন প্রসাদপুরের মাঠ-ঘাট পথ প্রভাত-রৌদ্রে ভরিয়া উঠিল। দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিয়া আমিও কাশী আসিবার অভিপ্রায়ে আমার পল্লীগ্রামের সেই ছোট ষ্টেশনটিতে আসিয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, উপন্যাসের নাম দিয়া ইহা লিখিলেও, ঘটনার শৃঙ্খলা বা গল্পের ধারাবাহিকতা কিছুই ইহাতে নাই। সুতরাং বিনুদার বিবাহের পর হইতে এই কয় বৎসরের কথা যখন কিছুই বলা হইল না, তখন বাঙ্গালাদেশের একান্তে এই ক্ষুদ্র প্রসাদপুরে আমাদের থাকিবার ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু না-ই বা বলিলাম। শুধু এইটুকু বলিলেই বোধ হয় হইবে যে, ইদানীং বৎসরের মধ্যে চারি পাঁচ মাস কাল আমি শিলাইতীরের এই গ্রামখানিতে আসিয়া কাটাইয়া যাই। এই সঙ্গে আরও দুই একটি কথা যাহা আমার বলা আবশ্যক, এই অবসরে তাহাও বলিয়া লই।

বিনুদার বিবাহের পর-বৎসরেই জ্যেঠামহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। পরবৎসর বৌদিও মাতৃহারা হয় এবং সেই বৎসরই মামাবাবু বেশী মাহিনাতে জব্বলপুর কালেজে চাকুরী পাইয়া কাশী ত্যাগ করিয়া যান।

কাশীর সেই বাড়ীখানি জ্যেঠামহাশয় কিনিয়াই গিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতেই বিনুদা বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে। এ কয় বৎসরের মধ্যে কাশী ছাড়িয়া একবারও বিনুদা কালীঘাট আইসে নাই বা কখনও যে আসিবে, তেমন লক্ষণও কিছু দেখি না। এ কয় বৎসরের ভিতর আমি বহুবারই কাশী গিয়াছি, কেন না, পদ্মাকে বেশী দিন না দেখিয়া আমি থাকিতে পারি না। এখন সে তবু একটু বড় হইয়াছে, কিন্তু যখন বড় হয় নাই, তখন সে-ও একটি দিন আমায় না পাইলে বাড়ীশুদ্ধ সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। আজ যে 'ধারা শ্রাবণের' ভরা বর্ষা মাথায় করিয়া সুদূর বাঙ্গালাদেশের একটী গ্রাম হইতে ব্যস্ত হইয়া সেখানে ছুটিতেছি, এ বিনুদা ও বৌদির জন্য যতটা না হউক, তাহার জন্য বটে। তাই খানিক পরে শব্দ করিয়া গাড়ী যখন ষ্টেশনে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন তাহার কথাই ভাবিতে ভাবিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"ঠাকুরপো, এখন কেমন আছ, ভাই?"

"ভাল আছি বৌদি। তোমার পূজো হয়ে গেল?"

কাশী আসিবার কিছু দিন পরেই জ্বরে পড়িয়াছিলাম। কয় দিনের পর আজ সকালে জ্বরটা বোধ হয় ছাড়িয়া গিয়াছিল। বিনুদার গঙ্গার ধারের ঘরখানিতে জানালার কাছে ইজিচেয়ারখানি টানিয়া লইয়া একান্তমনে ভাদ্রের ভরাগঙ্গার দিকে চাহিয়াছিলাম। সেই দিকেই চাহিয়া থাকিয়া বৌদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আজ এরি মধ্যে তোমার পূজো হয়ে গেল, বৌদি?"

লালপাড়ের মটকার সাড়ী পরিয়া একটু দূরে মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া বৌদি কহিল—"হ্যাঁ ভাই; আগেকার মত বেশীক্ষণ আর পূজোয় মন দিতে পারি না।"

"অসুখ শরীরে না দেওয়াই ভাল, বৌদি।"

"না ভাই, অমন কথা বোলো না। এই অসুখ শরীরে তাঁকে ডাকতে ডাকতেই যেন একদিন আমার ডাকার শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তা'ও ত হয় না।"

"কেন বৌদি, এমন কথা বল? তোমার মত সকল রকম গুণ নিয়ে এর আগে কোন বউ

বোধ হয় আমাদের সংসারে আসে নি। এমন কথা তুমি আর মুখে এনো না, তুমি যে আমাদের ঘরের লক্ষ্মী।"

"তাই হবার ত আশা করেছিলুম, ঠাকুরপো; কিন্তু তা হ'তে পারলুম কৈ! যা চেয়েছিলুম, তা ত পেলুম না, সেই দুঃখই ত আমার দুঃখ। আমি চেয়েছিলুম, সকলের সঙ্গে একসঙ্গে থেকে, ঘরের বৌ হয়ে, সর্ব্বরকম সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে থাকবো, কিন্তু তা ত আর হ'ল না! আজ আমার আপন শাশুড়ী না থাকলেও আর এক শাশুড়ী ত আমার বর্ত্তমান। আজ তিনিই বা কোথায়, আর আমিই বা কোথায়? আজ কোথায়ই বা আমার মা', কোথায়ই বা দেওর আর কোথায়ই বা ঘরের ছেলেমেয়েরা? আজ সকলের কাছ থেকে যে এইভাবে আমায় নির্ব্বাসিত হয়ে থাকতে হবে, এ আমি কিছুতেই আশা করিনি, ঠাকুরপো!"

"এমন ত অনেকেই থাকে, বৌদি।"

"যারা থাকে, তারা থাকে, তারাই জন্ম জন্ম থাকুক, কিন্তু এ আমি কিছুতেই চাই নি। বিয়ের পর থেকে কত সাধই করেছিলুম, এই ক'বছরে তার কোন সাধই ত আমার পূর্ণ হ'ল না। অসুখ ত আমার তাই, ঠাকুরপো। এ কি আমার দেহের অসুখ যে, পেসাদপুর নিয়ে গিয়ে, ছোটকী আমার রোগ সারাবে। এ রোগ আর আমার সারবে না, ভাই! ক'দিন ধ'রে সবই ত তোমায় বলিছি।"

"আচ্ছা, বিনুদা' কুস্তি-টুস্তি সবই একেবারে ছেড়ে দিলে? মিশনেও ত আর যান না?"

বৌদি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আমি কহিলাম—"অত কুস্তির ঝোঁক, জপতপ পুজো-আচ্চার মত নেশা, পড়ার মত বাই, এ সবই যে বিনুদা ছেড়েছুড়ে দিয়ে একেবারে এমন হয়ে যাবে, এ ত স্বপ্নেও কখনও—"

"বল ভাই—বল বল—এ কখনও ভেবেছিলে কি? ভেবেছিলে কি, দেশ ছেড়ে, বাড়ী ছেড়ে, আপনার জন ছেড়ে, জগতের কাযকর্ম্ম সব ঠেলে রেখে, শুধু আমাকে নিয়ে এইখানে এইরকম ক'রে থাকবে? আমার স্বামী যে এমন হয়ে গেল, এ আমারই পূর্ব্বজন্মের পাপ, ঠাকুরপো। নইলে, স্বামী আমি যা পেয়েছিলুম, খুব কম স্ত্রীলোকের ভাগ্যেই তা মেলে। অমন রূপ, অমন স্বাস্থ্য, অমন উদার হৃদয়, প্রশস্ত মন, অমন শিক্ষা, অমন শক্তি, আর সব চেয়ে অমন ঈশ্বরে ভক্তি, এত গুণ একাধারে খুব কম্ স্বামীতেই থাকে। তাই বিয়ের সময় দেবতা বলেই তাঁকে বরণ করেছিলুম। তখন জানি না যে, অভাগী আমার ভাগ্যদোষেই সেই দেবতা আমার পুতুল হয়ে এমনিধারা ধুলোমাখা হয়ে যাবে। স্বামীকে আমি স্বামীর মতনই চেয়েছিলুম; আমি চাই নি যে, পৃথিবীর সব কায ছেড়ে দিয়ে, দীন ভিখারীর মত চব্বিশ ঘণ্টা কেবল আমারই মুখের দিকে তিনি এই রকম চেয়ে ব'সে থাকবেন! অতুল সম্পদের অধিকারী হয়ে তিনি যদি এমনি ক'রে সে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে, ভিক্ষের ঝুলি হাতে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন, তা হ'লে আমাকে ভিক্ষে দিয়ে আমার দীনতা ঘোচাবে কে বল? কার ওপর আমি তা হ'লে নির্ভর করবো? এমন ক'রে তিনিই যদি নীচে নেমে পড়েন, তা হ'লে আমার হাত ধ'রে কে ওপরে তুলে নেবে, ঠাকুরপো?"

নীরবে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া গঙ্গা দেখিতে লাগিলাম। একটু থামিয়া বৌদি আবার বলিতে লাগিল—"বড় কষ্ট, ঠাকুরপো, বড় কষ্ট! দেবতার মত স্বামী পেয়েও, সব আমার লোকসান হয়ে গেল। এই দুঃখেই আমার এই অসুখ, ঠাকুরপো। এ অসুখ কি আমার চিকিৎসায় সারবে, না অন্য কোথাও গেলে সারবে? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন না-ই আর সারে। আজ আমার জন্যে তাঁর যে শক্তি, যে জ্ঞান, যে মহত্ব হীন হয়ে পড়েছে, যে উঁচু প্রাণ তাঁর আমার জন্যে এমন ভাবে বাঁধা পড়েছে, আমার অবর্ত্তমানে তা যদি আবার উঠতে পারে, আবার মুক্তি পায়! জীবন থাকতে যা হ'ল না, জীবন দিয়েও যদি তা হয়, তা হ'লে মরণই আমার সার্থক।"

হঠাৎ গঙ্গার জলের উপর ছায়া পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিল। বৌদি নীরবে দেওয়ালের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—"ঐ আমার অয়েল পেন্টিংয়ের চেহারাখানা যেখানে ঝুলছে, ঐখানে জগদ্ধাত্রীর বড় ছবিখানা টাঙানো ছিল, সেখানাকে খুলে তার যায়গায় আমার ঐ ছবি—ছিঃ ছিঃ—যখনি আমার ঐ দিকে নজর পড়ে, তখনি লজ্জায় আমার ম'রে যেতে ইচ্ছা করে। আর তা ছাড়া দেওয়ালের চারিদিকে আমারই রকম রকম এই সব ফটো দিয়ে যে

সাজানো, এর কি দরকার! তোমাকে কি বলবো, ঠাকুর-পো! কি উনি ছিলেন, আর কি হয়েছেন, সে ত তুমি পাঁচ ছ' বছর ধ'রে সবই দেখে আসছ! এ সবের ওপর আর একটি জিনিষ যা নতুন সুরু করেছেন, তাই দেখেই ত আমি ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি। সে কথা ত তুমি জান না, ঠাকুরপো।"

"কি বৌদি?"

"সে কথা তোমার কাছে আমার বলতেও লজ্জা হয়, ঠাকুরপো।"

"কি বল দেখি? স্বভাব চরিত্রে কোন—"

"সে সব কিছু নয়" বলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য নীরব থাকিয়া বৌদি কহিল,—"গোপন রেখেই বা কি করব! মাস দুত্তিন থেকে একটু একটু মদ খেতে আরম্ভ করেছেন।"

চাহিয়া দেখিলাম, বৌদির সমস্ত মুখের উপর একটা অসন্তোষ ও বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। তাহার সেই বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষুর দীপ্তি ম্লান হইয়া উভয় চক্ষুই জলে ভিজিয়া উঠিল। কথাটি শুনিয়া ভিতরে চমকাইয়া উঠিলাম বটে, কিন্তু বাহিরে সে ভাব গোপন করিয়া কহিলাম—"ও জিনিষটা নিয়মমত একটু খাওয়া যে খুব দোষের—তা নয়, ওতে বরং শরীর খুব ভাল থাকে। অনেক লোকেই ত আজকাল—"

কথাটা সব বৌদি আমাকে বলিতেও দিল না, অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে কহিল,—"ও কথা আর বোলো না, ঠাকুরপো। ঐ অজুহাত তোমার দাদাও দেন। কিন্তু ঐ একটু একটু হ'তে হ'তেই যে সর্ব্বনাশ হয়ে যায় কি না! আমিও অনেক দেখেছি, ঠাকুরপো। আমারই ছোট মামা ছিলেন; তিনিও প্রথমে ঐ রকম ব'লে, ঐ একটু একটু খেতে সুরু করেছিলেন। তার পর তাইতেই লিবার পাকিয়ে, রক্ত বমি ক'রে মারা গেলেন। আমার ভবানীপুরের মেসোমশাইও প্রথমে ঐ একটু একটু ধরেছিলেন। তার পর এখন রোজ তাঁর একটি ক'রে বোতল না হ'লে আর হয় না। আমি বলি, দরকার কি, ঠাকুরপো? শরীর ভাল? শরীর, ও না খেলেও বেশ ভাল থাকে। ও যে কি সর্ব্বনেশে জিনিষ, তা আমি জানি, ঠাকুরপো। তাই ত ভাবনায় আমি সারা হয়ে যাচ্ছি।"

"বিনুদাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ছাড়িয়ে দেওয়ালেই হবে; আমি ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলবো-এখন।"

"কি হবে তাতে? বলতে বোঝাতে আমি কি কসুর করিছি? জান ত, কি ধরণের মানুষ! যেটা ধরবে, তা ছাড়ায়, এমন লোক জগতে আছে? বলতে গেলে কোন কথা কাণে নেন্? বলেন,—শ্রীকৃষ্ণ খেত, বলরাম খেত, ভীম খেত, অর্জ্জুন খেত, দেবতারা খেত, মুনি-ঋষিরা সকলেই খেত। দেখ দেখি, এই সব কি কথা! এক এক সময় ঠাকুরপো, সত্যি কথা বলতে কি, আমার আত্মহত্যা ক'রে মরতে ইচ্ছা করে," বলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে বৌদি মেজের দিকে চাহিয়া রহিল। অপ্রীতিকর এই কথাটাকে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিবা'র উদ্দেশ্যে কহিলাম—"আচ্ছা বৌদি, আপনার মা কত টাকা দিয়ে গেছেন?"

"বাবা ত বেশী কিছু রেখে যেতে পারেন নি। বড্ডই খরচে ছিলেন তিনি। যা বিশ-বাইশ হাজার রেখে গেছলেন, সবই মা ওঁর হাতে দিয়ে গিয়েছেন। তা সে-টাকার বোধ হয় আর কিছুই নেই। সে-সব বোধ হয় নিশ্চিন্দি করেই ব'সে আছেন। তা করুন, তাতে দুঃখু নেই। যদি শান্তির সঙ্গে গাছতলাতেও ভিখিরী হয়ে থাকতে হয়, তাতেও সুখ।—ও মা, আমি ত বেশ। তোমায় কিছু খেতে না দিয়ে ব'সে ব'সে বেশ ত কথা কইচি। ঠাকুরপো, কি খাবে বল দেখি? বেলা হ'ল, কিছু তোমায় এনে দি, ভাই।"

"এখন আর কিছু খাব না বৌদি, শুধু আদা দিয়ে একটু চা যদি——"

মূর্ত্তিমতী বিষাদ-প্রতিমার মত ধীরপদে বৌদি চলিয়া গেল। আমি বিনুদার কথাই ভাবিতে ভাবিতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলাম। টেবলের উপর বিনুদার বাঁধান চক্‌চকে ডায়েরী-খানি ছিল। সেইখানি তুলিয়া লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, তাহারই পাতার পর পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। হঠাৎ মনে হইল, বিনুদার ডায়েরী, ইহা ত আমার পড়া উচিত নহে। তবুও 'উচিত'কে ঠেলিয়া দিয়া একটা পাতা তার না পড়িয়াও বন্ধ করিতে পারিলাম না। যেখানটা পড়িলাম, সেখানে এইরূপ লেখা ছিল:—

"বুধবার ২২ শে।—

সীতার শরীরের অবস্থা দেখে দিন দিনই আমার বড় ভয় হচ্ছে। ভগবান্ কি শেষে এই স্বর্গীয় পারিজাত আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন? জানি না, আমার অদৃষ্টে বিধাতার কি বিধান আছে। সীতাকে স্ত্রীরূপে পেয়ে যে সুখ যে শান্তি পেয়েছিলুম,

তা কার ভাগ্যে ঘটে? দুঃখের কালছায়া এসে পড়ে কেন,—এখন শান্তিতেও দুর্ভাবনার বিষ মিশে আমার প্রাণের গভীর আনন্দ এমন করে নষ্ট করে কেন? ছিলাম দরিদ্র ভিখারী, যত্নের মর্ম্ম বুঝিতাম না, ভগবান্ ভিখারীর হাতে জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন তুলে দিলেন, কিন্তু দিয়ে কি তিনি আবার তা কেড়ে নেবেন? তিনি কি এতই নিষ্ঠুর? তাই যদি হয়, তবে দিয়েছিলেন কেন? দেবার জন্যে ত তাঁকে মাথার দিব্য দিই নাই। দীন-দরিদ্রের হাতে রত্ন যেমন তিনি তুলে দিয়েছিলেন, তেমনি করেই তাকে আমি রেখেছি, এক দণ্ড তাকে চোখের আড়াল ক'রে থাকতে পারি না। মুহূর্ত্তের জন্য সীতাকে না দেখতে পেলে প্রাণ আমার অস্থির হয়ে পড়ে, জগৎ আমি শূন্য দেখি। মুহূর্ত্তের বিচ্ছেদ যার সহ্য করতে পারি না, তার চিরবিচ্ছেদ যদি ঘটে, কেমন ক'রে তা সহ্য করব? সত্যি তুমি যদি দয়াময় হও, তা হ'লে সীতার জীবন আমায় ভিক্ষা দাও। এ ছাড়া আর আমি কিছু চাই না; ধন-দৌলত, স্বাস্থ্য, কীর্ত্তি, প্রতিপত্তি, জ্ঞান, পুণ্য, কিছু চাই না।—আমি চাই সীতা—আমার প্রাণের সীতা—আমার জীবনে-মরণে চিরসঙ্গিনী সীতা! আমার——"

সিঁড়িতে বিনুদার গলার আওয়াজ পাইয়া, তাড়াতাড়ি ডায়েরীখানি বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। বিনুদা ঘরে ঢুকিয়া কহিল,—"এ সব এখন আমার যেমন আর মোটেই ভাল লগে না, ওরাও তেমনি নাছোড়বান্দা।"

"ওঁরা কারা এসেছিলেন, বিনুদা?"

"ওঁরা সেই স্কুলের ব্যাপার নিয়ে এসেছেন, এখনও সব ব'সে আছেন—জ্বালাতন আর কি!" বলিয়া বাক্স হইতে কি খানকতক কাগজ লইয়া বিনুদা তাড়াতাড়ি আবার নীচে নামিয়া গেল।

আমার জন্য চা লইয়া আসিয়া বৌদি কহিল— "এই মেয়ে-স্কুলের জন্যে এক সময় কি খাটুনিই না খেটেছিলেন! নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ ক'রে এক দিন এর জন্যে চাঁদা তুলে বেড়িয়েছিলেন। তা'ও কি সব টাকা উঠেছিল? শেষকালে দু-তিন হাজার টাকা যা কম পড়ল, উনি ত নিজেই সেই টাকাটা সব তখন দিয়ে দিয়েছিলেন। স্কুলের ঐ বাড়ী উনি না হলে কি আজ আর হত? তখন এই স্কুলের জন্য কত চাড়, কত চেষ্টা, আর আজ ওঁরা সব এসেছেন ব'লে মনে মনে কত বিরক্ত, দেখছ ত, ঠাকুরপো?"

চা খাইতে খাইতে কহিলাম—"মেয়ে-স্কুলের বাড়ী ত হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। তাই ওঁরা সব আজ সেখানে একটা সভা করবেন।"

বিনুদা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল— "আর সেই সভায় আমাকে আজ যেতেই হবে, তাই ওঁরা বলতে এসেছেন; আমার না গেলে আজ কিছুতেই হবে না, তা হ'লে সব কাষ পণ্ড হবে, আকাশ ভেঙে পড়বে, পৃথিবীর কাযকর্ম্ম সব একেবারে অচল হয়ে যাবে।"

আমি কহিলাম—"তুমিই ত স্কুলের গোড়া বিনুদা, এ সভায় তোমার যাওয়া চাই বৈ কি।"

"তুই আর বকিস নি। যা কিছু সব ত ক'রে দিয়েছি বাবা, এখন আর আমায় নিয়ে টানাটানি কেন? যাক—তুই আজ ভাল আছিস্ ত? ওবেলা যাওয়া যাবে এখন একবার। যেতে পারবি না? ঘণ্টাখানেক থেকে চ'লে আসা যাবে।"

তিন দিনের অনাহারে শরীরটা খুবই যদিও দুর্ব্বল ছিল, তথাপি বৈকালে স্কুলের সভায় যাইবার ইচ্ছাটাকেও কোনরকমে দমন করিতে পারিলাম না। বড় রাস্তা পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে আসিয়া সেইখান হইতে একখানি গাড়ী করিয়া বিনুদার সঙ্গে স্কুল-বাড়ীতে আসিলাম। স্কুলটি দ্বিতল; সদর রাস্তারই উপর। পাথর ও ইট মিলাইয়া হাল্‌ফ্যাসানানুযায়ীই তৈয়ারী। দোতলায় স্কুল বসিবে, নীচের তলাটি দোকানের জন্য ভাড়া দিয়া কিছু আয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নীচেকার হল্‌টিতেই সভার আয়োজন হইয়াছিল।

সভায় বিনুদাকে খুবই সম্মানিত করা হইল। তাঁহার গলায় রাশীকৃত ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া বুক একেবারে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় কহিলেন যে, বাঙ্গালা-দেশের বাহিরে এই সুদূর হিন্দুস্থানীর দেশে বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষার জন্য যাঁহার মন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং একমাত্র যাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি আজ কাশী-প্রবাসী বাঙ্গালীর অন্যতম গৌরবের জিনিষ হইল, তাঁহার উপযুক্ত সম্মান, আজ আমরা কিছুই দেখাইতে পারিলাম না। যত দিন এই স্কুল

থাকিবে, তত দিন এই স্কুলের নামের সঙ্গে তাঁহার পুণ্যময় নাম চিরস্মরণীয়—ইত্যাদি ইত্যাদি। বুঝিলাম যে, সভাভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত এই সম্মান ও ফুলের মালা ঠেলিয়া বিন্দুদার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার কোন উপায়ই নাই। আমি কিন্তু আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছিলাম না। ধীরে ধীরে সভাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম ও একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে চাপিয়া বসিলাম।

তখনও সন্ধ্যার বিলম্ব ছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া দুর্ব্বলপদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে গলির মধ্য দিয়া আসিতেছি, পার্শ্বের একখানি বাড়ীর বারান্দা হইতে উপরি উপরি দুই তিনবার কে আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। উপরের দিকে চাহিয়া দেখি, একটি আধা-বয়সী ফিট-ফাট স্ত্রীলোক,—মাথায় বাঁকা সিঁথা, পাতাকাটা চুল ভুরু পর্য্যন্ত নামান, পরিধানে একখানি চওড়া পাড়ের ধব্‌ধবে সাড়ী, কপালে কাঁচপোকার টিপ,—বারান্দার রেলিং হইতে মুখ বাড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহার দিকে চাহিতেই কহিল,—"পঞ্চুবাবু, সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেই ডানদিকে সিঁড়ি, একবার আসুন।" নিতান্ত পরিচিতের মত যিনি হাসিতে হাসিতে এমন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, সেই অভ্যর্থনা-কারিণীকে কোথাও কখন দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে করিতে পারিলাম না। তথাপি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া খোলা দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম এবং সম্মুখের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ পার হইয়া সিঁড়ির কাছে আসিতেই দেখি একটি কালো রংয়ের খর্ব্বাকৃতি হৃষ্টপুষ্ট ব্রাহ্মণ তাঁহার নগ্ন কৃষ্ণবক্ষে পৈতার গোছা ঝুলাইয়া আমার দিকে চাহিতে চাহিতে সেই প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছে। কাছে আসিতেই চিনিতে পারিলাম, "এ কি নন্দী মশাই! এখানে—"

হস্তভঙ্গীর দ্বারা আমার কথায় বাধা দিয়া তিনি তাঁহার বদ্ধ ধরা গলায় সাঁই-সাঁই রবে যাহা বলিলেন, সে কথা তাঁহার মুখের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া না পৌঁছিলেও, বুঝিতে আমার আটকাইল না। তিনি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"চুপ্, চুপ্, ও নাম ধ'রে ডাকবেন না। এখানে সকলেই আমাকে ঘোষাল মশাই ব'লে জানে" বলিয়া চারিপার্শ্বের অন্যান্য ভাড়াটীয়াদের ঘরগুলির দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইলেন এবং তাহার পর আমার হাত ধরিয়া বরাবর উপরে লইয়া গেলেন।

ঘরের মেজের একধারে পরিচ্ছন্ন ধবধবে শয্যা বিস্তৃত ছিল, তাহারই উপরে আমাকে বসাইয়া নন্দীমশাই বলিলেন, "ক'দিন হ'তে গলাটা ভেঙ্গে গিয়েছিল, আজ সকাল থেকে একেবারে আওয়াজই আর বার হচ্ছে না। তাই কামিনীকে ডাকতে ব'লে দিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যাচ্ছিলুম। অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল দাদা, অনেক কথা বলবার আছে। এই ক'বছরের ভেতর জীবনের ওপর দিয়ে আমার একটা তুফানই চ'লে গেল।"

"তুফানেরই যে সংসার! কি ব্যাপার বলুন দেখি?"

"সবই বলছি দাদা। কামিনী পঞ্চুবাবুকে পাণ দাও।"

শ্রীমতী কামিনী তখন পাণের সরঞ্জাম সম্মুখে করিয়াই বসিয়া ছিল। আমি কহিলাম,—"পাণ ত আমি খাই না, আপনি জানেন।"

"ঠিক ঠিক, ভুলে গিয়েছিলুম। তারপর সংক্ষেপে সব বলি। এর পর একদিন ভাল ক'রে সব বলবো। বাসাটা করেছেন কোথায়? মাঝে মাঝে যাওয়া যাবে; আর আপনিও পায়ের ধুলো দেবেন, দাদা! বাসাটা চিনে আসতে পারবেন ত? এই হাঁড়াবাগে এসে ঘোষাল মশাই ব'লে জিজ্ঞাসা করলে সকলেই দেখিয়ে দেবে! গণেশজীর মন্দিরের একেবারে গায়েই আর কি।"

আমি বসিয়া বসিয়া সেই অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘরখানির চারিপার্শ্ব একবার দেখিয়া লইলাম। সেই একখানি ঘরের মধ্যে সকল জিনিষই পরিপাটী-ভাবে সাজান, কিছুরই ত্রুটি নাই। ঘরের আসবাবগুলি ছাড়া আর একটি সজীব আসবাব বাহিরের বারান্দায় পিত্তলের একটি দাঁড়ে টাঙানো ছিল। টিয়াপাখীটি আমাকে দেখিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণে বা অকারণেই হউক, ভয়ঙ্কর চীৎকার সুরু করিয়া দিল। তাহাকে শান্ত করিতে কামিনী উঠিয়া গেল, নন্দী মশাই বলিল,—"তারপর বলি শোন, ভাই। তুমি ত চাকরী ছেড়েছুড়ে দিয়ে এলে, তারপরই বড় সাহেব চ'লে গেল বিলেত। তার যায়গায় যে এল, সে ব্যাটা মহা ঠ্যাটা, মহা পাজি। এসেই একটা মাস না যেতে যেতেই আমায় বল্লে কি না—'নন্দী, তুমি কাজকর্ম্ম কিছুই বোঝ না, খালি ফাঁকি দিয়ে মাইনে নিচ্ছ, আমি তোমার যায়গায় অন্য লোক রাখবো।' আমি

কি ধরণের 'অপাররাইট' লোক, জান ত দাদা, আমায় বলে কি না ফাঁকি দি! মুখের উপর তেমন আমি জবাব দিলুম—'Very good if you not lkie' I dont more come, I dont care for this 21 rupee post'; ব্যাটার এমনি অহঙ্কার পঞ্চুবাবু, ব্যাটা সেই দিনই আমায় ডিস্‌মিস্ ক'রে দিলে! আরে, আমি কি ডিস্‌মিসের ভয় করি, না তোর মত চিংড়ি-খেকো পিদ্রুকে ভয় করি? বড়সাহেব ছিল আমাদের একেবারে ঋষি, তার খোসামোদ করতুম ব'লে তো-ব্যাটার খোসামোদ করব? তেমন বাচ্ছাই আমি নই।"

"কি করলেন তখন?"

"রিজাইনিং দিয়ে চ'লে এলুম। আসবার সময় রুখে ব'লে এলুম—

"Very good but বিনা দোষে আমার 15 years service, you doing dismiss, but if God is in heaven your punish you must see.'

"তার পর?"

"তার পর দিনকতক বড় কষ্টেই কাটলো, ভাই। জান ত, একটি পয়সা বাইরে থেকে আর আসবার উপায় ছিল না। ঐ মাইনেটি যা পেতুম, কোন রকমে তাইতেই ত তিনটি প্রাণীর চলতো।"

"আপনার ত ছেলেপুলে ছিল না,—না?"

"না দাদা, ঐ স্ত্রীটি আর একটি মেয়ে। তা ছ'মাসের মধ্যেই ভগবান্ সুবিধে ক'রে দিলেন। স্ত্রীটি হঠাৎ গেলেন মারা। তখন মেয়েটাকে তার মামার কাছে গছিয়ে দিয়ে এসে, চ'লে এলাম এই কাশীতে। শুনেছিলুম যে, অন্নপূর্ণার রাজত্বে কা'কেও উপবাসী থাকতে হয় না। কিন্তু এখানে এসে দেখলুম, সেটা ব্রাহ্মণের পক্ষেই বেশী খাটে। অনেক সুখ-সুবিধে এখানে আছে বটে, কিন্তু তা ব্রাহ্মণদেরই একচেটে। সুতরাং এখানে এসেও দিন কতক খুবই কষ্টে কাটালুম। তারপর একদিন বিশ্বনাথের চরণের উদ্দেশে মাথা ঠেকিয়ে বললুম—'অপরাধ নিও না বাবা, আজ থেকে সাতকড়ি নন্দী তোমার সাতকড়ি ঘোষাল হ'ল—' ব'লে সেই দিনই গলায় এই পৈতে ঝোলালুম" বলিয়া নন্দী মশাই তাঁহার শুভ্র পৈতা গাছটিতে একবার হাত দিলেন।

আমি কহিলাম—"তা বেশ করেছেন। বামুন হবার পর আর ত আপনার কোন কষ্ট নেই?"

"না দাদা, তোমাদের আশীর্ব্বাদে আর বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় বেশ সুখেই আছি এখন। ক'টা দিনই বা আর বাঁচবো! এই ভাবে কাটিয়ে তাঁর চরণে স্থান পেলেই এখন যথেষ্ট।"

"আচ্ছা, নন্দী মশাই——"

"চুপ্ চুপ্, ঐটি ব'লে ডাকা ভুলতে হবে ভায়া, ঘোষাল——"

"ভুলে গিয়েছিলুম; আচ্ছা ঘোষাল মশাই!"

"ভায়া!"

"এ স্ত্রীলোকটি কে?"

"উটি হচ্ছেন" বলিয়া হাসিতে হাসিতে কি ইঙ্গিত করিলেন, তাহার মর্ম্ম ও অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নন্দী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। নন্দী মশাই কহিলেন "ওঁরও কেউ আর নেই। ব্রাহ্মণ-কন্যা আছেন আমার আশ্রয়েই, কিম্বা ওঁর আশ্রয়েই আমি আছি বললেও হয়। বড়ই সৎ চরিত্তিরের লোক উনি।"

"তা ত দেখতেই পাচ্ছি; তা ওনাকে তা হ'লে এইখানেই আপনার পাওয়া?"

"সকলই বিশ্বনাথের ইচ্ছা" বলিয়া নন্দী মশাই তাঁহার জোড় হাত মাথায় ঠেকাইলেন। আমিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম—"আচ্ছা, শরীরটা আজ ভাল নেই নন্দী—ঘোষাল মশাই, আজ উঠলুম, সন্ধ্যাও হ'ল।"

নন্দী মশাই আমার সঙ্গে সঙ্গে সদর পর্য্যন্ত আসিলেন, কহিলেন—"অনেক কথাই আপনার সঙ্গে আছে ভায়া, থাকা হবে ত কিছুদিন?" আমি ঘাড় নাড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। বাটীতে আসিয়া দেখিলাম, বিমুদা তখনও সভা হইতে বাটী আসে নাই। বৌদির সঙ্গে গল্প করিতে করিতে যখন চোখের পাতা ঘুমে জড়াইয়া আসিল, তখন ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল। তখনও পর্য্যন্ত বিমুদা গৃহে ফিরিল না দেখিয়া বৌদি একটু চিন্তান্বিতা হইয়া পড়িল। তাহার শরীরটাও সেদিন সন্ধ্যা হইতে ভাল ছিল না। কথা কহিবার সময় কয়েকবারই লক্ষ্য করিলাম, বৌদি দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া তাহার বুকের অসহ্য একটা ব্যথাকে যেন প্রাণপণ শক্তিতে ভিতরে ভিতরে চাপিয়া সহ্য করিয়া লইতেছে। বৌদিকে আর বসিয়া না থাকিয়া শুইতে বলিয়া আমি এ ঘরে চলিয়া আসিলাম ও আলো নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না, বিন্দুদার ঘরে একটা গোলমালের শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িয়া বিন্দুদার ঘরে আসিয়া দেখি, মেজের উপর বৌদি অজ্ঞান হইয়া ছিন্ন লতার মত লতাইয়া পড়িয়া আছে, আর বিন্দুদা এক হাতে মাথায় ও মুখে-চোখে জল দিতেছে, আর এক হাতে পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

শশব্যস্তে এ-ঘরে ছুটিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বিন্দুদাকে জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর পাইলাম না। ঘরের মধ্যে পদার্পণ করিতেই বিন্দুদা কহিল;—"পঞ্চু, আমাদের এই লাইনেই খানতুচ্চার বাড়ীর পরেই সুশীল চৌধুরী ডাক্তারের বাড়ী, আমার নাম ক'রে ডেকে আনতে পারিস? বাড়ীর দরজায় সাইনবোর্ড আছে, দেখে নিস্। খুব শীগ্‌গির। আমার নাম ক'রে ডাকলেই এক্ষুনি—।" সব কথা বিন্দুদার না শুনিয়াই আমি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলাম।

মিনিট পনর মধ্যেই আমি ডাক্তার চৌধুরীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলাম। বিন্দুদার নাম শুনিয়াই তিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ব্যস্ত হইয়া আমার সহিত চলিয়া আসিলেন। বিন্দুদা তাঁহাকে বলিল,—"মাঝে মাঝে বুকে একটা ব্যথা আটকাত, তার জন্যে ঘরে সর্ব্বদাই একটা ওষুধ থাকে। আধঘণ্টাটাক আগে সেই ওষুধ এক দাগ খেতে গিয়ে ভুলে পাশের একটা ব্রাণ্ডির শিশি থেকে আউন্সটাক ব্রাণ্ডি ঢেলে খেয়ে ফেলেচে। খাবার সঙ্গে সঙ্গেই senseless হয়ে এই অবস্থা!" ডাক্তার চৌধুরী কহিলেন—"এক আউন্স ব্রাণ্ডি খেলে ত senseless হয় না, ওঁর কি ফিট-টিট্ হ'ত আগে?" বিন্দুদা কহিল—"খুব কম; কালে-ভদ্রে। মনে খুব কষ্ট বা রাগ হ'লে কচিৎ কখন হয়।"

"যাই হোক, তাই হয়েচে আর কি" বলিয়া ডাক্তার চৌধুরী বৌদির বুক ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—"ভয় কিছু নেই, নাড়ী খুব ভালই আছে। কিন্তু এঁর Heart ভয়ানক weak—ভয়ানক—ভয়ানক। Heart সম্বন্ধে খুব ভাল ক'রে care নেবেন বিন্দু বাবু।"

তখনই ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে আবার তাঁহার গৃহে গেলাম। তিনি 'ডিস্‌পেন্‌সারি'-ঘর খুলিয়া দুইটি মোড়ক তৈয়ারী করিয়া দিলেন। তখনই ফিরিয়া আসিয়া সেই একটি মোড়ক বৌদিকে খাওয়ান হইল। ঔষধটি খাইবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বৌদি অল্প অল্প চেতনালাভ করিতে লাগিল। আরও মিনিট পাঁচেক পরে পূর্ণসংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া বৌদি পাশ ফিরিয়া শুইল এবং তাহার খানিক পরেই সেই মেজের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন দুপুরবেলা গঙ্গার দিকের টানা বারান্দায় বসিয়া বৌদির সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম। পূর্ব্বরাত্রির অনিদ্রার জন্য বিন্দুদা তেতলার ঘরে ঘুমাইতেছিল। আমি কহিলাম, "সত্যি বৌদিদি, ওষুধ মনে ক'রে ভুলে ব্রাণ্ডি খেয়ে ফেলেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"সত্যি বলচো?"

মুখ নীচু করিয়া, একটু মৃদুস্বরে বৌদি কহিল,—"সত্যি।"

"কিন্তু আমার তা মনে হয় না, আমার মনে হয় মিথ্যা।" একটুখানি চুপ করিয়া পুনর্বায় কহিলাম—"কাশীতে মিথ্যা কথা বল্‌লে কি হয়, জান ত?"

"জানি। যা হয়, তা কাশীতে বল্‌লেও হয়, কোলকাতাতে বল্লেও হয়" বলিয়া একটু দ্রুততার সহিতই উঠিয়া বৌদি ও-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

মিনিট দুই পরেই বৌদি আবার ফিরিয়া আসিল। মুখে তাহার বেদনা ও বিরক্তির ভাব। বড় বড় টানা চক্ষু দুইটির ভিতরে ভিতরে বোধ হয় যেন কিছু জলও জমা হইয়াছিল। সেই চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া চাপা উত্তেজনার স্বরে কহিল,—"সত্যি নয়।"

"কি বৌদি?"

"ভুলে খাওয়া।"

"তবে?"

"তবে?" বলিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া বৌদি কহিল,—"বল, এ কথা কারও কাছে কখনই বলবে না?"

"কারুর কাছেই বলব না বৌদি।"

"বল্‌লে, আমার মাথা খাবে, আমার মরামুখ দেখবে।"

"আচ্ছা।"

"কা'ল সব কথার ভেতর এই কথাটাকেই

শুধু তোমার কাছে গোপন করে ঠাকুরপো, আজ তা আর পারলুম না।" তারপর মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বৌদি কহিল—"নিজে একটু খেতে অভ্যেস ক'রে ইস্তক আমাকেও ওই ছাই খাওয়াবার জন্যে যে কত লোভই দেখিয়েছেন, তা আর কি বলবো! বলেন—'তোমার এই বুকের রোগটোগ সব সেরে যাবে, ক্ষিদে হবে, হজম হবে, চেহারা আরও সুন্দর হবে।'—কত চেষ্টাই যে আমাকে খাওয়াবার জন্যে করেছেন, কোন দিনই কিন্তু আমাকে খাওয়াতে পারেন নি। কা'ল যে আমার কি মতি হ'ল!"

"কা'ল নিজেই ইচ্ছে ক'রে খেলে বৌদি?"

"ইচ্ছে ক'রে? ওই জিনিষ ইচ্ছে ক'রে খাব?"

"তবে?"

"সেই কথাই ত বলছি তোমায়। কা'ল যখন উনি এলেন, রাত তখন প্রায় বারোটা। হাতের কব্‌জিতে, পাঞ্জাবীর আস্তিনের ওপরেই যুঁইফুলের ছড়াকতক মালা জড়ানো, চোখদুটো খুবই চকচকে, বুঝলুম—বাইরে কোথাও থেকে আজ একটু খেয়ে এসেছেন। আমার বুকের ব্যথাটা তখন এত বেড়ে উঠেছিল যে, আমি কথা কইতেই পাচ্ছিলুম না। উনি বল্লেন—'তোমার বুকের অসুখের একটা ওষুধ আনিয়ে রেখেছি, এক দাগ দি, খাও দেখি, এখনই ব্যথা সেরে যাবে এখন।" কা'ল কেনই যে ওঁর সে কথা বিশ্বাস করলুম! মেঝের ওপর শুয়ে ছিলুম, হাঁ করতেই মুখের ভেতর যেমন ঢেলে দিলেন, অমনি বিশ্রী একটা ঝাঁজে সমস্ত গলার ভেতরটা যেন আমার পুড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠলো। তার পরেই বোধ হয় 'ফিট' হয়ে পড়েছিলুম, সে ত তোমরা সব জান।"

মিনিট দুই তিন আমিও চুপ করিয়া রহিলাম, বৌদিও নীরবে বসিয়া রহিল। শেষে আমি কহিলাম,—"বৌদি তুমি দিনকতক প্রসাদপুরে চল।"

"চল ভাই, চল। বড় কুক্ষণেই এ বাড়ীতে আমি এসেছিলুম! এ বাড়ীর যাত্রা আমার বদলে আসতে হবে। ভাদ্রমাসের এই কটা দিন কেটে যাক্, এর মধ্যে তুমিও একটু সেরে নাও। তার পর একটা ভাল দিন দেখে, চল ত ভাই যাই।"

বৌদিকে লইয়া প্রসাদপুর আসিবার কথা সেই দিনই বিনুদার কাছে বলিলাম। বিনুদা প্রথমে রাজী না হইলেও বৌদির ও আমার আগ্রহাতিশয্যে শেষে তাহাকে আমাদের মতেই মত দিতে হইল; কিন্তু নিজের সম্পর্কে বিনুদা কহিল—"কাশী ছেড়ে আমি কোথাও পাদমেকং ন গচ্ছামি।" যাহা হউক, ২রা আশ্বিন আমাদের যাওয়ার দিন স্থির হইল, এবং সেই দিন সন্ধ্যার পর বিনুদার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া, ঠাকুরঘরের সমস্ত দেবদেবীর ছবিগুলিকে বার বার প্রণাম করিয়া, বৌদি আমার সহিত আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

এক দিন শ্রাবণের শেষে প্রসাদপুরের যে মূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছিলাম, আজি আশ্বিনে তথায় ফিরিয়া আসিয়া তাহার সে মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইলাম না। এই কয় দিনের ভিতরেই তাহার এক ভিন্ন রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর তাহার আকাশে মেঘের সে বিচিত্র ক্রীড়া নাই। তাহার আজিকার আকাশ একেবারেই মেঘশূন্য। শুভ্র সূর্য্যোকরোজ্জ্বলতায় তাহা আজ সুনীল, প্রফুল্ল, হাস্যময়। শরতের এই হাস্যচ্ছটা প্রসাদপুরের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাশ-সেফালী-কুমুদ-কহ্লারকে ফুটিবার ভার দিয়া তাহার কদম্ব-কেতকী-চম্পক আজ আত্ম-গোপন করিয়াছে। খাল বিল ডোবা পুষ্করিণী সকল কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। শিলাইয়ে আর জল ধরিতেছে না। জল-সম্পদে গর্ব্বিতা হইয়া, আনন্দে তর্ তর্ করিয়া শিলাই বহিয়া চলিয়াছে। তাহার পরপারের সেই আউস-ধানগুলি এই অল্পদিনের ভিতরেই পাকিয়া উঠিয়া স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। মাঠ-ঘাটের পথের জল শুকাইয়া গিয়াছে। গাড়ীর চাকার দাগ ও পথিকের পায়ের চিহ্ন বুকে লইয়া পথের কর্দ্দমরাশি আজ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বরষার স্নান সমাপন করিয়া প্রসাদপুরের বৃক্ষলতা কানন-প্রান্তর এক শুদ্ধ শ্যামল রূপ অঙ্গে ধারণ করিয়া বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে।

এখানে আসিবার কয়েক দিন পরে প্রসাদপুরের এই শরৎকালীন শোভা দেখিতে দেখিতে সে দিন শিলাইয়ের তীরের পায়ে-চলা পথ ধরিয়া যাইতে-ছিলাম। অপরাহ্নকাল; পরপারে বহুদূরে কাঁই-পাড়ার প্রান্তস্থিত ঝাউ বনের অন্তরালে সূর্য্যদেব তখন অস্ত যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। নদী-তীরের এই পথটি যেখানে আসিয়া ষ্টেশনের বাঁধের

রাস্তায় মিশিয়াছে এবং যেখান হইতে পূর্ব্বদিকে মাঠের উপর দিয়া আর একটি পথ সুন্দরদীঘির জলেশ্বরের মন্দিরের দিকে গিয়াছে, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম এবং ঠিক উপরেই যে প্রাচীন বটগাছটি ছিল, তাহার তলায় বসিয়া সম্মুখে মাঠের সেই পথের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিতে লাগিলাম।

সে দিন সন্ধ্যা ও বৌদি উপবাস করিয়া জলেশ্বরের মন্দিরে শিবের মাথায় গঙ্গাজল দিতে গিয়াছিল।

এখনও পূরা এক মাসও হয় নাই আমরা কাশী হইতে আসিয়াছি, কিন্তু ইহারই মধ্যে বৌদির স্বাস্থ্যের আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে। এখানে আসিয়া বৌদি তাহার বুকের অসুখ এক দিনও আর জানিতে পারে নাই, অথচ শরীরের উপর দিয়া অনিয়ম, অত্যাচার, পরিশ্রমও তাহার কম যাইতেছে না। এখানে আসিয়া অবধি সংসারের কাজ-কর্ম্ম বৌদি সন্ধ্যাকে বড় একটা করিতে দেয় না। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগের পর পূজার ফুল তোলা হইতে সুরু করিয়া সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিবার পর ঘণ্টা দুই তিন পূজার ঘরে কাটাইয়া খাইতে তাঁহার প্রত্যহই অপরাহ্ণ গড়াইয়া যায়। ইহার মধ্যে আবার কোন কিছু উপলক্ষ করিয়া মাঝে মাঝে উপবাস করাও আছে। অথচ ইহাতে তাঁহার কি অসীম উৎসাহ, কি গভীর তৃপ্তি, চিত্তের কি প্রফুল্লতা! সন্ধ্যা কখনও উপবাস করিতে পারিত না, কিন্তু বৌদি এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তাহাকেও বেশ শিষ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

এবার কার্ত্তিকমাসে পূজা পড়িয়াছে। মহামায়ার আগমনের আর অল্প কয়েক দিন মাত্র বাকী। প্রকৃতির চারিদিকে, আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, কাননে-প্রান্তরে, বৃক্ষে-লতায়, নর-নারীর অন্তরে অন্তরে মায়ের এই আসন্ন শুভাগমনের একটা সাড়া তখন পূর্ণমাত্রায় পড়িয়া গিয়াছিল।

আজ মহালয়া-অমাবস্যা। সকালে উঠিয়াই বৌদি আমাকে দুইখানা পাল্কীর জন্য বলিয়া কহিল,—"আজ আমরা উপোস ক'রে জলেশ্বরে জল দিতে যাব।" আমি কহিলাম, "এ তুমি কি আরম্ভ করেছ বৌদি? এই এত উপোস আর পূজো-আচ্ছা নিয়ে শরীরের ওপর এই রকম অত্যাচার ক'রে শেষে কি একটা তুমি—"

"কাণ্ড বাধিয়ে বসবো বলছ? কোন ভয় নেই ঠাকুরপো। কাশীতে তাঁর পায়ের তলা ছেড়ে কি কাণ্ড বাধাতে পারি? আর তা' ছাড়া পূজো-আচ্ছা, উপোস করলে কি কখনো কাণ্ড বাধে? আমরা হিঁদুর ঘরের মেয়ে, হিঁদুর ঘরের বৌ, এ আমাদের অভ্যেস আছে ঠাকুরপো! এই ক'রে দেহ আমার দিন দিন খারাপ হচ্চে কি ভাল হচ্চে, তা ত দেখতেই পাচ্ছ। আমি ত আবার সেই আগেকার মত হয়ে উঠেছি। দেখছ না, গায়ে কি রকম মাংস লাগতে আরম্ভ করেছে?" এ কথার পর কি-ই বা আর বলিব! দুইখানি পাল্কীর ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। দ্বিপ্রহরে আমাদের আহারাদি হইয়া গেলে দরোয়ান ও শৈলীর মা ঝিকে সঙ্গে লইয়া ইহারা জলেশ্বরের মন্দিরে যাত্রা করিয়াছে।

যে সময় তাহারা গিয়াছে, এতক্ষণে ফিরিয়া আসিবার কথা। যদিও সঙ্গে লোকজন আছে বটে, কিন্তু তবুও তাহাদের ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন, তাহাই সেই বটবৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে পাইলাম যে, অনেক দূরে, মাঠের পথে একখানি পাল্কী এই দিকে আসিতেছে। একটু কাছে আসিতে ভাল করিয়া দেখিলাম যে, আমাদের পাল্কীই বটে। কিন্তু একখানি কেন, আর একখানি কি হইল? ভাবিলাম, বোধ হয় পিছনে পড়িয়াছে, আর তাহারই সঙ্গেই বোধ হয়, দরোয়ান ও ঝি আসিতেছে। এ পাল্কীখানির মধ্যে সন্ধ্যা নিশ্চয়ই নাই, কারণ, সন্ধ্যা তাহার পাল্কীখানিকে মাঠের মধ্যে এমনভাবে যে আগাইয়া আসিতে দিবে, বিশেষ পাল্কীর সঙ্গে দরোয়ান বা ঝি কেহই নাই—তেমন সাহস তাহার কিছুতেই হইবে না। এ নিশ্চয়ই বৌদির পাল্কী। গ্রামের জানা-চেনা বেহারা হইলেও বৌদির এ সাহস যে অন্যায়, পাল্কী সামনে আসিলে এই কথাটাই বলিতে গিয়া দেখি যে, পাল্কীর দুই দিকের দরজাই খোলা আর তাহার মধ্যে আড় হইয়া শুইয়া বিনুদা গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছে। আমি চমকিত হইয়া কিছু একটা বলিতে যাইতে-ছিলাম, তৎপূর্ব্বেই বিনুদা বেহারাদের পাল্কী থামাইতে বলিল ও সঙ্গে সঙ্গেই পাল্কীর ভিতর হইতে নামিয়া পড়িয়া কহিল,—"তোকে আগে চিঠি না দিয়ে আসার এই শাস্তি পণ্টু! ষ্টেশনে নেমে বাঁধের রাস্তা ধ'রে ঠিক এইখানেই এসেছিলুম, কিন্তু সোজা না গিয়ে বরাবর এই মাঠটা ভেঙ্গে চ'লে গিয়েছি।"

আমি কহিলাম—"কোন চিঠি-পত্তর খবর-টবর না দিয়ে হঠাৎ এমনি ক'রে—। আড়াইটের গাড়ীতে নেমেছিলে বোধ হয় ?"

"হ্যাঁ রে। নাকালের একশেষ আর কি। এ দিকে কি দীঘি ব'লে একটা গাঁ আছে ?"

"হ্যাঁ, সেই সুন্দরদীঘিতে একেবারে গিয়ে পড়েছি। দুপুরবেলা, মাঠে একটা লোকও দেখা পাই না যে জিজ্ঞাসা করব। সমস্ত দুপুরের রোদ্দুরটাই আজ মাথার ওপর দিয়ে গিয়েছে। এখান থেকে সেই শিবের মন্দির কি কম দূর, বোধ হয়—"

"পাকা তিন মাইল পথ বিনুদা। ওদের সঙ্গে সেখানে দেখা হ'ল ত ?"

"তা না হ'লে আর পাল্কী পেলুম কোথায় ?"

কথা কহিতে কহিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। খালি পাল্কী তুলিয়া বেহারারা বৌদি ও সন্ধ্যাকে আনিবার জন্য আবার সুন্দরদীঘির মাঠের পথে ফিরিয়া গেল।

বাটীতে আসিয়া মুখ-হাত ধুইয়া কিছু জলযোগান্তে চা খাইতে খাইতে বিনুদা কহিল—"দেখ পঞ্চু, ভাবলুম, অত ক'রে এখানে একবার আসবার জন্যে বলে এলি, না এলে দুঃখ করবি, তাই একবার এসে পড়লুম। ও ত দেখলুম বেশ সেরেসুরে গিয়েছে রে! তোর পেসাদপুর দেখছি ওর পক্ষে শিমলের পাহাড় হয়ে গেছে! কাশীর মত জায়গায় থেকে যে শরীর সারলো না, এখানে এই ক'দিন এসেই—আচ্ছা, পদ্মটা ত' তেমন গায়ে সারতে পারি নি।"

"এখানে এসে পর্য্যন্ত বৌদি ভারি আনন্দেই আছে বিনুদা।"

"সে ত দেখতেই পাচ্ছি। দু'কোশ মাঠ ভেঙ্গে গিয়ে শিবের মাথায় জল দেওয়া, স্কুলে মাষ্টারী করা—?"

"স্কুলে মাষ্টারী করা ?

"হ্যাঁ রে! গিয়ে দেখি কি, মন্দিরের চাতালের ওপর বৌমা ব'সে রয়েছে, নইলে ত আমি বরাবর আরও চ'লে যেতুম। বৌমা ত হঠাৎ আমাকে দেখেই একেবারে চমকে উঠল। মনে মনে ভাবলুম, ঠিকই তা হ'লে পেসাদপুরে এসে পড়েছি। স'রে এসে এ ধারে মন্দিরের ছায়ায় এসে দাঁড়াতেই দরোয়ান বসে বললে—'আপনি পাল্কীতে গিয়ে বসুন, বেহারা লোক আপনাকে বাড়ী পোঁছে দিবে। বড় মাইজী ওহি স্কুলমে গিয়া।' স্কুল? স্কুলমে গিয়া? সামনে চেয়ে দেখি, সত্যিই বটে, খানিকটা দূরে একটা টীনের প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে একপাল মেয়ে—"

"হ্যাঁ বিনুদা, ও গাঁয়ের মিত্তিররা মেয়ে-স্কুলটা নতুন বসিয়েছে।"

"তা হবে। এক-পা এক-পা ক'রে কাছে গিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি যে, তোর বৌদি চেয়ারে ব'সে সেখানে মহা মাষ্টারী আরম্ভ ক'রে দিয়েছে" বলিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বিনুদা কহিল—"মেয়েদের জিজ্ঞাসা করাতে বড় বড় দু-চারটে মেয়ে বলেছিল যে, পৃথিবীর ভেতর গরম হয়ে উঠলে ভূমিকম্প হয়, তোর বৌদি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে, হাত-মুখ নেড়ে কি বক্তৃতে—'না—না—না' কিছুতেই তোমরা এ কথা বলবে না। বইয়ে তোমাদের যা লেখা থাকে থাকুক, ও খালি প'ড়ে যাবে, মনে নেবে না। তোমাদের ঠাকুরমা-দিদিমারা, তোমাদের ঘরের মা-খুড়ী-জ্যেঠাইরা যা বলেন, যা আমরা চিরকাল ধ'রে আমাদের ঘরে শুনে আসছি, তাই বলবে। বলবে যে, বাসুকি পৃথিবীর ভার সহ্য করতে যখন আর পারেন না, তখন একবার ক'রে ফণা বদলান, তাই তখন পৃথিবী নড়ে ওঠে। শুধু কাশী মহাদেবের ত্রিশূলের ওপর আছে ব'লে সেখানে ভূমিকম্প হয় না।' ওরে বাস রে, সে হাত-মুখ নাড়বারই বা ধরণ কি, আর সে বলবারই বা ভঙ্গী কি!"

নীচে কথার গোলমালে বুঝিলাম, ইহারা সব ফিরিয়াছে। বিনুদার দিকে চাহিয়া কহিলাম—"মহাদেবের ত্রিশূলও কিন্তু এবার নড়ে উঠেছে বিনুদা, নইলে তুমি যে কাশী থেকে ছিটকে এখানে এসে পড়বে, এ স্বপ্নেরও—"

দরজায় পায়ের শব্দ হইল। বৌদি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিনুদার উদ্দেশ্যে কহিল,—"রাত্রে ভাত খাবে না লুচি খাবে? সমস্ত দিন ত আর পেটে ভাত পড়ে নি।"

"তা ত পড়ে নি, সুতরাং ভাতই খাওয়া যাবে; কিন্তু বাসুকির ফণার কি সাংঘাতিক জোর রে পঞ্চু, এত বড় পৃথিবীটাকে ফণার ওপর অবলীলাক্রমে ধ'রে রয়েছে, আর সে ফণা না জানি বড়ই বা কত! তার পর শুধু একটাই ফণা নয়, এই রকম এক হাজার—!" পরক্ষণে বৌদির মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"আচ্ছা হ্যাঁ গা, বাসুকি থাকেন কোথায়,

পাতালে ত? কিন্তু ষ্টেশন থেকে নেমে বাড়ী পর্য্যন্ত আসতে পথে যে রকম তাঁর ছোট-বড় প্রজাপুঞ্জের দর্শন পেলুম, তাতে মনে হয়, কাছাকাছিই কোথাও যেন তাঁর রাজসিংহাসন পাতা আছে।"

"বেশ বেশ, তোমার আর ফাজলামী করতে হবে না। ঠাকুরপো, কা'ল ভাই একটু ভোর ভোর আমায় তুলে দিও ত, ওদের সব নেমতন্ন ক'রে এলুম।"

"কাদের বৌদি?"

"মিত্তির-বাড়ীর বৌদের। বৌ তিনটি যেমন শিক্ষিতা—তেমনই অমায়িক। শিবের মাথায় আমাদের জল দেওয়া হয়ে গেলে পরে, কিছু না খাইয়ে আর আমাদের ছাড়লে না। সে যে কি যত্ন, তার তোমায় কি বলবো ঠাকুরপো! ঘরে গোপীনাথ ঠাকুর, তিন যায়ে মিলে কি সেবাই যে ঠাকুরের করে! ঐ বৌদের ঝোঁকেই স্কুল। তিন জনে সঙ্গে ক'রে আমায় স্কুল দেখালে। কালই ত স্কুল হয়ে পুজোর ছুটী হয়ে যেত। সে দিন আমি ব'লে দিয়েছিলুম কি না যে, মহালয়ার দিন যাব, তাই কা'ল আর স্কুলে ছুটী দেয় নি, আজ স্কুল ক'রে তবে ছুটী দিলে।" মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বৌদি বলিল,—"একটা কাজ ক'রে এসেছি ঠাকুরপো।"

"কি বৌদি?"

"স্কুলের জন্যে একশটা টাকা দেবো ব'লে এসেছি। কা'ল ওদের হাতে টাকাটা দিয়ে দিলেই ভাল হয়। তুমি ভাই, এই একশ টাকা কা'ল আমাকে দিও, তার পর আমি তোমায় দিয়ে দেবো এখন,—কেমন?"

"আচ্ছা বৌদি।"

এই অল্প সময়ের মধ্যে এদিকে তখন বিনুদার নাক ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বৌদি কহিল,—"পথের কষ্ট কি কম কষ্ট! গোটা একটা রাত একটা দিন ত গাড়ীতে কেটেছে। যাই আমি রাঙ্গাদি'কে আগে চারিটি ভাত চড়িয়ে দেবার কথা বলে আসি" বলিয়া নীচে নামিয়া গেল। খানিক পরে ওদিককার ঘর হইতে অনেক দিন পরে আজ হার্ম্মোনিয়মের সঙ্গে বৌদির গলা পাইলাম। বৌদি গাহিতে লাগিল—

(তোমার) ডাকের সাড়া কর্ণে লেগেছে।
তাই গো আমার শেষ নিশাতে তন্দ্রা ভেঙ্গেছে॥
পথে আমার পায়ের চিহ্ন, কার গো ছিন্নভিন্ন?
কার সে গায়ের গন্ধে আমার বাতাস ভরেছে?
চারদিকে ঐ কে ডেকে যায়—
'আয় রে ওরে আয় রে আয়'?
কার সে গীতি, কার সে প্রীতি, আকুল করে যে!
যাই গো আমি, জীবনস্বামী, তন্দ্রা ভেঙ্গেছে॥

সেইখানেই কাত হইয়া শুইয়া বৌদির গানখানি শুনিতে শুনিতে আমারও চোখের পাতা ঘুমে জড়াইয়া আসিল। সুমিষ্ট কণ্ঠের উচ্চতম পর্দ্দা হইতে তরঙ্গায়িত সুরটি যখন গান-শেষের সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন পর্দ্দায় নামিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন সত্যই মনে হইল, যেন কোন সুদূর স্বপ্নলোক হইতে কোনও অগ্রদূতের আহ্বানে গায়িকা ব্যাকুল অন্তরে যাই যাই বলিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছে। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিশীথের সেই নীরবতার মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া অর্দ্ধ-সচেতন অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় শুনিতে লাগিলাম, কে যেন সূক্ষ্মদেহে পক্ষবিস্তার করিয়া অতি দূরদূরান্তরে সীমাহীন শূন্যপথে ভাসিতে ভাসিতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেছে, আর ব্যাকুলকণ্ঠে গাহিতেছে—

'যাই গো আমি, জীবনস্বামী, তন্দ্রা ভেঙ্গেছে।'

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন কি অসীম উৎসাহ আর অবিরাম পরিশ্রমের মধ্য দিয়া যে বৌদির কাটিয়া গেল, তাহা আর বলিবার নহে। কিন্তু ফলও ইহার ফলিল। শুনিলাম, সারারাত্রি গায়ের বেদনায় বৌদি কেবলই ছটফট্ করিয়াছে এবং নিদ্রাহীন রাত্রি কাটাইয়া পরদিন অনেক বেলায় যখন বৌদি উঠিল, তখন তাহার বেশ একটু জ্বর হইয়াছে। বৈকালে এই অল্প জ্বরের উপরেই বেশী করিয়া আবার জ্বর আসিল এবং দুই দিনের মধ্যে সে জ্বরের আর বিরামই হইল না। তৃতীয় দিনে বৌদির জ্বর অন্য দিন অপেক্ষা আরও বেশী হইল।

এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজ কি মাথার যন্ত্রণা বড্ড বেশী হচ্ছে, বৌদি?" আরক্ত চক্ষু দুইটি আমার দিকে ফিরাইয়া, দুই হাতে মাথাটাকে খুব জোরে টিপিয়া ধরিয়া বৌদি বলিল—"মাথার যন্ত্রণা? উঃ! কে—ঠাকুরপো?—এখন দিন না রাত

বলতে পার ?" পার্শ্বে বিনুদা বসিয়া ছিল, জিজ্ঞাসা করিল—"মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে ?"

"মাথায় ? কোথায় মাথা ? আমার ত মাথা নেই। মাথা নেই—মাথা নেই—মাথা নেই—মাথা —নেই—মাথা ম'রে গেছে—ম'রে গেছে গো! জান না ? সেই—সেই—উঃ! দেখ ঠাকুরপো, একটা শিয়াল—না না—একটা হাড়গিলে—ছুটু ছুটু! উঃ! কি ছুটতেই পারে বাবা!" বলিয়া খানিকক্ষণ নিঝুম হইয়া বৌদি চোখ বুজাইয়া রহিল। তাহার পর তেমনি চোখ বুজাইয়াই অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল—"কি জিজ্ঞাসা করছিলে ? হ্যাঁ, মাথার যন্ত্রণাটা আজ বড্ড বেশী।"

"আর কোন যন্ত্রণা হচ্ছে, বৌদি ?"

"কিছুই বুঝতে পারছি না, অনেক রকমই হচ্ছে। —ঐ প'ড়ে গেল! ধর্ ধর্—যাঃ!" বলিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—"যাই গো আমি জীবন-স্বামী—।"

ঘণ্টাখানেক পর ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেল, কহিল—"জ্বরটা এইবার রেমিসান হচ্ছে। তিন দিনের পর জ্বরটা ছাড়ছে ব'লে একটু restless হয়েছেন—যা হোক, ওঁকে বেশী বকতে দেবেন না। একটু ঘুমুতে পারলেই ভাল হয়, যদিও ঘুমুতে উনি এখন বোধ হয় পারবেন না।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে বিনুদাও উঠিয়া গেল। বৌদিকে বলিলাম—"একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর বৌদি, আমি যাই।"

"আমিও যাই।"

"কোথায় বৌদি ?"

"ওই যে ডাকছে।"

"একটু চুপ ক'রে ঘুমাও দেখি।"

"ঘুমুচ্ছিলুম ত, ঘুম ভেঙ্গে গেল ভাই, (সুর করিয়া) 'তাই গো আমার শেষ নিশাতে তন্দ্রা ভেঙ্গেছে'। উঃ! ঠাকুরপো, ভাই, মাথাটা আমার আছে কি না দেখ ত, কেউ কেটে নিয়ে যাচ্ছে না কি ?" মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বৌদি পাশ ফিরিয়া শুইল। সেই অবস্থায় চোক বুজাইয়া অতি মৃদু মৃদু কহিল—"সত্যি ঠাকুরপো, আমায় চারিদিক্ থেকে কেবলই ডাকছে,—কাছে এসে ডাক্‌তে ডাক্‌তে আবার দূরে চ'লে যাচ্ছে! কেমন জান ? যেমন জানকীর দুঃখে মা বসুন্ধরা তাঁকে কোল বাড়িয়ে ডেকেছিল—আয়, আয়, ঠিক তেমনি।" বলিয়াই বৌদি আবার গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল—"যাই গো আমি জীবনস্বামী তন্দ্রা ভেঙ্গেচে।"

আমি দেখিলাম, কাছে কেহ থাকিলেই বৌদি এই রকম অনর্গল বকিতে থাকিবে, তাই উঠিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

ডাক্তারের অনুমানই সত্য হইল। সেই রাত্রিতেই বৌদির জ্বর রেমিসন্ হইল। তাহার পর দুই দিন ধরিয়া আর তাঁহার একবারেই জ্বর আসিল না। পরের দিন সপ্তমীপূজা, সেই দিন বৈকালের দিকে একটু যেন বৌদির গা গরম হইল, কিন্তু ডাক্তার কহিল যে, উহা কিছুই নহে।

এই গ্রামটিতে কয় বৎসর হইতে বারোয়ারীতে দুর্গোৎসব হইয়া আসিতেছে। এই কার্য্যের মূলও ছিলাম যেমন আমি, তেমনই অনেকটা পরিমাণে আমারই অর্থ ও পরিশ্রমের উপরই ইহা নির্ভর করিত। এ বৎসরও মাকে আনা হইয়াছে, কিন্তু বৌদির অসুখের জন্য এবার আমি অন্যান্য বৎসরের মত ইহাতে তেমন ভাবে যোগ দিতে পারি নাই। কয় দিনের পর সে দিন বাড়ী হইতে বাহির হইবার অবকাশ পাইয়া ঠাকুর তলাতে আসিলাম। মহামায়াকে দর্শন করিয়া, সমস্ত বিকালটা সেখানে কাটাইয়া সন্ধ্যার পর বাটী ফিরিয়া আসিলে, বৌদি জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ মহাষ্টমী ঠাকুরপো ?" তাহার শিয়রের ধারের চেয়ারখানার উপর বসিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ বৌদি।"

"আমি আরতি দেখতে যাব।"

"কোথায় ?"

"ঠাকুরতলায়।"

"তুমি পাগল হয়েছ, বৌদি ? এই শরীর নিয়ে তুমি যাবে ঠাকুরতলায় ?"

"হ্যাঁ ঠাকুরপো, যাবো। মা এত কাছে এলেন, একবার দেখবো না, চোখ বুজিয়ে থাকবো ? চোখ বুজিয়েও যে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। একটিবার আমি যাব, ঠাকুরপো।"

বিনুদা আসিয়া কহিল,—"হ্যাঁ, ঠাকুরতলায় ঠাকুর দেখে অমনি একবার শিবের মাথায় জলটাও দিয়ে এস, তার পর মিত্তির বাড়ীর সকলকে নেমন্তন্ন ক'রে এসে, কালকে উদয়াস্ত খেটে তাদের ভাল ক'রে খাইয়ে দাইয়ে দাও। দিয়ে—"

"আচ্ছা গো আচ্ছা, বলেছি, আমার ঘাট হয়েছে, আর বোলব না।"

"না—না—তা কি হয়। ঠাকুরতলায় আজ

একবার যেতে হবে বৈ কি, আমি পাল্‌কী ডেকে আনি" বলিয়া বিনুদা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আমিও বাহিরে আসিয়া বারান্দায় আরামকেদারা-খানার উপর বসিয়া পড়িলাম। সেইখান হইতে শুনিতে পাইলাম, সন্ধ্যা কহিল—"বড়্‌কী তুমি এ যা-তা বলতে আরম্ভ করেছ। সাত দিনের এই অসুখের পর এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে আজ তুমি যাবে ঠাকুরতলাতে ?

জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম, দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে বৌদি কহিল—"ওরে যাব না—যাব না—যাব না। বাবা রে বাবা, একবার বলেছি ব'লে সকলে একেবারে হাঁ হাঁ ক'রে এসেছে !"

অষ্টমী কাটিয়া গেল, নবমীও কাটিল। মহামায়ার সাম্বৎসরিক উৎসবের শেষ হইল। কয় দিন ধরিয়া ক্ষুদ্র গ্রামখানির উপর যে একটা উৎসাহ ও পুলকের সাড়া পড়িয়াছিল, নবমীর নিশান্তের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অবসান হইল। ঠাকুরতলায় ঢুলীদের ঢোল-কাঁসর হইতে আজ বিজয়ার প্রভাত হইতে বিদায়ের বাদ্য বাজিতে সুরু করিল।

এ দিক্‌কার ঘরে বসিয়া কি-একখানা ইংরাজী নভেল লইয়া আমি পড়িতেছিলাম। আজ বৌদি অন্নপথ্য করিবে। সম্মুখে মেজেয় বসিয়া বৌদির জন্য মাছের ঝোলের তরকারী কুটিতে কুটিতে সন্ধ্যা আবোল্‌-তাবোল্‌ কত কি বলিয়া আমায় বিরক্ত করিতেছিল। শেষে তাহার কথার জবাব দেওয়া বন্ধ করাতে, বঁটী ও তরকারীর থালা লইয়া সন্ধ্যা নীচে নামিয়া গেল। খানিক পরে আবার পায়ের শব্দে বহি হইতে মুখ ফিরাইয়া দেখি, বৌদি একখানি পাটের সাড়ী পরিয়া আমার সামনে দাঁড়াইয়া। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ কি বৌদি ?"

"যাবো।"

"কোথায় ?"

"যেতেই হবে একবার,—ঠাকুরতলায়। আজ আর তোমাদের কারো কথা আমি শুনব না।"

"আট ন'দিন পরে আজ দুটি ভাত খাবে, আজ তুমি কখন ঠাকুরতলায় যেতে পার ? আর পূজো ত শেষ হয়ে গেছে বৌদি, আজ ত বিসর্জ্জন।"

"সেই জন্যেই ত আজ একবার যেতেই হবে। আর আজ যদি একটিবার তোমরা আমায় যেতে না দাও, তা হ'লে আবার কিন্তু আমার অসুখ করবে। সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখিছি, মা আমায় খালি ডাকছেন।"

"আচ্ছা বৌদি, মাকে তোমায় দেখাব। বিসর্জ্জনের সময় এই পথ দিয়েই ঠাকুর নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব এখন। এই দুর্ব্বল দেহ নিয়ে তুমি কি কখনো এতটা পথ যেতে পার ?"

অসম্ভব ধীর গলায় বৌদি কহিল—"মাকে দেখবার জন্যে হিড় হিড় ক'রে তাঁকে আমার বাড়ীর দরজার সামনে টেনে আনাবো ? এমন কথা আর বোলো না, ঠাকুরপো, এতে পাপ হয়। আর তা ছাড়া দেহ ত আমার দুর্ব্বল নয়। তোমাদের চেয়ে আমার দেহে পায়ে বল আছে জানবে। আমি এখনি এক কোশ, দু'কোশ, চার কোশ হেঁটে যেতে পারি। আমার সঙ্গে তুমি হাঁটতে পারবে ? চল ঠাকুরপো, ওঠ ভাই, লক্ষ্মীটি।" দেখিলাম, আজ বৌদি না-ছোড়বান্দা। প্রকৃতপক্ষে, কাহারও মানাই আজ বৌদি মানিল না। বিনুদা আসিয়া বলিল, সন্ধ্যা অনেক করিয়া বুঝাইল, কিন্তু কাহারও কথাই আজ আর বৌদি শুনিতে চাহিল না, উপরন্তু সকলের এই বাধাপ্রদান ও পীড়াপীড়িতে তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। তখন অগত্যা একখানি পাল্‌কীর বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে ঠাকুরতলায় লইয়া আসা হইল। বিনুদা ও আমি সঙ্গে আসিলাম।

তখন সকাল-বেলায় ছোট ছেলে-মেয়ের দলই ঠাকুরতলায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বৌদির সেই রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখে একটা গভীর তৃপ্তি ও প্রফুল্লতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। মিনিট দুই তিন ধরিয়া অপলকনেত্রে প্রতিমা দর্শন করিবার পর, আমার মুখের দিকে চাহিয়া বৌদি কহিল—"এইখানে একটু বসি, আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন ক'রে উঠ্‌ছে।" বিনুদা কহিল—"তা হ'লে আর ব'সে দরকার নেই, প্রণাম ক'রে বাড়ী চল !"

বুকের উপর হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বৌদি সেইখানে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল। একটা গভীর বেদনার ভাব নিমেষে তাহার রক্তহীন মুখের উপর ছাইয়া পড়িল। স্পষ্টই বোধ হইল, যেন একটা তীব্র বেদনা প্রাণপণ-শক্তিতে বৌদি বুকের মধ্যে চাপিয়া সহ্য করিয়া লইতেছে। ভিতর-ভিতর এই যন্ত্রণা চাপিতে চাপিতে, গলায় আঁচল জড়াইয়া দেবীকে প্রণাম করিবার জন্য

সেইখানে মাটীর উপর মাথা নত করিতে গিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিনুদার পায়ের উপরই তাহার মাথা একবারে লুটাইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই 'কি হ'ল, বলিয়া বিনুদা চীৎকার করিয়া উঠিল! কিন্তু যাহা হইল, তাহা বুঝিতে বিনুদারও বাকী রহিল না, আমারও বাকী রহিল না। একটু দেখিতেও অবসর পাইলাম না, একটু ভাবিতেও অবসর পাইলাম না। কোথা হইতে নিমেষে যেন কি হইয়া গেল। কি যে বলিব, কি যে করিব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, শুধু হতভম্বের মত দেবদারু-পাতা-জড়ান সেই বাঁশের খুঁটি ধরিয়া নির্জীবের মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বিনুদার চীৎকারে তখনই অনেকে প্রতিমার সম্মুখে ছুটিয়া আসিয়া জমা হইল। কে একজন ছুটিয়া ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিতে গেল, আর একজন একখানি পাখা লইয়া জোরে জোরে বৌদিকে বাতাস করিতে লাগিল। আমি বজ্রাহতের মত শুধু দাঁড়াইয়াই রহিলাম আর ভাবিতে লাগিলাম, ইহারা করিতেছে কি? কাহার জন্যই বা ডাক্তার আনিতে ছুটিল আর কাহার মাথাতেই বা বাতাস করিতে লাগিল! কিন্তু মুখ দিয়া আমার কোন কথাই বাহির হইল না। কে যেন হাত দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিল, কে যেন মন্ত্রশক্তিতে আমাকে পাষাণে পরিণত করিয়া ফেলিল।

ডাক্তার হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বৌদিকে দেখিয়াই যখন বলিল—"কি জন্যে আর আমায় নিয়ে এলেন, পণ্টু বাবু?" তখন মনে মনেই বলিলাম যে, আমি তোমায় ডাকি নি ডাক্তার, আমি তোমায় ডাকি নি!

একবার প্রতিমার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। আজ বিদায়ের দিনে জগন্মাতার মুখে যেন আর হাসি ধরিতেছে না। এ রকম হাসি এ কয় দিনের মধ্যে মায়ের মুখে আর দেখি নাই। মা গো, জগতে অতুলনীয় তোমার এই কন্যারত্নটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে তোমার এত ছল, এত আয়োজন, মা?—এত তোমার আনন্দ, এত হাসি?

বিনুদা সেইখানে বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পদতলে বৌদির রুক্ষ চুলগুলি তখনও লুটাইতেছিল। আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, খুঁটি ধরিয়া সেইখানেই ধূলার উপর বসিয়া পড়িলাম।

ডাক্তার বলিল—'হার্টফেল্', গ্রামের লোকেরা বলিল—পুণ্যবতী, সতীলক্ষ্মী,—মেয়েরা বলাবলি করিল—মানুষ নয়, শাপভ্রষ্টা স্বর্গের দেবী!—কেবল মুখদিয়া বাহির হইল না কিছু সন্ধ্যার ও বিনুদার। সন্ধ্যা তবুও প্রথম একদফা খুবখানিক কান্নাকাটি করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু বিনুদার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। চোখও তাহার একটিবারের জন্য ছল-ছল করিল না!

* * * *

শিলাই-তীরের শ্মশান। একরত্তি গ্রাম, তার শ্মশানও তেমনই একরত্তি। কদাচিৎ কালে ভদ্রে দুই একটি চুলী হয় ত বা এ শ্মশানে জ্বলে। কারণ, গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিঃস্ব। জীবিতকালে রোগের চিকিৎসাই যাহারা করিতে পারে না, রোগ হইলে পথ্যের সংস্থানটুকু পর্য্যন্ত করা যাহাদের অসাধ্য হইয়া পড়ে, মরিয়া গেলে পোড়াইবার ব্যয়ব্যবস্থা তাহারা কেমন করিয়া করিবে? তাই অধিকাংশ মৃত দেহ গ্রামের বাহিরে নদীতীরে ফেলিয়া দেওয়ার পর, শৃগাল-কুক্কুর-শকুনিতেই তাহার গতি করিয়া দেয়।

বেলা তখন অপরাহ্নে গড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র শ্মশানের বুকে এক ধারে বৌদির চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। অদূরে কতকগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট বাবলা-গাছের ছায়ায় বসিয়া শ্মশান-বন্ধুরা পরস্পর কথা কহিতেছিল। বিনুদা নাই। মুখাগ্নি শেষ করিয়া বিনুদা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মুখে আগুন দিতে প্রথমে বিনুদা কিছুতেই রাজী হয় নাই, খুব গণ্ডগোল বাধাইয়াছিল, বলিয়াছিল—'ওর মুখে আমি কিছুতেই আগুন দিতে পারব না, জগতে অনেক লোক আছে, যে-কেউ এসে দিয়ে যাক্'। অনেক ব্যাপারের পর তবে তাহাকে রাজী করাইতে পারা গিয়াছিল। কিন্তু সেই আগুন দিবার পরই বিনুদা কোথায় যে ওই দিকে চলিয়া গিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত ফিরিয়া আইসে নাই। অনেকক্ষণ পূর্ব্বে একবার তাহাকে দেখিয়াছিলাম—নদীর বাঁকের উপরকার ঐ কলাই ক্ষেতখানার আলের উপর। যে বুড়া লোকটি এখন ক্ষেতের ঢেলা ভাঙ্গিতেছে, উহারই হাত হইতে উহার হুঁকাটি লইয়া আলের উপর উহার পাশে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, আর হাসিয়া হাসিয়া উহার সহিত কি-সব কথা কহিতেছিল। তার পর বিনুদা যে কোথায় গেল—জানি না।

সম্মুখে প্রজ্বলিত চিতাগ্নি বৌদির দেহকে ভস্মীভূত করিতে লাগিল, আর আমি একাকী তাহারই দশ পনর হাত দূরে ঘাসের উপর বসিয়া কত রকম কত কথাই যে একান্তমনে ভাবিতে লাগিলাম, তাহার আর শেষ নাই। সহসা একটা তীব্র গন্ধে ও শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখি, বিনুদা একবারে আমার গা ঘেঁসিয়া পিছনে আসিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ফিরিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতেই, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল,—"কি রে, এখনো দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে? এতক্ষণ ধ'রে পোড়বার তার কি-ই বা ছিল!" দেখিলাম, দর্ দর্ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া তাহার ঘাম ঝরিতেছে, দুই চক্ষু ভয়ানক আরক্ত, পরনের কাপড়খানা এলোমেলোভাবে কোমরে পাক দিয়া জড়ান। মুখের দিকে চাহিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলাম, ত্রস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিনুদা কহিল,—"পোড়া—পোড়া—যত পারিস্ পোড়া! একটু মদ খাবি? তা' হলে গায়ে আরও জোর পাবি এখন",—বলিতে বলিতে হন্ হন্ করিয়া বিনুদা মাঠের পথে গ্রামের দিকেই চলিয়া গেল।

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, হইবারও বেশী বিলম্ব ছিল না। সূর্য্য তখন আরক্ত হইয়া আকাশের প্রান্তদেশে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। মনে হইল, সেখানেও তখন এক বিরাট শ্মশানের চুলী জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দিনের শেষে না জানি কাহার সে চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া সেখানের সমস্ত আকাশকে একবারে রাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছে। সম্মুখে পৃথিবীর চিতা—পশ্চাতে আকাশের চিতা। দেখিতে দেখিতে দুই চিতাই একসঙ্গে নিভিয়া গেল! ইহার পর জানি না, কতক্ষণের জন্য একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। সঙ্গীদের ডাকে যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখিলাম, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, আর সেই অন্ধকারের মধ্যে শ্মশান-প্রান্তের সেই বাবলাগাছগুলি প্রেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জোনাকীর ন্যায় অসংখ্য চক্ষুর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে মিটমিট করিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। তখনও নির্ব্বাপিত চিতার সেই ভস্মস্তূপের মধ্য হইতে দু'একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রহিয়া রহিয়া ঝিক্-ঝিক্ করিয়া উঠিতেছিল। কিছু পরেই গ্রামের দিক্ হইতে বিসর্জ্জনের বাজনার শব্দ যখন বাতাসে শ্মশান পর্য্যন্ত ভাসিয়া আসিয়া আমাদের কাণে পৌছিল, তখন বুঝিলাম, গ্রামের ঘাটে ঠাকুর-বিসর্জ্জন হইয়া গেল। সেই সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লী-শ্মশানের সেই গভীর নীরবতা ভেদ করিয়া, সকলের মিলিত কণ্ঠ হইতে উচ্চরবে ধ্বনিত হইল—বল হরি হরি-বোল্!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিয়া সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিনুদা?" সন্ধ্যা কহিল, "জানি না।" বাড়ীর নীচের ও উপরের ঘরগুলি খুঁজিয়া আসিলাম, বিনুদাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। এই রাত্রিতে, হয় ত কোথাও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নয় ত বা কোথাও মাঠের ধারে বা গাছের তলায় বা নদীর ধারে একলাটি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ইহাই ভাবিতে ভাবিতে আমার ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। বেশীক্ষণ শুইয়া থাকিতেও পারিলাম না, বিনুদার জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। নীচে যাইয়া, দরোয়ানকে ডাকিয়া ঠাকুরতলায় পাঠাইয়া দিলাম, কি জানি, যদি সেইখানে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু দরোয়ান ঘুরিয়া আসিয়া যাহা খবর দিল, তাহাতে জানিলাম যে, ঠাকুরতলায় এবং তাহার আশে-পাশে কোন স্থানেই বিনুদা নাই। নিদ্রাহীন চক্ষু বুজাইয়া সমস্ত রাত্রিই শয্যায় পড়িয়া রহিলাম।

পরদিনও বিনুদা আসিল না বা তাহার খোঁজখবর পাইলাম না। প্রভাতেই তাহার অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছিলাম, সকলেই দ্বিপ্রহরের মধ্যে একে একে ফিরিয়া আসিল, বিনুদার কোন সন্ধান কেহ আনিতে পারিল না। অপরাহ্ণে জনশূন্য বাঁধের উপরকার একটা গাছতলায় একাকী বসিয়াছিলাম, পার্শ্বের গ্রামের এক জন মুসলমান হাট করিয়া ফিরিতেছিল। তাহার মুখে শুনিলাম, বারুইহাটির কাছে নদীতে এক জন লোক ডুবিয়া মারা গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল—"কাল রাতেই বোধ হয় ডুবেছে, এখনো বেশী ফুলে ওঠে নি, পচা গন্ধও বেরোয় নি। বোরোল্হাটির নদীর বাঁকে ঠেকে মড়াটা আটকে ছিল, গ্রামের চৌকিদার তাকে ড্যাঙ্গায় তুলেছে।" মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া লোকটি কহিল—"এদিক্কার কোন লোক নয় বাবু, কেউ চেনে না। বেশ বাবুর মত চেহারা, মোটা-সোটা যোয়ান গোছের—"

"গায়ের রং খুব ফর্‌সা?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া চুল?"

"হ্যাঁ।"

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। বারুইহাটি প্রায় দুই ক্রোশ পথ। প্রসাদপুরের রেলের ষ্টেশন ছাড়াইয়া বাঁধের উপর আরও ক্রোশখানেক যাইলে তবে বারুইহাটির হাট-তলা। নদীর বাঁধ ধরিয়া ক্রমাগত ছুটিতে লাগিলাম। খানিকটা আসিয়াই হাঁপাইয়া পড়িলাম। আর দৌড়াইতে পারিলাম না। তখন সবেমাত্র পোয়া-তিনেক পথ আসিয়াছি। বাকী পাঁচ পোয়া পথ ছুটিয়া যাইতেই ইচ্ছা হইল; কিন্তু শক্তিতে কুলাইল না; হাঁপাইতে হাঁপাইতে চলিতে লাগিলাম। প্রায় ষ্টেশনের কাছে আসিয়া পড়িলাম, আরও ক্রোশখানেক যাইতে হইবে। এ স্থানটায় দুই পার্শ্বে কাশ-বন বর্ষায় বাড়িয়া উঠিয়া বাঁধের অপ্রশস্ত পথকে ঢাকিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল; তাহাই দুই হাতে সরাইতে সরাইতে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। সহসা এক স্থানে ঘন কাশ-বনের অন্তরাল হইতে কে সুর করিয়া বলিয়া উঠিল—"খুঁজে খুঁজে নারি—যে পায় তারি।" চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া যেন আমি পুনর্জীবন পাইলাম, দেখিলাম, একটা দেশী মদের বোতল হাতে করিয়া, বাঁধের নীচে একটা গাছে পিঠ দিয়া বিন্দুদা বসিয়া আছে। সেইখান হইতেই চীৎকার করিয়া ডাকিলাম—"বিন্দুদা!"

জড়িত কণ্ঠে একটা ধমক দিয়া বিন্দুদা বলিয়া উঠিল—"ড্যাম্ ষ্টুপিড, ব্রুট্—খুঁজে খুঁজে নারি—যে পায় তারি।"

দুই হাতে দীর্ঘ কাশের গুচ্ছগুলিকে সরাইতে সরাইতে পথ করিয়া, বাঁধের নীচে সেই গাছতলাতে বিন্দুদা'র সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম, কহিলাম,—"কাল থেকে তুমি—"

বোতল হইতে এক গেলাস মদ ঢালিয়া পান করিয়া সুরা-বিকৃত কণ্ঠে বিন্দুদা কহিল—"**Dont' speak silly words,** পঞ্চু। 'কাল থেকে তুমি', মানে কি? কাল মানে—গেছে কাল, না আসছে কাল? কাল **means—not today, yesterday, day before yesterday, month before yester month, year before yester year and 12 months make one year,** বুঝতে পারলি? **30 days have September, April, June and November, February has 28 alone and all the rest have 31.**"

দেখিলাম, এ অবস্থায় বিন্দুদার সহিত কোন কথা বলিতে যাওয়াই বৃথা। তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম,—"ওঠ এখন, বাড়ী চল।" কিন্তু টানাটানিই সার হইল, আমি কি বিন্দুদাকে টানিয়া তুলিতে পারি?—পারিলাম না। আমি যত টানি বিন্দুদাকে, বিন্দুদা তত টানে আমাকে। খানিকক্ষণ টানা-টানির পর আমি যখন কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া ধমক দিয়া উঠিলাম, তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া টলিতে টলিতে বিন্দুদা কহিল,—"রাগ কচ্ছিস্—আচ্ছা, চল, কিন্তু—কিন্তু কি বল্ দেখি? অর্থাৎ, খুঁজে খুঁজে নারি—যে পায় তারি, বুঝলি পঞ্চু?"

চলিতে চলিতে বাঁধের এক স্থানে আসিয়া বিন্দুদা থমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—"এইখান থেকেই ব্যাটাকে ঝপ-ঝপাং! কিন্তু আসল কথাটাই খালি ভুল হয়ে যাচ্ছে রে" বলিয়া আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"সে আর নেই, ম'রে গেছে, না? তোর বৌদি রে!—তাই ত, খুঁজে খুঁজে নারি—যে পায় তারি।"

কোন রকমে বিন্দুদাকে বাড়ীতে আনিয়া ফেলিলাম। এইটুকু পথ আসিতেই কিন্তু সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেল। সেই সন্ধ্যার পরই তাহাকে স্নান করাইয়া দিয়া, জোর করিয়া দুটি খাওয়াইয়া তাহার শয্যায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া বিন্দুদা আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ রে, এদিকে নদীতে কেউ ডুবে মরেছে কি না, কোন খবর শুনিছিস্?" চমকিত হইয়া সোৎসুকে কহিলাম,—"শুনিছি। কেন বিন্দুদা, কিন্তু সে ত এদিক্‌কার কোন লোক নয়। শুনলুম, আড়-শিমলের মণ্ডলদের বাড়ী জনকতক বাবু কোলকাতা থেকে পাখী শিকার করতে এসেছিল, তাদেরই এক জন। হয় ত কোন রকমে বে-কায়দায় নদীতে প'ড়ে গিয়েছিল, সঙ্গে আর কেউ ছিল না, জামাজুতো শুদ্ধ আর হয় ত উঠতে পারে নি। বারুইহাটির বাঁকে গিয়ে ভেসে উঠেছিল।—কেন বল দেখি?"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বিন্দুদা এই সূত্রে যে ব্যাপারটির বর্ণনা করিতে লাগিল, কাঠের মূর্ত্তির মত আড়ষ্ট হইয়া আমি তাহা শুনিয়া যাইতে

লাগিলাম। শঙ্কায় ও চমকে সমস্ত শরীর আমার বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কথা সমাপ্ত করিয়া বিন্নুদা কহিল,—"বাবুরা কোলকাতা থেকে আসেন পাখী শিকারের ছল ক'রে, কিন্তু যে শিকারের সন্ধানে তাঁরা ঘোরেন—কি পাষণ্ড বল্ দেখি! আহা, চাষাদের বৌটা একলা সন্ধ্যাবেলা নদীর ঘাটে না পারে চীৎকার করতে, না পারে তার হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালাতে!" নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া আমি বিন্নুদার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। খানিক থামিয়া বিন্নুদা আবার বলিতে লাগিল,—"লোকটা যে আবার আমার সঙ্গে জোর দেখাতে এল, আমারও তাই মাথার ভেতরটা কেমন ক'রে উঠলো। বউটাকে পালিয়ে যেতে বললুম আর তার পর পাঁজাকোল' ক'রে তাকে জাপটে ধ'রে ঝপাং ক'রে দিলুম নদীর জলে ফেলে। নেশাটা তখন বড্ডই ধরেছিল, অন্ধকারে আর তাকে দেখতেই পেলুম না। কে জানে যে, লোকটা সাঁতার টাতার একেবারেই জানতো না! বন্দুক নিয়ে শিকার করতে আসে, সাঁতার জানে না!—কোথাকার বাঁকে গিয়ে আটকেছিল বল্লি?"

আমি স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণের জন্য বিন্নুদার মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর কহিলাম,—"বিন্নুদা, খুব সাবধান! ঘুণাক্ষরেও এ সব কথা তুমি কারও কাছে বোলো না। এই ক'টা দিন পরে, চল তোমায় কাশী রেখে আসি, তোমার আর এখানে থেকে কায নেই।"

বিন্নুদা কহিল,—"ক'টা দিন পরে কি? কাশী আমি আজই চ'লে যাব। এখানে আর আমি এক তিল থাকতে পারব না, কিছুতেই পারব না, পেসাদপুরে তুই আর আমাকে থাকতে বলিস নি, পঞ্চু। আমি আজই যাব।"

কয়টা দিন কোন রকমে বিন্নুদাকে প্রসাদপুরে জোর করিয়া রাখিলাম। কিন্তু কয় দিনই চব্বিশ ঘণ্টা তাহার মদের উপর কাটিল। নানাপ্রকারে বুঝাইয়া, উপদেশ দিয়া, রাগ করিয়া, কোন রকমেই তাহাকে মদ খাওয়া ছাড়াইতে পারিলাম না। বিন্নুদার সেই একই কথা,—"ওরে, তাকে ভুলে থাকতে দে—তাকে ভুলে থাকতে দে। এত মদ ব'লে খাচ্চি না, এ যে তাকে ভোলবার ওষুধ, পঞ্চু!"

কয় দিন এমনই করিয়াই কাটিয়া গেল। দশ দিনের দিন বৌদির শ্রাদ্ধ কোন রকমে শেষ হইয়া গেলে বিন্নুদাকে কহিলাম,—"কাশী না হয় আর নাই বা গেলে বিন্নুদা। কাশীর বাড়ী বিক্রী ক'রে দাও, এখন থেকে চল, কালীঘাটে গিয়ে থাকবে।"

বিন্নুদা কহিল,—"সে আমি কিছুতেই পারব না—কিছুতেই পারব না, কাশী ছেড়ে আর আমি কোথাও থাকতে পারব না।" অনেক করিয়াই বিন্নুদাকে বুঝাইলাম, কিন্তু বিন্নুদা কিছুতেই রাজী হইল না, কাশী যাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। তখন এক দিন পদ্মাকে লইয়া বিন্নুদা ও আমি কাশী যাত্রা করিলাম। দিন পনর কাশীতে থাকিয়া আমি আবার প্রসাদপুরে ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় বিন্নুদাকে মাঝে মাঝে চিঠি দেবার জন্য অনেক করিয়া বলিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু কাশী হইতে কোন পত্রই আর বিন্নুদার পাইলাম না।

তিন মাস ধরিয়া চিঠির পর চিঠি দিয়াও যখন বিন্নুদার কোন সংবাদই পাইলাম না, তখন ফাল্গুন মাসে আমি সন্ধ্যাকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাট হইতে কাশী চলিয়া আসিলাম। আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে দুশ্চিন্তায় আমার মন ভরিয়া উঠিল। এই তিন মাসের মধ্যেই তাহার সেই চেহারা একেবারে বিশ্রী হইয়া গিয়াছে, সংসারের কিছুই আর বিন্নুদা দেখে না,সবই চাকর-বাকরদের উপর নির্ভর, তাহারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেছে আর বিন্নুদা নিজে চব্বিশ ঘণ্টাই কেবল মদের উপরই আছে। এ কাযে আরও দু'একটি বন্ধুও তাহার জুটিয়াছে।

সন্ধ্যা কহিল, "বড়ঠাকুরকে যেমন ক'রে হোক কাশী ছাড়াতেই হবে। এখানে থাকলে উনিও বাঁচবেন না, মেয়েটাও ম'রে যাবে। তুমি ভাল ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওঁকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে চল।" কিন্তু যাহাকে বুঝাইব, সে যে কিছুতেই বুঝিবার পাত্র নহে, এ কথা হয় ত সন্ধ্যা বুঝিতে পারে না। তবুও বিন্নুদাকে বুঝাইতে আমি আর বাকী রাখিলাম না, কিন্তু বিন্নুদার সেই একই কথা—"কাশী ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রথম বৎসর দুই আমি মধ্যে মধ্যে কাশী গিয়া বিন্নুদা ও পদ্মার সংবাদাদি লইয়া আসিতাম, কিন্তু তৃতীয় বৎসরে হঠাৎ একবার

গিয়া দেখিলাম, বিন্দুদা নাই, বাড়ীটি এক জন হিন্দুস্থানীর কাছে বিক্রয় করিয়া দিয়া বিন্দুদা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে এক ঘর বাঙ্গালী গৃহস্থ ভাড়াটীয়া ছিল, তাহাদের নিকট হইতে নূতন গৃহস্বামীর ঠিকানা জানিয়া লইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি কহিল বাড়ীটি কেনা তাঁহার ঠকা হইয়াছে, কিনিবাব কোন দরকারও ছিল না, স্রেফ, দোস্তির খাতিরেই তিনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন। বিন্দুদা কোথায়, জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, কাশীতেই ছিলেন, তার পরে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তিনি জানেন না। যাহা হউক, আরও কিছুদিন কাশীতে থাকিয়া বিন্দুদার খোঁজ করিলাম, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না। অগত্যা হতাশ হইয়া সেবার কাশী হইতে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর এই তিন বৎসর ধরিয়া কোথাও আর বিন্দুদাকে খুঁজিতে বাকী রাখি নাই। কাশী, চুনার, এলাহাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্ণৌ, কানপুর, দিল্লী, আগরা, হরিদ্বার,—এ দিকে আরা, বাঁকিপুর, ছাপরা, পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি একে একে পশ্চিমের ও উত্তর-পশ্চিমের সমস্ত বড় বড় সহর খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, কোথাও বিন্দুদার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। হঠাৎ সে দিন শয্যায় শুইয়া বিন্দুদার কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, এত যে খুঁজিতেছি, কিন্তু বিন্দুদা বাঁচিয়া আছে ত? বাঁচিয়া থাকিলে এই ৩ বৎসরের মধ্যে কোথাও না কোথাও তাহার সন্ধান পাইতাম। কিন্তু যে বাঁচিয়াই নাই, তাহার সন্ধান কি করিয়া মিলিবে? এই ৩ বৎসরের মধ্যে এ কথাটা ত একবারও ভাবি নাই। যদি তাহাই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে, পদ্মা—আর ভাবিতে পারিলাম না। সমস্ত শরীরটা আমার ভয়ে ও ভাবনায় শিথিল হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া সন্ধ্যার কাছে এই কথা বলিতেই সন্ধ্যা কহিল,—"অমন অলক্ষুণে কথা মুখে এনো না, বড়ঠাকুর কোথাও না কোথাও ঠিকই আছেন।"

আজ সকালে চা খাইবার সময় সন্ধ্যা কহিল,—"দেখ, আমার খুব বিশ্বাস, বড়ঠাকুর হয় ত ঐ কাশীতেই আছেন, তুমি ভাল ক'রে খুঁজতে পারনি। আমার বড্ড ইচ্ছে, তুমি আর একবার গিয়ে ভাল ক'রে খুঁজে এস।" সন্ধ্যার আগ্রহ দেখিয়া কহিলাম,—"বেশ, কালই আমি যাব, সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা কহিল,—"তাই যাও! যদি কোন রকমে সন্ধান করতে পার, যেমন করেই হোক, এবার বড়ঠাকুরকে ধ'রে আনতেই চাও, কিছুতেই আর যেন ছেড়ে এস না।" আরও কি সন্ধ্যা বলিতে যাইতেছিল, বলিতে পারিলনা। মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, দুই চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

দুই দিন পরেই আমি কাশী আসিলাম ও যথাসাধ্য চারিদিকে বিন্দুদার খোঁজ করিতে লাগিলাম। পরিচিত অপরিচিত যাহাকে পাই, তাহাকেই বিন্দুদার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, কেহই কোন খবর দিতে পারে না। এক ছত্রের ম্যানেজার এক দিন বলিল,—"একটা মাতাল গোছের লোক একটা বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রোজ এখানে খেতে আসতো বটে। মাতাল ব'লে প্রথম দিন তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ঐ মেয়েটির শুকনো মুখ দেখলে বড় কষ্ট হতো, তাই আর তাদের ফেরাতুম না, রোজই এইখান থেকে তারা খেয়ে যেতো।" ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তারা কোথায় থাকে, বলতে পারেন? আজও কি তারা এসেছিল?" বাবুটি কহিল,—"মাস দুই তিন আর তাদের দেখিনি। আপনাকে যা বলছি, এ মাস দুই তিন আগেকার কথা।"

এমনি সময় এক দিন বৈকালে নন্দী মশাই আসিয়া খবর দিলেন যে, তিনি সেই দিনই প্রভাতে বিন্দুদারই মত এক জনকে দেখিয়াছেন, ষ্টেশনের ঐ দিকে একটা দেশী সরাবের দোকানে বসিয়া মদ খাইতেছিল। নন্দী মশাই কাছে যাইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে, লোকটি না কি ঘুসি পাকাইয়া তাঁহাকে মারিতে আসিয়াছিল। নন্দী মশাই কহিলেন,—"আমার খুবই বিশ্বাস পঞ্চু বাবু, এ বিন্দু বাবু না হয়ে আর যায় না। কিন্তু চিনতে পারা বড়ই মুস্কিল। কাণের নীচেই সেই দাগটা দেখেই আমার সন্দেহ হয়। এই তিন চার বছরের ভেতর তাঁর সেই চেহারা কি হয়ে গেছে, তা' আর বলবার নয়। বিন্দু বাবু ব'লে কি আর তাঁকে চেনবারই জো আছে!"

সেই বৈকাল হইতে সুরু করিয়া রাত্রি নয়টা

সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত কাশীর যেখানে যতগুলি দেশী বিলাতী মদের দোকান ছিল, কোনটিই আর খুঁজিতে বাকী রাখিলাম না, কিন্তু কোন স্থানেই বিন্দুদার কোন সন্ধানই পাইলাম না। ক্লান্তদেহে বাসায় ফিরিতেছিলাম; গোধোলিয়ার কাছে এক স্থানে রাস্তার উপর লোকের ভিড় ও গোলমাল শুনিয়া দাঁড়াইলাম। একটি লোককে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল—"চুরি ক'রে ধরা পড়েছে, তাই লোকটাকে ধ'রে মারছে।" কাশীতে চোর-জুয়াচোরের ত অভাব নাই, সুতরাং কিছুমাত্র আশ্চর্য্য না হইয়া বাসার পথেই আবার চলিতে লাগিলাম। লোকটি আমারই সঙ্গে আসিতে আসিতে বলিল—"দু'খানা পাঁউরুটী চুরি করেছে ব'লে অত ক'রে মারাটাও ওদের ঠিক নয়।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"কা'দের দোকান?"

"ওই যে, মেয়ে-স্কুলটার নীচে, মস্ত একটা হিঁদুর তৈরী পাঁউরুটীর দোকান রয়েছে, এক দিকে পাঁউরুটী, এক দিকে চা-সরবৎ, এক দিকে পান সিগারেট ষ্টেসনারী।"

এ বিন্দুদার সেই মেয়ে-স্কুল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"লোকটা হিন্দুস্থানী না মুসলমান?"

"কে? যে রুটী চুরি করেছে?"

"হ্যা।"

"বাঙ্গালী। আরে মশাই, একটা মাতাল। তাকে কি অত ক'রে—"

"বাঙ্গালী? মাতাল?" পিছন ফিরিয়াই ছুটিতে লাগিলাম। ছুটিতে ছুটিতে সেই মেয়ে-স্কুলের সম্মুখে আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া দোকানের ভিতর ঢুকিলাম। তখনও দু'এক ঘা ঘুসি-ঘাসা লোকটির উপর পড়িতেছিল। একবারে তার সামনে যাইয়া দেখিলাম—হা ভগবান্, যা ভেবেছি, তাই—এ ত বিন্দুদাই বটে! হায়, এ-ও আমায় দেখতে হ'ল। এক দিন যে স্কুলের নীচেকার এই হলের মধ্যে ফুলের মালা দিয়ে বিন্দুদাকে সম্মানিত করা হইয়াছিল, আজ ঠিক সেইখানেই কি না—! আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দু'খানা রুটীর তোমার দাম কত ভাই?" সে কহিল—"পাঁচ সাত দিন ধ'রে রোজই দু'খানা ক'রে বড় রুটী ব্যাটা চুরি করেছে। ওই কোণে এসে দাঁড়ায় আর দু'খানা ক'রে রুটী পকেটের ভেতর সরায়। রোজই হিসেবে আমাদের দু'খানা ক'রে রুটী কম হয়, আজ সকলে তক্কে তক্কে ছিলুম, ব্যাটাকে ধ'রে ফেলেছি। সে দিন প্রায় একটা গোটা বাণ্ডিল চুল বাঁধবার ভাল ফিতে, আর এক দিন এক বাক্স সাবান, এ-ও ঠিক ওরি কাজ, শা—"

"ব্যস্—আর তোমায় বেশী বলতে হবে না" বলিয়া পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। সে টাকা দুইটি হাতে করিয়া আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। সেই অবসরে দোকানের বাহিরে আসিয়া বিন্দুদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাসা কোথায়?" কি বিড় বিড় করিয়া বিন্দুদা বলিল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। চলিতে চলিতে কহিলাম,—"কোথায় তোমার বাসা—আমায় নিয়ে চল, আর তোমায় আমি ছাড়ছি না।" বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে বিন্দুদা চলিতে লাগিল। আমি তাহার হাত জোরে ধরিয়া রহিলাম।

অনেকগুলি অপ্রশস্ত গলি অতিক্রম করিয়া এক অত্যন্ত নোংরা পল্লীর মধ্যে ততোধিক নোংরা একটা বাটীর সম্মুখে আসিয়া বিন্দুদা দরজায় ঘা দিতে দিতে জড়িতকণ্ঠে পদ্মার নাম করিয়া ডাকিল।

সেই অন্ধকারের মধ্যেই পদ্মা আমাকে চিনিতে পারিল। সামনে আসিয়া কহিল—"কাকু?" একবারে কোলের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া কহিলাম—"হাঁ মা, কেমন আছিস্ বল্ ত রে?" পদ্মা আমার বুকে মাথা গুঁজিয়া দুই হাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াই রহিল, আমার প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারিল না। বুঝিতে পারিলাম, সে কাঁদিয়া আমার বুকের জামা ভাসাইয়া দিতেছে।

ঘরের মধ্যে এক ধারে একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছিল। তাহারই ক্ষীণালোকে দেখিলাম, মেজের এক ধারে একটি ছিন্ন মলিন শয্যা, অন্য দিকে দু'একখানা এনামেলের বাসন, একটা ছোট আম-কাঠের বাক্স, কতকগুলি খালি মদের বোতল, মাটীর গোটাদুই জলের কলসী, একজোড়া শত-তালিযুক্ত জীর্ণ জুতা, কয়েকটা ভাঙ্গা কলিকা, একটা হুঁকা, খান দু'চ্চার ছেঁড়া কাপড়, একটা ভাঙ্গা আরসি,—ইহাই মাত্র ঘরের আসবাব! হায় বিন্দুদা।

পদ্মাকে কহিলাম,—"সামনেই একটা খাবারের দোকান দেখলুম, কিছু খাবার তোদের জন্যে নিয়ে আসি আমি।"

পদ্মা মৃদুস্বরে কহিল,—"বাবার পকেট দেখি, বাবা হয় ত আমাদের রুটী এনেছেন। এ কথার

আর উত্তর না দিয়া আমি সামনের দোকানখানি হইতে কিছু খাবার লইয়া আসিলাম ও পদ্মার হাতে দিয়া কহিলাম—"মা, তুই খা, তোর বাবাকে খাওয়া, আমাকেও কিছু দে। আর ঐ ছেঁড়া চট্ একখানা এক দিকে পেতে দে, আমি শোব। রাত হয়েছে, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড় আজ, তার পর যা করবার, সে আমি কাল করব।" কুলুঙ্গির মধ্যে একটি সাবানের বাক্সর উপর খাবারের চেংড়াটি রাখিয়া দিয়া পদ্মা পিতলের ঘটী লইয়া জল গড়াইতে লাগিল। আমি বলিলাম,—"কাগজের ঐ বাক্সটা থেকে চেংড়াটা নামিয়ে রাখ, মা, খাবারের রস গড়িয়ে পড়বে। কি আছে ওতে রে?" বাক্সর উপর হইতে চেংড়াটি পার্শ্বে নামাইয়া রাখিতে রাখিতে পদ্মা কহিল,—"ওতে খান দুই চন্দন-সাবান আর এক বাণ্ডিল চুল বাঁধবার ফিতে আছে। বাবাকে রোজ রোজ ঐ ও ঘরের ওরা আমার জন্যে আনতে বলতো, তাই সে দিন বাবা কিনে এনে দিয়েছেন।"

দুঃখে, কষ্টে, চিন্তায় সমস্ত রাত ধরিয়া চোখে আর ঘুম আসিল না। আশার মধ্যে এইটুকু যে, এত দিনের এত ব্যাপারের পর আজ বিনুদাকে ধরিতে পারিয়াছি। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কেন যে বিনুদা এত কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। প্রথম দুই বৎসর বিনুদা না চাহিলেও, প্রতি মাসেই দেড় শ' দুই শ' করিয়া টাকা আমি তাহাকে দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার পর এই তিন বৎসর ধরিয়া কেনই বা বিনুদা এই রকম পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেছে, আর কেনই বা তাহার কালীঘাটের সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও, আমরা থাকা সত্ত্বেও, স্বেচ্ছায় এই দারিদ্র্য ভোগ করিতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কি যে তাহার দুঃখ, কোথায় যে তাহার অভিমান, সমস্ত রাত সেই সব কথাই ভাবিতে ভাবিতে শেষরাত্রিতে বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

খোলা দরজা দিয়া সকালের রৌদ্র মুখে আসিয়া পড়ায় যখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া দেখি, ঘরের মধ্যে কেহই নাই। 'পদ্মা' 'পদ্মা' বলিয়া বারকতক ডাকিলাম, কাহারও সাড়া পাইলাম না। তখন ঘরের মধ্যে চারিদিকে চাহিয়া দেখি, খালি বোতলগুলি, জলের কলসী ও আরও দু'একটা ঐরূপ জিনিষ ছাড়া ঘরে আর কিছুই নাই। বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে, জ্ঞান ও শক্তি ফিরিয়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মাকে লইয়া বিনুদা প্রত্যুষেই পলাইয়াছে। এই বাটীর ওদিক্‌কার একখানি ঘরের এক জন স্ত্রীলোক ভাড়াটিয়া কহিল,—"খুব ভোরবেলায় একটা মুটের মাথায় জিনিষপত্র দিয়ে খুকীর বাবা চ'লে গিয়েছে, এ মাসের ঘর-ভাড়ার টাকা দেড়টা আমার কাছে রেখে গিয়েছে।"

জামা গায়ে দিতে গিয়া দেখিলাম যে, কোটের পকেটে যে দেড় শত টাকার নোট ছিল, তাহা নাই। বাহির হইতে কাহারও তাহা লইবার কোন সুযোগ ছিল না। ইহাতে তখনকার মত মনটা আমার একটু সুস্থ হইল যে, এ অবস্থায় দিন কতকের জন্যও বিনুদা অর্থাভাবে হয় ত কষ্ট পাইবে না।

সেই দিনই সন্ধ্যাকে সমস্ত কথা জানাইয়া পত্র দিলাম। পত্রের শেষে লিখিলাম,—"বিনুদাকে পাইবার আশা তুমি ছাড়িয়া দাও। এই লইয়া মন আমার এত খারাপ হইয়াছে যে, তাহা বলিবার নয়। শরীরও আমার খুব খারাপ। আমি এখন দিনকতক বাড়ী ফিরিব না। মন ও শরীরকে সুস্থ করবার জন্য আমি পশ্চিমের নানাস্থানে দিনকতক বেড়াইব। তবে কাশী হইতে যাইবার আগে আর একবার শেষবার আমি বিনুদার সন্ধান করিব। কাশীর প্রত্যেক রাস্তার, প্রত্যেক গলির, প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়া বিনুদার খোঁজ করিব; প্রত্যেক ধর্ম্মশালা, প্রত্যেক সবাইখানা, প্রত্যেক ছত্র, আর একবার তন্ন তন্ন করিয়া না খুঁজিয়া এখান থেকে আমি যাইব না।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায় তিন মাসকাল পশ্চিমের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বাটী ফিরিবার পথে এক দিন মধ্যরাত্রিতে ভাগলপুর ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ হইতে নামিলাম। আমার বহু দিনের এক বন্ধু সেই সময় ভাগলপুরে থাকিয়া ডাক্তারী করিত। রাজেনের সহিত অনেক দিন হইতে দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া একবার এখানে নামিলাম। কিন্তু চারি মাসেরও উপর বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি, বাড়ীর জন্য মনটা বড়ই টানিতেছিল, সুতরাং পথে আর বেশী দেরী করিতেও ইচ্ছা হইল না।

দুই দিন ভাগলপুরে থাকিয়া তৃতীয় দিনে সকালবেলা খুব খানিকটা বেড়াইয়া ফিরিয়া রাজেনের ডাক্তারখানায় আসিয়া বসিলাম এবং দৈনিক কাগজখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। রাজেন জিজ্ঞাসা করিল,—"আজই তুমি ঠিক যাবে না কি হে?" আমি বলিলাম,—"হাঁ ভাই, বাড়ীর জন্যে মনটা বড্ডই অস্থির হয়েছে।"

"দাদার তা হ'লে কোন সন্ধান টন্ধান আর পেলে না?"

"না, বিনুদার আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।"

"আচ্ছা, বিনু বাবু তোমার জ্যেঠতুতো ভাই, না?"

"হ্যাঁ। তুমি কি বিনুদা'কে কখন দেখনি?"

"একবার বোধ হয় কোলকাতায় দেখেছিলুম, অনেক দিন আগে। কুস্তি-টুস্তি করতেন খুব, সেই ত?—কি হে, সাড়া দিচ্ছ না কেন, নিবিষ্ট-মনে কি পড়ছ বল দেখি?"

কাগজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া কহিলাম,—"একটা খবর পড়ছি ভাই। লোকের দুঃখ-কষ্ট যে জগতে কত, তা আর বলবার নয়, আর কে-ই বা তার খোঁজ রাখে! রাজসাহীর এক ভদ্রলোক, ছেলে-মেয়ে পরিবারকে খেতে দিতে না পেরে আত্মহত্যা ক'রে মরেছেন,—তাই পড়ছি।"

"আরে ভাই, জগতে নিত্য কত কি দুঃখের ঘটনা ঘটছে, কে তার খবর রাখে বল। আজ যে এখানে এক জন লোক ঐ গাছতলাতে মরছে! মরবারও একটুখানি যায়গা হতভাগা পেলে না, তার কি বল দেখি?"

"কেন, তার কি বাড়ী-ঘর নেই?"

"আরে, বিদেশী লোক, এই দিন পনর হ'ল এখানে এসেছিল। একটা বেণিয়ার বাড়ীর একখানা খোলার ঘর ভাড়া ক'রে এই ক'দিন ছিল। বাড়ীওলাটা এক অদ্ভুত স্বভাবের লোক, সে তার ঘরের মধ্যে কিছুতেই তাকে মরতে দেবে না। শুনলুম, কাল রাত্রেই লোকটাকে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছে।"

"বল কি! এমন পাষণ্ড লোকও আছে?"

"হ্যাঁ। শুনলুম এখনও না কি মরেনি, বেঁচে আছে। যাও না, একবার দেখে এস না। ঐ যে সামনে—ঐ 'তালাও'টার পাশে।"

এই সময় একটি বিশ বাইশ বছরের ছেলে দ্রুত-পদে আসিয়া রাজেনকে কহিল,—"আপনি কোন ওষুধ আর দেবেন কি?"

"এখনও মরেনি শুনলুম, না?"

"হ্যাঁ।"

"লোকটার দেখছি কইমাছের প্রাণ হে! কাল রাতে আমি গিয়ে যা দেখে এলুম, তা'তে তখনই ত হয়ে যাবার কথা।"

কাগজখানা টেবলের উপর রাখিয়া দিয়া রাজেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"লোকটা কোথাকার, এই দেশী?"

"না—না, বাঙ্গালী; তোমাদেরই ব্রাহ্মণ। হরিহর মুখুয্যে বুঝি ওর নাম, শান্তিপুরে বাড়ী।"

ছেলেটি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ওষুধ তা হ'লে কি কিছু দেবেন?"

"আরে পাগল হয়েছ? এখন আর কি ওষুধ দোবো!"

ছেলেটি চলিয়া গেল।

রাজেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি অসুখ হয়েছিল?"

রাজেন রাস্তার দিকে চাহিয়া কহিল,—"লোকটা খুব মাতাল ছিল, মাতালের যা' হয়।"

"তার সঙ্গে আর কে আছে?"

"কে থাকবে, কেউ এর আর নেই। কেউ থাকলে কি আর আজ এর এই দুর্দ্দশা! শুধু একটা মেয়ে—"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম,—"শুধু একটা মেয়ে? মেয়েটি কত বড়?"

"তা, চোদ্দ পনর বছরের হবে বোধ হয়। কি হে, ব্যাপার কি, তোমার কি জানা-চেনা কেউ হবে?"

রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলাম—"মেয়েটির নাম জান তুমি?"

"মেয়েটির নাম? হ্যাঁ, জানি বৈ কি, মেয়েটির নাম হচ্চে প—ও কি, ছুটলে যে! হরিহর মুখুয্যেকে তুমি চেন না কি?—।" রাজেনের সব কথা আমার কাণে আসিয়া পৌছিল না। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই তালাও'য়ের ধারে গাছের তলায় ছুটিয়া গিয়া ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিলাম; সেই মুহূর্ত্তেই পদ্মা আমাকে দেখিয়া সেইখানে একেবারে লুটাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"কাকু! কাকু! বাবা, কাকু এসেছে! বাবা গো!"

সরকারী সড়কের পাশে একটা সুবৃহৎ বকুল-গাছের তলায় ঘাসের উপর একখানি শতচ্ছিন্ন মলিন লেপ দো-পাল্টা করিয়া বিছাইয়া বিনুদার অন্তিম শয্যা পাতা হইয়াছিল।

সেই রবিকরোজ্জ্বল প্রভাতে চক্ষুর সামনে আমার যেন হঠাৎ সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। অভিভূতের মত সেই শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া পড়িলাম। এই আত্মীয়-বান্ধবহীন বিদেশে, আজিকার এই দুর্দ্দিনে একটা 'আহা' বলিবার কেহ ত সেখানে ছিল না, তাই বুঝি এই হতভাগ্য মরণ-পথযাত্রীর অন্তিম শয়ন যাহার তলায় বিছান হইয়াছিল, সেই বকুলের পুষ্পগুলি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বেদনাতে আশে-পাশে চতুর্দ্দিকে একটি একটি করিয়া সব ঝরিয়া পড়িয়াছিল।

বিনুদা চক্ষু বুজাইয়া ছিল। হঠাৎ পদ্মার চীৎকারে চোখ চাহিয়া ইঙ্গিতে আমায় আরও কাছে ডাকিল। তখন কথা কহিবার শক্তিও বোধ হয় আর ছিল না। তবুও একখানি হাত আমার কোলের উপর রাখিয়া, অতি কষ্টে, অতি ধীরে, অত্যন্ত অস্পষ্ট উচ্চারণে কহিল,—"এই জন্যেই বোধ হয় বেঁচেছিলুম ভাই।" তার পর খানিকক্ষণ যেন ক্লান্তিতে চুপ করিয়া চক্ষু বুজাইয়া রহিল! মিনিট দুই তিন পরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সেই রকম স্বরে আরও জড়াইয়া জড়াইয়া কাহার যেন ছবি চাহিল, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। পদ্মাকে কহিলাম,—"বৌদির কোন ছবি আছে কি, থাকে ত দে, বোধ হয়, তাই চাইছে।" মনে মনে কহিলাম,—"মরবার সময়ও বৌদি' বৌদি' ক'রে গেলে, বিনুদা' !"

অদূরে ঘাসের উপর রক্ষিত কাশীর সেই আম-কাঠের বাক্সর মধ্য হইতে পদ্মা একটি ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া আনিল। তাহার মধ্যে সেই সাবানের বাক্স, সেই মাথা বাঁধিবার ফিতার বাণ্ডিলটি আর বৌদির একখানি ছোট্ট ফটোগ্রাফ ছিল। সেইখানি আনিয়া পদ্মা বিনুদার হাতে দিল। বিনুদা তাহা পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া, মুখটা একটু বিকৃত করিয়া অত্যন্ত অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠে অত্যন্ত কষ্টের সহিত কহিল,—"ঠাকুরের—শ্রীকৃষ্ণের—"

সেই ছেলেটির দিকে চাহিয়া কহিলাম—"পার ভাই কোথাও থেকে আনিতে ?" ছেলেটি ছুটিয়া গেল এবং মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যেই ছোট্ট একখানি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি আনিয়া আমার হাতে দিল। আমি বিনুদার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম,—"বিনুদা !"

শুধু একটিবারের জন্য আর একবার চক্ষু মেলিয়া বিনুদা চাহিল এবং তাহার পর রাধাকৃষ্ণের সেই ছবিখানি দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বোধ হয় কিছু বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শক্তিতে কুলাইল না, শুধু ঠোঁট দুইটি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, দুই কসের উপর কিছু ফেনা জমিয়া উঠিল, মুদ্রিত নয়নদ্বয় হইতে ফোঁটা দুই চার জল গণ্ডের হাড় বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

তার পর ?

তার পরের কথাটুকু বলিতে হইবে বৈ কি! এতটা যখন পারিলাম, সেইটুকুও পারিতে হইবে। বুক ফাটিয়া গেলেও তাহা বলিতে হইবে। যদি আজ চীৎকার করিয়া বলি—ওগো, আর ইচ্ছা নাই—ইচ্ছা নাই—আর কিছু বলিতে আমার শক্তি নাই, সাধ্য নাই—সে কথা আমার কেহ কি আর শুনিবে? সুতরাং বুকের হাড় বুক হইতে খসিয়া আসিলেও একটুখানি তার পরের কথা আমাকে বলিতেই হইবে! এ আনন্দকাহিনীর কি শেষ রাখিতে আছে!

চৌদ্দ পনর বৎসরের বালিকার মস্তিষ্ক যে দুঃখে শোকে সাময়িক ভাবেও বিকৃত হইতে পারে, ইহা আমার জানা ছিল না। পদ্মার চোখের দিকে চাহিয়া আমার ভয় হইল। এক বিন্দু অশ্রু সে চোখে নাই। তাহার শুষ্ক পলকহীন চোখের উদাসদৃষ্টি শূন্যের পানে স্থির হইয়া ছিল। সে দৃষ্টি দেখিলে মনে একটা আতঙ্কের ভাব আনিয়া দেয়। চোখের ন্যায় দেহেও তাহার কোন কোন সাড়া ছিল না। যেন কোন শোকের ছায়াপাত তাহার দেহে মনে পড়ে নাই। বুঝি তাহার আজ কিছুই ঘটে নাই। বুঝি অতি-সাধারণ দিন তাহার যেমন, আজও ঠিক তাহার তেমনই দিন।

মুহূর্ত্ত পরেই হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পদ্মা নড়িয়া উঠিল। তার পর সম্মুখস্থ সেই খালি সাবানের বাক্সটি হইতে মাথায় বাঁধিবার ফিতার সেই তাড়াটি লইয়া খুলিতে লাগিল, আবার গুটাইতে লাগিল। সেই অপূর্ব্ব উদাসদৃষ্টি তাহার ভূমির দিকেই নিবদ্ধ। হঠাৎ ফিতাগুলি পাক দিয়া নিজের মাথায় জড়াইতে জড়াইতে সোজা উঠিয়া পদ্মা আমার সামনে আসিয়া

দাঁড়াইল এবং সেই উন্মাদদৃষ্টি দিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া অদ্ভুত স্বরে বলিয়া উঠিল,—"তুমি কে বট হে,—ওগো, তুমি কে বট হে?"

আমি কিছু একটা বলিতে যাইতেছিলাম, বাধা দিয়া তেমনি ভাবে পদ্মা বলিয়া উঠিল,—"গরে যাবা না? পান্তা বাত খাবা না? ঠাউর দর্শন করব না? বলি, অ পঞ্চু বাবু তোম্ কেয়সান আদমী হো? আরে উঠ্, উঠ্,—চল্ চল্! (সুরে) পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।"

জোরে তাহার হাত ধরিয়া একটা ধমক দিয়া কাছে টানিয়া বসাইতেই পদ্মা একেবারে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বিন্দুদার মৃত্যুশয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। এই সময় দর্শকদের ভিতর হইতে একটি বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সুদীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—"নারায়ণ! শ্রীরামচন্দর!"

আমিও আমার কলমের শেষ টানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কথারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলি,—নারায়ণ। নারায়ণ! নারায়ণ!

জমা-খরচ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

জমা-খরচ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফটকের গায়ে পাথরের ফলকে লেখা ছিল,—জে, লোহিড়ী এসকোয়ার।

বাটীর কর্ত্তা বাটীতে ছিলেন না। কয়দিন হইল, একটা জরুরী কার্য্যের জন্য মফঃস্বলের কি একটা জায়গায় গিয়াছেন। ফিরিতে তাঁহার দিন পাঁচ সাত আরও বিলম্ব হইবে। এই শুভ অবসরে গৃহিণী আগামী পরশ্ব একটী ব্রতের অনুষ্ঠান এবং তদুপলক্ষে দু-দশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। বৈঠকখানা-ঘরের রাস্তার দিককার দরজা ভেজাইয়া দিয়া ভট্টাচার্য্যের সহিত গৃহিণী হরিমতি দেবীর তাহারই আলোচনা ও হিসাব ফর্দ্দ হইতেছিল।

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য হিসাবের অঙ্কের নীচে কসি টানিয়া দিয়া, হরিমতির উদ্দেশে বলিল,—তা হলে মা, এই মোট ছাপান্ন টাকা হলেই সব হয়ে যাবে, মায় আমার দক্ষিণে পর্য্যন্ত। তারপর স্মৃতির কাপড়ের বদলে, তুমি মা, যদি গরদই একখানা দিতে চাও ত এর ওপর আর গোটা বার টাকা। শুনিয়া হরিমতি তাহার বাক্স হইতে টাকা আনিতে উঠিয়া গিয়াছিল।

সহসা রাস্তার দিকের দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য চোখ চাহিতেই সম্মুখে যেন বাঘ দেখিল। জগদীশ জুতাশুদ্ধ সতরঞ্চির উপর আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার গম্ভীর কণ্ঠ হইতে প্রশ্ন বাহির হইল,—'ব্যাপার কি'? সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নজর পড়িল, খোলা ফর্দ্দখানির উপর।

ভট্টাচার্য্যের গলা যেন কে চাপিয়া ধরিয়াছিল, ঠেলাঠেলি করিয়া রব বাহির করিল,—আজ্ঞে, গিন্নীমা—

সতরঞ্চির উপর হইতে ফর্দ্দখানি তুলিয়া লইতে লইতে জগদীশ জিজ্ঞাসা করিল,—আজ্ঞে গিন্নীমা কি করেছেন?

পরশ্ব দিনটা ভাল আছে, তাই একটা—

হোম? পুজো? ব্রত? প্রায়শ্চিত্ত? চান্দ্রায়ণ? ব্রাহ্মণভোজন?—শুভদিনে কী করবার আয়োজনটা হচ্ছে?

নাকের উপর হইতে চশমাখানি খুলিয়া কাগজের খাপে পুরিতে পুরিতে ভট্টাচার্য্য বলিল,—এমন বিশেষ কিছু নয়,—একটা পুত্রেষ্টি—

নইলে তোমার অন্ত্যেষ্টির খরচাটা বুঝি—এই তার ফর্দ্দ হচ্ছিল? আরে ছোঃ!—মোট ছাপ্পান্ন টাকা! বলিয়া ফর্দ্দখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—'দেখ ভটচাজ., তোমাকে কতবার বলতে হবে জানি না যে, এসব চালাকি আমার বাড়ীতে কস্মিন্ কালেও চলবে না। গরীব বলে, মাসে দুটো করে টাকা ত দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি! এ মাসের টাকা বুঝি পাওনি? আচ্ছা'—বলিয়া ব্যাগ হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া ভট্টাচার্য্যের কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল,—যাও, ভেগে পড়। খবরদার বলচি, আমার বাড়ীতে এরকম ভট্চায্যিগিরি চালাতে আর এস না। তা হলে মাসে এই দুটাকাও বন্ধ করে দেওয়া হবে। দু'পা গিয়া ফিরিয়া আবার বলিল,—'পুত্রেষ্টিটা বাগাতে পাল্লে, তোমার দক্ষিণেটা আদায় হত কত? গোটা পাঁচেক টাকা ত? পুজোর বাজার, টানাটানি বড়, না? আচ্ছা, নিয়ে যাও, আরো পাঁচটা টাকা' বলিয়া ব্যাগ হইতে আরও পাঁচ টাকা বাহির করিয়া তাহার সামনে ফেলিয়া দিল।

বরাবর দ্বিতলে নিজের শয়ন-কক্ষে গিয়া, জে, লোহিড়ী এসকোয়ার, তাহার সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া ধুতি পরিধান করিয়া জগদীশ লাহিড়ী হইল এবং আরাম-কেদারাখানিকে জানালার ধারে টানিয়া আনিয়া তাহাতে ক্লান্ত দেহখানি এলাইয়া দিল।

শরতের অপরাহ্ণ। বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারাকে বিদায় করিয়া দিয়া, কয়দিন হইতে আকাশে বাতাসে যেন একটা নূতন রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতি মাসত্রয়ব্যাপী ধারা-স্নান সমাপনান্তে সবুজ শাড়ী

পরিধান করিয়া শুদ্ধাচারিণীর মত যেন আসন্ন পূজার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

জগদীশ জানালার ধারে বসিয়া দেখিতে লাগিল,—পথে লোক চলাচলেরও অন্ত নাই, অসংখ্য রকম ফেরীওয়ালার ডাকেরও বিরাম নাই। ও দিককার ফুট-পাথে একটা লোক ছড়া হাঁকিয়া বই বিক্রয় করিতেছিল।—

'এবার পূজোয় বিপদ ভারি,
বউ চেয়েছেন মটর গাড়ী।
বুড়ো কর্ত্তার কী দুর্দ্দশা,
নগদ মূল্য এক পয়সা।'

মোড়ের মাথার বড় বাড়ীখানা পাঞ্জাবীরা ভাড়া লইয়া, রাস্তার দিকের ঘরগুলাতে গ্যারেজ করিয়াছিল। তাহারই কেহ একজন একখানা ট্যাক্সির নীচে মড়ার মত চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া তাহার কি একটা মেরামত করিতেছিল, আর, তাহাই দেখিতে পাড়ার ছেলের দল ভিড় করিয়া সেখানটা ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল।

পায়ের শব্দে চোখ ফিরাইতেই হরিমতি বলিল, "আচ্ছা, ফর্দ্দখানা ছিঁড়ে ফেলে ভট্‌চায্যি মশাইকে না হয় তাড়িয়ে দিলে, কিন্তু হঠাৎ এরি মধ্যে ফিরে এলে যে? শরীর ভাল আছে ত?"

এ শরীরের কি আর মন্দ আছে, কনে বৌ?

তবে এরি মধ্যে ফিরলে যে বড়?

তোমার পুত্রেষ্টি নষ্ট হবে বলে।

হরিমতি মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল— "না, সত্যি বলচি ওসব কিছু নয়। পোরশু মহালয়ার দিনটা ছিল, তাই গুটিকতক ব্রাহ্মণভোজন করাবো মনে করেছিলুম। তুমি বাড়ীতে নেই, তাই ভট্‌চায্যি মশায়কে দিয়ে—"

রামো চন্দর। চিরটা কাল ধরে বামুনেরা ত খালি খেয়েই আসচে। বলি, ভগবানের কাছ থেকে ওটা কি তাদের একচেটে সনন্দ পাওয়া? আর কেউ খাবে না, শুধু ওরাই খাবে? খেয়ে খেয়ে যে, বামুনদের ডিসপেপসিয়া ধরে গেছে। খাবার লোক দুনিয়ায় ঢের—

তা থাকগে,—তার আর দরকার নেই। তোমার মুখখানা কিন্তু বড় শুকিয়ে গেছে। জলখাবার নিয়ে আসি, আগে কিছু খাও, তারপর বসে বসে জিরোও।

হরিমতি উঠিয়া গেল।

জগদীশও উঠিয়া আলমারী খুলিল এবং একটি ফ্লাস্ক বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থিত তরল পদার্থ ছোট একটি গ্লাসে ঢালিয়া উপর্য্যুপরি দুই তিন বার গলাধঃকরণ করিল।

হরিমতি খাবারের থালাখানি রাখিতে রাখিতে বলিল,—"উঃ, গন্ধে ঘর একেবারে ভরে গেছে। ওই ছাই খেলে বুঝি?"

ছাই বলতে নেই, কনে বৌ—ওঁর অমর্য্যাদা করা হয়।

এই বিকেল থেকেই বুঝি আজ সুরু করলে?

এর আর কালাকাল আছে কি? গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ। ওগো, দেখদেখি, ঐ ধনেখালির খুড়ো আসচে না?—ওই যে গো, ওদিককার ফুটপাতে?

হরিমতি সেইদিকে চাহিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনিই ত বটে। ইস, বড় রোগা হয়ে গেছেন ত!"

তবুও ত মরবার নামটি নেই। যেন অক্ষয় অমর হোয়ে—কনে বৌ, শীগ্‌গির, শীগ্‌গির! বলিয়া জগদীশ শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"সরাও —সরাও" শীগ্‌গির সরাও!

কি সরাবো গো,—অমন কচ্চ কেন?

আরে খাবারের থালা ফালা সব সরিয়ে নিয়ে যাও শীগ্‌গির। টুলখানা খাটের ধারে দাও। গোটা কতক শিশি—শিশি—ঐ ডাক্তারখানার ওষুধের শিশি গো। আরে, যা হয় রাখোনা শীগ্‌গির টুলটার উপর। এটা কি? ক্যাষ্টর অয়েল? এটা?—তোমার সেই মালিশ? দাও, দাও, মধুর শিশিটাও দাও। গোলাপ-জলের খালি বোতলটাও রাখ, লেবেলটা ঘ্যালের দিকে ঘুরিয়ে রাখ না ছাই। ওষুধের গেলাস একটা। জল এক ঘটি—পিকদানীটা। থার্ম্মোমিটারটা আলমারী থেকে বার করে—

কি গো, কি ব্যাপার?

ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু! আরে, এসে পড়ল বুঝি! ওই ফড়িঙে শরীরে পা চালিয়ে কি রকম জোরে আসছে! বেটা যেন—ওগো কম্বলখানা—কম্বলখানা। দেখ, এই শুয়ে পড়লুম, —যেন আমার খুবই অসুখ। তুমি ঐ একধারে ঘোমটা দিয়ে চুপটি করে বসে থাক। মাথার দিকের জানলাটা—

কৈ,—ও জগদীশ—জগদীশ! কোথায় হে সব?

কাহারো কোন সাড়া শব্দ নাই।

কোন ঘরে সব হে? বলিতে বলিতে ধনেখালির খুড়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন,—"এ কি! এমন করে—অসুখ নাকি?"

জগদীশ আরাম-কেদারাখানি হাত দিয়া দেখাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে শুধু বলিল,—"বসুন।"

তারপর, "কবে থেকে অসুখ হল? কি,—জ্বর না পেটের অসুখ?" বলিয়া তিনি জগদীশের ঘর্ম্মাক্ত কপালে হাত দিয়া বলিলেন,—জ্বরই বুঝি—তা হলে এখন রেমিশন হচ্চে।

একে সেই দারুণ গরম, তাহাতে উদরমধ্যে সদ্যঃ প্রেরিত সেই তরলাগ্নির অবস্থান, সর্ব্বোপরি গলা পর্য্যন্ত কম্বল ঢাকা থাকাতে, জগদীশের কপাল পর্য্যন্ত ঘামিয়া উঠিয়াছিল।

অতি কষ্টে, থাকিয়া থাকিয়া, জগদীশ বলিল,—"জ্বরও নয়, পেটের অসুখও নয়, হয়েছে—এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা।"

ও সব ইংরিজি বললে ত বুঝবো না বাবা; বাংলাতে একে কি বলে?

এই যাকে আপনার বাংলায়,—বাংলায়—নাঃ, বাংলাতে এর আর কোন নাম টাম নেই। এই প্রত্যেক গাঁটে গাঁটে খিলে খিলে প্লুরোথাইসিস।

থাইসিস?—থাইসিস ত যক্ষা! পিলেতে যক্ষা দু ইস তাহলে ত বড় ভয়ের কথা।

তাই হয়েছিল বটে, তবে এখন তা কাটিয়ে উঠেচি কাকা। এখন শুধু গায়ে একটু বল পেলেই হয়। ওঃ—গেলুম। বলিয়া জগদীশ একবার এপাশ ওপাশ করিয়া কাতরতা প্রকাশ করিল।

তা, দেখচে কে?—উঃ, কিসের গন্ধ বেরুচ্চে বল দেখি, যেন মদের মত?

ঐ যে, গেলাসে ওষুধটা ঢালতে গিয়ে, কনে বৌ সব ফেলে একাকার করে বসে আছে! ওষুধের গন্ধটা ঠিক মদের মতই বটে,—মুখে দিলেই যেন বমি আসে!

হরিমতি নিঃশব্দে উঠিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ধনেখালির খুড়া বলিলেন,—'তোমার অসুখ হয়ে পড়লো! গয়নাগুলোর জন্যেও বাড়ীতে ওরা বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যাক, তুমি একটু সেরে সুরে ওঠো।'

জগদীশ অতি ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল,—সব তৈরি হয়ে গেছে নিশ্চয়। আজই ত আমাদের গিয়ে আনবার কথা ছিল। সে যে আমি না গেলে হবে না, কাকা, নইলে ঠিকানা দিয়ে, চিঠি লিখে আপনাকেই পাঠিয়ে দিতুম। যাক আর পাঁচ সাত দশ দিন। আমি একটু উঠতে পাল্লেই গিয়ে নিয়ে আসচি। তারপর, আপনার শরীরটা কেমন আছে কাকা? বড়ই কাহিল কাহিল দেখছি যে?'

কাহিলের আর অপরাধ কি বাবা? এই এক মাসের মধ্যে বার চারেক জ্বরে পড়লুম। এ সময়টা কি গাঁয়ে কারুর আর ভাল থাকবার যো আছে?—আচ্ছা জগদীশ, তিন হাজার ত তোমার কাছে দিয়ে দিয়েছি, বাকী আর কত আন্দাজ দিতে হবে বল দেখি?

সবশুদ্ধ আপনার হাজার চারেকের ওপর যাবে না! তিন হাজার ত ওদের দেওয়াই আছে। রিসিটখানা বুঝি আপনাকে দিইনি, নিয়ে যান সেটা। আর হাজার খানেক দিলেই হবে বোধ হয়। নেহাৎ একটা মাখামাখি ভাব খাতির রয়েচে আমার সঙ্গে তাই, নইলে মজুরী আপনার অন্য জায়গায় ডবল পড়ে যেত। সবই জড়োয়া—মজুরী ওর বড্ড বেশী কি না?

আচ্ছা, আমি উঠি তাহলে আজ। তুমি সেরে উঠে, ওগুলো তাহলে আনিয়ে রেখো। রেখে, আমায় একখানা চিঠি দিও। টাকাটা এনেছিলুম, তোমাকে দিয়েই যাই। ধর দেখি,—এই এক'শ করে বাণ্ডিল, গুণে নাও। এই এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ।

ভৃত্য চিনিবাস গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে থতমত খাইল, তারপর দু'পা পিছাইয়া যাইয়া দরজার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, পরিশেষে জগদীশের দিকে চাহিয়া বলিল,—চালের গোলা থেকে লোক এসেছে।

তাহার দিকে না চাহিয়াই জগদীশ বলিল,—'যা, বোলগে বাবু বাড়ী নেই। জানিস, আমার এই অসুখ, উঠে বসবার ক্ষমতা নেই, আমি যাব তার সঙ্গে দেখা কত্তে, এ ও তো-ব্যাটাদের বলে দিতে হবে?'

খানিক পরে বাহির হইতে চাউলের গোলার লোকটির গলা বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উপরে আসিল;—'এক মাস শয্যাগত কি রে! এই ত একটু আগে ট্যাক্সি করে আসছিলেন, আমাদের গোলায় নেমে বলে এলেন, বিল নিয়ে আসতে, টাকা দেবেন।'

ধনেখালির খুড়ার মুখ হইতে কিছু একটা বাহির হইবার উপক্রম হইতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়াই

জগদীশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"আহা একটি ছেলে, তাও পাগল হয়ে গেল। আচ্ছা কাকা, আপনাদের ওখানকার তেরল কালীর বালাতে কি সত্যি কোন উপগার টুবগার হয়?"

কার জন্যে বল দেখি?

ওই যে ছেলেটি এসেছিল, ওঁর জন্যে। ওটি হচ্ছে, হৃষীকেশ সামন্ত একজন চালের আড়তদার—তারই ছেলে। বুড়োর ঐ একটিই ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ করে আড়তের কাজকর্ম্মই দেখাশুনো কচ্ছিল। হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছে। সমস্ত দিন ধরে এর ওর তার বাড়ী ঘুরছে। কাউকে গিয়ে বলছে—টাকা দাও, কাউকে বলচে—এক গাড়ী চাল পাঠাব? কাউকে বলচে—চালের কিস্তি ডুবে গেছে। আহা, ছেলেমানুষ, এই বয়সেই—আপনি একবার খপরটা নেবেন ত কাকা বালাটার সম্বন্ধে।

"আচ্ছা তা নেবখন। এখন উঠলুম তাহলে, নইলে সছটার ট্রেণ আর পাবোনা।" বলিয়া ধনেখালির খুড়া পীড়িত ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাবধান থাকিবার জন্য যথাবিহিত উপদেশাদি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং পরক্ষণেই হরিমতি ঘরেব মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। জগদীশ পূর্ব্ববৎ শয়নাবস্থাতেই ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—"উঃ গেলুম, কনেবৌ আর বোধ হয় বাঁচবো—"

দেখ, আর ঢং বাড়িও না। কত রকমই যে জান তুমি! ভ্যালা যা হোক। তোমার ফন্দি বুঝতে পেরেছি। কাকার ঐ গহনার টাকাগুলো বুঝি গাপ কর্ব্বার মৎলবে আছ? আচ্ছা এ সব কী কর্ত্তে লেগেছ তুমি?

সেই মোটা কম্বলে তখনও সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। গোঙাইতে গোঙাইতে জগদীশ বলিল—আর বোলনা, কনে বৌ। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। অর্থাৎ, কবিরাজীতে শব্দকল্পদ্রুম। মাগো, গেলুম। তারা ব্রহ্মময়ী। ওগো, হাঁ করে দেখছ কি? জানলা দিয়ে দেখনা তিনি গেলেন কি না।

যাবেন না ত কি আর থাকবেন? ঐ ত যাচ্ছেন! ছিঃ ছিঃ, চিরটা কালই তোমার এই জুচ্চুরী!

দুহাতে কম্বলখানাকে ঠেলিয়া দিয়া জগদীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—জুচ্চুরী কি রকম? যার আছে তার কাছে থেকে এ রকম করে না নিলে সে দেয় কখনো? সুতরাং এতে দোষ মাত্রেণ নাস্তি। আর তা ছাড়া জোচ্চর ত সকলেই।

হ্যাঁ, সবাই তোমার মত জোচ্চোর!

নয় ত কি! একধার থেকে ধর। তোমার উকীল জোচ্চোর, ব্যারিষ্টার জোচ্চোর, ডাক্তার জোচ্চোর, মোক্তার জোচ্চোর, পাণ্ডা জোচ্চোর, শিষ্যি জোচ্চোর, গুরু জোচ্চোর, বামুন——

থাম—থাম, বোকো না। উকীল—ব্যারিষ্টার—ডাক্তার—মোক্তার সব জোচ্চোর! যা নয় তাই!

উকীল জোচ্চোর নয়? মক্কেলের কাছ থেকে, আগে তাঁর ফীএর টাকাটি কড়ায় গণ্ডায় নিলেন হাতিয়ে, তারপর দিনের দিন, মকর্দ্দমার যখন ডাক পড়লো, তখন আর তাঁর দর্শন নেই, আর একটা কেস নিয়ে তখন তিনি আর এক ঘরে হাজির! এদিকে মক্কেল বেচারা বিশবার করে দৌড়োদৌড়ি কত্তে লাগলো তাঁর কাছে, যেন দয়াময় তিনি—একটু দয়া করবেন! তারপর ধর,—মক্কেল বলচে, পশ্চিম দিক, বাবু মশাই, ঠিকই সেটা পশ্চিম, তার উকীল বলচেন,—না না, পশ্চিম কিছুতেই নয়, বলতে হবে, ও একেবারে সোজাসুজি পূব। এই ত উকীলের ব্যাপার।

তার পর ধর, ব্যারিষ্টার। তিনি বিলেত থেকে ওথ নিয়ে এলেন যে, কারো কাছ থেকে ফী বাবদ একটি পয়সাও গ্রহণ কর্ব্বেন না, কিন্তু তাঁর ফীএর গিনি থেকে কেউ কখনো তাঁকে একটি পাইপয়সাও বাদ দিতে দেখেছে?

আর ডাক্তারের তো কথাই নেই। হোয়েছে যদি একটু সামান্য সর্দ্দিজ্বর, কি ধরেছে একটু ফিক্‌ব্যথা, বলে বসলেন, প্রকাণ্ড একটা বদখৎ নাম—গ্যালাকটোগোগস কি হাইপোকনড্রিয়াসিস—কেস বড় খারাপ—হার্ট য়্যাটাক্ হবার খুবই চান্স। বড় বড় গোটাকতক বাক্য ঝেড়ে, দিলেন বাড়ীশুদ্ধ সকলের মাথা একেবারে ঘুলিয়ে। তারপর, এই রকমারি ধরণের প্রেসক্রপশন লিখতে সুরু করে, একদিকে খালি কত্তে লাগলেন রোগীর বাড়ীর ক্যাশবাক্স, আর অন্যদিকে বাড়াতে লাগলেন, নিজের নামের ব্যাঙ্ক-একাউণ্ট। তারপর—

রক্ষে করো, আর তারপরে কাজ নেই। যা নয়—তাই! তাহলে, বল না কেন যে, জগৎশুদ্ধু সকলেই জোচ্চোর?

আরে বলছি ত তাই। এই হালফিল দেখনা কেন, আর মিনিট পাঁচেক বাড়ী ফিরতে যদি আমার

দেরী হত তা হলেই, ভট্‌চাজ, বুড়ো ছাপান্নটি টাকা হাতিয়েছিল আর কি! সুতরাং জগৎশুদ্ধুই ত জোচ্চোর। ও তোমার গিয়ে রাজা মহারাজা থেকে আরম্ভ করে মায় আরসোলা টিকটিকি পর্য্যন্ত সব জোচ্চোর,—নয় কে বল? স্বয়ং ভগবানকেও বাদ দেওয়া চলে না।'

স্বয়ং ভগবানও তাহলে জোচ্চোর! তবে দুবেলা তোড়জোড় করে তাঁর নাম জপ কত্তে বস কেন?

ডাকাতেরা ডাকাত-কালী পূজো করে জান ত? সে মহাজোচ্চোরকে না ডাকলে কাজ সিদ্ধ হবে কেন?

তা ভাল। এখন জল-খাবারটা আনি?

সে কথা আর বলতে। ক্ষিদেয় পেট একেবারে চাঁইচাঁই কত্তে লেগেছে। ফ্ল্যাস্কটা বার করে দাও। দু-আউন্সের নেশাটাই একেবারে ঘোলা মেরে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুণ্ডরীকাক্ষ পতিতুণ্ডি

আহারান্তে নিদ্রার পর জগদীশ নীচে বৈঠকখানায় আসিয়া যখন দরজা জানালা খুলিয়া বসিল, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। চিনিবাস চা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

ঠিক সেই সময় একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক হঠাৎ সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া জগদীশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—'মশাই গো, নমস্কার! দয়া করে এক ঘটি জল যদি আনিয়ে দেন। তেষ্টাও পেয়েছে বটে, মৌতাতেরও সময়টা হয়েছে। কটা বাজলো বলতে পারেন?—গোটা চারেক হবে না? একটু বসতে পারি বোধ হয় এখানে আপনার?' প্রশ্নকর্ত্তা শুধু প্রশ্নই করিল মাত্র, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া সটান বসিয়া পড়িল। লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া জগদীশ শুধু জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমার নাম কি বাপু, আসছ কোথা থেকে?'

'থেকে যে কোথা, তা আর কি বলবো। উপস্থিত, ঐ রাস্তার ফুটপাথ থেকেই ধরে নিন। ভবঘুরে লোক,—নির্দ্ধারিত আস্তানা ত কোন জায়গায় নেই যে, নাম করে দোবো।' তারপর চায়ের পেয়ালার দিকে নজর পড়িতেই লোকটি বলিয়া উঠিল,—'চা খাবেন নাকি? আচ্ছা, এ পেয়ালাটা আমায় দিন, আপনি দয়া ক'রে আর এক পেয়ালা আনিয়ে নিন, দেবতা। চা টা হলে আফিংটা মজে ভাল।' বলিয়া একটি ছোট্ট কৌটা হইতে একটি আফিং-এর গুলি বাহির করিয়া আলগোছে মুখের ভিতর ফেলিয়া দিল এবং চায়ের বাটিটি টানিয়া লইয়া দ্বিধাশূন্য নির্ব্বিকার মনে তাহাতে চুমুক দিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

লোকটির আচরণে জগদীশ বিন্দুমাত্রও বিস্মিত বা বিরক্ত হইল না, কেবল একদৃষ্টে তাহার সেই তাঁবাটে রঙের, ছিপ ছিপে পাকাটে চেহারা, তাহার গোলাকৃতি নিষ্প্রভ চক্ষু এবং তাহার বাক্যালাপের ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া যাইতে

চা খাইতে খাইতে লোকটি বলিতে লাগিল,—'কি জানেন? চা জিনিসটা বড় তোয়াজী, আফিংটার সঙ্গে জুৎ হয় ভাল। পয়সা কড়ির ত সম্বল নেই, ভিকিরি মানুষ, খেতেই পাই না, তা আবার চা। তবু আজ যা হোক, মশায়ের দয়াতে চা'টা খাওয়া হলো মন্দ নয়!' বলিয়া খালি চায়ের বাটীটা টেবিলের উপর রাখিয়া, পকেট হইতে একটা পোড়া আধখানা সিগারেট বাহির করিয়া বলিল,—'একবার দেশালাইটা দয়া করুন, দয়াময়!'

জগদীশ চিনিবাসকে ডাকিয়া আর এক পেয়ালা চা আনিতে বলিয়া, লোকটির দিকে চাহিয়া বলিল,—'আসচো কোত্থেকে, তা ত শুনলুম, এখন যাবে কোথায়?'

'আজ্ঞে, যাবার ঠিকানাটা ঠিক আছে। ষ্টিফেনসন সাহেবের কাছে যখন কাজ কর্ত্তুম, তখন মাইনের টাকা থেকে বড়-বাবুর কাছে মাসে গোটা কুড়ি করে টাকা জমা রাখতুম। প্রায় শ'তিনেক টাকা হয়েছিল। তারপর আজ আট মাস হল চাকরীটা ছেড়ে দিয়েছি। এখন ঐ টাকাটার জন্যে বাবুর কাছে মাঝে মাঝে যাই। গোটা সতের টাকা এই কমাসে দিয়েচেন। এই পূজোর ঝোঁকটায় যদি দু'পাঁচ টাকা পাই, তাই যাচ্ছি একবার তাঁর কাছে।'

'তিনশর ভেতর আট মাসে সতের পেয়েছ ত? আর সেখানে যাবার দরকার আছে বলে মনে কর? তা তোমার নামটা ত বল্লে না?'

আমার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ পতিতুণ্ডি।

ওরে বাসরে! তা ভাল। তাহলে ব্রাহ্মণ?

আজ্ঞে ছিলুম বটে এককালে, এখন আর নই।

কি রকম?

সে অনেক ব্যাপার। সংক্ষেপে বলি। বাবা সর্ব্বস্ব খুইয়ে তিনবার ফেলের পর, চার বারের বার যখন আমায় এনট্রান্স পাশ করালেন, তার পরই হঠাৎ গেলেন মরে। দিয়ে গেলেন, পাঁচশো টাকা দেনা, লক্ষ্মীজনার্দ্দিন ঠাকুর, আর তাঁদের নিত্যসেবা। দেনা আর পেটের দায়ে ত অস্থির করে তুললে। একটা চাকরি বাকরি কত্তে যে কোলকাতায় চলে আসবো, লক্ষ্মীজনার্দ্দিন রইলেন পথ আটকে। গাঁয়ের দোর দোর খোসামুদি করে বেড়ালুম, কেউ যদি কিছুদিনের জন্যে ঠাকুরের ভার নেয়, কেউ নিলে না। তখন বাঁধলুম ঠাকুরকে একটা ছেঁড়া গামছায়, তারপর কোলকেতায় এসে দিলুম একেবারে নিশ্চিন্দি করে, পোলের ওপর থেকে গঙ্গায় ফেলে। ঠাকুরও জুড়ুলেন, আমিও জুড়ুলুম। ও মশাই! কি করে এদিকে ব্যাটারা পেলে টের! আর গাঁ সুদ্ধু সকলে মিলে পরামর্শ করে দিলে আমায় একঘরে করে।

এ যে একটা উপন্যাস হে পতিতুণ্ডি।

আজ্ঞে, আরো আছে রাজা, শুনুন একবার কাহিনীটা। একঘরে হয়ে ত থাকি। ছোটলোক ছাড়া, ভদ্দরের ভেতর কেউ বাড়ীতে আসেও না, ডাকেও না। ওদিকে ষ্টিফেনসন সাহেবের আণ্ডারে চাকরী ত নিয়েছি এক বাগিয়ে,—ত্রিশ টাকা মাইনে। শনিবার শনিবার বিকেলের ট্রেণে বাড়ী আসি। দুরাত একদিন থেকে আবার সোমবার গিয়ে আপিস করি। এই রকম এক শনিবার বাড়ী এসেছি। শুনলুম, সেই রাত্রে নবা বাগ্দির মেয়ের বিয়ে। রাত কত বলতে পারি না, নবার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। নবা পা দুটো জড়িয়ে বল্লে, কি হবে দা-ঠাকুর, মেয়ের আমার বিয়ে হয় না। আমি বল্লুম অপরাধ?

নবা বল্লে, আমাদের বামুন বলচে যে, দশ টাকা না হলে আসনে বোসবেন না। খেতে পাইনে দাঠাকুর, দশ টাকা কোত্থেকে দি, বল ত একবার তুমি।

আমি তখনি ঘরে শেকল লাগিয়ে নবাইকে বল্লুম—তোকে এক আধলা দিতে হবে না। চ—আমি তোর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবো। দিলুমও তাই। মন্তর টন্তর কী যে তখন বলেছিলুম আর বলিয়েছিলুম, তা জানি না, কিন্তু বিয়েটা তাদের সে রাত্রে ঠিকই হয়ে গেল।

অনেক দিন পরে ও বছর মগরার ইষ্টিসনে সৈরভীর সঙ্গে দেখা হল। ছেলে পুলে নিয়ে তারা ত্রিবেণীর মেলা দেখতে এসেছিল। দুজনে পায়ের ধুলো নিয়ে ত অস্থির করে তুল্লে। যাক—যা বলছিলুম। বিয়ে ত দিয়ে দিলুম। সকালে বাড়ী এসে দেখি, উঠোনে গাঁ সুদ্ধু জড় হয়েছে। আমি এসে দাঁড়াতেই জনকতক ধরে আমায় বসিয়ে দিয়ে, নাপতেকে ডেকে, দিলে আমায় নেড়া করে। তারপর জন দুই এসে, দিলে আমার মাথার ওপর কলসীখানেক ঘোল ঢেলে। অবশেষে ধনঞ্জয়ের সুব্যবস্থা। একজন নিলে পৈতেগাছটা খুলে, আর বাকি সকলে চাঁদা করে মারতে মারতে দিলে গাঁয়ের বা'র করে।

তারপর—

আচ্ছা, তারপরের যা, তা পরেই শুনবো এখন। উপস্থিত বড়বাবুর কাছে আর গিয়ে কাজ নেই। আজ থেকে এইখানেই স্থিতি হোক,—রাজী আছ ত?

বরাবর?

বরাবর।

আফিং?

ফুরুলেই পাবে।

চেয়ার হইতে উঠিয়া পতিতুণ্ডি জগদীশের পায়ের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল,—পায়ের ধুলোটা দিন, দেবতা। যা বলবেন, শর্ম্মার দ্বারা সবই হবে, কোন কাজেই পেছপা পাবেন না। পেটটা আর আফিংয়ের কৌটোটা যদি ভরিয়ে রাখেন দয়াময়, তা হলে কী আর বলবো—

কিছু আর বলবার দরকার নেই। তা পৈতে গাছটা কি সেই থেকে এখনো নেই নাকি?

বহুকালই ছিল না বটে, কিন্তু বছরখানেক হল আবার পরিচি। ও গাছটা থাকলে, অনেক সময় অনেক কাজে বেশ একটু সুবিধে হয়।

বেশ করেছ। তা হলে—

রাম রাম জোগোদীশ বাবু। তবীয়দ আচ্ছা আছে ত?

আরে রাম রাম! আইয়ে আইয়ে। জগদীশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—আপনাদের কাঙালী ভোজনের কি হোল, কিছুই ত আর খবর দিলেন না, সুরজমল বাবু?

বাবু স্বরজমল মাড়োয়ারী চেয়ারখানি টানিয়া বসিয়া, পাকদেওয়া গোঁফের পাশে মিঠা হাসি ছড়াইয়া বলিলেন,—ব্রেফ খবর দিলেই ত কুছু হোবে না বাবু সাব, লেকেন, রুপেয়া ভি ত দেনে হোবে। পঁচাশ হাজার কাঙালী খিলানো হোবে, পানশো মণ চাউল ত লাগবেই করবে!

তা ত লাগবেই। তিন দিন ধরে সহরের সমস্ত কাঙালীদের খাওয়ান—

ওহে বাত ত হামভি বলছে। লেকেন রোপেয়া ত আপনাকে বিলকুল দিয়ে দিতে হোবে, জোগোদীশ বাবু?

রোপেয়া দিয়ে দিতে হবে বৈ কি। তবে চাল আপনার মজুত আছে জানবেন। যেদিন বলবেন, সেই দিনই পাবেন। আর ভাও, যা বলে দিয়েছি—সাত টাকা—বাজারে কেউ এ ভাওয়ে দিতে পার্ব্বে না। ভঁাড়ার গড়ের মাঠেই হবে ত?

ব্যস। একদম পছিমতরফ ওয়ালা বঁড়িয়া তাঁবু। ত বাত অউর কুচ নেহি জোগোদীশবাবু। পাঁনশো মণ তাহলে কাল সবেরে ভেজিয়ে দিয়ে দেবেন। রোপেয়াটা হিসাব করে লিয়ে লিন, বলিয়া, বাবু স্বরজমল একতাড়া নোট জগদীশের হাতে দিয়া বলিল,—লিন—গিণিয়ে লিন।

জগদীশ নোটগুলি মিলাইয়া লইয়া বলিল,—তিন হাজার দুশো—

হাঁ—বত্তিশ শও হোলো ত? আউর তিনশো, কাল সবেরে হামি ভেজিয়ে দেবে।

বহুৎ আচ্ছা। কাল সকালেই আমি পাঁচশ মণ চাল পাঠিয়ে দোবো। আর কোন খবর?

ব্যস, বলিয়া বাবু স্বরজমল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ডাইন হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জ্জনী দ্বারা ডাইন দিকের পাকানো গোঁফটাকে আরও একটু পাক দিয়া বাঁকাইয়া বলিলেন,—বহুৎ কাম আছে,—রাম রাম, জোগোদীশ বাবু।

রাম রাম।

স্বরজমল চলিয়া গেলে, জগদীশ চিনিবাসকে হাঁক দিয়া ডাকিল। চিনিবাস আসিলে বলিল,—ছাখ, চালের আড়তে গিয়ে বলে আয়, বাবু এখনি বাইরে কোথায় চলে যাবেন, তোমাদের টাকা নিতে ডাকছেন,—হ্যাঁ, আর ছাখ, এই পতিতুণ্ডি বাবু আজ থেকে এখানে খাবেন—দাবেন—থাকবেন,—তোর মাকে বলে আয়।

আসচি—বামুন দিদি অনেকক্ষণ থেকে এসে বসে আছে।

কে বামুন দিদি?

ঐ ভবানীপুরের।

অন্দরের দরজার দিকে চাহিয়া জগদীশ ডাকিল,—কৈ, কোথায়, ও কেষ্টর মা,—কি খবর তোমার?

থান পরিহিতা একটী প্রৌঢ়া বিধবা, একটী ছোট ছেলের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার দিকে চাহিয়া জগদীশ বলিল,—আমি ভারি ব্যস্ত। তোমাদের কি, বল দেখি শীগ্‌গির।

ঘোমটার ভিতর হইতে অতি ধীরে ধীরে স্ত্রীলোকটী বলিল,—এ মাসের——

কেন? এ মাসের টাকা ত আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমাদের ওদিককার সাত ঘরের পঁইত্রিশ টাকা আজই সকালে নন্দকে দিয়ে ত পাঠিয়ে দিয়েছি! তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছ কখন? হ্যাঁ, ঐ গোবিন্দর ঠাকুরমাকে গোবিন্দর এ মাসের স্কুলের মাইনের টাকাটা দিতে ভুলে গেছি। আর স্কুলও ত এখন বন্ধ হোয়ে গেছে।

আর বাবা, আর একটি ভদ্দর ঘরের বউ-ই আর নেই—বড়ই কষ্ট পাচ্ছে। উপযুক্ত ছেলেটি তার সম্প্রতি মারা—

আচ্ছা, আমাকে কি তোমরা রাজা না জমিদার পেয়েছ বল দেখি? দোহাই তোমাদের, আর ঝঞ্ঝি বাড়িও না। আমি নিজে পাইনে খেতে, আর তোমরা ক্রমেই—না বাপু, আর আমার দ্বারা হবে টবে না। আমি কি দানছত্র খুলে বসেচি?

বড্ড কষ্টে বউটা দিন কাটাচ্ছে বাবা। গলায় আবার একটি কচি ছাওর পো। কী কষ্টে যে দিন তাদের যাচ্চে বাবা। গরীব হোয়ে পড়েছে, কিন্তু হ্যাংলাটি কর্ত্তে পারে না। ভদ্দর ঘরের বউ!

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জগদীশ বার দুই অস্ফুটে নিজেনিজেই বলিল,—গরীব হোয়ে পড়েছে, হ্যাংলাটি কর্ত্তে পারে না! তারপর পতিতুণ্ডির দিকে চাহিয়া বলিল,—ওহে পতিতুণ্ডি, শুনচো? গরীব হোয়ে পড়েচে, হ্যাংলাটি কর্ত্তে পারে না। বোঝ কিছু?—ও সব হবে টবে না, কেষ্টর মা,—ভেগে পড়। আমার নিজের মদের খরচই জোটাতে পারি না, তার খবর রাখ? তবে, নেশার ঝোঁকে বলে ফেলি,—তাই। আমার জন্ম হয়েচে শুধু

নিতে,—দিতে নয়। সুতরাং, ওসব আশা ছেড়ে দাও।

কেষ্টর মা এক পা—এক পা করিয়া চলিয়া আসিতেছিল, জগদীশ ডাকিয়া ফিরাইল,—বলিল,—মেয়েটাকে সঙ্গে করে না হয় একদিন নিয়ে এস কনেবৌর কাছে, বুঝলে? আর কোন কথা নেই ত?

আর একটা কথা বাবা,—

বাবা টাবা আর নয়। ভেগে পড় এখন। আমার অনেক কাজ, বিস্তর টাকার দরকার। দুলাখ,—চার লাখ—দশ লাখ—দিতে পার কেউ? এ ব্যাটা গেল কোথা?—ওরে চিনে,—চিনিবাস! —ওরে আমার ফ্লাস্কটা—

চিনিবাস যে কোথায় বেরিয়ে গেল বাবা—

ওঃ,—গোলায় গেছে, না?—পতিতুণ্ডি, কি রকম? আফিং ধরেচে না কি? একটু জলটল খাবারও ত দরকার হোয়ে পড়েচে, কি বল? আচ্ছা বোস, আমি আসচি। কেষ্টর মা, যা বলবার থাকে টাকে, কনেবৌর কাছে গিয়ে বল, আমায় আর কেন জ্বালাও। তোমাদের ম্যানেজার রয়েচে যখন—

জগদীশ উঠিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেল।

পতিতুণ্ডির নেশাটা তখন সত্যসত্যই বেশ ঘোর হইয়া জমিয়া আসিতেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীফল-কোঁকোর-কোঁ

দুর্গাপূজার আনন্দ উৎসব সব শেষ হইয়া গিয়াছে। ছুটীর পর আফিস আদালত আবার সব খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাতঃকালেই সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হইয়া, জগদীশ, জে, লোহিড়ী এসকোয়ার হইয়া যখন উপর হইতে নামিয়া আসিয়া নীচে বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিল, পতিতুণ্ডি তখন বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া খরচের হিসাব মিলাইতেছিল।

জগদীশ জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয় পুণ্ডরীকাক্ষ? ব্বাপ! নাম বটে! দাঁত ভেঙ্গে যাবার উপক্রম।

পতিতুণ্ডি তাহার কাগজখানি হইতে চক্ষু না তুলিয়া বলিল, দু আনা পয়সা যে কিছুতেই মেলাতে পাচ্ছি না দেবতা।

'দেখি, দাও তোমার কাগজ পেন্সিল আমার কাছে' বলিয়া হিসাবের কাগজখানির যেখানে পতিতুণ্ডি কসি টানিয়া ৩৸৵০ আনা যোগ দিয়া মাথা ঘামাইতেছিল, জগদীশ তাহারই নীচে পতিতুণ্ডির আফিং দুই আনা লিখিয়া কাগজখানি ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—এই নাও, দেখ, চারে চারে, একেবারে ঠিক মিল।। আচ্ছা পতিতুণ্ডি, তোমার গাঁয়ের নামটা ত একদিনও বলনি, যেখান থেকে তোমার চির নির্ব্বাসন-প্রাপ্তি ঘটেছে?

সে আর সকালবেলা শুনে দরকার নেই।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, সকালবেলা, সে নামটা কেউ করে না আর কি। হাঁড়ি ফাটা নাম, বুঝলেন না দয়াময়।

আমার পেতলের হাঁড়ী ফাটবে না হে, তুমি বল।

নেহাৎ বলতেই হবে? শ্রীফল কোঁকোঁর কোঁ।

শ্রীফল কোঁকোঁর কোঁ? তার মানে?

তার মানে,—আসল নামটা আর মুখে উচ্চারণ করবো না, একটু ঘুরিয়ে বললুম। এই নামেই বলে সকলে।

শ্রীফল ত তোমার বেল, আর কোঁকোঁর কোঁ কি? খালি পেটে মালটাল পড়লে, পেট ত কোঁকোঁর কোঁ করে।

উঁ হুঁ হুঁ, প্রথমটা ধরেছিলেন ঠিকই,—কি পাখীতে কোঁকোর কোঁ করে বলুন না?

ও: বুঝিছি, মুরগী—

হয়েছে হয়েছে,—আর একটু কাছাকাছি আসুন।

আর একটু কাছাকাছি হল গিয়ে তোমার মদ, —মুরগী আর মদ—একটু কেন, খুবই কাছাকাছি!

দেবতা, অতটা করে রোজ মাল খান বটে, কিন্তু বুঝতে আপনার বড্ড বেশী দেরী হয়। মুরগীকে চলতি কথায় আর কি বলে?

চলতি কথায় বলে ফাউল।

আহা হা, ইংরিজির দিকে যাচ্চেন কেন? বাংলায় নেবে আসুন না!

বাংলা?—রামপাখী?

আর?

কুঁক——

এই হোয়েছে—হোয়েছে।

কুঁকড়ো?—তা হলে বল কুঁকড়ো?

এ : হে হে, নামটা করে ফেল্লেন দেবতা?

কোন ভয় নেই হে! যেখানে মা দ্রবময়ী নিত্য প্রবাহিতা, কালাচাঁদের যেখানে নিত্য নিত্য দুবেলা সেবা চলে, সে বাড়ীতে কি কখন হাঁড়ী ফাটে পতিতুণ্ডি?—যাক,—অজেদ গাড়ী আনলে না এখনো! আটটা বাজে, এত দেরী হচ্ছে কেন?

কোথায় বেরুবেন রাজা? সকাল বেলাতেই আজ চোখ দুটো বড্ড চকচকে দেখছি যে?

নিলুম গোটা দুই পেগ টেনে। ঘোরাঘুরি কত্তে হবে অনেক! বড্ড অস্থির হয়ে আছি পতিতুণ্ডি। এইটে লাগলেই ব্যাস বিট দি ফোর্ট উইলিয়ম—একেবারে লাখ তিনেক হস্তগত। তাহলেই রিটায়ার্ড হয়ে বসা আর কি! ভগবানকে ভাল করে ডাক পতিতুণ্ডি, লেগে গেলেই তোমাকে ভরি পাঁচেক আফিং একেবারে খাইয়ে দোব।

তা দেবেন বৈকি রাজা, এমনিই ভালবাসেন বটে! আচ্ছা তা না হয়—

—কি হে, হৃষীকেশ চন্দর,—খবর কি? চেক নাকি ডিসঅনার্ড করে ফিরিয়ে দিয়েছে?

একটি মিশ কালো রংয়ের মোটা সোটা, নাদুস নুদুস, খর্ব্বাকৃতি লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, গলায় তুলসীর মালা, আড়-ময়লা ঢিলে পাঞ্জাবী গায়ে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, গোঁপ কামান হইলেও তাহার কাঁচা পাকা চুলগুলি চিকচিক করিয়া উঁকি দিতেছিল। লোকটা প্রবেশ করিয়াই অনেকখানি নুইয়া পড়িয়া, যুক্ত হাত দুটী কপালে ঠেকাইয়া বলিল, পাতঃপেন্নাম, চেকখানা ডিজোন্নাড করেই ফিরিয়ে দিয়েছে হুজুর।

ডিসঅনার্ড করে ফিরিয়ে দেওয়াচ্চি আমি। পাঁচ হাজার থাকতে থাকতেই আমি যার বিশ হাজার জমা দিয়ে রাখি, আমার চেক ডিসঅনার্ড। মজাটা টের পাওয়াচ্চি আমি!

'পাওয়াবেন বৈ কি হুজুর। আপনি হচ্চেন দরের লোক। আপনার সঙ্গে কি না—তবে, হুজুরের কাছে একটা নিবেদন করি' বলিয়া চাউলের আড়তদার হৃষীকেশ সা, আর একবার হাত দুইটী জোড় করিয়া বলিল,—বড্ডই টাকার টান। আপনার এমন বেশী কিছুও নয়,—সবসুদ্ধ মোটে তিন হাজার সাত শ একান্ন। যদি দয়া করে হুজুর ওটা নগদই দিয়ে দেন ত—

কিছুতেই না। নর্থ ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ককে আমি দেখাচ্চি একবার মজাখানা। বাপ বাপ বলে ঐ চেকের টাকা ডেকে দিতে হবে না? এই জন্তেই ত যাচ্চি এখনি কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের কাছে—এই যে, অজেদ এসেছ। আরে আটটা বেজে গেল, এত দেরী করে গাড়ী নিয়ে এলে হ্যা? নাও—নাও—আর দেরী কোরো না—ষ্টার্ট দাও।

জগদীশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আড়তদার হৃষীকেশ সা তেমনি জোড়হস্তে কহিল,—হুজুর, আপনার হাত ঝাড়লেই পর্ব্বত! টাকাটা আটকে থাকলে—

না না, তা কি হয়। আমি টাকাটা দিয়ে দিলেই ত চুকে গেল। নর্থ ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ককে একবার মজাটা দেখান দরকার কি না। টাকার জন্তে তোমার কোন ভাবনা নেই হৃষীকেশ। এই দেখ না, পাঁচ সাত দিনের মধ্যে ডেকে তোমাকে টাকা দিতে হয় কি না।

জগদীশ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। পিছনে পিছনে হৃষীকেশও গাড়ীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। জগদীশ জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ হে সা, এবার আমার খাবার চাল যা দিয়েছিলে, ও কি রেঙ্গুন না কি?

চক্ষু খানিকটা কপালের উপর তুলিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা খানিকটা বাহির করিয়া হৃষীকেশ বলিল,—বল্লেন কি হুজুর! দশটাকা মণের কাটারি ভোগ চাল—

না না—ও কুলি রাইস খাওয়া আমার চলবে না, মরে যাব তা হলে,—বুঝলে? বলি, ওর ওপর কিছু আছে?

ওর ওপরে ত চালই হয় না হুজুর। তবে পাঁচ খানা বস্তা বাদশাভোগ এক আড়ৎ থেকে এসেছে,—বলেন ত পাঠিয়ে দেব ঐ পাঁচখানা বস্তা, কিন্তু বেজায় দাম, আম্বাদের খরিদ, হুজুর, দশটাকা সাড়ে তের আনা করে।

আরে দশটাকা হোক বার টাকা হোক, তাতে কি, খেতে পারা যাবে ত? আচ্ছা, দিও ঐ পাঁচখানা বস্তা পাঠিয়ে। আজই দিও, চাল প্রায় ঘরে শেষ হয়ে এসেছে।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। হৃষীকেশ আর একবার নুইয়া পড়িয়া প্রণাম করিয়া যখন মাথা তুলিল, তখন জগদীশের মোটর অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আবার ধনেখালির খুড়ো

দেবতা, কাশী থেকে ফিরবেন কবে তাহলে?

দিন চারেকের মধ্যেই ফিরবো, কিন্তু যাওয়া বোধ হয় আজকাল ঘটে উঠবে না, পতিতুণ্ডি। বন্দেমাতরম ব্যাঙ্কের একটা হেস্ত নেস্ত না করে আর নড়চি না। সেই ত লাল বাতি জ্বালাবি বাবা, গরীবকে দুচার লাখ দিতে এত টাল মাটাল কচ্চিস কেন?

ব্যাঙ্কের কি সব হেঁয়ালির ব্যাপার, কিছুই ত বুঝতে পারি না, রাজা। মোটা মোটা টাকা একবার জমা দিচ্ছেন, আবার তুলে নিচ্ছেন, আবার জমা রাখচেন, এসব—

এ সব আর বুঝেও দরকার নেই পতিতুণ্ডি। এই রকম দিতে নিতে, দিতে নিতে, শেষ লাখ তিন চার ওভারড্রাফট দিয়ে আমাকে সাধু-শ্রেষ্ঠ ম্যানেজার বাবু দয়া করবেন আর কি। তারপর তাঁর সঙ্গে আধা আধি বখরা। একবার হস্তগত কত্তে পাল্লে হয়। তারপর শর্ম্মার কাছ থেকে ভাগ নেওয়াব এখন। যাক, এ হপ্তার মধ্যে বোধ হয় আমার কোলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলছে না পতিতুণ্ডি। আজ তোমার কি বার হোল বল দেখি!

আজ হল আপনার মঙ্গলবার।

আজ মঙ্গলবার? ধনেখালির খুড়ো ত তা হলে আজই আসবেন।—এই যে অজেদ এসেছ, বোসো।

ট্যাক্সিওয়ালা আলি অজেদ জগদীশের কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। তাহার একসময়কার ভয়ানক দারিদ্র্য হইতে বর্ত্তমানে তাহার এই সাংসারিক সচ্ছলতা প্রধানতঃ জগদীশেরই সাহায্যে এবং উপদেশে হইয়াছে। সুতরাং অনেক কার্য্যেই সে জগদীশের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিল। অজেদ আসন গ্রহণ করিলে জগদীশ বলিল—দেখ, আজ বারোটার মধ্যেই আমায় বেরুতে হবে। তার আগেই গাড়ী আনবে। আগে বন্দেমাতরম্ ব্যাঙ্ক, তারপর আরও দু এক যায়গায় যেতে হবে। তারপর বৈকেলে আমার ধনেখালির খুড়ো আসবেন। তার হাঙ্গামাটা আজ চুকিয়ে দিতে হবে। যা বলি বেশ ভাল করে শুনে নাও। বলিয়া জগদীশ অজেদকে চুপি চুপি অনেকক্ষণ ধরিয়া কি সব বলিয়া দিল। তারপর, পতিতুণ্ডিকে বলিল,—ওহে, তোমার মার কাছ থেকে ধনেখালির খুড়োর বাক্সটা চেয়ে নিয়ে এস দেখি, আর আশীটা টাকা।

পতিতুণ্ডি উঠিয়া গেল এবং কিছু পরে খানকতক নোট এবং একটা ছোট চামড়ার বাক্স আনিয়া টেবিলের উপর জগদীশের সম্মুখে রাখিল।

অজেদের হাতে নোট কখানি দিয়া জগদীশ বলিল—তোমার সেপ্টেম্বরের ৭৮৲ টাকা ট্যাক্সির পাওনা হয়েছে ত? এই নাও। আর এই গহনার বাক্সটা একবার দেখে রাখ।

অজেদ নোটগুলি হাতে লইয়া, বাক্সটি খুলিয়া বলিল,—একি সবই জড়োয়া?

এতদিন আমার সঙ্গে ঘুরেও তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি কিছু হল না অজেদ। আরে, সবই কেমিকেলের ওপর লাল নীল কাঁচ বসান। সেই জন্যেই ত, এটা দিতেও হবে যেমন, তেমনি আবার নিতেও হবে। কি বললুম তবে এতক্ষণ ধরে?

হাসিতে হাসিতে অজেদ বলিল,—এইবার বুঝিছি।

ছাই বুঝেছ। তোমার চেয়ে পতিতুণ্ডির আমার মাথা সাফ আছে। যাও, ঐ দুটাকা বেশী দিয়েছি, নেশা খেয়ে মাথা ঠিক করে নাওগে।

বেলা প্রায় পাঁচটা। ধনেখালির খুড়ো গহনার বাক্সটি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—সছটার ট্রেণ, খুবই পাব, কি বল জগদীশ?

হ্যাঁ, তা খুব পাবেন। এখন পাঁচটাও বাজেনি। তা হলে গহনা আপনার সব পছন্দ হয়েছে ত কাকা?

এমন গয়না যদি না পছন্দ হবে, কী পছন্দ হবে বাবা? তুমি যে উবগার করলে, তা আর কী বলবো, ভগবান তোমার দিন দিন উন্নতি করুন। শরীরটা—

কিন্তু কাকা, অতগুলো গহনা নিয়ে ট্রামেতে আর আপনার গিয়ে কাজ নেই। কোলকাতা যায়গা,—পথে ঘাটে কত রকমের জোচ্চোর,—বলা যায় না ত কিছু।

আমিও তাই বলি বাবা। তুমি আমায় ট্যাক্সি একখানা আনিয়ে দাও। কত আর ভাড়া নেবে।

এই সিকেপাঁচেকের মধ্যেই আর কি। ওহে পতিতুণ্ডি, কোথায় গেলে?—দ্যাখ, ঝাঁ করে একখানা ট্যাক্সি ডেকে আন দেখি,—এই মোড়েই পাবে এখন।

পতিতুণ্ডি অনতিবিলম্বেই একখানা ট্যাক্সি আনিয়া হাজির করিল এবং ধনেখালির খুড়ো জগদীশকে আর এক দফা আশীর্ব্বাদ ও ভগবানের কাছে তাহার জন্য শুভ কামনা ইত্যাদি জানাইয়া গহনার বাক্সটি একটি কাপড়ে জড়াইয়া লইয়া গাড়ীতে যাইয়া উঠিয়া বসিল।

সন্ধ্যার পর বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া ফ্লাস্কটিকে সম্মুখে করিয়া জগদীশ কিসের একখানা হিসাবের কাগজ দেখিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে দু এক পেগের সদ্ব্যবহার করিতে করিতে পতিতুণ্ডির সহিত নানাপ্রকার রসালাপও করিতেছিল।

অজেদ দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল এবং জগদীশের সম্মুখে কাপড় জড়ানো গহনার সেই বাক্সটি এবং কাগজের মোড়কসুদ্ধ তিনটি টাকা ও চারি আনার পয়সা রাখিয়া বলিল,—এই নিন আপনার বাক্স, আর এই নিন তের সিকে।

কাজ ক্লিয়ার করেছ তা হলে।—তা, এ তের সিকেটা কিসের?

ওই কাপড়ের খুঁটে বাঁধা ছিল, একখানা পাঁচ টাকার নোট, আর দুটো টাকা,—তারই ফেরত ঐ তের সিকে,—

কি রকমটা হল বল দেখি?

হওয়া হয়ি আর কি। এরাস্তা সেরাস্তা ঘুরিয়ে, গিয়ে পড়লুম একেবারে রেস কোর্সের সামনে। তার পর, হঠাৎ দিলুম গাড়ী একেবারে থামিয়ে। উনি জিজ্ঞেস কল্লেন—কি হল হে? আমি বল্লুম, পেট্রল গরম হয়ে গেছে, তা কোন ভয় নেই, আপনি বসুন। উনি বল্লেন,—জলে ফলে উঠবে না ত হে? বলে, গাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি নেবে পড়লেন। আর যেই পড়লেন নেবে, ষ্টার্ট দেওয়াই ছিল, দিলুম একেবারে ঝড়ের মত গাড়ী ছুটিয়ে। অনেক দূর এসে একবার ফিরে চেয়ে দেখলুম, তিনি হতভম্ব হয়ে, যেমন দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ত আর কোনদিকে না চেয়ে ফুল মোশনে জিরেট পোল পেরিয়ে একেবারে পড়লুম গিয়ে খিদিরপুরের রাস্তায়। র‍্যাশ ড্রাইভের জন্যে পথে ধরলে এসে এক ব্যাটা পাহারাওয়ালা। নিজের শুধু গণ্ডা চার পাঁচ পয়সা পুঁজি। তারপর দেখি, কাপড় খানার খুঁটে ঐ সাতটা টাকা বাঁধা। দিলুম সে ব্যাটাকে দুটো টাকা। থাকলো পাঁচ। তারপর, পরিশ্রমটা বড্ড বেশী হয়েছিল, ক্ষিদেও পেয়েছিল,—কোয়াটার খানেক খেয়ে শরীরটা একটু তাজা করে নিলুম, খাবারও কিছু খেলুম। তাতে গেল আরও সিকে সাতেক। এই গেল আপনার তিন টাকা বারো আনা, আর বাকী ঐ তের সিকে।

ফ্লাস্ক হইতে একটি পেগ ঢালিয়া পান করিয়া, জগদীশ বলিল,—বহুৎ আচ্ছা, অজেদ আলি মণ্ডল! সাকরেদী কত্তে পারবে বটে!—তা, এ তের সিকে আর আমায় দিচ্চ কেন? নিয়ে যাও, কাল আবার একটু ফুর্ত্তি টুর্ত্তি কোরো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিট দি ফোর্ট উইলিয়ম্

জগদীশ কাশী গিয়াছিল,—এক্সপ্রেসে ফিরিতেছে। সঙ্গে একটি ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি শ্যামবর্ণা, কিন্তু রূপ তাহার গায়ে ধরিতেছিল না। গায়ে মূল্যবান গহনার সংখ্যাও তাহার দেহের রূপের মত সুপ্রচুর। দ্বিতীয় শ্রেণীর সে কামরা খানি রিজার্ভ করাই ছিল।

গাড়ী বর্দ্ধমান ষ্টেশনে আসিয়া যখন থামিল, তখন বেলা প্রায় এগারটা, জগদীশ বলিল,—ছেলেপুলের জন্যে কিছু সীতাভোগ মিহিদানা নাও, কিরণ।

কিরণবালা জগদীশের ট্রাঙ্ক খুলিয়া কি বাহির করিতেছিল, বলিল—দেখুন, আপনি আর আমায় ও ঠাট্টা করবেন না। আপনি বরঞ্চ আপনার কনেবৌর জন্যে নিয়ে যান।

কনেবৌর জন্যে না হক, কিন্তু নিতে হবে কিছু অন্তত: নিজের জন্যেও বটে। গোটা পাঁচেক টাকা বার কর দেখি।

টাকা বাহির করিতে গিয়া ধনেখালির খুড়োর সেই জড়োয়ার বাক্সটি তুলিয়া ধরিয়া কিরণ জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, এ কেমিকেলের গহনাগুলো পুরে এনেছিলেন কি জন্যে শুনি?

বল কেন আর, ও কনেবৌয়ের কীর্ত্তি! ট্রাঙ্কটি গুছিয়ে দিতে বলেছিলুম। তার ভেতর ওটা যে কেন পুরে দিয়েছে, সেই জানে।

গয়নাগুলো, বাস্তবিক, কেমিকেল বলে কারুর সাধ্যি নেই যে ধরে—ঠিকই যেন সত্যিকারের জড়োয়া!

জগদীশ নামিয়া যাইয়া সীতাভোগ ও মিহিদানা

কিনিয়া লইয়া আসিয়া কিরণের হাতে দিয়া বলিল, —বর্দ্ধমানে এলে সীতাভোগ খেতে হয়, তা না হলে কি হয় জানতো? ভূতে পায়। অর্দ্ধেক আমার সঙ্গে দাও, অর্দ্ধেক তোমার একটা পুঁটলি কর!

না, আমার সীতাভোগ মিহিদানা খাবার দরকার নেই। কি কতকগুলো চিনি মাখানো ভাতের মত —বিতিকিচ্ছি—ও আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যেতে পারবো না।

আচ্ছা, পুঁটলি আমি বেঁধে দিচ্ছি। হাওড়ায় নেবে বাড়ীর দোরগোড়া পর্য্যন্ত বাবুসাহেব যাবেন ত গাড়ীতে,—এ নিতে আর কষ্টটা কি শুনি? তোমায় নিতেই হবে। বিদ্যাসুন্দর পড়েছ ত? রাজকুমারী বিদ্যে মালিনীকে দিয়ে রোজ দু চ্যাঙ্গড়া সীতাভোগ কিনিয়ে নিয়ে যেতো। এক চ্যাঙ্গড়া নিজে খেতো, আর এক চ্যাঙ্গড়া সুন্দরকে খাওয়াতো,—বুঝলে?

'না, ও আমি কিছুতেই নোব না' বলিয়া কিরণ মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে দেখিতে লাগিল।

রাগ হল নাকি?—তবে, নাও ভাই তোমার কাশীর বাড়ী ফিরিয়ে। রেজেষ্ট্রী করে তবে দিতে গেলে কেন, হ্যাঁগা, কিরণবালা?

নাঃ,—আপনার সঙ্গে আর পারবো না। দিন —সীতাভোগ।

কাশীর বাড়ী তাহলে ফিরে নেবে না?

কিরণ হাসিতে হাসিতে বলিল,—নেবো! তারপর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমার কাশীর বাড়ী বলুন, কলকাতার বাড়ী বলুন, এ সব হল কোত্থেকে? আপনি না থাকলে আজ যে আমার কী দুর্দ্দশা হত, তা, সে আর কেউ জানুক, না জানুক, আমি ত জানি! আজ যে আমার তিন চারখানা বাড়ী, বাগান, গহনা গাঁটি, সোনা দানা, এ সব কার জন্যে বলুন ত? কি? চুপ করে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন যে বড়? এ সব আমি ভুলবো না জীবনে! আর, ভুলেই যদি যাই কখনো, তাহলে জানবেন, আমার মত নেমকহারাম আর ভূ-ভারতে নেই! আপনাকে ত বরাবরই আমি বলে আস যে, আমার যা কিছু, তার ওপর, আমার চেয়ে অধিকার যে আপনারই বেশী। আপনার যখন যা দরকার হবে, আমার কাছে এসে চাইলে আমার বড় কষ্ট হয়, আপনি যেন আমায় চাবুক মারচেন।—আপনি তা এমনই নেবেন, যেমন বাড়ীতে নিজের জিনিষ নেন!

থ্রি চিয়ার্স ফর মিস্ কিরণবালা! তবে যে লোকে বলে, কিরণ আপনার একটা কথা বলতে জানে না! তোমাকে এবার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করে দোবো, কিরণ।

কথায় কথায় গাড়ী মগরার ষ্টেশনে আসিয়া পড়িল! একটি প্রৌঢ় বয়স্ক লোক হাঁফাইতে হাঁফাইতে দরজা ঠেলিয়া গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—এ কি, ডেড়া ভাড়ার না কি মশাই?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জগদীশ বলিল, —তারও ওপর! আপনি যাবেন কোথা?

আজ্ঞে, আমি কোলকাতায় যাবো, বলিয়া, লোকটি নামিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল! গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছিল! জগদীশ তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিল—বসুন, আর গাড়ী পাল্টে কাজ নেই!

আমার যে থার্ড কেলাস মশাই, যদি ধরে?

ধরবেই ত! আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে, বসুন!

লোকটির মুখ চোখের ভাবে বোধ হইল, জগদীশের কথায় সে কিছুমাত্র আশ্বস্ত হইল না!

জগদীশ বলিল, কোন ভয়ের কারণ নেই, এ গাড়ী আমার রিজার্ভ করা।

এ দিকের বেঞ্চের একধারে বসিয়া পড়িয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিল,—মশায়ের কোথা যাওয়া হয়েছিল?

গিয়েছিলুম একটু তীর্থ ধর্ম্ম কর্ত্তে!

সঙ্গে ইনি?

আমারই স্ত্রী!

আজ্ঞে, আপনারা?

ব্রাহ্মণ।

প্রাত: পেন্নাম বলিয়া লোকটি দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল!

জগদীশ জিজ্ঞাসা করিল,—মশায়ের নাম?

আজ্ঞে, আমার নাম—রাইচরণ রক্ষিত!

নিবাস?

নিবাস এই ক্ষীরপুকুর, ত্রিবেণীর উত্তর!

বিষয় কর্ম্ম কি করা হয়?

আজ্ঞে, গাঁয়েতেই একটু ছোটখাট পত্তনি আছে—

বেশ বেশ! তা কোলকাতায় কি দরকার?

খানকতক গিনি কিনতে হবে, সেইজন্যেই—

কতগুলো?

এই খান পঞ্চাশেক! কি দর এখন বলতে পারেন?

পনর টাকা আসল, আর মেলের দর দুচার আনা কম!

ও কি আবার আসল মেল আছে নাকি?

আছে বৈ কি,—সে আপনারা ধর্ত্তেও পার্ব্বেন না। একটু দেখে শুনে কিনবেন। এই হালেই আমি ৮০ খানা সেদিন কিনেছি। গহনাও তার গড়ান হোয়ে গেছে। দেখি গা, গয়নার বাক্সটা বের করে দাও ত?

রাইচরণ গহনাগুলি দেখিয়া বলিল,—বাঃ! এ সবই ত জড়োয়া! কত ব্যয় হোলো মশাই?

প্রায় হাজার চারেক।

গিনি কখানা তাহলে দয়া করে আপনাকেই কিনে দিতে হবে। এ কৃপাটুকু কর্ত্তেই হবে আপনাকে। নইলে,—হাজার হোক, গেঁও লোক আমরা, ও আসল মেল হয় ত চিন্তেই পার্ব্বো না। দয়া করে কষ্ট একটু আপনাকে কর্ত্তেই হবে বাবু।

গাড়ী হাওড়ার প্লাটফরমের ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল। পতিতুণ্ডি হাজির ছিল। জগদীশ পতিতুণ্ডিকে বলিল,—ছাখ, আমার যেতে একটু দেরী হবে। তুমি বিছানা আর তোরঙ্গটা নিয়ে চলে যাও। কিরণকে ওর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যাবে। ঠিকানা মনে আছে ত? আরে, ওই ত গোকুলও এসে হাজির! কি হে, তিনরাত ঘুমুতে পেরেছিল ত? যাক, বল দেখি—ছেলে, ছেলে, ছেলে,—এই তোমার জিনিস পেলে। চার্জ বুঝে নিয়ে রসীদ দাও একখানা।

পতিতুণ্ডি বলিল,—দেবতা, আমি বিছানা তোরঙ্গ নিয়ে চলে যাই তা হলে?

দাঁড়াও। ঐ গহনার বাক্সটা দিয়ে যাও আমাকে।

সকলে চলিয়া যাইলে, রাইচরণ হাত দুটি জোড় করিয়া জগদীশকে কহিল,—তাহলে কি অনুমতি হয়?

ধনেখালির খুড়োর গহনার বাক্সটি হাতে লইয়া জগদীশ বলিল,—ধরেচেন এত করে, চলুন, দি কিনে আপনার গিনি কখানা।

একখানি ট্যাক্সি করিয়া উভয়ে লালবাজারে একটি পোদ্দারের দোকানে প্রবেশ করিল। জগদীশ পোদ্দারকে জিজ্ঞাসা করিল,—খান পঞ্চাশ গিনি দিতে হবে যে, দে মশাই, আজকের দর কি?

পোদ্দার তখন কি একটা ওজন করিতেছিল। সেই দিকেই চাহিয়া বলিল—পনর টাকা দু আনা।

জগদীশ চমকাইয়া উঠিয়া কহিল,—১৫৵০? —বলচেন কি আপনি? আজকের দর যে পনের টাকা।

কে বল্লে আপনাকে?

আমিই বলচি।

পনের টাকাতে কেউ দিতে পার্ব্বে না।

আপনার পাশের দোকান থেকেই আনবো। এঁকে পাড়াগেঁয়ে দেখছেন কিনা, তাই সঙ্গে সঙ্গেই একেবারেই দু আনা বেশী।

পোদ্দার একটু চটিয়া গেল, বলিল,—পনর টাকাতে যদি কোথাও থেকে আনতে পারেন, ত এখান থেকে নাকখৎ দিতে দিতে সেখানে যাব।

তর্কচ্ছলে জগদীশও একটু যেন উষ্মা দেখাইয়া বলিল,—আমার নাম পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী নয়, যদি পনর টাকায় না আনতে পারি। এই পাশ থেকেই নিয়ে আসছি দেখুন। গয়নার বাক্সটা নিয়ে মিনিট পাঁচেক একটু বসুন ত রক্ষিত মশায়, দেখি কেমন না আনতে পারি—বলিয়া গহনার বাক্সটি রাইচরণের কোলে বসাইয়া দিয়া, তাহার হাত হইতে রুমালে বাঁধা নোটের তাড়াটি লইয়া জগদীশ দোকান হইতে নামিয়া পড়িল এবং রক্ষিতের উদ্দেশে আর একবার বলিল,—দেখবেন, গয়নার বাক্সটা একটু সাবধানে—বলিয়া জগদীশ পাশের দোকান হইতে পনের টাকা দরে গিনি কিনিতে চলিয়া গেল।

রক্ষিতের আট শত টাকার নোটের তাড়াটি গামছায় জড়ানো তাহার কোমরে বাঁধা ছিল। জগদীশেরই উপদেশে, পকেট-কাটা কোমর-কাটার ভয়ে, রক্ষিত তাহা হাতে করিয়া রাখিয়াছিল।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনর মিনিট কাটিয়া গেল। রক্ষিত একটু চঞ্চল হইল। বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টা,—পঞ্চানন চক্রবর্ত্তীর আর দেখা নাই। আরও মিনিট দশেক। তখন রক্ষিত ছটফট করিতে লাগিল। একবার উঠিতে লাগিল, একবার বসিতে লাগিল। একবার রাস্তায় আসিয়া দেখিয়া যাইল।

পোদ্দার বলিল,—কৈ মশাই, আপনার লোকটি গেলেন কোথা? গিনি চাপা পড়লেন নাকি?

তাই ত, কোথায় গেলেন বলুন দেখি ?

কোথায় গেলেন তা আমি জানবো কেমন করে। উনি আপনার হন কে ?

অ্যাঁ, আমার হন না কেউ, ট্রেণেতে আজ আলাপ—

ট্রেণেতে আজ আলাপ! তবেই হয়েচে,—জোচ্চরের হাতে পড়েন নি ত ?

রাইচরণ রক্ষিতের মুখ শুকাইয়া জিভে আঠা ধরিয়া আসিতেছিল, গহনার বাক্সটি দৃঢ় করিয়া ধরিয়া বলিল,—অ্যাঁ, জোচ্চর! কিন্তু ওঁর যে এই গহনার বাক্স—

'দেখি, কি গয়নার বাক্স' বলিয়া, বাক্সটি লইয়া খুলিয়া দেখিয়াই পোদ্দার বলিয়া উঠিল,—তাহা জোচ্চরের হাতে পড়েছেন। এ ত সব কেমিক্যাল! কত টাকার নোট ছিল আপনার ?

রক্ষিত শুধু একটা 'অ্যাঁ' বলিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

* * *

সন্ধ্যার পর জগদীশ নেশায় বুঁদ হইয়া টলিতে টলিতে গৃহে ফিরিল। তাহার দুই বগলে দুইটি হুইস্কির বোতল, গলায় ও মাথায় ছড়া কতক যুঁইয়ের গোড়ে জড়ান। অন্দরে প্রবেশ করিয়া, কনেবৌকে সম্মুখে দেখিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—কনেবৌ, বিট দি ফোর্ট উইলিয়ম। ফোর লাখস। আজ বড় আনন্দের দিন, কেল্লা একেবারে ফতে,—একেবারে ফোর লাখস।—এই পতিতুণ্ডি, কাম হিয়ার। আজ আফিং ফাকিং সব দূর করে ফেলে দেবো,—আজ খালি হুইস্কি চলবে।

হরিমতি বলিল,—আজ বুঝি খুব খেয়ে এসেছ ?

এক পেট খেয়েছি, কনেবৌ,—আরো খাবো। বুঝতে পাচ্ছনা ?—একেবারে চার লাখ। বাবা! বিশ্বেশ্বরকে অত করে ডেকে এলুম, একি বিফলে যায় ? একেবারে ফোর লাখস। আবার তার সঙ্গে নেজুড় এল, রাইচরণ রক্ষিত মশায়ের আট শ, যেন জাহাজের সঙ্গে জালিবোট, বরের সঙ্গে নিতবর।

হরিমতি কোন কথা বলিবার আর সুবিধাই পাইল না। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—চল, ওপরে চল।

টলিতে টলিতে জগদীশ বলিল,—সব এস আজ। আজ খালি হুইস্কি চলবে। পতিতুণ্ডি খাবে, চিনে বেটা খাবে, আমি খাবো, কনেবৌ খাবে—আজ হুইস্কিতে বাড়ীঘর দোর সব একেবারে ভাসিয়ে দোবো।

হুইস্কির বোতল দুইটি জগদীশের হাত হইতে লইয়া কনেবৌ তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—বোকো না বেশী—চল ওপরে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অন্নসত্র

বারাণসীর পাঁড়ে-হাউলির প্রান্তভাগে একটি সুবৃহৎ অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। কোথাকার কোন্ রাজা ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত লোকে জানিতে পারে নাই বা জানিবার জন্য বিশেষ কাহারো কোন আগ্রহও হয় নাই। ইহা শুধু কানা, খোঁড়া, দীনদরিদ্র পথের কাঙ্গালীদের জন্য, যাহারা পেট পুরিয়া কোন দিন দুটি খাইতে পায় না।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। সত্রের বিস্তৃত উন্মুক্ত চত্বরে অসংখ্য কাঙ্গালী সারি সারি খাইতে বসিয়াছে। আহারের সঙ্গে সঙ্গে কোলাহলটা তাহারা বড় বেশী করিতেছিল। পেট পুরিয়া খাওয়ার তৃপ্তি ও আনন্দ তাহাদের সকলের চোখে-মুখে ও কণ্ঠে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

একটি রুক্ষ-শুষ্ক, ছিপছিপে, দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ হুঁকা হস্তে ধূমপান করিতে করিতে চারিদিকে ঘুরিয়া তাহাদের খাওয়ার তদারক করিয়া বেড়াইতেছিল। লোকটি আসল তদারক যতটা করিতেছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বাজে বকুনি বকিয়া যাইতেছিল।

জন দুই তিন পথিক ভদ্রলোক চত্বরের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই বিরাট কাঙ্গালী ভোজন দেখিতেছিল। যে লোকটি তদারক করিয়া বেড়াইতেছে, সে কাছে আসিলে, তাহাদেরই একজন জিজ্ঞাসা করিল,—এটি কার ছত্র, মশাই ?

লোকটি তাহাদের মুখের দিকে একবার কটমট করিয়া চাহিয়া হুঁকায় একটা টান দিল এবং তাহাদেরই দিকে একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—আপনাদের ছত্তর ঐ দিকে সব আছে,

রাঙ্গামেটে, আমবেড়ে, রাজরাজেশ্বরী, কুঁচবেহার, এটা হোলো সুধু কাঙ্গালী……আপনারা অফিসার ত? তাহলে, রাঙ্গামেটেতেই সুবিধে হবে, নটার ভেতরেই খাওয়া শেষ, অনেক অফিসারই ওখানে খেয়ে থাকেন।

যে লোকটি প্রশ্ন করিয়াছিল সে বলিল, আমরা খাবার জন্যে ছত্র খুঁজছি না, আমরা কাশীতে বেড়াতে এসেছি। এ ছত্রটি কে করেছেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

ওঃ, তাই বলুন। পাপ কর্ব্বেন,……ওহে, ঐ দিকে কটা পাতায় ভাত দিতে হবে যে, ভাত নিয়ে এস। কি চাই? সুক্ত? আজ্ঞে, এটি কোরেচেন—দিচ্চে, দিচ্চে, চেঁচিওনা, এটি কোরেচেন গিয়ে কোলকাতার একটি মস্ত ধনী লোক, তাঁকে রাজাও বলতে পারেন, দেবতাও……

কোলকাতার কোন্ যায়গায় থাকেন তিনি?

থাকতেন বটে আগে। সে সব চিরদিনের জন্যে ত্যাগ করে, এখন এইখানেই,……অম্বল আছে বৈ কি! টক নিয়ে এস হে, টক টক। হ্যাঁ, তিনি সপরিবারে আজই সকালে এখানে এসেছেন।

ঠিকই বটে। আজ সকালে ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে খুব মস্ত কে একজন জমীদার নাবলেন। সঙ্গে লোকজন, চাকর বাকর, জিনিষপত্র, গাড়ী পাল্কী, হৈ হৈ ব্যাপার—

'না না, সে ইনি নন। এঁর লোকজনও নেই, চাকর বাকরও নেই, গাড়ী পাল্কিও নেই। কাঙ্গালীদের জন্যে সর্ব্বস্ব দিয়ে, দেবতা আমার নিজেই কাঙ্গালী হোয়ে বসেছেন! ওই যে আমার রাজারাণী দুটিতে বসে কাঙ্গালীদের খাওয়া দেখচেন! দেখতে পাচ্চেন না? ঐ যে, করবী ফুলের গাছটা ফুলশুদ্ধু যেখানে নুয়ে পড়েছে' বলিয়া সেই দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া দিল।

ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, উনি কি সমস্তই দান করেছেন? নিজের খাবার জন্যেও কিছু রাখেন নি?

ঠিক খাবার জন্যে উনি কিছু রাখেন নি। বলেন, এত কাঙ্গালী যেখানে খাবে, আমাদের দুটো পেট সেখান থেকেই চলে যাবে এখন। তবে অন্য খরচের জন্যে, ওঁর কোলকাতার বাড়ী-ভাড়া দুটী'শ টাকা, তাই পুঁজি। তার ভেতর থেকে আবার অনেকগুলিকে মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা আছে।

করবী গাছের ছায়ার নীচে, পার্শ্বোপবিষ্টা সহধর্ম্মিণীকে জগদীশ তখন বলিতেছিল,—দেখদেখি কনেবৌ, ব্রাহ্মণ-ভোজনের চেয়ে বেশী আনন্দ কি না?

আনন্দ ত বটে, কিন্তু—

কিন্তু, কি বল কনেবৌ?

নিরানন্দটাও যে ঠেলে রাখতে পাচ্চি না!

নিরানন্দ? কিসের জন্যে?

চিরজীবনের পাপ?

চিরজীবনের পাপ? চিরজীবনের পাপের বোঝা, যা এতকাল ধরে মাথার ওপর জমিয়ে আসছিলুম, সে ত আজ অন্নপূর্ণার পায়ের তলাতে সব নামিয়ে দিলুম, কনেবৌ! তবু এর যদি কোন শাস্তি থাকে ত আমার এই সব ভাই বোনদের জন্যে তার ষোল আনাই আমি মাথা পেতে নিতে রাজি থাকলুম।

বরদা ডাক্তার

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বরদা ডাক্তার

প্রথম

বদনগঞ্জের মদন ডাক্তারের নিকট দুই বৎসর এগার মাসকাল কম্পাউণ্ডারী শিখিয়া, হাট বাজার করিয়া, ফাই-ফরমাস খাটিয়া, বরদা মণ্ডল ডাক্তার হইয়া উঠিয়াছিল এবং কয় বৎসর হইতে নিজ গ্রাম সাধুহাটিতে প্রকাণ্ড এক সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় সুরু করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এমনই তাহার ভাগ্য দোষ যে, কিছুতেই তাহার পশার জমিয়া উঠিল না, এবং এই কারণে তাহার মনে বিন্দুমাত্রও সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না, উৎসাহ ছিল না। তাহার আলমারীর মধ্যে বহু-দিনকার সঞ্চিত ঔষধগুলি ক্রমেই পচিয়া উঠিতেছিল এবং প্রকাণ্ড সাইনবোর্ডের—ডাক্তার বি, পি, মণ্ডল লেখাটুকু বছরের পর বছর, রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া ক্রমেই অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসিতেছিল।

সন্ধ্যার পর বরদা মাঠ হইতে ফিরিবার পথে তেলিপাড়ার কাছাকাছি আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল এবং কি ভাবিয়া, পাড়া ঘুরিয়া বিপিন মণ্ডলের বাড়ী যাইবার পথ ধরিল।

বিপিন মণ্ডল অনেক দিন ধরিয়া ব্যায়রামে ভুগিতেছিল। আজ তাহার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি অবস্থা, কখন কি হয়!

পথেই বরদার সহিত বিপিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলাইচরণের দেখা হইল। বলাই বিশেষ কাতর হইয়া কহিল,—কাকা, একবার গিয়ে নাড়ীটা দেখবেন? আর বুঝি রক্ষে হয় না, কাকা!

বরদা মনে মনে কহিল,—আজ শেষ সময়ে নাড়ী দেখবার জন্যে—কাকা!—নইলে, এই ছমাস ধরে ভুগচে, একটা দিনও আমায় ডেকে এক দাগ ওষুধ পর্য্যন্ত আমার খাওয়ান হয় নি। কতদিন ইচ্ছে করে ঘুরে বাড়ীর সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করেছি, তবুও তাচ্ছিল্য করে আমায় ডাকা হয় নি! রক্ষে ত হবেই না। প্রকাশ্যে কহিল—চল, একবার দেখে আসি।

বরদা আসিয়া দেখিল, বিপিনের নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে, কহিল—আর দেখে কি করবো, বাপু? দিন থাকতে যদি দেখাতে, তা হলে কি আর এ রকমটা হোত? এখন ত শেষ অবস্থা! তবুও বরদা একবার ডান হাতে, একবার বাঁ হাতে বিপিনের নাড়ী ধরিয়া দেখিল, চোখ টানিয়া তারা দেখিল, হাত পায়ের চেটো হাত দিয়া পরীক্ষা করিল, তারপর মুখখানা বিকৃত করিয়া চলিয়া আসিল।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার চারি বৎসর বয়সের শিশুকন্যা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া কহিল, বাবা, আদ আল লাম্না হবে না।

বরদা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল,—কেন মা?

—মায়েল দে অথুক কলেচে!

বরদা তাহাকে কোলে করিয়া শুইবার ঘরে আসিয়া দেখিল, স্ত্রী হৈমবতী বিছানায় শুইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছে গা?

হৈমবতী কহিল,—হবে আবার কি? যা হয় আমার! সেই অম্বলের ব্যথা!

বরদা কন্যাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া কহিল,—ধরবে না ত কি! নিজে একজন ডাক্তার রয়িচি বাড়ীতে, তা—ওষুধ ত আর খাবে না। বলে—আমি দিলুম কত লোকের অম্বল সারিয়ে, আর আমার বাড়ীতে কিনা—

তোমার ওষুধে ছাই হয়। খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল,—আর বোলচো কি, যে খাই না?

আমার ওষুধে কিছু হয় না?

হয় না ত।

যাক,—তা হলে আর খেয়ে কাজ নেই। লোকের আর দোষ কি? ঘরের লোকেই যখন বলচে, তখন বাইরের লোক ত—

কি মুস্কিল! উবগার না হলেও বলতে হবে যে—আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা। থাক,—আমার ওষুধ আর খেয়ে দরকার নেই। আর কখনো বোলবোও না।—আমি কি আবার একজন ডাক্তার, না, আমি জানি কিছু? বলিতে বলিতে খড়ম পায়ে দিয়া বরদা শুধু শুধুই একবার খটখট করিয়া উঠানের মধ্যে নামিয়া গেল। আবার পরক্ষণেই দাওয়ার উপর উঠিয়া আসিয়া বলিল,—হা রে ভগবান!—এই সেদিন কুঞ্জবোষ্টমের ভাদ্রবৌটা অম্বলের ব্যথায় মরে যাচ্ছিল, ওই গণশাটার কাছ থেকে বুঝি কি ওষুধ এনে খাইয়েছিল,—তা তাতে ছাই হল। শেষে, ছুটে আসতে হল এই শর্ম্মার কাছে। এক দাগ ওষুধ আমার খেয়ে তবে বৌটা উঠে বসে কথা কইতে পারে। ওরে অ পঞ্চা, অ দেসো। ছেলেগুলো সব গেল কোথা? ও মা বিন্দু, দে ত মা গোয়াল থেকে চারটি নারকোলপাতা এনে,—চায়ের জলটা ফুটিয়ে নি। ঘুরে ঘুরে দেহটা আক্লান্ত হয়ে পড়েচে।

হৈম উঠিয়া বসিয়া বলিল,—আমি ত আর মরিনি,—দিচ্চি চা করে।

হৈম উঠিয়া চা তৈয়ারি করিতে গেল।

পঞ্চু বাহির হইতে আসিয়া কহিল,—বাবা, বিপিন মোড়ল আর টেকে না, আজ রাত্তিরেই বোধ হয়—

আচ্ছা—আচ্ছা, তোব আব ফাজলামি কর্ত্তে হবে না, তুই যা। কোথায় ছিলি, পড়াশুনো নেই তোর?

না বাবা, কাল আমাদের ছুটী।

ছুটী বলে আর পড়তে শুনতে হবে না? আর, রোজরোজই এত ছুটী কিসের হয়?

সেক্রেটারীর মায়ের কাল বাবা গাছ প্রতিষ্ঠে—তাই।

চা আনিয়া হৈম বরদার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ গা, ওপাড়ার বিপিন ঠাকুরপোর অবস্থা বুঝি খুব খারাপ? শুনচি, আজ রাত্তির না কি টিকবে না।

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া বরদা কহিল,—"বলি, টিকবে না যে তাতে আশ্চর্য্য হবার আছে কি? গোড়া থেকে ত আর আমায় দিয়ে একটিবার দেখালে না। কেমন যে সব লোক, কিছুই বুঝতে পারি না। বরদা ডাক্তার যে কিসে সকলের চেয়ে কম"—মুখের কথা বরদার মুখে রহিয়া গেল, তাহার হাত হইতে চায়ের বাটি ঝন্ ঝন্ করিয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল, চক্ষু কপালে উঠিয়া স্থির হইল, সর্ব্ব দেহ ফ্যাকাসে হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দেহ মেজের উপর লুটাইয়া পড়িল।

হৈম স্বামীর প্রাণহীন শীতল দেহে হাত দিয়া দেখিয়াই একেবারে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দ্বিতীয়

যমরাজের পুরী-সংলগ্ন বিস্তর কার্য্যালয়। বৃহৎ দপ্তর সম্মুখে করিয়া চিত্রগুপ্ত তাঁহার দৈনিক হিসাব মিলাইয়া দেখিতেছিলেন। যে প্রধান অনুচরটি সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে সম্বোধন করিয়া চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখন কাকে আনা হল? অনুচর উত্তর করিল,—সাধুহাটির বিপিন মণ্ডল, বলিয়া বাহির হইতে বরদা ডাক্তারের হাত ধরিয়া আনিয়া সম্মুখে হাজির করিল।

চিত্রগুপ্ত চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন,—একি! এ করেছ কি? এ কাকে এনে ফেলেছ?

অনুচর কহিল,—কেন, হুজুর? বিপিন মণ্ডল। সাইনবোর্ডে লেখা ছিল।

বরদা ডাক্তার অগ্রসর হইয়া জোড়হস্তে কহিল,—না হুজুর, আমি বিপিন মণ্ডল নই,—কিছুতেই নই। বিশ্বাস না হয়, তাঁমা তুলসী গঙ্গাজল দিন,—আমি বরদা মণ্ডল। সাইনবোর্ডে আমার বিপিন মণ্ডল লেখা নেই, হুজুর,—আছে বি, পি, মণ্ডল। আমি বরদা, গাঁয়ের সকলেই সাক্ষী দেবে, হুজুর।

তখন চিত্রগুপ্ত অনুচরকে বিশেষরূপে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। গোলযোগ শুনিয়া স্বয়ং যমরাজ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া বরদাকে তদ্দণ্ডেই তাহার স্বগৃহে রাখিয়া আসিতে অনুচরের প্রতি আদেশ করিলেন।

বরদা জোড়হাত করিয়াই দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, হুজুর মিছিমিছি এই কষ্ট দিয়ে যখন এতদূর আনালেন, তখন একবার আপনার পুরীটা ভাল করে বেড়িয়ে দেখে যাবার হুকুমটা দিয়ে দিন, কি কাণ্ডটাই আপনার লোকের

ভুল হয়ে গেল, সেটা একবার ভেবে দেখুন হুজুর। হৈম ওদিকে আছাড় পিছাড় খেয়ে চীৎকার সুরু করেচে। ছেলে মেয়েগুলো সবই একধার থেকে কাঁদতে লেগেছে! অথচ হুজুর, সত্যিই ত আর আমি মরিনি।

আচ্ছা—আচ্ছা। বলিয়া যমরাজ বরদাকে সমস্ত যমপুরী দেখাইয়া আনিবার জন্য অনুচরকে আদেশ করিলেন।

আদেশানুযায়ী অনুচর বরদাকে সঙ্গে করিয়া যমপুরীর সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া আনিয়া সর্ব্বশেষে একটি তালাবদ্ধ সুবিস্তীর্ণ হলঘরের সম্মুখে আসিয়া কহিল,—এইটি প্রাণ-পুরী। বলিয়া ঝন ঝন শব্দে তাহার সুবৃহৎ তালা খুলিয়া বরদাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া বরদা দেখিল, প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে সারি সারি অগণ্য মোমবাতি জ্বলিতেছে। সব বাতি গুলিরই আকার এক, কিন্তু প্রজ্জ্বলিত বাতিগুলির আলোকের তারতম্য আছে। কোনটি খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে, কোনটির আলো হয় ত ততটা উজ্জ্বল নহে, কোনটি বা নিবু নিবু হইয়াছে, কোনটি বা একেবারেই নিভিয়া গিয়াছে, কোনটি বা সবেমাত্র নিভিয়াছে, তাহার নির্ব্বাপিত সলিতা হইতে তখনো ধোঁয়া উঠিতেছে।

অনুচর কহিল,—বিপিন, এই বাতিগুলো—

বাধা দিয়া বরদা কহিল,—কর কি স্যাঙ্গাত। আবার বিপিন? আমি যে বরদা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, নামটা খালিই ভুল হয়ে যাচ্চে।—দেখ বরদা, এই যে বাতিগুলো দেখচো, এইগুলোই ভিন্ন ভিন্ন মানবের প্রাণ। মৃত্যু সময় হলেই, যার যে বাতি—অর্থাৎ প্রাণ—নিভে যাবে।

আচ্ছা, আমার বাতিও তাহলে আছে এখানে?

নিশ্চয়ই। তোমার বাতি দেখবে? বলিয়া অনুচর একেবারে হলের প্রান্তদেশে যাইয়া উত্তরের কোণে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল,—ওই, একেবারে ঠিক কোণের বাতিটা হচ্চে তোমার। দেখতে পাচ্চ না? ওই যে ঠিক একেবারে কোণে জ্বলচে।

সেইদিকে চাহিয়া বরদা জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা স্যাঙ্গাত, আমাদের ওখানকার আফিস আদালতের হিসেব রাখার মত এ সব কি য়্যালফাবেটিক্যালি সাজান?—আচ্ছা, ঐ একেবারে ঠিক কোণেরটাই ত আমার?

হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছ ত?

তা ত পেয়েছি স্যাঙ্গাত, কিন্তু—

কিন্তু, কি?

বলচি যে, অমন মিট মিট করে জ্বলচে কেন? তেমন দপ দপ করে ত জ্বলচে না!

না। নিভে আসচে আর কি! বড় জোর আর বছর চার পাঁচ।

বরদার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। যা একটু হাসি এতক্ষণে তাহার মুখে ফুটিয়াছিল, তাহা মিলাইয়া গেল। অন্তঃস্থল হইতে অতি ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

অনুচর কহিল—আর নয়, চল। বেশীক্ষণ এখানে থাকবার হুকুম নেই।

প্রাণপুরী হইতে বাহির হইয়া, বরদা, যেখানে যমরাজ সিংহাসনের উপর বসিয়া, পার্শ্বে দণ্ডায়মান চিত্রগুপ্তের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

যমরাজ অনুচরকে কহিলেন,—এইবার একে এর বাড়ীতে রেখে এস।

বরদা তাহার যুক্তকর বুকে ঠেকাইয়া কহিল,—না হুজুর, আর অধীনকে কষ্ট দেবেন না, হুজুর।

যমরাজ বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কী বলচো তুমি?

তেমনি জোড়করে কাতরকণ্ঠে বরদা কহিল,—বছর চার পাঁচ পরেই ত আবার আসতে হবে হুজুর? এই কটা বছরের জন্যে আর ফিরে গিয়েই বা কি হবে? গেলেই ত হুজুর সেই দুঃখ কষ্ট, নেই নেই, হা হা,—তার চেয়ে, কিছু আগে থাকতেই না হয় থাকলুম, হুজুর। দয়া করে আর পাঠাবেন না,—দোহাই ধর্ম্মরাজ!

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, না—না, তাকি হবার যো আছে? তোমার কি খুবই কষ্ট বাড়ীতে?

কষ্টের কথা আর কি বোলবো আপনাকে! আপনি দেবতা, কিছুই ত আপনার অগোচর নেই। খেতে পাই না হুজুর, ছেলেপুলে নিয়ে খেতে পাই না।

কি কর তুমি?

হুজুর, আমি ডাক্তার। এত করে বিদ্যেটা শিখলুম, তা প্রয়োগ কর্ত্তেই পাল্লুম না। কী যে লোকের দুর্ব্বুদ্ধি! দুটাকা—চার টাকা—আট টাকা দিয়ে গো-বদ্দিদের ডাকবে, তবু হুজুর, একটা টাকা হলেই আমি যাই, তা আমাকে

কিছুতেই ডাকবে না। অন্য লোকের কথা ছেড়ে দি, এই হৈ—,এই হুজুর নিজের ঘরেরই লোক যারা, তাদেরই আমার ওপর বিন্দুমাত্র ভক্তি শ্রদ্ধা নেই।

বুঝিছি, আর তোমায় কিছু বলতে হবে না। আচ্ছা, তুমি যাও, তোমার দুঃখ কষ্ট কিছু থাকবে না। ঐ ডাক্তারীতেই তোমার যশ দেশ জোড়া হয়ে যাবে, তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

দিন, হুজুর, দিন। গরীবের ওপর যখন আপনার দৃষ্টি পড়েছে, তখন আমার মঙ্গল হবেই।

উন্মুক্ত জানালার ফাঁক দিয়া, ধর্ম্মরাজ বাহিরের দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিয়া যেন কিছু চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহার পর বরদার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"দেখ, ডাক্তার, যেখানেই যাবে, রুগীর ঘরে আমাকে দেখতে পাবে। যদি আমাকে রুগীর মাথার দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখ, তা হলে জানবে যে, তার মৃত্যু নেই। আর যদি তার পায়ের দিকে আমাকে দেখ, তা হলে বুঝবে যে, তার মৃত্যু একেবারে অবধারিত। এই দেখে কাজ কল্লেই তোমাকে আর কেউ হারাতে পার্ব্বে না, সর্ব্বস্থলেই তোমার জয় সুনিশ্চিত। তা হলেই তোমার সাংসারিক কোন কষ্টই আর থাকবে না।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ অন্তঃপুরে যাইবার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"এইবার চল, তোমায় রেখে আসি" বলিয়া অনুচর বরদার হাত ধরিয়া যমপুরী হইতে বাহির হইয়া চলিল।

সাধুহাটি বরদার গৃহদ্বারে যখন তাহারা উভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সূর্য্যোদয়ের বহু বিলম্ব ছিল। রাত্রির অন্ধকার তখনো চারিদিক ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। সমস্ত গ্রামখানি তখনো গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন।

বরদার হাত ছাড়িয়া দিয়া অনুচর কহিল,—তা হলে বিপিন, চল্লুম আমি।

আবার বিপিন? আমি বরদা।

ঠিক ঠিক,—ঐ ভুলটাই কেবলি হচ্ছে। আচ্ছা,—বরদা, চল্লুম তা হলে।

"এস, স্যাঙ্গাত" বলিয়া অনুচরের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই বরদা দেখিল যে, স্যাঙ্গাত তাহার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয়

গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, বরদা ডাক্তারের হার্ট ফেল হইয়া মৃত্যু হয় নাই, হইয়াছিল সর্পাঘাতে এবং দংশনের দাগটি এখনো তাহার দক্ষিণ পায়ে হাঁটুর উপর সুস্পষ্ট বর্ত্তমান। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল—একেই বলে,—রাখে হরি ত মারে কে?—নইলে লাস জালিয়ে দিলেই ত সব ফুরিয়ে যেত। ভাগ্যে সে রাত্রে তখন ঝড় জল এসে পড়লো আর চেষ্টা করেও কোনখানে শুকনো কাঠের যোগাড় হল না, তাই ত নদীর ধারে ফেলে আসা হয়েছিল, নইলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার পর ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। একদিন চৈত্রমাসের অপরাহ্নে শুইবার ঘরের দাওয়ার উপর উবু হইয়া বসিয়া বরদা চা পানান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে তামাক খাইতেছিল। হৈম কাছে আসিয়া কহিল,—হ্যাঁ গা, দুপুর থেকে অম্বলের ব্যথায় সারা হয়ে যাচ্ছি, দাও না একটু ঔষধ তৈরী করে।

নীরবে হুঁকায় গোটা দুই টান দিবার পর বরদা হৈমর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—হ্যাঁ। আমার আবার ঔষধ, তাতে আবার উপকার হবে! খেয়ে খেয়ে শুধু পেটে চড়া পড়ান!

দেখ—জালিও না। বুঝতে পারিনি বলে, কবে একবার বলেছিলুম, তা রোজ রোজই সেই খোঁটা। উবগার না পেলে লোকই বা এত ডাকবে কেন? হরির ইচ্ছায় এখন ত দিন দিনই—

হরির ইচ্ছেয় কি?—এই দেখবে,—ছমাসের মধ্যে কি কাণ্ড করে ফেলি! এ তল্লাটের মধ্যে কোন ব্যাটাকে আর ট্যাঁ ফোঁ করতে দোবো না!

তা না দাও নাই দেবে, এখন ঔষুধ একটু আমাকে দাও। কেন না, ব্যথাটা যখন ধরে, একেবারে অস্থির করে ফেলে! তাই নিয়ে রাঁধা বাড়া, কাজ কর্ম্ম, পারা যায় কি?

আর বেশীদিন পার্ত্তে হবে না, হৈম। রাঁধবার জন্যে একজন বামুন, গোটা দুই ঝি, আর আমার নিজের ফাই-ফরমাসের জন্যে একটা চাকর, এ আমি, শীগ্‌গিরই ব্যবস্থা করে ফেলছি। কাজ কর্ম্ম আর তোমায় কর্ত্তে হবে না হৈম, তুমি খালি বসে থাকবে।

হাসিতে হাসিতে হৈম কহিল,—তা হলেই খাসা হবে! একে অম্বলের ব্যথায় মরে যাচ্ছি, তার

ওপর, বসে থেকে বাতের ব্যথা যদি ধরে, তা হলেই সুখের আর আমার সীমে পরিসীমে থাকবে না।

তাই থাকবে না হৈম, সত্যই সুখের আর সীমে থাকবে না। বলিয়াই বরদা সহসা বিশেষরূপ যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ভাবান্তর ঘটিল। কি যেন একটা দুশ্চিন্তার ছায়া নিমেষে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল।

হঠাৎ যমালয়ের প্রাণ-পুরীস্থ তাহার নিজের জীবন-বাতির কথা বরদার স্মরণে আসিয়া পড়িয়াছিল। স্মরণ হইল, তাহার স্যাঙ্গাতের মুখে তাহার জীবনের ওয়াদার কথা—বড় জোর আর বছর চার পাঁচ। মনে হইবামাত্রই তাহার সমস্ত সুখের কল্পনা, বিষাদের গভীর অতলে ডুবিয়া গেল, হাতের হুঁকা হাতেই রহিল। বরদা ভাবিতে লাগিল, পাঁচ বছর। পাঁচই বা বলি কেন? চারই ধরে রাখি। চারের ত দেখতে দেখতে ছমাস গেল কেটে। কটা দিনই আর ভোগ কত্তে পাব? হা ভগবান! একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাহার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িল। হৈম জিজ্ঞাসা করিল—হঠাৎ কি হোল বল দেখি? কি ভাবচো?

চমকিয়া উঠিয়া বরদা কহিল,—অ্যাঁ!—ও কিছু নয়।

তবু?

না,—ভাবচি যে, বাড়ীখানাও ত পাকা করে ফেলতে হবে? ডিসপেনসারিটাও কি রকম প্ল্যানে হবে, একবার চাটুয্যে মহাশয়ের সঙ্গে আগে থাকতে পরামর্শ টা করে রাখতে হবে। তিনি কাল বাড়ী এসেছেন শুনলুম। কাজের ঝঞ্ঝাটে একবার গিয়ে দেখা করে আসতেও পারিনি। যাই, একবার দেখাটা করে আসি বলিয়া বরদা হুঁকাটি দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া রাখিয়া, আলনা হইতে উড়ানিখানি ও ঘরের কোণ হইতে লাঠিগাছটি লইয়া বাহির হইয়া গেল। হৈমর ঔষধের কথা আর মনে হইল না এবং স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া হৈমও সে কথা আর উত্থাপন করিল না।

রমাপতি চট্টোপাধ্যায় সাধুহাটির একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। কলিকাতার বেলেঘাটায় তাঁদের তিনপুরুষের শাল কাঠের বৃহৎ কারবার। দেশে প্রকাণ্ড বাড়ী, বাগান, পুকুর,—কলিকাতাতেও বাড়ী, গাড়ী। সপরিবারে কলিকাতেই প্রায় বারমাস থাকেন। চাটুয্যে মশায় স্বয়ং মধ্যে মধ্যে—অর্থাৎ প্রতিমাসেই একবার করিয়া সাধুহাটিতে আসিয়া থাকেন ও দু'একদিন থাকিয়া বাড়ী-ঘর, বাগান-বাগিচা, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদির তদারক করিয়া যান।

এবার তাঁহার সঙ্গে এক গৈরিকধারী সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। সাধু সন্ন্যাসীর উপর চিরকালই চাটুয্যে মশায়ের অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি। হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফরমে ইঁহার দর্শন পাইয়াই তিনি ইঁহাকে আটক করিয়া ফেলিয়াছেন এবং সঙ্গে করিয়া সাধুহাটিতে আনিয়াছেন। সন্ন্যাসী বাবা বলিয়াছেন—তাঁহার বয়স আড়াইশত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বেশীদিন আর তিনি বাঁচিবেন না। বড় আর দেড় শত বৎসর তিনি জগতে থাকিবেন, যেহেতু চারি শত বৎসরই তাঁহার আয়ুষ্কাল। ভারতবর্ষের কাজ তাঁহার একরূপ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কেবল একটিমাত্র কাজ বাকী। চট্টগ্রামের অন্দর-কিল্লার সমীপবর্ত্তী গভীর এক বনমধ্যে একটি কালী মন্দির নির্ম্মাণ করার জন্য প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন। এই বনে কালীর মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিলেই তাঁহার ভারতের কাজ শেষ হয় এবং সেই উদ্দেশ্যেই অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি বাহির হইয়াছেন। দৈবাদেশ প্রাপ্ত এই কাজটি শেষ করিতে পারিলেই তিনি আর ভারতবর্ষে থাকিবেন না। ভারত ত্যাগ করিয়া কিছু দিন হনলুলু এবং তাহার পর যুগোশ্লাভিয়াতে থাকিয়া ধর্ম্মমাহাত্ম্য প্রচারকার্য্যে বাকী জীবন কাটাইয়া দিবেন।

মুগ্ধ চাটুয্যে মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার বন কালীর মন্দির নির্ম্মাণের জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

চাটুয্যে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বরদা যখন বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সন্ন্যাসী বাবা দ্বিপ্রাহরিক গুরু আহারের পর, তক্তপোষে পাটির উপর চিৎ হইয়া শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। তাঁহার বিশাল বক্ষমধ্য হইতে গুরু গম্ভীর নাদ উত্থিত হইয়া নাসিকা রন্ধ্র পথে অপূর্ব্ব ধ্বনিতে ঘনঘন বাহির হইতেছিল। কিছু দূরে সতরঞ্চির উপর বসিয়া চাটুয্যে মহাশয় গোমস্তা সিদ্ধু পালের নিকট হইতে এ বৎসরের বাড়ি ধাজের হিসাব বুঝিয়া লইতেছিলেন।

বরদা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া চাটুয্যে মহাশয়কে জোড় হস্তে নুইয়া পড়িয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই,

—তিনি হিসাবের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন,—ভাল আছ ত মোড়লের পো ?

চাটুয্যে মশায়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বরদা একদৃষ্টে নিদ্রিত সন্ন্যাসী বাবার প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ইনি কে ?

চাটুয্যে মহাশয় কহিলেন,—ওঁর কথা আর কি বলবো,—উনি নরাকারে দেবতা—একজন মহাপুরুষ। চার শ বছর ওঁর পরমায়ু। আড়াইশ বছর কেটে গেছে, এখনো দেড়শ বছর উনি ধরায় থাকবেন। চট্টগ্রা—

কিন্তু আজই যে ওঁর লীলা শেষ দেখচি !

হো হো করিয়া চাটুয্যে মহাশয় হাঁসিয়া উঠিয়া কহিলেন,—কি বোলচো হে মোড়লের পো ? তোমার কি মাথা খারাপ হোয়ে গেল না কি ? শুনতে পাই, তোমার খুব হাত যশ হয়েচে, কিন্তু—

বরদা কোন কথা না বলিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া নিদ্রিত সন্ন্যাসী বাবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আসিয়া কহিল,—যাই বলুন আপনি, আজই এঁর ইহলীলার শেষ। একটু আগে এসে পড়লেও, হয় ও ওষুধ পত্তর দিয়ে বাঁচাতে পাত্তুম,—কিন্তু আর হয় না,—এঁকে আজ যেতেই হবে।

সন্ধ্যার পর ডিসপেনসারী ঘরের বারান্দায় বসিয়া যখন বরদা জন কয়েক প্রতিবাসীর সঙ্গে গল্প করিতেছিল, তখন সংবাদ আসিল যে, সন্ন্যাসী বাবা হঠাৎ দুইবার দাস্ত ও একবার বমি করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। বরদা কহিল,—বরদা ডাক্তার যাকে দেখে বলবে মরবে, সে মরবে, আর যাকে বলবে বাঁচবে, সে বাঁচবে। আরে, ডাক্তারী ত সকলেই শেখে আর করে, কিন্তু এর ভিতর অনেক বায়নাক্কা আছে। আসল বিদ্যা কটা লোকের ভেতর আছে ?

এমন সময় স্বয়ং চাটুয্যে মশাই তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তিনি আসিয়াই কহিলেন,—বরদা, সার্থক বিদ্যে তোমার ! এ রকম কলিতে বড় একটা দেখা যায় না ! ভেতরে ভেতরে যে তোমার এতখানি ক্ষমতা ছিল, তা এর আগে কৈ একদিনও ত জানতে পারিনি। যা হোক, তোমার আর সাধুহাটিতে পড়ে থাকলে চলবে না, কোলকাতায় যেতে হবে। বরদা, দুহাত দিয়ে তোমার উপায় হবে। এ কি সাধারণ ক্ষমতা। দুমাসে তুমি লাল হয়ে যাবে, বরদা। এত পয়সা উপায় কর্ব্বে, যে, রাখবার আর তোমার জায়গা হবে না।

চতুর্থ

আজ দুই বৎসর হইল বরদা সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। এই দুই বৎসর বাস্তবিকই বরদা দুই হাত দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আসিতেছে। চাটুয্যে মহাশয় যে বলিয়াছিলেন, এত পয়সা উপায় হইতে যে রাখিবার আর জায়গা হইবে না,—তা হইতেছেও তাহাই। তাহার সাধুহাটির সেই জীর্ণ পর্ণকুটীরের জায়গায় এখন সুবৃহৎ পাকা ইমারত, বাগান, পুকুর, জমিজমা ! কলিকাতাতেও বরদা বাড়ী কিনিয়াছে —গাড়ী করিয়াছে ! তাহার বাটীর প্রবেশ-দ্বারে সুদৃশ্য প্রস্তর-ফলকে লেখা ছিল, ডাক্তার বি, পি, মণ্ডল—ডেথ স্পেশালিষ্ট !

সন্ধ্যার পর বরদা মোটরে করিয়া বেড়াইয়া আসিয়া উপরে যাইয়া হৈমকে কহিল,—'লাখ টাকা দিতে হবে হাসপাতালের জন্যে, তবে সাধুহাটিতে হাসপাতাল হবে,—আজ খবর দিয়েছে ! এখানকার বাড়ী বিক্রী করে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নগদ এক লাখ ত হবে না ! তাই ভাবছি কি করব !'

হৈম কহিল,—"সব বেচে কিনে দিয়ে আবার সন্ন্যাসী সাজ ! কী যে বুদ্ধি তোমার ! হাসপাতাল টাসপাতাল করবার মতলব ছেড়ে দাও ! ওই ত শরীর ! ভগবান না করুন, একটা ভাল মন্দ হলে তখন ছেলেপিলেগুলোর কি দুর্দ্দশা হবে বল দেখি ? আমরা দুজন আর কদিন বল—আমাদের ত সময় হয়ে এসেছে ! ছেলেগুলোর ত একটা হিল্লে,—

বিশেষ বিরক্তির স্বরে বরদা কহিল—'সময় হয়ে এসেছে—সময় হয়ে এসেছে, আর বোল না হৈম ! তোমার মুখে খালি ঐ কথাটাই শুনি ! কেন, সময় হবে কেন ? কিসে তুমি বুঝলে যে, মাঝে মাঝে এই কথাটাই তুমি'—

হঠাৎ বরদার এই অপ্রত্যাশিত বিরক্তিতে চমকিত হইয়া বিস্ময়ের স্বরে হৈম কহিল,—'ওগো, একি ! আমি কি সত্যিই বলি—একটা কথার কথা বললুম' তা—

'না আ আ,—কথার কথা তুমি ও রকম বোলো না ! যাক, হাসপাতাল আমি করবই ! আমার

অনেক দিনের সাধ, এ না করে আমি ছাড়বো না! এতে আমায় সন্ন্যাসী সাজতে হয়, সেও ভাল! তবে ঐ একটা সর্ত্ত থাকবে আমার যে, পাশকরা নামকরা ডাক্তার কেউ যেন না আমার হাসপাতালে চাকরী পায়! ওই পাশ করা নাম করাদের জ্বালায় যারা কিছু করে উঠতে পারে না, তাদেরই উপর থাকবে আমার হাসপাতালের ভার!'

হৈম আর কোন কথা কহিবে না মনে করিয়াছিল, কিন্তু থাকিতেও পারিল না—'তা হলেই হাসপাতাল তোমার একেবারে গড় গড় করে চলবে!'

না চলে, না চলবে! আমার টাকা, আমার হাসপাতাল, আমি যা ভাল বুঝবো তাই কর্ব্বো, আমি ত হরে নরে—পঞ্চার কথা মত কাজ কর্ব্ব না! এই বরদা মোড়ল অনেক ভুগেছে! ঐ সব পাজি, নচ্ছার—

এমন সময় মতি চাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে, নন্দীপুরের রাজবাড়ীর লোক এসেছেন, নীচে রুগী দেখবার ঘরে বসে অপেক্ষা কচ্ছেন!

কাপড় আর ছাড়া হইল না! বরদা তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া দেখিল, স্বয়ং ম্যানেজার তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন! তাঁহার বিষাদ-মলিন মুখে ব্যগ্রতার চিহ্ন দেখিয়া বরদা জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনার কি—'

"আপনিই কি ডাক্তার মণ্ডল?"

আজ্ঞে হ্যাঁ, বসুন, আপনার—"

"আপনাকে এখনই একবার যেতে হবে! নন্দীপুরের রাজা কোলকাতায় এসে আছেন! কুমার বাহাদুরের বড় সঙ্কট অবস্থা! দয়া করে এখনই—"

"কে দেখছিলেন?"

"দেখার আর কারো বাকী নেই! কবিরাজী থেকে আরম্ভ করে, আপনার গিয়ে হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, ইউনিপ্যাথি, হাকিমি, সব রকমই হয়ে গেছে! শেষে একজন জারমেন ডাক্তার দেখছিলেন! তিনি আজ হোপ্‌লেস বলে চলে গেলেন! দয়া করে একবার চলুন—আমার মোটর তৈরী! গাড়ীতে বসে বসে সব আপনাকে বলবো!"

মোটরে বসিয়া ম্যানেজার বাবু বরদাকে কুমারের অসুখের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত জানাইয়া শেষে কহিলেন,—"রাজার ঐ একটি মাত্রই ছেলে! সুতরাং কুমার যদি না রক্ষা পায়, তাহলে রাজা রাণীরও বেঁচে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠবে! কিন্তু সন্ধ্যা থেকে অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে আর বাঁচবার কিছুই নেই! তবে যদি—" ইত্যাদি ইত্যাদি!

রাজবাড়ী পৌঁছাইয়া কুমারের ঘরে ঢুকিতেই বরদা দেখিল যে, কুমারের তখন ঊর্দ্ধ নেত্র, শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে এবং যমরাজ তাহার পায়ের দিকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন!

বরদা কুমারের নাড়ীটি একবার হাতে লইয়া বলিল,—"এখন আর বৃথা চেষ্টা—কোন উপায়ই এখন আর নেই। দু'এক দিন আগে হলে কি কর্ত্তে পার্ত্তুম বলতে পারি না—তবে এখন একেবারেই—"

বরদাকে কথা শেষ করিতে দিল না। রাণী একেবারে তাহার পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল—"বাবা, তুমি মরাকে বাঁচাতে পার। শুনিচি—তুমি এরকম বাঁচিয়েছ। বাঁচিয়ে দাও, বাবা—নইলে—"

একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বরদা কহিল,—"কিন্তু পরমায়ু না থাকলে কি মা—"

"ও সব কিছু শুনতে চাই না, বাবা। বল—ছেলে আমার বাঁচবে। তুমি মুখের কথা বল একবার—তা হলে ঠিকই ও বাঁচবে। তোমার কথা সব যে আমরা শুনিচি, বাবা।'

বরদা যে কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। রাণীর অসহ্য কাতরতা দেখিয়া বরদার মুখে আর কথা সরিল না।

তেমনি আছাড়ি পিছাড়ি খাইতে খাইতে রাণী আকুল ক্রন্দনে কহিল,—"ছেলেকে আমার বাঁচিয়ে দাও বাবা,—আমাদের যথাসর্ব্বস্ব তোমায় দোবো, দিয়ে—আমরা ভিকিরী সেজে চলে যাব। ধন-দৌলত বিষয় আশয় কিছু চাই না বাবা,—শুধু ছেলেকে আমার বাঁচিয়ে দাও।"

বরদা দেখিল, যম ঠিক তেমনি একভাবেই স্থির নিশ্চল হইয়া কুমারের পায়ের দিকে দাঁড়াইয়া আছেন।

বরদা রাণীর দিকে ফিরিয়া কহিল—"মা, কোন আশা থাকলে নিশ্চয়ই আমি আশা দিতুম। তবে দেখি একটু চেষ্টা করে,—কিন্তু খানিকক্ষণের জন্যে আপনারা কেউ এ ঘরে থাকতে পাবেন না।" বলিয়া পকেট হইতে ঔষধের পকেটকেসটি বাহির করিল।

সকলে গৃহের বাহিরে যাইলে বরদা হাত জোড়

করিয়া যমরাজকে কহিল,—"অনেক দয়া করেছেন —এবারেও একটু দয়া কর্ত্তে হয়েছে, হুজুর।"

যমরাজ কহিলেন,—"তুমি যা মনে করে বলচো বরদা, তা কিছুতেই হবার যো নেই—হতে পারে না।"

সেইখানে ধর্ম্মরাজের পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বরদা কহিল,—"আপনি মনে করলে সবই হতে পারে, হুজুর। আর আপনাকে কোন অনুরোধ কোরব না—এই আমার শেষ ভিক্ষে, এ দিতেই হবে।"

"তা হয় না বরদা।"

"হয় ধর্ম্মরাজ, আপনি ইচ্ছে করলে সবই হয়। সান্দীপুনি মুনির ছেলেকে, বহুকাল পরে যখন শ্রীকৃষ্ণ এসে আপনার কাছ থেকে চাইলেন, তখন ত তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে দিলেন, মনে করে দেখুন হুজুর। তারপর মার্কণ্ডেয়র কথা ভেবে দেখুন, সত্যবানের কথা ভাবুন। আপনার ইচ্ছেয় কি না হয়? একবার দয়া করে কুমারের শিয়রের দিকে গিয়ে দাঁড়ান, হুজুর। আমি আশ্রিত, আশ্রিতের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

বৈবস্বত কিন্তু কিছুতেই নাড়িলেন না। বরদার এত কাকুতিমিনতি সকলই বৃথা হইল।

কাল কহিলেন,—"বৃথা অনুরোধ। বরদা, বাড়ী যাও।"

"দয়া করে মাথার দিকে দাঁড়াবেন না, দয়াময়?"

"উপায় নেই, বরদা।"

তখন বরদা মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিয়া, উঠিয়া মালকোঁচা বাঁধিল এবং কুমারের শয্যা দুই হাতে ধরিয়া সড় সড় করিয়া টানিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া, কুমারের মস্তক একেবারে যমরাজের পায়ের তলায় আনিয়া ফেলিল।

ধর্ম্মরাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিয়া উঠিলেন, —"এ কি করলে বরদা?"

জোড় হাতে বরদা কহিল,—"এ ছাড়া আর যে কোন উপায় পেলুম না, হুজুর!"

রোষ-কষায়িত নেত্রে বরদার দিকে চাহিয়া কাল কহিলেন,—"এবার থেকে রুগীর ঘরে আর তুমি আমায় দেখতে পাবে না।"

অপরাধীর মত অবনত মস্তকে বরদা দাঁড়াইয়াছিল। মাথা তুলিয়া দেখিল-- যমরাজ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন এবং কুমার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। মণিবন্ধে হাত দিয়া বরদা দেখিল কুমারের নাড়ীর গতি ফিরিয়া আসিয়াছে।

পঞ্চম

নন্দীপুরের রাজার ছেলে বাঁচিয়া উঠিল। বরদা প্রভূত অর্থ পুরস্কার পাইল। তাহার হাসপাতালের জন্য একলক্ষ টাকার আর অভাব হইল না। হাসপাতালের জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া বরদা মনে ভাবিল,—আর বৎসর দুই আড়াই ত তাহার জীবনের মিয়াদ। এইবার মাস কতকের জন্য তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সাধুহাটিতে গিয়া বাস করাই ভাল।

মনের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে বরদা বিলম্বও করিল না। অগ্রহায়ণের এক শুভদিনে বরদা একাকী, একটিমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িল।

প্রায় দুইমাস কাল ধরিয়া নানা তীর্থ ঘুরিয়া, মোগলসরাই ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে বরদা একখানি ইজি-চেয়ারে বসিয়া কলিকাতার গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছিল। ভৃত্য জগন্নাথ চায়ের জন্য ষ্টোভ জ্বালাইতেছিল। বরদা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—'জগ, আসছে বছরে আমি উইল করব। তোর মাসোহারার একটা ব্যবস্থা উইলে আমি করে যাব।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতার গাড়ী আসিতে তখনো ঘণ্টা দুই বিলম্ব ছিল। জগন্নাথ চা প্রস্তুত করিয়া প্রভুর হাতে দিল। বরদা চায়ের বাটিটা হাতে লইয়া সহসা যেন একবার চমকাইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বেকার একদিন এমনি সন্ধ্যার মত তাহার হাত হইতে ঝন ঝন করিয়া চায়ের বাটি খসিয়া পড়িল। সেদিনকার মতই চক্ষু তাহার কপালে উঠিয়া স্থির হইল এবং সমস্ত দেহ তুষার শীতল ও কঠিন হইয়া ইজি-চেয়ারের উপর ঢলিয়া পড়িল। সেদিন স্ত্রী হৈম গায়ে হাত দিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, আজ এই বিদেশে, প্রবাসের সাথী ভৃত্য জগন্নাথ আঁৎকাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া গিয়া ষ্টেশনের বাবুদের খবর দিল।

হিন্দুস্থানীর দেশে বাঙ্গালীর শব, বিশেষতঃ রেল-ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমের মধ্যে। সুতরাং

সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর তাহার সদগতি হইল না। পূর্ব্বজন্মের বন্ধু—ভৃত্য জগন্নাথ প্রভুর মৃত দেহ সম্মুখে করিয়া সারা রাত বসিয়া কাটাইল।

"স্যাঙ্গাত?"

"কি স্যাঙ্গাত!"

"বলি, দু-বছর ত এখনো আমার সময় রয়েচে। তুমিই ত স্যাঙ্গাত বলেছিলে যে—"

যমালয়ের পথে আসিতে আসিতে বরদা ও অনুচরের কথা হইতেছিল। বরদা অনুচরের মুখের দিকে উৎকণ্ঠাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া কহিল,—"তুমিই ত স্যাঙ্গাত বলেছিলে যে, এখনো বছর চার পাঁচ।"

অনুচর কহিল,—"আমি একটা মোটামুটি আন্দাজ মত বলেছিলুম বৈ ত নয়। নিখুঁৎ হিসেব গুপ্ত মশায়ের খাতায়।"

"না—আমার ওপর রাগ করে ধর্ম্মরাজ সময় কমিয়ে দিলেন?"

"তা কি হবার যো আছে, স্যাঙ্গাত? আয়ু থাকতে কি কমিয়ে দেবার সাধ্য আছে মহারাজের? ধর্ম্মরাজের বিচার—বড় সূক্ষ্ম বিচার জানবে!"

"তবে ভুলও ত হতে পারে সেবারের মত।"

"বার বার কি আর ভুল হয়, ভাই? সে হঠাৎ একবার হয়ে গিয়েছিল, আর সে ভুল ত আমার, ভাই।"

বরদা অনুচরের মত দ্রুত চলিতে পারিতেছিল না। তাহার হাত ধরিয়া কহিল,—"একটু আস্তে চল, স্যাঙ্গাত। আচ্ছা, ঠিক কিনা—একবার সন্দেহটা ভঞ্জন করে নোয়া যাক, চল না। দেখাই যাক না কেন—বাতি জ্বলচে কি নিভেছে।"

"তা হলেই যদি তোমার সন্দেহ যায়, তাই হবেখন স্যাঙ্গাত।"

তখন উভয়ে দ্রুত চলিতে লাগিল। যথা সময়ে প্রাণপুরীর সম্মুখে আসিয়া দেখিল, প্রাণপুরী তখন খোলাই রহিয়াছে, গুপ্ত মহাশয় কিছু তদারকের জন্য আসিয়াছেন। অনুচর বরদাকে লইয়া হলের প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল,—'ঐ দেখ, স্যাঙ্গাত, এ কি আর ভুল হবার যো আছে? ঐ দেখ তোমার বাতি নিভে গিয়েছে—এখনো পলতে থেকে একটু একটু ধোঁয়া উঠছে, দেখতে পাচ্ছ ত?"

"তা ত পাচ্ছি, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"কিন্তু"—বলিয়াই বরদা কোণের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল এবং নিমেষের মধ্যে নিজের নির্ব্বাপিত বাতিটাকে তুলিয়া লইয়া পার্শ্বের একটি জ্বলন্ত বাতি হইতে জ্বালাইয়া লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া কহিল,—"কিন্তু এই যে জ্বলচে, স্যাঙ্গাত।"

হা হা করিয়া অনুচর ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"এ করলে কি, বরদা?"

দুই পা পিছাইয়া আসিয়া অনুচরের গলা ধরিয়া বরদা কহিল,—"কিছু নয়, স্যাঙ্গাত, কিছু নয়। বলি, এত মাখামাখি ভাব—এ সব ছোট ব্যাপারে কি নজর দিতে আছে স্যাঙ্গাত? এখন চল,—আবার একবার কষ্ট কর। চা টা খেয়ে আসতেও সময় দাও নি, স্যাঙ্গাত। চল, দুজনে গিয়ে জুত করে চা টা খাওয়া যাবে এখন।"

তখনো রাত্রি শেষ হইবার অনেক বিলম্ব ছিল। বিদেশে অপরিচিত ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমের মধ্যে প্রভুর মৃতদেহ সম্মুখে করিয়া তখনো জগন্নাথ নীরবে বসিয়া রহিয়াছিল। তাহার সারা রাতের অনিদ্রায় চক্ষু দুইটি ক্লান্তিতে বুজিয়া আসিতেছিল।

হঠাৎ বরদার প্রাণহীন দেহ নড়িয়া উঠিল। বিস্ময়ে জগন্নাথ চাহিয়া দেখিতেই বরদা উঠিয়া বসিয়া কহিল—"জগ, টপ করে ষ্টোভ জ্বালিয়ে একটু চা তৈরী করে ফেল বাবা! দু'কাপের জল নিস্।" জগন্নাথের ভীত চকিত মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"আমি মরিনি রে, কোন ভয় নেই।" বলিয়া বরদা মুক্ত দুয়ারের দিকে চাহিয়া ডাকিল,—"স্যাঙ্গাত।"

উই আর সেভেন্

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

উই আর সেভেন

আমরা সাত জন। সাত ভাই বোন নয়, সাত জন মাষ্টার,—স্কুলমাষ্টার। আমি, জিতেন, পশুপতি, কেদার, যতীন, কেষ্টবাবু, আর বুড়োদাদা। বুড়োদাদার নাম স্কুলের খাতায় ছিল—দয়ালকৃষ্ণ দাস, কিন্তু আমাদের কাছে এবং আমাদের কাছ হইতে সর্ব্বসাধারণের কাছে তাঁহার রেজিষ্টার্ড নাম হইয়া গিয়াছিল—বুড়োদাদা। আর তাঁহার ট্রেডমার্ক ছিল—দেহটি কৃশ, হাড়গুলি মোটা মোটা, দাঁতগুলির যে কয়টি এখনও পড়ে নাই, তাহাতে সযত্নে সঞ্চিত ময়লার দাগ, মাথার বিরল কেশগুলি সবই পাকিয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, অবসর প্রাপ্ত গাল দুইটির মধ্যবর্ত্তী নাসিকাটি একটু বেশী রকম সজাগ থাকিয়া সমস্ত মুখখানাকে যেন মাথাখাড়া করিয়া পাহারা দিতেছে। বুড়োদাদা নিজে তাঁহার বয়স বলিয়া থাকেন—বাহান্ন, কিন্তু জলটুকু বাদ দিয়া খাঁটি হিসাবে, আমাদের মনে হয় যে, আমাদের ছয়জনের বয়সের সমষ্টি যাহা, বুড়োদাদার বয়স ঠিক তাহার সমান না হইলেও, কাছাকাছি হইবে। এই কারণেই ইনি আমাদের বুড়োদাদা। বুড়োদাদা কথায় কথায় একটি কথা প্রায়ই আমাদের শুনাইয়া দেন, এক সময়ে তাঁহারও নাকি যৌবন ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বিচার করিয়া এরূপ অতীতে আমরা কিছুতেই আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

রামচন্দ্রপুর একটা ছোটখাট পাড়া গাঁ। ইহার জমিদারও ছোট। কিন্তু এখানকার স্কুলটা বাঙ্গালা স্কুল হইলেও, এ অঞ্চলের মধ্যে বড়। তাই মাষ্টারের সংখ্যা ইহাতে—সাত,—অর্থাৎ আমরা সাত জন।

কাজের মধ্যে, বুড়োদাদা নীচের ক্লাসে মানসাঙ্ক করাইতেন, ড্রইং করাইতেন, কথামালা পড়াইতেন, আর বেশীর ভাগ সময়, বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেন।

সে দিন স্কুলে ইনস্পেক্টর আসিয়া হাজির। সংবাদ পাইয়াই বুড়োদাদা খুব হাঁকিয়া হাঁকিয়া কথামালা পড়াইতে সুরু করিলেন—একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ বিস্তর চেষ্টা করিল, কিছুতেই—

ইনস্পেক্টর তাঁহার ক্লাসে আসিয়া কহিলেন, কি পড়াচ্ছেন?

আজ্ঞে, কোথামালা।

আপনার দেশ বোধ হয় কাঁথির ঐ দিকে? ওটা কোথামালা নয়, কথামালা। আচ্ছা কথামালা কথাটার মানেটা এদের বুঝিয়ে দিন দেখি।

ছেলেদের দিকে চাহিয়া বুড়োদাদা কহিলেন, দেখ, তোমরা সব শিশু, অর্থাৎ ছোট ছোট ছেলে। তোমরা এই রামচন্দ্রপুর জয়চন্দ্র ইনটিটিউশনে—

ইনস্পেক্টর একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, ও দরকার নেই, শুধু কথামালা কথাটার মানে এদের বুঝিয়ে দিন।

যে আজ্ঞে। শুন সকলে, বুঝ, এই কথামালা মানে তোমরা জান কি? আমি বহুবার তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি, পুনরায় অদ্য মহামান্য শ্রীযুক্ত ইনস্পেক—

এবার বিরক্তিটা সুপ্রকাশ করিয়া ইনস্পেক্টর কহিলেন, ভূমিকার কোন প্রয়োজন নেই, শুধু মানেটা বুঝিয়ে দিন।

আজ্ঞে তাই দিচ্ছি। এই কোথামা—কথামালা মানে হচ্চে, অর্থাৎ—এই কতগুলি অক্ষর একসোঙ্গে থাকলে এক একটি কোথা হয়! আবার কোথা? একটি কথা হয়। সেই কথাগুলিকে কালি দিয়া ছাপাইয়া, কাগজে গাঁথিয়া মালা তৈরী কর' হোয়েছে। অনেকগুলি অক্ষর নিয়ে একটি কথা এবং সেইরূপ অনেকগুলি কথা লইয়া একটি মালা। বুঝতে পেরেচ সব?

ইনস্পেক্টর কহিলেন, ওরা হয়ত পেরেছে, কিন্তু আমি পারলুম না। আচ্ছা কিসের গল্প পড়াচ্ছেন? বাঘ ও বক? এটা গদ্য করুন দেখি।

হুজুর, এইটাইত গদ্য।

তবে, পদ্য করুন। বুঝেছেন? বাঘ ও বকের গল্পটা পদ্য করে ফেলুন। শীগ্‌গির। আধ ঘণ্টার মধ্যে। লিখে আমার কাছে নিয়ে যাবেন।

ইনস্পেক্টর অন্য ক্লাসে গেলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, বুড়োদাদা যতীনের শরণাপন্ন হইলেন। আমাদের ভিতর হেডমাষ্টার কেষ্টবাবু আর যতীন একটু আধটু কবিত্ত লিখিতে পারিত। বুড়োদাদা যতীনকে কহিলেন—দে ভাই, শীগ্‌গির এর একটা কবিতা লিখে দে, দিয়ে আমাকে বাঁচা। কি অদ্ভুত ফরমাজ দেখো না একবার। পদ্যকেই ত গদ্য করে, এ যেন উল্টো রাজার দেশের উল্টো খেয়াল! যতীন কহিল, আপনিও উল্টো করে দিন। বুড়োদাদা কথাটায় কান না দিয়া, যতীনকে তাড়া দিয়া কহিলেন, যা লেখবার লিখে দে ভাই শীগ্‌গির। আধঘণ্টা সময় দিয়েছে।

যতীন তাড়াতাড়ি করিয়া কবিতাটা লিখিয়া ফেলিল। বুড়োদাদা তাহা ভাঁজ করিয়া পকেট জাত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইনস্‌পেক্টার আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হোয়েছে কবিতাটা?

আমরা সাত জনই তখন আফিসঘরে উপস্থিত। টিফিন হইয়াছে।

বুড়োদাদা কহিলেন, হুজুরের হুকুম, না হোয়ে যায়? বলিয়া বুড়োদাদা পকেট হইতে ভাঁজকরা কাগজখানা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি মনে মনে পড়িয়া বলিলেন, এ কি! এ যে কুসুমের টাকার হিসেব। কুসুমটা কে? চুড়ি ১ গাছা, আংটী ১টা, শাঁখা ৩ গাছা, মোট ২৩৲ টাকায় বাঁধা, সুদ ৩৭৷৷০ টাকা, মোট—

হুজুর, ওটা দিন, ওটা নয়। বলিয়া বুড়োদাদা আবার পকেটের মধ্যে হাত দিলেন। ইনস্‌পেক্টর কহিলেন, ধার করেচেন বুঝি? তা ২৩৲ টাকায় ৩৭৷৷০ সুদ! এ কুসুমটি কোন কাননের কুসুম?

বুড়োদাদা আমতা আমতা করিয়া কহিলেন, দুঃখের কোথা আপনার কাছে কি বলবো হুজুর! চোদ্দটা টাকায় কিছুতেই আর চালাতে পারি না বাবু! আপনার দয়ায় যদি কিছু ইনক্রিমেণ্ট—

আচ্ছা সে হবে, কিন্তু কই, পদ্যটা কই?

এই যে হুজুর।

ইনসপেক্টর সমস্ত কবিতাটা মনে মনে পড়িয়া কহিলেন, সুন্দর হোয়েছে, খাসা হোয়েছে। আপনি বর্ত্তমানে কত করে পাচ্ছেন?

চোদ্দটি টাকা হুজুর।

আসছে মাস থেকে যাতে আপনি বার টাকা করে পান, সে সম্বন্ধে রেকমেণ্ড করে আজ লিখে যাব। মাষ্টার মশায়রা, কবিতাটা একবার আপনারাও পড়ুন। বলিয়া ইনস্‌পেক্টর কাগজখানা কেষ্টবাবুর হাতে দিয়া কহিলেন, একবার হেঁকে পড়ুন ত।

কেষ্টবাবু হাঁকিয়া পড়িলেন—

একদা একটি হাড়ের গলায়
ফুটেছিল এক বাঘ।
ব্যথায় যতই হোল সে কাতর
হল তত তার রাগ।
হাড় বিস্তর করিল চেষ্টা
তবু পারিল না হায়
বাহির করিতে বাঘটিকে সে যে—
যাতনায় প্রাণ যায়।
অবশেষে এক শিয়ালের কাছে
ছুটিয়া গিয়া সে কয়—
দয়া করে দাও বাঘ বার করে
হে শৃগাল মহাশয়।
শৃগাল কহিল—ভয়টা কি তার,
সরে এস মোর কাছে,
দেখি একবার—দুষ্টু ব্যাঘ্র
কোথায় ফুটিয়া আছে।
এই না বলিয়া ধূর্ত্ত শিয়াল
হাড়খানি লয়ে মুখে,
কড় মড় কড় লাগিল চিবাতে
শুয়ে শুয়ে মহাসুখে।

ইনসপেক্টর কহিলেন, অতি সুন্দর! তা উলটো কথামালা যেমন লিখেছেন, দুটাকা উলটো ইনক্রিমেণ্টও হোয়ে যাবে আপনার।

বুড়োদাদা তাঁহার উচ্চ নাকটিকে উচ্চতর করিয়া, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইনস্‌পেক্টর চলিয়া গেলেন।

বুড়োদাদা যতীনের দিকে চাহিয়া সখেদে কহিলেন, কি কাণ্ডটাই করলে বল ত যতীন?

যতীন কহিল, কাণ্ডটা আর কি? যেমন উলটো ফরমাস, তেমনি উলটো কথামালা হবে না ত কি?

তেমনি সখেদে বুড়োদাদা কহিলেন, এদিকেও তেমনি উলটো ইনক্রিমেণ্টের যে ব্যবস্থা হোয়ে গেল!

তখন সকলে মিলে আমরা বুড়োদাদাকে ভরসা দিলাম—কোন ভয় নেই। ইনস্‌পেক্টর ভারি রসিক লোক। দেখবেন, আপনার দুটাকা

মাইনে ঠিক বেড়ে যাবে। অর্থাৎ, ইনক্রিমেণ্ট নয়, ইনক্রিমেণ্টই হোয়ে যাবে।

হইলও তাই। আমাদের ইনসপেক্টর ছিলেন একদিকে যেমন খুব রসিক, অপর দিকে তেমনি দয়ালু। সত্যই তিনি বুড়োদাদার প্রতি সদয় হইয়া পরের মাস হইতে তাঁহার ষোল টাকা হিসাবে বেতনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যেদিন বুড়োদাদা ষোলটাকা মাহিনা পাইলেন, সেদিন তাঁহার স্ফূর্তি দেখে কে! পশুপতি কহিল, এইবার মাথাটা নীচের দিকে করে একবার উলটো নাচন নেচে ফেলুন বুড়োদাদা।

এমনই সুখে, এমনই আনন্দে—কাটাইতেছিলাম আমরা সাতজন! কিন্তু ভেকেসনের পর কি কুক্ষণে যে সেই লোকটা—সেই হ্যাট কোট পরা লোকটা লটারীর টিকিট বিক্রয় করিতে আমাদের রামচন্দ্রপুরে পদার্পণ করিয়াছিল!

কথাটা তবে খুলিয়াই বলি।

হাওড়া চ্যারিটী লটারীর টিকিট বিক্রয় করিতে একটি বাঙ্গালী সাহেব আমাদের গ্রামে আসিয়াছিল। সে বুঝাইয়া সুঝাইয়া বুড়োদাদাকে এক টাকা দিয়া একখানা টিকিট বিক্রয় করিয়া যায়। সেই টিকিটই বুড়োদাদার সর্ব্বনাশ ঘটাইল। শুধু বুড়োদাদারই বলি কেন, আমাদেরও সর্ব্বনাশ ঘটাইল।

লটারীর প্রথম পুরস্কার ছিল ৭৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০ হাজার, তৃতীয় পুরস্কার ৩০ হাজার—এইরূপ। সর্ব্বশেষ পুরস্কারটিও যদি ওঠে, তাহা হইলেও ৫ হাজার টাকা। কিন্তু বুড়োদাদা আমাদের, সর্ব্বশেষও নয়, দ্বিতীয় তৃতীয়ও নয়, প্রথম পুরস্কারটিরই আশা করিয়া টিকিটখানি কিনিয়াছিলেন। শুভনাম অর্থাৎ ন্যম ডি প্লুম দিয়াছিলেন—ভোলাবাবা। আমাদের এখানে হাড়োয়া হাটের কাছে ভোলাবাবা নামে এক সাধুর আস্তানা। বুড়োদাদা তাঁর খুব ভক্ত। একটু কিছু হইলেই বুড়োদাদা তাঁহার চরণে গিয়া শরণ লইয়া থাকেন। টিকিটখানা কিনিবার পরও সুতরাং বুড়োদাদা একদিন তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি কহিলেন, আমার নাম যখন দিয়েছিস, তখন প্রাইজের টাকা তোর বাক্সে এসে গেছে জানবি। তবে প্রথম পুরস্কারটা অন্য লোকে পাবে, তোর দ্বিতীয় পুরস্কার। যা বেটা, ঘরে যা। পরদিন পাড়ার নন্দ ঘোষের নিকট হইতে, কানের একজোড়া সোনার দুল বাঁধা রাখিয়া বুড়োদাদা পাঁচটা টাকা লইল এবং তদ্দ্বারা মস্ত এক সিধা সাজাইয়া, তৎসহ সস্ত্রীক ভোলাবাবার চরণে গিয়া লুটাইয়া পড়িল। ভোলাবাবা সেই ২৮৮০০ নম্বরের টিকিটখানা হাতে লইয়া মন্ত্রপুত করিয়া দিলেন। সেইদিন রাত্রিতে বুড়ো বৌদি স্বপ্ন দেখিলেন, পঞ্চাশ হাজার টাকার নোট ভরা রেজেষ্ট্রী করা খাম হাতে পিওন আসিয়া তাঁহাদের ডাকাডাকি করিতেছে।

তিনদিন আর বুড়োদাদা স্কুলে আসিলেন না। চতুর্থ দিনে যদিও আসিলেন, কিন্তু বড় একটা আমাদের সঙ্গে কথা কহিলেন না। তবে বুঝা গেল, তাঁহার অন্তরে আনন্দ ও উৎসাহের একটা ফল্গুধারা বহিয়া যাইতেছে।

ফেটবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে ড্রইং হবে বুড়ো—দা? ৭ই ভাদ্র।

পশুপতি জিজ্ঞাসা করিল, টাকাটা রাখবেন কোথায়? এক আধ টাকা ত নয়—৫০ হাজার! কোলকাতার কোন বড় ব্যাঙ্কে রাখা উচিৎ। যতীন কহিল, কি উচিৎ, কি অনুচিৎ, সে আর বুড়োদাদাকে তোমার শেখাতে হবে না। কেদার কহিল, শেখানো নয়, আমাদের এই সাতজনের ভেতর একটা পরামর্শ আর কি। বুড়োদাদা কিন্তু কোন কথা না বলিয়া নীরবেই রহিলেন।

ইতোমধ্যে চারিদিক হইতে খবর পাওয়া গেল, বুড়োদাদা হরিশ স্যাকরাকে সোনার বাজার দর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ১০০ ভরি সোনাতে কি কি ভাল ভাল গহনা হইতে পারে, তাহার হিসাব লইয়াছেন, একটা চক মিলানো দোতালা বাড়ী করিতে গেলে কত লক্ষ ইটের দরকার, কোলকাতায় একটা ছোট খাট বাড়ী করিতে কত ব্যয় হয়, একখানা মটর গাড়ীর দাম কত, প্রভৃতি সংবাদও সংগ্রহ করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে শ্রাবণ মাস কাটিয়া গেল। প্রবল বর্ষার ধারায় রামচন্দ্রপুরের মাঠ, ঘাট, বিল, প্রান্তর ভাসিয়া একাকার হইয়া গেল। কিন্তু বুড়োদাদার অন্তর ক্ষেত্রে বর্ষার একবিন্দু বারিও প্রবেশ করিতে পারিল না, তথায় তখন সহস্র পুষ্প-বাসিত বসন্তের মধুর বাতাস প্রবাহিত।

১৫ই ভাদ্র সংবাদপত্রে বাহির হইল, হাওড়া চ্যারিটি লটারীর প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে—মুর্শিদাবাদের মহম্মদ কেরামেতুল্লা খাঁ।

দ্বিতীয় পুরস্কার? কোন খবর লেখা নাই।

বুড়োদাদা ছটফট করিতে লাগিলেন। প্রত্যহই স্থূল করিয়া তিনি ভোলাবাবার কাছে যাতায়াত সুরু করিয়া দিলেন। ভোলাবাবা বুড়োদাদাকে বলেন, দ্বিতীয় পুরস্কার—তোমার। যা বোলে দিয়েছি, তার আর নড় চড় হবে না।

কেষ্টবাবু কহিলেন, দাদু, হয় ত টাকাটা ফাঁকি দিয়ে গাফ করবার মৎলবে আছে, একখানা চিঠি দিন। জিতেন কহিল, টিকিটের নম্বর দেবেন না যেন, খালি লিখবেন যে কত নম্বরের টিকিট দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছে, তা জানাবেন।

আমি কহিলাম, চিঠিখানা রেজেষ্ট্রী করে দেবেন।

পশুপতি কহিল, শুধু রেজেষ্ট্রী নয়, উইথ য়্যাকনলেজমেণ্ট ডিউ।

কিন্তু আমরা জানিতাম না যে, তৎপূর্ব্বেই চিঠি দেওয়া হইয়া গিয়াছে এবং পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহা ভোলাবাবার দ্বারা মন্ত্রপূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর চিঠিখানা পাঠাইবার পর হইতেই বুড়োদাদা প্রত্যহই দুই বেলা ডাক-ঘরে হাজিরা দিয়াও আসিতেছেন কিন্তু কোন জবাবই আর আসিতেছে না।

জিতেন কহিল, বুড়োদাদা, আপনার নামে যে, টকই উঠেছে, তা এইবার জানা যাচ্ছে, নইলে রেজেষ্ট্রী চিঠির জবাব না দিয়ে চুপচাপই বা থাকে কেন? দেখুন, দু দশ টাকা নয়, আধ লাখ! আপনি হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সব কথা লিখে একখানা চিঠি দিন।

কেষ্টবাবু কহিলেন, দিতে হয় ত একেবারে খোদ লাটের কাছেই দেওয়া দরকার।

বুড়োদাদা তাঁহার নাকটি একটু কোঁচকাইয়া কহিলেন, দিতে পার ভাই, বেশ ভাল করে একখানা ঐ রকম চিঠি লিখে?

কেষ্টবাবু তখনই কাগজ কলম লইয়া বসিলেন।

পরের দিন কেষ্টবাবু আর যতীন কি একটা পরামর্শ করিল। যতীন আমাকে কহিল, তোমাদের সব বলবো এখন।

বলা বাহুল্য যে, লাট সাহেবের চিঠিখানাতে সর্ব্বৈব ফাঁকি দেওয়া হইয়াছিল। কারণ, চিঠির ভিতরও কেষ্টবাবু যা তা লিখিয়াছিলেন, ঠিকানাও যা তা লিখিয়াছিলেন। ঠিকানায় লেখা হইয়াছিল, To His Highness, The Charity Lotterer of Bengal, Darjeeling, যেহেতু, সুবিধা ছিল, মোটামুটি অক্ষর পরিচয় ছাড়া বুড়োদাদার ইংরেজীতে আর জ্ঞান ছিল না। বুড়োদাদা বিশ্বাস করিয়া চিঠিখানা আর কাহারও হাত দিয়া ডাকে দিলেন না, ডাকঘরে গিয়া নিজ হাতেই উহা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন। উহা যে ডি, এল, আফিস হইতে ফিরিয়া আসিবে, তাহারও উপায় ছিল না, যেহেতু পত্রের ভিতর আসল প্রেরকের নাম ঠিকানা কিছুই ছিল না, যাহা ছিল—সে সমস্তই ভূয়া। চিঠিখানা আমি রেজেষ্ট্রী করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কিন্তু কেদার আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছিল, ও চিঠি কি আর মারা যায়?

এইবারকার চিঠিতে কিন্তু ফল ফলিল। কয়েকদিন পরেই হাওড়া চ্যারিটী লটারীর আফিস হইতে বুড়োদাদার নামে নিম্নোক্তরূপ এক পত্র আসিল—

মহাশয়,

আপনার টিকিটের নম্বর কত? যদি উহা ২৮৮০০ হয়, তাহা হইলে পত্র পাঠ আপনার টিকিটখানি আমাদের আফিসে পাঠাইয়া দিবেন, ইতি।

পশুপতি লাফাইয়া উঠিল, কখনই না—কখনই না। টিকিট হাত ছাড়া কিছুতেই করা হবে না। টিকিটখানা একবার দেখি, বুড়োদাদা।

কিন্তু পশুপতির পশুবুদ্ধিতে সে কি করিয়া বুঝিবে যে, সে টিকিট কি বুড়োদাদা যার তার হাতে দেন, না—যেখানে সেখানে রাখেন? সে টিকিট ছোট্ট একটি জারমান সিলভারের কৌটায় রাখিয়া, কৌটাটা আর এক বড় টীনের কৌটায় ভরিয়া, সবশুদ্ধ তাঁহার শুইবার ঘরের মেঝের মধ্যে পোতা আছে।

এইবার গ্রামে আর কাহারো জানিতে বাকী রহিল না যে, বুড়োদাদার নামে ৫০,০০০৲ টাকা উঠিয়াছে। এতদিন রামচন্দ্রপুরের আকাশে যে ঈষৎ গুরু গুরু মেঘের মৃদুধ্বনি উঠিতেছিল, এক্ষণে তাহা ঘোর নিনাদে সারা গ্রামকে কাঁপাইয়া তুলিল। ছেলে, বুড়ো, যাহার সহিতেই বুড়োদাদার দেখা হয়, সেই জিজ্ঞাসা করে টাকা এল, বুড়োদাদা?

লটারী-আফিসের চিঠিখানা, কেষ্টবাবু আর যতীনের কাণ্ড। সেই যে দুজনে চুপি চুপি পরামর্শ করিয়াছিল, চিঠিখানা তাহারই ফল। চিঠিখানা তাহারাই লিখিয়া হাওড়ার পোষ্টাফিসে পোষ্ট করিয়াছিল।

যাহা হউক, সকলে মিলিয়া পরামর্শ দেওয়া হইল, টিকিট যেন কিছুতেই পাঠানো না হয়। পশুপতি হঠাৎ বিশেষ উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, দেখুন ত বুড়োদাদা, চিঠিখানার ছাপ কোথাকার? বুড়োদাদা ছাপটা মনে মনে পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—HAROAH। যতীন তাহা ছিনাইয়া লইয়া পড়িতে পড়িতে কহিল, এই যে হাওড়াই ত বটে।

পরদিন স্কুলে আসিতে বুড়োদাদার একটু দেরী হইল। কিন্তু পদার্পণ করিয়াই তিনি কহিলেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা, এ গাপ করতে কিছুতেই দিচ্চি না। টাকা ধ্রুব আমার নামে উঠেছে। ভোলাবাবার কথা মিথ্যা হবার নয়।

কেদার কহিল, আর হপ্তাখানেক দেখুন, এর ভেতর টাকাটা পাঠায় ভালই, নইলে—আর চিঠি চাপাটি নয়, এবার একেবারে লাটের কাছে গিয়ে সব কোথা খুলে বলা।

বুড়োদাদা কহিলেন, কোথাও আর যেতে হবে না। ভোলাবাবা বলেচেন, কাজ অনেক এগিয়ে আসচে। হপ্তাখানেকের মধ্যেই বাড়ী বয়ে টাকা দিয়ে যেতে হবে।

পরদিন বুড়োদাদা স্কুলে আসিলেন না। তাহার পরদিনও না। তাহার পরদিনও না। জানা গেল, টাকা দিতে আসিয়া পাছে তাঁহার দেখা না পাইয়া ফিরিয়া যায়, সেই জন্য বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও তিনি যাইতে পারিতেছেন না।

তিন দিন পরে ঘর ছাড়িয়া যদিও বাহির হইলেন, কিন্তু স্কুলে আর তিনি আসিলেন না।

একটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। সে দিন আমরা সাত জন—খুড়ি—ছয় জন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, বুড়ো বৌদি তাঁহার মুণ্ডিত মস্তকে মধ্যম নারায়ণ তৈল মালিশ করিয়া দিতেছেন। যে কবিরাজ তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন, তিনি উন্মাদভঞ্জী বটিকা প্রভৃতি সেবনের ঔষধও ব্যবস্থা করিয়াছেন। হায় বুড়োদাদা! শুধু শুধু তুমি এ কী কাণ্ড ঘটাইয়া বসিলে।

আমরা যাইতেই বুড়োদাদা কট মট করিয়া আমাদের দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, টাকা এনেচ? নোট আমি নোব না, পোকায় কাটবে, নগদ টাকা চাই। বুড়োদাদার চক্ষু রক্তবর্ণ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। বুড়োবৌদি আমাদের দেখিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। হায়! বুড়োদাদা পাগল হইয়া গিয়াছেন।

মনে মনে ভাবিলাম, উহার জন্য কতকটা আমরাও যে দায়ী বটে। অন্তরে ভগবানকে স্মরণ করিয়া কহিলাম, ঠাকুর! বুড়োদাদার মাথা ভাল করে দাও। তাঁহাকে লইয়া কত আনন্দে, কত উৎসাহে আমাদের স্কুলের সময়টা কাটিত। তাঁহাকে লইয়া—আমরা সাত জন—যে বহুকাল হইতে আছি। আজ বুড়োদাদা বিহনে আমরা যে একজনও নই। তাই ত বলিতেছিলাম, ভেকেসনের পর কি অশুভক্ষণেই যে সেই হ্যাট কোট পরা লোকটা এ গাঁয়ে পদার্পণ করিয়াছিল?

হায় বুড়োদাদা! আজ এক মাস তোমা ছাড়া আমরা ছজনে আছি। কিন্তু একটি দিনের তরেও মনে হয় না যে, আমরা সাত জন নই। কত নূতন লোক ছেলে ভর্ত্তি করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, আপনারা কজন? উত্তরে আমরা বলি, আমরা সাত জন।

সে ইনস্‌পেক্টর বদলী হইয়া গিয়াছেন। নতুন ইনস্‌পেক্টর সে দিন আসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কজন? আমরা কহিলাম, আমরা সাত জন। তিনি গণিয়া বলিলেন, সাত কোথায়—এই ত ছয়।

তাঁহার কথা ঠেলিয়া দিয়া, জোর করিয়া আমরা বলিলাম, না, মহাশয়, উই আর সেভেন।

প্রিয়তমাসু

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

প্রিয়তমাসু

সম্মুখ হইতে নূতন বছরের তাড়া পাইয়া, পুরাণ বছর তখন যাই-যাই করিতেছে।

বরানগরের কুঠীঘাট ছাড়াইয়া কিছু উত্তরে, প্রায় গঙ্গাগর্ভ হইতেই এক নাতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা উঠিয়াছিল। তাহারই নীচের তলাকার, গঙ্গার দিকের একখানি প্রশস্ত ঘরের মধ্যে এক জন যুবক কলম হাতে ও এক জন যুবতী সেলেট ও পেনসিল হাতে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

খানিক বৃথা চিন্তা করিবার পর, যুবতী হঠাৎ যুবকটির দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সাত আষ্টে —বত্রিশ?

যুবক কহিল, তোমার মাথা। সাত আষ্টে—পৌনে তিন শ। তোমার কিচ্ছু হবে না। অত বড় মাথাটা খালি ছাই-ভস্মে ভরা।

যুবতী হাতের সেলেটখানা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল, যুবকের হাত হইতে ফাউন্টেন পেনটি কাড়িয়া লইয়া একধারে রাখিয়া দিল, তার পর তাহার গলায় হাতটি জড়াইয়া, তাহার মুখখানা আপন মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, অঙ্ক-টঙ্ক আমি পারি না, আমি পারি এই,—বলিয়া স্বামীর গণ্ডে একটি চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল।

এই আখ্যায়িকার বড়ই দুর্ভাগ্য যে, যাহাকে লইয়া ইহার সুরু হইল, তাহার রূপের প্রভায় ইহার প্রথম পৃষ্ঠাখানি ঝল্‌সাইয়া দিতে পারা গেল না। যেহেতু সাধারণের দৃষ্টিতে অশ্রুময়ী মোটেই সুন্দরী নয়। সে কালো। তবে অনেকে নাকি সেই কালোর ভিতরই এমন একটা লালিত্য দেখিতে পায়, যাহাতে তাহাকে তুচ্ছ করাও চলিত না। তা' ছাড়া আর একটি অসাধারণ জিনিষ তাহার ছিল। সে তাহার চোখ দু'টি। সে পদ্ম-আঁখির স্নিগ্ধ চাহনিতে যদি কেহ মুগ্ধ না হয়, তাহা হইলে সে, হয় অতি-মানুষ নয় ত অ-মানুষ।

অরুণ কহিল, অশ্রু, তোমার দৌরাত্ম্য দিন দিন—

আবার ঐ বিদ্‌ঘুটে কথাটা। ঐ 'দৌরাত্ম্য', 'ঊর্দ্ধ', 'আকাঙ্ক্ষা' 'নির্দ্ধারিত',—এই ধরণের গোটাকতক কথার জন্যে দ্বিতীয়ভাগখানাকে কোন রকমে আর কায়দা-ই করতে পারলুম না; রাগ ক'রে তাই তাকে যমালয়ে পাঠালুম।

আজ সেলেটখানাকেও যমালয়ে পাঠালে। আপদ শান্তি! লেখাপড়া তোমার কিচ্ছু হবে না, তা বোঝা গেছে।

তোমারি কোন্ হয়েছে? পৈত্রিক পয়সা নষ্ট ক'রে তিনবার বি-এ দিলে, কিছুতেই ত পাশ করতে পারলে না। বল না, পেরেছ কি?

তুমিই তার কারণ।

আমারও কিছু না হওয়া—সে-ও, তুমিই তার কারণ।

অরুণ কিছুক্ষণ অশ্রুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, যা বলতে যাচ্ছিলুম, ভুলে গেলুম। ঐ কালো মুখখানি আর ঐ চোখ দু'টি—যার মধ্যে মনে হয় খানিকটা সাগরের জল টল্‌টল্ করছে,—দেখলেই সব ভুলে যেতে হয়। বাস্তবিক কি সুন্দর!

বটে! তার পর?

তারপর বলছিলুম যে, সেলেটখানা যে ফেলে দিলে, তা না হয় দোকান থেকে পয়সা দিলেই আবার পাওয়া যাবে; কিন্তু কবিতাটা আমার, ভেবে ভেবে কেমন মিল খাইয়ে এনেছিলুম, হঠাৎ এমনি ব্যাপার ক'রে বসলে যে, মিল-টিল, ভাব-টাব সব গঙ্গা পেরিয়ে ও-পারের কোন্ চড়ায় গিয়ে আটকালো।

অশ্রু বিজ্ঞের মত সম্মুখের কাগজখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, ইস্! কবিতার ভাবটা নষ্ট হয়ে গেল বটে! দাঁড়াও, আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। কি লিখেছ?—

বৈশাখেরি প্রথম প্রাতে
প্রথম কিরণ লয়ে সাথে
পূর্ব্বাকাশে অরুণ যখন ওঠে—

এর পরই তোমার ভাব হারিয়ে গেছে বুঝি? আচ্ছা, আমি ব'লে দিচ্ছি, লেখ—

উঠেই দেখে চক্ষু চেয়ে,
যাচ্ছেতাই এক কালো মেয়ে,
অশ্রুরূপে বক্ষে তাহার ফোটে।

হয়েছে ত? বল না? চেয়ে রইলে কেন অমন ক'রে?

অপলক-দৃষ্টিতে অশ্রুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অরুণ কহিল, এ সব দিকে ত খুবই পরিপক্ক, খালি অঙ্কের বেলাতেই তোমার যত গণ্ডগোল। গেরস্থ ঘরের বৌ, একটু-আধটু অঙ্ক জানা থাকলে ছোট-খাট বাজার হিসেবগুলো—

রাখতে পারব?

হ্যাঁ।

বোয়ে গেছে। বাজারের হিসেব কিছুতেই রাখতে পারব না, বরঞ্চ বাজারটা ক'রে দিতে পারব। তাতে দু'পয়সা পাওনার আশা আছে!

তোমাকে কথায় ত দেখছি পারবার জো নেই।

না।

আচ্ছা, পড়া-শুনো তোমার তা হ'লে মোটেই ভাল লাগে না?

না।

কি তবে ভাল লাগে?

তোমার সঙ্গে এই রকম ব'সে ব'সে কথা কইতে।

তুমি একটি অদ্ভুত!

আমি তা'র অর্দ্ধাঙ্গিনী। আসল অদ্ভুত হলে তুমি।

আমি অদ্ভুত কিসে?

অদ্ভুত না হোলে আর আকাশের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে ব'সে থাক। আচ্ছা, আকাশে হাঁ ক'রে দেখবার মত কি আছে বল ত? ও-পারের ঐ সব বন-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড়, পাখীর ডাক, গঙ্গার ঢেউ, আকাশ, চাঁদ—এ সবের ভেতর দেখবারই বা কি আছে আর শোনবারই বা কি আছে? চাঁদ ত ছোট ছোট ছেলেরাই দেখে থাকে আর ডেকে থাকে। বুড়োদের ওতে দেখবার যে কি আছে, তা ত বুঝি না। সুর্য্যির দিকে ঐ রকম চেয়ে ব'সে থাকতে পার, তা হ'লে বলি, কবি বটে! তবে আমার মুখের দিকে যে হাঁ ক'রে চেয়ে থাক, সেটা অবিশ্যি স্বীকার করি যে, এ মুখে দেখবার, আর দেখে মজবার অনেক কিছুই আছে।

তোমার মুখ দেখে আমি কোন দিনই মজি নি।

যতদূর মজবার মজেছ; মিছে কথা আর বোলো না।

এই সময়ে বাহিরে জুতার শব্দ হইল। অশ্রু উঠিয়া গিয়া জানালার ধারে চেয়ারখানায় বসিল। দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া অরুণের কনিষ্ঠ তপন ডাকিল, মেজদা, ঘরে আছ কি?

অরুণ সাড়া দিল, হ্যাঁ, আয়। কি খবর রে?

তপন মেজদা'র পাশে আসিয়া বসিল; কহিল, মেজদা, হনুমানের দৌরাত্ম্যে বাগানের ফল-পাকড় ত আর কিছু রইল না। মালীটা কিছুই দেখে না; খায় দায় আর ঘুমোয়। ও মাসে ওর একটা টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া গেল ত, কিন্তু তা'তেও ওর আকাঙ্ক্ষা মেটে নি।

অশ্রু তপনের দিকে চাহিয়া কহিল, ঠাকুরপো, তার চেয়ে তোমরা সোজা কথা বল না কেন, আমি তোমাদের বাড়ী ছেড়ে দূর হয়ে যাই। সেই দৌরাত্ম্য আর আকাঙ্ক্ষা? আমায় কি তোমরা তাড়াবেই স্থির করেছ, ভাই? তপন সবিস্ময়ে তাহার মেজবৌদির মুখের দিকে চাহিতেই, অশ্রু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, দ্বিতীয় ভাগের বানান গো! তোমার ঐ আকাঙ্ক্ষা আর দৌরাত্ম্য শুনে বলছি ভাই। কি সব দাঁত-ভাঙ্গা কথা ঠাকুরপো, কিছুতেই ত কায়দা করতে পারলুম না।

অরুণ কহিল, বাগানের মালীটাকে তাড়াতে হবে। দাদাকে একবার কথাটা তুই বলিস।

তপন কহিল, যা বলবার, তুমিই বড়দা'কে বোলো।

সেই সময় বহির্বাটী হইতে অরুণের নাম ধরিয়া কে ডাকাতে অরুণ ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল। তপনও উঠিয়াছিল। অশ্রু কহিল, যেও না ঠাকুরপো, একটা ভয়ানক দরকারী কথা আছে।

কি মেজবৌদি?

দেখ ভাই, হেনা মেয়েটি কুটুমের মেয়ে; দু'চার দিনের জন্যে এ বাড়ীতে তার দিদির কাছে বেড়াতে এসেছে। এখনো ও আইবুড়ো। সুতরাং একটু বুঝে সুঝে কাজ কোরো ভাই।

হেঁয়ালী রেখে আসল কথা খুলে বল, মেজবৌদি।

বলছি, মেয়েটিকে যেন বেশী ক'রে পেয়ে বোসো না। হোলই বা তোমার বড়বৌদির বোন। তুমিও ভাই আইবুড়ো কি না। কি জানি কি হয়।

তার মানে ?

তার মানে, দিনরাত ওকে নিয়ে গান-বাজনা করা, ওর মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকা, এ সব কি ভাল ?

খুব খানিকটা হাসিয়া তপন কহিল, সে হিসেবে আমার চেয়ে তোমরাই ওকে বেশী ক'রে পেয়ে বসেছ। ঐ যে তোমার হেনারাণী আসতে আসতে পালিয়ে গেল। বলিয়া তপন মুক্ত দরজার ফাঁকে গলা বাড়াইয়া একবার দেখিল। অশ্রু তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়াই তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল এবং জোর করিয়া তাহাকে বিছানার উপর বসাইয়া কহিল, নট্ নড়ন্-চড়ন্। তোর সেই গানখানা একবার গাইবি, তবে যেতে পাবি। বলিয়া মেজবধূ বেঞ্চের উপর হইতে হার্ম্মোনিয়মটা আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, গা—খুব ভাল করে, সেই গানখানা।

হেনা কহিল, কোন গানটা, দিদি ?

সেই 'শিউলি ফুলের বনে'।

হেনা তখন হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া গানখানি গাহিল :—

হৃদয় আমার হারায়েছি আজ শিউলি ফুলের বনে।
আপন ভুলে তাই যে আমি ব'সে আছি আন্‌মনে।
যাহার বাঁশীর সুরটি আমার বাজে হৃদয়-তলে,
যাহার প্রেমের প্রদীপখানি হিয়ার মাঝারে জ্বলে,
পথে যেতে যেতে চেয়ে গেছে
সে যে আকুল আঁখির কোণে—
শিউলি ফুলের বনে।
তারি তরে আজ গাঁথিয়াছি মালা,
তারি তরে ব'সে রই,
প্রভাতে গিয়াছে এই পথ দিয়া—
এখনো ফিরিল কই ?
বৃথা-অভিমানে ভুল বুঝে সে কি চলে গেছে তাই ?
প্রাণের দেবতা প্রাণের কথা কি কিছু বোঝে নাই ?
নয়ন আমার কহিল যে কথা তার নয়নের সনে—
শিউলি ফুলের বনে ?

মেয়েটির মধুর কণ্ঠে ইহারা এতই তন্ময় হইয়া গানখানি শুনিতেছিল যে, বড়বউ কখন্ যে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। গান শেষ হইলে বড়বউ বাহিরে দাঁড়াইয়া মেজবউয়ের উদ্দেশ্যে কহিল, দিনরাত তোদের ভালও লাগে, মেজবৌ। বাড়ীখানা যেন থিয়েটারের আখড়া করে তুললি তোরা। যা হিনু, বেলা গেছে, গা-হাত ধুগে যা। বলিয়া বড়বউ যেন একটু বিরক্ত হইয়াই চলিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গেই হেনা ও তপন উঠিয়া গেল। মেজবউ তখন জানালার ধারে বসিয়া নিবিষ্টমনে সম্মুখের দূর-প্রসারী দক্ষিণ-বায়ু-তাড়িতে ঊর্ম্মি-চঞ্চল ভাগীরথীর অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এপারের ঘাটে তখন জন-কয়েক কুলী-মজুর সারাদিনের কাজের শেষে স্নান করিতে নামিয়াছিল। জলের ভারীরা ঘাটের এক পাশ হইতে ঘড়ায় জল ভরিয়া লইয়া, বাঁকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। শূন্য কলসী কাঁখে লইয়া দু'একটি বধূ কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা তুলিয়া দিয়া, ও-পারে বেলুড়মঠের যে নূতন মন্দিরটি নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহাই দেখিতেছিল। তখন সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত তপন, মঠের শীর্ষদেশে তাহার শেষ আলোকরশ্মি ছড়াইয়া দিতে দিতে বিদায়ের আয়োজন করিতেছিল।

অশ্রু একান্তমনে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

দুই

সেকালে হরিশঙ্কর বসু নামে এক ব্যক্তি কমিসারিয়েটে চাকুরী করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার বাটী ছিল, চব্বিশপরগণা জেলার বকুলবাটী গ্রামে। কর্ম্মজীবনের অন্তে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন ও সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার একমাত্র পুত্র জ্ঞানশঙ্কর পল্লীজীবন পছন্দ করিলেন না। তিনি দেশের বাটী পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং সহরের উপকণ্ঠ বরাহনগরের গঙ্গাতীরে এক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। সেই সময়ে কলিকাতায় তিনি এক কন্‌ট্রাক্‌টারী ব্যবসায়ও সুরু করেন।

সে সময় দেশের হাওয়া অনুকূল ছিল। ব্যবসায়ে দিন দিনই তাঁহার যথেষ্ট ধনাগম হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি অতিমাত্রায় বিলাসী এবং আয়েসী গোছের লোক ছিলেন বলিয়া আয় অপেক্ষা ব্যয়ই তিনি বেশী করিয়া ফেলিতেন। তাহার ফলে পিতৃপরিত্যক্ত অর্থের অধিকাংশই তিনি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। যাহা বাকী থাকিল, শেষ-জীবনে তাহার দ্বারা কলিকাতার মধ্যে তিনি খানদশেক বাটী নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে সেই বাটীগুলি

হইতে যে ভাড়া পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহার পুত্রদের প্রধান আয়। কন্‌ট্রাক্‌টারী কাজটাও একরূপ চলিতেছে। মোটের উপর বাড়ী-ভাড়া ও কন্‌ট্রাক্‌টারী হইতে বার্ষিক প্রায় হাজার আষ্টেক টাকা আয় হইয়া থাকে।

জ্ঞানশঙ্করের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ উদয়শঙ্করই বিষয় ও ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া থাকে। মধ্যম অরুণশঙ্কর একটু কবি গোছের লোক। সে পাখীর গান, দখিণ বাতাস, জ্যোৎস্না, ফুল, নদীর বাঁক, বালুর চর, 'মাঠের বুকে ঐ যে সোনার পথ' প্রভৃতি লইয়া তাহার দিন কাটায়। বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট তাহাকে বড় একটা পোহাইতে হয় না এবং তাহা সে চাহেও না।

কনিষ্ঠ তপনশঙ্কর সবেমাত্র নাবালকত্বের সীমা-রেখা পার হইয়াছে। সুতরাং সংসার সম্বন্ধে সে একেবারেই অভিজ্ঞতাহীন। বৎসর দুই হইল আই, এ, পাশ করিয়া সে তাহার ছাত্রজীবন শেষ করিয়া দিবার পর, বর্ত্তমানে গান-বাজনা, উপন্যাস-পাঠ, লাইব্রেরী, ক্লাব প্রভৃতি লইয়া মাতিয়া আছে। উদয়শঙ্করের বয়স ৩৭।৩৮, অরুণশঙ্করের ৩০ এবং তপনের বছর ২৪।২৫ হইবে।

তপনের এখনো বিবাহ হয় নাই; চেষ্টা চলিতেছে। অরুণের স্ত্রী অশ্রুময়ী, স্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে দ্বিতীয়ভাগের যুক্তাক্ষর ও অঙ্ক শাস্ত্রের গুণ-ভাগ শিখিতে শিখিতে ইতিপূর্ব্বে একদিন দ্বিতীয়ভাগখানাকে যমের বাড়ী এবং সেদিন সেলেটখানাকে জলাঞ্জলি দিয়া আপদের শান্তি করিয়া ফেলিয়াছে। উদয়ের প্রথম স্ত্রী পর পর দুইটি মৃতশিশু প্রসব করিবার পর মারা যায়। তাহার পর, আজ বছর পাঁচেক হইল চপলাসুন্দরী আসিয়া বড় বধূর শূন্যস্থান অধিকার করিয়াছে। অশ্রু ও চপলা দু'জনেই প্রায় সমবয়সী, উভয়েরই বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশী হইবে না। অরুণের দুই শিশু পুত্র—কিরণ ও হিরণ। বয়স যথাক্রমে পাঁচ ও দুই।

দুই বৎসরের ছোট খোকা এই হিরণকে লইয়া সে দিন বিকালে, নূতন ঝি লক্ষ্মীর মার মেয়ে লক্ষ্মী দোতালার দালানে বসিয়া খেলা করিতেছিল। চপলা সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে লক্ষ্মীকে দেখিয়া দাঁড়াইল। গাম্ভীর্য্য ও বিরক্তি যেন একজোট হইয়া তাহার মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়াই চোখ নামাইয়া লইল। চপলা চিবাইয়া চিবাইয়া কহিল, এইখানে ব'সে মেজবউয়ের দাইগিরি করা হ'চ্ছে? বলেছিলুম না, হেনাকে নিয়ে জয় মিত্তিরের কালীবাড়ীটা একবার দেখিয়ে নিয়ে আসতে?

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে লক্ষ্মী বলিল, আমি ত বলেছিলুম; হেনা-মাসী গেল না।

এবার ঝঙ্কারের মাত্রা একটু বাড়িল,—হেনামাসী যে গেল না, সেটা ত আমাকে জানাওনি ক। জানাবে কি ক'রে; তোমার ত আর কাজের অন্ত নেই। বিকেলে মুড়ী গেলা হোয়েছে ত,—না, এখনো হয়নি?

খেয়েছি।

লক্ষ্মীর চোখের কোণে জল আসিয়াছিল বলিয়া যথাসম্ভব সে মুখ হেঁট করিয়াই বসিয়া রহিল। চপলা গা ধুইতে যাইতেছিল। তাহার কাঁধে গামছা, এক হাতে কোঁচান শাড়ী আর এক হাতে সাবানের বাক্স। হঠাৎ সাবানের বাক্সটা তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। সেটা না তুলিয়া সে যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেইরূপই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বিষাক্ত হাসি হাসিয়া কহিল, ওটা তুলে দিলে মানের কোন হানি হয় না। লক্ষ্মী কম্পিত হাতে তাড়াতাড়ি সাবানখানা তুলিয়া চপলার হাতে দিল। চোখ দিয়া একটা আগুনের হল্‌কা ছড়াইয়া চপলা হেলিতে দুলিতে নাইবার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

হিরণ দু'একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা শিখিয়াছিল। এ পাড়ায় মধ্যে মধ্যে হনুমান আসিয়া বড় অত্যাচার করে। হনুমানকে হিরণ ভয়ও করিত যত, তার উপর তার রাগও তত। সেইজন্য কাহাকেও তাহার অপছন্দ হইলে তাহার উদ্দেশে সে বলিত, হনু-দুত্‌তু-পাজি। চপলা চলিয়া গেলে পর হিরণ তাহার জ্যেঠাইমার উদ্দেশে মুখ ভেংচাইয়া বলিল, হনু-দুত্‌তু-পাজি। অতঃপর হনু দুত্‌তু-পাজিকে কোলে তুলিয়া লক্ষ্মী মেজবউয়ের কাছে তাহাকে দিতে, নীচে নামিয়া গেল।

এই বাড়ীর উপরে মাত্র দুইখানি শয়নঘর ও বারান্দা। তাহা উদয়েরই দখলে। বাকী সব ঘরই একতালায়। তন্মধ্যে গঙ্গার ধারের দিকে যে ঘর কয়খানি আছে, তাহাই অরুণ ও তপন পছন্দ করিয়া ভাগা-ভাগি করিয়া লইয়াছিল।

সেই দিন সন্ধ্যার পর উদয় আফিস হইতে আসিয়া জলযোগাদির পর যখন নিজের শয়নঘরে বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিল, তখন চপলা ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া অদূরে আসন গ্রহণ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিবার পর, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, ঠাকুরপোর কাছে কথাটা পেড়েছিলে?

উদয় কহিল, না। কাল রবিবার আছে, কাল বোলবো।

হাসির একটা ভাণ করিয়া চপলা কহিল, বিয়ের কথা বলবে, তা'ও কি আবার দিন দেখিয়ে বলতে হয় না কি?

দিন দেখিয়ে নয়। আমারও ত সময় হওয়া চাই; তা'কেও ত সময়মত ডেকে পাওয়া চাই—বুঝলে না? কালকে ওকে বোলবো এখন।

আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, ঠাকুরপো তোমার মুখের ওপর অমত করতে পারবে?

করলে খুবই করতে পারবে, বিশেষ তপনের মত ছেলে। ওকে বাগে আনতে হবে—ধীরে সুস্থে, খুব বুদ্ধি খাটিয়ে। সবুরে মেওয়া ফলবে, চপল, তাড়াতাড়িতে সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। ব্যস্ত হয়ো না। যা'ক; হিনু এখানে এসে আছে ত বেশ? তা'কে ত বড় একটা দেখতেই পাই না।

তুমি কতক্ষণই বা বাড়ী থাক যে দেখতে পাবে? আর তা'দের আড্ডা—সেই নীচে মেজবউয়ের ঘরে।

কই, তাকে একবার ডাক ত দেখি।

নন্দ চাকর বারান্দার ও-ধারে বসিয়া বড়বাবুর কাপড় কোঁচাইতেছিল। চপলা তাহাকে ডাকিয়া নীচে মেজবউয়ের ঘর হইতে হেনাকে ডাকিয়া আনিতে বলিল। কিছু পরেই হেনা এ ঘরে আসিয়া কহিল, আমায় ডাকছ, দিদি?

হ্যাঁ, বোস্। কি করছিলি রে মেজবৌয়ের ঘরে—গান না গল্প?

মেজদি একটা ভূতের গল্প বলছিল।

উদয় গড়গড়ার নলটা একপাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, হেনার গান কিন্তু এ ক'দিনের মধ্যে এক দিনও আমার শোনা হোল না। তোমার চেয়েও হিনুর গলাটা আমার কাছে মিষ্টি লাগে; সত্যি বলছি।

ত' আমি কি বলছি—মিথ্যে। আমাদের ত গান শেখাতেন রমেশবাবু—তিনিও তাই বলতেন। তা তুমি শুনলেই ত পার, কেউ ত আর বারণ করেনি। গা' ত, হিনু। আমার গান শুনে শুনে তোর জামাইবাবুর অরুচি ধ'রে গেছে। নন্দা, মেজবৌয়ের ঘর থেকে হার্ম্মোনিয়মটা নিয়ে আয় ত।

হেনা চপলার পার্শ্বে গিয়া বসিল। তার পর হার্ম্মোনিয়ম আসিলে সে গান ধরিল:—

সে যে এসেছিল মনে হয় বাঁশীতে গেয়ে।
বসেছিল বাতায়নে নীরবে চেয়ে।
মনে হয়—মোর ঘুমের ঘোরে,
জাগো জাগো ব'লে ডেকেছিল মোরে।
ফিরে গেছে শেষে অভিমানভরে
সাড়া না পেয়ে।
ধূলার উপরে পড়িয়া র'য়েছে ওই—
যাহার মালার ছিন্ন ফুলটি, প্রাণের বঁধু সে কই?
জানি না কি ঘুম এসেছিল মোর
মাথাটি খেয়ে।
মনচোরে মোর ধরিয়া আনিব,
পদতলে তা'র লুটায়ে পড়িব,
সে বিনা আমার হৃদয় গিয়াছে
আঁধারে ছেয়ে।

গান শেষ হইলে উদয় কহিল, বাঃ—হিনুর গলাটি বাস্তবিকই অতি সুন্দর!

সুন্দর হবে না, বাবাজী? ও যে আমার ছোট মা। বলিতে বলিতে যে বৃদ্ধটি ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি নগেন বাবু—উদয়ের শ্বশুর, অর্থাৎ চপলা ও হেনার বাবা। চপলার মাথায় কাপড় ছিল না, তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিয়া বসিল।

নগেন বাবু আসন গ্রহণ করিয়া চপলার দিকে চাহিয়া কহিলেন, মা, তুই বোনে গিয়ে একটু চা কি কোকো, যা হয় কিছু আমার জন্যে ক'রে আনো। চপলা ও হেনা উঠিয়া নীচে চলিয়া গেল। নগেন বাবু বলিলেন, দুই বোনকে গান শেখাবার জন্যে রমেশ বাবুকে সাতটি বছর মাইনে গুণেছি। ঐ নিকুঞ্জ—রমেশের ভাইপো—ও ত আমার ওখানেই তখন দিনরাত থাকতো। রমেশের ভেতর ভেতর ইচ্ছেটা ছিল, নিকুঞ্জর সঙ্গেই চপলার বিয়েটা হয়।—তার পর নগেন বাবু গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিলেন, কিন্তু তা' ত আর হোতে পারে না। ওরা ত হোল নীচু ঘর কি না। শেষকালে ওই ত তোমার সম্বন্ধটা নিয়ে যায়। আহা, টপ্‌ ক'রে ম'রে গেল লোকটা।

উদয় কহিল, রমেশ বাবু লোকটি বেশ ছিলেন।

—নিকুঞ্জটা সেই ফিল্ম কোম্পানীতেই কাজ করছে? তোমার এখানে আসে-টাসে ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মাঝে মাঝে এদের সব বায়োস্কোপে নিয়ে যায়; নতুন পালা-টালা হোলে দেখিয়ে শুনিয়ে আনে। এদের আবার বায়োস্কোপের যে ভয়ানক বাতিক কি না!

ভয়ানক—ভয়ানক! এই বিয়ের পর থেকে বন্ধ হোয়ে গেছে। নইলে আগে ঐ নিকুঞ্জর সঙ্গে প্রায়ই ত—তবে নিকুঞ্জ ছেলেটি অতি সৎ।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

চপলা পিতার জন্য চা ও কিছু মিষ্টান্ন লইয়া প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, শ্বশুর-জামাতায় এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হইল।

চা খাইতে খাইতে নগেন বাবু কহিলেন, বাবাজী, এদিককার কত দূর? দেরী করলে কিন্তু তাল ফস্‌কে যাবে। রাবণ রাজা ঐ জন্যে স্বর্গের সিঁড়িটা আর করতেই পারলে না। বোশেখের মধ্যেই কাজ শেষ ক'রে ফেলতে হবে জেনো।

উদয় নড়িয়া বসিয়া কহিল, ওকে বিয়ের সম্বন্ধে এখনো আমি কিছু বলিনি। বল্‌লে, আপত্তি হয় ত কিছু করবে না, কিন্তু ও ওই বাবার ধাঁচ পেয়েছে। ঠিকুজীর মিল খুঁজবে।

বলি সেও ত সব 'রেডি' গো।

আজ্ঞে হ্যাঁ। কালকেই আমি ওকে ডেকে সব বোলবো।

আবার কাল কেন? কালকের জন্যে আর কিছু রেখো না। এইখানে তোমরা একটা মস্ত ভুল কর, বাবাজী। সেই বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ থেকেই ত প'ড়ে আসছ যে—'কল্য করিব বলিয়া কোন কাজ রাখিয়া দিবে না। যাহা রাখিয়া দিবে, হয় ত তাহা আর হইবে না।' তুমি আজকেই ওকে জানিয়ে দাও। ওদের দুজনকেই এইখানে ডাক দেখি। আমার সামনেই কথাটা হোয়ে যাক,—তাতে সুবিধে ছাড়া অসুবিধে হবে না।

তা হ'লে এখুনিই ডাকব?

হ্যাঁ। বাবাজী, সংসারধর্ম্ম করতে হ'লে অনেক কিছু অভিজ্ঞতার দরকার। খালি ধর্ম্ম-পুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে থাকলে হবে না। সত্য মিথ্যা, ভদ্র অভদ্র, সরল অসরল—সব রকম ব্যবহার চাই; তবে যদি নিজে stand করতে পার। আর এটাও জান যে, Self preservation is the best law of nature। আমাদের শাস্ত্রেও বলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আজকালকার ছেলে, ওদের কি আর বিশ্বাস আছে রে বাপ! ফস্ ক'রে হয় ত এক দিন কোত্থেকে এক বিয়ে করে আনবে। তার পর শ্বশুর আর শালার দল এসে বিষয়-সম্পত্তির চুল চিরে ভাগ আদায় ক'রে নেবে। তা হলেই আমাদের এত যে মতলব সব গেল—মাঠে মারা!

উদয় নন্দাকে ডাক দিল। নন্দা আসিলে কহিল, দেখে আয় ত, মেজ বাবু আর ছোট বাবু আছে কি না।

নগেন বাবু কহিলেন, দেখে আবার আসবে কি। যদি থাকে ত একেবারে ডেকে আনতে বল।

মিনিট পাঁচেক পরেই অরুণ ও তপন উপরে আসিল। অরুণের উদ্দেশে নগেন বাবু বলিয়া উঠিলেন, অরুণ, বাবা, তোমার কবিতাটা সে দিন পড়লুম। কি সুন্দরই যে আমার লাগলো! শুধু আমারই বা বলি কেন, যাঁরা যাঁরা সেখানে ছিলেন, প'ড়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সার্থক কলম ধরতে শিখেছিলে বাবা!

কোন্ কবিতাটার কথা বলেছেন, তালুই মশাই?

ঐ যে, যেটা 'দুর্ব্বাদলে' বেরিয়েছে।

ও:! 'নিশীথ রাতের পথিক বঁধু, আন্‌মনে কোথা যাও?'—ঐটের কথা বলছেন বোধ হয়?

হ্যাঁ—হ্যাঁ; ভারী চমৎকার! ভারী চমৎকার! ওর ষোল আনা beauty বোঝবার অবশ্য ক্ষমতা আমাদের নেই, কিন্তু যেটুকু আছে, তাতেই—। অতি সুন্দর!—অতি সুন্দর! তপন, বোসো বাবা; অরুণ, তুমিও বোসো।

অরুণ ও তপন বিছানার এক ধারে বসিলে নগেন বাবু কহিলেন, বাবা তপন, উদয় বাবাজী ত মনে মনে একটা মতলব ক'রে রেখেছে। তা আমি বলি, এ বুড়োর আবার মতামতের অপেক্ষা কি? তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর। আমার চপল-হিমু-অশ্রু যেমন তিনটি মা, তোমরাও আমার তিনটি বাবা। তা এ আবার আমায় জিজ্ঞাসা করা কেন?

তপন নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। অরুণ কহিল কি তালুই মশাই?

উদয়ই উত্তর দিল, দেখ অরুণ, কিছু দিন থেকে

আমার বড্ড ইচ্ছে হয়েছে, হিনুর সঙ্গে তপনের বিয়ে দি। হিনু সর্ব্বাংশেই সুন্দর মেয়ে। এর আর জানা শোনারও কিছু দরকার হবে না। তোমার মত, কি বল?

অরুণ কহিল, আমার আর মতামত কি, দাদা। আপনি যা ভাল বুঝবেন, তাই হবে।

নগেন বাবু বলিয়া উঠিলেন, বাঃ বাঃ, অরুণ ঠিকই বলেছে, উদয়। লক্ষ্মণ-ভাইকে তোমার, তুমি গেলে মতামত জিজ্ঞাসা করতে? তোমার যা সাধ হোয়েছে, তুমি যেটা ভাল বলে বুঝেছ, তাতে কি অরুণের অমত হবে, না তপনেরই হবে? ওরা কি তোমার আজকালকার ভাইয়ের মত, বাবা? অরুণ, তপন—তোমার দু'টুকরো হীরে; দাদার ওপর শ্রদ্ধা ভালবাসায় সে দুটি ঝল্‌মল্ করছে। জগদম্বা! শিবশম্ভু!—নগেন বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জোড়হাত মস্তকে স্পর্শ করিলেন। উদয় কহিল, তা'হলে আমার ইচ্ছা, বোশেখেই শুভকাজ সম্পন্ন হোক।

তপনের নিবিষ্ট চক্ষু দেওয়ালের ব্রাকেটটা হইতে রুক্মিণীহরণ ছবিখানার দিকে ফিরিল।

নগেন বাবু কহিলেন, হ্যাঁ; জষ্টিমাসে যদি আমি শিলং-ই যাই, তা হোলে আষাঢ়েও হয় ত ফিরতে পারব না। বোশেখে হলে একটু তাড়াতাড়ি হয় বটে, তা আর কি হবে। ইচ্ছে যখন হোয়েছে, তখন আর দেরী করেই বা ফল কি। তাই ভাবি যে, ভবিতব্যতার চাবি ঘোরানোর ভেতর মানুষের ইচ্ছার শক্তি কতটুকু! রাজসাহীর জমীদারবাড়ী থেকে হিনুর যে সম্বন্ধটা প্রায় পাকা হোয়ে এসেছিল, শেষে কেমন আমার যেন ভেতর থেকে একটা অনিচ্ছে হোল, তাদের জবাব দিয়ে দিলুম। রাইগড়ের সরকাররা রাজা বিশেষ লোক;—কি পেড়া-পিড়ী আমাকে! মনে করেছিলুম—দিয়ে দি, হিনু আমার রাজরাণী হবে। কিন্তু তা কি হবার জো আছে! বলে—'তুমি যা করাও দেব তাই করি হেথা······!'—আবার তাঁহার জোড় হাত মস্তক স্পর্শ করিল।

তপনের একাগ্র দৃষ্টি তখন ছবি হইতে দেওয়ালের টিক্‌টিকিটার উপর পড়িয়াছিল।

তিন

বেলা প্রায় নয়টার সময় পকেটের মধ্যে দুইখানা ঠিকুজী লইয়া তপন হন্ হন্ করিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিল। হাতীবাগানের মোড় ছাড়াইয়া সে তাহার গন্তব্য স্থানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সেখানে সম্মুখের দেওয়ালের গায়ে ঝোলান সাইন-বোর্ডখানিতে লেখা ছিল—জ্যোতিষী চন্দ্রকান্ত জ্যোতির্ভূষণ। তপন ভিতরে প্রবেশ করিয়া তক্তাপোষের একপাশে বসিল, কোঁচার অগ্রভাগ দিয়া কপালের ঘাম মুছিল, তার পর ঠিকুজী দুইখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া জ্যোতিষী চন্দ্রকান্তের হাতে দিয়া কহিল, এই দু'খানা একটু মিলিয়ে দেখে দিতে হবে।

ঠিকুজীর পাক খুলিতে খুলিতে জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় কহিলেন, কোন্ বিষয়ে দেখব বলুন?

অন্য কিছু দেখতে হবে না। খালি দেখে দেবেন যে, এই দু'জনের মধ্যে বিয়ে হতে পারে কি না।

ওঃ, যোটক-মিলন? তা' হলে বেশী নয়, দুটো টাকা পারিশ্রমিক দিলেই হবে।

পাছে কার্য্যশেষে বৃথা দর-দস্তর করিতে হয়, তজ্জন্য আগে হইতেই জ্যোতিষী মহাশয়, কথার পাকে পারিশ্রমিক সম্বন্ধে পাকা করিয়া রাখিলেন। কিন্তু তাহার কোন আবশ্যক ছিল না। তপন তখনই পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিতে গেল। তিনি কহিলেন, টাকা এখন রেখে দিন। কাল এমনি সময়ে আসবেন। আমি দেখে শুনে সব ঠিক ক'রে রেখে দেবো, কাল তখন টাকা দেবেন।

ঠিকুজী দুইখানা রাখিয়া দিয়া তপন চলিয়া গেল।

পরদিন ঠিক ঐ সময়ে তপন আসিলে জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় কহিলেন, এমন সুন্দর মিল প্রায়ই দেখা যায় না। রাজ-যোটক। এই বিবাহ যদি উভয়ের মধ্যে ঘটে, তা হোলে স্বামিস্ত্রীর চিরকাল সুখ, চিরকাল শান্তি, চিরকালই আনন্দ। এ বিবাহের ফলে সংসার, সোনার সংসার হবে।

ঠিকুজী দুইখানার একখানা তপনের, একখানা হেনার।

তপন পারিশ্রমিকের টাকা দুইটি দিয়া, ঠিকুজী দুইখানা পকেটে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বাহিরে আসিয়া, রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিল। রাজ-যোটকের কথায়

তাহার মনের উপর একটা সন্দেহের ধাক্কা আসিয়া লাগিয়াছিল। সাধারণভাবে মিল হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু—কিন্তু—একেবারেই রাজ-যোটক। এ বিবাহে সংসার, সোনার সংসার হবে? এই লইয়া নিজের মনে সে যতই চিন্তা করিতে লাগিল, চিন্তার রকমারি শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া ততই যেন তাহাকে চতুর্দ্দিক্ হইতে জড়াইতে লাগিল। হাতঘড়ীতে দেখিল, বেলা তখন দশটা বাজিয়া মিনিট কতক হইয়াছে। সে উত্তরমুখ ছাড়িয়া আবার দক্ষিণমুখে ফিরিল। সম্মুখেই একটা রেস্তোঁরা ছিল, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে কিছু খাইয়া লইল। তাহার পর কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিয়া আকাশ-পাতাল কি-সব ভাবিবার পর বাহিরে আসিল এবং বৌবাজারগামী এক বাসের মধ্যে উঠিয়া পড়িল।

হিদারাম বাড়ুয্যে লেনে তপনের এক বন্ধু ছিল। সেই বন্ধুর পিতা কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন প্রতিপত্তিশালী কাউন্সিলার। তপন বরাবর সেইখানে গেল। হরকালী বাবু তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, তপন যে, খবর কি? বিনয় ত কোলকাতায় নেই, আজ দিন পাঁচ ছয় হোল দেশে গিয়েছে। তপনের দরকার আজ তাঁহারই কাছে। সুতরাং বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া হরকালী বাবুকে কি-সব বলিল। হরকালী বাবু কহিলেন, তুমি স্নান-টান ক'রে খাওয়াদাওয়া কর। বারোটার পর আমি এইখান থেকেই ফোন্ ক'রে সব খবর আনিয়ে দেবো এখন। ব্যাপারটা কার হে?

তপন পরিষ্কার মিথ্যা বলিল, আমাদেরই এক আত্মীয়ের।

রেস্তোঁরা হইতে যদিও তপন ভাল করিয়াই খাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু বেলা বারোটা পর্য্যন্ত যখন এখানে অপেক্ষা করিতেই হইবে, তখন স্নান করিয়া দুইটি ভাত খাইয়া লওয়া মন্দ যুক্তি বলিয়া মনে করিল না। সুতরাং সে স্নানাহার করিয়া লইল।

যথাসময়ে হরকালী বাবু উপরের যে ঘরে তাঁহার ফোন থাকে, সেই ঘরে তপনকে লইয়া গেলেন ও তৎপরে ফোনের রিসিভার ধরিলেন। তাহার পর কলিকাতা কর্পোরেশনের বার্থ রেকর্ড আফিসে যাঁহার সহিত কথা কহিলেন, তাঁহার সহিত এইরূপ কথোপকথন হইল—

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী।

প্রশ্ন আসিল, ১৯২৬?

আরে না—না; ১৯২২—১৯২২—নাইনটীন টোয়েন্‌টীটু।

নাইনটীন টোয়েন্‌টী টু? কোন্ তারিখ বলুন।

এগারোই ফেব্রুয়ারী। এগারোই—ইলেভেন্থ। অর্থাৎ ঐ তারিখে জন্ম, ওর পরের তারিখ থেকে দেখে যাও, কবে 'এণ্ট্রি' আছে।

আচ্ছা ধ'রে থাকুন, দেখছি।

খানিকক্ষণ পরে আবার এইরূপ কথা চলিল—

পাচ্ছি না, হরকালী বাবু।

পাচ্ছি না, মানে?

ঐ তারিখ থেকে সমস্ত ফেব্রুয়ারী মাস দেখে গেলুম। ৩২।৫ নং হাজরা রোডের নগেন্দ্রনাথ মিত্রের কোন কন্যার বার্থ রেজেষ্ট্রি নেই।

নেই?

না।

আচ্ছা, পয়লা থেকে এগারোই পর্য্যন্ত দেখে যাও দেখি।

খানিক পরে উত্তর আসিল, পাওয়া গেছে।

কার?

৩২।৫ হাজরা রোড, নগেন্দ্রনাথ মিত্র। ৮ই তারিখে 'এনট্রি' আছে।

জন্ম কোন্ তারিখে?

৫ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার, রাত দুটো দশ মিনিট।

ছেলে, না মেয়ে?

মেয়ে।

অল্ রাইট—থ্যাঙ্ক ইউ। তোমরা সব ভাল আছ ত?

চ'লে যাচ্ছে এক রকম।

আচ্ছা—গুড্‌বাই।

গুড্‌বাই।

তপনের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, তা হোলে ঠিকুজীখানা সুন্দর জাল করা হোয়েছে! কোরে, আমার সঙ্গে রাজ-যোটক করে দেওয়া হোয়েছে! উঃ!—সে পকেট হইতে ফাউণ্টেনপেন ও হেনার ঠিকুজীখানা বাহির করিল এবং যেখানে 'এগারোই ফেব্রুয়ারী সোমবার' লেখা ছিল, সেইখানটা কাটিয়া লিখিল—'৫ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার'। তাহার পর বেলা ৩টা পর্য্যন্ত হরকালী বাবুর বাটীতে কাটাইয়া, বাটী ফিরিবার পথে সে আবার সেই চন্দ্রকান্ত জ্যোতিষীর কাছে আসিল

এবং তাহার হাতে দুইটা টাকা দিয়া কহিল, দেখুন, মেয়েটির জন্মতারিখে একটা ভুল ছিল, আমি সংশোধন ক'রে এনেছি। যতক্ষণ আমায় বসে থাকতে হয় থাকবো এখন, কিন্তু দয়া ক'রে এখনি এটা দেখে দিতে হবে।

তখন জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় নূতন জন্মতারিখ ও সময় লইয়া পঞ্জিকা দেখিয়া, নূতন রাশিচক্র প্রস্তুত করিলেন এবং ছক কাটিয়া কন্যার রাশি, লগ্ন, গণ, নক্ষত্র, তিথি, প্রভৃতি মিলাইয়া গণনায় মনোনিবেশ করিলেন। তপন চুপ করিয়া এক ধারে বসিয়া রহিল।

* * *

সন্ধ্যার ঠিক পরেই, অশ্রু যখন তাহার ঘরের মেজেতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া অরুণের পেন্সিল দিয়া লেখার উপর কালি দিয়া বুলাইতেছিল, সেই সময় শশব্যস্তে তপন ঘরে ঢুকিয়া কহিল, কি হচ্ছে মেজবৌদি?

এই ভাই, দাগা বুলোচ্ছি।

ও সব এখন রাখ,—এই নাও। বলিয়া তপন তাহার পায়ের কাছে হেনার ঠিকুজীখানা অশ্রদ্ধার সহিত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। অশ্রু তাহা তুলিয়া লইয়া কহিল, বুলোতে হবে না কি, ঠাকুরপো?

সব মিথ্যা, মেজবৌদি, সব মিথ্যা। জাল ঠিকুজী।

কার ঠিকুজী, ঠাকুরপো?

বিরক্তির স্বরে তপন কহিল, আরে ঐ হেনার—হেনার। আমার জন্ম-নক্ষত্রের সঙ্গে মিল খাইয়ে পরিপাটীরূপে ঠিকুজীখানি তৈরী করা হোয়েছে। সুতরাং একেবারেই রাজ-যোটক। রাজযোটক মানে বোঝ ত, মেজবউদি?

তা আর বুঝি না?

কি বল ত?

এই মনে কর, তুমি হবে রাজা—হেনা হবে রাণী; তুমি হার্মোনিয়ম ধরবে—হেনা গান গাইবে; তুমি কবিতার এক লাইন লিখবে—হেনা আর এক লাইন লিখে সেটা মিলিয়ে দেবে; অর্থাৎ তপন আর হেনা যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল, একেবারেই অভিন্ন। তপন স্বর্ণরশ্মি ছড়িয়ে যেই আকাশে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে বুকভরা মধু আর গন্ধ নিয়ে অমনি হেনা রাণী—

সহসা হাসিয়া উঠিয়া তপন কহিল, অস্ত যাবে; অর্থাৎ কিনা—চক্ষু মুদবে। অর্থাৎ একেবারে বিপরীত। এইটিই ঠিক, মেজবৌদি এইটিই ঠিক। একেবারে ঘোর অমিল। আমি সব দেখিয়ে এসেছি। আমার যা গণ আর রাশি, ওর হ'ল ঠিক তার বিরুদ্ধ। যাক, ধ'রে ফেলেছি সব! কিন্তু এ সব যে কেন, তা ত বুঝতে পারি না। মেজদা এলে সব বোলো। আমিও সব বোলবো এখন; বলিয়া তপন চলিয়া গেল।

খানিক পরে অত্যন্ত শশব্যস্তে অরুণ ঘরে ঢুকিয়াই টেবলের উপর হইতে কলমটা লইয়া তাহার কাগজ-পত্র ঘাঁটিতে লাগিল। অশ্রু জিজ্ঞাসা করিল, কি গো, ব্যাপার কি? আবার কোথাও বেরুবে না কি?

না গো; ভয়ানক মিল মনে পড়ে গেছে। বিকেলে তখন অত ক'রে ভাবলুম, কিছুতেই ত হোল না, এইবার সুন্দর মিলিয়ে ফেলেছি। বলিয়া একখণ্ড কাগজে চারি ছত্র কবিতা লিখিয়া বলিল, শোন:—

উৎসবেরই উল্লাসেতে
কমলরাণী নয়ন খোলে তা'র;
তা'রই বুকের গন্ধে ভরা
ছন্দে গাঁথা ক্ষুদ্র উপহার।

অশ্রু কহিল, তা' ত মিললো, কিন্তু এদিকে যে ভয়ানক গরমিল!

কিসের?

এই ঠিকুজীর।

অশ্রুর নিকট সমস্ত শুনিয়া অরুণ কহিল, ননসেন্স! বাবার ঠিকুজী ঠিকুজী যে একটা 'হবি' ছিল, তপনেরও দেখছি তাই। আরে, ও সবের কোন সত্যিকার 'ভ্যালু' আছে? ঐ রাক্ষসগণ, শনির দশা মেয়েকে আমায় দিক না, আমি অম্লানবদনে—

খেয়ে ফেলবে?

আরে, বিয়ে করব!—হঠাৎ কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই অরুণ মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইল।

দুই চোখ কপালে তুলিয়া, স্বামীর মুখের দিকে অতিমাত্রায় বিস্ময়াবিষ্টের মত চাহিয়া থাকিয়া অশ্রু কহিল, বিয়ে করবে? সে কি! আমাকে ত বিয়ে করেছ, আবার বিয়ে করবে কি রকম? এ কি বলছ তুমি? হ্যাঁ গা?

যাও! তোমার খালি ফাজলামী!—সত্যি, কবিতাটা বড় চমৎকার মিলে গেল।

তারই বুকের গন্ধে ভরা
ছন্দে গাঁথা ক্ষুদ্র উপহার।

গন্ধ আর ছন্দ—সুন্দর হোয়েছে।

অশ্রু কহিল, তা ওতে আর এমন বিশেষ মাথা ঘামানোর কি আছে? ছন্দ আর গন্ধ—আমি ও রকম কত মিলিয়ে দিতে পারি,—সন্ধ্যা, কন্ধকাটা, সকরকন্দ, মকরন্দ, বন্দেমিঞা, নন্দরাণী, কুন্দ—

খুব হোয়েছে; এখন আমার জন্যে চা এক কাপ নিয়ে এস দেখি। বলিয়া অরুণ জানালার ধারের চেয়ার খানাতে গিয়া বসিল। আকাশের মাঝখানে তখন বড় এক ফালি চাঁদ উঠিয়া গঙ্গার জলে, ঘাটে, ঘাটের পাশে নিমগাছের মাথায় তাহার স্নিগ্ধ আলোক ছড়াইতে সুরু করিয়াছিল।

রাত্রে উদয় অফিস হইতে গৃহে ফিরিলে, চপলা তাহাকে বাঁ হাতের বুড়া আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল, 'সকলি গরল ভেল!'

উদয় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, অর্থাৎ?

অর্থাৎ—তোমরা মনে কর, তোমরাই খুব চালাক, কিন্তু ছোট্ট ঠাকুরপো তোমাদের দশ বার করে বেচে আসতে পারে। বলিয়া চপলা ঠিকুজীঘটিত ব্যাপারটার বর্ণনা করিল। সমস্ত শুনিয়া উদয় কহিল, উঃ! এতটা যে দাঁড়াবে, সেটা ভাবতেই পারি নি। ও যে 'বার্থ রেজেষ্ট্রী' খুঁজে—

ইহার খানিক পরেই তপন ক্লাব হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিল এবং উপরে চেঁচামেচি শুনিতে পাইয়া অরুণের ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি, মেজদা?

অরুণ কহিল, হেনার ঠিকুজীর ব্যাপার শুনে বড়দা তালুই মশায়ের ওপর সাংঘাতিক রেগে গেছেন; তাঁকে যাচ্ছেতাই সব বলছেন।

উদয় চপলাকে শুনাইয়া তখনো ডাক-হাঁক করিতেছিল,—এ সব হোল অত্যন্ত নীচতা। উনি বুড়ো হোয়েছেন, কিন্তু লোভের বশবর্ত্তী হোয়ে এই রকম একটা যাচ্ছেতাই কাজ করিতে ওঁর কিছুমাত্র বাধলো না। তোমায় ব'লে রাখছি, খবরদার, উনি এ বাড়ীতে যেন আর না আসেন। অবিশ্যি এ ব্যাপারে ওঁর নিজের কোন দোষ আছে কি না বুঝতে পাচ্ছি না। না-ও হয় ত থাকতে পারে। কিন্তু থাকে যদি, তা হ'লে ভয়ানক সাংঘাতিক কাজ,—এমন কাজ হাড়ী-বাগ্দীতেও করতে পারে না।

দাদাকে শান্ত করিতে অরুণ ও তপন দু'জনেই উপরে আসিল। অরুণ কহিল, যা হ'বার হোয়ে গেছে, আপনি আর মেজাজ খারাপ করবেন না।

উদয়ের রুদ্রমূর্ত্তি। উদয় কহিল, না—না অরুণ, ব্যাপারটা সোজা নয়। সামান্য একটু স্বার্থের লোভে এত বড় একটা ঘৃণিত কাজ, সত্যিই যদি উনি ক'রে থাকেন—তা হোলে কি ক'রে তা করতে পারলেন, আমি শুধু তাই ভাবছি। যাই হোক, এ বাড়ীতে ওঁর আর না আসাই বোধ হয় ভাল।—তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিবার পর আবার কহিল, অবশ্য অনেক দিকে এ সংসারের অনেক উপকারও ওঁর দ্বারা হোয়েছে, কিন্তু এ কাজটা—

যাহা হউক, খানিক পরে উদয় শান্ত হইল।

অনেক রাত্রে ফিস্ ফিস্ করিয়া উদয় চপলাকে কহিল, কাল আফিস থেকে বরাবর হাজরা রোডে যাব। বাবাকে সংবাদটা দিয়ে একটা পরামর্শ ক'রে আসতে হবে। তোমাদের জানিয়ে যাবো, যে আফিসের কাজে হুগলী যেতে হবে; বুঝলে?

বুঝলুম বই কি; এখন ঘুমোও। পা টিপে দেবো কি?

পুণ্য সঞ্চয় করতে চাও, দাও; কিন্তু দরকার নেই।

তথাপি চপলা উঠিয়া বসিয়া উদয়ের পা দু'খানা আপন কোলের উপর তুলিয়া লইল।

চার

তাই না কি?

আজ্ঞে—হ্যাঁ।

এমন ভাবে যে এটা ফাঁস হোয়ে যাবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

আমিও ত তাই।

হাজরা রোডে নগেনবাবুর গৃহে বসিয়া রাত্রে উদয় ও নগেন বাবুর মধ্যে কথা হইতেছিল। খানিকক্ষণ উভয়েরই নির্ব্বাক অবস্থায় কাটিলে, নগেন বাবু কহিলেন, তা আমার ওপর রেগে যে-সব কথা যেমন ভাবে বোলেছ, ঠিকই হোয়েছে। এর

ভেতর কোথাও তোমার একটুও ভুলচুক হয়নি। ঠিকই করেছ। বরং ও-রকমটা না করলে কাজে দোষ হোয়ে যেত। কিন্তু আমাকে তা হ'লে ত কালই তোমার ওখানে যেতেই হয়।

আপনার এ-সময় যাওয়াটা কি—

বিশেষ দরকার। অর্থাৎ যে দোষটা আমার ঘাড়ে এসে পড়ছে, সেটা কাটাতে হবে ত? নইলে পরে আর ত ও-বাড়ীতে আমার ঢোকাই যেতে পারে না কি না। বুঝলে না?

বুঝেছি।

না; বোধ হয় ঠিক বোঝনি। দোষ যে হোয়েছে, সেটা ধরে ফেলেছে; কিন্তু দোষী হয়ে থাকলে ত চলবে না। দোষটা অবশ্য একজনের ঘাড়ে ফেলতেই হবে। আমার ঘাড়ে নিয়ে ব'সে থাকলে সব কাজই পণ্ড হবে। সুতরাং ভবানীর ওপর ওটা চাপাতে হবে। বুঝতে পারলে? তা হোলে ভবানীকে একটু গড়ে-পিটে রাখার দরকার।

উদয় কহিল, তা হোলে তপাটার অন্য কোথাও বিয়ের চেষ্টা-ফেষ্টাও আর ক'রে কাজ নেই।

না। বিয়ের কথা আর মনেই ভেবো না। এইবার একেবারে সোজাসুজি কামান দাগা যাক। ওর অংশের তিন চারখানা বাড়ীর দাম, আজকালকার বাজারে প্রায় লাখের কাছাকাছি। এটা টেনে আনতেই হবে, উদয়। অরুণ কবিতায় মসগুল, ওর জন্যে আমার কোন চিন্তা নেই। এইটেকে নিয়েই—একটু ভোগাভূগি করতে হবে।

নগেন বাবুর শ্যালক ভবানীচরণ চিরকাল ভগিনীপতির আশ্রয়েই থাকিত। ভবানী দরজার সম্মুখে আসিয়া ইহাদের ডাকিয়া কহিল, তোমাদের খাবার দেওয়া হোয়েছে যে, এস উদয়।

নগেন বাবু কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইয়াই পড়িয়াছিলেন। সহসা গা-ঝাড়া দিয়া যেন সেই চিন্তারাশিকে ফেলিয়া দিলেন; কহিলেন দেখ উদয়, চিরকাল মহেশপুরের বড়াল বাবুদের নায়েবী ক'রে এসেছি। মাইনে যা পেতুম, তাতে ক'রে কোন রকমে কটা পেট না হয় চলতে পারত। কিন্তু এই যে আজ কোলকাতার ভেতর বাড়ী একখানা, তোমার শ্বাশুড়ীর গায়ে এক-গা গয়না, যা হোক দু'চার হাজার নগদও করিছি,—এ সব খালি একটুখানি বুদ্ধি আর তার. সঙ্গে একটু যত্ন, একটু চেষ্টা। চপলার আজ না হয় সন্তানাদি হয়নি, কিন্তু হওয়াই ত সম্ভব; আর হবেও। সুতরাং আজকালকার দিনে পয়সাটার বাবাজী, বড়ই দরকার। অল্প আয়ে সংসার প্রতিপালন করার মত দুঃখু আর কিছু নেই জানবে। পয়সাটা একটু বেশী রকম থাকা দরকার। ভেবেছিলুম, দুই বোন যদি এক ঘরেতে পড়ে, তা হলে সম্পত্তিটা ফাঁক হোয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে না, মিলে-মিশে এক রকমে চলে যাবে। তা যখন হোল না, তখন—

হেনা ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সে সে-দিন নগেন বাবুর সহিত এ বাড়ীতে চলিয়া আসিয়াছিল। হেনা কহিল, তোমরা খাবে চল; কখন্ যে তোমাদের খাবার দেওয়া হয়েছে।

সে রাত্রে যে উদয় বরানগরে ফিরিবে না, তাহা চপলাকে সে বলিয়াই আসিয়াছিল। আহারাদির পর রাত্রে শয্যায় শুইয়া উদয় নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল;—ঠাকুরদাদা অনেক টাকাই রেখে গেছলেন। সেই সব টাকাটা আজ থাকলে ভাবনা ছিল কি? বাবা তার অর্দ্ধেক দিলেন উড়িয়ে। বাকী অর্দ্ধেকের আবার তিন ভাগ! যেমন হতভাগা দেশ, তেমনি হতভাগা তার আইন। বড় ছেলে পিতৃধনের পুরো অধিকারী হওয়া, এটা যে কি সুন্দর নিয়ম, তা আর বলবার নয়! এই ভাগা-ভাগির আইনে, দেশের চাষ-বাসেরও তেমনি দুরবস্থা ঘটেছে। বড় একখানা ক্ষেত আর দেখতে পাবারই উপায় নেই। দু'পুরুষ আগে যে ধান-জমিখানা হয়ত পাঁচ বিঘে ছিল, দু'পুরুষ পরে, ক্রমাগত ভাগের ফলে, বিশ টুকরো হয়ে, এখন এক জনের ভাগে পাঁচ কাঠা ক'রে পড়েছে। এর পর হয়ত আবার তার আড়াই কাঠা কি পাঁচ ছটাক ক'রে আয়তন হোয়ে চারিদিকে আল দিয়ে ঘেরা হবে। সুতরাং সেইটুকুর ভেতর লাঙ্গলই বা চলে কি ক'রে আর তার চাষই বা হয় কি ক'রে। দশখানা বাড়ী—এ যদি আমারই শুধু থাকতো, তা হোলে কি চমৎকারই হোত! তা না হোয়ে—ননসেন্স! যাক; দেখি কতদূর কি করতে পারি। চপলা—চপলা—চপলাকে অভাবের মাঝখানে ফেলে কিছুতেই যাব না। সমস্ত সম্পত্তির ওপর ওকে আমি রাণী ক'রে বসিয়ে তবে ছাড়বো। এর জন্যে আমার সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে হবে। চাই—চপলার সুখ, চপলার স্বাচ্ছন্দ্য; নচেৎ আমি মরতেও পারব না।

এইরূপ নানা চিন্তায় উদয়ের ঘুম আসিল না। নিশীথের নিস্তব্ধতাকে নাড়া দিয়া, দালানের ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া যখন দুইটা বাজিয়া গেল, তখন পাশের বালিসটাকে বুকে চাপিয়া উদয় পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঠিক সেই সময়ে বরানগরের বাড়ীতে তাহার শয়ন-ঘরের দ্বার খুলিয়া সন্তর্পণে চপলা বাহিরের দিকের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। নীচে হইতে একটা ঘোরানো সিঁড়ি এই বারান্দায় আসিয়া মিশিয়াছিল। চপলা ধীরে ধীরে সেই সিঁড়ি বাহিয়া নীচে যেখানে নামিয়া আসিল, সে যায়গাটা এই বাড়ীর উত্তরদিকস্থ খানিকটা ফাঁকা জমী। এইখানে প্রকাণ্ড একটা আঁশফলগাছ ছিল। চপলা এক পা এক পা করিয়া সেই আঁশফলগাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিহিত নীলাম্বরী শাড়ীখানি নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়ার সহিত মিশিয়া যাওয়াতে শুধু তাহার সুন্দর মুখখানাই, অন্ধকারে চাঁদের মত অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল। অতি মৃদুকণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করিয়া চপলা কহিল, এলে যে বড়? উঃ, কি কঠিন তুমি!

তখন দেখা গেল, অন্ধকারের মধ্যে আর একটি দেহ নড়িয়া উঠিল। সে কহিল, কঠিন—আমি না তুমি, চপল? চিঠিতে লিখেছিলে, রাত দুটোর সময় এখানে আসবে, আমি দেড়টা থেকেই এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি। এই তোমার চিঠি।

তা আমার ওপর খুবই রাগ করেছ ত?

তোমার ওপর আমার রাগ করবার কি অধিকার বল?

তোমার জিনিষে তোমার অধিকার থাকবে না ত থাকবে কার? এই নাও—ধর। বলিয়া চপলা একতাড়া নোট সেই লোকটার হাতে দিল। কহিল, এক'শ। আবার জোগাড় করতে পারলে দোবো। বল, আমার ওপর রাগ নেই?

তোমার ওপর কি রাগ হয়? তবে ভয় হয় বটে। কেন না, চপলা ত, কখন্ আছে কখন্ নেই।

আমি চপলা বটে, কিন্তু তোমার কাছে আমি স্থির-সৌদামিনী। যত দিন পায়ে রাখবে, তত দিন যে আমি তোমারই প্রিয়তম।

এই লোকটিই নিকুঞ্জ—গানের মাষ্টার রমেশ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র। বয়স ২৭।২৮ হইবে। এই জমিটার সংলগ্ন উত্তরেই তাহাদের বাড়ী। আঁশফল গাছ হইতে হাত দশ পনর দূরে তাহার বাহিরের ঘরখানির দরজা খোলাই ছিল। চপলার হাত ধরিয়া সে কহিল, কে দেখতে পাবে, ঘরের ভেতর চল।

তখন উভয়ে সম্মুখের সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

পরক্ষণেই মালকোঁচা বাঁধা দুই জন ইতর শ্রেণীর লোক, পা টিপিয়া টিপিয়া গঙ্গার দিক হইতে সেই আঁশফল গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। একজন যেন একটু বিরক্ত হইয়া অপর জনকে কহিল, ন'কড়ি দা, আজ আদ্ধেক ভাগ না দিলে আমি ঢুকবো না, এ কথা তোমায় আগে থাকতেই কিন্তু ব'লে রাখছি। চুরি করব অথচ না খেয়ে মরব, সেটি আর হ'চ্ছে না।

ন'কড়ি কহিল, আদ্ধেক না ভাই; আজকের উপায়ের দশ-ছয় ভাগ হ'বে'খন। দশ আনা আমার, ছ আনা তোর।

না ন'কড়ি দা, আজকে আধা-আধি করতেই হবে। তিন চার দিন থেকে ঘরে একমুঠো চাল নেই। তার ওপর বৌটার কঠিন ব্যামো। হাঁসপাতালের অষুধে সে আর বুঝি বাঁচে না। কবে হয়ত টপ ক'রে একদিন মারা পড়ে! আজ আমার আদ্ধেক ভাগ চাই-ই।

জানি, তোর গোঁ—শূয়োরের গোঁ। তা আদ্ধেকই পাবি এখন, চ'। কাগজখানা কি পড়ে রে? দেখ. দেখ,—নোট-ফোট নয় ত?

কিছু পরেই নিকুঞ্জর বাটীর পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া উভয়ে সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করিল।

পাঁচ

সন্ধ্যার পর উদয়ের ঘরে সভা বসিয়াছিল। উপস্থিত ছিল নগেন বাবু, উদয়, অরুণ এবং তপন। আর বাহিরের বারান্দার এক ধারে অন্ধকারের মধ্যে কাণ খাড়া করিয়া বসিয়াছিল—চপলা।

নগেন বাবু কহিলেন, ব্যাপারটা তুচ্ছ করবার মত নয়, অরুণ। নিজেদের ঘরে ঘরে বলেই আমরা জানতে পারলুম যে, এতে কা'রো intentionally কোন দোষ নেই, পাকে-প্রকারে এই অঘটনটা ঘটে গিয়েছে। কিন্তু অন্য কা'রো সঙ্গে ঠিক যদি এই caseটা হোত, তা হলে ত তারা এ-সব কিছু বুঝতও না, বুঝতে চাইতও না। তারা ঠিকই

মনে করত যে, কোন রকমে বিয়েটা ঘটাবার মৎলবেই ঠিকুজীখানা জাল ক'রে তৈরী করা হয়েছে। ভবানীকে দিয়ে যখনই যে কাজই আমি করেছি, কিছু না কিছু গলদ ও ক'রে বসেছে। ওটা একেবারেই অকর্ম্মণ্যের একশেষ।

অরুণ কহিল, না তালুই মশাই, ভবানীমামার মত লোক আজকাল খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। আমি ত ওঁর সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলাপ ক'রে দেখেছি।

আহা-হা, সেটা আমিও ত অস্বীকার করি না, বাবা। ওর গুণ অনেক, কিন্তু ওর দোষও যে কম নয়। এই দেখ না কেন, সে সময় আমার বেশ মনে পড়ছে, শরীরটা আমার বড়ই অসুস্থ, ওকেই বললুম—তোর ভাগ্নীর জন্মটা লিখিয়ে আয়। দু'ক্রোশ নয়, দশ ক্রোশ নয়, ঐ হাজরা রোডেই ক'খানা বাড়ীর পরই কর্পোরেশনের আফিস। এ আর কতক্ষণের কাজ? তখনই গিয়ে তুই লিখিয়ে দিয়ে এলেই ত হাঙ্গামা মিটে যেত। তা নয়, তুই নিজে যেতে পারলি না, আর এক জনকে মারফৎ ক'রে পাঠালি। তার পর সে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপিয়ে এল। মেয়ে জন্মালো এগারোই, সে লিখিয়ে এলো পাঁচই! অথচ—

তপন কহিল, কিন্তু যিনি লিখিয়ে এসেছিলেন, তিনি আট তারিখেই লিখিয়ে এসেছিলেন। ওদের রেজিষ্টারে ৮ তারিখে entry আছে। ১১ই জন্মালে ৮ তারিখে কি ক'রে—

কি সব একাকার কাণ্ড করেছে, বাবা, কিছুই জানি না। শুনবে ওর আর এক কাণ্ড। হাসতে হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবে। বছর তিন চারের কথা হবে। ভবানীপুরে আমার এক বন্ধুর বাড়ী। তার মেয়েটির নাম তুলসী। আমি ওকে বললুম, ওরে ভবানী, তুলসীর জন্মদিন কাল; সকলকে নেমন্তন্ন ক'রে গেছে; তোকে যেতে হবে। ও ত সব কথা ভাল ক'রে কাণ দিয়ে শোনে না। আমি বললুম, বুঝতে পেরেছিস ত', যেতে পারবি কি? ও তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে উঠতে বললে, পারবো—পারবো। তার পরদিন বেলা ১০।১১টার সময় ওর শ্বশুরবাড়ী থেকে একটি দল এসে হাজির। ও বাড়ীশুদ্ধ সকলকে তাদের নেমন্তন্ন ক'রে এসেছে।

তপন কহিল, মন্দ নয়। তার পর কি হ'ল, তালুই-মশাই?

খুবই হ'ল। গোটা কুড়ি টাকা খরচ আর সারাদিন ধ'রে রান্না-বাড়া, আর খাটা-খাটুনির একশেষ। হয়েছে কি জান,—ওর শালারও নাম তুলসী। ও আমার কথাটা ভাল ক'রে না শুনেই চলে গেছে সন্ধ্যার পর একেবারে ওর শ্বশুরবাড়ী দর্জ্জিপাড়া। সেখানে গিয়ে সকলকে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছে! তারা জিজ্ঞাসা করেছে, কিসের উপলক্ষ? ও বলেছে দাদার জন্মদিন।

অরুণ ও তপন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নগেন বাবু কহিলেন, তাই ত বলছিলুম যে, ও সেই ছোটবেলা থেকে আমার কাছে যেমন আছে, ওর দ্বারা দুর্ভোগও কি আমাকে কম ভুগতে হয়েছে! এই যে ব্যাপারটা,—বাইরের কারো সঙ্গে হ'লে, কতদূর লজ্জায় পড়তে হ'ত বল দেখি? —হ্যাঁ, ভাল কথা; সেই তুলসী মেয়েটির এই ২৬শে বোশেখ বিয়ে। অরুণ, বাবা, তোমাকে একটু ব্যাগার খেটে দিতে হবে। মনে করবে, আমারই কাজ।

কি কাজ, তালুই-মশাই?

ঐ তুলসীর পিসীমা, তুলসীর বিয়েতে তাকে যেন আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছে, এই হিসেবে একটি কবিতা, বাবাজী, লিখে দিতে হবে। আমাকে বড্ডই ধরেছে। কবিতা একটা ত অনেকেরই কাছ থেকে লিখিয়ে নিতে পারা যায়; কিন্তু ওদের ইচ্ছেটা, তোমার হাতের লেখা একটা যদি পায়। আমি বলেছি, তা সে যত বড়ই কবি হোক, আমারই ত সে ছেলে গো, তার জন্যে আর ভাবনাটা কি? কলমটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বোলবো—'দে ত' বাবা লিখে'।—তা বাবাজী, দু'এক দিনের ভেতরেই এটি দিতে হবে কিন্তু। ছেলের নাম—কানাই, আর মেয়ের নাম ঐ তুলসী। মনে থাকবে ত' বাবা?

অতঃপর সভা কিছুক্ষণের জন্য নীরব রহিল। তার পর তপন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, আপনার চা খাওয়া হয় নি, তালুইমশাই?

কি ক'রে হবে, বাবা! বুড়োর ওপর আমার কোন ছেলেরই ত' টান নেই! আমার অশ্রু-মা কি চপলা-মা জানতে পারলে, এতক্ষণ চা এসে পড়তো, মিষ্টি কিছু এসে পড়তো। তবু বাবা তুমি যে মনে ক'রে বলেছ—Thousands and thousands thanks to you, বলিয়া হাসিতে হাসিতে নগেন বাবু তপনের পিঠ চাপড়াইয়া

কহিলেন, হ্যাঁ গো বাবাজী, রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন বল ত'?

কই তালুইমশাই, চেহারা ত আমার খুব ভালই রয়েছে।

নেই বাবা—নেই। পেট ভ'রে খাও, না কি কর?

তপন হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দরজার কাছে গেল এবং বড়বৌদিদির উদ্দেশে হাঁকিয়া চায়ের জন্য বলিয়া দিল।

সহসা সেই সময় উদয় উঠিয়া আলমারীর ভিতর হইতে একজোড়া বেনারসী শাড়ী বাহির করিয়া আনিল এবং শ্বশুর মহাশয়ের হাতে দিয়া কহিল, দেখুন দেখি, কাপড় দু'খানা কি রকম হবে।

কাপড় দেখিতে দেখিতে নগেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিনবে—না কিনেছ? খাসা কাপড়!

উদয় কহিল, মরিস সাহেবের কোন একটা কাজে মাস দুই আমি একটু খেটে-খুটে সাহায্য করেছিলাম। সাহেব সেদিন একখানা আড়াই শো টাকার চেক পাঠিয়ে, তার সঙ্গে এক চিঠি দিয়ে লিখেছে,—A present to Mrs Bose। আমি ভাবলুম, এটা ত হঠাৎ আমাদের একটা উপরি পাওনা। তাই মেজবউমার জন্যে একখানা আর ওদের জন্যে একখানা কিনে ফেললুম। আর তপুকে নগদ টাকা দিয়ে দেবো, ওর যা ইচ্ছে তাই কিনবে এখন—কাপড় দু'খানা কেমন দেখছেন?

কাপড়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া নগেন বাবু কহিলেন, খুব সুন্দর কাপড়। দামও এক-একখানার শ'য়ের ওপরেই নিয়েছে বোধ হয়?

— সাতাশী করে—১৭৪টাকা। বাকী ৭৬ টাকা তপুর জন্যে আছে। কাল সকালে মনে ক'রে ওটা তপু তুমি চেয়ে নিও; বুঝলে?

সেই সময়ে একখানি ট্রেতে করিয়া চা ও জলখাবার লইয়া অশ্রু এ ঘরে প্রবেশ করিল। মাথায় তাহার একগলা ঘোমটা। নগেন বাবু কহিলেন, ওরে আমার মেজ-মা আজ চা করেছেন, আজকের চা অমৃতের মত লাগবে। আজ আমায় দু'কাপ দিও, মা।

অতঃপর চা খাইতে খাইতে নানা বিষয়েব টুকরা আলোচনা চলিতে লাগিল—এইবার হাবসীরা আর পারে না বোধ হয়; ইটালীকে কিন্তু নাস্তানাবুদ হ'তে হয়েছে; মশা থেকেই যে ম্যালেরিয়া, তা শুধু নয়; 'উদুরি-ভাদুরি-যক্ষা, তিনে নেই রক্ষা'—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

তাহার পর নগেন বাবু চলিয়া গেলেন, অরুণ ও তপন নীচে নামিয়া গেল, উদয়ের খাবার আসিলে উদয় খাইয়া লইল। নন্দা চাকর গড়গড়ায় তামাক দিয়া গেল। তখন চপলা নীচে হইতে খাইয়া আসিয়া, পাণ চিবাইতে চিবাইতে উদয়ের পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া কহিল, মাথার কাঁচা চুল তুলে দেবো?

তামাক টানিতে টানিতে উদয় কহিল, আমিই তোমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম।

কি? আমার মাথার কাঁচাচুল তুলে দেবে কি না?

হ্যাঁ।

একরাশ এলো চুল নাড়িতে নাড়িতে চপলা কহিল, তা দিতে পার, কিন্তু এই এত চুল কত দিন ধ'রে তুলবে? তার চেয়ে ক্ষুর দিয়ে নেড়া ক'রে দাও না; আর ভাঁড়ার ঘবে ঘোলও আছে, কুলোও আছে।

অর্থাৎ—নেড়া মাথায় ঘোল ঢেলে, শেষে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় ক'রে দেবো?

হ্যাঁ।

তার পর আমার দশা কি হবে; বনে যাব?

বালাই! আবার আর একটা বিয়ে ক'রে ফেলবে।

ক'নে পাব কোথা?

বাঙ্গালা দেশে আবার ক'নের অভাব? বিশেষ তোমার ধনসম্পত্তির টানে কত বাপ মেয়ে নিয়ে এসে হাজির হবে। তার পর—এই টানা-টানির বাজারে পুরুতেরও অভাব নেই আর মন্ত্রেরও অভাব নেই। সুতরাং তোমার মত বেটাছেলের বিয়ের আবার ভাবনা?

চপলার আঘাতটার দিকে মনোযোগ না দিয়া উদয় কহিল, কিন্তু আমার ত যে-সে ক'নে হ'লে চলবে না! আমার যে চাই--চপলা, অর্থাৎ এই —তুমি। বলিয়া উদয় চপলার মুখখানাকে নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া চুম্বন করিল। চপলা হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, ও মা, কি ঘেন্নার কথা, ছি! ছি! এক পেট খেয়ে এখুনি আবার চুমো খাওয়া!

সাধ ক'রে খাওয়া না কি পরীক্ষার জন্যে

খাওয়া। চুমো খাওয়ার একখানা বই লিখছি কি না—তাই।

তা হ'লে তুমি তামাক খেতে খেতে পরীক্ষা কর, আমি বিছানায় গিয়ে দেহরক্ষা করি, কারণ, নিদ্রা এসে চোখের আগড় বন্ধ করবার চেষ্টা করছে। বলিয়া চপলা শয্যায় গিয়া শয়ন করিল।

পরদিন সকালবেলা নূতন-কেনা শাড়ী দুইখানার একখানা হাতে করিয়া চপলা নীচে নামিয়া আসিল ও বরাবর মেজবউয়ের ঘরে প্রবেশ করিল। অশ্রু তখন একলাটি চুপ করিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। চপলা কহিল, কি লো, তুইও যে দেখছি ঠাকুরপোর গায়ের বাতাস পেয়ে শেষকালে কবি হয়ে উঠবি।

অশ্রু তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল, উঠব কি দিদি, হয়ে উঠেছি। গঙ্গার ঢেউ, চলন্ত মেঘ, তার সঙ্গে চাঁদের লুকোচুরি—এ সবের ভেতর আগে আমি অন্য বিশেষ কিছু দেখতে পেতুম না,—

এখন তা হ'লে কিছু পা'স না কি?

হ্যাঁ দিদি; এখন এদের ভেতর আমি কত সুখদুঃখের কাহিনী, কত নিগূঢ় কথা, কত হাসি, কত কান্না দেখতে পাই আর শুনতে পাই।

বলিস কি! রোগ যে তা হ'লে ধরেছে লো!

তাই ত ভাবছি দিদি, আমাকে ধরেছে, ধরেছে —তোমাকে আবার না ধ'রে বসে! বলি কি, আগে থেকে না হয় এর একটা ইনজেকসান্ নাও, দিদি। নিশ্চয় এর ইনজেকসান্ বার হয়েছে। কি বল?

তা বেরিয়েছে বই কি।

তবে একটা নিয়ে নাও, দিদি। কাব্যি রোগে তোমাকে ধরলেই ভাবনার কথা। আমরা কালো-কুৎসিত লোক। শুনি, যাদের গায়ের রং কাল, তারা রোগের আক্রমণকে ঠেলে দিতে পারে। রোদ-বৃষ্টি ঝড়-ঝাপ্টা তারা নাকি সহ্য করতে পারে, কিন্তু গায়ের রং যাদের ফরসা, তারা সে সব পারে না। কাব্যি-রোগে আমাদের বড় একটা কিছু করতে পারবে না। আমরা চাঁদ দেখি বটে, কিন্তু তার পেছনে পেছনে ছুটি না। কিন্তু দিদি, ভয়—তোমাকে নিয়েই। তুমি হ'লে সুন্দরী! কবিত্বের ভাবে ভোর হয়ে কোন জ্যোৎস্না রাতে ঘর ছেড়ে চাঁদের পেছন পেছন না ছুটে যাও! সেইটেই ভয়!

অদ্ভুত ভঙ্গিমায় চপলা কহিল,—বটে! ভয় হবার কথাই ত'। তুই যে দেখছি, মেজবউ, আজকাল অনেক কথাই বলতে শিখেছিস। তা, ভাল। এখন এই নাও—ধর। তোমার একখানা—আমার একখানা।

অশ্রুর শেষের দিককার সরল পরিহাসের কথাগুলা চপলার একেবারেই ভাল লাগে নাই। তাহার সতর্ক ও সন্দিগ্ধ অন্তরের কোথাও গিয়া তাহা যেন একটু নাড়া দিয়া দিল। সুতরাং মুখ ও কণ্ঠস্বর একটু ভারি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—পছন্দ হয়েছে? সাতাশী টাকা!

কাপড়খানি দেখিতে দেখিতে আহ্লাদের সহিত অশ্রু কহিল, সত্যি,—বড় সুন্দর কাপড় হয়েছে, দিদি। সস্তার বাজার; নইলে আগে ছিল এর দাম দেড়শো।

গম্ভীর মুখে চপলা কহিল, বাজারের খবর-টবর জানি না। তা যা'ক, পছন্দ হ'লেই ভাল, ভাই। বলিয়া মন্থর গতিতে—হেলিতে দুলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ছয়

বানান কর—হস্ত।

হ, সয়-তয়।

কোন্ স?

দোন্তে স।

কষ্ট?

ক, সয় টয়।

কোন্ স—সেটা বলতে হয়।

দোন্তে স।

সবই তোমার দোন্তে স?

তালব্য শ।

না।

মোদ্ধন্য ষ। হয়েছে ত!

শিরশ্ছেদ?

অরুণ গুরুমহাশয়, অশ্রু পড়ুয়া। দ্বিতীয় ভাগের বানান জিজ্ঞাসা করা হইতেছিল। অরুণ কহিল, বল—শিরশ্ছেদ?

সি—

সি বলে কোন অক্ষর ত আর নেই। একটু হুঁস ক'রে বল।

সয়ে ইকার সি——

কোন্ স, সেটা কি প্রত্যেক বারেই জিজ্ঞাসা করতে হবে?

যাও! এত আমি পারব না। তার চেয়ে আমারই তুমি শিরশ্ছেদ ক'রে ফেল। বলিয়া ছাত্রী শ্রীমতী অশ্রুময়ী দাসী মুখ ফিরাইয়া বসিল।

দুঃখ ও বিরক্তির সহিত অরুণ কহিল, নাঃ—Hopeless! তালব্য শ'য়ে হ্রস্ব ই, র, তাল্‌বো শয়-ছয় একার—আর দ।

অত আমি পারব না। শুধু স বল্লে হয় না?

না।

কেন হয় না? তা হোলে আমার দ্বারাও হবে না। কে এই সব অনাচিষ্টির সৃষ্টি করেছিল বল ত?——ওগো সর—সর—বড়ঠাকুর আসছেন বোধ হয়।

দালানে চটি-জুতার শব্দ হইল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই উদয়ের কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন আসিল,—অরুণ ঘরে আছ? তাড়াতাড়ি অরুণ দালানে বাহির হইয়া পড়িল। অশ্রু এক হাত ঘোমটা দিয়া এক ধার দিয়া সরিয়া পড়িল। উদয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—অরুণ, ঘরের ভেতর এস। তপনকেও একটু চাই। সে কি বাড়ী আছে, না বেরিয়েছে?

তপন বৈঠকখানাতে বসিয়া ক্যারম খেলিতেছিল। তাহাকে ডাকা হইল।

তপন আসিলে উদয় উভয়কে সম্বোধন করিয়া কহিল,—দেখ, একটা খবর আজ হঠাৎ পেলুম। ষষ্ঠী দত্ত না কি নালিস করবার যোগাড় কচ্ছে।

অরুণ কহিল, ওঃ! ষষ্ঠী দত্ত? যার কাছে আমাদের ফারমের ঋণ রয়েছে? ক'হাজার টাকা সে পাবে?

তোমার ত অরুণ, ভোলা মন, কিছুই মনে থাকে না; সতর হাজার। ভাবছি, এই ত সবে বছর দুই হ'ল ওর কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে। এক বছরের সুদও দেওয়া হয়েছে। তবে হঠাৎ এই নালিস করবার হেতুটা কি? আমার মনে হয়, এর ভেতর কোন দুষ্টু মৎলব আছে। কথাটা বুঝতে পারছ, তপু?

তপন কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

এখন কথা হ'চ্ছে যতদূর শুনলুম, আর শুনে যা বুঝছি,—ও ব্যাটা ঐ সতর হাজারের জন্য আমাদের সব এষ্টেটের ওপর চার্জ্জ দিয়ে নীলেম ডাকাবে। এই হচ্ছে বোধ হয় ওর মৎলব। এখন কি করা যায় বল দেখি? ওর টাকা আমরা দিয়েই ত দিতুম। কিন্তু এই রকম বদ মৎলব ওর যখন, তখন ওকে একটি পয়সাও দেওয়া হবে না। ওকে ফাঁসাতেই হবে। কিছু একটা তার বুদ্ধি তোমাদের মাথায় আসে?

অরুণ কহিল, আমাদের বৃন্দাবন বসাক লেনের বাড়ীখানা বিক্রী ক'রে ওর টাকাটা ফেলে দিলেই আপদ চুকে যায়।

তপনের দিকে চাহিয়া উদয় কহিল, তপু, তুমি কি বল?

আমি বলি বড়দা, মেজ বউদির নামে আমাদের সম্পত্তিগুলো বেনামী ক'রে রাখা যাক না কেন?

উদয় একটুখানি হাসিল। একটুখানি চুপ করিয়া, মাথা হেট করিয়া যেন কি ভাবিয়া লইল। তাহার পর মাথা তুলিয়া কহিল, দেখ তপুর একটু আধটু বিষয়বুদ্ধি তবু যা হোক আছে, কিন্তু অরুণ তুমি এ সব একেবারেই কিছু বোঝ না। বৃন্দাবন বসাক লেনের বাড়ীখানা বিক্রী ক'রে দিলে ত' ঐ সতর হাজার শোধ হয়ে যায় ঠিকই। কিন্তু তা করতে যাই কেন? ও যখন দুষ্টুমী বুদ্ধি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছে, তখন আমরা ত' ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে যাব না। শঠে শাঠ্যং—আর তা ছাড়া, ঋণ যদি পরিশোধ করতেই হয়, ত' বাড়ী বিক্রী ক'রে ঋণ দিতে হবে? তা হ'লে আমাদের চলবে কি ক'রে অরুণ? কর্ত্তারা যা রেখে গেছেন, তা কখনো নষ্ট করতে আছে? আমার অবশ্য বিষয়-সম্পত্তি কিছুরই আবশ্যক নেই, কারণ, আমার ত' আর ছেলেপুলে নেই। আমার অবর্ত্তমানে বড়-বউকে এক মুঠো ভাত তোমরা দেবেই। বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করা যে তোমাদেরই জন্যই, ভাই। এ সংসারে বড় ভাই ক'রে পাঠিয়ে, ভগবান যে সব চেয়ে বড় দায়িত্ব আমার ঘাড়েতেই চাপিয়েছেন। সুতরাং এক চুল কি আমি কিছু নষ্ট হ'তে দিতে পারি? আর তপু যা বল্লে, সে যুক্তি মন্দ নয়; কিন্তু তা হয় না। মেজ-বউমার নামে বেনামী ক'রে রাখতে পারলে ত ভালই হোত। কিন্তু ভাই, তা যে চলবে না। মেজ-বউমার নামেও চলবে না, বড়-বউয়ের নামেও চলবে না। ঘরে ঘরে কি না, কোর্ট সন্দেহ করবে।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর উদয় পুনরায় কহিতে লাগিল, এর একটিমাত্র

সোজা এবং সু-পথ আছে। করতে হবে কি জান, সম্পত্তিগুলো দু'এক দিনের মধ্যেই আমাদের আত্মীয়কুটুম্ব কারো কাছে মিছি মিছি করে একটা মোটা টাকায় mortgage দিয়ে situationটা safe ক'রে রাখতে হবে। তা হোলেই, এক দিকে ষষ্ঠে দত্তর মৎলব ফেঁসে যাবে, অন্য দিকে তার সতের হাজার টাকাও অগাধ জলে গিয়ে পড়বে।

তিন ভাতায় মিলিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ আদির পর, ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, দু'চার দিনের মধ্যেই কলিকাতার বাড়ী দশখানা ও বরানগরের বসতবাটী, ভবানী মামার নামে পঁচাত্তর হাজার টাকায় mortgage রাখিতে হইবে। mortgage দিবার কারণ দেখাইতে হইবে—ফারমের উন্নতি বিধানের জন্য। সম্পত্তি অন্যত্র বন্ধক দেওয়া থাকিলে, অন্য কোন পাওনাদার আর সেই সম্পত্তির উপর চার্জ্জ দিতে পারবে না। আর ভবানী মামার নামে mortgage deed লিখিয়া দেওয়াতে অন্য কোনও ভয়ের কারণ থাকিবে না ; যেহেতু, ভবানী মামা এ সংসারের প্রকৃতই এক জন হিতকামী বন্ধু।

উদয় কহিল, তুমি যে সে দিন বলছিলে অরুণ, যে ভবানী মামার সঙ্গে তুমি অনেক বিষয়ে অনেক আলোচনা ক'রে দেখেছ যে, তিনি এক জন খুবই ভাল লোক, সে কথা তোমার ঠিকই। ভবানী মামার দ্বারা আমাদের উপকার ছাড়া অপকার হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

সুতরাং সেই ব্যবস্থাই পাকা হইয়া গেল।

উদয় চলিয়া গেলে, তপন কহিল, পরামর্শ ত পাকা হয়ে গেল। হোক।—তার পর মিনিট খানেক নীরব থাকিয়া কহিল, মেজদা, তুমি ঋষি ; তোমার মনে কোন দাগ-দোগ নেই। আচ্ছা মেজদা, তুমি 'প্রফুল্ল' পড়েছ বা দেখেছ? অরুণ কহিল, না ; কেন বল্ ত? তপন পাইচারী করিতে করিতে কহিল, না—এমনিই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

সেই সময় গঙ্গার ঘাটে বসিয়া কে এক জন গান গাহিতেছিল—

জগৎটা যে অতি চমৎকার।
কারও চক্ষে রঙীন আলো, কারও অন্ধকার।

তপন কহিল, মেজদা সেই লোকটা গাচ্ছে,—শোন।

লোকটি গাহিতে লাগিল—

কেউ বা ঠকে,—কেউ বা ঠকায়
বিনা দোষে কেউ বা কাঁদায়,
ভাই হোয়ে কেউ ভা'য়ের গলায় বসায় তলোয়ার।
চারিদিকেই ফাঁদ যে পাতা,
পালিয়ে তুমি যাবে কোথা?
দেখতে পাবে যথা-তথা—দৈত্য নরাকার।

রাত্রে আহারাদির পর, শয্যায় শয়ন করিয়া উদয় ভাবিতে লাগিল—এইবার শেষ চাল চেলেছি ; এ চালে মাৎ হোতেই হবে। একবার কোন রকমে mortgage deed খানায় সই করিয়ে নিতে পারলেই—ব্যস্, সমস্ত কাজ হাসিল। কিন্তু বেশী দেরী করলে চলবে না। দু'চার দিনের মধ্যেই যাতে লেখা-পড়াটা শেষ ক'রে ফেলে রেজিষ্টিটা হয়ে যায়, সেই ব্যবস্থাটা ক'রে ফেলতে হবে। শুভস্য শীঘ্রম্।—একটা বোকা, আর একটা চ্যাংড়া ; ওরা টিঁকবে—আমার বুদ্ধির কাছে! দু'বছর আগে ষষ্ঠী দত্তর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ভাগ্যিস এই সতর হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোটখানা করিয়ে রেখেছিলুম, তাইতে আজ কাজটা এত সহজে হয়ে গেল। ষষ্ঠেটাকে হাজার দুই দেবার কথা আছে। ওটা ওকে না দিয়ে উপায় নেই। না দিলে হয় ত রেগে ভেতরের কথা এদের কাছে প্রকাশ ক'রে দেবে। তা দেয়া যাবে। মামার নামে mortgage deed খানা হোয়ে গেলে, বুঝলুম কাজ ফতে। তখন ওকে টাকাটা দিয়ে দেবো। আর হ্যাণ্ডনোটখানা ওর কাছ থেকে নিয়ে রাখতে হবে। টাকার লোভ—বড় লোভ! আজ আমার সঙ্গে ওর হরিহর-আত্মা ; টাকার লোভে কালই হয় ত ও বেঁকে বসতে পারে। কাল আমার আফিসে ওর যাবার কথা ছিল ; গেল না কেন জানি না। যাক, গড়া-পেটা ত সব হোয়েই আছে। এ দিককার কাজটা শেষ হোয়ে গেলেই, ওর সঙ্গে কাজের শেষ করে ফেলতে হবে।

চপলা বহুক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বেড্-ল্যাম্পের স্বল্পালোকে উদয় তাহার শুভ্র-সুন্দর মুখের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সাত

আদি-গঙ্গার ধারে যেখানটায় কালীঘাটের শ্মশান অবস্থিত, সেই স্থানটার নাম—সাহানগর।

হয় ত অতীতকালের কোন দিনে সেখানে সাহা-বংশীয়দের বসবাস ছিল, এক্ষণে কিন্তু শুধু নামটিমাত্র পুঁজি করিয়া এই অঞ্চলটি নানা দেশের নানা লোককে নিজ বক্ষে স্থান দিয়া রাখিয়াছে।

এই সাহানগরের মধ্যে শ্রীগোপাল সরকার লেনের একখানি বাটীতে অকস্মাৎ শোক ও আতঙ্কের একটা ভীষণ ঝাপটা আসিয়া লাগিয়াছে। বেহারের ভূমিকম্পের ন্যায়, সহসা অতর্কিতে এই আনন্দের গৃহে মৃত্যুদূতের নিষ্ঠুর কবাঘাত পড়িয়াছে। মাত্র চৌদ্দ ঘণ্টা ভুগিয়াই এই বাটীর বড় ছেলেটি গত রাত্রে কলেরায় মারা গিয়াছে। শেষ রাত্রি হইতেই আর একটি ছেলে আবার এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। আরও কি হয় বলা যায় না। কখন্ কাহার পালা আসিয়া পড়ে, কিছুই স্থিরতা নাই। সকলেই ত্রাসে ও উদ্বেগে জ্ঞানবুদ্ধিহারা হইয়া পড়িয়াছে।

বাড়ীর গৃহিণী এই দারুণ আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া কোন-একটা ঘরের মেজেতে নিৰ্জ্জীবের মত পড়িয়াছিল। বাটীর কর্ত্তা পাগলের মত হইয়া একবার পীড়িত পুত্রের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিতেছে, আবার উঠিয়া যাইতেছে। একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার রোগীর পার্শ্বের চেয়ার খানিতে বসিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, আপনি এ রকম অস্থির হোলে ত চলবে না, দত্তমশাই। সাধ্যমত চিকিৎসা হোচ্ছে, সাধ্যমত আপনারা সেবা-শুশ্রূষা ক'রে যান; তার পর ভগবানের হাত।

উন্মত্তের মত গৃহমধ্যে পাইচারী করিতে করিতে গৃহকর্ত্তা কহিতে লাগিল, ভগবানের হাত—ভগবানের হাত! আমার এ কি হোল। এমন যে হবে, এ ত কখনো ভাবি নি! উঃ! কি করব আমি?

এই সময় রোগী একবার বমি করিল। ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া আর একবার ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন।

আবার বমি হোল? কি হবে, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার কহিলেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না। নাড়ী ভাল।

এই সময় রোগী 'জল' 'জল' বলিয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। ডাক্তার কহিলেন, বরফকুচি দিন, বরফকুচি দিন। ভয়ে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? একটু স্থির হয়ে ওকে দেখা-শুনো করুন।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে দত্তমশাই কহিলেন, স্থির? পাচ্ছি না যে! স্থির কি হওয়া যায়? একজন যে চ'লে গেছে ডাক্তার বাবু। আবার কি হবে গো! ওরে বাবা রে! উঃ, আমারই পাপ! আমারই পাপ! কি করি আমি!

এমনি সময়ে মুক্তদ্বারপথে আসিয়া দাঁড়াইল—তপন।

গৃহকর্ত্তা তাহাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, কে—কে? তুমি উদয়ের ভাই তপন না? ভাই—ভাই, দেখ আমার কি সর্ব্বনাশ! তুমি ত আমার বাড়ী কখনো আসো নি, কি ক'রে চিনে এলে ভাই?

তপন কহিল, অনেক খুঁজে এসেছি, দাদা। এসেই সব শুনলুম।

শুনেছ, ভাই, শুনেছ? আমার বিভূতি আর নেই, তা শুনেছ? আর ঐ দেখ—বিনয়। ও-ও বুঝি বা যায় রে ভাই! ষষ্ঠী দত্ত অধৈর্য্য হইয়া তপনকে জড়াইয়া একেবারে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তপন কহিল, দাদা, শান্ত হোন, বিপদ কেটে যাবে, কোন ভয় নেই।

ভাই রে, বড় একটা অন্যায় করেছি; আর করব না। তুমি বল ভাই, আমায় ক্ষমা করবে। তুমি ক্ষমা না করলে বিনয় আমার বাঁচবে না।

এই সময় ডাক্তার আর একবার রোগীর নাড়ী দেখিয়া কহিলেন, case turn নিয়েছে, নাড়ীর অবস্থা অনেকটা ভাল।

ভাল—ভাল? ষষ্ঠী দত্ত কহিল, তা হোলে, বোধ হয় তপন ক্ষমা করবে। তপন, তোমায় ক্ষমা করতেই হবে। তুমি বোসো, যেও না যেন। আমি আসছি। দু'মিনিট।

ষষ্ঠী দত্ত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল ও মিনিট পাঁচেক পরে একখানি কাগজ হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল। কাগজখানা তপনের হাতে দিয়া বলিল, কি বল দেখি? তপন সেখানা দেখিয়া কহিল, এ ত আমাদের সেই সতর হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট, দাদা।

লম্বা-লম্বিভাবে সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ষষ্ঠী দত্ত কহিল, হ্যাঁ, সেই পাপ হ্যাণ্ডনোট, যার সবই মিথ্যে। উদয় ছেলে-বেলাকার বন্ধু, তার অনুরোধ না এড়াতে পেরে, এই কাগজখানা মুড়ে মস্ত বড় এক পাপ রেখে দিয়েছিলুম, যার জন্যে আজ আমার এই সর্ব্বনাশ! কি আর বলব ভাই, এর বেশী কিছু আর বলতে পারছি না।

তপন ছেঁড়া হ্যাণ্ডনোটখানি হাতে লইয়া কহিল,

তা হোলে কি এ টাকা সত্যি ধার নেওয়া নয়, দাদা?

না রে ভাই—না। আব আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না, ভাই।

এই সময় আর এক জন ডাক্তার ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়াই প্রথম ডাক্তাবেব মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, How is he, Dr. Banerjee? বলিয়াই তিনি বিনয়েব নাড়ী পরীক্ষা কবিলেন।

I see the pulse is improved!

হ্যাঁ, এখন অল্প অল্প ফিরে আসছে।

ষষ্ঠী দত্ত বলিয়া উঠিল, আসছে? আসছে? তপন, অরুণকে আর এ সময় কাছে পেলুম না। তোমরা দু'ভাই মন খুলে আমায় ক্ষমা করলেই বিনয় আমার বেঁচে উঠবে। নিষ্পাপ, নিরীহ তোমাদের দু'ভাইকে ঠকাতে গেছলুম, ভগবান হাতে হাতে তাব প্রতিফল দিলেন। যা হবার, তা ত হয়ে গেছে, এখন বিনয় আমার বাঁচ্‌লে হয়! ডাক্তার বাবু, বাঁচ্‌বে কি?

ক্ষিপ্তের মত ষষ্ঠী দত্ত ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন, রোগ ফেরবার পথ ধরেছে, বাড়ে ত আর হয নি। নাড়ীর অবস্থাও ভাল।

তপন কহিল, দাদা, আপনি অধীর হবেন না, বিনয় আপনার সেরে উঠবে।

উঠবে ভাই? তুমি বল্লেই উঠবে। তোমাদের দু'ভায়ের ক্ষমা পেলেই—উঠবে।

আচ্ছা দাদা, আর একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করব। আপনি কি টাকাটার জন্যে কোর্টে নালিশ দায়ের করবার যোগাড় করছিলেন?

আর কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না, ভাই। মিথ্যে কথা আর বলতে পারব না। হ্যাঁ,—উদয়েরই পরামর্শে—। কেন আব জিজ্ঞাসা কচ্ছ ভাই, সবই ত বুঝতে পাচ্ছ। তবে উদয়কে প্রাণ যেন তোমরা লজ্জা দিও না।—ভুল—ভুল—বড্ড ভুল ক'রে ফেলেছিল—তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ক'রে ফেলেছিলুম। যাক ভাই, ও সব কথা আর কিছু তুলো না। সব ভুলে যাও, ভাই। সর্ব্বান্তঃকরণে, তপন, ভাই, ক্ষমা কর।

ডাক্তারদ্বয় রোগীর মুখে বরফকুঁচি দিতে বলিলেন। তপনই উঠিয়া তাহা দিল। এক জন ডাক্তার পুনরায় নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, ভয়টা বোধ হয় আমরা কাটালুম, দত্ত মশাই। এই যে ওষুধটা আমরা দিয়ে যাচ্ছি, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক দাগ ক'রে এইটে খাইয়ে যাবেন। ঘণ্টা দুতিন বাদে আমরা আবার আসবো।

ডাক্তাররা চলিয়া গেলেন। তপন সে-বেলাটা সেইখানেই রহিয়া গেল। বিকালের দিকে আবার ডাক্তাব দুইজন আসিলেন। বিনয় তখন অনেকটা ভাল। ডাক্তাররা দেখিয়া কহিলেন, আর কোন ভয় নেই।

সত্যই আর কোন ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ক্রমে ক্রমে বিনয় সুস্থ হইতে লাগিল। ষষ্ঠী দত্ত প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে তপনের হাত ধরিয়া কহিল, আজ তুমি না এলে হয় ত বিনয়কে আমার হারাতে হ'ত।

ষষ্ঠী দত্তর ওখান হইতে বাহির হইয়া পথে আসিতে আসিতে তপন ভাবিল—হয় এস্পার, নয় ওস্পার। ও বাড়ী ত্যাগ করতেই হবে। শ্বশুর-জামাইয়ে মিলে যে বিষ ছড়িয়ে রেখেছে ও বাড়ীতে, ওখানে থাকলেই মরতে হবে। উঃ! কি ভয়ানক! আগে ভাবতুম, নভেল-নাটকে এই সব ব্যাপারগুলো বানিয়ে-সাজিয়ে লেখে। এখন দেখছি, এ রকম ব্যাপার সংসারে সত্য-সত্যই ঘটে থাকে, পুরোপুরি কবির কল্পনা নয়।—যাক, যা থাকে কপালে, সংসারের ভেতর থেকে সংসারের বাইরেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমার এ জীবনের আবার মূল্য কি? বড়দা, তুমি যদি সত্যিকার বড়দা হয়ে আজ আমার কাছ থেকে তুমি সব চেয়ে নিতে, হয় ত তোমাকে আমি আমার অংশটা স্বচ্ছন্দে দিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু তুমি গেলে—ঠকিয়ে নিতে!—ঠকতে রাজী নই, দাদা। ডুবি যদি—সোজাভাবেই ডুববো, তাল-গোল পাকিয়ে ডুববো না।—মেজদাটাকে বাঁচাতে হবে। আহা, মেজদা আর মেজবৌদির মন—আয়নার মত পরিষ্কার। সংসারের মধুটুকুরই শুধু খোঁজ রাখে, বিষের খবর জানে না। জগতের একটা মস্ত বিস্ময় এটা যে, যে মায়ের ছেলে বড়দা, মেজদাও সেই মায়ের ছেলে।

সমস্ত পথ এই রকম এলো-মেলো হাজার রকমের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যাবেলায় তপন বরানগরে ফিরিল এবং সরাসরি বাটীতে না গিয়া, গঙ্গার একটা ঘাটে আসিয়া বসিল। গঙ্গায় তখন পরিপূর্ণ জোয়ার। কাল-বৈশাখীর সূচনা জাগাইয়া, আকাশে চলন্ত মেঘের রাশি স্থির হইয়া জমিয়া উঠিতেছিল। চঞ্চল পবনের সহিত,

গঙ্গার চঞ্চল ঢেউগুলি এতক্ষণ ধরিয়া যে মাতামাতি করিতেছিল, তাহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। গঙ্গার ঘোলা জলে কালো ছায়া পড়িল। ওপারের কয়খানা জেলে-ডিঙ্গি হইতে জাল ফেলিয়া তোপসে মাছ ধরিবার আয়োজন হইতেছিল। তাহা দেখিয়া তপনের মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িল—জাল, চারিদিকেই জাল। জগতের জঞ্জাল জড়ো করবার জন্যে মানুষের এত জাল পাতা। পিছন হইতে কে বলিল, কিসের জাল রে? তপন ফিরিয়া দেখিল—অরুণ; কহিল, মেজদা? ভয়ানক জাল! বোসো, সব বলছি।

অরুণ তপনের পার্শ্বে বসিল।

আট

প্রেমের বাঁধনে কি করেই যে আমাকে বেঁধেছ নিকুঞ্জ, তা আর বলতে পারি না।

গভীর রাত্রে চপলা সেই আঁসফল গাছের তলায় আসিয়া নিকুঞ্জকে ঐ কথা বলিল। নিকুঞ্জ চপলার হাতখানা ধরিয়া কহিল, ঘরের কর্ত্তা কি আজ—

—ঘর-ছাড়া। হাজরা বোড়ে গেছেন। যে জন্যে গেছেন, এইটে লেগে গেলেই আমি চিরকাল ধ'রে তোমার 'ব্যাঙ্ক' হয়ে থাকব। একটু সবুর সয়ে থাক, মেওয়া এক দিন ফলবেই।

অদূরে অন্ধকারের মধ্যে কি একটা শব্দ হইল। চপলা কহিল, চল ঘরের ভেতর যাই।

নিকুঞ্জর সেই ঘরের মধ্যে উভয়ে প্রবেশ করিল। আলোকশূন্য গৃহে তক্তাপোষের উপর দু'জনে পাশাপাশি বসিল। নিকুঞ্জ কহিল, মেওয়া ত ফলবেই চপল, কিন্তু মেওয়া খাবার লোক তত দিন পর্য্যন্ত টেঁকে কি না।

বালাই! অমন কথা বলতে আছে? সেদিনকার এক শ' টাকা এরি মধ্যে সব খরচ ক'রে ফেলেছ?

তোমার সঙ্গে ত আমার মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয় নি, সুতরাং প্রাণের সঙ্গে ত আর আমায় ভালবাস না। তা যদি বাসতে, তা হোলে আমার প্রাণের ব্যথা বুঝতে, চপল। যেখানে এক হাজারের দরকার, সেখানে এক শ'তে কি হবে বল? বলে,—'সিন্ধু সম ভালবাসা, বিন্দুতে কি যায় পিপাসা?' সে রাত্রে এক জন মন-চোর এসে টাকা দিয়ে গেল, আর একজন ঘটী-চোর এসে সব চুরি ক'রে নিয়ে গেল। ঘটী, বাটি, বাসন-কোসন, জামা-কাপড়—রান্নাঘরে আর দালানে যা কিছু ছিল, বেটা চোর তার কিছু কি আর রেখে গিয়েছে! ঐ সব আবার কিনতেই ত প্রায় সে টাকা খরচ হোয়ে গেল, চপল। যাক, আমার দুঃখ আর তোমায় জানাবো না। জানিয়ে যখন কোন ফল নেই, তখন নিজের দুঃখ নিজেই মুখ বুজে সহ্য করব।

তুমি এ রকম মন-মরা হোয়ে থাকলে আমার কিছু ভাল লাগে না। আর দু'টো মাস একটু সহ্য ক'রে থাক, তার পর তোমার কোন অভাবই আমি রাখব না। তোমার মুখে হাসি না দেখলে, আমার প্রাণের সমস্ত হাসিও যেন শুকিয়ে যায়,—এটা তুমি ঠিকই জেনো।

একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া নিকুঞ্জ কহিল, হ্যাঁ—তা জানি। আর এটাও জানি যে,—'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'। যখন বিষয়-সম্পত্তি তোমার হাতে আসবে, তখন হয় ত চপল, আমায় দেখেও তুমি আর চিন্তে পারবে না। আমার নাম শুনে তখন হয় ত বলবে—নিকুঞ্জ? নিকুঞ্জ ত কুঞ্জবন, গাছ-পালা-ফুল-লতা-পাতা——

আচ্ছা, এ সব কথা ব'লে আমার মনে ব্যথা দিয়ে কি সুখী হও? সূর্য্য রাত্রে—আর চাঁদ দিনের বেলা ওঠাও যদি সম্ভব হয়, ত তোমাকে কখনো ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না—বলিয়া চপলা নিকুঞ্জর বুকে গভীর তৃপ্তিতে আপন মুখ রক্ষা করিল।

নিকুঞ্জ!

কি চপল?

তুমি কি কোন যাদু জান? নইলে তোমাতে আমি এমন ক'রে মজবো কেন?—চপলার মুখ সেইভাবে নিকুঞ্জর বুকের উপর।

তুমিই যাদু জান, চপল; নইলে তোমার মুখ দেখলে আমার এত যে কষ্ট, সবই ভুলে যাই কেন? চপল, চপল! তুমি চিরকাল আমার থাকবে, চপল?

দুটো মন্ত্র পড়া বাদ গেছে বটে, কিন্তু তাই বলে কি তুমি আমাকে নিজের স্ত্রী বলে মনে কর না? যাক, ওরকম কথা তুমি বোলো না। টাকার জন্যে কি বড্ডই আটকেছে?

বড্ড।

তা হোলে এই চুড়ি চারগাছা নাও। ভরি চার হবে; বিক্রী ক'রে নিও,—বলিয়া চপলা তাহার হাত হইতে চারিগাছা সোনার চুড়ি খুলিয়া নিকুঞ্জর হাতে দিল। নিকুঞ্জ কহিল, সে কি! হাত খালি ক'রে খুলে দিলে? তার পর——

অন্য চুড়ি আমার আছে, আমি তাই পরব এখন।

আচ্ছা, চপল!

কি, নিকু?

মাঝে মাঝে আমার একটা ভয় হয়।

ভয়? কিসের ভয়?

যদি হঠাৎ তুমি——

ম'রে যাই?

বালাই! আর সেটা ত ভয়ের কথা নয়, চপল। কেন না, তুমি ম'রে গেলে তুমি কি ভাব, আমিই আমার প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখবো? তা' হোলে ত সঙ্গে সঙ্গে আমিও মরব, চপল।

তবে বল, তোমার কিসের ভয়?

চপলার কপালের উপরকার চুলগুলা নাড়িতে নাড়িতে নিকুঞ্জ কহিল, যদি কখনো কেউ আমাদের এইভাবে মেলামেশা দেখতে পায়, আর তার ফলে দু'জনের মধ্যে চিরস্থায়ী এক কঠিন পাথরের পাঁচীল উঠে পড়ে?

সোজা হইয়া বসিয়া চপলা কহিল, তা হ'লে সমস্ত শক্তি এক ক'রে সেই পাথরের পাঁচীল টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দেবো। সমস্ত জগতের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াবার লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, কিছুই আর তখন রাখবো না। একদিন যৌবনের প্রথম উষাতে চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী রেখে, ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা করে আমরা বিয়ে করিচি। আর সে কথা প্রথমে আকারে ইঙ্গিতে, পরে স্পষ্ট করেই বাপ মায়ের কাছে জানিয়েছি। তা জেনেও, শুধু বিষয়ের লোভে তারা জোর করে আমায় আর একজনের হাতে তুলে দিলে, যারে আমি কিছুতেই চাই নি। আমি যে তোমাকেই চেয়ে এসেছি। এ চাওয়া কেউ এসে বন্ধ করতে পারে? এ প্রবল নদীর স্রোত রোধ করবার শক্তি কারো আছে?

আমার প্রায়ই মনে পড়ে, চপল, আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সেই মধুময় দিন—

যে দিন তুমি কোন এক স্বপ্নলোক থেকে হঠাৎ আমার সামনে এসে আমার মুগ্ধ মনের ওপর এক অতুল সৌন্দর্য্যে ঝলমল প্রেমের বাণ ছুঁড়ে আমায় মারলে!

আর তুমি যে দিন, তোমার এই অমরবাঞ্ছিত, অতুলনীয় স্বর্ণকমলখানি আমার মুগ্ধ চোখের সামনে অপূর্ব্ব লীলায় ফুটিয়ে তুল্‌লে। কী তার রূপ! কী তার বল! কী তার গন্ধ!

আজিকার এই নাটকীয় ভঙ্গীর আলাপে উভয়েরই অন্তর উৎফুল্ল। সেই উৎফুল্লতার ভারে খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরবে রহিল। তাহার পর নিকুঞ্জ কহিল, আমি এ রকম ক'রে পারব না, চপল। নিশীথ নদীর এপারে-ওপারে আমরা দুই চকা-চকী; জানি না, এ কাল-রাত্রি কবে শেষ হয়ে গিয়ে, আমাদের চোখে মিলন-রবি উদয় হবে।

নিকুঞ্জ, অধীর হোয়ো না। তুমি জান না, তোমার চেয়ে কত গুণ অতৃপ্তির জ্বালা নিশিদিন আমার অন্তরকে বিষিয়ে তুলছে। তবে এই আশায় বুক বেঁধে আছি, একদিন না একদিন আমাদের আশা পূর্ণ হবেই; একদিন না একদিন পরিপূর্ণ তৃপ্তি আর আনন্দের ভারে আমরা পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ব। আর তেমন দিনের বেশী দেরীও নেই জেনো।

নিকুঞ্জ নীরব থাকিয়া চপলার সাড়ীর আঁচল-খানা লইয়া নাড়িতে লাগিল। চপলা তাহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আজ তোমাকে বড় শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে।

আজ রাত্রে কিছু খাই নি।

খাও নি? কেন?

খুড়ী বল্লে—শরীর খারাপ, আজ আর রাঁধতে পারব না; আমি বল্লুম, তবে থাক, আজ আর কিছু খাবই না।

আমি আসছি,—পাঁচ মিনিট,—বলিয়া চপলা শশব্যস্তে বাহির হইয়া গেল এবং প্রায় মিনিট পনর পরে, একটা ছোট 'টিফিন-কেরিয়ার' হাতে ঝুলাইয়া প্রবেশ করিয়া কহিল, এ ঘরে আসন-টাসন কিছু আছে? উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে নিজেই চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল এবং কিছু না পাইয়া, আলনা হইতে একখানা টারকিশ তোয়ালে লইয়া তাহাই মেজের এক ধারে পাতিয়া দিল। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বেই ঘরের আলোটা জ্বালা হইয়াছিল। এক্ষণে আসনের সামনে 'টিফিন-কেরিয়ারে'র বাটিগুলি সাজাইয়া দিয়া চপলা কহিল, এস—খাও।

ব্যাপার কি চপল? তুমি গেলে আর এক রাশ খাবার নিয়ে এলে কোত্থেকে।

ও আমার থাকে। এখন এস, আর দেরী কোরো না।

নিকুঞ্জ আসনে আসিয়া বসিল। চপলা কহিল, আজ মনের একটা সাধ মেটাব। অনেক দিনের সাধ। আজ তোমাকে আমি হাতে ক'রে খাইয়ে দেবো। মৃদু হাসিয়া নিকুঞ্জ বলিল, দাও। একটা বাটিতে লুচি, একটা বাটিতে আলুভাজা, আলুর দম, আর একটা বাটিতে সন্দেশ ও পান্তুয়া ছিল। চপলা সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইযা দিতে লাগিল, নিকুঞ্জ খাইতে লাগিল। আহার শেষ হইলে, চপলা জলের গেলাসটা নিকুঞ্জর মুখে ধরিয়া কহিল, মানুষের মরা-বাঁচার কথা ত বলা যায় না। কি জানি যদি হঠাৎ মরেই যাই, ত অনেক দিনের সাধটা আজ মিটিয়ে রাখলুম।

নিকুঞ্জ কহিল, এগুলো আবার গুছিয়ে-গাছিয়ে নাও।

তা আর মশাইকে বোলে কষ্ট পেতে হবে না। মনের ইচ্ছাটা কি যে, এই সাত-সিকে দামের 'টিফিন-কেরিয়ার'টা এখানে আমি রেখে যাই? মজার কথা আর কি! কিন্তু তার আগে আর একটা কাজ যে বাকী আছে আমার,—বলিয়া আঁচলে-বাঁধা এক ছড়া বেল ফুলের মালা বাহির করিয়া সে নিকুঞ্জর গলায় পরাইয়া দিল। দিয়া কহিল, মনে আছে ত—আমাদের বিয়ের রাতে মালা-বদলটাও বাকী ছিল। আজ এতদিন পরে সেই কাজটা সারলুম।

নিকুঞ্জ নিজ গলা হইতে মালাছড়াটি খুলিয়া চপলার গলায় পরাইয়া দিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল, তাই ত বলছিলুম চপল যে, যে-বিয়েতে মন্ত্র-পড়া হয় নি, মালা-বদল হয় নি, সে বিয়ের কথা কি তোমার বেশীদিন মনে থাকবে?

অধিকতর উত্তেজিত ভাবে চপলা কহিল, দেখ, মন্ত্র-পড়া মালা-বদল বাইরের জিনিস বলেই আমি মনে করি। সে রাতের সেই বিয়েই আমার আসল বিয়ে। তার পর বাপ-মা জোর ক'রে দেহটার সঙ্গে আর একটা বিয়ে দিয়ে দিলে। কিন্তু পারলুম না নিকুঞ্জ, মানিযে নিতে পারলুম না। বিদ্রোহী যৌবনের প্রথম দিনে যাকে অতুল তৃপ্তিতে রাজা ক'রে মনের সিংহাসনে বসিয়েছি, আজ শান্তির দিনে, সমাজ-বিধির আদেশে, তাকে নামাবার শক্তি আমার নেই। নামাতেত পারবই না, তবে তেমন অবস্থা যদি কখনো ঘটে, তখন দু'জনে একসঙ্গে হাতে-হাতে, গলায়-গলায় জড়িয়ে, সামনের ঐ গঙ্গার অতল-তলে ডুব্‌বো।

নিকুঞ্জ চপলার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

নয়

সে দিন সকাল বেলা অশ্রু দালানে বসিয়া পাণ সাজিতেছিল। তাহার কোলের খোকা দিগম্বর বেশে সম্মুখে বসিয়া বিজ্ঞের মত মায়ের কাজের তদারক করিতে ব্যস্ত ছিল। তাহার এই এক বছর আট মাস বয়সের ভিতর সে কতকগুলা কথা পরিপাটীরূপে শিখিয়া ফেলিয়াছে। তবে সে গুলি সাঙ্কেতিক কথা, তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক হয়; যেমন—'মাম্', অর্থাৎ পান; 'মেও' —অর্থাৎ পুষি বেড়াল; 'হিস্-সি'—অর্থাৎ এমন একটি কাজ যাহাতে তাহার ইজেরটি বদলাইয়া দেওয়ার দরকার; 'গগা—বে-ঈ'—অর্থাৎ গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যাইবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার এমন অনেকগুলি কথা সে সময় সময় বলিয়া থাকে, যাহার অর্থ এখনও পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারা যায় নাই। তবে অন্য সব কথার চেয়ে, 'হোনু-তুত্তু-পাজী' কথাটাই তাহার মুখ দিয়া বেশী বাহির হয়। ইহার কারণ,—যতক্ষণ না সে ঘুমায়, ততক্ষণ সব সময়ই কোন-না-কোন অপকর্ম্মে সে নিযুক্ত থাকেই; যেমন ঘটী-বাটীর মধ্যে 'হিস্-সি' করা, আলনার নীচেকার তাকের কাপড়-চোপড়গুলা টানিয়া টানিয়া মেজেয় ফেলা, বালতির জলের মধ্যে রাজ্যের ঢিল-কাঁকর প্রভৃতি ফেলা, জলভরা গেলাস উল্টাইয়া ফেলিয়া, সেই জল থাব্‌ড়াইয়া থাব্‌ড়াইয়া নিজ শুভ্র উদরদেশে একান্তমনে লেপন করা— প্রভৃতি। এই সকল কাজে যে তাহাকে বাধা দিতে যাইবে, সেই তাহার কাছে—'হোনু-তুত্তু-পাজী' হইবে।

সুপারির বাটি হইতে কাটা সুপারিগুলি খোকা সব মেজেতে ঢালিয়া অশ্রু সেগুলি আবার বাটিতে তুলিয়া, বাটিটা নিজের পিছনের দিকে লুকাইয়া রাখিল। খোকা তখন ধরিল— পানের ডাবরটা। অশ্রু সেটাও সরাইয়া রাখিয়া কহিল, দাদা কি কচ্ছে, দেখে এস দিকি। মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া খোকা জিজ্ঞাসা করিল, দাদ্-দা?

হাঁ। দেখে এস দেখি—দাদা কোথায় ?

থপ্‌ থপ্‌ করিয়া টলিতে টলিতে খোকা দালানের দরজা পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিল, কহিল, দা-দ্‌-দা গগা বে-ঈ।

দাদা গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেছে ? তবে তুমি চুপটি ক'রে এখানে ব'সে থাক, তুমিও বে-ঈ করতে যাবে ; আর দুষ্টুমী কর যদি, তা হোলে হোম্বু আসবে।

মা, মা,——মাম্‌।

মাম্‌ সাজা হোক, তার পর দেবো। বলিয়াই হঠাৎ শশব্যস্তে অশ্রু বুক পর্য্যন্ত মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই চটি-জুতার শব্দ করিতে করিতে উদয় সেইখানে আসিয়া অশ্রুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, বৌমা, এরা দু'জন তলিয়ে বুঝল না যে ব্যাপারটার ভেতর কি আছে। ষষ্ঠী দত্তর দেনাটা অবশ্য মিথ্যা, তার নালিশ করবার কথাটাও মিথ্যা ; কিন্তু কেন যে এই মিথ্যার সৃষ্টি করা হয়েছিল—এর ভেতর যে মস্ত একটা কিছু থাকতে পারে, যেটা এখন প্রকাশ করা হয় ত চলে না,—সে সব কথা ওদের মনে একরত্তি উদয় হোল না। ব্যাপারটাকে ওরা সাধারণ—আর সোজাসুজি ভাবেই ধ'রে নিলে। মনে করলে, যে বড়দা আমাদের······। আরে, যদি ফাঁকি দিতেই ইচ্ছে করত, তা হোলে কি আর এত দিন বিষয়-সম্পত্তি কিছু থাকতো, না, আফিসটারও কোন অস্তিত্ব থাকতো ! এ বাড়ীর মধ্যে তুমিই মা বুদ্ধিমতী, তুমি হয় ত একটু বুঝবে। রাজাকে অনেক সময়, মঙ্গলের জন্যে, সত্যগোপন ক'রে রাজ্য শাসন করতে হয়। নইলে হয় ত রাজ্য ছারেখারে যায়। এ সংসারের হিতের জন্যে আমাকেও অনেক কিছুই করতে হয়, মা। পূজো-ধ্যান করবার আগে সকলের কাছে তা ব'লে বেড়ালে সেটা ছেলেখেলা হয়ে যায়। বুঝলে না, মা ?—তার পর একটু চুপ করিয়া পুনরায় কহিল, যাক্‌, আর কোন চেষ্টা করব না। সংসার, বিষয়-সম্পত্তি, আফিস—সব জাহান্নমে যাক। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কিছুর ভেতরই থাকবো না। বলিয়া উদয় খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া দালানের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল। খোকার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'হোম্বু-দুত্তু-পাজীরা' সব এইখানে পোড়ে থাক্‌, তোমাতে আর আমাতে, বাবা, চল ত চলে যাই।

এবার উদয় খুব বড় রকমের ঘা খাইয়াছে। কয় দিন হইতেই তাহার কথায়-বার্ত্তায়, হাবে-ভাবে, কাজে-কর্ম্মে একটা গম্ভীর ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। দুই দুইবার ষড়যন্ত্র প্রকাশ ও বিফল হইয়া পড়াতে তাহার মনে এক দিকে ধিক্কার এবং লজ্জা, অপর দিকে ক্রোধ এবং আক্রোশ জমিয়া উঠিয়াছিল। আক্রোশটা তপনেরই উপর।—ঐ একরত্তি ছেলেটাই তাহার পথের কাঁটা হইয়া ক্রমাগতই দাঁড়াইতেছে। ছেলেটা অসম্ভব ডানপিটে গোছের। কিছুতেই ত ওটাকে আমলে আনিতে পারা যাইতেছে না।

পাইচারী করিতে করিতে উদয় পুনরায় কহিতে লাগিল, একজন কবিত্বে মশগুল হয়ে আছে, আর একজন ক্লাব, লাইব্রেরী, থিয়েটার, স্পোর্ট—এই সব নিয়েই ব্যস্ত। 'ফারম'টাকে এখনও পর্য্যন্ত যে কি ক'রে বজায় রেখেছি, সে আমিই জানি। তবু ফারমের দশ হাজার টাকা এখনো দেনা ! সে কথা কি আমি কারোকে জানতে দিয়েছি ! এইবার জানাতে হবে। কেন না, ফারম আর টিকবে না। টিকিয়ে রাখতে পারব না। ফারম যাক্‌, তাতে দুঃখ নেই, তবে বাবার হাতের গড়া জিনিষ, কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে হয় ত ও থেকে আবার আগেকার মত আয় হোতে পারতো। বাবার আমলে বারো মাসে বারো হাজার টাকা ঐ ফারম থেকেই ত হয়েছে।

যাহাকে শুনাইয়া এই সব কথা বলা হইতেছে, সে ইহার কি-ই বা বুঝে। অশ্রু পলাইতে পারিলে বাঁচে, কিন্তু সেটা ত শোভন হয় না। সুতরাং সে হাত গুটাইয়া নীরবে চোরের মত বসিয়া রহিল। এমন সময় সহসা সকালবেলাতেই নগেন বাবুর আবির্ভাব হইয়া পড়িল। উদয়কে নীচের দালানে দেখিয়া তিনি এক-পা এক-পা করিয়া সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই সুযোগে অশ্রু পাণের সরঞ্জাম তুলিয়া রাখিয়া রান্না-বাড়ীর দিকে পলায়ন করিল। নগেন বাবু উদয়ের মুখের দিকে চাহিয়া চাপা গলায় কহিলেন, বাবাজী, সময়টা এখন তোমার খারাপই পড়েছে। এখন দিনকতক একেবারে চুপ ক'রে থাক। এই নিয়ে আর এখন কোন রকম উচ্চ-বাচ্য করো না, তা হ'লে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়বে। এই কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলবার জন্যেই তাড়াতাড়ি এই সকাল-বেলাতেই আমি এলুম। চল, ওপরে চল।

উদয় উপরে চলিয়া গেলে পর, অরুণ একটি যুবককে সঙ্গে করিয়া শশব্যস্তে আসিল ও মহা উৎসাহে দালানের একাংশে একখানা সতরঞ্চ পাতিয়া দিয়া কহিল, বোসো গুণেন। খুব ভাল ক'রে গাইবে। গানখানা 'রেকর্ড' হোলে, আমার চেয়ে তোমার নামটাই জাহির হবে বেশী। আমি ত লিখে দিয়েই খালাস, কিন্তু সুরের মাধুর্য্যে ওতে প্রাণসঞ্চয়—সেটা তুমিই করবে। তোমারই দায়িত্ব বেশী। হার্ম্মোনিয়মটা এনে দি, বেশ সুন্দর ক'রে গেয়ে একবার শুনিয়ে দাও দিকি। এই প্রথম গানখানা যদি 'পাবলিকে'র কাণে একবার লেগে যায় গুণেন, তা' হোলে জানবে, রেকর্ড কোম্পানীর কাছে তোমার আদর খুবই বেড়ে যাবে।—বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে অরুণ হার্ম্মোনিয়মটা বাহির করিয়া আনিয়া গুণেনের সম্মুখে রাখিল। অরুণের রচিত গানলেখা কাগজখানা গুণেন হার্ম্মোনিয়মের উপর খুলিয়া গানখানা গাহিতে সুরু করিল—

আজি নয়ন ভরিয়া দেখা দিল মোরে
আমার মানস-রাণী।
চাঁদের আলোতে উঠিল ফুটিয়া
চন্দ্রবদনখানি।
সে যে স্বপনের মত এসেছিল,
চোখে চোখে সে যে চেয়েছিল,
স্নিগ্ধ পরশে মুগ্ধ করিয়া
ক'য়ে গেছে প্রেমবাণী।
জীবন আমার সার্থক আজি,
সার্থক গান গাওয়া—
সারা জীবনে নাহি যদি হয়
আর কভু তারে পাওয়া,
তবু দুঃখ নাহিক মানি—
রিক্ত হৃদয় ভ'রে দিয়ে গেছে
প্রেমের অমৃত দানি'॥

চমৎকার! চমৎকার!—অরুণ কহিল, চমৎকার সুরটি দেওয়া হয়েছে, গুণেন্। গানখানা লেখাও আমার মন্দ হয় নি;—কি বল? আচ্ছা', ঐ 'জীবন আমার সার্থক আজি'—ঐখানটা আর একবার গাও ত। গুণেন গাহিল। অরুণের মুখখানা গর্ব্বে ও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গুণেন কহিল, আজ তা হোলে উঠলুম, অরুণদা'। অনেক কাজ। বলিয়া গুণেন চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে তপন আসিয়া কহিল, মেজদা, উঁনি এসেছেন।

উঁনি মানে?

উঁনি মানে—তিনি গো।

অরুণ বুঝিতে না পারিয়া তপনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে, তপন বলিয়া উঠিল, আরে—কি মুস্কিল! হাজরা রোড।

ওঃ, তালুই মশাই?

হ্যাঁ।—এস, মেজ-বৌদি।

অশ্রু আসিয়া কহিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, হাজরা রোডের উপর তোমার আক্রোশটা ত দেখতে পাই—খুব;—আবার সময় সময় তাঁর ওপর ভক্তি-ভালবাসার বানও ডাকে—খুব। তুমি একটি অদ্ভুত, ঠাকুরপো!

মৃদু হাসিতে হাসিতে তপন কহিল, তাতে বিশেষ কোন ভুল নেই। কারণ, কোন একটা ব্যাপারে, মনটা চঞ্চলও যত শীগ্‌গির হয়, সুস্থও হয় তত শীগ্‌গির। অর্থাৎ খড়ের আগুন। দপ ক'রে যেমন জ্ব'লে ওঠে, তেমনি খপ ক'রে নিভেও যায়। এই বড়দার ওপর সময় সময় আমার এত রাগ হয় যে, মনে করি, বড়দার ত্রি-সীমানায় আর যাব না, কিন্তু তার পরের দিন আর কিছু মনে থাকে না।

অশ্রু কহিল, তা ত থাকে না, কিন্তু আজ এইমাত্র বড়ঠাকুর অনেক কথা আমাকে ব'লে গেলেন।—উদয়ের কথাগুলো সংক্ষেপে অশ্রু স্বামী ও দেবরকে কহিল।

তপন কহিল, স্পষ্ট ক'রে কিছুই বুঝতে পারি না, মেজ-বৌদি। মনটা খুবই বেঁকে বসে, আবার সোজা হয়েও যায়। সে-দিন ষষ্ঠী দত্তর বাড়ী থেকে এসে মনটা এত ফিরে দাঁড়িয়েছিল যে, তা আর বলবার নয়, কিন্তু সেই ফিরে দাঁড়ানটা স্থায়ী হ'ল না, আবার যেমন—তেমনি। কিছুই আর মনে নেই। এইটেই আমার অদ্ভুত স্বভাব আর কি। নিজেও তা বুঝতে পারি।

অরুণ অশ্রুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আরে, তপার কথা আর বোলো না। সে দিন সা-নগর থেকে যে রকম খাপ্পা হয়ে ও ফিরে এল, মনে করলুম, এইবার তপু খুব বড় রকমের একটা কিছু কাণ্ড বুঝি না বাধিয়ে আর ছাড়বে না। সে রাগ কি! জাল, শয়তানী, প্রফুল্ল,

রমেশ, নরপিশাচ,—সে কত কথা! তার পরদিন দেখি—একেবারেই জল।

তুমিই ত মেজদা, জল ক'রে সব বুঝিয়ে দিলে। ব্যাপারটি ত সোজা নয়! রাগ না হয়ে যায়? অফিসের কাজের জন্যে টাকা ধার করা হোল। হ্যাণ্ডনোটে তিনজনে সই দিলুম। তার পর হঠাৎ সে নালিশ ক'রে বাড়ীগুলো সব ক্রোক করবে, সুতরাং তাড়াতাড়ি সব বেনামী ক'রে ফেলতে হবে। এই এত ব্যাপার। তার পর কি না জানা গেল,—সর্ব্বৈব মিথ্যা, কিছুই নয়। এতে কার না রাগ হয়? তাই ভয়ানকই রেগে গিয়েছিলুম। তার পর তুমি বললে, বড়দা'র হয় ত কোন দুষ্টু বুদ্ধি নেই এর ভেতর, তা থাকলে, বাবা মরবার পর সমস্ত সম্পত্তি বড়দা' নিজের নামে কায়দা ক'রে অক্লেশেই নিতে পারতো। ষষ্ঠে দত্তরই হয় ত শোকে মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আর নয় ত বা এষ্টেটের মঙ্গলের জন্যে কোন একটা অভিসন্ধিতে বড়দা' এটা করেছে। এই রকম কত কি তুমি বল্লে,—আমিও শেষকালে তাই বুঝলুম।

তাই বুঝে চুপ ক'রে থাক্। বড়দা'র ওপর কোন কিছু সন্দেহ করা মানেই—পাপ করা।

তা ভাল; আব পাপ কোরব না। কিন্তু তুমি যা-ই বল মেজদা, হাজরা রোডটি কিন্তু লোক ভাল নয়।

ওরে, ও ভাল হয়েও কেউ কারো কিচ্ছু করতে পারে না, মন্দ হয়েও পারে না; ভাগ্যে যা আছে, তা হবে।

তাই হোক। আমার আর কি, খালি তোমার জন্যেই আমার ভাবনা।—রান্না হয়েছে, মেজ-বৌদি? আজ হঠাৎ সকাল-সকালই ক্ষিধে পেয়ে গেছে।

অশ্রু কহিল, বুঝে বল। ক্ষিধে পাওয়াটাই ঠিক ত? এখনিই আবার না বোলে বোস যে, মোটেই ক্ষিধে নেই, কিছু খাব-টাব না। তোমার মত খাম-খেয়ালী ত দুনিয়ায় কেউ নেই!—তার পর স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, ওগো—শুনছ?

অরুণ তখন গভীর মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহার রচিত গানখানি বোধ হয় মনে মনে পাঠ করিতেছিল, সুতরাং স্ত্রীর প্রশ্ন তাহার কাণে পৌছিল না। অশ্রু কহিল, আচ্ছা, এত তন্ময় হয়ে কি পড়ছ বল ত? স্বপ্নের ঘোরে কে তোমাকে দেখা দিয়ে গেল? পথ ভুলে কে এল বল ত'? তাকে আমি সোজা পথ দেখিয়ে দেবো এখন, জীবনে আর কখনও তার পথ-ভুল হবে না।

অরুণ পূর্ব্ববৎ তাহার গানখানিই এক মনে পড়িতে লাগিল।

অশ্রু কহিল, তা', তুমি যে দেখছি একেবারেই তন্ময়! আমি মুখ্যু বলে আমার কথাগুলোও শুনবে না? কিন্তু মুখ্যু আমি একেবারেই নই। তোমার দ্বিতীয় ভাগের ঐ সব খটো-মটো বানান, আর বইয়ের অঙ্কগুলো ঠিক তোমাদের ঐ বইয়ের নিয়মে করতে পারি না বলে, আমায় মুখ্যু ভেবো না। অরুণ মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি? মুখ্যু? কে বলে? এমন পণ্ডিতী কথা যার—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অশ্রু বলিল, তার পেটে বিদ্যে বুদ্ধি যথেষ্টই আছে জেনো। বড় বড় বাজার হিসেবগুলো, নাম্‌তা-টাম্‌তা না জানিলেও এই আঙ্গুল গুণেই ত সব ঠিক করে ফেলি। সাধারণ জ্ঞান-বিদ্যে আমার একটু আধটু আছে মনে কোরো। বলিয়া অশ্রু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

অরুণ গানের কাগজখানা ভাঁজ করিতে করিতে কহিল, তা' একশো বার মনে কবি। এখন যা বলছিলে বল, শুনি কি হয়েছে।

বলছি, ঠাকুরপো কলকাতায় আর থাকবে না, দেশের বাড়ীতে গিয়ে থাকবে। দেশের বাড়ীটা প'ড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পিতৃপিতামহের বাস, তাকে বজায় বাখতে হবে। জননী আর জন্মভূমি হ'ল—স্বর্গাদপি গরীয়সী। দেশের মাটীই মায়ের কোল। এই রকম অনেক কথাই ঠাকুরপো সে দিন আমায় বলছিলো। তা আমি বলছি কি, ঠাকুরপো ত চললো; তুমিও কেন চল না। কেমন সেখানে ফাঁকা মাঠ, চাঁদের আলো;—সেই চাঁদের আলোতে পথ ভুলে কত মানসের রাণী আসবে এখন। আর এ সব ছাড়া, বেণুবন, কাশের গুচ্ছ, পদ্ম, শালুক, ছাতার পাখী, ভুঁড়ো শেয়াল—কত সব সেখানে পাবে। যাবে? যদি যাও—

তাহা হইলে কি যে হইবে, তাহা আর জানা গেল না। তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা টানিয়া দিয়া অশ্রু একটি ধারে গিয়া দাঁড়াইল। নগেনবাবু ধীরে ধীরে যেন চোরেব মত দালানে প্রবেশ করিয়া, অরুণ ও তপনকে লক্ষ্য করিয়া অসাধারণ ভঙ্গীতে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেছে। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটু ঠাণ্ডা ক'রে

এলুম। তার পর কথঞ্চিৎ গলা ছাড়িয়া কহিলেন, মনে ওর দুঃখুটা লেগেছে একটু বেশী। বলে, ছেলেপুলে আমার নেই, আমার আবার সংসার কিসের? কত রেখে-ঢেকে, ফিকির-ফন্দী ক'রে তবে এষ্টেটটাকে বজায় রেখে এসেছি। তা কথাটা উদয়ের খুবই সত্যি। তবে ওর দোষ হচ্ছে—ভাইরা এখন ত আর কেউ ছেলেমানুষ নেই, সব কথা ওদের কাছে খুলে বলে, যা-কিছু করবার, তা করলেই হয়। যেটা গোপন কথা, সেটা ওদের কাছে গোপন রাখবারই বা দরকার কি? ভেতরের কথাটা ওরা কিছুই বুঝবে না, মাঝে থেকে উল্টো কিছু একটা ভেবে নেবে। সেই কথাটাই বেশ ক'রে বুঝিয়ে এতক্ষণ বলছিলুম। অত্যন্ত ভালবাসে, ভাই-অন্ত প্রাণ, তাই রাগটাও হয়েছে—অত্যন্ত। যাক, আমি আবার সন্ধ্যার পর আসব এখন। এখন চল্লুম বাবা, বেলা হয়ে উঠল।

তপন অশ্রুর দিকে ফিরিয়া শশব্যস্তে কহিল, মেজ-বৌদি, তালুই মশায়ের জন্যে চা ক'রে নিয়ে এস। একটু আর ব'সে যান, তালুই মশাই।

না বাবাজী, এখন আর বসবোও না, চা-ও খাব না। চা খেয়েই আজ বেরিয়েছি।—তার পর তপনের পিঠটা চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে নগেন বাবু কহিলেন, তপন কিন্তু আমায় সবচেয়ে ভালবাসে।

তপন হাসিতে হাসিতে কহিল, আপনার নিজের কথাটি বলছেন না কেন? আপনি আমাকে কত ভালবাসেন! তা—চা একটু খেয়ে যান, তালুই মশাই। আপনার জন্যে সে দিন স্পেশাল ফার্ষ্ট কোয়ালিটীর চা এনেছি।

না বাবা, ও-বেলা এসে খাব। নতুন চাকরী একটা এক জায়গায় নেব মনে করছি, সেখানে একবার যাব। খাটতে যখন পারি, তখন আর চুপ ক'রে ব'সে থাকি কেন? পরিশ্রমই পুরুষের পুরুষার্থ। যারা পরিশ্রমে বিমুখ, ফাঁকি দিয়ে যারা বড়লোক হ'তে চায়, তারা বড়ও হ'তে পারে না, ছোটও থাকতে পারে না, ফলে তারা জাহান্নমেই যায়। তা তাই ভাবলুম, এখনও একটু খাটলে যদি ৫০।৬০টা ক'রে টাকা আসে,—আসুক না। সৎকাজ আর পরিশ্রম—বেটাছেলেকে এ দুটো জিনিষের ভয় করলে কখনও চলে?

তপন জিজ্ঞাসা করিল, চাকরী কোথায় নিলেন, তালুই মশাই?

নিই নি এখনও বাবা, নেবার যোগাড় কচ্ছি। লালজী প্রেমজী—বড়বাজারে যাদের মস্ত গদী, সেইখানেই। বলিতে বলিতে নগেন বাবু চলিয়া গেলেন।

দশ

সারা চৈত্র বৈশাখে এবার একটি ফোঁটাও বর্ষণ হয় নাই। তার পর অগ্নিময় জ্যৈষ্ঠ আসিয়া পৃথিবীতে আগুন ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। পুকুর ডোবা শুকাইয়া গিয়া তাহাদের পাঁক শুধু বাহির হইয়াই পড়ে নাই, প্রখর রবিতাপে তাহা শুষ্ক ও কঠিন হইয়া, ফাটিয়া চৌ-চির হইয়াছে। পাতকুয়ায় কাহারো এক বিন্দু জল নাই। যেগুলি খুব গভীর, হয় ত সেগুলির মধ্যে ঘটী ডোবে, কিন্তু যা' একটু জল পাওয়া যায়, তা কাদা-ঘোলা এবং দুর্গন্ধময়—অর্থাৎ মুখহাত ধুইবার পক্ষেও অযোগ্য। জলাভাবে মানুষ স্নান করিতে পায় না, কাপড় কাচিতে পারে না। হয় ত আধক্রোশ তিনপোয়া দূরে একটি মাত্র পুষ্করিণীতে যৎসামান্য কিছু জল আছে—তাহাই লইয়া সকলের কাড়াকাড়ি। সেইখান হইতে কোন গতিকে পানের ও রন্ধনের জল সকলে লইয়া আসে। গরু-বাছুর, ছাগল প্রভৃতি জলাভাবে ও তৃণাভাবে মৃতপ্রায়। মাঠ ফুটি-ফাটা হইয়া ধূ ধূ করিতেছে, তাহার কোথাও একগাছা ঘাস পর্য্যন্ত নাই।

সে দিন সকালে বকুলবাটী গ্রামের রথতলায় রামধন মোড়লের দোকানে বসিয়া গ্রামের জনকতক লোক তামাক টানিতে টানিতে এই দারুণ জলকষ্ট ও অনাবৃষ্টির প্রসঙ্গ লইয়াই আলোচনা করিতেছিল।

স্বয়ং রামধন কহিল, বহুকাল আগে এই রকম জলকষ্ট একবার হয়েছিল বটে, তখন আমার বয়স এগারো কি বারো। এ তল্লাটের কোথাও একটি বিন্দু জল ছিল না। কত গরু বাছুর আর লোক যে সেবার মারা গিয়েছিল, তার আর সংখ্যা হয় না। অনেক লোক গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেছ্‌লো। শেষের দিকটায় অরুণনগরের বাবুরা গাড়ী ক'রে গাঁয়ে গাঁয়ে জল বিতরণ করেছিল।

অবশ্য রামধনের বয়স উপস্থিত সকলের অপেক্ষা বেশী হইলেও, নিতাই পাল তাহার শেষের কথাটাকে আক্রমণ করিয়া কহিল, এটি

খুড়ো তোমার আজগুবি কথা, বাবা! যখন তল্লাটের কোন যায়গায় এক বিন্দু জল নেই, তখন অরুণনগরের বাবুরা গাড়ী ক'রে গাঁয়ে গাঁয়ে জল বিতরণ করবে কি ক'রে?

রামধন কহিল, কি ক'রে তা জানি না, তবে আমার বেশ মনে আছে যে—করেছিল। বড় বড় জলের জালা রাখবার জন্যে আলাদা সব গাড়ীই তৈরী হয়েছিল—ষোষে টানতো।

নিরঞ্জনের একটু বয়স কম। সে খুব বিজ্ঞের মত কহিল—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠাকুরমার কাছে শুনিছি বটে যে, মেয়েরা সেবার দল বেঁধে কেঁদে, সেই চোখের জলে নাকি কলসী বোঝাই করত, আর সেই জল নাকি রান্না-খাওয়ায় ব্যবহার হ'ত।

গোপাল সিমলাই কহিল, রামধন জ্যেঠার কথাটা বুঝি তোর বিশ্বাস হ'লো না, নীরে?

রামধনের খদ্দের আসিয়া পড়িয়াছিল, কথাটায় আর মনোযোগ দিতে পারিল না। সুতরাং আলোচনাটা অন্য পথে প্রবাহিত হইল। জল-কষ্ট হইতে অন্নকষ্ট; চাষ—আবাদ; ধান; 'আমে ধান—তেঁতুলে বান'; এবার আমটা যেরূপ প্রচুর হয়েছে, ধানটাও খুব সম্ভব প্রচুর জন্মাবে; কিন্তু জলাভাবে এখনও পর্য্যন্ত কেউ বীজ ফেলতেই পারে নাই; নেত্য সেকরাণী ম'রে ভূত হয়েছে; তাঁতিদের ছোট বৌটা—ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর তাঁতিপাড়া ডিঙ্গাইয়া চালতা-তলা দিয়া, প্রসঙ্গটা উত্তরমুখী হইয়া পড়িল এবং সর্ব্বমঙ্গলা তলা ছাড়াইয়া একেবারে মধ্যের পাড়াকে গিয়া অধিকার করিয়া বসিল। এবার নাকি মাঝেরপাড়া-ওয়ালারা বারোয়ারীতে দুর্গোৎসব আনবে। ভাঁড়ারীর দল দু'রাতের জন্যে বায়না হবে। কাশী চাটুয্যেই হ'ল চাঁই। লোকটা বাস্তবিকই সদা-প্রফুল্ল। তবে ঐ মেয়েটাকে নিয়েই ওর যা একটু দুঃখ। টপ ক'রে বৃন্দাবনটা ম'রে গেল। সে ত ওর ভাইপো ছিল না, সে ছিল যেন ঠিক ওর নিজেরই ছেলে। মেনা মেয়েটারও কিন্তু বরাত খারাপ। বাপ বিয়ে দিলে; একটি বছরও গেল না, নিজেও বিধবা হ'ল, বাপটিও গেল। বিয়েটাই যেন একটা অশুভক্ষণে হয়েছিল; আজ ভাগ্যে কাশী চাটুয্যে বেঁচে ছিল, তাই······

গোপাল সিমলাই বলিল, মেয়েটা কিন্তু বেহায়ার হদ্দ।

মনোমোহন বলিল, সে বিষয়ে অপরাধটা কি? একে বিধবা, তাতে ঐ বয়স, তাতে রূপও আছে, লেখাপড়া জানে, তার ওপর বাপ সখ ক'রে গান-বাজনা শিখিয়েছে,—সুতরাং হবে না কেন?

শিবকালী একটু অঙ্গমোড়া দিয়া কহিল, দেখ, গোপাল, তোদের কথার ওপর একটা কথা বলি। মেনার মত ভাল মেয়ে আজকালকার দিনে খুব কমই হয়। বেহায়া ত নয়ই, মানে, কথা হচ্ছে, মিনমিনে গোছের নয় আর কি। যা বলে, তা স্পষ্টই বলে; যা করে, তা সকলের সামনেই করে। মনে কোন পাপ নেই, তাই মিথ্যা লজ্জাফজ্জার ধার ধারে না।

অবিনাশ শিবকালীকে সমর্থন করিয়া বলিয়া উঠিল, ঠিক বলেছ, শিবুদা; মেনা একটা খুব ভাল মেয়ে যে, তার আর সন্দেহই নেই।

রামধন গুড় ওজন করিতে করিতে কহিল, তা বোলে কি সোমত্ত মেয়ের ঐ রকম যখন-তখন ঘরে ব'সে গান গাওয়া ভাল? আর চাটুয্যেমশায়েরই কি এতে পরিশ্রয় দেওয়াটা ভাল?

তখন এই ভাল-মন্দ উপলক্ষ্য করিয়া দুইটি দলের সৃষ্টি হইল এবং দুই দলে ইহা লইয়া মহা বচসার উদ্ভব হইল। বচসা যখন মধ্যম ছাড়াইয়া পঞ্চম এবং পঞ্চম ছাড়াইয়া ধৈবতে উঠিল, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে তেলের বোতল হাতে ঝুলাইয়া নন্দহরি আসরে অবতীর্ণ হইয়া এক পক্ষ অবলম্বন করিল। তখন যেটুকু বাকী ছিল, তাহা পূর্ণ হইল। তুমুল ব্যাপার। বকা-বকি, চেঁচা-মেচি এবং ঠেলা-ঠেলি। হঠাৎ মনোমোহনের হাতের একটা ধাক্কায় গোপালের হাতের হুঁকা হইতে অগ্নিসমেত কলিকাটা নিরঞ্জনের গায়ে পড়িল। নিরঞ্জন লাফাইয়া নন্দহরির উপর পড়িল। নন্দর হাতের বোতলটা গিয়া লাগিল—শিবকালীর গায়ে। শিবকালীর ও মনোমোহনের পায়ের গুঁতা লাগিয়া জলের কলসীটা গেল গড়াইয়া, চ্যাঙ্গারির পাণগুলা গেল ছড়াইয়া এবং রামধন বলিয়া উঠিল চোখ রাঙ্গাইয়া, কি সব কাণ্ড বল দেখি তোমাদের? তোমাদের জন্যে দোকানখানা কি আমি তুলে দেবো বলতে পার?

রামধনের দোকানে এরূপ ব্যাপার প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কোন-না-কোন আলোচনা উপলক্ষ্য করিয়া ইহাদের মধ্যে এইরূপ কাণ্ড প্রায়ই সংঘটিত হয়। আবার পরস্পরের মধ্যে সন্ধি হইয়া একটা শান্তভাবের সৃষ্টি হইতেও বড় বেশী বিলম্ব হয় না। এ যেন কালবোশেখীর ঝড়, হঠাৎ আসে—হঠাৎ যায়।

ঝড়-ঝাপটা শান্ত হইবার পরক্ষণেই এক সুদর্শন যুবক দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সকলেরই দৃষ্টি তাহার দিকে পতিত হইল। রামধন যোড়হাত মাথায় ঠেকাইয়া নমস্কারান্তে কহিল, ছোটবাবুর এখন থাকা হবে কি দু'চার দিন?

হ্যাঁ; বাড়ীটা একটু-আধটু মেরামত করাতে হবে কি না।

শিবকালী কহিল, খিড়কীর পাঁচীলের খানিকটা ত একেবারেই প'ড়ে গেছে।

গোপাল সিমলাই কহিল, ওটা আর মাসখানেক গাঁথবেন না। আপনাদের খিড়কীর পুকুরের ঐ জলটুকুই ও পাড়ার মেয়েদের ভরসা। ঐখান দিয়েই সব ঘাটে নামে। ওটি বন্ধ হোলে, আপনাদের মাঝের পাড়ার লোকেরা আর এক বিন্দু জল পাবে না।

যুবকটি কহিল, না ওখানটা গাঁথবো না, তবে একটা দরজা ঐখানে বসিয়ে দেবো মনে করছি। সেটা অবশ্য এখন খোলাই রেখে দেবো। বাস্তবিক, জলের কষ্ট দেখছি ভীষণ! এ কি সব গাঁয়েই?

রামধন কহিল, সর্ব্বত্র, বাবু, সর্ব্বত্র; তল্লাটের কোথাও এক বিন্দু জল নেই! সে দিন একটা নারকোল পাড়লুম বাবু গাছ থেকে; কেটে দেখি—একেবারে ভুয়ো! বসুন্ধারাই জলশূন্যি, তা তাতে জল হবে কোত্থেকে?

মনোমোহন কহিল, শুধু কি জলই নেই? জল নেই, শস্য নেই, গাছে ফল নেই, গরুর বাঁটে দুধ নেই, লোকের মনে নেই সুখ, দেহে নেই স্বাস্থ্য; বসুন্ধরা যেন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে দেউলে-খাতায় নাম লিখিয়ে মুখটি বুজে প'ড়ে রয়েছে!

গোপাল সিমলাই কহিল, হবে না? মানুষের পাপ যে ষোল আনারও ওপরে উঠেছে। বসুন্ধরার ওপর অত্যাচারটা কি কম হচ্ছে? তার বুকের ভেতর থেকে—কয়লা, অভ্র, লোহা—কত-কি তার লুকোনো জিনিষ, কল বসিয়ে, জোর ক'রে বার কোরে নেওয়া হচ্ছে। তার আকাশ থেকে বিদ্যুৎ ধ'রে ধ'রে 'ফ্যানের' হাওয়া খাওয়া হচ্ছে! এ কি অত্যাচার করা হচ্ছে না বলতে চাও? তার অতল-বুকের পাতাল-জলটুকু পর্য্যন্ত, পাইপ বসিয়ে, পম্পো ক'রে ক'রে টেনে বার ক'রে নেওয়া হচ্ছে! পাপের কি আর সীমে-পরিসীমে আছে! অমন যে কৈলাস—স্বয়ং মহাদেবের আস্তানা,—সেখানে পর্য্যন্ত মানুষের অত্যাচার সুরু হয়েছে! এ সব পাপ কি অমনি যাবে?—বলিয়া একটু উত্তেজিত-ভাবেই যেন গোপাল সিমলাই গা-নাড়া দিয়া বসিল।

রামধন কিন্তু মনে মনে ভীত হইয়া পড়িতেছিল, পাছে এই সূত্রে আবার একটা মহামারী ব্যাপার ঘটিয়া যায়। সুতরাং সে হারিকেনের আলোটা এবং জলের বড় ঘটীটা সরাইয়া এক ধারে রাখিয়া দিল। কিন্তু এবার আর কিছু ঘটিল না। আলোচনা শান্ত এবং সংযতভাবেই চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আগন্তুক যুবকটি চলিয়া যাওয়ার পর তাহার সম্বন্ধেও যে আলোচনা এবং সমালোচনা চলিল, তাহার ধারাটিও তেমন অশান্ত, অসংযত বা মারাত্মক হইয়া উঠিল না।

আগন্তুক—তপন। আজ কয় দিন হইল তপন কলিকাতা হইতে দেশের বাটীতে আসিয়াছে। একলাই আসিয়াছে। সঙ্গে আছে একটি চাকর এবং একটি 'কুকার'।

তপন চলিয়া গেলে গোপাল সিমলাই কহিল, এইবার ও-পাড়ার সকলকে জলের জন্যে মরতে হবে।

নিরঞ্জন কহিল, তার মানে?

গোপাল কহিল, তার মানে—খিড়কীর ঐ পাঁচীলটাতে দরজা একটি বসিয়ে চাবি বন্ধ ক'রে রাখবে, কাউকে আর ঘাটে নামতে দেবে না! গোপাল আসনপিঁড়ী হইয়া বসিয়াছিল; এই কথা বলিয়া নড়িয়া-চড়িয়া উবু হইয়া বসিল।

শিবকালী কহিল, কৈ, তা ত বললেন না। বল্লেন যে দরজা একটা গাঁথাব বটে, কিন্তু সেটা খোলাই রেখে দেবো।

নিরঞ্জন কহিল, আরে মুখে ত ব'লে গেল; বলি—মুখ আর মন ত লোকের এক নয়। বিশেষতঃ ও সব হোল—কোল্‌কাতিয়া ছোকরা। ও গোপাল যা বলেছে, তাই ঠিক।

নন্দহরি বলিল, বাবুর ভাব-ভঙ্গীটা একবার লক্ষ্য করলে ত? চুলের ফ্যাসানটা? তা আমি ভাবছি হঠাৎ এই বন-জঙ্গল দেশে আগমনের হেতুটা কি? মতলব একটা অবিশ্যি কিছু আছেই: নইলে দেশের মাটী ত কেউ বড় একটা মাড়ান না।

রামধন এতক্ষণ আর কোন কথাই বলে নাই। নন্দহরির কথায় কহিল, কোলকাতার রস শুকিয়ে এসেছে, বুঝতে পাচ্ছ না? তাই এইবার দেশের মাটীর ওপর সকলকেই এসে গড়াতে হবে।—তেলের দামটা কি তোমার লিখতে হবে না কি?

লেখা-টেখা আর বাড়িও না, দা'ঠাকুর—তোমায় ব্যাগ্যাতা করি। লেখার দিকটা যে দিন দিন বড্ড ভারী হোয়ে পড়ছে!

নন্দহরি বোতলটা রামধনের হাতে দিয়া কহিল, ভারী আর হোতে দিচ্ছি কই বল্ না। এই ত হালখাতার দিন চার টাকা দিয়ে গেছি।

তা দিয়ে গিয়েছ বটে। ছাব্বিশ টাকা হোয়েছিল, চার টাকা দিয়ে গেছ। তার পর আবার এই দু'মাসে সাত আট টাকা আন্দাজ জমেছে। এ রকম করলে আর কি ক'রে পেরে উঠি বল?

নন্দহরি কথাটায় কর্ণপাত না করিয়া তেলের বোতল লইয়া, এক পা এক পা করিয়া চলিয়া গেল এবং তাহার উপর তাগাদার জেরটা পাছে আর সকলের উপর আসিয়া পড়ে, সেই আশঙ্কায় সকলেই একে একে তখন গৃহে যাইবার উদ্দেশে উঠিয়া পড়িতেছিল, এমন সময় অদূরে রাধু-বৈরাগীকে দেখিয়া সকলেই আবার চাপিয়া বসিল। রাধু কাছে আসিলে নিরঞ্জন কহিল, অনেক দিন তোমার গান শোনা হয় নি, রাধু! আজ একখানি শুনিয়ে যেতে হচ্ছে।

রাধু কহিল, গান গাওয়াই ত ব্যবসা, দা'ঠাকুর: গান গাইব বই কি; কিন্তু গাঁয়ের লোকে আমার গান শুনে কেউ কখনো একটি পয়সা আমায় দেয় না। রোজই আমাকে গাঁ ছেড়ে ভিন্ গাঁয়ে ভিক্ষেয় যেতে হয়। পেটে খেতে হবে ত?

মনোমোহন কহিল, আচ্ছা ভাল দেখে গাও একখানা, রামধন খুড়ো দেবে এখন একটা পয়সা।

রামধন ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া কহিল, হ্যাঁ, রামধন খুড়োর ত আর এ দোকান নয়, সদাব্রেত খুলে বসেছে! রামধন খুড়ো দিতে-টিতে কিছু পারবে না।

গোপাল সিমলাই রাধুর দিকে ফিরিয়া কহিল, গান না গাইতেই প্যালা নিয়ে যে আগেই গণ্ডগোল বাধলো দেখছি। তুমি আগে গান একখানা গাও ত রাধু, তার পর পয়সা একটাই হোক, আর এক পালি চালই হোক, তার ব্যবস্থা হবে'খন।

সুতরাং রাধু তাহার খঞ্জনী বাজাইয়া গান ধরিল—

ভিখারিণীর বেশে আমায়
কেমন করে চিনবে শ্যাম?
শ্রীরাধিকার সাধের সখী—
বৃন্দে দূতী আমার নাম।
যখন ছিল অসময়,
চিনতে আমায় রসময়,
এখন যে গো দিন ফিরেছে,
পূর্ণ যে গো মনস্কাম।
রাধার জন্যে কতই কাঁদা,
পায়ে ধ'রে কতই সাধা;
সে সব কি আর সোজায় তোমার
পড়বে মনে বাঁকা-ঠাম?

গানটি শেষ করিয়া রাধু রামধনকে কহিল, দাও খুড়ো, চারটি চালই হোক, কি একটা পয়সাই হোক, দিয়ে দাও। বড্ড রোদ্দুরটা উঠে পড়ল। আজ যাব অনেকটা দূর বটে গো—সেই ময়নাতলার হাট ছাড়িয়ে, বিবিপুর। দোকানে তখন আর কেহই ছিলনা। রাধুর গানটি শেষ হইবার পূর্ব্বেই, একে একে, ধীরে ধীরে যে যাহার গৃহের উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছিল।

এগার

মাঝের পাড়ায় বোসেদের প্রকাণ্ড বাড়ীর অনতিদূরেই কাশীনাথ চাটুয্যে মশায়ের বাড়ী। তাঁহার প্রতি নিতান্ত স্নেহবশতঃই যেন তাঁহার এই জীর্ণ বাড়ীখানি এখনও ভূতলশায়ী না হইয়া নিজ ক্ষত-বিক্ষত বক্ষে তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে এবং নিজের আসন্ন অন্তিম দিনটির প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ধুঁকিতেছে।

কাশীনাথ চাটুয্যে মহাশয়ের কিন্তু অন্তিম দিন আসিয়া পড়িবার মত বয়স হয় নাই। বৃদ্ধ তিনি বটেন, কিন্তু অতি বৃদ্ধ নহেন। তাঁহার বয়স ৫৫ কি ৫৬ হইবে। এত দিন সংসারে স্ত্রী কাননবালা ভিন্ন আর কেহই ছিল না, কিন্তু আজ বছর চারি পাঁচ হইল, তাঁহার মৃত ভ্রাতুষ্পুত্র বৃন্দাবনের সদ্যো-বিধবা কন্যা মৃণাল আসিয়া তাঁহার সংসারভুক্ত হইয়াছে। সে দিন সকালে রামধনের দোকানে, যাহার কথা লইয়া প্রলয়কাণ্ড ঘটিবার সূচনা হইয়াছিল, সে এই—মৃণাল। মৃণাল ভাল কি মন্দ, এই বিচার করিতে গিয়াই সে-দিনের তুমুল ব্যাপারের সৃষ্টি হইয়াছিল। অথচ তাহার সম্বন্ধে কাহারই সত্যকার অভিজ্ঞতা ছিল না যে, সে ভালও নহে, মন্দও নহে, সে অসাধারণ।

এক দিন অপরাহ্নে কাশীনাথের জীর্ণ বাটীর

একখানা গৃহমধ্যে বসিয়া একটি ন'দশ বৎসরের বালিকার সহিত যে কুড়ি একুশ বৎসরের যুবতীটি পুতুল লইয়া খেলা করিতেছিল, সেই—মৃণাল। বিজু নামে ঐ মেয়েটি মেঝের এক ধারে তাহার পুতুলগুলি, তাহাদের জামা-কাপড়, পুঁতির মালা, খাট-বিছানা প্রভৃতি সাজাইয়া সাজাইয়া রাখিতেছিল, আর একধারে মৃণালও তাহার পুতুলের ঘরকন্না পাতাইতে ব্যস্ত ছিল। আজ একটা বিয়ের দিন আছে; তাই আজ বিজুর মেয়ের সহিত তাহার ছেলের বিবাহের আয়োজন হইতেছিল।

বিজু মৃণালের মনোযোগ তাহার দিকে আকৃষ্ট করিয়া কহিল, মেয়েকে আমি বেশী দিন শ্বশুর-বাড়ীতে ফেলে রাখতে পারব না, মেণাল দি', তা কিন্তু আমি ব'লে রাখছি। মৃণাল কহিল, মেয়েকে তোর চিরকাল বাপের বাড়ীতে রাখতে চাস না কি? তা হ'লে ত তাকে আমার মত বিধবা হ'তে হয়।

তুমি বুঝি বিধবা, মেণাল দি'?

যাঃ—মিছে কথা তা হ'লে ত তুমি বুড়ী হ'তে।

মৃণাল কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কানন সেই ঘরে আসিয়া কহিল, হ্যাঁ লা, কচি-খুকীগিরি তোর আর কিছুতেই গেল না। বলি, এ সব ভালও ত লাগে।—একটা লম্বা হুঁ দিয়া, মৃণাল তাহার পুতুলের কাজে যেমন ব্যস্ত ছিল, তেমনই ব্যস্ত হইয়া রহিল। কানন কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহার কাণ্ড দেখিল এবং অবশেষে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তখন বিজু তাহার পুতুলগুলি বাক্সের মধ্যে গুছাইতে গুছাইতে কহিল, মেণাল দি, সবই ঠিক হয়ে থাকলো। সন্ধ্যার সময় ত বর আসবে, এখন আমি যাই; রায়েদের বড় বাগানে আম কুড়ুই গিয়ে। তুমিও যাবে দিদি?

তুই যা, আমি খানিক পরে যাব'খন; বলিয়া মৃণালও উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর বিজু ছুটিয়া চলিয়া গেলে, সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খানিক কি ভাবিল; তার পর বাক্স খুলিয়া একখানা পদাবলীর বই বাহির করিয়া তাহা পড়িতে লাগিল। খানিকটা মনে মনে পড়িবার পর কহিল, কি চমৎকার!—

'হরি নিজ আঁচরে, রাই মুখ মুছই
কুঙ্কুমে তনু পুন মাঝি।
অলকা তিলক দেই, সীঁথি বনায়ই;
চিকুরে কবরী পুন সাজি॥
মাধব সিন্দূর দেয়ল সীঁথে।
কতহুঁ যতন করি, উর'পর লেখই,
মৃগমদ-চিত্রক পাঁতে॥
মণিময় মঞ্জীর চরণে পরায়ল,
উর'পর দেয়ল হার।
তাম্বুল সাজি, বদন ভরি দেয়ল'
নিছই তনু আপনার॥
নয়নহিঁ অঞ্জন, করল সুরঞ্জন,
চিবুকহিঁ মৃগমদ-বিন্দ।
চরণকমলতলে, যাবক লেখই,
কি কহব দাস গোবিন্দ॥
কি কহব বোলই আজি॥'

—এ সবের কাছে কি আর কিছু লাগে? এর আর তুলনা নেই। একবার সুর ক'রে গাই।—বলিয়া মৃণাল তন্ময় হইয়া গানখানি গাহিল। গীত শেষ হইলে, মুক্ত দরজার দিকে চাহিয়া মৃণাল উঠিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, কোথায় গেছলে, দাদু? তোমার চা বে'ধ হয় তৈরী—আনব?

কাশীনাথ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, আনব মানে? চায়ের জন্যে প্রাণ ছট্‌ফট্—শীগ্‌গির নিয়ে আয়। বলিয়া তিনি তাঁহার কাঁধের উড়ানিখানা আলনায় রাখিলেন, গায়ের ফতুয়াটা খুলিয়া আনলার দড়িতে মেলিয়া দিলেন, তার পর হাতপাখাখানা লইয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন।

খানিক পরেই মৃণাল চা লইয়া প্রবেশ করিল এবং চায়ের কাপটা সম্মুখে রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। কাশীনাথ ধীরে ধীরে তাহাতে চুমুক দিতে সুরু করিলেন এবং দুই চারি চুমুক পান করিবার পর গভীর তৃপ্তিতে কহিলেন, এতক্ষণে প্রাণ মম হইল শীতল!

মৃণাল রান্নাঘর হইতে চা খাইয়া পুনরায় এ ঘরে আসিল। দাদুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি শীতল হোল, দাদু?

উৎফুল্ল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাশীনাথ কহিলেন, প্রাণ—প্রাণ, হৃদয়। বুঝ্‌ছিস্? কিন্তু চা-টা আজকের তেমন সুবিধের হয় নি। কে করেছে রে, তুই—না তোর দিদিমণি?

দিদিমণি।

তা বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ঘরে যখন আমার তুই গৃহিণী বর্ত্তমান, তখন চা করাটা ছোট

গিন্নীরই কর্ত্তব্য। চা, কি পাণ সাজা, কি ভাল তরকারিটা-আসটা—এ সব ছোটরই করবার কথা। বড় বুড়ো হোয়েছে; সে এখন গোয়াল ঝাঁট দেবে, ধান সেদ্ধ করবে—

আর?

আর ঘরের ঝুল ঝাড়বে, বাটনা বাটবে, আর রান্না-বান্নার মধ্যে বড় জোর ভাতটা আর ডালটা রাঁধবে।

আচ্ছা দাদু, একটা কথা বলি শোন।

এই সময়ে কানন শশব্যস্তে এ ঘরে আসিয়া কহিল, হ্যাঁগা, শোন দেখি।

কাশীনাথ উভয়ের মুখের দিকে এক একবার চাহিয়া কহিলেন, দুই দিকে দুই আকর্ষণ! এক দিকে প্রফুল্ল মৃণাল,—এক দিকে পুষ্পিত কানন! এক দিকে নবারুণের বিচিত্র স্বর্ণচ্ছটা, আর এক দিকে পড়ন্ত সূর্য্যের ম্লান ঝিকিমিকি; একদিকে উদয়, একদিকে অস্ত; কার কথা আগে শুনি?

মৃণাল হাসিতে হাসিতে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

কানন কহিল, আচ্ছা—ও হতভাগীর সামনে ঐ ধরণের কথা সব বল কেন? সর্ব্বনাশের কি আগুন ওর প্রাণে জ্বলছে, সেটা কি তোমার মনে থাকে না?

থাকে। কিন্তু সে আগুন ত আর নেই। এই পাঁচ বছর ধ'রে তাতে জাহ্নবীর পবিত্র ধারা প'ড়ে যে তা নিভে গেছে। যদি কিছু জ্বল্‌তে দেখে থাক, তা আগুন নয়, জোনাকীর আলো—স্নিগ্ধ, দীপ্তিময়; তার দাহিকা শক্তি নেই।

অত-শত আমি বুঝি না। সোমত্ত বয়েসে বিধবা হয়েছে, রঙ্গরহস্যের কথা ওর সামনে না বল্‌লেই ভাল হয়।

ঐ যে বল্‌লুম, বুঝলে না? সে সব বিষয়ে কাশীনাথ চাটুয্যে ওকে 'প্রুফ' ক'রে গড়ে তুলেছে। ওর জন্যে ভয়-ভাবনার কিছু নেই, কানন। ভয় বরঞ্চ তোমার এই কাননের ফুলটিকে নিয়ে।

ও-সব ঢং-ঢাং রেখে দাও। হ্যাঁ,—যা বলতে এলুম, সেইটেই ভুলে যাচ্ছি। আচ্ছা, আমার বাক্সতে তুমি হাত দাও কেন বল দেখি? কত লুকিয়ে একটা টাকা রেখেছিলুম, ও মা! সেটিকে খুঁজে-পেতে বা'র ক'রে নিয়ে গেছ! বলি, এই চুরি করা স্বভাব তোমার আর গেল না?

গম্ভীরভাবে কাশীনাথ কহিলেন, চুরি করা স্বভাব, আমার না তোমার? সেদিন ধার চাইলুম, একটা আধুলি বার ক'রে দিয়ে বল্‌লে—'এই আটটি গণ্ডা পয়সাই আমার পুঁজি ছিল, নাও; শীগ্‌গির দিও।' তার পর আর পুঁজি না থাকলেও, পরশু আবার দশ আনা বার ক'রে দিলে। বল্লে—যা ছিল, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে দিয়ে দিলুম, আর একটি আধলাও আমার রইল না। তা, একটি আধলাও যখন রইল না, তখন তোমার বাক্সটি ত একেবারেই দেউলে; আবার তাতে টাকা থাকবে কি ক'রে; কোমর বেঁধে যে দাবী করতে এসেছ বড়?

কানন চোখ মুখের ভঙ্গী করিয়া কহিল, আমার কাছে কি আছে না আছে, সে খোঁজে ত তোমার কোন দরকার নেই। এ ত ভাল জ্বালায় পড়লুম আমি!

মৃণাল পুনরায় এ ঘরে আসিয়া কহিল, কি হোয়েছে, দিদিমণি?

কানন কহিল, নিজের দু'চারটে পয়সা সময়-অসময়ে খরচ-পত্তর করব, এখানে-সেখানে লুকিয়ে রাখি, তা পর্য্যন্ত খুঁজে-পেতে বার করে নিয়ে নেবে! ন'বছর বয়সে এসে এ-সংসারে ঢুকেছি, আর আজ ৪৫।৪৬ বছর বয়স হোল, এই চিরটা কালই দেখছি, এই ছিঁচকেচুরির অভ্যেসটা আর গেল না! ও তখনও যা, এখনও তা।

জানালার ফাঁকে বাহিরের দিকে চাহিয়া কাশীনাথ কহিলেন, ব'লে যাও, ব'লে যাও—থামলে চলবে না।

মৃণাল কহিল, তুমিও খুব শুনিয়ে দাও না, দাদু; এক তরফা শুধু তুমিই বা শুনবে কেন?

না রে দিদি, এখন একতরফাই আমাকে শুনে যেতে হবে। বিয়ের পর প্রথম বয়সে ছিল আমার বলবার পালা। উনি তখন তিন হাত ঘোমটার ভেতর ক'নে বৌটী সেজে নীরবে সব শুনে গেছেন। সুতরাং এ-বয়সে ওঁরই এখন বলবার পালা, আমি এখন নীরবে শুনে যেতে থাকব। এর পর আবার ভবিষ্যতে যদিও আর একটা সময় আছে—যখন দু'জনে আরও বুড়ো-বুড়ী হ'ব।

কানন জিজ্ঞাসা করিল, তখন কি হবে?

তখন দু'জনেই সমান ওজনে দু'জনকে বলতে থাকবো।

তা' হোলে তা শুনবে কে?

তখন শুনবে—তোমার গিয়ে—পাড়ার লোকে।

কানন কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই সময় বাহিরে কে এক জন ডাকা-ডাকি করাতে কাশীনাথ বাহিরে চলিয়া গেলেন। কানন ও মৃণাল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তখানেক পরেই কাশীনাথ তপনকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় এ-ঘরে আসিলেন। তপনকে কহিলেন, তা তুই যে বরাবর বাড়ীর ভেতর চ'লে না এসে, এই রকম পরের মত বাইরে থেকে ডাকবি, সেটা ত আন্দাজ করতে পারি নি কি না।—বোস্ ভাই, বোস্। শুনলুম, তুই ক'দিন হোল এসেছিস্! তোর ঠাকুরমা কাল বলছিল যে, তপু তোমার কাছে এসেছিল। দাঁড়া, তোর একটু চায়ের কথা ব'লে আসি।

কাশীনাথের সহিত বসু পরিবারের বহু দিন হইতেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। স্বর্গীয় জ্ঞানশঙ্কর কাশীনাথকে মুখেই শুধু খুড়া বলিয়া সম্বোধন করিতেন না। কাশীনাথ তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও, সম্পর্ক হিসাবে তিনি কাশীনাথকে আপন পিতৃব্যের ন্যায়ই জ্ঞান করিতেন। সেই হিসাবে উদয়, অরুণ এবং তপন যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার সঙ্গেই তাঁহাকে আপন পরিজন বলিয়া মনে করিয়া থাকে। পূর্ব্বে, বছরের মধ্যে কোন না কোন সময় কাশীনাথ সস্ত্রীক কিছুদিন ধরিয়া বরানগরে কাটাইয়া আসিতেন। আজ পাঁচ বৎসর হইল, মৃণাল তাঁহার গলায় আসিবার পর হইতে সে নিয়ম প্রায় বন্ধ হইয়াছে। তাঁহার অপুত্রক সংসারে, একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র বৃন্দাবনের এই কন্যাটি আসিয়া তাঁহার পায়ে প্রীতি ও কর্ত্তব্যের বেড়ি এমন শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে যে, এই মুক্ত বিহঙ্গমের স্বাধীন পক্ষদ্বয় তাঁহার বকুলবাটীর গৃহমধ্যে যেন পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে।

কাশীনাথ আসিলে তপন কহিল, শরীরটা আছে কেমন, ঠাকুর্দ্দা?

সর্ব্বাঙ্গ একবার দেখিয়া লইয়া কাশীনাথ কহিলেন, এ শরীরের ভালও নেই, মন্দও নেই; অর্থাৎ কি না—সমভাব। তা যাক, দেশে মাঝে মাঝে এই রকম আসা-যাওয়া করলে আমাদের মনে একটু আহ্লাদ হয়, ভাই।

মাঝে মাঝে নয়, ঠাকুর্দ্দা; মনে করছি, দেশেই থাকব। খানকতক ঘর মেরামতের জন্যে লাগিয়ে দিয়েছি। মেজদা, মেজ-বউদি আর আমি দেশেই থাকবো; বড়দা শুধু বরানগরে থাকবেন।

বেশ বেশ। অরুণ এসে থাকলে, সুন্দর হবে। দুই লেখক তখন বকুলবাড়ীর সব বাড়ীটাই আলো ক'রে বসব। অরুণ হোল কবি, আর আমি হলুম—গবি। তার হোল পদ্য আর আমার হোল গদ্য; জমবে ভাল।

কই ঠাকুর্দ্দা, আপনার লেখা-টেখা আর ত বড় কাগজে দেখতে পাই না।

পাবে না ত ভাই। মধ্যে এক জায়গা থেকে শ' পাঁচেক টাকা পেয়ে গিছলুম। সুতরাং লেখার দপ্তরকে সিকেয় তুলে ফেলেছিলুম। বছরখানেক পরে টাকাটা এইবার ফুরিয়েছে, তাই সেদিন দোয়াত কলমটা নামিয়ে আবার লিখতে সুরু করেছি।

তপন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কাশীনাথ কহিলেন, আমার লেখার ব্যাপারটা কি রকম জানিস? এই যেমন কুড়ে ঘরামীগুলোর স্বভাব, আমারও ঠিক তাই। সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে চালের হাঁড়িতে দেখি, চাল আছে কি না। যদি থাকে ত আবার পাশ ফিরে শুই। আর যদি দেখি নেই, অমনি দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখতে ব'সে যাই। এই আজই একটা গল্প এখনি ডাকে ফেলে দিয়ে এলুম। যেহেতু হাত একেবারে শূন্য। তোর ঠাকুরমার বাক্স-তোরং হাতিয়ে ক'দিন চালিয়ে দিলুম, কিন্তু আর চলে না; বড্ড কথা শুনতে হয়।

অতঃপর মৃণাল তপনের জন্য চা লইয়া আসিল। তখন চা খাইতে খাইতে নাতি ঠাকুর্দ্দায় বসিয়া নানা কথা, নানা আলোচনা চলিতে লাগিল।

বার

সন্ধ্যার বহু পূর্ব্ব হইতেই আষাঢ়ের আকাশ অল্পে অল্পে ক্রমশঃ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া চারিদিক্ অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। এক্ষণে সন্ধ্যার পর টিপি টিপি বৃষ্টি সুরু হইল। রাত্রি যত অধিক হইতে লাগিল, অন্ধকার এবং বৃষ্টির বেগ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সকাল সকাল চপলা খাইয়া লইয়া উপরে আসিল এবং ঘরে খিল

টাগাইয়া নভেল লইয়া বসিল। খানিকটা পড়িয়া আর তাহার ভাল লাগিল না; রাখিয়া দিল। একবার আয়নাখানার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া নানাভাবে আপন প্রতিকৃতি দেখিল। তাহার পর মুক্ত জানালার ফাঁকে বাহিরের বর্ষণরত প্রকৃতির দিকে খানিকক্ষণ একান্ত মনে চাহিয়া থাকিবার পর কোচের উপর আসিয়া বসিল এবং অনুচ্চকণ্ঠে একখানা গান ধরিল—

'এই ত মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
সো পিয়া বিনু হিয়া ফাটিয়া না যায় গো—
নিলজ পরাণ নাহি যায়।
সখি গো, বড় দুঃখ রহল মরমে—
আমায় ছাড়িয়া পিয়া, মথুরা রহল গিয়া,
এই বিধি লিখিল করমে।
আমারে লইয়া সঙ্গে, কতই কৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে।
সো হেন গুণের পিয়া কৈছন রহল গিয়া,
দিবস গোঙায় কার সনে।
বিদ্যাপতি কহ, ধৈরজ চিত কর,
টুঁটি তবি মিলব তায়॥'

গান শেষ হইলে, চপলা চুপ করিয়া কোচের উপর বসিয়া রহিল। আজ উদয় গৃহে নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আফিস হইতে ফিরিয়াই আবার বাহির হইয়া গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছে, তাহার ফিরিতে রাত একটু বেশী হইবে, অন্ততঃ একটা! আজ নিকুঞ্জও গৃহে নাই। যে ফিল্ম কোম্পানীতে সে চাকুরী করে, তাহাদের সঙ্গে ছবি তুলিতে তাহাকে মুঙ্গের যাইতে হইয়াছে।

চপলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।— আজকের দিনে নিকুঞ্জ বাড়ীতে থাকলে ভাল হোত। মনের আকাঙ্ক্ষা যে কবে মিটবে! চারিদিকে বাধাবিপত্তির আর অন্ত নেই! মানুষকে ঘিরে রাশি রাশি বাজে কাজ নিষ্ঠুরের মত জমে এসে, তার আসল সুখটুকুকে কত আড়াল ক'রে এসে যে দাঁড়ায়! এইভাবে পরাধীন আর বন্দিনী হোয়ে আর কত কাল যে কাটাতে হবে! এ জীবনটা কি খালি অভিশাপ দিয়েই ভগবানের সৃষ্টি?—এই সব চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, নিকুঞ্জ, নিকু,—আর তিলে তিলে এইভাবে আমি জ্বলে পুড়ে মরতে পারব না। হয় আমায় বাঁচাও, নয় একেবারেই আমার মৃত্যু হোক!—

ঘরের ল্যাম্পটাকে খুব কমাইয়া দিয়া চপলা শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

কিছু পরেই সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল। চপলা তখন নিজের বিক্ষিপ্ত এবং অসংযত মনকে ঠিক করিয়া লইয়া উঠিয়া পড়িল। ঘরের খিল খুলিয়া দিতেই উদয় কহিল, সকাল-সকালই কাজটা হোয়ে গেল। তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

মৃদু হাসিয়া চপলা কহিল, কার জন্যে আর জেগে ব'সে থাকবো বল? শুয়ে শুয়ে তোমার কথা ভাবতে ভাবতেই তন্দ্রা এল, আর স্বপ্ন দেখলুম—

—কি স্বপ্ন দেখলে, চপল?

যেন এমনি ক'রে তোমার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে, জগতের সুখের স্রোতে ভেসে যাচ্ছি। বলিয়া চপলা দুই হাতে উদয়কে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে মুখ রাখিয়া দাঁড়াইল। উদয় কহিল, এ ত স্বপ্ন নয় চপল; এই ত সত্যি। যেটুকু এর বাকী আছে, তা, এইবার পূর্ণ হ'বে। আমার ঠাঁই কর, আমি ততক্ষণ মুখ হাত ধুয়ে আসি। বলিয়া উদয় গামছা ও কাপড় লইয়া বাথ-রুমের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

চপলার মনের মধ্যে তখনও নিকুঞ্জর কথা মিলাইয়া যায় নাই। সে আবার কোচের উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিল।—এমন ক'রে অভিনয় করতে আর পারি না। এ কি কম পাপের শাস্তি! অবিশ্যি, কিসে পাপ, কিসে পুণ্য, ত'াও বুঝি না। স্বামি-অন্ত প্রাণ নিয়ে মেজ-বউই যে সোনার স্বর্গে উঠবে, আর আমি যে নরকে নেবে পড়ব, এ কথার কোন সঠিক হিসেব ত চোখের সামনে পড়ছে না! নভেল-নাটকে পড়া যায় বটে। জীবনটা ত দু'জনেরই পড়ে রোয়েছে; দেখাই যাক না, শেষ পর্য্যন্ত কার কি ঘটে। মেয়েদের মুখ ত সেলাই করা। তবু বিয়ের আগে, সে শক্ত সেলাই ছিঁড়ে ফেলে বাবাকে স্পষ্টই জানিয়েছিলুম যে, এ বিয়ে আমি করব না। বাবা বোলে-ছিলেন, মানুষটির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিচ্ছি না, দিচ্ছি তার টাকার সঙ্গে, সুতরাং অপরাধ যদি কিছু হোয়ে থাকে—হোয়েছে বাবার। আর যদি আমারই হোয়ে থাকে, ত, অপরাধী জীবনের ওপর দিয়ে তার একটা যাচাই হয়ে যাক্। শাস্তির জন্যে আমার কোন ভয়-দুঃখই থাকবে না। যদি পাপই সাব্যস্ত হয়, আর সেই পাপের ভারে অতল তলে হাবুডুবু খেয়ে মরি, তা হোলে আমার মরবার পর আমার

প্রেতাত্মাকে দিয়ে তখন জগতের ঘরে ঘরে বোলে বেড়াব,—ওগো এতে পাপ, এতে পাপ। তোমাদের ছুটো মন্ত্রপড়া বন্দী পরাধীন জীবনই পুণ্যময়! তোমাদের অন্ধ ভালবাসার ভেতরই স্বর্গের সুষমা!

সিঁড়িতে অনেকগুলি চটিজুতার শব্দ হইল এবং সে শব্দ দুয়ারের কাছে আসিয়া মিলাইয়া গেলে, ঘরের মধ্যে প্রথমে উদয় এবং তাহার পিছন পিছন অরুণ ও তপন প্রবেশ করিল। চপলা কোচের উপর যেমন বসিয়াছিল, সেইরূপই বসিয়া রহিল। উদয় কহিল, অবশ্য দেশের বাড়ীটাকে বজায় রাখা খুবই উচিত। সেখানে এক জনের থাকা বিশেষ দরকার। বাবারও সেইরকম ইচ্ছাটা ছিল। আমি বলি, তপু সেখানে থাক্। আর অরুণ, তুমি এখানে থেকে এখানকার সম্পত্তি, আফিসটা দেখা শোনা কর। বলি, আমার অবর্ত্তমানে ত' কর্ত্তেই হবে গো! তা হোলে আমি দিন কতক একটু ছুটি নি। কি বল তোমরা?

অরুণ ঘাড় হেঁট করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। তপন চকিতে একবার কড়ি এবং বরগাগুলির উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, তা কি হয়, বড়দা?

কেন হবে না? এত দিন ধরে ত সবই দেখে শুনে এলুম, এইবার একটু রেহাই তোমরা আমায় দেবে না? আর অরুণ ঐ কবিতা কবিতা কোরে একেবারেই বৈষয়িক ব্যাপারে অকেজো হয়ে যাচ্ছে। এ সবের ভেতর ওর একটু আধটু ঢোকা দরকার ত'। নয় কি বল?

অরুণ তাহার স্বপক্ষে কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তপন তাহার আগেই বলিল, আপনি বর্ত্তমান থাকতে বড়দা, আমাদের কাছ থেকে আর ছুটি পাবেন না। তবে তেমন কোন দরকার পড়লে, মেজদা আর আমি আপনার পাশে ত' হাজির আছিই।

সে ত আছই। আর তেমন কোন দরকারও সচরাচর পড়বে না। আফিস-সংক্রান্ত কোন কোন কাজে-কর্ম্মে তিন জনেরই যেমন সইয়ের দরকার হয়, তেমনি তোমরা থাকবে না ব'লে, আমার ওপরই যখন 'পাওয়ার-নামা' লিখে দিয়ে গেলে, তখন আফিস দেখা-শুনো সম্বন্ধে অবশ্য কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু আমি বলছি কি, তোমরা দুজনে যেমন আমার নামে 'পাওয়ার-অফ-য়্যাটর্নি' লিখে দিলে, ওটার বদলে, অরুণের নামে, এস আমরা দু'জনে ঐ রকম লিখে দি। অরুণ কোলকাতায় থেকে সব দেখাশুনা করুক। আমি একটু পশ্চিম-ফশ্চিমের দিকে দিনকতক ঘুরে আসি। আর না হয়, তপন, তুমিই এখানে এই সব নিয়ে থাক, অরুণ মেজ-বৌমাকে নিয়ে দেশে যাক। কিন্তু আসল কথা কি জান? সেটা আর এতক্ষণ বলি নি। হিরণ আর কিরণকে না দেখে আমি কি কোথাও থাকতে পারব? আমার 'হোমু-দুত্তু-পাজী'টা ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়? কি দুষ্টুই হয়েছে সেটা!—না হয় আর এক ব্যবস্থা হোক,—অরুণ আর আমি দেশে থাকি গে, তপন, তুমি কোলকাতায় থেকে সব দেখা-শুনা কর। সেই সব চেয়ে ভাল।

হাসিতে হাসিতে তপন কহিল, না বড়দা, আপনি না দেখলে কিছুতেই চলবে না। আপনাকে এখানে থাকতেই হবে।

কাঁধের গামছাখানায় ভাল করিয়া মুখখানা মুছিতে মুছিতে উদয় কহিল, বড় হওয়ার কি বিপদ রে! আচ্ছা তাই হবে। ইচ্ছে যখন দুজনেরই হোয়েছে—তা তোমাদের ২৮শের আগে ত যাওয়া হ'তে পারে না। আমি পাঁজী দেখিয়েছি, ওর আগে আর ভাল দিন নেই। ঐ ২৮শে তোমাদের যেতে হবে।—তোমাদের—।—তাহার পর মুহূর্ত্তখানেক নীরব থাকিয়া কহিল, মেজ-বৌমা ছিলেন—এ-বাড়ীর লক্ষ্মী। সকলে চ'লে গেলে দিনকতক আমাদের কি কষ্টই যে হবে, তা আমি বেশ জানতে পাচ্ছি। বাড়ী একেবারে খাঁ খাঁ করবে আর কি।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উদয় শয্যার একধারে বসিয়া পড়িল। তার পর তপনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, দেড় শো টাকা যা নিয়েছিলে, সবই ত' বাড়ী মেরামতে খরচ হোয়ে গিয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা, আর কিছু টাকাকড়ি মেরামতের জন্য লাগে নিয়ে যেও, তবে ২৮শের আগে তোমাদের যাওয়া কিছুতেই হবে না। নতুন কাজটার জন্যে, এর ভেতর দিন-কয়েক আমাকে একবার বর্দ্ধমান যেতে হবে। তবে ২৮শের আগেই আমি ফিরে আসব।

তার পর তিন ভ্রাতায় আরও কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথা কহিবার পর, অরুণ ও তপন নীচে নামিয়া

গেল। তখন চপলা উদয়ের খাবার বন্দোবস্তের জন্যে উঠিয়া দাঁড়াইল।

উদয় চপলাকে বসিতে বলিয়া চাপা গলায় বলিল, এইবার বাবুরা নিজেদের কলে কেমন সুন্দর ভাবে নিজেরা পড়লেন।

চপলা কহিল, কাগজখানা রেজেষ্ট্রী হোল আজ?

হ্যাঁ। না হোয়ে ত আর উপায় নেই। ওঁরা এখানে থাকবেন না। ফারম—তিন নামে। বড় বড় কাজে-কর্ম্মে তিনজনেরই সইয়ের দরকার হয়। সে সময় হয়ত দেরী করাও চলে না; সুতরাং ফারম 'ম্যানেজ' করা, তার দেনা-পাওনা, আদায়-উসুল, তার উন্নতি, তার ভালমন্দ, সব-কিছু করবার ভার আমার ওপর দিতে হোল। এর থেকে যে কি আমি করতে পারি, তা বুঝতে পেরেছ বোধ হয়?

আমি বুঝে আর কি হবে বল।

তোমারই ত বোঝা দরকার। এই দশবার খানা বাড়ীর ওপর তুমিই যে রাণী হোয়ে বসবে, চপল।

আমি তোমার পায়ের তলায় যে স্থান পেয়েছি, সেই আমার পরম সৌভাগ্য। রাত হয়েছে, আমি তোমার খাবারটা গুছিয়ে দি;—বলিয়া চপলা দালানের বাহির হইয়া গেল।

সে-রাত্রিতে শয্যায় শুইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চপলা, আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই ভাবিল। বাহিরে তেমনই মেঘ, তেমনই অন্ধকার, তেমনই বর্ষণ। বাহিরের সেই দুর্য্যোগের ন্যায় তাহার মনের মধ্যেও আজ যেন দুর্য্যোগ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। পাশ-বদ্ধ কুরঙ্গিণী যেমন সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা চতুষ্পার্শ্বে পথের সন্ধানে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, আজ সে-ও সেইরূপ, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অতৃপ্তি ও দুশ্চিন্তার জালে পড়িয়া ছট্‌ছট্‌ করিতে লাগিল।

তের

দিন পাঁচ-সাত পরে একদিন রাত্রিকালে নীচে মেজ-বৌয়ের ঘরে বসিয়া অরুণ এবং তপন বকুলবাটী সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প-গাছা করিতেছিল। অরুণ কহিল, হ্যাঁরে, উত্তর পাড়ার সাতকড়ি পাল এখনো বেঁচে আছে? তপন কহিল, শুধু বেঁচে? সে এখনো দুলেপাড়ায়, জেলেপাড়ায় ঘুরে ঘুরে সুদের তাগাদা করে। চেহারাটা একটুও টস্কায় নি। একশোর কাছা-কাছি বয়স হবে। রামধনের দোকানে সকাল-সন্ধ্যায় কমিটী বসে?

ভয়ানক!

তা নেহাৎ মন্দ নয়। ঐ জিনিষটি হোল পাড়াগাঁর বৈশিষ্ট্য! ওর ভেতর দোষ যতই থাকুক, ওর বেশ একটু মাধুর্য্য আছে। গ্রামের লোকে কি নিয়ে থাকে বল? ঐ যে পরস্পরের মধ্যে একটু আধটু আলোচনা-আন্দোলন—ও চাই বই কি। এই যে এখানে কেউ কারো ধার ধারে না, এক বাড়ীর লোক, তার পাশের বাড়ীর লোককে চেনে না, এটা কি ভাল? এক বাড়ীতে মড়া-কান্না উঠলো, তার পাশের বাড়ীতে গান-বাজনা স্ফূর্ত্তি চলতে লাগল, এ সব ঠিক না। আমাদের হোল সামাজিক জীবন।

তপন কহিল, গোটা-দুই ভাল দুধুলী গরু পুষতে হবে, মেজদা। আর এই বছরই কিছু মাছ ফেলতে হবে খিড়কীর পুকুরটায়।

সবই হবে; কিন্তু তোর বউদির সেখানে মন টিঁকলে হয়।

অশ্রু একধারে বসিয়া খোকার একখানা কাঁথা সেলাই করিতে করিতে এই সব গল্প শুনিতেছিল। মন-টেঁকার কথায় কহিল, আমাকেও গিয়ে সেখানে থাকতে হবে না কি?

অরুণ তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, তুমি কি মনে করেছ?

আমি মনে করেছি, হবে না। আর হয় যদি, ত আমি থাকব না। স্বামীর পেছন পেছন যে স্ত্রীকে ঘুরে বেড়াতে হবে, তার ত' কোন মানে নেই। তোমরা যদি দেশে থাক, আমি তা' হ'লে কিছুদিন কোলকাতায়, কিছুদিন মধুপুর, কিছুদিন শিলং, কিছুদিন বা রাঁচি, এই ক'রে বেড়াব।

তপন তাহার নস্যের ডিবাটা আনিতে উঠিয়া তাহার ঘরের দিকে গেল।

অরুণ অশ্রুকে কহিল, তা, ভাল। তবে একলা একলা ত ও-রকম ভাবে বেড়ান ভাল লাগবে না, সঙ্গে তোমার কোন একজন 'কাজিন-ব্রাদার'কে নেবে না কি?

তা' নিতে হবে বৈ কি। বলিয়া মুখ ফিরাইয়া অশ্রু তাহার মুখের হাসিটুকু গোপন করিল।

এক টিপ নস্য নাকে গুঁজিতে গুঁজিতে তপন ঘরে ঢুকিয়াই কহিল, সত্যি মেজদা, দেশে মেজ-বৌদির মন টিঁকলে হয়। দিন কতক তোমার

মেজ-বৌদি, একটু ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে, তার পর কিন্তু দেখবে, বেশ মন ব'সে গেছে। তখন আবার দেশ ছেড়ে আসতেই চাইবে না।

কাঁথাখানা পাট করিয়া রাখিয়া অশ্রু তপনের মুখের দিকে স্থির শান্তদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ঠাকুরপো, হিঁদুর ঘরের বৌদের সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে গৌরবের স্থান হোল—স্বামী-সঙ্গ। জান ত, সীতা দময়ন্তী স্বামীর সঙ্গে বনবাসেও কত সুখী ছিলেন। স্ত্রী স্বামীর ছায়া। সে নিজেকে নিঃস্ব ক'রে স্বামীর পায়ের তলায় লুটিয়ে দেয়। সেই লুটিয়ে দেওয়ার ভেতর, সেই ত্যাগের ভেতর, কতটা তৃপ্তি, কি আনন্দ, তা যে দিতে পাবে নি—সে বুঝবে না। যে পেরেছে—সে বুঝেছে। সুতরাং, স্ত্রী কখনো স্বামী-ছাড়া হোয়ে থাকতে পারে? সেটা ত তার পক্ষে চরম দুভাগ্য! যেখানে স্বামী, সেই খানেই স্ত্রী। যেখানে আসল বস্তুটি, সেই খানেই তার ছায়া! স্বামী-ছাড়া হ'য়ে স্ত্রীর স্বর্গও কাম্য নয়। সে স্বর্গের পথে স্বামীর অপেক্ষায় ব'সে থাকে।

তপন তাহার মেজ-বউদির মুখে এমন সব কথা পূর্ব্বে কোন দিন শুনে নাই। সে চমকাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা মেজ-বৌদি, আজ-কালকার মেয়েরা যে স্বাধীনতার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে, তার কি? তারা বলছে, তারাও মানুষ; তাদের যে আজীবন পায়ে বেড়ী পরিয়ে রেখে—

কথাটা তপনকে শেষ করিতেও দিল না। অশ্রু বলিল, হিন্দুর ঘরের মেয়েরা ত মোটেই পরাধীন নয়, ঠাকুরপো। মা-বাপ তাকে যার হাতে তুলে দেয়, তার সঙ্গেই স্বাধীনভাবে—তার সুখে, দুঃখে, উৎসবে, বিপদে দিন কেটে যায়! স্বামি-ছাড়া হোয়ে থাকতে হোলেই বরং তার পক্ষে পরাধীনতা। সেই তার দুঃখের জীবন, সেই তার মৃত্যু। স্বামী-সঙ্গই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার স্থান। সে স্থান ত্যাগ ক'রে, স্বাধীনতার মরীচিকায় ভুলে সে যেখানে ছুটে যায়, তার অভিশপ্ত অধীন জীবনটা সেখানে গিয়ে বিষে একেবারে ভরে যায়।

অশ্রুর মুখে আজ হঠাৎ এই সব বড় বড় কথা শুনিয়া তপনের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অরুণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, খুব চমকে গেছিস, তপু, না? কাশী ঠাকুরদার ঐ বইখানা পড়ে পড়ে সব একেবারে মুখস্থ ক'রে ফেলেছে রে।

কোন্ বইটা মেজদা?

আরে, ঐ যে—'চির-সুন্দর'। ঐ বইখানিই ত ওর পুঁজি। পড়ে পড়ে ওর প্রত্যেক পাতার প্রত্যেক লাইনটি কণ্ঠস্থ। নইলে দ্বিতীয় ভাগের বানানগুলো যে পারে না, তার মুখ দিয়ে কখনও এ সব বেরোয়?

অশ্রু মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতেছিল; কহিল, বেশ, বেশ। এ সব কথা আবার মেয়েমানুষের বই পড়ে শিখতে হয় নাকি। মেয়েরা নিজেদের মনের মধ্যে থেকেই এ সব কথা জানতে পারে, বুঝতে পারে।

তপন কহিল, তা যাক। তা হোলে তুমি দেশে গিয়ে থাকতে পারবে ত?

এই সব এত কথার পর আবার তা জিজ্ঞাসা করছ, ঠাকুরপো?

ও সব ত বইয়ের কথা।

ঐ বইয়ের কথাই আমার মনের কথা।

অরুণ কহিল, তা বোঝা গেছে; তা না হোলে আর পড়ে পড়ে ও-গুলো মুখস্থ ক'রে ফেলেছ।

তপন কহিল, সেখানে কিন্তু তোমাকেই রান্না-বান্না করতে হবে, তার কি?

তাই ত' আমি চাই, ঠাকুরপো। নিজের হাতে রেঁধে-বেড়ে যদি স্বামী-পুত্তুর, ভাসুর-দেওরকে খাওয়াতে না পারলুম, তার চেয়ে নুলো হোয়ে থাকা ভাল; তেমন হাত থেকে ফল কি বল?

ফল এই যে, সোণার চুড়ী, ব্রেসলেট, তাগা, বালা—এই সব পরে হাতের সৌন্দর্য্য বেড়ে যাবে।

একচুলও সৌন্দর্য্য তাতে বাড়ে না। যে হাত স্বামী-শ্বশুরের সেবায় না খাটে, সে হাতের রূপ সোণা, হীরে, মুক্তোতে দিতে পারে না। আর যে হাত তাতে খাটে, শুধু এক গাছা শাঁখাতেই তার পরম রূপ ফুটে ওঠে।

অরুণ দাঁড়াইয়া উঠিয়া, ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল, খুব হোয়েছে; ধার-করা বক্তৃতা দিয়ে আর বাহাদুরীর দরকার নেই; রাত একটা বাজে। যা তপু, শুয়ে পড়গে যা।

তপন উঠিয়া শুইতে গেল। অরুণ মুখ মুছিতে গিয়া তাহার তোয়ালেখানা দেখিতে পাইল না;

জিজ্ঞাসা করিল, তোয়ালেখানা কি কেচে দিয়েছ নাকি ?

অশ্রু কহিল, হ্যাঁ, সেটা কেচে উত্তরের বারান্দায় শুকোতে দিয়েছিলুম, তুলতে আর মনে নেই। এনে দোবো ?

আমি আনছি।

তবে আঁসফল গাছের দিকের জানালাটা অমনি বন্ধ ক'রে দিয়ে এস। কেন না, যদি বৃষ্টি হয়, ঝাপ্‌টায় শুকনো কাপড়গুলো তা হোলে সব ভিজে যাবে।

অরুণ বাহির হইয়া গেল এবং খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া অশ্রুকে কহিল, এস আমার সঙ্গে। শীগ্‌গির। শব্দ কোরো না, কথা কোয়ো না।—প্রবল এক ঔৎসুক্য লইয়া, তাড়াতাড়ি অশ্রু অরুণের অনুসরণ করিল।

প্রায় মিনিট চারি পাঁচ পরে উভয়ে আবার ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। অরুণ বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, দেখলে ত ?

দেখলুম।

ওটা নিকুঞ্জই ত' ঠিক বটে ?

হ্যাঁ।—উঃ! দিদি যে এ রকম, এ কোন দিন আমি স্বপ্নেও——

চুপ কর। বলিয়া অরুণ উঠিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই, অশ্রু তাড়াতাড়ি স্বামীর হাত টানিয়া ধরিয়া কহিল, দিদিকে, কিছু বলতে-টলতে যাচ্ছ নাকি ?

একেবারেই নয়। আমাদের যাবার দিন কবে ?

২৮শে।

আজকের ভোরেই যেতে হবে। বোসো, আমি তপুকে ডাকি। তাকে এসব ব্যাপার কিচ্ছু বোলো না।

অরুণ নিঃসাড়ে গিয়া তপনকে ডাকিয়া আনিল। তপন বোধ হয়, গিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে অরুণের পিছন পিছন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি মেজদা ?

আজকের ভোরেই আমাদের বকুলবাড়ী যেতে হবে।

বিস্মিত হইয়া তপন জিজ্ঞাসা করিল, কেন মেজদা ? আমরা ত ২৮শে যাব, বড়দা ফিরে এলে পরে।

না। আমি তোর মেজ-বউদিকে নিয়ে আজকের ভোরেই যাব। তুই সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে, ঐ ২৮শেই যাস্।

হঠাৎ আবার তোমার কি হোল ?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, ২৫শে আষাঢ় বকুলবাড়ীতে ঝাঁপানের মেলা বসে। অনেক দিন ঝাঁপান দেখি নি। ভাবলুম, কালই যেতে হবে; গিয়ে ঝাঁপানটা দেখতে হবে।

বড়দার সঙ্গে দেখাটা ক'রে যাবে না ? বড়দা বোধ হয় কাল-পরশুই বর্দ্ধমান থেকে ফিরে আসবে। এই দুটো দিন—

না।

হিরণ-কিরণকে নিয়ে যাবে, ভাল দিনেতে গেলেই—

না।

তবে, কাল দুপুরের ট্রেণেই না হয় যেও, ঝাঁপান ত হয়—বিকেলে। বড়দা যদি সকালেই এসে পড়ে।

পায়চারী করিতে করিতে অরুণ কহিল, না।

তা' হোলে, বড়দাকে কি বলব ?

কিছুই বলবি না।

জিজ্ঞাসা করবে ত' ?

তেমনি পায়চারী করিতে করিতে অরুণ কহিল, বলবি যে তোর মেজ বউদির দিদিমার খুব অসুখ; রাত্রে টেলিগ্রাম পেয়েই ভোরে সেখানে চ'লে গেছে; সেখান থেকে অমনি দেশে যাবে।

ঝাঁপান ছাড়া অন্য কোন ব্যাপার যে ইহার মধ্যে আছে, তাহা তপন বুঝিতে পারিল। কিন্তু তাহা কি ? নানাদিক্ দিয়া নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অরুণ তেমনই ভাবে মাথা হেঁট করিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল। আর যাহার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় কিছু আগে ঘরের বাতাস চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তপন দেখিল, তাহার সেই মেজবউদিটি তাহার পরণের সাড়ীখানির পাড়টি যে কেমন, তাহাই দেখিতে তদ্গতচিত্ত। সে আপনার শয্যায় আসিয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল—কি হোতে পারে ? মেজবউদির সঙ্গে ঝগড়া ? কিন্তু যে জিনিষটা দশ বছরের ভেতর একদিনের জন্যও হ'তে দেখি নি, সেটা দশ মিনিটের মধ্যেই হোল, এ ত হ'তে পারে না—সুতরাং ঝগড়া নয়। তা হোলে আর কি ?

এই 'আর কি'-র সূত্র ধরিয়া তপন নানা দিকে

নানা স্থানে চলিয়া গেল, কিন্তু কোন স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারিল না। অবশেষে ঠিক করিল, অন্য কিছুই নয়, কবির খেয়াল মাত্র।

চৌদ্দ

পরদিন প্রত্যূষে অরুণ অশ্রুকে লইয়া বকুলবাটী যাত্রা করিল এবং সেইদিনই অপরাহ্ণে উদয় বর্দ্ধমান হইতে প্রত্যাগত হইল। তাহার বাটী ফিরিবার অগ্রেই হঠাৎ এইভাবে অরুণের চলিয়া যাওয়াটা সে আশা করে নাই, তবে দিদি-শ্বাশুড়ীর অসুখের টেলিগ্রাম পাইয়া যখন তাহাকে এইভাবে যাইতে হইয়াছে, তখন ইহাতে বলিবারও কিছু নাই। কিন্তু উদয় কিছু না বলিলেও, চপলা বলিল, অসুখ-টসুখ, টেলিগ্রাম—আমার ত মনে হয়, ও সবই মিছে। তোমার ফিরে আসা পর্য্যন্তও আর তর্ সইল না ওদের! এ সব মেজ-বৌয়েরই কারসাজি। ওদের ইচ্ছেটা, ওরা আলাদা থাকে। আমরা দু'জনে মেজ-বৌয়ের হলুম একেবারে চক্ষুঃশূল! দেওরটিকেও ক্রমাগত কাণ-ভাঙ্গানি দিয়ে দিয়ে নিজেদের দলে টেনে নিয়েছেন। দিদি-শ্বাশুড়ীর অসুখই হোক আর টেলিগ্রামই আসুক, যাবার সময় আমাকে একবারটি ব'লে যাওয়া ত উচিত ছিল। আমি না হয় ঘুমুচ্ছিলুম, কিন্তু মরিনি ত? ডাকলেই ত হোত! এমন চুপিসাড়ে চ'লে গেছে যে, চাকর-বাকর পর্য্যন্ত কেউ জানে না। ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারচ না?

উদয় কহিল, ব্যাপার বোঝবার আর আমার কোন দরকার নেই। চ'লে গেছে—আপদ গেছে। তুমি আর তপুর সামনে এই নিয়ে কিছু বোলো-টোলো না।

চপলা কোচের একধারে বসিয়া পড়িয়া কহিল, কি দরকার? কিছু বলিও নি, বলবোও না। আরে, তোরা চ'লে গিয়ে আমার কি ক্ষতিটা করবি? আমি যদি সতীলক্ষ্মী হই, ত আমার স্বামীর পায়ে কাঁটাটি পর্য্যন্ত ফুটবে না; তার পায়ের তলায় মাথা রেখে, সুখে শান্তিতেই দিন আমার কেটে যাবে।

ঘরে তখন সন্ধ্যার আলো জ্বালা হইয়াছিল। নন্দা চাকর আসিয়া ধূনা দিয়া গেল। চপলা উঠিয়া আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল এবং গুচ্ছবদ্ধ কেশ-রাশি খুলিয়া ফেলিয়া চিরুণী দিয়া তাহা আঁচড়াইতে লাগিল। সেই সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 'উদয় ফিরেছে, মা?' বলিয়া নগেন বাবু ও তাঁহার পিছন পিছন নিকুঞ্জ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই, চপলা মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইল।

নিকুঞ্জর দিকে চাহিয়া উদয় কহিল, কি হে, ভাল আছ ত?

নগেন বাবু নিকুঞ্জকে আর উত্তর দিবার অবসর না দিয়া কহিলেন, বায়োস্কোপে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে ওকে টেনে নিয়ে এলুম। মা, একটু চা। বায়োস্কোপে ব'সে যদিও কুঞ্জ এক কাপ খাইয়েছে বটে, কিন্তু তেমন যুত হয় নি।

চপলা যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নিকুঞ্জর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরপো, খাবে ত?

নগেন বাবু কহিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, খাবে বই কি। ওরা ফিল্ম-এর প্লেয়ার, প্রত্যেক মিনিটে এক কাপ ক'রে চা হোলেও ওদের আপত্য নেই; কেমন হে?

নিকুঞ্জ হি হি করিয়া একটু বিনয়ের হাসি হাসিল।

উদয় নিকুঞ্জর উদ্দেশ্যে কহিল, তোমাদের কোম্পানী চলছে কেমন হে; নতুন বই কি তোলা হোচ্ছে?

নিকুঞ্জ কহিল, নতুন বই তোলা প্রায় শেষ হোয়ে এল,—'বালির বাঁধ।'

বালির বাঁধ? তা হোলে ত টিঁকবে না, একটু হাওয়াতেই ত ধ্বসে পড়বে!—বলিয়া উদয় হাসিতে লাগিল। নিকুঞ্জও হাসিতে হাসিতে কহিল, এখানা খুব ভাল একখানা সামাজিক। 'রিলিজ' হোলে বৌদিকে নিয়ে একদিন দেখে আসবেন।

ইতিমধ্যে নন্দা গড়গড়ায় তামাক দিয়া গিয়াছিল। নলটা মুখে দিয়া নগেন বাবু তাহা টানিতে টানিতে থিয়েটার ও বায়োস্কোপ সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প করিয়া অবশেষে কহিলেন, আমি দেখে এলুম আজ—'যুগের হাওয়া'। প্লটটি মন্দ নয়, বেশ লাগলো।

উদয় কহিল, সেদিন এরাও ওইটে দেখে এল না? হ্যাঁ হে, কুঞ্জ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নগেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কে—চপল?

নিকুঞ্জ কহিল, হ্যাঁ। হিমুও গিছলো। মেজ-বউদির অসুখ ব'লে যেতে পারেন নি। নগেন

বাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় চপলা চাকরের হাত দিয়া চা-ও জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল।

জলখাবার ও চা খাইয়া নিকুঞ্জ উঠিয়া দাঁড়াইল ও উদয়ের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

সিঁড়ির মধ্যপথে, অন্ধকারের মধ্যে চপলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিকুঞ্জ তাহার হাতটা ধরিয়া একটা টান দিল। চপলা ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, ছেড়ে দাও, কে দেখতে পাবে।

তেমনই ফিস্ ফিস্ করিয়া নিকুঞ্জ কহিল, সন্দেশটা ভাঙ্গতেই দেখি, ভেতরে একটা বেলফুল; ভাগ্যিস্ সবশুদ্ধ গিলে ফেলিনি! কি কাণ্ড তোমার?

কাণ্ড নয়,—আমার প্রেমের ব্রত।

এই সময় কাহার' পায়ের শব্দ পাইয়া, শশব্যস্তে চপলা উপরের দিকে এবং নিকুঞ্জ নীচের দিকে চলিয়া গেল।

অরুণের হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার কথা লইয়া নগেন বাবু ও উদয়ের মধ্যে নানা প্রকার কথা হইতেছিল, এমন সময় চপলা ঘরের মধ্যে আসিলে, নগেন বাবু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ছেলেবেলায় এক জ্যোতিষী তোর হাত দেখে বলেছিলো, তুই রাজরাণী হবি। তার সেই কথা যে সত্য হবে, তা আমি বুঝতে পারছি।—তা হোলে এরা আজকেই চ'লে গেল?

উদয় কহিল, হ্যাঁ।

তপন কবে যাবে?

গেলেই হোল। দু'একদিনের মধ্যেই ও যাবে বোধ হয়। পরামর্শটা কি রকম হোয়েছে তা ত' জানি না।

তা যাক্। হাল্কা হও, বাবাজী, হাল্কা হও। এইবার তোমার সামনে অনেক কাজ। তাড়াতাড়ি সব সারতে হবে। দেরী মোটেই চলবে না। খদ্দের আমার হাতের ভেতর রয়েছে। বাড়ী ক'খানা দাও ঝাড়াক্সে বিক্রমপুর পাঠিয়ে। ও সম্বন্ধে আর এদিক্-ওদিক্ কিছু ভেবো না। দাম একটু আধটু কম হয়—সেও স্বীকার। বুঝলে না?

বুঝিছি।

হ্যাঁ, তারপর টাকাটা তোমার নামে রাখা নয়। 'ফারমে'র খাতায় ওটা জমা ক'রে নিতে হবে। নিয়ে কিন্তু ব্যাঙ্কে রাখতে হবে—চপলার নামে। তোমার নামে রাখা চলবে না,- বাবাজী। চপলার নামে রাখলে কেউ আর তাতে ছুঁচটি ফোটাতে পারবে না। একেবারে 'সেফ'—যেন গড়ের মাঠের কেল্লা। বুঝলে না? তবে দেরী করলে চলবে না; চট্ পট্ কাজ সারতে হবে।

উদয় খানিক চিন্তা করিয়া কহিল, ফারমের খাতায় জমা করে টাকাটা ফারমের নামেই প্রথমে ব্যাঙ্কে রাখতে হবে। তারপর কিছু কিছু ক'রে, বিভিন্ন খাতে খরচ দেখিয়ে সব টাকাটাই আবার তুলে নিতে হবে। নিয়ে চপলার নামে—

অতঃপর, কি করিতে হইবে এবং কি না করিতে হইবে, সেই সব বিষয়ে উভয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া শলা-পরামর্শ হইল। দশখানা বাড়ীর দাম, এ বাজারে খুব কম হইলেও, দশ লক্ষ টাকা ত হবেই। সুতরাং এই মহাসুযোগ যেন কিছুতেই নষ্ট না হয়। Power of Attorney যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন যথাসম্ভব সত্বর, কাজ হাসিল করিয়া লইতেই হইবে।

নানাদিকে নানা পরামর্শ করিয়া, রাত প্রায় দশটার সময় যখন নগেন বাবু চলিয়া গেলেন, তখন তাকিয়াটাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া উদয় কিছুক্ষণ উপুড় হইয়া নীরবে শুইয়া রহিল। চপলা জিজ্ঞাসা করিল, ওরকম ক'রে শুয়ে রইলে যে? শরীর ভাল আছে ত?

হুঁ।

না; নেই বোধ হচ্ছে। মাথা ধরেছে কি? টিপে দোবো একটু?

না।

পা টিপে দোবো?

পাও টিপতে হবে না, মাথাও টিপতে হবে না। এরা সত্যিই তা হ'লে চ'লে গেল! তপাটাও তা হ'লে আজকালের ভেতরই যাবে।

কি ভাবছ বল দেখি?

ভাবছি না। বলছি, চিরকাল একসঙ্গে থাকার পর এইবার সব ছাড়া-ছাড়ি হোতে চল্লো,—এই আর কি।—তাহার পর আরও খানিকক্ষণ পূর্ব্বের মত নীরবে থাকিয়া সহসা উদয় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং চপলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আমি তোমায় এত সুন্দর দেখি যে, তা আর বলবার নয়। বিধাতার কি নির্ব্বন্ধ দেখ। কোথায় ছিলুম—আমি, কোথায় ছিলে—তুমি। কে জানতো যে আমারই নয়ন-মনের তৃপ্তির জন্যে, সুখের জন্যে, তুমি তোমার এই রূপ নিয়ে আর এক জায়গায় অপেক্ষা করছিলে।

সোহাগভরে স্বামীর হাতখানা ধরিয়া চপলা কহিল, সত্যি, তুমি কি ভাবছিলে, আমাকে বলবে না?

চপলার মুক্ত, এলায়িত অলকগুচ্ছ হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে উদয় কহিল, বিশেষ কিছু ভাবি নি, চপল। কোথাও মনের একটা কোণে অস্বস্তির একরত্তি খোঁচা যেন লাগছে।—পরক্ষণেই মাথাটা সোজা করিয়া বসিয়া বলিল, চুলোয় যাক! Eat, drink and be merry! চপল, একখানা গান আজ খুব ভাল ক'রে গাও ত, শুনি। খুব ভাল গান, আর যার খুব ভাল সুর। ওই কোচের ওপর বোসে গাও। মাথার চুলগুলো ঐ রকমই তোমার এলানো থাক।

সেইভাবে কোচের উপর বসিয়া চপলা গাহিল—

চির-সুন্দর! মম মন্দিরে এস আজি—
তোমারে প্রণাম করি পায়।
চিত্ত আমার উঠছে ভরে সুরের মূর্চ্ছনায়॥
ফুলের বনের গন্ধ মেখে,
দখিণ বাতাস যাক গো দেখে,
পুলকে মোর অলকরাশি উড়চে তোমার গায়—
তোমারে প্রণাম করি পায়॥
মম অন্তর দি'ছি বিছা'যে
তব পথের ধূলাতে হে প্রিয়।
দিছি সুরে সুরে দিক ভরা'যে
ওগো প্রাণাধিক, আজি আসিও।
তব পুণ্য চরণ-পরশে, যত ফুল মোর ফুটিবে হরষে,
তব বন্দনা গাহি চন্দন সাথে
অঞ্জলি দিব তায়।
তোমারে প্রণাম করি পায়॥

গানের শেষ চরণের স্বপ্নময় সুরটি যখন মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া ঘরের বাতাসে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল, তখন উদয়ের যেন চমক ভাঙ্গিল। সুরের প্রভাবে তাহার অন্তর বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল, আমার সব যাক্,—সর্ব্বস্ব যাক্, শুধু তুমি আমার থেকো, চপল। দিনান্তে এই রকম রূপের মাধুরী ছড়িয়ে আমার সামনে এসে বোসো, আর এইরকম সুরে, গানে, রূপে, রসে আমার অন্তর ভরিয়ে দিও। এ ছাড়া আমি আর কিছু চাই না।

হর্ষে গদ্‌গদ্‌ভাবে চপলা উদয়ের পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

পনর

শ্রাবণ মাস।

'ধারা শ্রাবণ' নামটা যেন এইবার তাহার সার্থক হইয়াছে। কয়েকদিন ধরণ করিয়া বেশ রৌদ্র উঠিতেছিল। কালও সারাদিন রৌদ্রে কাঠ ফাটিয়াছে। কিন্তু আজ প্রকৃতির রূপে একেবারেই পরিবর্ত্তন। শেষ রাত্রি হইতে সেই যে দুর্য্যোগ নামিয়াছে, সমস্ত দিনের মধ্যে কেহ আর তপনদেবের মুখ দেখিতে পায় নাই। সারাদিন ধরিয়া, কখনো গুঁড়ি গুঁড়ি রিণ্‌ রিণ্‌, কখনো বা মুষলধারে ঝম ঝম্‌—বর্ষণের আর বিরাম নাই। এই অপরাহ্নেই যেরূপ চতুর্দ্দিক্‌ ছাইয়া আঁধার নামিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, দারুণ দুর্য্যোগে ভয় পাইয়া, সূর্য্যদেব চিরকালের নিয়ম ভুলিয়া সকাল-সকালই বুঝি অস্তাচলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

কাশীনাথের ভাঙ্গাবাড়ীর খিড়কীর ডোবাটা বর্ষার জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহারই চারিদিক্‌কার পাড়ে কোলা ব্যাঙের দল মহা উল্লাসে অবিশ্রান্ত ডাকিয়া যাইতেছে। ডোবার ধারে শ্রেণীবদ্ধ কয়েকটি সুপারিগাছ বহুদিনের দাহজনিত দুঃখের পর মহানন্দে মাথা নাড়িতে নাড়িতে আশা মিটাইয়া ভিজিয়া লইতেছে।

কয়দিন হইল কাশীনাথ একখানি নূতন উপন্যাস লিখিতে সুরু করিয়াছিলেন। দক্ষিণের জানালার ধারে, মেজেয়-পাতা মাদুরের উপর বসিয়া একান্তমনে তিনি তাহারই একাদশ পরিচ্ছেদ লিখিতেছিলেন। সম্মুখে তাঁহার উপন্যাসের লেখা-কাগজগুলি খোলা পড়িয়া, হাতে তাঁহার কলম, আর মুক্ত জানালার বাহিরে মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া। গৃহিণী কাননবালা তাঁহাকে কি বলিতে আসিয়া, নিঃসাড়ে চলিয়া যাইতেছিল, কাশীনাথ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি গা?

কানন কহিল, তুমি এখন লিখ্‌ছ,—থাক্‌।

না, থাক্‌বে কেন? বল; এস। লেখার সময় একটু করে মাঝে মাঝে এসো। সত্যি বলছি। নইলে আমার লেখার খেই হারিয়ে যায়।

ভয়েতেই আসি না। কি জানি লেখা খারাপ-টারাপ যদি হোয়ে যায় কিছু।

আর সকলের কি হয় জানি না, কিন্তু আমার হয় না, কানন। বরং লেখার মাঝে মাঝে—অবশ্য সময় আর হিসেব মত—তোমার সঙ্গে দুটো একটা

কথা কোয়ে নিলে, আমার এই কলমের ইঞ্জিনে রসের ষ্টিম সোঁ সোঁ ক'রে জমে যায়। তা, এখন এই যে—'শাওন গগন ঘিরে, আঁধার নাবৃত ধীরে'—এ সময় শুভাগমনের হেতুটা কি বল দেখি? পয়সা-কড়ি চাওয়ার বিষয় ছাড়া, আর যা বোলবে, গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা শুনবো।

উঃ, কি চতুর! আগে থেকেই মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা! তা হ'লে তা চাইব না?

কি, পয়সা-কড়ি? যাও, যাও, লেখার সময় কাছে এস না।

আমি ত যাব না; এই বসলুম।

আমিও তা হোলে এই উঠলুম। বলিয়া কাশীনাথ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরক্ষণেই বসিয়া পড়িয়া, তাঁহার লেখার খসড়াখানা হাতে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, শোন কি লিখলুম। বলিয়া তিনি তাঁহার একাদশ পরিচ্ছেদ হইতে পড়িতে লাগিলেন—

'দক্ষিণডাঙ্গার বিলের ধারে, যেখানে কয়েকটা শিরীষ, সোঁদাল আর বাব্‌লার গাছ সমস্ত স্থানটাকে ছায়া করিয়া রাখিয়াছিল, সেদিন অপরাহ্নে বিমল সেইখানে গিয়া, বিলের জলের দিকে মুখ করিয়া বসিল। পূবে-হাওয়ায় বিলের জলে, ছোট ছোট তরঙ্গ উঠিবা, সম্মুখস্থ পাড়ের গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আঘাত করিতেছিল। সেইখানে কিনারা হইতে কিছু দূরে, জলের উপর পাশাপাশি দুইটি রক্ত-কমল ফুটিয়া তরঙ্গাভিঘাতে অনবরত আন্দোলিত হইতেছিল। একটি বড় কমলের পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট কমল। একের বক্ষে অপরের ছোট মুখখানি ক্রমাগত ঢলিয়া পড়িতেছে। বিমল একান্তমনে সেইদিকে চাহিয়া রহিল;—'

বাধা দিয়া কানন কহিল, বক্ষে কি ক'রে হবে? মুখের ওপর ঢলে পড়্‌ছে হবে।

কাশীনাথ কাননের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

কানন কহিল, অমন ক'রে চেয়ে রইলে যে? 'মুখের ওপর' হবে না? ফুলটাই ত হোল গিয়ে পদ্মের মুখ। বলে না?—পদ্মমুখ? আর মুখের ভেতরে, যেখানে মধু থাকে, সেইটে হোল বুক। সেখানে ঢলে পড়বে কি করে? তবে, মুখের ওপর ঢলে পড়তে পারে বটে।

থি-চিয়ার্স ফর মিসেস কাননবালা!—লেখকের বউ—চালাকী কথা! কানন, এইবার তুমিও কাগজ কলমের আড্ডা পাত। একে বকুলবাড়ী, তাতে স্বয়ং কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় G. S.—অর্থাৎ গল্পসম্রাট, তার ওপব শ্রীমান্ অরুণশঙ্কর ভায়া—নবাগত, এবং তারও ওপর শ্রীমতী কাননবালা দেবী। সুতরাং গ্রামখানি আমাদের দেবী ভারতীর একেবারে খাস মন্দির হোয়ে উঠল।

এখন খাস মন্দিরে ব'সে তুমি তা হ'লে পুজো-আচ্চা কর, আমায় একটা টাকা দাও, কেলোটাকে হাটে পাঠাতে হবে। তরি-তরকারী, নুণ-তেল, মশলা, ঘরে একেবারে কিচ্ছুটি নেই। হাটে না পাঠালে এবেলা আর হাঁড়িই চড়বে না। দাও।

আজকে এক রকম ক'রে দাও না চালিয়ে। এই বাদলাতে ছেলেটাকে আর কেন কষ্ট দেবে? কাল সকালে তোমায় আমি সব এনে দোবো।

তা হোলে আজ আর কিছু খাবে না ত?

এ কি অলক্ষুণে কথা! খাব না কি রকম? দুপুরে আজ যা দুটি খেয়েছিলুম, সমস্তদিনের এই কলমের কস্‌রতে সব হজম হোয়ে পেট একেবারে খালি। ভয়ানক ক্ষিদে আজ!

তা হোলে কি রাঁধব বল তাই?

ঘরে তোমার চাল-ডাল ত মজুত? ভাত রাঁধ—

হুঁ,—আর?

আর ডাল রাঁধ।

তার পর?

তার পর ডাল বেটে, ডালের বড়া ভাজো।

তার পর?

তার পর—তার পর—ঐ বড়ার অম্বল।

তাই দিয়ে খেতে পারবে ত?

আর দুধ আছে।

তা বেশ। কিন্তু বড়া ভাজবো কি ক'রে তেলও নেই, নুণও নেই। কাঁচা ডাল বেটে দিলে, তা দিয়ে খেতে পারবে?

নাঃ; উঠিয়ে তবে তুমি ছাড়লে।—বলিয়া কাশীনাথ উঠিয়া তাঁহার বাক্স খুলিলেন এবং তন্মধ্য হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া কাননের হাতে দিলেন। কানন টাকাটা একবার দেখিয়া ফিরাইয়া দিয়া কহিল, অচল।

অচল মানে?

অচল মানে—চলবে না।

টাকাটার এদিক্-ওদিক্ দেখিতে দেখিতে কাশীনাথ কহিলেন, তুমি একবার দেখেই ধরে ফেল্লে, অথচ আমি ভাল ক'রে দেখে নিয়েও ত বুঝতে পারি নি।

কানন কহিল, তুমি আর বুঝবে কি ক'রে? তুমি নিজেই যে অচল। আমি বোলে তাই কোন রকম ক'রে চালিয়ে নিচ্ছি।

আমি অচল?

সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। এখন, দাও আমাকে, বেলা যাচ্ছে।

কাশীনাথ আর একটি টাকা বাহির করিয়া কাননের হাতে দিলেন। টাকাটা লইয়া কানন চলিয়া গেলে, কাশীনাথ আবার তাঁহার একাদশ পরিচ্ছেদে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু লেখা তাঁহার আর যোগায় না। কলম হাতে লইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন। দৃষ্টি তাঁহার—মুক্ত জানালার বাহিরে, বর্ষণক্লান্ত প্রকৃতির দিকে থাকিলেও, মনটি তাঁহার কোথাও পথে-বিপথে এলোমেলোভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছিল। আকাশ যেন একটু হাসিয়া উঠিয়াছে। মেঘের আঁধার যেন অনেকটা কাটিয়াছে। হঠাৎ দক্ষিণ বাতাস আসিয়া পূবে বাতাসকে যেন জোর করিয়া তাঁহার ঘরে ফিরাইয়া দিয়াছে।

কাশীনাথের মনের দৃষ্টি যেখানে সেখানে, সে-দৃষ্টির সম্মুখে তখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল—দক্ষিণডাঙ্গার বিল; বিলের জলে রক্তকমল; বিমল; আর সেই সঙ্গে একটি প্রফুল্ল, পবিত্র, পতিগতপ্রাণা তরুণীর শুদ্ধ-সুন্দর রূপের বিকাশ, তাহার সরসতা, তাহার সরলতা, তাহার কমনীয়তা। ভাবে তাঁহার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কলমের মুখে সে ভাবধারা তাঁহার প্রকাশ পাইল না। কিছুক্ষণ তন্ময় হইয়া থাকিবার পর, তিনি কলমটি রাখিয়া দিলেন, একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন, বহুক্ষণ নির্ব্বাপিত গড়গড়ায় দু'চারটি বৃথা টান দিয়া দেখিলেন, তারপর সিগারেটের বাক্স হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া, ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মৃণাল এক গোছা তাস হাতে করিয়া এ ঘরে ছুটিয়া আসিল এবং কাশীনাথের সম্মুখে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, দাদু, খেলবে?

উপন্যাসের কাগজগুলি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে কাশীনাথ কহিলেন, খেলবো; কিন্তু যদি তুই হেরে যাস, তা' হোলে খুব ভাল ক'রে এক কাপ চা ক'রে এনে দিবি বল্?

দোবো।

মনে কর্, তুই হেরেই যাবি। তা হোলে চা এক কাপ আগে ক'রে নিয়ে আয়, তারপর খেলবো।

সুতরাং একটুখানি হাসিয়া মৃণাল চায়ের জন্য গেল এবং খানিক পরে চা আনিয়া কহিল, আবার আকাশ অন্ধকার করে আস্ছে। আকাশের কান্নার কি আর শেষ নেই?

চা খাইতে খাইতে কাশীনাথ কহিলেন, শেষ সবেরই আছে। সময় হওয়া চাই। কান্নাটাও যে দরকার, কেন না, এ 'ছয়ে'রই যে একটা। এ যে সত্য; এই সত্য দিয়েই প্রকৃতি গড়া যে দিদি।

কি দিয়ে গড়া?

ছ'টা অবস্থা। মানুষের যেমন ছ'টা রিপু, রসের যেমন ছ'টা রকম, প্রকৃতিরও যে তেমনি ছ'টা অবস্থা। শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি মানেই হাসি, রাগ, কান্না এই সব। আরে এস—এস, সন্ধ্যাবেলা অরুণোদয়!

হাসিতে হাসিতে অরুণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল; পিছনে পিছনে—তপন। অরুণ কহিল বাদলায় সারা দিনটা আজ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ; আর পারলুম না, ঠাকুর্দ্দা, বেরিয়ে পড়লুম।

বেশ করেছ ভাই। একটু চা খাবে কি?

না ঠাকুর্দ্দা; চা খেয়েই বেরিয়েছি। বোস মৃণাল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

মৃণাল একধারে বসিয়া পড়িল।

কাশীনাথ কলিলেন, ও আমার সঙ্গে তাস খেলবার জন্য এসেছিল। ওকে বললুম, বাদলায় মিইয়ে যাচ্ছি, শীগ্‌গির যদি এক কাপ চা ক'রে এনে দিতে পারিস, তা হলে তোর সঙ্গে খেলব। সেই লোভে তাড়াতাড়ি আমায় চা ক'রে এনে দিয়েছে। সুতরাং কথাটা আমার রক্ষা করতেই হবে।—তার পর মৃণালের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, সন্ধ্যার পরই তা হোলে খেলা যাবে। এখন তোমার দাদারা এসেছে, একটু গল্প-সল্পো করি। কি বল।

মৃণাল দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, করুন না; আমি কি বারণ কচ্ছি?

কাশীনাথ কহিলেন, তা তুমি চল্লে কোথা, দিদি?

দেখি, কতদূর চলতে পারি। অরুণ-দা ত খাবে না, তুমি চা খাবে তপনদা, এনে দোবো?

তপন কহিল, না মেনা; আমিও খেয়ে বেরিয়েছি।

মৃণাল চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে, ওদিক্‌কার কোণের ঘর হইতে তাহার গান শুনিতে পাওয়া গেল। অরুণ কহিল, ওর গলা ত অতি চমৎকার!

বাঃ বাঃ!

কাশীনাথ কহিলেন, সাত বছরের বেলা থেকে বেন্দা ওকে গান শিখিয়েছে। ঐ একরত্তিকে নিয়েই ত সে ছিলো। সুতরাং ও শুধু তার ত মেয়ে ছিল না, ও ছিল তার প্রাণ! লেখাপড়াও কিছু কিছু শিখিয়েছিলো। তা মেয়েটার ভাগ্য খারাপ। সংসারে ঢোকবার মুখেই বিধবা হোল, এদিকে বাপটিও গেল। আগে পাছে দুর্ভাগ্যকে সঙ্গে করেই যেন ওর জন্ম। ও আমার চির-অভাগিনী—চির-অভাগিনী! এই পাঁচ বচ্ছর ওকে আমি কি ক'রে যে ভাঙ্গা বুকে চেপে রেখেছি, তা আমিই জানি। তবে যে ভাবে ওকে আমি গড়ে তুলেছি, তা'তে করে ওর সম্বন্ধে অন্য কোন দুর্ভাবনা আমার নেই। সংসারের খেলায় ওকে আমি বুড়ী ছুঁইয়ে দিয়েছি।—কাশীনাথের গলার স্বর একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল।

ও-ঘরে মৃণালের গান তখনও শেষ হয় নাই; অরুণ উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল। কাশী-নাথ কহিল, তপন ওর গান শুনেছে, তুমি এর আগে ত শোন নি। আচ্ছা ওকে এই ঘরেই ডাকি।—বলিয়া তিনি মৃণালকে এ ঘরে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন, তোর অরুণদা তোর গান শোনে নি। ঐ গানখানা এইখানে ব'সে গা দেখি, যেখানা গাইছিলি।

মৃণাল মেজের একধারে বসিল। কহিল, আমি যে এখন কাগজের ফুল তৈরী করব। কাল গাইব।

না; লক্ষ্মী দিদিরাণী আমার; গাও ঐ গানখানি।

যেখানা গাইছিলুম, সেইখানা?

তাই গাও।

মৃণাল গাহিল—

'উমার দেহের অতসীবরণ
পীত রবি-করে ঝলকে।
চন্দ্রমা যেন চন্দন-ফোঁটা
উমার ললাট-ফলকে॥
উমার পায়ের আলতা রঙ্গীন—
রাঙ্গাইয়া দেয় উষারে,
উমার মুখের সাদা হাসিটুকু—
ঝিকিমিকি করে তুষারে।
শালের শাখায় পাই সে সুরভি,
ছিল যা উমার অলকে॥
ধানের শীষে যে কেঁপে দোলে তার
সোণালী সবুজ অঞ্চল,
নিঃশ্বাস তার কমল-বনের
সমীরণে বহে চঞ্চল।
তুলা-সুকোমল মেঘেতে দেখে না
তা'র লঘুগতি বল কে?'

গান শেষ হইলে মৃণাল উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, কাগজের ফুল তৈরী করিগে। বলিয়াই সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

কিছুপরেই সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। কানন আসিয়া ঘরে আলো দিয়া যাইবার পরও বহুক্ষণ ধরিয়া তিনজনের মধ্যে নানারূপ গল্প, কথা, আলোচনা চলিতে লাগিল। তার পর অরুণ ও তপন চলিয়া গেলে কাশীনাথ একাকী বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।—জীবনের ধারাটা কাটছিলো এক পথে, সহসা মেনার জন্যে ধারাটা বদ্‌লে গেল। দুটো শেষ-বেলার পড়ন্ত জীবন, কেটে যাচ্ছিল এক রকমে। কোন দিকেই কোন পিছু-টান ছিল না। হঠাৎ যবনিকা পড়-পড় সময়ে আবার নতুন ক'রে এক অঙ্কের সৃষ্টি হোল। গভীর দুঃখে, নিবিড় স্নেহে মেনাকে অঙ্কে তুলে নিলুম। ভাবনা হয়ত কিছু বেড়েছে, কিন্তু আনন্দ ক্ষুন্ন হয় নি। আনন্দময়ের দয়ায়, দুঃখের ভেতরও আমার আনন্দের সীমে-পরিসীমে নেই। আমার কানন, আমার স্নেহের দুলালী মৃণাল, আমার সাধের লেখা, আর সবের ওপর আমার হৃদয়ের রাজা, আমার বুকের ধন—নারায়ণ, আমার হৃদয়-বৃন্দাবনের বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ! অনেকে বলে, আমার লেখা তাদের এত ভাল লাগে কেন? কেন যে ভাল লাগে, তা আমি জানি। একটা রাখাল-ছেলে যে আমার লেখার ওপর তার পাঁচন-বাড়ি বুলিয়ে দিয়ে যায়; আমার কলম এসে ছোঁয়; আমার কাগজের ওপর পা ফেলে এসে দাঁড়ায়! নারায়ণ—নারায়ণ! আমার ওপর এ কী দয়া তোমার!

কাশীনাথের চোখ ভরিয়া আনন্দাশ্রু জমিয়া উঠিল।

মৃণাল কি একটা কথা বলিবার জন্য শশব্যস্তে আসিয়া, দাদুর চোখে জল দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কাঁদছ?—কেন?

কাশীনাথ দেওয়ালের গায়ে শ্রীকৃষ্ণের ছবিখানা দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, ঐ যে!—কান্না নয়; আনন্দ গ'লে চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে! ওঁর পায়ের তলায়, আয় দিদি, দু'জনে একসঙ্গে প্রণাম করি।

সেই ছবির নীচে, মেজের উপর মাথা ঠেকাইয়া, উভয়ে তখন একান্তমনে প্রণাম করিল। দাঁড়াইয়া উঠিয়া, ছবির দিকে চাহিয়া কাশীনাথ কহিলেন, তুমি যেমন চঞ্চল, তেমনি তোমায় বেঁধে ফেলেছি। আর তোমার পালাবার জো নেই। হাস্‌ছ? ধরা পড়েছ ব'লে?—কাশীনাথ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, এখন বল ত ঠাকুর, তুমি চতুর, না আমি চতুর! না না, তুমি যে দয়া ক'রে আমায় ধরা দিয়েছ, নইলে তোমার নাগাল ধরে কার সাধ্যি?—বলিয়া সহসা কাশীনাথ গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। মৃণালের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ রে, তুই দেখতে পাস্?

হ্যাঁ; মনে করলেই;—চোখ চেয়ে, চোখ বুজিয়ে, গাইতে গাইতে, খেলতে খেলতে, পথে, মাঠে, বনে, আকাশে—

কি রকম ভাবটা দেখিস্? রাগ রাগ ত নয়?

না। খালি মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসেন, দাদু; যেমন ঐ হাসছেন।

একগাল হাসিয়া, আনন্দে বিভোর হইয়া কাশীনাথ কহিলেন, তার মানে, তোরা বড্ড আমাকে ধ'রে ফেলেছিস্! তোদের কাছ থেকে আর যাব না।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর কাশীনাথ কহিলেন, কি বলতে তুই তখন তাড়াতাড়ি এলি, দিদি?

ভুলে গেছি, দাদু।—ওঃ, মনে পড়েছে। তোমার জন্যে পাকা পাকা জাম কুড়িয়ে এনেছিলুম, নুণ দিয়ে জরিয়ে রেখেছি; খাবে চল। বলিয়াই মৃণাল কাশীনাথের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

যোল

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর মৃণাল একবার পাড়া ঘুরিয়া আসিবার অভিপ্রায়ে সদর বাটীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কানন পিছন হইতে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, কোথায় যাস্ লো তুই?

মৃণাল ফিরিয়া তাহার কাছে আসিয়া কহিল, গোটাকতক পিটুলি ফল কুড়িয়ে আনি, দিদিমণি। বেশ রথ তৈরী করব এখন।

কানন তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা মেনা, তুই কি কচি খুকি? একুশ বছরের বুড়ো ধিঙ্গী তুই, তুই চললি—পিটুলি ফল কুড়োতে? ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাই ত পিটুলি ফলের রথ নিয়ে খেলা করে!

বড় হোলে বুঝি করতে নেই?

না।

তবে, ভ্যাঁটার বন' থেকে দুটো বন-যুঁইয়ের চারা তুলে নিয়ে আসি, রান্নাঘরের পাশে পুঁতে দেবো।

তোর যা ইচ্ছে করগে যা।—বলিয়া কানন তাহার অপ্রসন্ন মুখখানা ফিরাইয়া লইল। তখন অস্বাভাবিক উচ্চ গলায় মৃণাল ঝাঁকি দিয়া কহিল, বল না—আনবো?

বলা-না-বলার অপেক্ষাতেই তুমি থাক কি না! বলিয়া কানন কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। মৃণাল সেইখানে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, সারা আকাশ চলন্ত মেঘরাশিতে ছাইয়া গিয়াছে। এই মেঘের রাশি ক্ষণেক স্থির হইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইলেই ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিবে। সে ধীরে ধীরে, এক-পা এক-পা করিয়া সদরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল,—বৃষ্টি এল ব'লে! আজ আর পিটুলি ফল কুড়িয়ে কাজ নেই। মাঠের ধারে কুমোরদের শালে বোসে বৃষ্টি দেখি গে। ফেরবার সময় 'ভ্যাঁটার বন' হয়ে আসবো।

ভাবিতে ভাবিতে সে ধীরে ধীরে কুমোরদের বাড়ীর উদ্দেশে অগ্রসর হইল। পথে আসিতে আসিতে 'তেলি-পুকুরের' মোহানার কাছে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। সেখানে সেই মোহানা দিয়া 'গ্যানতা মাঠের' জল ঝির্ ঝির্ করিয়া স্রোত বহিয়া 'তেলি-পুকুরে' আসিয়া পড়িতেছিল। মোহানার মুখেই একটা 'ঘুনী' বসান ছিল, তাহাতে অনেক চুনা মাছ আসিয়া পড়িতেছিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, অবশেষে বসিয়া বসিয়া সে জলের স্রোত, তাহার কল্‌কল্ শব্দ, চিকিমিকি,

মাছ, ঘুনী—এই সব দেখিতে লাগিল। একবার জলের মধ্যে হাতখানা ডুবাইয়া ধরিল। তাহার ফলে বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের কল্-কল্ শব্দ কথঞ্চিৎ বাড়িয়া গেল। নিকটেই নালার ধারে একটা কচুগাচের বন ছিল। মৃণাল উঠিয়া গোটাকতক কচুপাতা ছিঁড়িয়া আনিল ও স্রোতের মধ্যে এক-একটিকে নৌকা করিয়া ছাড়িতে সুরু করিল। ক্রমে ক্রমে সেগুলা ঘুনীর গায়ে গিয়া আটকাইল। পিছনে একটা বাঁশঝাড় ছিল, তারই কিছু উত্তরে সুখময় সর্দ্দারের একরত্তি কুঁড়ে। সুখময় গ্রামের চৌকীদার, জাতিতে হাড়ী। তাহার সাত বছরের মেয়ে বাতাসী, মৃণালকে দেখিতে পাইয়া সেখানে ছুটিয়া কহিল, কি কর, মেণাল দিদি?

মৃণাল তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, কত মাছ দেখছিস্, বাতাসী! ধরবি?

কি ক'রে ধরবে? একখানা গামছা থাকলে হ'ত।

আমার এই কাপড়ের আঁচল দিয়ে ধরব—বলিয়াই মৃণাল নালার মধ্যে নামিয়া পড়িল এবং জলের মধ্যে কাপড়ের একপ্রান্ত ডুবাইয়া, তাহার দুই দিক্ দুই হাতে টান্ করিয়া ধরিল। বাতাসী হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, ঐ একটা পড়ল, মেণাল দিদি,—ঐ আর একটা। ঐ ঐ—কত পড়ছে, দিদি!

অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেক পুঁটি-চুনা আসিয়া মৃণালের কাপড়ের মধ্যে জমা হইল। মৃণাল তখন দুই হাতে আঁচলখানা গুটাইয়া ধরিয়া উঠিয়া পড়িল এবং একটু তফাতে ঘাসের উপর গিয়া আঁচলখানা ঝাড়িয়া কহিল, নিয়ে যা বাতাসী, অনেকগুলো পুঁটি আর পাকাল, ঝাল ক'রে তোরা খাবি এখন।—তাহার পর, কাপড়ের ভিজা অংশটা পাকাইয়া নিংড়াইতে নিংড়াইতে সে কুমোরদের শালের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

কিন্তু শাল পর্য্যন্ত আর তাহার যাওয়া হইল না। 'মাঠের পুকুরের' কাছে আসিতেই ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি সুরু হইল। তাহার পরণে যেটুকু শুষ্ক কাপড় ছিল, জলের ঝাপটায় সেটুকুও ভিজিয়া গেল। পাড়ের উপর তালপাতার টাট্-বাঁধা ছোট্ট একটু ঘরের মত আচ্ছাদন ছিল। শীতকালে বিদেশী শিউলীরা এইখানে খেজুর-রস জ্বাল দিয়া গুড় তৈয়ার করিত ও সেই গুড় হাটে-বাজারে ও ফেরী করিয়া লোকের বাড়ী-বাড়ী বিক্রয় করিত। এই 'মাঠের পুকুরের' পাড়ের ক্ষুদ্র ঘরখানি তাহাদের থাকিবার আড্ডা ছিল। মৃণাল ছুটিয়া আসিয়া তন্মধ্যে আশ্রয়লাভ করিল।

ভয়ানক বৃষ্টি। অবিরাম বর্ষণ। পৃথিবী, আকাশ, পল্লী, প্রান্তর সব একাকার হইয়া গেল। সম্মুখে বহু দূরে সুদূর-প্রসারী ধানক্ষেতের মধ্যে একস্থানে 'কুলুইতলার' বহু প্রাচীন বটগাছ। সেইখান হইতে খানিকটা গেলেই 'সাতশিমুল' গ্রাম। কিন্তু বৃষ্টির ধারা ভেদ করিয়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রবল বর্ষণের ফলে যেন ধোঁয়ায় চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। মৃণাল বসিয়া এই অবিরাম বর্ষণ ও সম্মুখের দিগন্তব্যাপী শস্যক্ষেত্রের আবছা দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

প্রায় এক ঘণ্টার পর বৃষ্টি থামিল। তখন পিচ্ছিল পথে সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া মৃণাল বাড়ীর পথে ফিরিল। বোসেদের সদর দিয়া আসিবার সময়, ভিতর হইতে তপন তাহাকে দেখিতে পাইয়া হাঁকিল, এই বৃষ্টিতে কোথায় গিয়েছিলে, মৃণাল?

মৃণাল একটু লজ্জিত, একটু সঙ্কুচিত হইল; কহিল,—বৃষ্টি দেখতে।

বৃষ্টি দেখতে! কোথায়?

ঐ মাঠের ধারে।

সাধারণ সখ নয় দেখছি। তা কাপড়খানা ত ভাল করেই ভিজিয়েছ। বাড়ীর ভেতর চল, বৌদি তোমার কথা বল্ছিল।

ভিজা কাপড়ে সেই অবস্থায় তাহার যাইবার ইচ্ছা হইতেছিল না। অথচ বাড়ী ফিরিতেও তাহার ততটা মন নাই। সেজন্য একটু ইতস্ততঃ করিবার ফাঁকে তপন আবার কহিল, মেজ-বৌদি বলছিলো, তুমি একেবারেই আর আস না। কেন? এস।

অগত্যা যাইতে হইল।

অশ্রু তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, এমন ক'রে ভিজলে কি ক'রে? ধানক্ষেতে গিয়ে ঘাস নিড়ুচ্ছিলে না কি?

একটু হাসিয়া মৃণাল কহিল, না বৌদি; কোন কাজ ছিল না, তাই 'মাঠের পুকুরে'র ধারে বোসে বোসে খই ভাজছিলুম।

তা হোলে জলের ঝাপটায় নিজেও ভিজেছ আর বাতাসের ঝাপটায় তোমার খই সব তা হ'লে উড়ে

গিয়েছে বল। তা উড়ো খৈ গোবিন্দকে দিলেই হ'ত। দিয়েছ ত?

না বৌদি; আমার গোবিন্দকে খই-টই কিছু দিতে হয় না, শুধু একটু ডাকলেই হয়। রাখাল-ছেলে কি না, একটুখানি অন্তরের আদর পেলেই নাচতে নাচতে ছুটে। তবে তার ওপর যদি একটা পাতার ভেঁপু কি তালপাতার একটা বাঁশী হয়, তা' হ'লে ত কথাই নেই। আর তালপাতার বাঁশী ছাড়া কোথায় কি পাব, বৌদি, যে দোবো!—

'কাঁহুকে ধন্ ধাম্ হেঁয়, কাঁহুকে পরিবার।

তুলসী অ্যায়সে দীনকো—সীতারাম আধার।'

সকলেরই ধন-দৌলত, বাড়ী-সংসার, আছে; সীতারাম ছাড়া আমার আর কি আছে?

অশ্রু কহিল, তোমার তালপাতার বাঁশীতেই তিনি যে তোমায় ধরা দিয়েছেন, মেণা! ও রকম বাঁশী পাব কোথায়, ভাই; জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার দরকার। তা এখন কাপড়খানা আগে ছেড়ে ফেল দেখি।—বলিয়া অশ্রু তাহার পরণের একখানা বাসি-করা সাড়ী আনিয়া মৃণালের হাতে দিল। কহিল, ছেড়ে ফেল; আর ওখানা গুটিয়ে দালানের একপাশে রেখে দাও, বাড়ী গিয়ে কেচে শুকোতে দিও।

মৃণাল কাপড় ছাড়িল। অশ্রু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, একটুখানির মধ্যেই মনটাকে খুব বড় একটা নাড়া দিয়ে দিলে। তবে, একটি কাজ কর, ভাই। তোমার তালপাতার বাঁশী একটু শোনাও।

মৃণাল কহিল, তুমি যখন বলছ বৌদি, তখন গাইতেই হবে, কিন্তু আজকাল হেঁকে গাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়িছি, এখন নিরিবিলি ব'সে, মনে মনে গান গাই। মন গায়, আর তিনি শোনেন।

মৃণাল দালানে বসিয়া গান ধরিল। তপন মৃণালকে বৌদিদির নিকট দিয়াই বাহির-বাড়ীতে গিয়াছিল। এক্ষণে মৃণালের গান শুনিতে পাইয়া সে দালানে আসিয়া বসিল। অরুণের আজ শরীরটা ভাল ছিল না; সে পাশের ঘরে শুইয়াছিল। প্রথম গানখানা শেষ হইলে, অশ্রু এবং তপনের পীড়াপীড়িতে মৃণালকে আরও একখানা গাহিতে হইল। দ্বিতীয় গানখানা শেষ হইলে তপন অশ্রুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আচ্ছা মেজবৌদি, এ গানে আর হেনার গানে কিছু প্রভেদ মনে কর?

করি বই কি।

কি বল'ত?

এই যেমন—জবা আর মরসুমী ফুল, তেমনি।

ঠিকই তাই, মেজ বৌদি। সে গানে আর এ গানে তফাৎ ঢের, অর্থাৎ স্বর্গ আর মর্ত্ত্য।

তাই ত বলছি ভাই, হেনার গান হ'ল—মরসুমী ফুল; সাজানো ঘরে, ফুলদানীতে অতুল শোভার সৃষ্টি করে। আর মেণার গান—রাঙ্গা জবা, মায়ের পায়ে ভক্তি মাখানো পূজার নিবেদন।

মৃণাল তখন তপনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, তপনদা, গান শুনতে খুবই ভালবাস,—না?

তপনের হইয়া অশ্রুই জবাব দিল; কহিল, ঠাকুরপো ত? ভয়ানক—ভয়ানক।

মৃণাল তপনের উদ্দেশে কহিল, তোমার জন্যে এমন একটি বৌ আনতে হবে, যে দিনরাত তোমায় গান শোনাবে।

অশ্রু কহিল, তেমনি একটি বৌয়ের যোগাড় হ'য়েছিল মেনা, তা কি জানি ভাই, কেন ওঁর পছন্দ হ'ল না।

তপন লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, ঐ হেনা, যার গানের কথা বলছিলুম।

তা, কেন দাদা পছন্দ হ'ল না?

আরে, সে অনেক কথা!—বলিয়া তপন উঠিয়া দাঁড়াইল।

মৃণাল কহিল, কিন্তু বিয়ে ত একটা করতেই হবে, আর শীগ্‌গিরই করতে হবে। নইলে গান শোনাবে কে? আর তেম্‌নি একটি মেয়ের আমরা সন্ধানও করছি; অন্ততঃ দাদু করছে।

বিয়ে-টিয়ে আমি করছি না। কিছুতেই না।

তা হ'লে গান শোনাও তোমার হবে না, দাদা।

তপন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে পাইচারী করিতে লাগিল।

অশ্রু কহিল, বিয়ে ত উনি করবেন না; কিছুতেই করবেন না। দাঁড়াও না, আরও দিন কতক যাক্। তার পর কয়লা দিয়ে এখানে সেখানে দেওয়ালের গায়ে লিখে বেড়াতে হবে—'আর একটিবার বলিলেই করিব'।

অশ্রু ও মৃণাল উভয়েই হাসিয়া উঠিল। যেমন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে পাইচারী করিতেছিল, তেমনি ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে তপন দালান হইতে বাহির হইয়া গেল।

মৃণাল জিজ্ঞাসা করিল, অরুণদা কই?

তাঁর দেহটা আজ ভাল নেই, তাই ও-ঘরে শুয়ে আছেন।

পাশের ঘর হইতে অরুণ, গায়ে একখানা মোটা চাদর জড়াইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, আজ শরীরটা ভাল নেই। এতক্ষণ শুয়ে থেকে তোমার গান শুনছিলুম।

আর আমি ব'সে ব'সে উপন্যাস লিখছিলুম।

চকিতে অশ্রু ঘোমটা টানিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে পালাইয়া গেল। মৃণালও উঠিয়া তাহার পিছন পিছন যাইল। অরুণ কহিল, আসুন ঠাকুর্দ্দা!

কাশীনাথ কহিলেন, আর আমি এতক্ষণ ব'সে ব'সে উপন্যাস লিখছিলুম, অরুণ। অনেকক্ষণ ধরে লিখছিলুম সুতরাং আর ভাল লাগ্‌লো না। মেনাটা দেখলুম কোথায় বেরিয়েছে। ও-ঘরে দেখি, তোমার ঠানদি মেজেয় একখানা মাদুর পেতে অগাধে নিদ্রা দিচ্ছেন। কালি দিয়ে তাঁর কপালের ওপর বড় বড় ক'রে লিখে দিলুম—'কুম্ভনসী', আর পাশে একখানা দাঁড়া-আরসী রেখে দিয়ে এলুম।

হো হো করিয়া অরুণ হাসিয়া উঠিল; কহিল, তবুও ঠানদির ঘুম ভাঙ্গলো না?

তোমার ঠানদি'র ঘুম কি জাপানী পল্‌কা জিনিষ যে, একটুতেই ভেঙ্গে যাবে? ও হ'ল একেবারে খাঁটী স্বদেশী। যেমন সুলভ তেমনি মজবুত। তবে আমার লেখবার-টেখবার সময় তোমার ঠানদির ঐ দ্রব্যটি আমার পক্ষে যে খুবই শুভ, তার আর কোন সন্দেহ নেই।

অরুণ কহিল, কেন ঠাকুর্দ্দা?

কাশীনাথ কহিলেন, এই মনে কর, বেশ—ভাবে বিভোর হয়ে লিখছি, এ হেন সময় উঁনি সামনে এসে জানালার ধারটিতে পা ছড়িয়ে বসলেন। তারপর খানিক এ-দিক ও-দিক্ দৃষ্টি। তার পরই প্রশ্ন—দেখেছ একবার! ছেলেগুলো মিলে ওদের জামরুলগুলো আর একটাও গাছে রাখলে না। দেখ—দেখ—দেখ একবার!—সুতরাং কলমটি থামিয়ে একবার সেই দিকে দেখতেই হবে। তবে সংক্ষেপে দেখে, সংক্ষেপেই হয় ত জবাব দিলুম—যাক্‌গে; পরের ব্যাপারে আমাদের দরকার কি? আবার লিখে যেতে লাগলুম। পুনরায় প্রশ্ন—আচ্ছা, হ্যাঁ গা?—এই 'হ্যাঁ গা'র আর কামাই নেই। বল্লুম, কি গা?—আচ্ছা, সিংহের চেয়ে বাঘের শক্তি কি বেশী? বললুম—হুঁ। আচ্ছা, বাঘের মাসী ত বেড়াল? লিখতে লিখতে আবার বললুম—হুঁ! কিন্তু রেহাই নেই। পাণ চিবুতে চিবুতে পুনরায় প্রশ্ন হ'ল—বাঘের মাসী কেন বলে জান?—বল্লুম, না। জান না?—এই 'জান না'র 'না'র টানটা এমন ভাবে ব'লে উঠলেন, যে কলমটি বাধ্য হোয়ে আমাকে বন্ধ করতে হ'ল, কাগজগুলো গুটিয়ে রাখতে হ'ল; তার পর ফিরে ব'সে বললুম, জানি বই কি। শুনবে? শোন। একদা বনের ভেতর ছিল দুটি বাঘিনী। একজনের নাম রাধী আর একজনের নাম মাধী——

ঘরের ভিতর হইতে চাপা হাসির শব্দ আসিতে লাগিল। অরুণ কহিল, রাধী আর মাধী?

হ্যাঁ। রাধী বেশ হৃষ্টপুষ্ট' আর মাধী হ'ল শুঁটকো, হাড়-জিরজিরে। দুটিরই বিয়ে হ'য়েছে; দুটিই সধবা; দুটিরই সন্তান-সন্ততি বর্ত্তমান। এখন এক-দি-ই-ই-ন, দুপুর বেলা-য়, ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি! ওলোট-পালোট ব্যাপার! সমস্ত বন জলে জলময়! বাতাসের হুঙ্কার, মেঘের টঙ্কার, বাজের কড়-কড়াঙ্কার……!—গল্পের ভাব-গতিক দেখে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতা ত উঠে অন্যত্র গমন করলেন, আমিও একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলুম। কিন্তু লেখার দফা তখনকার মত রফা!

অরুণ হো হো করিযা হাসিয়া উঠিল। ঘরের মধ্য হইতে অশ্রু ও মৃণালের চাপা হাসির শব্দও শুনিতে পাওয়া গেল। কাশীনাথ কহিলেন, তাই ত বলছিলুম যে লেখবার সময়টাতে তোমার ঠানদি' যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, ততক্ষণই ভাল। তবে মাঝে মাঝে একটু দর্শন দরকার।

অরুণ হাসিতে হাসিতে কহিল, দাঁড়ান; ঠানদিকে সব বলে দিচ্ছি।

তা দিও; 'আমি কি ডরাই সখা ভিখারী রাঘবে?' কিন্তু ভায়া, তোমার শরীরটা যেন আজ ভাল দেখাচ্ছে না; মুখটা যেন খুব শুক্‌নো শুক্‌নো লাগছে।

শরীরটা আজ ভাল নেই, ঠাকুর্দ্দা। ডিস্‌পেপ্‌-সিয়া রুগী, দেহটাকে নিয়ে বড়ই ভুগতে হচ্ছে।

দিনকতক ঝেড়ে উপোস দাও দেখি, ভায়া। ও ডিস্‌পেপসিয়া-টিস্‌পেপ্‌সিয়া কোথায় চ'লে যাবে।

হ্যাঁ ঠাকুর্দ্দা, তাই দোবো। আমেরিকার ডাক্তার Sinclairএর বইখানা পড়লুম। তিনি লিখেছেন, সামান্য একটু আঁচড় থেকে আরম্ভ ক'রে

মহা-মহা রোগ পর্য্যন্ত Fasting এর দ্বারাতে সেরে যায়। তিনি উপবাসের দ্বারা রোগারোগ্যের যে নতুন Theory বার করেছেন, বাস্তবিকই তা অদ্ভুত।

হাসিতে হাসিতে কাশীনাথ কহিলেন, তার চেয়ে বেশী অদ্ভুত, ভায়া, তোমরা। মহাভারতখানা ভাল ক'রে তা হ'লে পড়নিক। তোমার ঐ আমেরিকাও সে-দিনের, আর ঐ তোমার আমেরিকার ডাক্তারটি ত আরো সে-দিনের। আর মহাভারত ব্যাসদেবের—কতকাল আগেকার লেখা, তার আর হিসেব নেই।

অরুণ কহিল, মহাভারতে এ সম্বন্ধে কিছু আছে না কি?

জান ত 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।' মহাভারতে যা নেই, তা পৃথিবীতেও নেই। এ একেবারে মহা সত্যকথা। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বটা একবার ভাল ক'রে পড়ে দেখো ত ভায়া, তা হ'লে আর পয়সা খরচ ক'রে আমেরিকা পর্য্যন্ত ছুটতে হবে না। আর গিয়েও এত বেশী খবর সেখানে পাবে না।

বলেন কি, ঠাকুর্দ্দা?

হ্যাঁ। মহর্ষি অঙ্গিরার উপবাস-বিধিটা একবার পড়ে দেখো। শুধু দু'-কথায় তা লেখা নেই। এ সম্বন্ধে হদ্দ-মুদ্দ ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন। তার মূল কথা এই,—যিনি একটু একটু জল খেয়ে দীর্ঘ দিন ধরে উপবাস করেন, তিনি নতুন জীবন এবং যৌবন লাভ করেন। একদিন থেকে আরম্ভ করে ৩০ দিন পর্য্যন্ত উপবাস করবার বিধি-ব্যবস্থা ও ফলাফল বিশদভাবে বর্ণনা করা আছে। যাই হ'ক, তুমি ভায়া Sinclair পড়েছ, একবার আমাদের ব্যাস-Clairখানা পড়ে দেখো। হিন্দু হ'য়ে মহাভারত না পড়াটা একটা পাপের মধ্যে গণ্য—এ কথাটাও মনে ভেবে দেখো। আজই পোড়ো। আমার আছে—নিয়ে এসো। ঐ মেণাটাকে আমি গোটা একটি বচ্ছর ধরে মহাভারত পড়িয়েছি।

অরুণ কহিল, আমি তপনকে আপনার সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি, দেবেন তো, ঠাকুর্দ্দা।

দেবো। বড় দুঃখ হয় অরুণ, ঘরের মণি-মাণিক্যের খবর না রেখে, আজ সবাই বাইরেকার বেলোয়ারী কাচের পেছনে ছুটেছে। দেশের গঙ্গাতীরের উর্ব্বর মাটী ছেড়ে দিয়ে, লোকে আজ বিদেশের মরুভূমিতে কলের চাষ করবার জন্যে মালকোঁচা বাঁধছে।—যা'ক, সন্ধ্যার পরে পার ত এসো; গল্প-টল্প করা যাবে এখন।

উপন্যাসের কতদূর এগুলো, ঠাকুর্দ্দা?

প্রায় শেষ ক'রে এনেছি। তবে, বীণা ব'লে একটা মেয়ে, তাকে রাখব কি মারব, সেইটি ঠিক করতে পারছি না! তাকে যদি মারি, তা হ'লে অনেকেই বলবে—সুন্দর! আর্টিষ্টিক ফিনিস্!—আবার অনেকেই বলবে—অমন মেয়েটিকে নির্দ্দয়ের মত মেরে ফেললেন! সেই জন্যে ঐ বীণাটাকে নিয়ে একটা সমস্যাতে পড়েছি।—তা যাক, সে সমস্যার সমাধান, যা হয় হবে'খন। এখন ঘরে ব'সে আর করবে কি, চল আমার ওখানে, একটু জুৎ করে চা খাইগে দু'জনে।

চা খাবেন? করতে বলব?

না—না; এখানে আর খাব না। তোমার ঠানদি'কে দিয়ে চা বানিয়ে একটু রগড় করা যাবে এখন।—বলিয়া তিনি মৃণালকে ডাকিলেন।

সতর

সকাল বেলা মৃণাল তাহার ঘরে তপনকে বসাইয়া, নিজের হাতে লেখা একখণ্ড পত্র দিয়া বলিয়া গিয়াছে, তুমি পড়—আমি আসছি।

নির্জ্জন গৃহমধ্যে তপন মৃণালের সেই পত্রখানি পড়িতেছিল। পত্রখানি এইরূপ:—

প্রাণাধিক,

তোমাকে প্রাণের মধ্যে লাভ করা আমার নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য। হে প্রিয়, আমি চাতকিনীর ন্যায়, বারি-রূপ তোমার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আসছে অমাবস্যার রাত্রে, বারটার পর 'মাঠের পুকুরে'র সেই চালাটার মধ্যে দয়া করিয়া থাকিও, দাসী তোমার সহিত মিলিত হইয়া ধন্য হইবে। ইতি— তোমারি—ওগো তোমারি।

একবার, দুইবার, তিনবার—তপন পত্রখানি পাঠ করিল। তাহার পর ভাঁজ করিয়া তাহা পকেটের মধ্যে রাখিল।

হঠাৎ কাশীনাথ এ-ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, চোরের মত এ-ঘরে ব'সে আছিস্ যে? কিছু মতলব-টৎলব আছে না কি? একটা কিন্তু সু-খবর আছে। ভারি একটি সুন্দর মেয়েকে আবিষ্কার ক'রে ফেলেছি তোর জন্যে; যেমন

নাটোরের দয়ারাম ছাতিন গ্রামে গিয়ে একদিন রাণী ভবানীকে পেয়েছিলেন, এ-ও ঠিক তাই।

তপন কহিল, তা ত পেয়েছেন, ঠাকুর্দ্দা। কিন্তু বিয়ে-টিয়ে সত্যি বলছি, আমি করব না।

তপনের মুখের কাছে মুখ আনিয়া কাশীনাথ কহিলেন, করবি না? ইস্! বললেই হ'ল আর কি!

হাসিতে হাসিতে তপন কহিল, ঠিকই বলছি, ঠাকুর্দ্দা।

কেন বল্ ত? কারো সঙ্গে পিরীত-টিরিতে পড়ে গেছিস না কি? আচ্ছা, সে হবে'খন। এখন বিয়ে ক'রে, বৌ একটা ঘরে ত নিয়ে আয়, তারপর না হয় আমাকেই দিয়ে দিস। বোস, পালাস নি যেন, আমি আসছি। বলিয়া কাশীনাথ বাহির হইয়া গেলেন। খানিকপরেই মৃণাল আসিল। কহিল, দাদু-টাদুকে এখন কিছু যেন বোলো না, তপন দাদা। এইখানা তার চিঠি।—বলিয়া আর এক টুকরা ভাঁজ করা পত্র মৃণাল তপনের হাতে দিল।

ব্যাপারখানা ঘটিয়াছিল এইরূপ—

সেদিন জমিদারের কাছারী-বাড়ীর পথ দিয়া আসিতে আসিতে দূর হইতে মৃণাল দেখিল যে, সেই ন'বাবুটি, যিনি মহাল তদারক মানসে আজ কয়েকদিন হইল এখানে আসিয়াছেন, তিনি বাগানের সম্মুখের পথটায় পায়চারী করিতেছেন। মৃণাল নিকট দিয়া যাইতেই তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছোট্ট এক টুকরা ভাঁজ-করা কাগজ তাহার পায়ের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মৃণাল সেটি কুড়াইয়া লইয়া আসিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল :—তোমায় দেখিয়া অবধি আমি পাগলের মত হইয়াছি। আমার ধন, যৌবন, জীবন, সবই তোমার পায়ে উৎসর্গ করিয়াছি। তোমার দয়া না পাইলে, আমার জীবন বিষময় হইবে, সুতরাং সে বিষাক্ত জীবন রাখিব না; বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিব। হে প্রাণাধিকা, হে প্রিয়া—ইত্যাদি ইত্যাদি। পত্রখানি পাঠ করিয়া মৃণালের মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি চাপিল। একথা সে আর কাহাকেও জানাইল না। সে এই আত্মহত্যা-প্রেমপত্রের এক প্রেম-উত্তর লিখিল। পরম-প্রণয়ী জমিদার বাবুর যে ধন এবং যৌবন তাহার পদতলে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তাহা গ্রহণ করিয়া, তাঁহার জীবন বিষময় হওয়া হইতে রক্ষা করিল। তারপর আজ গোপনে তপনের কাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া এবং মূল পত্রখানা ও তাহার উত্তরটি দিয়া কহিল, প্রেমিকবরের জীবন এবং যৌবন রাখবার ভার তোমাকেই নিতে হবে, তপনদা'।

তপন কহিল, দুষ্টুটাকে ভাল রকম একটু শিক্ষা দেওয়াই ঠিক। এ সব কথা আর কারো কাছে প্রকাশ করার দরকার নেই। যা করবার আমি সব করব এখন, বলিয়া তপন উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় কাশীনাথ দুই হাতে দুই কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিয়া কহিলেন, আজ নিজের হাতে চা তৈরী করিছি ;—Taste কর্ দেখি।

চা খাওয়ার মাঝখানে অরুণ আসিয়া উপস্থিত হইল। কাশীনাথ মৃণালের নাম ধরিয়া আর এক কাপের জন্য হাঁকিলেন। তার পর চা খাইতে খাইতে তিন জনের মধ্যে নানা বিষয়ের গল্প চলিতে লাগিল।

অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া কাশীনাথ কহিলেন, একটি সুন্দর এবং সর্ব্বসুলক্ষণা পাত্রীর সন্ধান পেয়েছি। সেইটিকে আমার নাতবৌ করতেই হবে, অরুণ। ও শালা বলে, বিয়ে করব না। প্রথম প্রথম ওদের ঐ 'করব না'র মানে হচ্ছে—'করব হ্যাঁ'—বুঝতে পেরেছ?

অরুণ কহিল, তপার কথা ছেড়ে দিন, ঠাকুর্দ্দা ; ওর কথাতে ত আর কাজ হবে না। মেয়েটি সত্যিই যদি ভাল হয়, তা হ'লে—

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়া কাশীনাথ কহিলেন, খুব ভাল মেয়ে। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। লক্ষণযুক্ত মেয়ে। যেন লক্ষ্মী-প্রতিমাটি। বয়স—বছর চোদ্দ হবে। তবে অত্যন্ত গরীবের ঘরের। বোধ হয় তাদের একবেলা খাওয়ার পর আর একবেলার খাওয়া জোটে কিনা সন্দেহ।

অরুণ কহিল, তা'তে আটকাবে না। মেয়েটি, আর বংশ ভাল হ'লেই হ'ল। তবে ওর আবার ঠিকুজী মেলানো মস্ত একটা বাই আছে। মেয়েটির ঠিকুজী আছে ত?

হুঁ।

তবে চলুন না কেন, একদিন, গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আসা যাক্ ; আর অমনি তার রাশি-চক্রটা আনা যাবে। এখান থেকে কতদূর?

তপন বাড়ী যাইবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্ব্বে সে ঘরের ছাদে সর্ব্বশুদ্ধ কয় সারি বরগা ও এক এক সারিতে তাহা কয়খানি করিয়া, তাহারই একটা হিসাব গণনা করিতেছিল।

কাশীনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, উঠে পড়লি যে? বিয়ের কথায় একটু লজ্জা-লজ্জা করছে, না? বলিয়া তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তপনের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিলেন—এখন সকলের সামনে তোর একটু লজ্জা-লজ্জা করবে, ভায়া। এর পর আবার, যখন নাত-বৌয়ের প্রেমে হাবুডুবু খেতে দেখবো, তখন আবার তোর সামনে আমাদেরই লজ্জা-লজ্জা করবে। তখন কিন্তু মোটা রকম একটা ঘটক-বিদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

হাসিতে হাসিতে তপন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাশীনাথ কহিলেন, দেখ অরুণ, শ্রীকেষ্টপুর জান ত? ব্যাত্‌ড়া-শ্রীকেষ্টপুর? দীঘিরপাড় ষ্টেশন থেকে বড় জোর কোশখানেক পথ হবে। সেই শ্রীকেষ্টপুরের সরকার-বাড়ীর মেয়ে। যদি সব দিকেই যোগাযোগ হয় ত শুভ অগ্রাণেই—কি বল?

বেশ ত। তা হ'লে, চলুন না মেয়েটিকে একদিন গিয়ে দেখে আসা যাক। তার পর আমি বড়দাকে লিখবো।

অনেক বেলা পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যুক্তি পরামর্শ স্থির করিবার পর উভয়ে উঠিয়া পড়িল এবং অরুণ গৃহের ও কাশীনাথ গৃহিণীর উদ্দেশ্যে গমন করিলেন।

ইহার পরের কয়েকটা দিন সাধারণ ভাবেই কাটিয়া গেল। তাহার পর আসিল সেই অসাধারণ রাত্রি, যে রাত্রিতে মৃণালের সহিত 'মাঠের পুকুরে'র পাড়ে তাহার প্রণয়ীর মিলন ঘটিবে। সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত ন'বাবু একটু মাঠের হাওয়া খাইয়া ফিরিয়া, গোমস্তা তিনকড়ি দাসকে কহিলেন, তোমাদের করচাগুলো আজ আর দেখতে পারব না হে। শরীরটা আজ ভয়ানক খারাপ।

তিনকড়ি মনে মনে মহা খুসী হইয়া মুখে কহিল, কি হ'য়েছে বাবু? নিজের শরীরটার ওপর আপনার যে একেবারেই লক্ষ্য নেই কি না। ডাক্তারকে কি একবার—

আরে না—না। ডাক্তার ডাকার মত তেমন কিছু নয়। এই একটু মাথাটা—একটু নয়, বেশী রকমই—ধরেছে আর কি।

ধরবেই ত, বাবু। দিন রাত পরিশ্রম ক'রে কাগজপত্র দেখা, হুজুরের ত আর এ সব অভ্যাস নেই। তা একটু ও-ডি-কলোন চেষ্টা ক'রে দেখবো কি?

কোথায় পাবে এখানে? ও সব কিছু করতে হবে না। বুঝলে?

আজ্ঞে, বুঝেছি। তা হ'লে চুপ ক'রে চোখ বুজিয়ে খানিক শুয়ে থাকুন, বাবু। শোভোটা খানিক না হয় পা দুটো একটু টিপে দিক।

একটু উচ্চ গলায় ন'বাবু কহিলেন, কিছু করতে হবে না। ধরলো মাথা, পা টিপে কি করবে? তুমি এখন এখান থেকে যাও দেখি।

আজ্ঞে যাই, বাবু।—বলিয়া ত্রস্তভাবে তিনকড়ি প্রস্থান করিল।

অতঃপর ন'বাবু মোটা তাকিয়াটিকে আশ্রয় করিয়া ফরাসের উপর পড়িলেন ও কাত্‌ হইয়া, চিৎ হইয়া, চক্ষু চাহিয়া, চক্ষু বুজাইয়া, প্রসন্ন মনে, তদ্‌গত চিত্তে—মৃণালের মুখখানি, তাহার গড়ন, তাহার কপাল, কর্ণমূল, তদুপরিস্থ শিথিল কেশগুচ্ছ, তাহার চক্ষু, সে চক্ষুর মদির চাহনি, তাহার সুধা-কণ্ঠের গান, প্রণয়-লিপি, মাঠের পুকুর প্রভৃতি কত কথাই ভাবিতে লাগিলেন। সবই সুখের, সবই আনন্দময়, সবই রূপময়। শুধু আজ এই অমাবস্যার অন্ধকার না হয়ে যদি পূর্ণিমার—। তা একপক্ষে ভালই হ'য়েছে। এ সব ব্যাপারে অন্ধকারই ভাল। ক'টা বাজলো? সাড়ে সাতটা। আর ঘণ্টা চার। খেতে-দেতেই ত ঘণ্টাখানেক কাটবে। তার পর তামাক খেতে মিনিট পনর কুড়ি। কাপড়-চোপড় পরতে—সে-ও ঐ রকম। সুতরাং ৯৷৷টাতে খেতে বসলেই হবে'খন; অর্থাৎ আর ঘণ্টা দেড়েক।—অতঃপর একটা অঙ্গমোড়ার সহিত ন'বাবু গাহিয়া উঠিলেন—

'—এ ঘাটে লাগা'য়ে ডিঙ্গা পাণ খাইয়া যাও
গো বঁধু,
পাণ খাইয়া যাও।'

* * *

অন্ধকার রাত্রি।

একে অমাবস্যা, তাহাতে আকাশে ঘন মেঘের সঞ্চার হেতু পৃথিবী যেন ঘোরান্ধকারের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। রাত্রি দুই প্রহর অতীত। সমস্ত পল্লী সাড়াহীন, শুধু অবিশ্রান্ত ঝিল্লীর রব ও ব্যাঙের ডাকে জানা যাইতেছে যে, পৃথিবী হারায় নাই, অন্ধকারের আবরণে ডুবিয়া গিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে।

সেই নিদ্রিত জগতের মধ্যে জাগিয়া আছেন—ন'বাবু। তিনি মাঠের পুকুরের পাড়ের উপরকার

সেই চালাখানার মধ্যে অধীর উৎকণ্ঠায় মৃণালের অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার পরণে শান্তিপুরের কোঁচান ধুতি, গায়ে চুনট্-করা আদ্দির চুড়িদার আস্তিন, পায়ে সোনালী হল-করা ফার-ফোর লপেটা, হাতে সৌখীন হাত-ঘড়ি, মাথায় 'অর্দ্ধনারী' প্যাটার্ণ চুলের উপর 'কিম্ভূত'-প্যাটার্ণ তেড়ী এবং ঠোঁটের উপর একরত্তি 'মাছি-গোঁফ্'। তা ছাড়া, পাশ-পকেটের একটাতে ছিল ছোট একটা 'টার্চ্চ,' অপরটিতে ছিল—সিগারেট ও দিয়াশলাই। আর সমস্ত স্থানটাকে সুগন্ধে আমোদিত করিয়াছিল—বুকপকেটের রুমালখানা, যাহা দ্বারা তিনি মাঝে মাঝে হাতের কব্জি, ঘাড় এবং মুখখানাকে মুছিয়া লইতেছিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা হইল তিনি আসিয়াছেন। আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা সম্মুখের অন্ধকার মাঠের দিকে চাহিয়া তিনি কাটাইলেন। অবশেষে তাঁহার মনের বাসনা—শুধু পূর্ণ নহে—দ্বিগুণ পূর্ণ হইল। তিনি আশা করিতেছিলেন—একজনের, কিন্তু অদূরে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল। খানিকটা কাছে আসিলে দেখিলেন, তাহারা নারী নয়—নর। তাহাদের উভয়েরই কেবল নাক ও চোখ ফাঁক রাখিয়া বাকী মুখখানা কাপড়ের ফেটী দিয়া জড়ানো এবং পরণের ময়লা ধুতি ভাল করিয়া মালকোঁচা বাঁধা। গায়ে দু'জনেরই আধ ময়লা ফতুয়া। একজনের হাতে মাছ ধরিবার একখানা ঘুরনী জাল। ন'বাবু বুঝিলেন, ইহারা অন্ধকার রাত্রিতে পুকুর হইতে মাছ চুরি করিতে আসিয়াছে। পুকুরটির মালিক তিনিই। সুতরাং ভাবিলেন, মাছ আজ চুরি করে করুক, তবে এ দিক্‌টায় না এসে পড়ে। কিন্তু 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়!' তাহারা যে তাঁহার দিকেই আসে! মালের সঙ্গে মনিবকেও চুরি করিবার মতলব না কি? খুঁটীর আড়ালে নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করিয়া ন'বাবু খুঁটীর মতই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চালাটার খুব কাছে আসিয়া, যাহার হাতে জাল ছিল, সে অপর লোকটাকে রুখিয়া বলিল, মারবো এক থাপ্পোড়! যেন ছিনে-জোঁকের মত সঙ্গ নিয়েছে! অপর লোকটাও বেশ জোরের সঙ্গে কহিল, বেশ করিছি! খুসী আমার!—প্রথমটি তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অধিকতর তর্জ্জন করিয়া কহিল, খবরদার!

তুই খবরদার!

ফের বল্‌ছি—চোপ্‌রও।

তুই চোপ্‌রও!

তবে দেখবি একবার মজাটা?

তবে তুই দেখবি একবার মজাটা?

তখন চক্ষুর নিমেষে উভয়ের মধ্যে বিষম ঠেলাঠেলি এবং হুটোপুটী লাগিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গেই উভয়ে গিয়া পড়িল—নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, খুঁটিবৎ শ্রীল শ্রীযুক্তের উপর। তখন তিনে মিলিয়া ভয়ানক কাণ্ড! অঘটন-ঘটন! শ্রীযুক্তের শ্রীমুখে খালি—এই শূয়ার! এই রাসকেল! পুলিসে দেবো দু'জনকে; আমাকে ছাড়্, আমি ন'বাবু!—আর ন'বাবু! কে-ই বা কাহার কথা শোনে! মহাযুদ্ধ সমভাবেই চলিল। শ্রীযুক্তের কোঁচানো শান্তিপুর ছিঁড়িল, চুড়ীদার ফাটিল, জুতা খসিল, হাতের ঘড়ি বাঁধন ছিঁড়িয়া কোথায় ছিটকাইয়া গেল, চশমা ভাঙ্গিল, দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইল। অবশেষে প্রথম চোর অদ্ভুত কৌশলে, দ্বিতীয় চোরকে বাদ দিয়া, মৃণাল-চোরকে জাল চাপা দিয়া ফেলিল এবং সেই মহামহিম শ্রীজালকে ছিঁচ্‌ড়াইয়া টানিতে টানিতে পুকুরের গর্ভে পাঁকের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। অতঃপর যে পবিত্র স্থান, প্রথমে বৃন্দাবন এবং পরে কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে শান্তিপুরে পরিণত হইল এবং সেই নির্জ্জন, শান্তিপুরে, প্রেম-পাশের পরিবর্ত্তে জাল-পাশে আবদ্ধ হইয়া, পঙ্কমধ্যে পড়িয়া রহিলেন—মহামান্য প্রজা-শাসক শ্রীল শ্রীযুক্ত ন'বাবু প্রবল-প্রতাপেষু।

* * *

রাত্রিশেষে ন'বাবু শম্ভু চাকরকে ডাকিয়া তুলিলেন। কহিলেন, তিনকড়িকে ডেকে নিয়ে আয়।

তিনকড়ি আসিয়া তাঁহার মুখে ও কপালে কাটা ও আঁচড়ের দাগ এবং কাণের কাছে পাঁক-মাটীর ছোপ্ প্রভৃতি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিতেই তিনি কহিলেন, কাল্‌কে আমার শুধু মাথা ধরা তো নয়, ভয়ানক মাথা ঘুরেছিল। তারপর অনেক রাতে একবার পাইখানা যেতে হয়। পাইখানার সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বেশীরকম মাথাটা ঘুরে উঠলো আর একেবারে ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে পড়ে গেলুম।

প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া তিনকড়ি বলিয়া উঠিল,

বলেন কি হুজুর! এত বড় বিপদ—একটা খবর পর্য্যন্ত—আমি যাই, সত্য ডাক্তারকে একবার চট্ ক'রে—

আরে, না—না; আর ডাক্তার-টাক্তারের দরকার নেই। আমি এই ফার্ষ্ট ট্রেণেই আজ চ'লে যেতে চাই। কেন না, এ রকম মাথা ঘোরা দেখছি আজকাল আমার ঘন ঘন হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে। কোলকাতায় গিয়ে একটু চিকিৎসা করাতে হবে।

নিশ্চয় করাতে হবে, বাবু।

ট্রেণ তোমার পাঁচটা পয়তাল্লিশে না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হ'লে চার জন বেয়ারার বন্দোবস্ত ক'রে ফেল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি বেরিয়ে পড়ব। আর কাগজগুলো নিয়ে তুমি দু'চারদিন পরে কোলকাতা যেও, সেইখানেই দেখবো। বুঝলে?

আজ্ঞে, বুঝিছি, হুজুর।

তার পর অতি প্রত্যুষে, অন্ধকার থাকিতে থাকিতে, গ্রামের লোক জাগিতে না জাগিতে, ন'বাবু কাছারী ছাড়িয়া ষ্টেশনের পথে রওনা হইলেন। তার পর একটু একটু করিয়া অন্ধকার কাটিয়া গেল। ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল, সকাল হইল। তখন একটু বেলায়, মৃণাল ও তপনের মধ্যে নিম্নোক্তরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

মৃণাল কহিল, ইস্! তা হ'লে ত ভারি—

হ্যাঁ, বেটা নর-পিশাচের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।

চিনতে-টিনতে পারে নি ত?

আরে, রাম কহো! সে জো রাখি নি। কেষ্টা বেটা আমার কেমন চাকর দেখলে ত? সবেতেই 'স্কোয়ার'। এইজন্যেই ওকে আমি ভারি পছন্দ করি। দুটো টাকা বকসিস্ করিচি।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর মৃণাল কহিল, কিন্তু তপনদা, এর জন্যে কষ্টও একটু হচ্ছে মনে। সে লোকটা যা-ই কেন হ'ক না, এ-রকমটা করা আমার ভাল হয় নি। শেষকালে কিন্তু অনেক করেই তোমাকে আমি বারণ করেছিলুম তপন দা', তুমি যে কিছুতেই শুনলে না।

তপন একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল, আরে না—না, ও ঠিকই হ'য়েছে। দুষ্টের দমন চাই বই কি।

সে, যিনি করবার মালিক, তিনিই করবেন, দাদা। বলিয়া মৃণাল একটা অস্বস্তির শ্বাস ফেলিল।

আঠার

হয় নি, বৌদি'?

না ভাই। তিনের সঙ্গে আর সাতের সঙ্গে কিছুতেই মিলছে না। সাতেকে সাত, সাত দু'গুণে চোদ্দ, তিন সাতে একুশ, চার সাতে—

অনেকদিন পরে অশ্রুময়ীর অঙ্কশাস্ত্র আলোচনা হইতেছিল। আজিকার গুরুমহাশয়—মৃণাল। অশ্রুর হাত হইতে সিলেটখানা লইয়া মৃণাল কহিল, এ কি করছ, বৌদি? সাত কখনো তিনের ভেতর যায়? পাশের ছয়টাকে তিনের সঙ্গে নিয়ে ছত্রিশ ধ'রে নিতে হবে। তারপর ৩৬ এর ভেতর ৭ ক'বার যায় দেখ। পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ। পাঁচ খাওয়াও।

তিনের ভেতর সাত যায় না বুঝি?

কি ক'রে যায়? তুমি তিন টাকা থেকে সাত টাকা খরচ করতে পার?

কেন পারব না? কোলকাতা থাকতে ত প্রায়ই পারতুম। কোন একটা খরচ পত্রের ব্যাপারে, তোমার দাদা হয় ত আমার হাতে দুটো টাকা দিয়ে চ'লে গেল; তার পর ফিরে এলে আমি পাঁচ টাকার খরচ দেখিয়ে দিতুম।

তা হ'লে তুমি নিজের ত'বিল থেকে বাকী তিন টাকা খরচ ক'রে পরে আদায় ক'রে নিতে।

মৃণালের পিঠে ছোট একটা কিল মারিয়া অশ্রু কহিল, এই বুদ্ধি নিয়ে কখনো এত বড় সংসার-সমুদ্রে পাড়ী দেওয়া যায়! তা করতে যাব কেন? ঐ দু'টাকার ভেতরেই পাঁচ টাকার খরচ দেখিয়ে দিতুম।

একটুখানি হাসিয়া মৃণাল বলিল, তা হলে বল বৌদি যে, তুমি চুরি করতে।

তা, যা-ই কেন বল না, ভাই! তবে, সে কি আমি রাখতুম? ওঁর হাত-টানের সময় আবার ঝেড়ে-পুঁছে সব বার করে দিতুম। সুতরাং ও চুরি, ও চোরও জানতো—গেরস্তও জানতো।

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মৃণাল কহিল, তা বেশ; এখন অঙ্কটা হবে কি?

না।

কি তবে হবে, বৌদি?

হবে—তোমার একখানা গান, বলিয়া অশ্রু মৃণালের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মৃণাল কহিল, হ'তেই হবে, না, না-হ'লে চলবে?

না-হ'লে—চলবে না।

তা হ'লে তাই হ'ক।—বলিয়া মৃণাল গাহিল—

কে দিলি রে—কে দিলি রে—কে দিলি,
মায়ের পায়ে রক্ত-জবার অঞ্জলি?
ভক্তি-রাঙা কামনা কে ছড়িয়ে গেল প্রাণ
খুলি?
তা'রই মনের ছোঁয়াচ্ লেগে
উঠুক আমার চিত্ত জেগে,
নিত্য আমি দু'হাত ভরে
তোমার পূজার ফুল তুলি।
সেই পূজারি আনন্দেতে
পূরবে আমার মনের সাধ,
মাথায় ল'য়ে প্রসাদী ফুল
বইব তোমার আশীর্ব্বাদ।
তাইতে ফুটে উঠবে আমার হৃদয়-কমল-দলগুলি।
বিশ্ব-জবা-ফোটা পায়ে,
স্নিগ্ধ তোমার করুণ ছায়ে,
হৃদয় আমার পাগল হ'য়ে
পড়বে লুটি' চঞ্চলি'।

গান শেষ হইলে অশ্রু কহিল, গলাখানা করেছিলে বটে! তোমাকে পেলেই, তাই সব কাজ ফেলে তোমার গান শুনতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা ভাই, এমন চমৎকার গান গাইতে পার, লেখাপড়াও ভাল জান, বুকখানি ত ঠাকুরের ওপর ভক্তিতে ভরিয়ে রেখেছ; আবার এ দিকে আমতলাতে-জামতলাতে ছুটে গিয়ে, গাছ-কোমর বেঁধে আম-জাম কুড়োও, পুতুলের বিয়ে দাও, লুকোচুরি খেল, বৃষ্টি দেখিবার জন্যে মাঠের ধারে ছোট! সেদিন ত আমাদের খিড়কীর পুকুরটা সাঁতারে এপার-ওপার হচ্ছিলে।

মৃণাল কহিল, পুকুরে তখন কেউ ছিল না, তাই সাঁতার কাটতে ভারি ইচ্ছে হ'ল, বৌদি।

অশ্রু অপলক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কিছু পরে মৃণাল কহিল, এরা সব এখনো ফিরছে না কেন, বৌদি?

কি জানি, ভাই। বোধ হয়, একেবারে ঠাকুরপোর বে দিয়ে বৌকে নিয়ে সব ঘরে আসছে।

শ্রীকেষ্টপুরে আজ সকলে মিলিয়া সেই মেয়েটিকে দেখতে গিয়াছে।

মৃণাল কহিল, মেয়েটি খুব সুন্দর, বৌদি। তার নাম কি জান ত?

অশ্রু কহিল, আমি কালো, সুন্দরের নাম কি ক'রে জানবো ভাই? কি নাম?

ছায়া। ছায়াময়ী। বেশ মিলবে বৌদি, অশ্রুময়ী আর ছায়াময়ী।

দাঁড়াও আগে বে হোক। আগে থাকতেই তুমি যে মিলিয়ে দিচ্ছ!—বলিয়াই তাড়াতাড়ি অশ্রু মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া বসিল।

সকলে আসিয়া পড়িয়াছে।

কাশীনাথ আসিয়াই একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কহিলেন, যা বল অরুণ, এ রকম মেয়ে কিন্তু বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। বলি, শুধু রংটি ফর্সা হ'লেই ত সুন্দর হয় না। মুখশ্রী, গঠন, চলন, বলন, চাওনি, লক্ষণ—সব নিয়ে তবে ত সৌন্দর্য্যের বিচার। তার ওপর লজ্জা, নম্রতা, শান্তভাব—এ সব থাকা চাই। তা, এ সবই আছে। আমি অনেক মেয়েই দেখেছি, অরুণ, এ রকম সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মেয়ে খুব কমই আমার নজরে পড়েছে।

অরুণ কহিল, সত্যি—মেয়েটি ভারি চমৎকার। মেয়েটির শান্ত রূপের মধ্যে বেশ একটা মাধুর্য্য—

ঘরের মধ্য হইতে তপন বলিয়া উঠিল, ও ঠিকুজী না মিললে সবই বৃথা, ঠাকুর্দ্দা।

কৃত্রিম একটা ধমক দিয়া কাশীনাথ কহিলেন, ঠাকুর্দ্দা আর বড় ভাইয়ের কাছে বিয়ের কথা নিয়ে Opinion চালানো! এটা কোথাকার গোঁয়ার-গোবিন্দ বেহায়া ছেলে রে! ও শালার ঠিকুজী ঠিকুজী একটা বাই। কেন বল ত, অরুণ?

অরুণ কহিল, বাবার ছিল জানেন ত; সেইটে ওতে বর্ত্তেছে আর কি। তা, ঠিকুজী থেকে লগ্ন রাশির ছক ত লিখে আনা হ'ল, তুই ভাল লোককে দিয়ে মিলিয়ে দেখিস, তপু। কি বলেন, ঠাকুর্দ্দা?

কাশীনাথ কহিলেন, ঠাকুর্দ্দা এক কাপ চা না খেয়ে আর কিছু এখন বলতে টলতে পারবে না। দিদিরাণীরা, ওঠ একবার। ষ্টোভ্ জেলে সাড়ে তিন কাপ চা শীগ্‌গির ক'রে ফেল দেখি।

তপন কহিল, সাড়েটা কার জন্যে, ঠাকুর্দ্দা?

অরুণের এক কাপ, তোর এক কাপ, আর আমার দেড় কাপ।

মৃণাল ও অশ্রু মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে ও-ঘরের দিকে উঠিয়া গেল।

পরদিনই অরুণ পত্র দ্বারা উদয়কে এই মেয়েটির কথা সবিস্তারে লিখিয়া জানাইল। এবং তাহার

পরদিন, উদয়ের আফিসে চলিয়া যাইবার পর, চিঠিখানা চপলারই হাতে আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যার পর উদয় আফিস হইতে আসিয়া মুখহাত ধুইয়া, জলখাবার খাইয়া বসিবার পর, চপলার কপালের উপরকার চুলগুলি হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল, তোমার মুখখানা আজ একটু বিমর্ষ দেখছি। কেন,, চপল?

চপলা উদয়ের বুকে মাথাটি রাখিয়া কহিল, আজ তোমার আফিস যাবার পর থেকে, কি জানি কেন, খালি তোমার কথা বার বার মনে পড়েছে। আমার যেন আর কিছুই ভাল লাগে না। কেন এমন হ'ল বলো ত? সত্যি বলছি, কিছু আমার যেন ভাল লাগে না।

কি তবে ভাল লাগে চপল?

সদাসর্ব্বদাই তোমার কাছে থাকতে।

তা হ'লে কাল থেকে আমার সঙ্গে আফিসে বেরিও। তবে তার আগে আর একটা কাজ কর দেখি। সেই সেদিনের মত তেমনি ক'রে আজ একখানা গান গাও দেখি, চপল। মন তা হ'লে ভাল হ'য়ে যাবে এখন।—সেদিনের সেই গানখানা—কিম্বা যা তোমার ইচ্ছে।

চপলা উঠিয়া কোচের একপ্রান্তে গিয়া বসিল। উদয় অপর প্রান্তে বসিল। চপলা গাহিল—

আসবে বলে ওগো তুমি দয়া করে আমার ঘরে,
মনের সাধে বসে বসে সাজিয়েছি আজ এমন করে।
বেলা যে বেড়ে ওঠে কাজে কাজে,
গান যে থেমে আসে কণ্ঠমাঝে।
শূন্য তোমার আসনখানি
থাকবে কি গো এমনি পড়ে?
ক্ষীণ হোয়ে এল ধূপেরি ধোঁয়া,
ফুল-চন্দন শু'কালো,
স'রে গেল ওই পথের ছায়া,
অগুরু গন্ধ মিলালো।
এত আয়োজন—এত ডাকাডাকি,
এত চেয়ে থাকা—বৃথাই হবে কি?
এস প্রাণাধিক, চিত্ত আমার
কাণায় কাণায় উঠুক ভরে।—

গান শেষ করিয়া চপলা কহিল, আজকের গান মোটেই ভাল লাগবার কথা নয়। আজ কি জানি, তোমার জন্যে মন আমার সারাদিনই যেন কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। মনের মধ্যে যেন বর্ষার বাদল লেগেছে।—ওঃ, ভাল কথা, তোমার একখানা চিঠি এসেছে। দেখ দেখি, বোধ হয় বড়ঠাকুরপোই লিখেছে। বলিয়া চিঠিখানা আনিয়া উদয়ের হাতে দিল। বলা বাহুল্য, চিঠিখানা চপলা কৌশলের সহিত খুলিয়া ইতিপূর্ব্বেই পড়িয়া লইয়াছে এবং তাহার পর আবার তাহা আঁটিয়া রাখিয়াছে।

চিঠিখানা পড়িয়া উদয় কহিল, অরুণই লিখেছে বটে। তপনের জন্যে খুব এক ভাল মেয়ে পাওয়া গেছে। কাশীঠাকুর্দ্দা সন্ধান এনেছেন।—খানিক নীরব থাকিবার পর আবার উদয় কহিল, তখন হিমুর সঙ্গে কোন রকমে বিয়েটা হ'য়ে গেলে কোন হাঙ্গামাই আর ঘটতো না। যাক্—বিয়ে হোক, আর নাই হোক, আমার কাজ আমি গুছিয়ে নিয়েছি। তিনখানা বাড়ী বিক্রীর ত সব ঠিকঠাকই হ'য়ে গিয়েছে। ও মাসে দলিল রেজেষ্ট্রী হবে। হাজার বিয়াল্লিশ টাকা ত হাতে আসুক।

চপলা কহিল, ওর বেশী হ'ল না?

তাড়াতাড়িতে কি আর দর বেশী হয়। যাক, টাকাটা পেলেই, ঐ বিয়াল্লিশ হাজার তোমার নামে ব্যাঙ্কে প্রথম গোড়াপত্তন।

আমার নামে?

হ্যাঁ গো! আমার এই বুকের বাগিচার ফুটন্ত চন্দ্রমল্লিকা শ্রীমতী চপলা সুন্দরী দাসীর নামে।

আমি তোমার চরণের দাসী, তার বেশী কিছু নই।

নন্দা চাকর তামাক দিয়া গেল। উদয় তামাক খাইতে লাগিল। চপলা কহিল, কালই ত তুমি বর্দ্ধমান যাবে?

উদয় কহিল, হ্যাঁ চপল।

আমি তোমার সঙ্গে যাব।

সাশ্চর্য্যে উদয় কহিল, সে কি?

হ্যাঁ। তা না হ'লে আমি থাকতে পারব না।

আরে, চারটে দিন, কি বড় জোর—পাঁচটা দিন।

একদিনও তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

ছিঃ! ছেলেমানুষী করতে আছে?

চপলা আর কোন কথা না বলিয়া, সেইখানে উদয়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

—

উনিশ

বর্দ্ধমান।

উদয় এইখানে একটা বড় কাজের কনট্রাক্ট পাইয়াছে, তাই মধ্যে মধ্যে তাহাকে এইখানে আসিতে হয়। গতকল্য বৈকালে সে এখানে আসিয়াছে। এবার চারি পাঁচ দিন তাহাকে এখানে থাকিতে হইবে।

উদয় আসিলে, তাহায় অস্থায়ী বাসায় কাজ-কর্ম্ম করিবার জন্য তাহারই কুলীদিগের মধ্যে কেহ একজন নিযুক্ত হইত। ও মাস হইতে একজন নূতন লোক তাহার কাজে ঢুকিয়াছে। সরকার মশাই উদয়ের বাসার কাজের জন্য এবার তাহাকেই দিয়াছে! সকালবেলা চা খাইতে খাইতে উদয় তাহারই সহিত কথা কহিতেছিল।

তা হ'লে ছেলেটিকে তোমার শালীর কাছেই রেখে দিয়ে এসেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, নইলে আর কোথায় তার গতি করি বলুন। পরিবার মারা যাবার পর ছেলেটাকে নিয়ে দিনকতক বড় আতান্তরেই পড়লুম। তখন ঐ শালীটি নিজেই এসে ছেলেটাকে চেয়ে নিয়ে গেল।

তা, আগে তুমি কি কাজ করতে, নকড়ি?

সে বাবু, সুবিধের কাজ নয়। পরিবার মরবার পর থেকেই সে কাজে ইস্তফা দিলুম। দিয়ে, এই আপনার এখানে এসে ঢুকিছি! এখন আর পেছটান্ বড় কিছু নেই। খালি ঐ ছেলেটা। তা—তার মাসীর কাছে সে বেশই আছে। আপনাকে বাবু আমার একটি কাজ ক'রে দিতে হবে। তামাক দেবো কি আপনাকে?

না, থাক্। বলিয়া সিগারেটের টিন হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া উদয় কহিল, কি কাজ তোমার ক'রে দিতে হবে বল?

একখানা গিনি আছে বাবু, আমার কাছে। অনেকদিন থেকে আমার পরিবাব পুতু-পুতু ক'রে ঐখানি রেখেছিলো। কত দুঃখু-কষ্টের দিন গেছে, তবু কখনো সে গিনিখানা বিক্রী করতে দেয় নি। তার ইচ্ছে ছিল, ঐখানা দিয়ে খোকার গলার একখানা পদক গড়িয়ে দেবে।

তা, তাই বুঝি তোমার করাবার ইচ্ছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে বাবু ঐ গিনিখানা আমি দিই, আপনি কোলকাতা থেকে যদি একখানি পদক করিয়ে এনে দেন। ওর মজুরী আলাদা ক'রে আর দিতে পারব না। ঐ সোনা থেকেই যেন মজুরী হ'য়ে যায়। আমরা হলুম বাবু মুখ্যু-সুখ্যু লোক, হয়ত সেঁকরার ফাঁকি কিছুই বুঝব না, তাই আপনাকে দিয়ে—

গিনিটা কি এখানেই তোমার কাছে আছে?

তা'ছাড়া কোথায় আর রেখে আসব বলুন? দেখবেন?

নকড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পাশের যে ছোট ঘরখানায় বামুনঠাকুর ও সরকার মশাই শুইত, সেই ঘরে গিয়া, তাহার ক্ষুদ্র আমকাঠের বাক্সটার মধ্য হইতে কাগজ মোড়া গিনিখানা আনিয়া উদয়ের হাতে দিল। যে কাগজখানাতে গিনিখানা মোড়া ছিল, উদয়ের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে উৎসুকভাবে তাহারই উপর পড়িল। গিনিখানাকে পাশে রাখিয়া দিয়া সে তাহার সমস্ত মনোযোগ সেই এক টুকরা কাগজের উপর দিল।

সেখানা ছোট একটু পত্র। চপলারই হাতের লেখা। তাহাতে লেখা ছিল:—

'আজ রাত দু'টার সময় আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো। যদি বায়স্কোপে যাও, ঐ সময়ের আগেই ফিরে এস। আমার ওপর রাগ কোরো না। ঐ সময়ে ঠিকই যাবো—ঠিকই। বুঝলে? ইতি।

'তোমার ঝিকিমিকি'।'

উদয়ের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। হাতের সিগারেটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিয়া উদয় নকড়িকে জিজ্ঞাসা করিল, ন'কড়ি, এ কাগজের টুকরোটা তুমি পেয়েছিলে কোথা? গিনিখানা তোমার স্ত্রী যত্ন ক'রে রেখেছিলো, এটা তুমি আর নষ্ট কোরো না, রেখে দাও। আমি নিজেই খরচ দিয়ে তোমার ছেলের জন্যে একভরির একটা পদক গড়িয়ে দেবো। কিন্তু এই কাগজখানা তুমি কোথায় পেয়েছিলে বলতে পার?

উৎসুক দৃষ্টিতে উদয় নকড়ির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নকড়ি প্রথমে একটু থতমত খাইল। তাহার পর সত্য-মিথ্যায় জড়াইয়া কহিল, কিছুদিন আগে, কোন একটা কাজে নৌকো ক'রে আমাদের নৈহাটী যেতে হ'য়েছিল। ফেরবার সময়, বরানগর কুটীঘাটের কাছে এক জায়গায় কিছুক্ষণের জন্যে আমরা নৌকো বেঁধেছিলুম। রাত তখন একটা কি দেড়টা হবে। সেখানে গঙ্গার তীরে একখানা একতালা বাড়ী, ভেতর-দিক্‌টায় তার দোতালা।

দোতালায় ওঠবার জন্যে বাইরের দিকে একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি ছিল।—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, ব্যাপারটাকে যেন মনে আনিবার জন্য নকড়ি একটু ভাবিতে লাগিল। উদয় উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তার পর?

নকড়ি কহিল, তারপর আমার ঐ ছেলেটার পেটব্যথা ক'রে উঠল। তাই তাকে নিয়ে একবার ডাঙ্গায় নাবতে হ'ল। সেইখানে ঐ কাগজখানা পড়েছিল। অন্ধকারে নোট্-টোট্ কিছু হবে মনে ক'রে আমি ওখানা কুড়িয়ে নি। তার পর নৌকোয় উঠে আলোর ধারে এসে দেখি যে, নোট নয়, এক-টুকরো কাগজ। আমার পরিবারের আঁচলে ঠাকুরের ফুল বাঁধা ছিল। সে ফুলগুলো ঐ কাগজখানায় মুড়ে রাখলো। তারপর ঘরে এসে আমি আবার ফুলগুলোর সঙ্গে গিনিখানাও ওতে জড়িয়ে রাখি। সেই থেকেই অমনি আছে, বাবু।

উদয়ের মুখভাব আশ্চর্য্য রকম বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল। নকড়ি কহিল, তারপর নৌকোর মধ্যে থেকে যা দেখলুম বাবু, সে আর বলবার কথা নয়। বড় লোকের বাড়ী বাবু, কি যে সব কাণ্ড হয়, তা আর—

সোৎসাহে উদয় জিজ্ঞাসা করিল—কি কাণ্ড দেখলে?

নকড়ি কহিল, কেলেঙ্কারী কাণ্ড, বাবু, কেলেঙ্কারী কাণ্ড! দোতলা বাড়ীর ঐ বাইরের সিঁড়ি দিয়ে একটি মেয়েলোক চুপি চুপি নেবে এল। আর সামনের বাড়ীর একটা লোক সেই গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে—

লোকটা কি রকম বল দেখি?

লোকটা? তিনিও বেশ ভদ্দর লোক। বেশ দেখতে শুনতে; অল্পই বয়েস।

চোখে চশমা ছিল?

ছিল বোধ হয়। অন্ধকারে সব ঠিক ঠাওর করতে পারি নি। দু'জনে ফিস্ ফিস্ ক'রে অনেকক্ষণ ধরে কথা কইলে। তার পর দু'জনে সামনেকার একতালা বাড়ীর বাইরের দিক্‌কার ঘরখানার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। আমরা ত নৌকোর ভেতর থেকে এই ব্যাপার দেখে একেবারে অবাক্! বড় বড় ঘরেই বা! এই রকম ব্যাপার হয়, আমাদের গরীবের ঘরে বাবু—

উদয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া নকড়িকে তামাক সাজিয়া আনিতে কহিল। তার পর একটা সিগারেট্ ধরাইয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল। বালিসের তলা হইতে হাত-ঘড়িটা লইয়া দেখিল, বেলা তখন সাতটা একান্ন।

নকড়ি তামাক সাজিয়া আনিলে তাহাকে কহিল, দেখ, এখনি আমাকে একবার কোলকাতায় যেতে হবে, সরকার মশাই ফিরে এলে বোলো, হয় কাল, নয় পরশু আমি আসব।—বলিয়া উদয় কাপড় ছাড়িয়া জামা গায় দিল। কলিকার তামাক কলিকার মধ্যে বৃথা পুড়িতে লাগিল। উদয় ব্যস্তভাবে আর একবার হাত-ঘড়িটা দেখিয়া দ্রুতপদে রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

নকড়ি মনিবের হঠাৎ এই ভাব-পরিবর্ত্তন এবং কলিকাতা যাওয়ার কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একটু যেন থতমত খাইল। সে বসিয়া বসিয়া এই ব্যাপারটার কারণ যে কি হইতে পারে, তাহাই ধরিবার জন্য মাথা ঘামাইতে লাগিল! তাহার মনিবের গৃহ যে বরানগর, তাহা সে জানিত না। কলিকাতার আফিস হইতেই সে কাজে বাহাল হইয়াছে। তাহার ধারণা, বাবুর বাটীও কলিকাতারই কোন স্থানে। বাবুর বাড়ী যে বরানগরে এবং শুধুই বরানগরে নয়, তাহা ঐ কুঠীঘাটেরই নিকটস্থ গঙ্গাতীরে, এ সংবাদ তাহার জানা থাকিলে, ব্যাপারটার অন্যান্য বিবরণ যেমন সে গোপন করিয়া বলিয়াছে, স্থানটার সম্বন্ধেও তেমনি গোপন রাখিয়া অন্য স্থানের নাম করিত। নকড়ির মনে একটা ধোঁকা লাগিয়া গেল! সে বসিয়া বসিয়া মন্দটাই ভাবিয়া লইল এবং সেই সংক্রান্ত দুর্ভাবনারাশি একে একে তাহার মাথায় আসিয়া জমিতে লাগিল। সে ভাবিল, সেদিন গণ্শাটাকে নিয়ে যে বাড়ীতে চুরি করেছিলুম, সেইটেই এই বাবুর বাড়ী নয় ত? সেই লোকটাই এই বাবু কি? নইলে কথাগুলো শুনে ঐ রকম ভাবান্তর হ'ল কেন? আর টপ্ ক'রে সেজে-গুজে গেলই বা কোথা? গিনিখানা ত ফিরিয়ে দিলে, কিন্তু কাগজটুকু ত দিলে না! পুলিসে খবর দিতে গেল না ত? হয় ত মাল শুদ্ধ একেবারে ধরিয়ে দেবে। না বাবা, গতিক ভাল নয়! অনেক জায়গায় অনেক অপকর্ম্ম করিছি। গিনিখানা দেখিয়ে ভাল কাজ করি নি। কি থেকে কি কাণ্ডই বা ঘটে যায়। নাঃ—এর ভেতর নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে।

খানিকক্ষণ মনে মনে গবেষণা করিবার পর নকড়ি সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল, বাবু ঠিকই পুলিসে খবর দিতে গিয়াছে। সুতরাং সে আর কাল-বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বামুনঠাকুরকে রান্নাঘরে রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত দেখিয়া, সে এ ঘর হইতে তাহার আমকাঠের ছোট বাক্সটি বগলে করিল এবং চুপি চুপি বাসা হইতে সরিয়া পড়িল।

সেই দিন দ্বিপ্রহরের সময় অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় উদয় বরাহনগরে আসিয়া শুনিল, চপলা সকালে হাজরা রোড হইতে মায়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া, একখানি ট্যাক্সি আনাইয়া তথায় চলিয়া গিয়াছে। নন্দা চাকর সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু চপলা কাহাকেও সঙ্গে লয় নাই। সেখান হইতে যে লোকটা সংবাদ আনিয়াছিল, তাহারই সহিত চলিয়া গিয়াছে। উদয় আর উপরে গেল না, ঘরের মধ্যেও প্রবেশ করিল না। বরাহ-নগর হইতে ট্যাক্সি করিয়া বরাবর হাজরা রোডে গিয়া হাজির হইল। সেখানে সদর-দরজাতেই ভৈরব চাকরের সহিত তাহার দেখা হইল। উদয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাটীর সকলে কেমন আছেন ভৈরব?

ভৈরব আহারান্তে একটা বিঁড়ি ধরাইয়া বাহিরে আসিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ জামাইবাবুর দর্শনে এবং তাঁহার প্রশ্নে সে থতমত খাইয়া বিঁড়িটা পিছনের দিকে ফেলিয়া দিয়া কহিল, সকলেই ভাল আছেন; কিন্তু আইজ্ঞে—মা ত ঘরে নাই। কোথায় আইজ্ঞে—ভ্যামোন্তোন্নতে গ্যাছেন। আপনাদের সংবাদ সব ভাল বাবু? বড় দিদিমণি ভাল আছেন?

উদয়ের গলা শুনিতে পাইয়া হেনা ছুটিয়া বাহিরে আসিল এবং তাহার দিদির কুশল-প্রশ্ন করিয়া উদয়কে ভিতরে যাইবার জন্য বলিল। উদয় কিন্তু আর ভিতরের দিকে পা বাড়াইল না। হেনাকে জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথায় গেছেন? হেনা কহিল, মা ভবানীপুরে বিভূতি বাবুর বাড়ী গেছেন। এখনি আসবেন, আপনি আসুন না।

রাস্তার দিকে পা বাড়াইয়া উদয় কহিল, এখন না, হিনু। টালীগঞ্জে বিশেষ একটু দরকারী কাজ আছে। সেটা সেরে, ফেরবার সময় এখান হয়ে যাবো।

ওখান হইতে উদয় পুনরায় একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া, ভারতের হলিউড—টালিগঞ্জে গিয়া পৌছিল। সেখানে যে ফিল্ম কোম্পানীতে নিকুঞ্জ কাজ করিত, সেখানে গিয়া তাহার খোঁজ করিয়া জানিল, নিকুঞ্জ দুইদিন সেখানে যায় নাই। ফিরিবার সময় সেখানকার একজন ভৃত্য তাহাকে কহিল যে, নিকুঞ্জ বাবুকে সে আজ বেলা ১১টা ১১॥টার সময় কালীঘাটে দেখিয়াছে। উদয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কালীঘাটের কোথায়? সে কহিল, মন্দিরের উত্তরদিকের রাস্তায় যে নূতন যাত্রি-বাস হ'য়েছে, মস্ত বাড়ী, তারই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দোতলার বারান্দায়।

বেলা যখন চারিটা, তখন উদয়ের ট্যাক্সি উক্ত যাত্রি-বাসের সম্মুখে আসিয়া থামিল। উদয়ের প্রশ্নে তথাকার একটি লোক কহিল, ওপরের কোণের ঘরে একটি বাবু স্ত্রীকে নিয়ে আজ দুপুর বেলা এসেছেন। তাঁরা দু'ইদিনের জন্যে ঘর ভাড়া নিয়েছেন।

উদয় মত্ত অবস্থার মত টলিতে টলিতে উঠিয়া গেল।

ঘরখানির সম্মুখদিকে দুইটি দরজা। দুইটি দরজাই উন্মুক্ত ছিল। ভিতরে মেজের উপর একখানা মাদুর পাতা, একটা দড়ির টানাতে কাপড়-চোপড় ঝুলিতেছিল। এক কোণে শালপাতার উপর ভোজনাবশিষ্ট লুচি, কচুরি, আলুর দম প্রভৃতি পড়িয়া ছিল। তাহারই কাছে একটা মাটীর কলসীতে জল ও একটা গেলাস উপুড় করা ছিল। মাদুরের এক ধারে কয়েক দোনা সাজা-পাণ, সিগারেটের বাক্স, দিয়াশলাই, দুইটা মাছি-ধরা খালি চায়ের কাপ এবং মাদুরখানার মধ্যস্থলে—কাত হইয়া বসিয়া নিকুঞ্জ এবং সোজা হইয়া বসিয়া—চপলা।

অন্ধকারের মধ্যে, নর্দ্দমা দিয়া ছুটিয়া আসিতে আসিতে, ছুঁচা যেমন সম্মুখে হঠাৎ মানুষের সাড়া পাইবামাত্রই পিছন ফিরিয়া দ্রুত পলাইয়া যায়, তেমনি মুক্ত দ্বারপথে উদয়কে দেখামাত্রই নিকুঞ্জ দ্বিতীয় দরজা দিয়া বিদ্যুদ্বেগে পলাইয়া গেল। চপলার কিন্তু উঠিয়া পলাইবার অবসর বা সাহস হইল না। সে একবার সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াই, মুখ নীচু করিয়া বসিল। উদয় দুই হাতে দরজার দুই চৌকাঠ ধরিয়া, সোজা দাঁড়াইয়া, চপলার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল,—ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল না। খানিকক্ষণ এই ভাবে চাহিয়া

থাকিবার পর, শান্ত এবং ধীর গলায় কহিল, তোমায় ছোঁব না, তুমি অস্পৃশ্য। তোমার গায়ের গয়নাগুলোও খুলে দেবার দরকার নেই, ওগুলোও তোমার ব্যবহারে অস্পৃশ্য হোয়ে গেছে। তবে, আঁচলের ঐ চাবির রিংটা খুলে দাও। তোমায় বলবার আর আমার কিছু নেই। তবে কখনো আমার সামনে যেন না পড়। তা পড়লে, হয় ত সেদিন তোমার পক্ষে ভয়ানক বিপদের দিন হবে। দাও, চাবির রিংটা খুলে দাও।

নীরবে আঁচল হইতে চাবির রিংটা খুলিয়া চপলা দুয়ারের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। উদয় তাহা কুড়াইয়া লইয়া কিছুক্ষণের জন্য আর একবার চপলার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পর, নীরবে পশ্চাৎ ফিরিল। সিঁড়ির অর্দ্ধ পথ নামিয়া আসিয়া উদয় আবার ফিরিল এবং সেই ঘরের সম্মুখে আসিয়া চপলাকে কহিল, আর একটা কথা তোমায় বলবার আছে। ঠিক উত্তর দেবে। মিথ্যা বললে, এই ঘরে—সহসা উদয়ের কণ্ঠস্বর ভীষণ হইয়া উঠিল—এই ঘরে গলা টিপে খুন ক'রে চ'লে যাব। পরক্ষণেই সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কঠোর গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, এই লোকটার সঙ্গে তোমার এ-ভাব কতদিন থেকে? —ঠিক বলবে।

কিন্তু ঠিক বা বে-ঠিক চপলা কিছুই বলিল না, সে নীরবে সেই ভাবেই ঘাঁড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। সেই সময় যদি কেহ তাহার বুকে হাত দিয়া দেখিত, তাহা হইলে জানিতে পারিত, মহাপাপীয়সী হইলেও তাহার বুকের মধ্যে তখন দ্রুত স্পন্দন হইতেছে। হয় ত বুক পর্য্যন্ত তাহার কান্না ঠেলিয়া উঠিয়াছে। বাহিরের চপলা সজীব থাকিলেও, ভিতরের চপলা হয় ত তখন নির্জ্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আর উপায় নাই। নিমেষটুকুর মধ্যেই তাহার পশ্চাতের পথ যেন সহসা চারিদিক্ হইতে রুদ্ধ হইয়া গেল।

পুনরায় উদয়ের তীব্র কণ্ঠের প্রশ্ন আসিল, বল—ওর সঙ্গে এরকম ভাব কতদিন থেকে?

যেন প্রাণহীন দেহাভ্যন্তর থেকে উত্তর আসিল, —অনেক দিন থেকে।

অনেকদিন মানে, কতদিন?

বিয়ের আগে থেকে।

আর একটা কথা। তোমার বাপ-মা এ সব কিছু জানতো? ঠিক বলো।

জানতো। আমরা চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করে বিয়ে——

উদয় আর কিছু শুনিল না, বা শুনিবার মত অবস্থা তাহার ছিল না। সে দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। ট্যাক্সিতে উঠিয়া ড্রাইভারকে কহিল, সরাবকা দেকানমে লে চলো।

আদি-গঙ্গার ধারে একখানা দেশী সরাবের দোকানের সামনে ট্যাক্সি আসিয়া থামিলে, উদয় নামিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। দোকানদার জিজ্ঞাসা করিল, কতটা দেবো?

উদয় কহিল, যতটা খেলে নেশা হয়।

দোকানদার একটু বিস্মিত হইল; কহিল, আপনার কি খাওয়া অভ্যাস নেই?

না।

তবে দু' আউন্সই দি।—বলিয়া ছোট একটা গ্লাসে দু' আউন্স মাপিয়া উদয়ের হাতে দিল। উদয় তাহা পান করিবার সঙ্গে-সঙ্গে মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল, পাণ—শীগ্‌গির! দোকানী তখনি দুই খিলি পান আনাইয়া দিল। পাণ মুখে দিয়া, দোকানীর দাম চুকাইয়া দিয়া, উদয় টলিতে টলিতে ট্যাক্সিতে আসিয়া বসিল। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করিল, আভি কাঁহা যানে হোগা বাবুসাব।

যাঁহা তোমরা খুসী। বলিয়া উদয় সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিল

বাবুসাব!—ড্রাইভার কি বলিতে যাইতেছিল। উদয় বলিয়া উঠিল, আচ্ছা—চলো হাজরা রোড, 'পার্ক' কা সাম্‌নামে।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। রাস্তার উভয় দিকের বাতিগুলো একে একে জ্বলিয়া উঠিতে সুরু করিয়াছিল। উদয় নগেন বাবুর গৃহ-সম্মুখে নামিতেই, আবার তাহার সহিত ভৈরবের দেখা হইল। ভৈরব কহিল, বাবু ত ঐ পার্কের মধ্যে ব'সে আছেন, জামাই বাবু।

সম্মুখেই পার্ক। উদয় পার্কে প্রবেশ করিয়া দেখিল, নির্জ্জন পশ্চিমদিকের একখানা বেঞ্চের উপর নগেন বাবু একলাটি বসিয়া রহিয়াছেন। উদয়ের বেশ একটু মত্ততা আসিয়াছিল। পা তাহার একটু অস্বাভাবিক ভাবেই পড়িতেছিল। শ্বশুরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি উঠিয়া কহিলেন এস, বাবাজী। শুনলুম, তুমি আর একবার এসেছিলে। বাড়ীর খবর সব ভালত?

খুব খারাপ, শ্বশুর মশাই, খুব খারাপ। আপনার কন্যা রোগগ্রস্ত।

ভয়ানক উৎকণ্ঠার সহিত নগেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, চপলার?

হ্যাঁ! চপলা—চপলা—চপলা—চপলার!

কি হয়েছে তার?

কি হয়েছে, দেখে এস—মন্দিরের কাছে নতুন ঐ যাত্রিবাসের দোতালার কোণের ঘরে গিয়ে। সেখানে তোমার জামাই আছে—নিকুঞ্জ—নিকুঞ্জ! নিকুঞ্জকে চেন ত? তোমার পয়লা জামাই গো! যাও—দেখে এস। বলিয়া উদয় নগেন বাবুকে এমন এক ভীষণ জোর ধাক্কা দিল যে, তিনি ঠিক্‌রাইয়া একেবারে বেঞ্চির উপর গিয়া পড়িলেন এবং বেঞ্চির কোণার লোহাটার আঘাতে বামচক্ষুতে ভীষণ ব্যথা পাইয়া, দুই হাতে চক্ষু চাপিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

পরক্ষণেই উদয় টলিতে টলিতে ট্যাক্সিতে আসিয়া বসিল এবং ড্রাইভারকে কহিল, চালাও—যাঁহা তোমরা খুসী।

ড্রাইভার বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলে উদয় কহিল, আচ্ছা—বয়োস্কোপমে চলো—শ্যামবাজার।

একুশ

উদয় বকুলবাটীতে আসিয়াছে। তাহাকে ঘিরিয়া অরুণ, তপন এবং কাশীনাথ বিমর্ষচিত্তে গৃহমধ্যে উপবিষ্ট। কাশীনাথ কহিলেন, এত বড় বিপদটা ঘটে গেল, তোমার একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দেওয়া খুবই উচিৎ ছিল, উদয়। এটা তোমার মস্ত বড় ভুল হয়েছে, ভায়া। উদয় কহিল, সময় পেলুম না, ঠাকুর্দ্দা। ভোরবেলা হ'ল আর সন্ধ্যাবেলাতেই মারা গেল। আমারই যেতে একটু দেরী হ'লে, আমার সঙ্গেই আর দেখা হ'ত না

চপলা মারা গিয়াছে। অর্থাৎ উদয় আসিয়া কহিয়াছে যে, চপলা গত বুধবারের আগের বুধবার তাহার মাকে দেখিতে যায়। সেই বুধবারই শেষরাত্রিতে তাহার কলেরা হয় এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় মারা যায়। চিকিৎসার কোন ক্রটী হয় নাই, সেবা-শুশ্রূষাও যেমন হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই বাঁচাইতে পারা যায় নাই,—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উদয় কহিল, মরণ রোগ হ'লে ত আর কারুকে বাঁচাতে পারা যায় না; সুতরাং আফশোষের আর কি আছে!

সহসা এই দুঃসংবাদে সকলেই মুহ্যমান হইয়া পড়িল। অশ্রু অন্তরালে থাকিয়া চোখের জল ফেলিল, অরুণ যদিও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, ভালই হ'য়েছে, তথাপি চপলার হঠাৎ মৃত্যু-সংবাদে সে মনের মধ্যে একটু কাতরও যে না হইল, তাহা নয়। তপনের মনেও একটা ঘা লাগিল। তাহার বড় বউদির জন্য যতটা না হউক, বড়দাদার জন্য মনটা তাহার বেদনায় ভরিয়া উঠিল। সে বিমর্ষচিত্তে ভাবিতে লাগিল, বছর পাঁচ ছয় হ'ল যে আঘাত বড়দা' পেয়েছিলেন, তার দাগটা প্রায় মিলিয়েই এসেছিলো; কিন্তু সহসা আবার এই নতুন আঘাত,—এ কি তাঁর সহ্য হবে!

যা'র সহ্য অসহ্য হওয়ার জন্য তপন চিন্তামগ্ন, সেই উদয় কিন্তু নির্বিকার চিত্তে খুব শান্ত এবং সহজভাবেই কহিল, যা'ক; এখন তপুর বিয়েটা দেওয়া খুবই দরকার হ'য়ে পড়লো; কি বলেন, ঠাকুর্দ্দা?

কাশীনাথ কহিলেন, নিশ্চয়ই। আর মেয়েও ত দেখে-শুনে আমরা ঠিক করেই রেখেছি। খালি তোমার মতামতের অপেক্ষা।

উদয় কহিল; তার আগের একটা অপেক্ষা আছে, সেটা হ'ল—তপুর ঠিকুজী মিলিয়ে দেখার অপেক্ষা, ওটা আমিও চাই। মেয়েটিকে কাল একবার আমি দেখে আসি। তার পর, তার ঠিকুজীখানা নিয়ে তপু একদিন বরানগরে—ভাল কথা, আর একটা কাণ্ড আমি করিছি, অরুণ।

অরুণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উদয়ের মুখের দিকে চাহিলে, উদয় কহিল, তোমরা সব চ'লে এলে, তারপর এদিকে হঠাৎ এই কাণ্ডটা ঘটে গেল, সুতরাং বরানগরের অত বড় বাড়ীতে আমার একলা থাকাটা বড়ই কষ্টকর হ'য়ে উঠলো। বুঝলে না? আর তা ছাড়া, আমার বন্ধু সেই দেবকী ভট্টাচার্য্য, তার 'সোপ-ফাক্টরী'র জন্যে বরানগর গঙ্গার ধারে একখানা বাড়ী খুঁজছিল। আমি মাসে দেড়'শ টাকা ভাড়ায় তাদের ওটা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি—পনর বছরের লিজে।

অরুণ ও তপন প্রায় একসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, তা হ'লে আপনি আছেন কোথায়, বড়দা?

আমি ত এখন একলা। আর আফিসের

কাজের সুবিধের জন্যে আমার কোলকাতার মধ্যে থাকাই ত সুবিধে। শ্রীনাথদাস লেনের বাড়ীখানার ভাড়াটে ত উঠে গেছলো। আমি সেই বাড়ীতেই আছি। জিনিস-পত্তর লরি বোঝাই ক'রে একদিনেই সব নিয়ে গেছি। এখনো সব ঠিক গোছানো হয় নি—তার পর তপনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আমি তা হ'লে পরশু কি তরশু এখান থেকে চ'লে যাব। তুই আমার সঙ্গেই যাবি কি? তপন কহিল, ঠিকুজীখানা দেখাতে আর কোলকাতা যাবার দরকার কি, বড়দা? নারাণপুরের সিদ্ধেশ্বর ভট্‌চার্য্যি দেশে এসে রয়েছেন, তাঁকে দিয়ে দেখালেই সব চেয়ে ভাল হবে। উনি ত এ সব বিষয়ে একজন পাকা লোক।

সেই পরামর্শই স্থির হইল। আগামী কল্য উদয় কাশীনাথকে সঙ্গে লইয়া মেয়েটিকে দেখিয়া আসিবে। তার পর তপন একদিন পার্শ্বের গ্রাম নারাণপুরে গিয়া ঠিকুজীখানা দেখাইয়া আনিবে।

ইহার পর উদয় তাহার জামার পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া কহিল, খবর অনেক আছে। আর একটা কাণ্ড ক'রে ফেলেছি। বলিয়া সেই ভাঁজ-করা কাগজখানা খুলিয়া উদয় কাশীনাথের হাতে দিল। কাশীনাথ কহিলেন, কি বল দেখি?

দান-পত্রের খসড়া। আমার অংশের সম্পত্তিটা আমি দুই বউমাকে দিয়ে যাচ্ছি।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না। উদয় কহিল, আমাদের কোলকাতার ক'খানা বাড়ী, বরানগরের বাড়ী, বাগান, আফিস, মধুপুরের বাড়ী,—এ সবের যে এক-তৃতীয়াংশের আমি অধিকারী, তা'র অর্দ্ধেক আমি মেজ-বউমাকে আর বাকী অর্দ্ধেক—ভাবী ছোট-বৌমাকে তুল্যাংশে দিয়ে গেলুম। এ ছাড়া আমার নিজের নামে ব্যাঙ্কে হাজার পঞ্চাশ টাকা আছে, যার কথা তোমরা কেউ জান না, সে টাকাটাও আমি সমান ভাগে দু'জনকে দিয়ে যাচ্ছি। এখন থেকেই এঁরা মালিক। এর উপস্বত্ব এখন থেকেই এঁদের দু'জনের নামে জমা হবে। তবে, যদি আবশ্যক হয়, তা হ'লে তা'র থেকে মাসে পঞ্চাশটা ক'রে টাকা, যত দিন আমি বাঁচব—নেবো।

অরুণ কহিল, এর জন্যে এত তাড়াতাড়ির কি দরকার ছিল, বড় দা'? তপনও ঐ রকম কিছু-একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উদয় কাশীনাথকে তাড়া দিয়া কহিল, একবার প'ড়ে দেখুন ত, ঠাকুর্দ্দা।

কাশীনাথ দান-পত্রের খসড়াখানা মোটামুটি চোখ বুলাইয়া লইলেন। উদয় কহিল, আমার ইচ্ছে, দুই বউমার নামে আলাদা আলাদা দু'খানা দান-পত্র আমি করব। পুজোর বন্ধের আগেই মেজ-বৌমারখানা আমি রেজেষ্ট্রী ক'রে ফেলবো, আর সেইখানাই মেজ-বৌমার হাতে দিয়ে এবার তাঁকে পুজোর আশীর্ব্বাদ করবো। তার পর, তপুর বিয়েটা যদি অঘ্রাণে হয়, তা হ'লে ছোট-বৌমাকে আমি তাঁর নামের দান-পত্রখানি দিয়েই তাঁর মুখ দেখবো।

পরদিন সকাল-সকাল আহারাদি সারিয়া উদয় কাশীনাথকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকেষ্টপুরে মেয়ে দেখিতে যাত্রা করিল। মেয়ে দেখিয়া উদয়ের খুবই পছন্দ হইল। বাটী ফিরিয়া আসিয়া উদয় কহিল, সুন্দর মেয়ে। চোখ-ধাঁধানো রূপ নয় বটে, কিন্তু রূপটি শান্ত। আর বেশ লক্ষণযুক্ত মেয়ে। যদি ভগবানের ইচ্ছায় কোষ্ঠীতে মিলে যায়, তাহ'লে আমাদের সংসারে দুই বিভিন্নরূপে দুই লক্ষ্মী বিরাজ করবেন। কাশীনাথ কহিলেন, হবে না ভাই? কি ঘরের মেয়ে ও। রামরতন সরকারের পৌত্রী; কত বড় সদ্‌বংশ! আজ ওরা গরীব হ'য়ে পড়েছে বটে, কিন্তু বংশের সেই মর্য্যাদা, সেই সদ্‌গুণ, সেই সুনাম তখনো যা ছিল, আজও তাই আছে। সেই বংশের মেয়ে ভায়া, সুতরাং ভাল হ'বে না! এ দিকে আজকালকার হিসেবেও মেয়েটি ফেল্‌না নয়। লেখাপড়া বেশ জানে, গান জানে, প্রায় সর্ব্বরকম শিল্প কাজেও বেশ হাত।

পরদিন উদয় কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। চপলার ব্যাপারে বেদনার যে কালো মেঘ তাহার অন্তরদেশে জমা হইয়া উঠিয়াছিল, বকুলবাটী হইতে ফিরিবার সময় তাহার অনেকটা যেন কাটিয়া গেল।

উদয়ের চলিয়া যাইবার কয়দিন পরে তপন একদিন তাহার ও ছায়ার ঠিকুজী দুইখানা লইয়া নারাণপুরের সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্যের নিকট গিয়া হাজির হইল। তিনি উত্তমরূপে উভয় কোষ্ঠী বিচার করিয়া কহিলেন যে, চমৎকার যোটক। এই বিবাহের ফলে, স্বামি-স্ত্রীর জীবনে সুখ ও শান্তির পবিত্র বিমল স্রোত একটানা বহিয়া যাইবে। তবে আগামী বৈশাখ মাসের ভিতর কন্যার একটা ফাঁড়া দেখা যাইতেছে। সুতরাং ঐ

সময়টা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তবেই যেন বিবাহটা হয়।

এই সংবাদ জানাইয়া কলিকাতায় উদয়কে পত্র দেওয়া হইল; উদয় পত্রোত্তরে লিখিল যে, কথাবার্ত্তা সব পাকা হইয়া থাক, আগামী জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ়েই—বিবাহ হইবে।

অশ্রু একদিন তপনকে ধরিয়া বসিল; কহিল, তাই ত ঠাকুরপো, একদিন নয়, আধ দিন নয়, প্রায় একটি ব-চ্ছ-র! থাকতে পারবে ত? আমি বলি, ছায়াকে না হয় এই ক'টা মাস এখানেই এনে রাখা হ'ক। আর না হয় তুমি এই ক'টা মাস ছায়াদের বাড়ীর পাশে একখানা ঘর ভাড়া ক'রে থাক গিয়ে। তপন হাসিতে হাসিতে কহিল, আমিও তাই মনে কচ্ছিলুম, মেজ-বৌদি। বিয়ের আগের এই লম্বা সময়টা বৃথা যায় কেন, এর মধ্যে তাকে দ্বিতীয় ভাগের বানানগুলো আর গুণ-ভাগটা রপ্ত করিয়ে নি। নইলে দু'জনেই সমস্ত দুপুর বেলা ধ'রে যে, বাড়ীর মধ্যে পাঠশালা বসিয়ে দেবে, সেটা পড়ুয়াদের হয় ত ভাল লাগতে পারে কিন্তু যারা পড়ুয়া নয়, তাদের ততটা ভাল লাগবে না। অথচ গুণ-ভাগটা শেখাও দরকার; কেন না, বড়দার অংশের সম্পত্তিটা ত দু'জনের মধ্যে ভাগ ক'রে নিতে হবে। আমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে আর ভাগা-ভাগির কোন হাঙ্গামা নেই।

অশ্রু কহিল, তা বড়-ঠাকুর আমাদের দুই জা'কে দিয়েছেন ব'লে তোমাদের বুঝি হিংসে হ'য়েছে? তা তাঁকে ব'লে-ক'য়ে না হয় ওটা তোমাদের দু'ভাইকেই দেওয়ার ব্যবস্থা করব এখন। তা হ'লে হবে ত?

আমাদের দু'ভায়ের আর চাই না মেজ-বৌদি, বরং আমার অংশটাও তোমাদের দু'জনের নামে লিখে দিতে পারলে আমরা হাল্কা হ'য়ে যাই। তা হলে কিন্তু শুধু ভাগে কুলুবে না, কম্পাউণ্ড ভাগ শিখতে হবে তোমাদের।

তোমাদের ভাগটাও দিয়ে দেবে যে, তা, তোমাদের মনে আবার এমন কি বৈরাগ্যের উদয় হ'য়ে পড়লো, ঠাকুর পো?

তপন হঠাৎ হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, ছি-ছি-ছি-ছি! উচ্চারণ করে ফেল্‌লে, বৌদি? উচ্চারণ করতে নেই যে!

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া অশ্রু যেন একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া কহিল, কি বলছ?

বলছি, ভাসুরের নাম ধ'রে ফেললে! বৈরাগ্যের 'উদয়' বল্লে যে?

বৈরাগ্যের কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অশ্রু কিন্তু অন্য কারণে মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। কথাটার মধ্যে তাহার ভাসুরের উদ্দেশ্যে একটুখানি হাল্কা বিদ্রূপের আভাস ছিল। কিন্তু তাহার সঙ্কোচটা সঙ্গে-সঙ্গেই কাটিয়া গেল, যখন তপন কথাটাকে রহস্যের পথে আনিয়া ফেলিল।

বিদ্রূপটা এই জন্য যে, চপলার হঠাৎ মৃত্যুর কথাটা শুনিয়া সকলেই দুঃখের সহিত চমকাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরে, অরুণ ও অশ্রুর মন হইতে এই চমকের ভাবটা কাটিয়া যায়। সমস্ত ব্যাপারটা মিথ্যা বলিয়াই দু'জনে অনুমান করে। যে কারণে বরাহনগর ছাড়িয়া সদ্য-সদ্যই তাহারা এখানে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়, ইহারও মূলে হয় ত তেমনই কিছু একটা ব্যাপার জড়িত আছে, যাহার জন্য হঠাৎ বড় বধূর মৃত্যু অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। উভয়েরই বিশ্বাস, চপলার মৃত্যু হয় নাই এবং তজ্জন্য উদয়ের মনে বৈরাগ্যের উদয়ও হয় নাই। সেদিন রাত্রিতে অরুণ ও অশ্রু এই কথার সূত্রে চুপি চুপি অনেক কথারই আলোচনা করিয়াছে এবং আলোচনা-শেষে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছে যে, ইহা লইয়া আর আলোচনা, অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসা-বাদ করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাহাদের মনের এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল, যখন ছায়ার ফাঁড়ার সংবাদের উত্তরে পত্র আসিল, যাহাতে তপনের বিবাহের পাকা-পাকি ব্যবস্থা করিয়া রাখার কথা ছাড়া লেখা ছিল যে, তাহার শ্বশুর মহাশয়ের একটি চক্ষু হঠাৎ আঘাত পাইয়া একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তিনি সপরিবারে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কাশীবাস করিবার সঙ্কল্পে তথায় চলিয়া গিয়াছেন। নগেন বাবুর হঠাৎ সপরিবারে কাশী যাওয়ার ভিতরেও একটা গূঢ় রহস্য থাকা সম্ভব। সকলেই জানিত, যাঁহারা শেষ বয়সে কাশীবাস করিয়া থাকেন, নগেন বাবু সে প্রকৃতির মানুষ নহেন। সুতরাং চপলার সে-রাত্রির সেই ব্যাপার, তাহার পর তাহার হঠাৎ মৃত্যু এবং নগেন বাবুর কাশীবাস—এ সমস্তরই ভিতর একটা অন্য কিছু যে আছে, তাহা অরুণ ও অশ্রু মনে মনে স্থির করিয়া লইয়াছিল। তবে এ কথাটাও উভয়ে মনে মনে অনেকবার বলিয়াছিল যে, চপলার মৃত্যুর কথাটা সত্য হইলেই ভাল হয়।

যাহা হউক, তপনের কথার উত্তরে অশ্রু কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তপন আর না দাঁড়াইয়া, হুইল-বাঁধা ছিপগাছটা লইয়া খিড়কীর ঘাটের দিকে চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই অশ্রু তাহার মাথার ঘোমটাটা যে অবধি টানা ছিল তাহা অপেক্ষা আরও একটু টানিয়া দিয়া অরুণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

অরুণ বাহিরে কোথাও গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিল।

অরুণ কহিল, ঘোমটাটা ত মাথাতে দেওয়াই ছিল, আবার আমায় দেখে খানিকটা টেনে দিলে যে? অশ্রু কহিল, ওটা অভ্যাসের দোষ।

আচ্ছা, অভ্যাস বানান কর ত?

পারব না। ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

অঙ্ক-টঙ্ক, লেখা, পড়া—সব?

সব।

কারণ?

অকারণ। *বিনা কারণেই ধরেছিলুম, বিনা* কারণেই ছেড়ে দিলুম।

কিন্তু ছোট-বৌমা যে আসছে, সে খুব ভাল লেখাপড়া জানে, তা শুনেছ ত?

শুনিছি।

সে গানও খুব সুন্দর গাইতে পারে, তা'ও বোধ হয় শুনেছ?

শুনেছি। সে কবিতাও লিখতে পারে, সেটাও বোধ হয় তুমি শুনেছ?

না, সেটা শুনিনি। পারে না কি?

হ্যাঁ। সে এলে লেখা পড়া শেখার বদলে, ভেবেছি তার কাছ থেকে কবিতা লেখাটাই শিখব।

না শিখেই ত তুমি মস্ত কবি গো।

অন্ততঃ কবি-প্রিয়া ত বটেই; তার ত আর কোন ভুলই নেই।

অরুণ বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া কহিল, আচ্ছা অশ্রু, জগতে সকলের চেয়ে কি আনন্দের বল দেখি।

একটুখানি ভাবিয়া এবং একটুখানি হাসিয়া অশ্রু কহিল, সব চেয়ে কি আনন্দের? এ ত খুব সোজা কথা। ভয়ে বলবো—না নির্ভয়ে বলবো?

ভয় কেন, নির্ভয়েই বল।

তা হ'লে বলছি।—এই তোমার কাছে আমার থাকা, আর আমার কাছে তোমার থাকা—এই হল সব চেয়ে আনন্দের।

না। আমার কিসে আনন্দ বলব? বিশ্ব-প্রকৃতির বিভিন্ন বিচিত্র রূপ মন প্রাণ দিয়ে উপভোগ করা।

সেই ভাত খেয়ে বেরিয়ে এতক্ষণ পর্য্যন্ত তা হ'লে বিশ্ব-প্রকৃতির রূপ উপভোগ করছিলে বোধ হয়? তোমার চেয়ে তা হ'লে দেখছি ঠাকুরপো আসল বস্তুটির সন্ধান পেয়েছে। 'মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে।'—ঠাকুরপো সেই মৎস্যের সন্ধানে গিয়ে দেখছি সুবুদ্ধির কাজ করেছে।

অরুণ কহিল, প্রকৃতির এই বর্ষা-রূপটাই—আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। এখন—'মাহ ভাদর, ভরা বাদর।' যখন ঝম্ ঝম্ ক'রে খুব বৃষ্টিটা হ'ল, তখন বৈঠকখানায় ব'সে ব'সে তাই দেখছিলুম। বাস্তবিকই এই অবিশ্রান্ত ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির ধারা আমায় একেবারে তন্ময় ক'রে দেয়।

দিত না; তবে দেয় যে তার একটা কারণ আছে; আমার লেখাপড়া ত্যাগের মত একেবারে অকারণ নয়।

কারণটা কি?

কারণটা—আমি। আমি কাছে আছি বলেই তাই ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির ধারাও ভাল লাগে, প্রচণ্ড শীতও ভাল লাগে, আর দারুণ গ্রীষ্মও ভাল লাগে। চ'লে যাই দেখি মাস কতকের জন্যে বাপের বাড়ী, কেমন তোমার এ সব তখন ভাল লাগে? চোখের জল নোন্‌তা হ'লেও তোমার কাছে অশ্রু যতটা মিষ্টি, এমন আর কিছুই নয়। বল না, ঠিক কি না?

না।

তা হোলে চ'লে যাই বাপের বাড়ী?

যাও। আমার সব চেয়ে ভাল কবিতাগুলো তোমার অ-বর্ত্তমানেই অর্থাৎ তোমার বাপের বাড়ী থাকার সময়েই বার হ'য়েছে।

তা মনেও ক'রো না। সে সময় বাহ্যিক ভাবে আমি না থাকলেও, তোমার অন্তরে আমি আরও বেশী ক'রে জড়িয়ে থাকতুম, তাই ভাল কবিতাগুলো তোমার সেই সময়েই বার হ'য়েছে।

ভৃত্য কৃষ্ণচরণ একখানা ডাকের চিঠি হাতে করিয়া আসিতেছিল। অশ্রু কহিল,—তা হ'লে আমি বাপের বাড়ীই চলে যাই। ঐ চিঠিও এল বোধ হয়।

কেষ্টর হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া অশ্রু অরুণের হাতে দিল। অরুণ পড়িয়া বলিল, দাদা

লিখেছেন। আবার এই শনিবার তিনি আসছেন। দেশের ওপর দাদার দেখছি মায়া প'ড়ে গেল।

হয় ত উদয়ের সত্যই দেশের প্রতি একটু টান পড়িয়াছে। পড়িবারই কথা। তাহার সব চেয়ে যে বড় টান ছিল, সে টানের দড়ি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই টানা ছিঁড়িবার ফলে যে প্রবল ধাক্কা তাহাতে আসিয়া লাগিয়াছে, তাহার টাল্ সামলাইতেই, অন্তর তাহার ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে। তাই সে নানা দিকে, নানা কাজের মধ্যে, নানা ভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাই সে আফিসের কাজে আজ-কাল উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে, সম্পত্তির আয় বাড়াইতে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছে, দেশের দিকে ঝুঁকিয়াছে এবং তপনের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। মোট কথা—তাহার জীবনযাত্রার এতদিনকার ধারাটাই যেন বদলাইয়া গিয়াছে। এখনকার উদয় যেন আগেকার সে উদয় নয়।

শনিবার ষ্টেশনে গরুর গাড়ী পাঠান হইল; উদয় আসিল। কলিকাতা হইতে উদয় ছায়ার পিতাকেও একখানা পত্র দিয়াছিল। সেই পত্রানুযায়ী রবিবার মধ্যাহ্নে তিনিও বকুলবাটী আসিলেন। সকলে থাকিয়া বিবাহ সম্বন্ধে পাকা-পাকি কথা স্থির হইয়া গেল। এক পয়সাও যৌতুক লওয়া হইবে না। উপরন্তু এ-পক্ষ হইতে বিবাহের আনুষঙ্গিক ব্যয়াদির জন্য কাশীনাথের হাত দিয়া শ-পাঁচেক টাকা সাহায্য করা হইবে; তবে বিবাহটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে হইবে। ছায়ার ফাঁড়ার কথাটা গোপন রাখিয়া, অন্য একটা কারণ দেখাইয়া শুভকর্ম্ম এই কয় মাস স্থগিত রাখিবার ব্যবস্থা হইল।

সন্ধ্যার পর কাশীনাথ, অরুণ এবং তপনকে লইয়া উদয় নানা বিষয়ের পরামর্শ করিল।—দেশে দুই পাচ শত বিঘা ধান-জমি কিনিবার আবশ্যক, কিছু টাকা এখানে লগ্নীতে খাটাইলে ভাল হয়, আগামী বারে দুর্গোৎসব করিতে হইবে, তপনের বিবাহের আগে বাড়ীখানা ভাল করিয়া মেরামতের আবশ্যক। এই সমস্ত শলা-পরামর্শ এবং ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়া, সোমবার প্রাতের ট্রেণে উদয় আবার কলিকাতা রওনা হইয়া গেল।

বাইশ

টালীগঞ্জের যে স্থানটায় পূর্ব্বমুখী আনোয়ার সা রোড নামক রাস্তাটি বাঁকিয়া দক্ষিণমুখে গিয়াছে, সেইখানে এক নূতন বস্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। বস্তিটার নাম—চারা বাগান।

চারা-বাগানের এক প্রান্তে দুইটি কামরাবিশিষ্ট ছোট একখানা একতালা বাড়ী। বাড়ীখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দুইখানা ঘরের একখানিকে শয়ন-ঘর ও অপর খানিকে ভাঁড়ার করা হইয়াছে। শয়ন-ঘরখানি বেশ সাজানো। একধারে খাটের উপর পরিষ্কার ধব্-ধবে বিছানা। এক পার্শ্বে দুইখানা চেয়ার। আর এক পার্শ্বে বড় আয়না বসানো আলমারী, ছোট একটা গ্লাস-কেস্, একটা বক্স-হার্ম্মোনিয়ম, দুই কোণে দুইটি টিপয়, কাপড় রাখিবার আলনা, সিলাযের কল প্রভৃতি। দেওয়ালের গায়ে অনেকগুলি ফ্রেমে-আঁটা ছবি। তাহার অধিকাংশেই রাধাকৃষ্ণ নামের আবরণ দিয়া উলঙ্গ-প্রায় মডার্ণ নাগর-নাগরীর কেলেঙ্কারীর দৃশ্যই অঙ্কিত। আজ মাস পাঁচ-ছয় হইল, নির্জ্জন পল্লীমধ্যস্থ এই বাড়ীখানা ভাড়া লইয়া নিকুঞ্জ ও চপলা বাস করিতেছে।

বেলা তখন প্রায় এক প্রহর। শীতের নিস্তেজ রৌদ্র ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ এবং অপরিসর রোয়াকের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নিকুঞ্জ চেয়ারে বসিয়া সিগারেট টানিতেছিল। তাহারই সম্মুখে একটু দূরে মেজের উপর বসিয়া—চপলা। চপলার সে রূপের জ্যোতি এই কয়মাসের মধ্যেই ম্লান হইয়া গিয়াছে। তাহার মনের মধ্যেও যেন পূর্ব্বের সে স্ফূর্ত্তি, সে উৎসাহ, সে আনন্দ আর নাই। হয় তাহার দেহের মধ্যে কোন ব্যাধি আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে, নয় ত তাহার মনের মধ্যে কোন ব্যথার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সতেজ, সুদর্শন, পুষ্পিতা লতা, মূলদেশে বিষাক্ত কীটদষ্ট হইলে যেমন সহসা দিনের পর দিন শ্রীহীন হইয়া তাহার পত্র, পল্লব, পুষ্পাদি সহ শুকাইয়া যাইতে থাকে, চপলারও যেন সেইরূপ অবস্থা। সে যেন সহসা কীটদষ্ট হইয়াছে। তাহার গলার স্বরটারও যেন আর সে পূর্ব্ব মাধুর্য্য নাই।

নিকুঞ্জর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া একটু বিরক্তির সহিত চপলা কহিল, আজ দু'মাস

ধ'রে বলছি, কিন্তু জিনিসগুলো ফিরিয়ে আনবার আর তোমার সময় হয় না। আজকে জিনিসগুলো তোমাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। নিকুঞ্জ যেন উদাসীন ভাবে কহিল, তা আজই আনা যাবে।

চপলা পূর্ব্ববৎ বিরক্তির সহিত কহিল, আনা যাবে নয়, আজ আনতেই হবে; না আনলে কিছুতেই চলবে না।

কিছুক্ষণ ধরিয়া কেহই আর কোন কথা কহিল না। তার পর আলনা হইতে আলোয়ানখানা লইয়া নিকুঞ্জ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

চপলা যখন নিকুঞ্জর সহিত চলিয়া আসে, তখন তাহার গায়ে হাজার দুই-আড়াই টাকার গহনা ছিল, তন্মধ্যে ভরি আঠারো ওজনের একছড়া যে বিছা ছিল, সেইটি সে সময় বিক্রয় করিয়া তাহারা শ'পাঁচেক টাকা পায়। সেই টাকাতে তাহাদের নূতন সংসার পাতা হইয়া, এই পাঁচ ছয় মাস কাল তাহাদের খরচ-পত্র চলিয়া আসিতেছে। আশ্বিন মাসে পূজার আগে নিকুঞ্জ একদিন চপলাকে বলে যে, এই জায়গাটা বড় নিরিবিলি, চোরের একটু ভয় আছে এবং সে ভয়টা অন্য সময়ের চেয়ে এই পূজার সময়টাতেই বেশী। সুতরাং চপলার গায়ের গহনাগুলি ঘরে না রাখিয়া কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিলে ভাল হয়। মাস দুই পরে আবার ফিরাইয়া আনিলেই চলিবে। গচ্ছিত রাখিবার জন্য ব্যাঙ্ককে মাসিক যৎসামান্য কিছু দিতে হয় মাত্র। চপলা দেখিল, যুক্তিটা মন্দ নয়। তাই সেই আশ্বিন মাসে তাহার গহনাগুলি নিকুঞ্জ কোন এক ব্যাঙ্কে রাখিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর অগ্রহায়ণ হইতে চপলা নিকুঞ্জকে অনবরত সেইগুলি ফিরাইয়া আনিতে বলিতেছে, কিন্তু গত দুই মাসের মধ্যে নিকুঞ্জ সেগুলি ফিরাইয়া আনিবার অবসর পায় নাই। তাই আজ যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়াই চপলা তাহার গহনাগুলি ফিরাইয়া আনিবার জন্য নিকুঞ্জকে ঐরূপ কড়া তাগাদা করিল।

বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে নিকুঞ্জ যখন ফিরিয়া আসিল, চপলা জিজ্ঞাসা করিল, এনেছ?

না।

কেন?

আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ।

আজ ত কোন কিছু নেই, যে ব্যাঙ্ক বন্ধ।

একটু উগ্রভাবেই নিকুঞ্জ কহিল, সব খবর কি তুমি রাখ? আজ 'অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক য়্যাসোসিয়েসনে'র প্রেসিডেণ্ট মারা গেছেন ব'লে সব ব্যাঙ্ক বন্ধ।

বেশ। কাল ত আর বন্ধ থাকবে না, কাল আনতেই চাও।

নিকুঞ্জ আর কোন কথা বলিল না। গায়ের আলোয়ানখানা খাটের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া, একটা সিগারেট ধরাইয়া বসিল এবং মাথাটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়া লম্বা চুলগুলাকে ঘাড়ের দিকে সরাইয়া দিল।

পরদিন সকালে চা খাইয়া নিকুঞ্জর বাহির হইবার সময় চপলা কহিল, আজ আনতেই চাও। বুঝলে?

নিকুঞ্জ যাইতে যাইতে ফিরিয়া কহিল, বলছি ত আজ আনবোই। তার পর সে চলিয়া গেলে, চপলা কিছুক্ষণ ঘরের মেজেয় পা ছড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল এবং স্নান করিল। তাহার পর উনানে আগুন দিয়া রান্না-বান্না সারিয়া লইল।

কয়দিন হইতেই তাহার মনটা ভাল নাই। কোথায় যেন একটা ব্যথা আসিয়া জমিতে সুরু করিয়াছে। নিকুঞ্জর ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষায় সে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। অন্যদিন বেলা একটার মধ্যেই নিকুঞ্জ ফিরিয়া আসে। কিন্তু আজ দুইটা বাজিতে যায়, তবুও নিকুঞ্জ ফিরিল না। চপলা বুঝিল, আজ নিকুঞ্জ গহনাগুলি লইয়াই ফিরিবে। সে তখন নিকুঞ্জর ভাত বাড়িয়া, ঢাকা দিয়া রাখিয়া নিজে খাইয়া লইল। ক্রমে মধ্যাহ্ন গড়াইয়া অপরাহ্ণের পর সায়াহ্ন আসিল, কিন্তু তখনও নিকুঞ্জ ফিরিল না। গভীর রাত পর্য্যন্ত চপলা বিনিদ্র নয়নে জাগিয়া রহিল, কিন্তু নিকুঞ্জ আসিল না।

এক-একদিন নিকুঞ্জ এইরূপে আসে না বটে, কিন্তু সে-দিন সে তাহার না-আসার কথা বলিয়া যায়। চপলা বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিল। শেষে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিনও নিকুঞ্জ ফিরিল না, তাহার পরদিনও না। তাহার পরদিনও না। ক্রমে সাত দিন কাটিয়া গেল, নিকুঞ্জর আর দেখা নাই। চপলা তখন মহা চিন্তিত হইয়া পড়িল। কিছুদিন হইতে যে ব্যথা তাহার অন্তরে জমিতে সুরু করিয়াছিল,

এক্ষণে তাহা বিরাট হইয়া তাহার অন্তরদেশ ছাইয়া ফেলিল। এই কয়দিন সে চুপ করিয়া বসিয়াও ছিল না। নিকুঞ্জর ফিল্ম কোম্পানীতে সে দুই দিন গিয়া খবর লইয়া আসিয়াছে, বিশেষ কোন সন্ধান সেখানে পায় নাই। তাহারা সঠিক কিছুই বলে না। লোক পাঠাইয়া বরাহনগরে সংবাদ লইয়াছে, সেখানেও নিকুঞ্জ নাই। আরও কয়েকস্থানে, যেখানে নিকুঞ্জর যাতায়াত ছিল, সে কয়েকবার করিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন স্থানেই সে নিকুঞ্জর কোন সংবাদ জানিতে পারে নাই। চতুর্দ্দিকে এইরূপ অনুসন্ধানের ফলেও যখন নিকুঞ্জর কোন সন্ধান বা সংবাদ মিলিল না, তখন চপলা মহা চিন্তিত হইয়া পড়িল। প্রিয়তমের প্রতি তাহার বুক-ভরা ভালবাসাজনিত চিন্তা, তখন বুক হইতে নিম্নগামী হইয়া উদরে আসিয়া জমিল। অর্থাৎ প্রেমের অপেক্ষা পেটের চিন্তাতেই চপলা অধিকতর অধীর হইয়া উঠিল। তাহার হাতে যে একটি কপর্দ্দকও আর নাই। যে কয়েকটা টাকা তাহার হাতে ছিল, তাহা এই কয়দিনেই ব্যয় হইয়া গিয়াছে। গহনাগুলি সবই নিকুঞ্জ কোথায় কোন্ ব্যাঙ্কে রাখিয়াছে, কিম্বা ব্যাঙ্কের নাম করিয়া সে কি করিয়াছে, তাহার কোন সন্ধানই সে জানে না। দশ গাছা হাল্কা ওজনের ভাটিয়া চুড়ী মাত্র তাহার হাতে আছে; তাহাই মাত্র তাহার সম্বল। ইহা ছাড়া এক কুঁচা সোনা কিংবা একটি পয়সাও তাহার আর পুঁজি নাই। সে তখন ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া অন্ধকার দেখিতে লাগিল। যদি নিকুঞ্জ আর না-ই ফেরে! গহনাগুলি আর যদি না-ই পাওয়া যায়! তাহার বুক-ভরা প্রেমকে তুচ্ছ করিয়া নিকুঞ্জ কি সামান্য গহনা ক'খানার লোভে তাহা লইয়া কোথাও অন্তর্দ্ধান হইল?

চপলা উপায়ান্তর না দেখিয়া টালীগঞ্জের এক পোদ্দারের দোকানে গিয়া তাহার হাতের চুড়ী কয়গাছা বিক্রয় করিয়া দিল। তাহাতে সে প্রায় আড়াই শত টাকা পাইল। ইহারই উপর নির্ভর করিয়া সে দিন চালাইতে লাগিল।

এইভাবে আরও কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে, তাহার মাথায় হঠাৎ এক নূতন মতলব আসিল। সে দৈনিক দু'একখানি সংবাদপত্রে নিম্নরূপ বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিল :—

'নিকু, তোমার জন্য শয্যা লইয়াছি। যাহা আনিবার জন্য তোমায় বলিয়াছিলাম, যাহা আনিতে গিয়া তুমি আর আস নাই, তাহা আমার চাই না। শুধু তুমি ফিরে এস—শুধু তুমি ফিরে এস! ইতি—

—চারাবাগান।'

বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর, একটি একটি করিয়া তিরিশটি দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু কোন দিক্ হইতে নিকুঞ্জর কোন সাড়া-সংবাদ পাওয়া গেল না।

সাড়া না আসুক, কিন্তু—কিন্তু—চুড়ী বিক্রয়ের টাকায় চপলার ত চিরকাল চলিবে না। গৃহে থাকা কালে যে চিন্তা স্বপ্নেও কোন দিন তাহার মনে উদিত হয় নাই, সেই পেটের চিন্তাই এক্ষণে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। অথচ অস্থির হইবার কথা নহে, যেহেতু তাহার রূপও আছে, তাহার যৌবনও আছে। কিন্তু কোনদিনই সে নিজেকে সেই শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে পারে নাই, যে শ্রেণীতে ঐ দু'টি দ্রব্যের খোলা ব্যবসায় চলে। তবে গৃহত্যাগ করা সম্বন্ধে সে নিজের মনের কাছে যে কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করে, তাহার মধ্যে কোন সত্য নাই, সহানুভূতি নাই, সান্ত্বনাও নাই।

যাহা হউক, দুঃখে, দুশ্চিন্তায়, উদ্বেগে চপলার দিন কাটিতে লাগিল। তাহার চুড়ী-বেচা টাকা ক্রমেই ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। আর ত সোনার জিনিস কিছু নাই যে, বিক্রয় করিবে। সে চিন্তার অকূল পাথারে পড়িল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বিপদের এই পাথারে কোন দিকেই তাহার কোন অবলম্বন নাই; অবলম্বনের কোন আশামাত্রও নাই। চারিপার্শ্বের ঘন অন্ধকারের মধ্যে একটি ক্ষীণালোকরেখা দেখিতে পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। তাহার পিতৃ-গৃহের কথা, পিতামাতার কথা, হেনার কথা, বরানগরের কথা, উদয়ের কথা—একে একে সকলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। তাহার ফলে তাহার দুঃখ, তাহার কষ্ট, তাহার অশান্তি, তাহার জ্বালা, আজ কূল ছাপাইয়া উঠিতে লাগিল।

পল্লীর একটি প্রান্তে তাহার বাসা। আশে পাশে আর কাহারও বাড়ী ছিল না। একটু দূরে দু'এক ঘর গৃহস্থের বাস থাকিলেও, এ পর্য্যন্ত কাহারও সহিত তাহার আলাপ-পরিচয়ও হয় নাই। চপলা ইচ্ছা করিয়াই কাহারও সহিত আলাপ করে নাই। শুধু তাহার বাসার পিছন দিক্‌কার গোলপাতার ঘরখানার মধ্যে কালীর মা নামে যে নিম্নশ্রেণীর একটী স্ত্রীলোক বাস করিত, কেবল তাহার সহিতই

চপলার ভাব-সাব হইয়াছিল। কালীর মা চপলাকে দুধের 'রোজ' দিত। তাহার একটি গাই ছিল। কালীর বাপ ছিল না। কিন্তু কালীর মা'র ঘরের দাওয়ায় বসিয়া যে লোকটি ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া তামাক খাইত, আর কাসিত এবং কালীর মা যাহাকে 'উনি' বলিয়া সকলের কাছে পরিচয় দিত, সকলে জানিত, 'তিনি'ই কালীর বাবা।

সেদিন দুপুর বেলা চপলা কালীর মাকে ডাকিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছিল। চপলা কহিল, দেরাজটা তুমি যে বলেছিলে নেবে, তা নেবে কি, কালীর মা? কালীর মা কহিল, দেরাজটা নিতে ত আমার ইচ্ছে, কিন্তু দিদিমণি, উঁনি বলছিলো যে কুড়ি টাকায় যদি হয়, তা হ'লে না হয়—, আজকাল কাঠ-কাঠরার জিনিষের ত দাম নেই। তাই বলছি, দিদিমণি যে——

দেরাজটা পঁয়ষট্টি টাকায় চপলা কিনিয়াছিল। চপলা কহিল, শোন কালীর মা, একটা কথা বলি। আমার ঘরে আর যে সব জিনিষ আছে, সে সবও আমি বিক্রী ক'রে ফেলবো। কালীর বাবা যদি সব জিনিষের খদ্দের করে দিতে পারে, তা'হলে আমি ঐ কুড়ি টাকাতেই দেরাজটা তোমাদের দেব। বুঝলে? কালীর মা কহিল, বেচবে সব কেন, দিদিমণি? রেখে দাও। যাওয়াটা সোজা— হওয়াটা শক্ত।

কালীর মা চপলার হাল সবই জানিত। সে চপলাকে অনেক বুঝাইল, অনেক স্তোক-বাক্য দান করিল, অনেক উপদেশ দিল। শেষকালে বলিল, একটা পেটের জন্যে সোমত্ত মেয়ে মানুষের আবার ভাবনা দিদিমণি, বিশেষ তোমার মত মেয়ে লোকের? তুমি কিচ্ছুটি ভেবো না। মনের ফূর্তিতে খাও, দাও, থাকো।

পরের দিন কালীর মা দেরাজটা নিজের ঘরে লইয়া তুলিল। দুধের পাওনা দাম বাদ দিয়া ৮৷৵১৫ চপলাকে দিয়া দিল এবং কালীর বাবা যে তাহার যাবতীয় দ্রব্যাদির খরিদ্দার যোগাড় করিয়া দিবে, সে আশ্বাস-বাণীও দান করিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেরাজটা যত শীঘ্র চপলার ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল, অন্যান্য দ্রব্যগুলি বাহির হইতে তত বিলম্ব হইতে লাগিল। চপলা অবশেষে এ বিষয়ে নিরাশ হইয়া ভাবিল, খাটখানা আর দু'একটা জিনিষ, ও বিক্রী ক'রে আর কত টাকাই বা হবে। আর সে টাকাতে কতদিনই বা চল্‌বে?

অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চপলা অনেক কিছুই ভাবিল। তাহার পর উঠিয়া পড়িয়া, দেরাজের মধ্যে যে-সব জিনিস ছিল, সেই গুলি গুছাইতে বসিল। দেরাজটি বিক্রয় করিয়া দেওয়াতে, এখন সেগুলিকে ত অন্যত্র গুছাইয়া রাখিতে হইবে।

এই সকল জিনিষের মধ্যে তাহার গানের খাতাখানা ছিল। খাতাখানা সে আগে রোজই খুলিত ও তাহা দেখিয়া তাহার প্রিয় গানগুলি সে প্রত্যহই গাহিত। কিন্তু নিকুঞ্জ চলিয়া যাইবার পর হইতে সে একদিনের জন্যও আর খাতাখানা খোলে নাই। আজ খাতাখানা হাতে লইয়া খুলিতেই তাহার মধ্য হইতে একখানা চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল :—

'চপলা, মহাভুল করে ফেলেছিলুম। তা'তে পাপও কিছু হোয়েচে। পাপের ভোগ অবশ্য ভুগতেই হবে, তার আর কোন সন্দেহ নেই। তবে, আমার পক্ষে একটু সান্ত্বনা এই, যে, তোমার তুলনায় আমার পাপের মাত্রাটা কম। যাই হো'ক, পাপ আর ভারী করে তুলতে ভয় হোচ্চে। প্রথমে, তোমার কথায় ভুলে মনে করেছিলুম, সত্যিই বুঝি আমরাই আসল স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু পরে বুঝলুম, ওটা আমাদের কবিত্বময় স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী রেখে বিয়ে— আমাদের এ হিন্দুর সমাজে চলবে না। আমাদের দেশে বিয়ের দুটো মন্ত্রের আর অনুষ্ঠানের যা জোর, তা হাজারটা চন্দ্র সূর্য্যের সাক্ষাতে নেই। সুতরাং বিদায় নিচ্ছি। তোমার গহনাগুলো দিতে পারলুম না, ক্ষমা কোরো। যাচ্চি চিরদিনের মত দূর বিদেশে। সেখানে কিছু সঙ্গতি ত চাই। সুতরাং ক্ষমা চাইচি।

—নিকু।'

চিঠিখানা চপলা দুই তিনবার পড়িল। তাহার পর শয্যায় আসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

সে ভাবিতে লাগিল যে, নিজের কি সর্ব্বনাশই সে করিয়াছে! আজ এই অবস্থায় সেই কথাটাই তাহার বার-বার মনে পড়িতে লাগিল আর চোখের জলে বিছানা ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

তেইশ

শেষ মাঘের এক অপরাহ্নে কাশীর নারদ-ঘাটে বসিয়া দুইটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক পরস্পর আলাপ করিতেছিলেন। একজন সবিনয়ে অপর জনকে বলিলেন, তা'হলে নীলকমল বাবু, সর্ব্ব বিষয়েই জ্ঞানচর্চ্চা করতে আপনি কিছু আর বাকী রাখেন নি বলুন?

নীলকমল কহিলেন, বি-এ-টা যখন পাশ করলুম, পরীক্ষার ফল দেখে প্রফেসারদের চোখ কপালে উঠলো। অত বড় প্রেসিডেন্সি কলেজ—তা আমার ওপর আর কা'কেও উঠতে হয় নি। তারপর মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হলুম। বছর তিন পড়বার পর দেখলুম, ও চিকিৎসায় বাহ্যাড়ম্বরটা যত বেশী, কাজে ততটা নয়। সুতরাং দিলুম ছেড়ে।

বলেন কি! তারপর?

তার পর, দিন কতক হোমিওপ্যাথীটা ভাল ক'রে পড়লুম। দেখলুম—হ্যাঁ, একটা জিনিস বটে। কত লোকের কত কঠিন কঠিন ব্যাধি যে সেই সময় আমি হোমিওপ্যাথীতে সারিয়েছিলুম, তার আর সংখ্যা নেই।

আচ্ছা দেখুন, আমার একটি নাতির আজ ক'য়েক দিন ধরে একেবারে—সে আর আপনাকে কি বলব—ঠিক জলের মত—

বাহ্যে হচ্ছে ত? দেব এমন ওষুধ বলে, একটি ফোঁটাতেই সেরে যাবে এখন। আয়ুর্ব্বেদের চরক সুশ্রুতও কিছু কিছু' আমি পড়েছিলুম।

তা হ'লে আর আপনার কিছুই বাকী নেই বলুন? আচ্ছা, চোখটা' আপনার নষ্ট হ'ল কি ক'রে দাদা?

দাদা কহিলেন, বছর দশেক আগে একটু-আধটু যোগ করার অভ্যাস ছিল। একদিন সূর্য্যের দিকে চেয়ে 'তপনাহুতি' দিচ্ছিলুম, এমন সময় একটা চিল এসে—

বাধা দিয়া অপর ভদ্রলোকটি কহিল, আচ্ছা, ও জিনিষটা কি বলুন ত?

ওটাকে মোটা-মুটি জ্যোতি-যোগ বলে আর কি। অর্থাৎ 'সান্'-এর 'আল্ট্রা ভাওলেট রে'-টাকে চোখের তারার মধ্যে দিয়ে টেনে নেওয়া আর কি। তা, একদিন আমি ঐ রকম টেনে নিচ্ছি, এমন সময়—

দুইটি আগন্তুক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। একজন পুরা জোয়ান, হিন্দুস্থানী; অপর জন আধা-জোয়ান, বাঙ্গালী বাবু। উভয়েরই পরণে ধুতি এবং পাঞ্জাবী; তবে একজনের মোটা মার্কিনের, অপর জনের মিহি ফ্ল্যানেলের। নীলকমল বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বাঙ্গালী বাবুটি কহিলেন, আপনি নীলকমল বাবু না? মোলায়েম একটু হাসি হাসিতে হাসিতে নীলকমল কহিলেন, তাই বলেই ত সকলে ডেকে থাকে চিরকাল। মশায়, কি চান?

চাই আপনাকেই। দয়া ক'রে চলুন; প্রভু রামচন্দ্রের পূজায় আপনার দরকার পড়েছে যে। তার পর হিন্দুস্থানীটির দিকে চাহিয়া কহিলেন, পাকড়াও।

নীলকমলের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল। তবু জোর করিয়া শুষ্ক মুখে সাহস আনিয়া লোকটির দিকে কট্ মট্ করিয়া চাহিয়া কহিলেন, আপনি কে শুনি? শুধু শুধু একজন ভদ্দর লোককে এই রকম—! তাঁহার মুখের কথা আর শেষ হইবার অবসর পাইল না; আগন্তুক তাহার সঙ্গীটিকে একটা ইঙ্গিত করিলেন, অমনি সে নীলকমলকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

যাহার নাতির অসুখ করিয়াছিল এবং কলের জলের মত—ইত্যাদি হইতেছিল, সেই ভদ্রলোক ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া, কাঠের পুতুলের মত সেইখানে বসিয়া রহিল এবং ভাবিতে লাগিল—লোকটা কে?

লোকটা নগেন বাবু। নগেন কাশীতে আসিয়া কমল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাও শ্বেত কিম্বা রক্তকমল নয়—একেবারে নীলকমল;—দুর্লভ বস্তু। তাঁহাকে সন্ধান করিতে অনেককেই হিম-সিম খাইতে হইয়াছিল।

কয়েক মাস পূর্ব্বে নগেন বাবু কিছু দিনের জন্য যে সময় অস্থায়ী ভাবে এক মাড়োয়ারী ফারমে কাজ করিয়াছিলেন, সেই সময় ফারমের স্বত্বাধিকারী লালজী প্রেমজীর নাম জাল করিয়া তাঁহার নিজের নাম বরাবর একখানা পাঁচ হাজার টাকার চেক বাহির করেন। চেকখানা তিনি 'এনডর্স' করিয়া দেন সুরেন সরকার নামে তাঁহার এক বিশেষ বন্ধুর নামে। সুরেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয় যে, তাহাকে এক হাজার টাকা দেওয়া হইবে। সুরেন ব্যাঙ্কে চেকখানা ভাঙ্গাইতে গেলে, সহি সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের এক কর্ম্মচারীর একটু সন্দেহ হয়। তখন টাকা দেওয়া বন্ধ রাখিয়া তাঁহারা লালজী প্রেমজীকে তাঁহার অফিসে

'ফোন' করেন। তিনি উত্তরে সুরেনকে আটক রাখিতে বলেন। অতঃপর সুরেন সরকারকে পুলিসের হাতে দেওয়া হয়। যে দিন হাজরা পার্কে, উদয়ের ধাক্কায় বেঞ্চের খোঁচা লাগিয়া নগেন বাবু চক্ষে আঘাত পান, তাহারই কয়েক দিন পরে এই ব্যাপার ঘটে এবং ব্যাপারটি কাণে আসা মাত্রই নগেন বাবু সপরিবারে কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়েন এবং বরাবর কাশী আসিয়া নীলকমল হইয়া বসেন। তাঁহার কাশী যাওয়ার কথা কেহই অবগত ছিল না। কিন্তু কোন সূত্রে উদয় তাহা জানিতে পারে এবং বকুলবাটীতে অরুণকে পত্র দ্বারা জানায়।

পুলিসের হেফাজতে দুই দিন থাকিয়া, সুরেন সরকার সব কথাই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। তখন হইতেই কলিকাতার পুলিস নগেন বাবুর সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। এতদিনে তাহারা মূল আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইল এবং তাঁহাকে কলিকাতায় চালান দিল।

যথাদিনে এই মোকর্দ্দমার বিচার হইল। বিচারে নগেন বাবুর প্রতি পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাবাসের হুকুম হইল। সুরেন সরকারের কিছুই হইল না, সে অব্যাহতি পাইল।

উদয় যখন সংবাদটা জানিতে পারিল, তখন সে মনে মনে চমকাইয়া উঠিল। আজই প্রভাতে দৈনিক কাগজের স্তম্ভে সে সংবাদটি পড়িয়াছে। ইহাতে তাহার মনে দুঃখও হইল না, আনন্দও হইল না। উদয় চায়, ইহাদের কথা মোটেই আর তাহার কাণে না পৌঁছায়। ইহারা বাঁচে, মরে, ইহারা সুখেই থাকে, দুঃখেই থাকে ; ইহাদের বিপদ হউক, সম্পদ হউক ; কিছুই সে জানিতে চাহে না। তাহার জীবনের অধ্যায়গুলি হইতে ইহাদের লইয়া বিগত পাঁচ বৎসরের যে অধ্যায়টি—সেইটি সে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চায়। চা খাইবার পর সে এই সব কথাই চিন্তা করিতে করিতে বারন্দার আরাম-কেদারায় বসিয়া গড়্‌গড়ায় তামাক খাইতেছিল। যে কথাটাকে এই কয়মাস ধরিয়া সে ভুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, কোন-না-কোন সূত্রে তাহাই তাহার বিদ্রোহী মনের মাঝে আসিয়া কেবলই তাহাকে নাড়া দিয়া যাইতেছে।

তামাক খাইতে খাইতে সে মনটাকে অন্য কোন-কিছুর দিকে ফিরাইবার ইচ্ছায়, মনের মধ্যে নানারূপ গবেষণা সুরু করিয়া দিল।—নবাবী আমলে দেশে সুখশান্তি ছিল, না—এই ইংরাজ আমলে? প্রতাপাদিত্যের সময় বাঙ্গালীর অবস্থাটা কি রকম ছিল? য়ুরোপ এখন উন্নতির পথে বটে, কিন্তু চরম স্থানটায় পৌঁছুতে এখনো তার বহু বিলম্ব। শীতকালে রোজ লাউ খাওয়া চলবে না, সর্দ্দি হ'য়ে পড়বে ; বামুন ঠাকুরকে বারণ ক'রে দিতে হবে। ওঃ! চিলগুলোর কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি!

কিন্তু তাহার বিগত নিরানন্দের আঁধার অধ্যায়টিই এই সমস্ত গবেষণার চিন্তাকে ঠেলা দিয়া অনবরত সামনে আসিতে লাগিল। উদয় উঠিয়া পড়িল। মনে মনে ঠিক করিল, আজ আর আফিসে যাইবে না। আজ যেন তাহার শরীর মোটেই ভাল নাই, ঘরের মধ্যে গিয়া সে শয্যায় শুইয়া পড়িল। মাথার বালিশের পাশে কি-একখানা মাসিক পত্র ছিল, শুইয়া শুইয়া সে তাহারই পাতা উল্টাইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, এবার কাশী ঠাকুর্দ্দা তাঁহার লেখা যে 'দেবী ও দানবী' উপন্যাসখানা দিয়াছিলেন, সেখানা ত পড়া হয় নাই। উদয় আলমারী হইতে বইখানা বাহির করিয়া পড়িতে সুরু করিল।

বেলা যখন বারটা, তখন বইখানি তাহার শেষ হইল। কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটিল। যাহার পাপ-কথাটা মন হইতে তাড়াইবার জন্য এত সব প্রয়াস, বইখানা পাঠ করিয়া তাহারই কথা, কোনও পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায়, নবভাবে নবরূপে তাহার অন্তর ভরিয়া ফুটিয়া উঠিল। বইখানির শেষের দিকে যে দানবীর চিত্র আঁকা হইয়াছে, চপলার সহিত সেই চিত্রের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। কল্পনা ও সত্য যেন এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।

বেলা প্রায় আড়াই প্রহর। স্নানাহার শেষ করিয়া উদয় জামা-কাপড় পরিতে লাগিল। বামুন ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, আমি দেশে যাচ্ছি, পরশু সকালে আসব—খাবার দাবার ক'রে রাখবে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই উদয় বকুলবাটী আসিয়া পৌঁছিল। কাশীনাথ সংবাদ পাইয়া তাহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। উদয় তাঁহাকে কহিল, আপনার 'দেবী ও দানবী' বইখানা আজই সকালে প'ড়ে শেষ করলুম, ঠাকুর্দ্দা। দেখুন, মেয়ে জাতটার ওপর আমার আগে খুব শ্রদ্ধাই ছিল, কিন্তু সেটা উল্টে গেছে। এখন আমার মনে হয়,

সংসারে যত কিছু অন্যায়, যত কিছু পাপ, যত কিছু দুঃখ অশান্তি—সবেরই মূল স্ত্রীলোক। বাধা দিয়া কাশীনাথ কহিলেন, ভয়ানক ভুল ধারণা, উদয়। কোথাও একটা মন্দ মেয়েকে বিচার ক'রে, তার দোষটা সমস্ত মেয়ে জাতের ওপর চাপিও না। জগতে দেবী দানবী দুই-ই আছে। আমাদের হিন্দুর ঘরে দেবীই বেশীর ভাগ; ক্কচিৎ দানবীর দেখা পাওয়া যায়।

উদয় কহিল, আপনার বইখানার আর সবই আমার খুব ভাল লেগেছে, খালি চারুবালার যে ছবি এঁকেছেন, ওইটে—

তোমার ভাল লাগে নি; এই ত? অনেকেরই লাগবে না বটে, তা জানি; কিন্তু—

বাধা দিয়া উদয় কহিল, আমার বলবার উদ্দেশ্য, ও চরিত্রের স্ত্রীলোক আমাদের ঘরে নিশ্চয়ই আছে। তবে যে বই আমাদের ঘরের মেয়েদের হাতে যাবে, আর তারা পড়বে, তাতে ঐ রকম একটা হীন চরিত্র এঁকে দেখানো কি ঠিক?

ঠিক মনে করেই ত আমি লিখিছি, উদয়। অবশ্য তোমার কথা আমি বলছি না, বাইরেকার কে কি বলবে, সে অপেক্ষায় কাণ খাড়া ক'রে থাকার বয়স আর অবস্থা আমি কাটিয়েছি। সবই যে সাজিয়ে-গুছিয়ে, দেব-মন্দিরের মত শুদ্ধ-সুন্দর ক'রে দেখাতে হবে, সেটা আমি মনে করি না। অ-সুন্দরটাও ত জগতে আছে।

আছে ত নিশ্চয়ই। তবে কেউ যদি বলে যে, আছে ব'লেই কি সেটা দেখাতে হবে?

হবে বৈ কি। চারুবালার ব্যাপারটা পর্য্যন্ত দেখান চলবে। তার বেশী আর চলবে না। চলা উচিত নয়।

তা, চারুবালার পরিণতি দেখে, সকলের যে মন্দের প্রতি একটা ঘৃণা জন্মাবে আর সঙ্গে সঙ্গে সকলে সাবধান হবে, সেটা খুবই আশা করা যায়।

সেই মঙ্গলটুকুর জন্যেই ত ঐ ছবিটুকু আঁকতে হয়েচে, ভাই। দেহের সুস্থতা বজায় রাখবার জন্যে একটু-আধটু তিক্ত-কষায়ও খেতে হয়।—যা'ক, সাহিত্য আলোচনা ত খুবই হ'ল, এখন তুমি আছ কেমন বল।

ভাল আছি, ঠাকুর্দ্দা।

বিজ্‌নেস্‌?

ভালই চলছে। অনেক সব নতুন নতুন কাজে হাত দিয়েছি।

ভগবান দিন দিন তোমাদের উন্নতি করুন। তোমার শ্বশুরের খবর কি? আহা, বৃদ্ধবয়সে ভদ্রলোকের চোখটি গেল, মেয়েটি মারা—

আপনি চা খাবেন কি, ঠাকুর্দ্দা?

আপত্তি নেই। পেলেই খাই।

এই সময় বাহির হইতে বেড়াইয়া অরুণ ও তপন গৃহে ফিরিয়া আসিল। তখন চারি জনে বসিয়া নানারূপ গল্প-গাছা করিতে লাগিল।

চব্বিশ

টালীগঞ্জের সেই বাসা চপলাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। কোথা হইতে সে ভাড়া যোগাইবে? কালীর বাবাকে দিয়া সে ঘরের জিনিস-পত্র সব বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, যদিও তাহার বদলে সে যাহা পাইয়াছে, তাহা যৎসামান্য। কিন্তু কি করিবে—উপায় নাই। জিনিসগুলার জন্যই তাহার ভাল ঘরের দরকার হইত। জিনিসগুলি না থাকিলে তাহার যেমন-তেমন একটু মাথা গুঁজিবার স্থান হইলেই চলে। তাই নিত্য কালীর মাকে খোসামোদ করিয়া, সে অল্পদিন হইল এক রকম মাটীর দামেই খাট, গদি, টিপয়, হার্ম্মোনিয়ম, ছবি, আলনা প্রভৃতি যাবতীয় জিনিস বিক্রয় করিয়া দিয়াছে এবং সাবেক বাসা তুলিয়া দিয়া, কালীর মা'রই একখানি ঘরে আশ্রয় লইয়া আছে। এখানি কালীর মা'র রান্না-ঘর ছিল। মাসিক দেড় টাকায় সে চপলাকে ইহা ভাড়া দিয়া, বাঁধিবার জন্য নিজে সে শয়ন-ঘরের দাওয়ার খানিকটা ঘিরিয়া লইয়াছে।

চপলা সেলাইয়ের কাজ ভাল জানিত। তাহার নিজের একটা কলও ছিল। সেটা সে বিক্রয় করে নাই। এখন সে ঘরে বসিয়া নানারূপ ফ্রক, সেমিজ, ব্লাউজ প্রভৃতি তৈয়ারী করে ও সেগুলি দোকানে দিয়া, তাহা হইতে তাহার প্রতি মাসে আট দশ টাকা হয়। বর্ত্তমানে ইহাই তাহার উপজীবিকা। এইরূপে অন্নচিন্তার হাত হইতে এখন সে নিষ্কৃতি পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মুখে পূর্ব্বকার সে প্রফুল্লতা আর নাই, দেহের সে কান্তি-সৌন্দর্য্যও আর নাই। মনে হয়, অন্নচিন্তার স্থলে কোন এক নূতন চিন্তা তাহার দেহমনকে আচ্ছন্ন করিয়া দিনে দিনে, তিলে তিলে, তাহাকে

দগ্ধ করিতেছে। এখনও পুরা এক বৎসর কাটে নাই, সে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এই অল্পদিনের মধ্যেই তাহার দেহ-মনের উপর দিয়া যেন একটা মারাত্মক ঝড় বহিয়া গিয়াছে, যাহাতে করিয়া তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্যের, সমস্ত মাধুর্য্যের শাখা-প্রশাখাগুলি ভাঙ্গিয়া, মচ্‌কাইয়া, মূল শিকড় পর্য্যন্ত একটা প্রবল ঝাঁকুনি পাইয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে যাহারা তাহাকে দেখিয়াছে, হয় তো এখন দেখিলে তাহারা তাহাকে হঠাৎ চিনিতে পারিবে না! সে বড় একটা আর কাহারও সহিত কথা কহে না। সকাল-সকাল দু'টি রাঁধিয়া খাইয়া লয়, তাহার পর সমস্ত দিনই সেলাইয়ের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে।

সেদিন দুপুর বেলা তাহার সেলাইয়ের কাজ ভাল লাগিল না। সমস্ত ফেলিয়া রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া অজস্রধারে কাঁদিতে লাগিল। সে কী কান্না! এত বড় জগতে তাহার কেহই নাই। অথচ সবই তাহার ছিল। অনেকেরই যাহা থাকে না, তাহা তাহার ছিল। আজ বরাহনগরের কথা, উদয়ের কথা, অরুণ-অশ্রুর কথা, তপনের কথা, ঝি-চাকরদের কথা, সেখানকার কুকুর-বেড়ালের কথা, সকলই বার বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। পুণ্য সংসার-তরুর সেই স্নিগ্ধ ছায়া, দেবতার মত স্বামী,—দেবর, পুণ্যময়ী পতিব্রতা জা—এ সমস্ত সে হেলায় হারাইয়াছে। ভাগীরথীতীরে পুষ্পিত, ছায়া-শীতল, পাখী-ডাকা রমণীয় কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া সে মোহের বশে এ কোন্ তৃণহীন, বারিহীন, জ্বালাময় মরীচিকা-নিকুঞ্জে আসিয়া পড়িল! একদিন সে অশ্রুকে ব্যঙ্গ করিয়া, নিজের সম্বন্ধে গর্ব্বভরে নিজের মনে বলিয়াছিল, 'কিসে পাপ, কিসে পুণ্য জানি না। আমার পথ পাপের পথ, আর মেজ-বউয়ের পথ যে পুণ্যের পথ, এ-জীবনে তার একটা—না হয় যাচাই হয়েই যাক। আমারি যদি পাপ সাব্যস্ত হয়, আর তার ভারে যদি অতলতলে হাবু-ডুবু খেয়ে মরি, তা হ'লে আমার প্রেতাত্মাকে দিয়ে তখন জগতের ঘরে ঘরে ব'লে বেড়াব—'ওগো, এতে পাপ! এতে পাপ! তোমাদের বন্দী স্বামিগত জীবনই পুণ্যময়, সুখময়, শান্তিময়। তোমাদের অন্ধ-ভালবাসার ভেতরই স্বর্গের সুষমা!'—আজ সেই সমস্ত কথাই তাহার বার বার মনে পড়িতে লাগিল। অত্যল্পদিনের মধ্যেই তাহার জীবনের কষ্টিপাথরে পাপ-পুণ্যের যে পরীক্ষা হইয়া গেল, তাহাতেই তাহার ভীষণ পরাজয় ঘটিয়া গেল। তাই আজ শয্যায় পড়িয়া ছট-ফট্ করিতে করিতে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, অশ্রুর উদ্দেশে সে বার বার বলিতে লাগিল, তোমাদের স্বামি-অন্ত প্রাণই পুণ্যময়, মধুময়; তোমরাই হিন্দুর ঘরের সাক্ষাৎ দেবী; তোমাদের স্বামিভক্তির মধ্যেই স্বর্গের সুষমা!—সেদিন সে যে-কথা বিদ্রূপের ভাণে নিজের মনে বলিয়াছিল, আজ তাহার ইচ্ছা হইল যে, জগতের নারীদের ঘরে ঘরে গিয়া, সেই মহাসত্য সে প্রচার করিয়া আসে।

চোখ মুছিয়া, খিল খুলিয়া যখন সে ঘরের বাহিরে আসিল, তখন অপরাহ্ণ। কালীর মা কহিল, দিদিমণির আজ অসুখ-টসুখ করেছে না কি গা? চোখ দুটো লাল হয়েছে, মুখখানা ভয়ানক যেন খারাপ দেখাচ্ছে। আজ আর সমস্তদিন কলের শব্দ-টব্দ কিছুই ত পাইনি তোমার। চপলা কহিল, শরীরটা আজ ভাল নেই কালীর মা। এত মাথা ধরেছিলো যে, সমস্ত দিন আর মাথা তুলতে পারি নি!

কালীর মা যেন মনে মনে একটু ভয় পাইয়া বলিল, গায়ে-টায়ে ব্যথা হয় নি ত? দেখো দিদিমণি, যে দিন-সময় পড়েছে, যেন নিজে মজে আমাদের মজিও না। জ্বর-টর হয় নি ত?

সেই সময়টা ওদিকে দু'চার ঘরে 'মা'র অনুগ্রহ' দেখা দিয়াছিল। কালীর মা'র ভয়ের কারণ তাহাই।

চপলা কহিল, না না, কালীর মা, সে সব ভয় নেই। আর তাই যদি হয়, ত তোমাদের আমি মজাব না। দিন থাকতে তোমার বাড়ী ছেড়ে নিজেই হাসপাতালে গিয়ে উঠবো। মরণ হ'লেই ত বাঁচি কালীর মা!

কিছু মনে কোরো না, দিদিমণি। দিন-সময়টা বড্ডই খারাপ পড়েছে কি না, তাই বলছি। তা' মাথা-ধরাটা ছেড়েছে?

ছেড়েছে। আচ্ছা, কালীর মা, সেই যারা রাঁধবার লোক খুঁজেছিল, তাদের সে লোক কি হয়ে গেছে?

কালীর মা কহিল, তুমি করবে, দিদিমণি? তা হ'লে কাল গিয়ে খবরটা আনবো এখন।

কয়েকদিন আগে কালীর মা চপলার একটা কাজের খবর আনিয়াছিল। রান্নার কাজ। কাজ খুব হাল্কা। দুইটি বুড়া বুড়ী, আর কেহ নাই।

লোক তাঁহারা খুবই ভাল। তাঁহাদেরই পরিবার-ভুক্ত হইয়া থাকিয়া দু'বেলা তাঁহাদের জন্য দু'টি রান্না করিয়া দেওয়া ;—এই কাজ। তাঁরা বারমাস এক স্থানে থাকেন না। কখনো কলিকাতায়, কখনো কাশীতে, কখনো বা পশ্চিমের অন্য কোন স্থানে—এইভাবে বেড়াইয়া বেড়ান। মাহিনা—খাওয়া-পরা বাদে মাসে পাঁচ টাকা।

চপলা মনে করিল, বর্ত্তমানে যে ভাবে সে জীবন যাপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা কোন ভাল লোকের আশ্রয়ে এই ভাবে থাকাটাই তাহার পক্ষে শ্রেয়। যে পাপ সে করিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দরকার! এই কাজটা সে যদি পায়, তাহা হইলে পেটের চিন্তা তাহাকে আর করিতে হইবে না, সে তখন ভগবানের কাছে তাহার কৃত অন্যায়ের জন্য নিত্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবার অবসর পাইবে। তাই, কালীর মা'র কথায় বলিল,—এনো ত কালীর মা' খবরটা। লোক যদি না হয়ে থাকে ত আমিই কাজটা করব।

পরদিন কালীর মা খবর আনিল যে, লোক এখনো হয় নাই। তখন তাহারই মধ্যস্থতায় চপলা কাজটি লইল এবং কালীর মা'র ঘর ছাড়িয়া দিয়া, নিজের যৎসামান্য কাপড়-চোপড় ও দ্রব্যাদি লইয়া সে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির গৃহে গিয়া আশ্রয় লইল। ভদ্রলোকটির নাম—জগদ্বন্ধু ঘোষ।

পঁচিশ

মধ্যাহ্নে ঘরের মধ্যে বসিয়া, মৃণাল পাড়ার দুইটি বালিকাকে লইয়া কাগজের জাহাজ, নৌকা, দোয়াত, ফুল প্রভৃতি তৈয়ার করিতেছিল। সুতরাং সমস্ত মেজেটায় গোটা ও কাটা কাগজের ছড়াছড়ি। পাঁচী একখানা দু'মুখো নৌকা তৈয়ার করিয়া, পরমোল্লাসে চেঁচাইয়া উঠিল, দেখ মৃণালদি—দেখ দেখ! সুতরাং মৃণালকে তাহা একবার দেখিতে হইল। সোনা বসিয়া মেয়েটি কিছুতেই জাহাজ বানাইতে পারিতেছিল না। সে মৃণালের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, জাহাজ কি ক'রে করতে হয় মেনা-দিদি? মৃণাল কহিল, জানিস না? দেখিয়ে দেবো এখন! দাঁড়া, আগে আমার দোয়াতটা হয়ে যাক। সোনা তখন কাঁচি দিয়া কাগজ কটিয়া ফুল তৈয়ার করিতে লাগিয়া গেল। খানিক পরে সে তাহার হাতের ফুলটা মৃণালকে দেখাইয়া কহিল, হয়েছে মেনা-দিদি? মৃণাল কহিল—দাঁড়াও ভাই, ফুলগুলো ভাল করে সাজাতে হবে। আর ফুলের নীচে নীচে এই সব নৌকা, জাহাজ, এরোপ্লেন—সব চলবে।

পাঁচী মেয়েটির বয়স বছর আষ্টেক। সে হাসিতে হাসিতে কহিল, হ্যাঁ মেনাল-দি, ডাঙ্গার ওপর বুঝি জাহাজও চলবে, এরোপ্লেনও উড়বে? মৃণাল যে দোয়াতটা তৈয়ার করিতেছিল, তাহার উপরকার ছিদ্রতে জোরে একটা ফুঁ দিয়া কহিল, নিশ্চয় ;—বলিয়া কোন একখানা গানের একটা কলি গুন্-গুন করিয়া গাহিতে লাগিল।

সোনা কহিল, মেনা-দি!

কি হুকুম?

সেই গানাখানা আমায় শিখিয়ে দেবে, মেনা-দি?

কাগজ কাটিতে কাটিতে মৃণাল কহিল, দেবো।

কোন্‌খানা বল দেখি?

সেই যেখানা তুই শিখতে চাচ্ছিস।

কোন্‌খানা—তাই বল।

তা ত জানি না।

সেই যে গো——

একখানা কাগজের কোণ কাঁচি দিয়া কাটিতে কাটিতে মৃণাল কহিল, কই যে গো?

সেই—'কুঞ্জে আমার চাঁদ উঠেছে সই।'

ওঃ! উঠেছে না কি? তা হ'লে ত এই চোত-বোশেখেই তোর বিয়ে হবে বোধ হয়?'

যা! বলিয়া সোনা তাহার মুখখানাকে ঘুরাইয়া কহিল, সত্যি—আস্তে আস্তে একটিবার গাও না, মেনা-দি'।

গাইব? আচ্ছা গাইছি। বলিয়া মৃণাল ঠিক সেই গানখানা না গাহিয়া, নিজে নিজে বানাইয়া খুব মৃদুস্বরে গাইতে লাগিল—

কুঞ্জে আমার চাঁদ উঠেছে সই।
আমি বরের জন্যে বোসে রই॥
আমার নামটি সোনামণি—

সোনা কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া কহিল, যাও মেনা-দি, তোমার সঙ্গে আড়ি কিন্তু!

মৃণাল গাহিতে লাগিল—

আমার নামটি সোনামণি,
আমার বুকে প্রেমের খনি,

আবার সোনা লাফাইয়া উঠিল,——ভাল হবে না বলছি, মেনা-দি'!

তথাপি মৃণালের গান চলিল—

নিশি হোল ভোর, মনোচোর মোর
কই রে আমার কই॥

গান শুনিয়া পাঁচী একেবারে হাসিয়া লুটো-পুটি খাইতে লাগিল। সোনা খুবই গম্ভীর হইয়া কহিল, আর কখ্খনো মেনা-দি'র সঙ্গে ভাব করব না। এই দেখ, মেনা-দি;——বলিয়া দাড়ীতে বুড়া আঙ্গুল ছোঁয়াইয়া কহিল, গাড়ী, গাড়ী, গাড়ী—তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে জন্মের আড়ি!

মৃণাল ফুলগুলি সাজাইতে সাজাইতে কহিল, কেন, আমি তোর কি করলুম না?

বরের কথা বল্‌লে কেন?

বলিছি, তা'তে হয়েছে কি? বর ত একদিন হবেই।

না—হবে না।

আইবুড়ো থাকবি?

হ্যাঁ, থাকবো।

তবে তাই থাকিস্। শেষকালে বরের জন্যে পাগল হ'য়ে ছুটোছুটি করবি।

তুমি তাই কর বুঝি?

আমি করতে যাব কেন? আমার বর ত রয়েছে। আমার আছে—বরের বর। সত্যি বলছি।

পাঁচী কহিল, সে আবার কে, দিদি?

সে একজন আছে। বড় হ'লে জানতে পারবি। সে ছেলেমানুষ, ভারি চতুর, যমুনার ধারে বনে-বনে ছুটে ছুটে খেলে বেড়ায়, বাঁশী বাজায়। তার জন্যে, আমি ত আমি, জগৎশুদ্ধ পাগল!—বলিয়া মৃণাল গুন্ গুন্ সুরে গাহিল—

বৃন্দাবনের বনে বনে সে বাজিয়ে বাঁশী ফেরে।
কেউ কি তোরা চিনিস?—আমার প্রাণের বঁধু সে রে।

সেই সময় কানন ঘরের ভিতর আসিয়া কহিল, মেনা, তোরা বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে খেলা করগে যা ত দিদি, আমি একটু শুই। বড্ড শীত-শীত কচ্ছিল, এতক্ষণ রোদে বসেছিলুম; আর পাল্লুম না।—বলিয়া কানন খাটের উপর বিছানাতে শুইয়া পড়িল। মৃণাল মেয়েদুটিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, দিদিমণির অসুখ করেছে ভাই, গোলমাল কোরো না। চল আমরা চণ্ডীমণ্ডপে যাই। তখন তলপী-তলপা লইয়া সকলে ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাননের দেহ আজ ভাল নাই। রাত্রে যেন জ্বরভাবের মত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আজ স্নানাহার করিয়াছে এবং তাহার পর হইতেই শরীর আরও খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এতক্ষণ রৌদ্রের মধ্যে বসিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না।

কাশীনাথ ও-ঘরে বসিয়া তাঁহার নূতন উপন্যাস 'লক্ষ্মী-বিদায়' লিখিতেছিলেন। কাননের সাড়া পাইয়া এ-ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীরটা কি বেশী খারাপ বোধ করছ?

বোধ হয় জ্বরই হ'ল।

কাশীনাথ কপালে হাত দিয়া কহিলেন,—বোধ হয়? এ যে দেখছি, বেশ জ্বর হয়েছে।

এই সময় বাহিরে জুতার শব্দ হইল এবং অরুণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, কাল সারাদিন আপনার দেখা পাই নি, ঠাকুর্দ্দা। লেখায় ব্যস্ত ছিলেন বোধ হয়?

হ্যাঁ ভাই। বোশেখ থেকে উপন্যাসখানা কাগজে বেরুবে, তাই উঠে পড়ে শেষ ক'রে ফেললুম। এই মাত্র শেষের পরিচ্ছেদটা লিখে এলুম।

ঠানদি এমন ক'রে শুযে কেন? অসুখ-টসুক করেছে না কি?

জ্বর হয়েছে। কাল রাত থেকেই শরীর একটু খারাপ হয়েছিলো। আজ আর ভাতটা না খেলেই হ'ত। তা এরা ত মোটেই সাবধান নয় কি না! সকালে স্নানও করেছে, তার ওপর ভাতও খেয়েছে। কি আর বলব বল।

কানন কহিল, কিছু আর বলতে হবে না, তুমি চুপ করেই থাক। জ্বর কি আর লোকের হয় না নাকি?

আর জ্বর হ'লে লোকে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ রাখে নাকি?

কানন আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে শুইয়া রহিল। কাশীনাথ অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, একটু চা তোমার জন্যে করতে বলি, খাবে ত?

কাননের আর চুপ করিয়া থাকা হইল না; কহিল, 'পো'র নামে পোয়াতি বর্ত্তায়'—তা ওকে আর উপলক্ষ্য করছ কেন? খাবে ত তুমি। মেনা কোথায় গেল, তাকে ডাক তা হ'লে।

কাশীনাথ মৃণালকে ডাকিলেন। মৃণাল আসিলে, তাহাকে দুই কাপ চায়ের জন্য বলিয়া,

অরুণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, উদয়ের চিঠি আর এর ভেতর পাওনি? বরানগরের কোন নতুন খবর—বরানগরটাই খালি মনে আসে। বরানগর ছেড়ে উদয় যে কোলকাতায় গিয়ে আছে, সেটা খালি ভুলেই যাই। তা উদয় ভাল কাজ করেনি। বরানগরের মত অমন গঙ্গার ধার ছেড়ে—

বরাহনগরের জন্য যতটা না হউক, উপস্থিত চা'য়ের জন্য কাশীনাথ একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই কারণ ঘন-ঘন দুয়ারের দিকে চাহিয়া মৃণালের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুপরে মৃণাল চা লইয়া আসিল। চা খাইতে খাইতে অরুণ কহিল,—তাই ত! ঠানদি' আবার অসুখ ক'রে বসলেন! বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জাই হবে, ঠাকুর্দ্দা।

কাশীনাথ কহিলেন,—যা হোক একটা কিছু য়েঞ্জা যে, তার আর কোন ভুল নেই। তোমাদের বাড়ীর খবর সব ভাল ত? নাত-বৌ, খোকার সব ভাল আছে?

কানন হাসিতে হাসিতে কহিল,—এতক্ষণ পরে সকাল সকাল কুশল প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করবার অবসর হ'ল? তার মানে, এতক্ষণ চা বিনে মনের আর ঠিক ছিল না আর কি; এখন চা পেয়ে তবে মনটা সুস্থির হোলো,—না গা?

কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া কাশীনাথ চা'য়ে চুমুক দিতে লাগিলেন।

ছাব্বিশ

কাননের ইনফ্লুয়েঞ্জা নয়। তাহার অসুখ একটু বাঁকা পথে গিয়া পড়িল। তিন দিনের মধ্যে যখন জ্বর বিরাম হইল না, তখন চতুর্থ দিনে ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার আসিয়া লক্ষণাদি পরীক্ষা করিয়া কহিল,—টাইফয়েড্। কাশীনাথ প্রমাদ গণিলেন। যাহা হউক, চিকিৎসার ও শুশ্রূষার রীতিমতই ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করা হইল। পাড়ার একটি বিধবা স্ত্রীলোক—মৃত তুলসী বন্দ্যোর স্ত্রী হরিমতি দেবী—তিনি কাশীনাথের এই অসময়ে তাঁহার গৃহে আসিয়া রহিলেন। তাঁহার দ্বারাই রান্না-বান্নার কাজ চলিতে লাগিল। কাশীনাথ ও মৃণালের দ্বারা রোগীর সেবা-শুশ্রূষা চলিতে লাগিল। তা ছাড়া, অরুণ, তপন প্রায় সর্ব্বক্ষণই রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকে। অশ্রুও প্রায় সারা দুপুরটা এ বাড়ীতে কাটাইয়া যায়।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে একদিন রোগের এত বৃদ্ধি হইল যে, সকলেই খুব ভীত হইয়া পড়িল। কাশীনাথ অরুণকে কহিল, ভাই, বুঝতে পাচ্ছ না, কাননকে এ যাত্রা হারাতে হবে। আমার উপন্যাস 'লক্ষ্মী-বিদায়' শেষ করলুম, এইবার সত্যিকারের গৃহলক্ষ্মীকে বুঝি বা বিদায় দিতে হয়।

অরুণ, তপন এবং পাড়ার প্রতিবেশীরা যথাসাধ্য কাশীনাথকে বুঝায়, ভরসা দেয়, কিন্তু কাশীনাথ রোগীর অবস্থা দেখিয়া একেবারে নিরাশ হইয়া পড়েন, কিছুতেই আর বুঝ মানেন না।

একদিন রাত্রে কাননের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িল। কাশীনাথ বুঝিলেন, রাত্রের ঘন-ঘোর অন্ধকারের মধ্যেই হয় ত কানন চিরতরে আঁখি মুদিবে। তিনি কাননের মাথার পাশে বসিয়া ডাকিলেন,—কানন! কানন কোন সাড়া দিল না। অজ্ঞান অবস্থায় তখন সে ভুল বকিয়া যাইতে লাগিল—বেড়ালটা পালিয়ে গেল—কি বিষ্টি রে বাবা! কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি, খ্যাঁকশিয়ালী পালায় ছুটি! অ নন্দ, হাটে যাচ্ছ বুঝি?—কাশীনাথ আবার ডাকিলেন, কানন, শুনছো,—ওগো! কানন কিন্তু পূর্ব্বের মতই বকিয়া যাইতে লাগিল, ঐ—কেষ্ট খাঁড়া হাতে কালী হয়ে দাঁড়ালো! দৌড়ে পালাচ্ছে ও কে রে? ঐ দিলে বুঝি এক কোপ বসিয়ে!

পার্শ্বের ঘরে মৃণাল তখন শ্রীকৃষ্ণের ছবিখানার নীচে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মনে মনে বলিতেছিল, ঠাকুর, দিদিমণিকে ভাল ক'রে দাও; নইলে কি ক'রে আমাদের দিন কাটবে। তোমার মনের আসল ইচ্ছেটা কি, কিছুই ত বোঝবার জো নেই। টিপি টিপি হাসছ যে বড়? ওঃ, বুঝেছি! হাসি-মুখ যখন, তখন বুঝিছি, তুমি একটু ভয় দেখাচ্ছ। হয় ত কোথাও আমাদের একটু অন্যায় হয়ে গেছে, বোধ হয় এ তা'রি একটুখানি শাস্তি। না—না, অন্যায় একটু নয়, বোধ হয়, বেশী রকমই কিছু হয়ে থাকবে; তবে তুমি বড্ডই ভালবাস, তাই শাস্তিটা বড় ক'রে না দিয়ে, শুধু বড় ক'রে ভয়টাই দেখাচ্ছ।—মৃণালের মুদ্রিত চক্ষু বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইল। সহসা কাশীনাথ এ ঘরে আসিলেন

এবং মৃণালকে তদবস্থায় দেখিয়া কহিলেন, ঠাকুরকে জানাচ্ছিস, দিদি? খবরদার, কিছু যেন চেয়ে বসিস্ নি; চাইবার অধিকার থাকে যদি ত চাইতে হবে না, খালি ওঁকে স্মরণ কর্। খালি কাছে যা। উঁনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন, কাননকে টেনে নিলে ভাল হয়, উঁনি নিন্। আর না-নেবার যদি হয়, তা হ'লে উঁনি নেবেন্ না, জানবি। তবে ওঁকে খালি মনে কর্, সেইটেই লাভ।

সম্পদ চাহি না প্রভু,
সম্পদে ভুলিয়া যাই।
বিপদ দাও গো মোরে,
বিপদে তোমারে পাই।

যাহা হউক, সে রাত্রে কোন বিপদ ঘটিল না।

পরদিনও কাটিয়া গেল। যে মন্দ উপসর্গগুলির খুব বৃদ্ধি হইয়াছিল, ক্রমশঃ সেগুলি যেন কমিতে লাগিল। দু'একদিন এইরূপে কাটিয়া যাইবার পর সকলেরই আশা হইল যে, কানন বাঁচিয়া উঠিবে। ডাক্তার কহিল, সেকেণ্ড উইক কেটে যখন কমের দিকে এসেছে, তখন আর ভয় নেই।

দিন যতই কাটিতে লাগিল, কানন ততই আরোগ্যের পথে ফিরিতে লাগিল। কাশীনাথের মনে সে জন্য আনন্দও নাই, নিরানন্দও নাই। তাঁহার মুখে তখন সেই কথা যে, কাননকে টেনে নেবার সত্যকার সময় হয়ে থাকে, তিনি ওকে টেনেই নিন্—বুঝবো যে সত্যিকারই দরকার।

যে দিন কানন পথ্য করিবে, তাহার পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে তাহার ঘরে কাশীনাথ, অরুণ, তপন, অশ্রু, হরিমতি, মৃণাল প্রভৃতি সকলে বসিয়া নানারূপ গল্প-গাছা করিতেছিল। খানিক আগে তাহা শুনিতে শুনিতেই বোধ হয় কানন একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল; চোখ চাহিয়া মৃণালের উদ্দেশে কহিল, তোর সেই গানখানা একবার গা না, দিদি। আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছে করছে। মৃণাল কহিল, কোন্‌টা বল। কানন কহিল, সেই—তুমি ধরা দাও।

মৃণাল গানখানা গাহিল—

তুমি ধরা দাও—
তবু ধরিয়া রাখিতে পারি না,
কোন্ ফাঁকে তুমি সরে যাও—
আমি জানি না।
বুকেতে তোমায় বাঁধিব কি করে—
নন্দদুলাল।
যশোদা তোমারে বাঁধিতে গিয়া
হ'য়েছে নাকাল।
না-ডাকিতে কভু ছুটে আস তুমি,
কভু ডেকে সাড়া পাই না।
এবার তোমার বাঁশীটি কাড়িয়া ল'ব,
অপরাধী যদি হ'তে হয় তা'তে—হ'ব।
তুমি এসে তার সাজা দিয়ে যেও,
আর কিছু আমি চাহি না॥

পথ্য পাইয়া কানন দিন দিন অল্পে অল্পে সারিতে লাগিল। হঠাৎ কাল-বৈশাখীর একটা প্রচণ্ড বিপর্য্যয়ের পর কাশীনাথের গৃহে আবার পূর্ব্বের শান্তভাব দেখা দিল। ডাক্তার কহিল, একটা মাস ওঁকে নিয়ে পশ্চিমের কোথাও যদি একটু ঘুরে আসতে পারেন, তা হ'লে শীগ্‌গিরই ওঁর শরীরটা সেরে যায়।

শীঘ্র শরীরটা সারা কাননের পক্ষে আবশ্যকও হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, আষাঢ়ের প্রথমেই তপনের বিয়ে। মধ্যে বৈশাখের এই কয়টা দিন আর জ্যৈষ্ঠ মাস বাকী। তপনের বিবাহ কাননের উপর নির্ভর করিতেছে; কারণ, অশ্রু ও মৃণাল দু'জনেই ছেলেমানুষ। তাহারা এ-সব কাজের কি-ই বা জানে, কি-ই বা বোঝে। সুতরাং কাননের শরীর যাহাতে সত্বর সারিয়া যায়, সে জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তখন অগত্যা একটা মাসের জন্য কাশীনাথ কানন ও মৃণালকে লইয়া পশ্চিম বেড়াইয়া আসাই স্থির করিলেন। তপনের বিয়ের দিন কিছু পিছাইয়া ২৭শে আষাঢ় ঠিক করা হইল, তৎপূর্ব্বে তাঁহাদের ফিরিয়া আসিতে হইবে।

কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়। বৈদ্যনাথ? সেখানে কানন কিছুতেই যাইবে না, তাহার কারণ, গত বৎসর ভট্টাচার্য্যদের বড় কর্ত্তা ও বড়গিন্নী বৈদ্যনাথ গিয়াছিল, কিন্তু বড়কর্ত্তা আর আসে নাই। হাতের নোয়া খুলিয়া, সীঁথির সিঁদুর মুছিয়া, বড়গিন্নী কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়াছিল; সুতরাং বৈদ্যনাথে কানন কিছুতেই যাইবে না। সিমুলতলার কথা উঠিলে, অরুণ ও-জায়গাটার নানা অসুবিধার কথা তুলিল। তপন কহিল—গিরিডি? কাশীনাথ কহিলেন, ওখানে বারগণ্ডার দিক্‌টাই ভাল, কিন্তু শুনিছি যে, ভাড়াটে বাড়ীগুলোতে নাকি থাইসিস্ রোগীরা থেকে থেকে—। আর বলিতে হইল না, গিরিডি পরিত্যক্ত হইল। মৃণাল মধুপুরের কথা বলিল। কাশীনাথ তাহাতে নারাজ। কানন

কহিল, মধুপুরে যাওয়াই ত সুবিধে। সেখানে যোগেশ বাবুর বাড়ীখানা আদর ক'রে তোমায় দেবে এখন; একটি পয়সাও তোমার ভাড়া লাগবে না। তোমার মুখেই শুনিছি, সে খুব ভাল বাড়ী, বাগান-বাগিচে, চাকর-বাকর—

হ্যাঁ, তা সবই সত্যি। আর এ-ও সত্যি যে, আমি গিয়ে কিছু দিন থাকতে চাইলে, যোগেশ খুব আদর করেই আমায় সে-বাড়ী ছেড়ে দেবে। কিন্তু সেখানে আমি থাকতে পারব না, কানন।

কানন জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কাশীনাথ কহিলেন, তুমি জান বোধ হয়, ঐখানে যোগেশের স্ত্রী মারা গেছেন। তার আদরের স্ত্রী, তার জীবনের সর্ব্বস্ব ঐখানে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন, যোগেশের ও হ'ল ব্যথার তাজমহল। ওর ঘরে-ঘরে আকাশে-বাতাসে যোগেশেরও দীর্ঘশ্বাস বইছে; আনন্দ-ভ্রমণের জায়গা ও নয়, কানন। যখনি আমি সেখানে গিয়েছি, ব্যথায় আমার বুক ভরে উঠেছে। আমি একলা ওখানে গিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু যেখানে যোগেশ তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে, আমি তার বন্ধু হয়ে, আমার স্ত্রীর শরীর সারাবার জন্যে সে যায়গায় তাকে নিয়ে যেতে পারি না। অত বড় নির্দ্দয় আমি হ'তে পারব না।

কাশীনাথের কথা শুনিয়া সকলেই কিছুক্ষণ নীরব রহিল। অবশেষে কাশীনাথই কহিলেন, তবে কাশী গেলে বোধ হয় নেহাৎ মন্দ হয় না। তপন কহিল, কাশী মন্দ নয় বটে এবং তীর্থ হিসেবে ও সেরা তীর্থ, কিন্তু 'চেঞ্জের' পক্ষে—অর্থাৎ বর্ত্তমান কাশীকে ঠিক স্বাস্থ্য-নিবাস বলা চলে না।

মৃণাল কহিল, চুণার?

চুণারটা সকলেরই পছন্দ হইল। ডাক্তারটিকেও পরদিন বলা হইলে, তিনিও ওখানকার জলের কেমিকেল্ একজামিনের রিপোর্ট শুনাইয়া দিয়া, 'মাইকা', 'আইরণ', 'লাইম্', 'পার্সেন্টেজ্', 'ভ্যালু', 'অক্সিজেন', 'ওজোন' প্রভৃতি অনেক কথাই বলিলেন এবং চুণারের পক্ষে ভোট দিলেন।

সুতরাং চুণার যাওয়াই স্থির হইল।

সাতই বৈশাখ শুভদিন। সেইদিনই কাননকে লইয়া কাশীনাথ যাত্রা করিলেন। সঙ্গে যাইল—মৃণাল আর তপন। তপন না গিয়া ছাড়িল না। কাশীনাথ তাহাকে কহিলেন, 'যার বে তার মনে নেই, পাড়া-পড়সীর ঘুম নেই'; তুই যাবি কি রকম? বিয়ে করাটা কি তা হ'লে আর কা'কেও মারফৎ দিয়ে যাবি নাকি? আমরা ত বিয়ের দু'দিন আগে ফিরবো; তোর ত আর তা এলে চলবে না। তপন কহিল, আমি না হয় পনর দিন আগেই ফিরে আসবো।—মোট কথা, তপন যাইবেই। সুতরাং স্থির হইল, সে আষাঢ়ের প্রথমেই ফিরিয়া আসিবে। কাশীনাথও মনে করিলেন, তপন সঙ্গে থাকিলে তাঁহারও অনেক সাহায্য হইবে।

সাতাশ

চুণারে আসিয়া কাননের নষ্ট-স্বাস্থ্যের দিন দিনই উন্নতি হইতে লাগিল। এ সময়টা খুবই গরম পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু সকলেরই শরীর অল্পদিনের মধ্যেই বেশ সারিয়া উঠিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে কাশীনাথ তপনকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তপন চলিয়া গেলে কানন একদিন কাশীনাথকে কহিল, এখানে আর ভাল লাগছে না। শরীর ত আমার এই একমাসের মধ্যে বেশ সেরেছে, চল না, দিন কতক কাশীতে গিয়ে থাকা যাক। কাশীনাথ কহিলেন, আর একটা মাস পরই আমাদের ফিরে যেতে হবে। তা আমি বলি কি, শুধু কাশী কেন, আরও দু'একটা জায়গায় বেড়িয়ে এলে হয়। যদিও এ সময়টা পশ্চিম বেড়াবার পক্ষে সুবিধের সময় নয়, কিন্তু তার আর কচ্ছি কি বল। এই প্রচণ্ড গরমে সকলেরই কষ্ট হচ্ছে এবং হবেও, কিন্তু টিঁকে থাকতে পারলে শরীরের উপকারটাও এই সময় বেশী হবে। চুণার পর্য্যন্ত যখন আসা ঘটল, তখন এই সূত্রেই একবার—। মৃণাল ত লাফাইয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গেই পরমোৎসাহে কতকগুলা জায়গার নাম তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—মথুরা, বৃন্দাবন, তাজমহল, গঙ্গা-যমুনা, জব্বলপুর, নর্ম্মদা, মর্ম্মর পাহাড় প্রভৃতি।

পরামর্শ যখন পাকা হইয়া গেল, তখন কাশীনাথ আর চুণারে বিলম্ব করিলেন না। দু'একদিনের মধ্যেই তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। একে পশ্চিমের সহর, তাহাতে জ্যৈষ্ঠ মাস; দিনের বেলা যে ভীষণ গরম তাহা আর বলিবার নয়। কিন্তু নূতন নূতন স্থানের বৈচিত্র্য ও দৃশ্য দেখার আনন্দে গরমের কষ্টটা কাহারও কাছে আমল পাইল না।

প্রত্যহ সকালটায় সকলে একবার ঘুরিয়া আসে, তাহার পর অপরাহ্ণে বাহির হইয়া রাত নয়টা দশটা পর্য্যন্ত চারিদিকে দেখিয়া শুনিয়া বেড়ায়। আগ্রায় 'তাজ', জ্যোছনা রাতে না দেখিয়া মৃণাল ছাড়ে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ ও উৎসাহ তাহারই। বৃন্দাবনের 'বন' বেড়াইয়া তাহার কি আনন্দ। কিন্তু কচ্ছপের ভয়ে কোনদিনই সে যমুনাতে নামিয়া স্নান করে নাই। পাণ্ডা-মাগী একদিন তাহার মুখে চণ্ডীদাসের একখানা গান শুনিয়া বলিয়াছিল, তুমি দ্বাপরে এইখানেই জন্মেছিলে।

ওদিক্‌কার আরও দু'একটা স্থানে দু'একদিন বেড়াইয়া সকলে এলাহবাদ আসিল। এলাহবাদে গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে স্নান ও ভরদ্বাজ-আশ্রম, কেল্লা, অক্ষয়-বট প্রভৃতি দেখা হইলে পর কানন কহিল, এইবার কাশী যাওয়া যাক, চল। কাশীনাথ কহিলেন, একবার জব্বলপুরটা ঘুরে যাবে না? 'মার্ব্বেল রক' আর 'নর্ম্মদা-ওয়াটার-ফলটা' আমার অনেকদিন থেকে দেখবার ইচ্ছেটা আছে। কানন কহিল, ইচ্ছে আর অপূর্ণ থাকে কেন, চল।

সুতরাং এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর আসা হইল। জব্বলপুরে যেন আরও গরম। সকালের দিক্‌টায় বাহির হইয়া টোঙ্গা করিয়া, দেখিবার স্থানগুলি কোন প্রকারে দেখিয়া আসা হয়। তাহার পর সন্ধ্যার মধ্যে ঘরের বাহির হয় কাহার সাধ্য। রাণী দুর্গাবতীর কেল্লা, পিসনহারীর মন্দির, ওয়াটার ওয়ার্কস, পটারি ওয়ার্কস—এগুলা সহরের কাছেই অবস্থিত বলিয়া সকাল বেলাতেই দেখিয়া আসা হইল। 'Balancing stone' দেখিয়া কানন যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে বহুক্ষণ ধরিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল ও দূরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তদ্বিষয়ে মনে মনে অনেক কিছু ভাবিতে লাগিল।

পরদিন দুর্গম এবং দীর্ঘ পথ অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়া সকলে নর্ম্মদা জল-প্রপাত ও মর্ম্মর-পর্ব্বত দেখিয়া আসিল। যেখানে উচ্চ ভূমি হইতে নর্ম্মদার বিশাল স্বচ্ছ বারিরাশি গভীর গর্জ্জনে নিম্নভূমিতে পতিত হইতেছে, সেইখানে পর্ব্বতোপরি দাঁড়াইয়া, চতুস্পার্শ্বের গভীর অথচ মনোরম দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে মৃণাল কাশীনাথকে কহিল, তোমরা ফিরে যাও, আমি এখানেই থাকব। কাশীনাথ কহিলেন, বেশীক্ষণ ত আর থাকতে পারি না, বড় জোর আজ খানিকটা রাত পর্য্যন্ত।

মৃণাল কহিল, কেন দাদু?

অর্থাৎ অন্ধকার হলেই ব্যাঘ্র-মহারাজের শুভাবির্ভাব হবে কি না!

দিন চার জব্বলপুরে কাটাইয়া, কাশীনাথ সকলকে লইয়া কাশী আসিয়া কহিলেন, এইবার আমি স্ব-রাজ্যে এলুম। কানন জিজ্ঞাসা করিল, স্ব-রাজ্যে ক'দিন থাকা হবে বল দেখি?

হপ্তা খানেক। তার ওপর বড় জোর আরও দু'চারদিন ফাউ চলতে পারে। তার বেশী নয়। অর্থাৎ পনরইয়ের ভেতর আমাদের বকুলবাড়ী ফিরতেই হবে। উদয় ত চিঠির ওপর চিঠি পাঠিয়ে ফেরবার জন্যে কড়া তাগিদ্ দিচ্ছে।

মোট কথা, কাশীনাথের আর ভাল লাগিতেছে না। বকুলবাড়ীর জন্য তাঁহার মন ছটফট করিতেছে। দিনকতক তাঁহার কাশী একটু ভাল লাগিল। তাহার পর গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। বৃন্দাবনও তাঁহার তেমন ভাল লাগে নাই। সেখানে একদিন তিনি কাননকে বলিয়াছিলেন,—কৃষ্ণ কৈ? সারা বৃন্দাবনে কই তাঁকে খুঁজে পেলাম না ত। বরং আমার বকুলবাড়ীর বনে-উপবনে, বকুলবাড়ীর নির্জ্জন মাঠে-প্রান্তরে, আর সব-চেয়ে আমার বাড়ীতে, আমার ঘরে-ঘরে তাঁকে আমি দেখতে পেয়ে থাকি।

এখানে আসিবার কয়েকদিনের মধ্যেই জন-কয়েক তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া পাকড়াও করিয়া ফেলিয়াছে। সাহিত্য-রসিকগণের কাছে তিনি ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। সকালটায় মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিয়া, বিকালে গঙ্গার ঘাটে বেড়াইয়া এবং সন্ধ্যায় সাহিত্য-বৈঠকগুলিতে গল্প-সল্প করিয়া তাঁহার দিন বেশ কাটিতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্ণে গোধূলিয়ায় 'বসুমতী'র দোকানে বসিয়া চারি পাঁচজন ভদ্রলোকের সহিত তিনি গল্প-গাছা করিতেছিলেন। সহসা পথের একটি লোককে দেখাইয়া, তাঁহাদের মধ্যে একজন কাশীনাথকে কহিলেন, ঐ মহাজন বাবু কোনদিন আপনার কাছে সুদের তাগাদা করে নি? কাশীনাথ কহিলেন, না। সুদের তাগাদা মানে? ভদ্র-লোকটি কহিলেন, ওর একটু মাথা খারাপ। সকলকেই ডেকে ডেকে বলবে—ওহে সুদটা চুকিয়ে দাও না ভাই, আসলটা না হয় রোয়ে-বোসে দিও। লোকটার মুখে এ ছাড়া অন্য কথা বড় একটা শুনতে পাওয়া যায় না। অথচ আর সব কাজে ও ঠিক আছে, তখন কিছু বোঝবার জো নেই।

কাশীনাথ কহিলেন, পাগল হবার মূলে হয় ত ঐ টাকা-কড়ির সুদ সংক্রান্ত কোন-কিছু ব্যাপার জড়িত আছে।

আর একটি ভদ্রলোক বলিলেন, আজকাল পাগলের আমদানী দেখছি এখানে বাড়ছে। জগবন্ধু বাবু ব'লে একটি ভদ্রলোক আছেন, মাঝে মাঝে তিনি এখানে এসে কিছুদিন করে থাকেন। আমার বাড়ীর পাশেই তাঁর একখানি ছোট বাড়ী আছে। অল্পদিন হ'ল কোলকাতা থেকে এবার তিনি এসেছেন।

তা তিনিও কি পাগল হয়ে গিয়াছেন না কি?

না, তিনি হ'ন নি। তাঁর সঙ্গে এবার একটি রাঁধুনী এসেছে। বেশ দেখতে শুনতে মশাই। লেখাপড়া জানে, বয়স খুবই কম, স্বভাব-চরিত্রও—ঘোষ মশাই বলেন, খুবই ভাল,—কিন্তু দোষ হচ্ছে—একটু মাথার গোলমাল। এখানে এসে হয়েছে, আগে না কি ছিল না।

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম মাথা খারাপ?

সে-ও এই রকম অনেকটা। কিছুই বোঝা যায় না। বেশ ভাল লোক। দুবেলা রান্না-বান্না সবই করে। কিন্তু দুপুর বেলা খাবার-দাবার পর, ঐ সদর দরজার ধারে এসে বসবে, আর পথ দিয়ে যত সধবা স্ত্রীলোক যাবে, তাদের ডেকে ডেকে বলবে—স্বামীই পরম দেবতা, তার পায়ে মতি রেখো, সতীদের জন্যই স্বর্গ।

কাশীনাথ কহিলেন,—তাই না কি। আর কিছু বলে টলে?

হ্যাঁ,—ঐ ধরণের অনেক কথাই বলে। কখনো কাঁদে, কখনো গান গায়। আবার কখনো মাথা খোঁড়ে। জগবন্ধু বাবু বলেন, কি যে মুস্কিলে পড়িছি মশাই, ওকে ছাড়তেও পারি না, রেখে দেওয়াও এক হাঙ্গাম। ওঁর স্ত্রী নাকি তাকে খুবই ভালবাসে।

বটে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এইরূপ গল্প-গাছা হইতেছে, হঠাৎ কাশীনাথ লাফাইয়া উঠিয়া পথে বাহির হইয়া কহিলেন,—এ কি? তুমি হঠাৎ যে?

অরুণ কহিল, আপনাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যেতে এলুম। বড়দা'র হুকুম।

খবর সব ভাল ত, অরুণ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার শরীর ভাল আছে?

তা না থাকলে আর এই রকম ক'রে বাইরে ঘুরে আড্ডা দিয়ে বেড়াই?

অরুণকে লইয়া কাশীনাথ বাসার দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে আসিতে আসিতে অরুণ কহিল, সকালে সিকরোলে নেমেছি। গাড়ীতে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা—কিছুতেই ছাড়লেন না; তাঁর সঙ্গে যেতেই হ'ল। সেখানে স্নানাহার ক'রে একটু নিদ্রা দি। তারপর বেলা চারটে আন্দাজ বেরিয়ে পড়ি। এখানে এসে আপনার বাসা খুঁজে নিতে বেশী আর কষ্ট হয় নি। দেখলুম, এখানে আপনি বেশ নামজাদা হয়ে উঠেছেন।

কাশী কাশীনাথেরই স্থান কি না। তা চা-টা খাওয়া হয় নি?

হ্যাঁ। চা খেয়ে ঠানদির কাছ থেকে আপনার বেড়াবার জায়গাগুলোর সন্ধান জেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

তা বেশ; আমি ত বুধবার দিন চ'লে যাব বলে সব ঠিক ঠাকই করেছি।

সে ত চিঠিতে লিখেছেন। কিন্তু বড়দা তাড়া দিলেন। তিনি বল্লেন, তুমি গিয়ে তাঁদের নিয়ে এস।

কাশীনাথ কহিলেন, আসল কথা বুঝতে পেরেছি। তপু চুণারটা বেড়িয়ে গেল, তোমার কাশীটা বেড়াবার ইচ্ছে। বুঝতে পেরেছি, তা হ'লে দিন পাঁচ-সাত থেকে একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে নাও।

বাসায় আসিয়া অরুণ কহিল, সকলের চেয়ে কিন্তু সুন্দর সেরেছেন,—বলিয়া অরুণ কাননের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কাশীনাথ কহিলেন,—তা ব'লে পর-স্ত্রীর মুখের দিকে ওরকম ক'রে চেয়ে থাকাটা মোটেই সুন্দর নয়; এটা কবি এবং অ-কবি সকলেই বোঝে। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ঠানদিদিটিকে বর্ত্তমানে তোমার পছন্দ হয়ে গেছে, এবং পছন্দ যদি হয়ে থাকে—

কানন ঝাঁকি দিয়া উঠিল,—আচ্ছা, কী বল দেখি তুমি? আমি ঠিকই—আমি; আমার ত বিশেষ 'চেঞ্জ' হয় নি ক। তারপর অরুণের দিকে চাহিয়া কাশীনাথ কহিলেন, তা হ'লে কাল বাদে পরশুই রওনা—কেমন?

কানন কহিল, তোমার যদি যেতে ইচ্ছে না করে, তুমি না হয় কিছুদিন থাক এখানে; অরুণকে নিয়ে আমরা চ'লে যাই।

কাশীনাথ কহিলেন, তা হ'লে দেখছি, অরুণের একলার দোষ নেই, তুমিও অরুণকে আগেকার চাইতে তা হ'লে সুন্দর দেখছ। ও তবু খুব স্পষ্ট ক'রে কিছু বলে নি; তুমি যে দেখছি একেবারে ওকে নিয়ে চ'লে যেতেই প্রস্তুত!

কানন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অরুণ কহিল, কাশীতে আপনার বোধ হয় বেশই দিন কেটেছে?

হ্যাঁ, তা মন্দ নয়, অনেক দিন হ'ল বই কি।

আমি বেশী বলিনি—বলছি বেশ-ই।

ওঃ! বেশ আমার সব জায়গাতেই লাগে, যদি তোমার ঠানদি'টি সঙ্গে থাকেন; নইলে স্বর্গও আমার কাছে বেশ লাগে না।

মৃণাল এতক্ষণ রান্নাঘরে বসিয়া কুটনা কুটিতেছিল। এক্ষণে এ-ঘরে আসিয়া কহিল, দাদুর স্বর্গ হচ্ছে—বকুলবাড়ী, জানেন অরুণদা।

কাশীনাথ কহিলেন, তা ত সত্যিই। বকুলবাড়ীর চেয়ে জগতের কোন জায়গায়ই আমার প্রিয় নয়; সে কথা একশ' বার। কানন ছাড়া হয়ে, যদি কখনো আমাকে থাকতে হয়, ত কাশীতেও পারব না, বৃন্দাবনেও পারব না, মর্ম্মর পাহাড়, নর্ম্মদা, তাজ দেখে বেড়িয়েও পাবব না। শুধু বকুলবাড়ীতে থেকে তা পাবব।

অরুণ হাসিতে হাসিতে কহিল, তা হ'লে কাশী চান না আপনি?

কাশীনাথ কহিলেন, বকুলবাড়ী ছেড়ে? নিশ্চয়ই নয়—

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সকলে মিলিয়া এইরূপ গল্প-গাছা চলিল।

আটাশ

ছাব্বিশে আষাঢ়।

কাল তপনের শুভবিবাহ।

কয়েকদিন হইতেই বিবাহ-বাড়ীতে খুব গোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড বাড়ী এই উপলক্ষে মেরামত হইবার পর নবরূপ ধরিয়াছে। সমস্ত আত্মীয়-স্বজন কুটুম্বদিগকে উদয় নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছে। উৎসবের হাওয়া শুধু বিবাহ-বাড়ীতেই নহে, সমস্ত গ্রামখানিতেই যেন প্রবাহিত।

কয়েকদিন পূর্ব্বে কাশী হইতে কাশীনাথ সকলকে লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বিবাহ-বাড়ীতে তিনিই কর্ম্মকর্ত্তা, উদয় নামে মাত্র। কাশীনাথের আর নাইবার খাইবার অবসর নাই। সর্ব্ব সময়ই তিনি ভিতর বাহির ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। আগামী কল্য বিবাহ, কিন্তু আজ হইতেই তিনি গলা ভাঙ্গিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার হাঁক-ডাকের আর অন্ত নাই,—পুকুর থেকে আজ কত মাছ ধরা হ'ল? গয়লা এখনো দই দিয়ে গেল না কেন? ওরে-নবৎ-ওয়ালাদের একটু বাজাতে বল্ না কেউ। ওলপুর থেকে যাঁরা এলেন, তাঁদের গাড়ীভাড়া দোয়া হয়েছে ত? তপু, ভাই, জলে জলে বেড়িয়ো না দাদা; দুটো দিন একটু সাবধানে থাকো। ন'বতে বেশ সুরটি লাগিয়েছে ত; ভৈরবী বোধ হয়।

বাটীর ভিতরের কাজে কাননকেও খুব খাটিতে হইতেছে। খাটিতেছে না শুধু অশ্রু আর মৃণাল। তাহারা দুইটিতে ঘোরা-ঘুরি করিতেছে খুবই, কিন্তু তাহা কাজে নয়—অকাজে। একবার অরুণ আসিয়া অশ্রুকে কহিল, তুমি এতদিন যে অঙ্ক-টঙ্ক কষলে, মুদীর দোকানের হিসাবগুলো সব তোমাকে লিখে রাখতে হবে। অশ্রু ব্যস্তভাবে চলিয়া যাইতে যাইতে কহিল, অত ছোট হিসেব আমি রাখতে পারবো না।

উদয় বৈঠকখানা-ঘরে তাকিয়া হেলান দিয়া একভাবেই বসিয়া আছে আর গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছে। গ্রামের পাঁচজনও তাহার কাছে আসিতেছে, আত্মীয়-কুটুম্বের দলও তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। ইহাদের লইয়া উদয় নানারূপ গল্প-গাছা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছে। তপনের বিবাহে আজ তাহার মনে আনন্দের সীমাপরিসীমা নাই, কিন্তু উৎসাহও নাই। তাহার হাত-পা যেন আজ শক্তিহীন।

আনন্দে, উৎসাহে, কোলাহলে সে দিনটা কাটিয়া গেল। পরদিন বরানুগমনের মহা আয়োজন। আগে রোশন-চৌকী, তৎপশ্চাতে বর ও বরযাত্রীর দল, সর্ব্ব শেষে বকুলবাড়ী মিউজিক্যাল ক্লাবের কনসার্ট। সমস্ত গ্রাম আনন্দ-কোলাহলে, বাদ্যে, সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিল। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ভাঙ্গা গলায় কাশীনাথ তপনের কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিলেন, বিয়েটা তা হ'লে ঠিকই করবি ত, ভাই? আর অমত নেই

ত? আমি অবশ্য reserve-এ থাকলুম, ছাঁদনা-তলায় অমত ক'রে বসিস যদি, কাজ আটকাবে না।

সমস্ত গ্রামখানাকে হঠাৎ নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া, বর সহ বরযাত্রী দল বেলা প্রায় চারিটার সময় ষ্টেশনের পথে যাত্রা করিল।

পরদিন মহা সমারোহে বর-বধূ লইয়া যখন সকলে বকুলবাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর। গ্রামের মেয়ে-ছেলে, বউ দেখিতে বসু-বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িল। কানন একে একে সকলকে বউ দেখাইতে লাগিল। কাশীনাথ ভাঙ্গা গলায় সকলকে কহিলেন, লক্ষ্মীকে আজ গাঁয়ে আনলুম, বকুলবাড়ীর আর কখনো অমঙ্গল নেই।—সত্যাই ছায়ার শান্তরূপ, সলজ্জ হাব-ভাব এবং লক্ষণাদি দেখিয়া কাশীনাথের কথাই সকলের মনে বার বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

তাহার পর বর-বধূ সংক্রান্ত অন্যান্য করণীয় সাঙ্গ হইলে আশীর্ব্বাদের পালা আসিল। ব্রাহ্মণ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও পরমাত্মীয়তুল্য বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে কাশীনাথই ছায়াকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি কহিলেন,—

'প্রজনার্থং মহাভাগাঃ
পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু
ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥'

—গৃহস্থের ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আজ তোমাদের গার্হস্থ্য-জীবনের পুণ্য প্রভাতে কায়মনোবাক্যে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি, গৃহস্থের ধর্ম্মপালন করতে তোমরা যেন দু'জনে সমর্থ হও। এই আমার প্রাণের আশীর্ব্বাদ।

তাহার পর উদয় আশীর্ব্বাদ করিল। উদয় তাহার অংশের অর্দ্ধেক সম্পত্তির সেই রেজেষ্ট্রী-করা দান-পত্রখানি ছায়ার হাতে দিয়া কহিল, মা, বসু-বংশ তোমার পুণ্যে যেন ধন্য হ'য়ে ওঠে।

অরুণও বর-বধূর মস্তকে ধান-দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। অশ্রু আশীর্ব্বাদান্তে তাহার বড় সাধের মুক্তার সাত-নরটি ছায়ার গলায় পরাইয়া দিল। কানন আশীর্ব্বাদান্তে ছায়ার নাম লেখা একটি মিনা-করা অঙ্গুরী তাহার অনামিকায় পরাইয়া দিল।

সকলের আশীর্ব্বাদ করা হইয়া গেলে কানন কহিল, সকলে এখন যাও, ওরা একটু জিরুক। জলখাবার এনে দি, দু'জনে খা'ক।

সকলে চলিয়া গেলে, তপন ছায়াকে কহিল, আমি তোমাকে কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করব, ছায়া?

মধুকণ্ঠে ছায়া কহিল, যা তোমার ইচ্ছা।

তপন কহিল, তা হ'লে আমাদের জীবন-পথের আজকের এই শুভ-আরম্ভে তোমাকে এই বলেই আশীর্ব্বাদ করি যে, সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে সব অবস্থাতেই তুমি আমার পাশে ছায়ার মতই থেকো।

মধুর মৃদু কণ্ঠে ছায়া বলিল, তোমার প্রথম আশীর্ব্বাদ জীবনে আমার সবদিক্ দিয়ে যেন সফল হয়।—বলিয়া তপনের পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। তাহার পর মাথা তুলিয়া একটু-খানি হাসিয়া কহিল, শুনেছিলুম, তুমি নাকি বিয়ে করতে চাও নি?

ছায়ার মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তপন কহিল, তোমাকে পাইনি বোলে, ছায়া। তোমাকে ছাড়া কি আর কা'কেও আমি বিয়ে করতে পারি? এতদিন ধরে আমার মনের খাতায়, প্রিয়তমাসু বোলে সম্বোধন ক'রে তোমার উদ্দেশে কত কথাই যে লিখে রেখেছি!

তুমি——তপন আরও কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ কাশীনাথকে পশ্চাতে দেখিয়া লজ্জায় স্তব্ধ হইয়া গেল।

কাশীনাথ সামনে আসিয়া কহিলেন, বলি, এখন থেকেই প্রিয়তমাসু সুরু হ'ল! তবে যে বলেছিলি যে, বিয়ে কিছুতেই করবি না! আর আজ বিয়ে হ'তে-না-হ'তেই একেবারে গলা ধরে প্রিয়তমাসু'র পুষ্পবৃষ্টি! কিন্তু সেটা ত আর চলবে না; যেহেতু 'প্রিয়তমাসু'টি ত আমার!—বলিয়া কাশীনাথ তপনকে টানিয়া উঠাইয়া দিয়া, ছায়ার পাশে বসিয়া পড়িলেন।

দুষ্টামী করিয়া সেই সময় মৃণাল কোথা হইতে পোঁ করিয়া শাঁক বাজাইয়া দিল।

দাদা ও ভাই

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

দাদা ও ভাই

জীবনের সাথী মোর—পথের মাঝে,
ছাড়িয়া গিয়াছে হায়—আঁধার সাঁঝে !
দেহ আছে—প্রাণ নাই—শূন্য ধরা !
কোথা তুমি—কোথা তুমি—চিত্ত-হরা !

হাওড়া কোর্টের উকীল, শিবপুরের গিরীশচন্দ্র —কোর্টের ফেরত কলিকাতায় গিয়াছিল !

তথা হইতে সন্ধ্যার সময় শিবপুরে নিজের বাটীতে ফিরিয়া বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া পত্র লিখিতে বসিল !

সারাদিন পরিশ্রম করিয়া আসার পর জলখাবারের থালা সাজাইয়া কেহ তাহাকে ডাকিতে আসিল না, —আসিবার তেমন কেহ ছিল না, যেহেতু গিরীশ বিপত্নীক ! ছয় মাস হইল তাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে ! স্ত্রীলোকের মধ্যে বাটীতে ছিলেন এক বৃদ্ধা পিসিমা,—থাকা না থাকা সমান !

পরলোকগতা পত্নীর যে নূতন বড় ছবিখানা গিরীশ সম্প্রতি বাঁধাইয়া আনাইয়া বৈঠকখানায় তাহার বসিবার চেয়ারের সম্মুখে সিল্কের কর্ড দিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল, তাহারই দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, গিরীশ কাগজ কলম লইয়া পত্র লিখিতে বসিল !

ছবিখানির নীচে যে চারি ছত্রে কবিতা বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল, ছোট ছোট অক্ষরে সেই চারি ছত্রই তাহার সেই চিঠির কাগজের শীর্ষদেশে মুদ্রিত ছিল। তাহা এই :—

জীবনের সাথী মোর—পথের মাঝে,
ছাড়িয়া গিয়াছে হায়—আঁধার সাঁঝে !
দেহ আছে—প্রাণ নাই—শূন্য ধরা !
কোথা তুমি—কোথা তুমি—চিত্ত-হরা !

এই মুদ্রিত চিঠির কাগজ আনিতেই, কোর্টের ফেরত গিরীশকে কলিকাতায় পত্নী-শোকাতুর প্রেসে যাইতে হইয়াছিল। মজঃফরপুর হইতে তাহার এক বন্ধু আজ কয়দিন হইল একখানি পত্র দিয়াছে। এই মুদ্রিত চিঠির কাগজ তাহার ফুরাইয়া গিয়াছিল বলিয়া, কয়দিন যাবৎ বন্ধুর পত্রের উত্তর দিতে পারে নাই।

চিঠিখানি শেষ করিয়া গিরীশ উঠিয়া ভিতরে যাইবার উপক্রম করিতেই ওপাড়ার কিরণ মিত্র আসিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া কহিল,—গিরীশদা, তুমি একটা পরামর্শ দাও। পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা বলছে। কেউ বলছে—কর, কেউ বলছে—কোরোনা। ওদের রং-বেরংএর ও সব কথা ছেড়ে দি দাদা, তুমি একটা সৎযুক্তি দাও দেখি। করব, কি, করব না ?

কিরণ মিত্রও সম্প্রতি গিরীশের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বিপত্নীক হইয়াছে ; প্রভেদের মধ্যে এই যে, গিরীশ অপুত্রক—কিরণ সপুত্রক, গিরীশের মাথার উপর তাহার বৃদ্ধা পিসিমাতা ছিলেন, কিরণের আর কেহই ছিল না। আর,—পত্নীহারা হইয়া গিরীশ জগতে যেন সর্ব্বস্বহারা হইয়াছে, সমস্ত জগৎ যেন তাহার নিকট শূন্য, আর কিরণ কেবল স্ত্রীকেই হারাইয়াছে, জগৎ তাহার নিকট জগতই আছে।

কিরণ কহিল,—দাও গিরীশদা—তুমিই একটা সৎপরামর্শ দাও।

গিরীশ খানিক নিস্তব্ধ থাকিবার পর বলিল,—দেখ, কিরণ, করতে চাও কর বিয়ে, কিন্তু,—

কিরণ বাধা দিয়া বলিল,—না গিরীশদা, ও কিন্তু টিন্তু নয়। তুমি একেবারে তোমার মনের ঠিক কথাটি বল। তুমি যা বলবে, তাই আমি করব।

গিরীশ কহিল—তা যদি বল,—তাহলে আর বিয়ের কথাই মুখে এনো না।

আনবো না ?

না, একেবারেই না। হৃদয় বলে একটা যে স্থান বুকের ভেতর ভগবান দিয়েছেন, তাতে একবার এক জনকে বসান হয়েছে। বেঁচে থাকতেও সে যেমন সেই হৃদয় জুড়ে থাকে, মরে গেলেও তেমনি জুড়ে থাকে। তাকে সেখান থেকে ঠেলে

দিয়ে আবার নতুন করে আর এক জনকে সেখানে বসান—এ যে কি করে হতে পারে, তা আমি ভাবতেই পারি না কিরণ! বলি, ভগবান পশু করে ত আর আমাদের গড়েন নি, মানুষ করেই গড়েছেন। সুতরাং—বুঝলে কি না?

কিরণ একদৃষ্টে গিরীশের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, কহিল,—যা বললে ঠিকই গিরীশদা,—তবে—

এর মধ্যে আর তবে টবে কিছু নেই রে ভাই। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। ভগবান যখন একজনকে টেনেই নিলেন, তখন মানুষ আবার বাহাদুরী করে সেই জায়গায় আর এক জনকে টেনে আনে কোন সাহসে? তা হয় না—হয় না। যার সত্যিকারের হৃদয় আছে, সে তা কিছুতেই পারে না। আবার বিয়ে করবার জন্যে যে তোমায় পরামর্শ দেয় দিক, আমি তা কিছুতেই দিতে পারি না। তা হলে মেয়েরাই বা কি দোষ করলে? তারাও বিধবা হয়ে আবার তো বিয়ে করতে পারে। তুমি পুরুষ বলে তা যদি পার, ত তারাই বা পারবে না কেন? দেবতার বেলা লীলে খেলা—আর পাপ লিখেছে মানুষের বেলা? প্রথম স্ত্রী মরে গেলে কেমন করে যে লোকে আবার বিয়ে করবার কথাও মনে আনতে পারে, এ ভেবে ত আমি চমকেই যাই, কিরণ!

আড়ষ্ট হইয়া কিরণ গিরীশের কথাগুলি শুনিয়া একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল,—না,—তোমার পরামর্শ ই শুনবো গিরীশ দা, ও নামই আর করব না। বলিয়া কিরণ ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

পিসিমাতা প্রসন্নময়ী ভিতরের দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া কহিলেন—কখন এসেছিস, বাবা? একবার বাড়ীর ভেতর যেতে নেই রে? কিছু একটু মুখে দিলি না—অমনি অমনি রইলি? মুখখানা যে একেবারে শুকিয়ে গেছে, বাবা! চা খাবি? ঠাকুরকে দিয়ে দেবো পাঠিয়ে?

গিরীশ খবরের কাগজের ভাঁজ খুলিতে খুলিতে কহিল;—"চা?—হয়ে থাকে দাও পাঠিয়ে।"

প্রসন্নময়ী কহিলেন—হয়েছে বৈ কি বাবা, শিরীষ ত খাচ্ছে দেখলুম।

শিরীষ গিরীশের কনিষ্ঠ।

মিনিট পাঁচেক পরে ঠাকুরের পরিবর্তে প্রসন্নময়ী নিজেই চায়ের বাটি হাতে করিয়া আনিয়া গিরীশের সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন,—হ্যা, বাবা, গিরীশ, তোকে ত আর বুঝিয়ে পাল্লুম না! কি যে তোর গোঁ! তা যাক গে বাছা, তুই সন্ন্যেসী হোয়েই থাক,—তোকে আর বোলবো না। তা—শিরীষটাও কি অমনি অমনি থাকবে? ওর ত পাশের পড়া সব শেষ হল। এবার ওর জন্যে একটি মেয়ে টেয়ে দেখ!

খুঁজছি ত পিসি। তিন চার যায়গায় মেয়ে দেখেও ত এলুম। পছন্দ না হলে—

আচ্ছা, সেই নেবুবাগানের মেয়েটি না কি খুব সুন্দর,—সেটিকে না হয় এক দিন গিয়ে দেখে আয় না, বাবা। মেয়েটি সুন্দর হলেই হল,—আমার ত আর টাকার খাঁই নেই।

আচ্ছা, পিসি, এই আসছে রবিবার নেবু-বাগানের সেই মেয়েটিকে দেখে আসবো।

তাই আসিস বাবা—বলিয়া প্রসন্নময়ী খালি চায়ের পেয়ালাটি লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

খবরের কাগজখানি হাতে লইয়া, আলোটি বাড়াইয়া দিয়া, গিরীশ সম্মুখস্থ স্ত্রীর ছবিখানির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল। উজ্জ্বল আলোকে ছবির নীচেকার সাদা জমীর উপর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের সেই চারি ছত্র লেখা ঝকঝক করিতেছিল—

'জীবনের সাথী মোর—পথের মাঝে,
ছাড়িয়া গিয়াছে হায়—আঁধার সাঁঝে!
দেহ আছে—প্রাণ নাই—শূন্য ধরা!
কোথা তুমি—কোথা তুমি—চিত্ত-হরা!'

২

শুভ-বিবাহ

পরের রবিবার গিরীশ নেবুবাগানের সেই মেয়েটিকে দেখিতে আসিয়া, ঠিকানার কাগজে লিখিত নম্বরটি বারবার মিলাইয়া, যে ভগ্ন জীর্ণ বাড়ীখানির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা আদিকালে, যখন সেখানে সত্যই হয় ত কোনো লেবুর বাগানের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল, তখনকার সৃষ্টি। লেবুর সেই লুপ্ত বাগানের পথানুসরণ করিবার জন্যই যেন আজ সেই পূর্ব্ব যুগের জীর্ণ গৃহখানি ধরাবক্ষে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল।

অপরাহ্ন সময়ে বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া গিরীশ যখন তন্মধ্যে মনুষ্য-সমাগম আছে কি না, সন্দিহান

চিত্তে চিন্তা করিতেছিল, তখন, সেই বাটীখানিরই মত জরাজীর্ণ বাটীর মালিকটী তাহার শীর্ণ হস্তে হুঁকা ধরিয়া তামাক টানিতে টানিতে সেইখানে আসিল এবং সম্মুখে গিরীশকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কাকে খোঁজেন আপনি?

এইটেই ছত্রিশ নম্বর ত?—মধু মুখো—

হ্যাঁ, আমারই নাম। কি আবশ্যক?

'আপনার একটি বিবাহ-যোগ্যা কন্যা—

কন্যা নয়—আমার ভাগিনেয়ী,—হ্যাঁ, আছে বটে, আপনি একবার দেখতে চান মেয়েটি? মশায়ের নিবাস?

আমার নিবাস শিবপুর। আমি হাওড়া কোর্টে ওকালতী করি।

বেশ বেশ! আসুন তা হলে, বলিয়া মধু মুখোপাধ্যায় বাটীর মধ্যে অগ্রসর হইতে হইতে বলিতে লাগিল,—আমার নিজের ছেলে মেয়ে কিছুই নেই। ভগ্নীপতিটি দেশে সামান্য স্কুল-মাষ্টারী করে। দু দুটো মেয়ে গলায়, তাই এটার ভার আমিই নিয়েছি। অবশ্য, আমারও অবস্থা তথৈবচ, বাড়ী দেখেই বুঝতে পেরেছেন বোধ হয় অনেকটা, শোকে তাপে, রোগে ভোগে শরীরের অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছেন।

চলিতে চলিতে গিরীশ কহিল,—জগতে ভাল আর ভগবান কাকেও—

বলেন কেন আর! ত্রিশ বছর চাকুরী করে,—এমনই বরাত—যে, পূরো পেনসেনটাও পেলুম না! চল্লিশটি করে টাকা পাই, তা তাতে আর এ বাজারে —বুঝতেই ত পাচ্ছেন সব! আজকাল মেয়ের বিয়ের যা ব্যাপার হয়ে উঠেছে, তাতে আর গরীবের পক্ষে—! তবে, আমার সীতা সাবিত্রী—এই আমার ভাগিনী দুটি—রূপে গুণে এ রকমটি আজকাল বড় একটা আর দেখা যায় না! সত্যই মা রা আমার যেন সাক্ষাৎ সীতা—সাবিত্রী!

অন্দরের দালানে আসিয়া বসিয়া গিরীশ কহিল যে, কন্যাকে সাজাইবার গোছাইবার কোন আবশ্যক নাই, শুধু যেন একখানি পরিষ্কার কাপড় পরাইয়াই দেখান হয়! সুতরাং সে সব ব্যবস্থা আর করা হইল না! শুধু, মুখখানি প্রথমে শুকনা ও পরে ভিজা গামছা দিয়া বেশ করিয়া মুছাইয়া দিয়া, কপালে খয়েরের একটি টিপ পরান হইল এবং চুলে একটু চিরুণী দিয়া, একখানি গুজরাটি ছাপা সাড়ী পরাইয়া দিয়া, কন্যাকে গিরীশের নিকটে আনা হইল।

গিরীশ শুনিয়াছিল বটে যে, মেয়েটি না কি খুবই রূপসী, কিন্তু সে রূপ যে এমন, তাহা সে ধারণাও করিতে পারে নাই! গিরীশ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

শুধু চাহিয়া থাকাও যেমন চলে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও তেমনই ভাল দেখায় না! সুতরাং গিরীশ জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার নাম কি?

মেয়েটি নতমুখে উত্তর দিল,—সীতা।

মাতুল কহিলেন,—ভাল করে পুরো নাম বলতে হয়, মা!

মেয়েটি পুনরায় কহিল,—শ্রীমতী সীতা দেবী!

লিখতে পড়তে পার?

সীতা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, পারে!

রান্নার কাজ, কি সেলাই টেলাই—

ভাগিনেয়ীর হইয়া মাতুলই জবাব দিল, কহিল সব—সব—মা আমার রান্না বান্না, সেলাই বোনা, সবেতেই পাকা; আমার এখানে ও-ই ত সংসারের যাবতীয় কাজ করে। সীতা আমার সত্যই সেই ত্রেতার সীতা। সে সীতার যদিও কোন দোষ খুঁত থেকে থাকে ত আমার এ সীতার কোন দিকে কোন খুঁতই নেই। তবে মশাই, ওই যে আজকাল মেয়েদের সব নাচ—গান—য়্যাকটিং শেখান হয়েছে, সে সব কিছু জানে না। সত্যি কথা বলতে কি, ও গুলো সব আমরা মোটেই পছন্দ করি না। গান পর্য্যন্ত না হয় চলতে পারে, কিন্তু নাচ, য়্যাকটিং —এ সব কি ব্যাপার বলুন দেখি? মেয়ে কি থিয়েটারে চাকরী করবে? তার পর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাগিনেয়ীকে যাইতে আদেশ করিয়া, কহিল, তা হলে, মেয়ে কি আপনার পছন্দ হল?

গিরীশ কহিল—পছন্দ ত হবারই কথা। এখন—

তা হলে পাত্রটি আপনার কে?

মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া গিরীশ কহিল, পাত্র আমি নিজেই। ছ মাস হল আমার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। অবশ্য দোজবরে বলে যদি কোন আপত্তি না থাকে আপনাদের, তা হলে—

না না, আমাদের কোনই আপত্য নেই। আর আপনি ত দেখছি একেবারেই ছেলেমানুষ। দোজবরে হলে কি হবে? এক বরেরও বয়েস আপনার হয় নি। বেশ বেশ, সীতা আমার তা

হলে ঠিক রামচন্দ্রেরই হাতে পড়বে। ভাগ্য—ভাগ্য—ওরই ভাগ্য।

সেই দিনই সেইখানে বসিয়া মধু মুখোপাধ্যায়ের সহিত গিরীশের সকল কথাই পাকা হইয়া গেল। স্থির হইল যে, এই মাসেই, অর্থাৎ অগ্রহায়ণের মধ্যেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে। তবে কোন বিশেষ কারণে কয়েক মাস এই বিবাহের কথা অপ্রকাশ রাখিতে হইবে। ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া গিরীশ কহিল, কি জানেন ব্যাপারটা? বাড়ীতে এক বুড়ো পিসিমা আছেন। তিনি এক যায়গায় একটি মেয়ে দেখে পছন্দ করেছেন। তাঁর ঝোঁক —সেইখানেই বিয়ে করি, সেই জন্যে—বুঝলেন না?

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডান হাত হইতে বাঁ হাতে হুঁকাটি ধরিয়া কহিল, সে ত ঠিক কথা। টপ করে তাঁর মনে ব্যথা দেওয়াটা—তা, এ মেয়ে ঘরে পেলে আর রাগ দুঃখু টেঁকতে পারবে না। তা বেশ বেশ, এখন না হয় মাস পাঁচ সাত প্রকাশ নাই হল। তার পর হুঁকাটি দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া রাখিতে রাখিতে কহিল, যাক, একেই বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, নইলে, কত যায়গা থেকেই ত সম্বন্ধ আসছে, কিন্তু কোথা থেকে এক দিনের মধ্যেই সব একেবারে পাকাপাকি। হবার হলে এই রকমই হয় আর কি।

গিরীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তা হলে ভটচায্যি মশাইকে দিয়ে দিনটা আর একবার ভাল করে দেখিয়ে কালই আপনাকে সংবাদ পাঠাবো। এখন উঠলুম আমি। সালকের জনকতক বড় বড় মক্কেলের আজ যাবার কথা আছে, তাদেরই জন্যে—

যাবেই ত বাবাজী। তোমার নাম ত আর অজানা নেই। হাওড়া কোর্টের কত বড় এক জন উকীল তুমি! দেখ বাবাজী, শুভকাজ আগে মিটে যাক, তার পর তোমায় একটু খাটতে হবে। ছটাক দুতিন জমী আমার ঐ খিড়কীর বাইরে, সে আমারই জমী দলীলে স্পষ্ট লেখা, তা ঐ কুণ্ডুরা জোর করে সেটা দখল—আচ্ছা, সে তখন পরে হবে। আচ্ছা,এস বাবাজী। থাক থাক আর পায়ের ধূলো নিতে হবে না।

গিরীশ চলিয়া গেল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সীতাকে ডাকিয়া কহিল, মা, আজ আফিংটা যেন তেমন ধরলো না: কৌটোটা একবার দে ত মা, আর একটু চড়িয়ে দিই আজ।

পরদিন গিরীশ, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দিয়া পাঁজি দেখাইয়া সংবাদ দিল যে, ২৪শে তারিখেই বিবাহ হইবে, সেই দিনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সুতরাং সেই ২৪শে অগ্রহায়ণ বুধবার অষ্টমী তিথিতে রাত্রি সাড়ে নয়টার লগ্নে গিরীশ সীতার পাণিগ্রহণ করিয়া, তাহার শূন্য প্রাণ পূর্ণ করিয়া, আঁধার পথে আলো জ্বালিল এবং কিছু পরেই স্ত্রী-আচারের সময় কে একজন রমণী যখন তাহার দুই হাত এক করিয়া ধরিয়া কহিল,—

'কড়ি দিয়ে কিনলুম
দড়ি দিয়ে বাঁধলুম।
হাতে দিলুম মাকু
একবার ভ্যা কর ত বাপু।'

তখন আনন্দ-আবেগে গিরীশ সত্যই ভ্যা করিয়া ফেলিল!

ঠিক সেই সময় শিবপুরে শিরীষ ও কিরণ মিত্তির, প্রতিবাসী মতি ঘোষালের কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়া কাহার একটা হাসির কথায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

৩

সেই—গিরীশ

পৌষ মাস। বড়দিনের ছুটীতে আফিস আদালত সব বন্ধ। ছুটী হইতেই, দিন চারি পাঁচ গিরীশ বাড়ী ছিল না। জামতাড়া, না মিহিজাম—কোথায় ঐ দিকে মক্কেলের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল, আজ ফিরিয়াছে। শিরীষ কিন্তু ইহারই মধ্যে এক দিন না কি ট্রামে আসিতে আসিতে গিরীশকে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। গিরীশ কহিল, তুই একটা আস্ত গাধা। চোখের মাথাটাও খেতে বাকি রাখিস নি। চশমা নে—চশমা নে।

পরদিন প্রাতঃকালে গোয়ালা দুধ দিতে আসিয়া পিসিমার নিকট অনেক করিয়া একটি টাকা চাহিল, তাহার হঠাৎ কি বিশেষ দরকার। গিরীশ গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, শিরীষও বাড়ী ছিল না, প্রসন্নময়ীর নিজের কাছেও টাকা কড়ি কিছু ছিল না। তবুও দাসু গোয়ালার পীড়াপীড়ি দেখিয়া প্রসন্নময়ী গিরীশের চাপকানের পকেট খুঁজিতে আসিয়া দেখিলেন যে, গিরীশের পোর্টম্যাণ্টের চাবিটি তাহাতেই লাগান রহিয়াছে।

সুতরাং প্রসন্নময়ী পোর্টম্যাণ্ট খুলিয়া মণিব্যাগ হইতে টাকা একটি লইয়া দাস্থ গোয়ালাকে দিয়া দিলেন।

দ্বিপ্রহরে গিরীশ আহারে বসিলে, পার্শ্বে বসিয়া প্রসন্নময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ রে গিরীশ, ও মেয়েটি কাদের রে? ঐ যে ফটোগেরাবের ছবিখানা রয়েছে তোর পোর্টম্যাণ্টের ভেতর?

গিরীশ চমকিত নয়নে প্রসন্নময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি দেখলে কি করে?

ঐ যে দেসো গয়লা একটা টাকার জন্যে এসে হত্যা দিয়ে পড়ল না সকালে? তুই তখন গঙ্গাস্নানে গিয়িছিলি, তোর চাপকানের পকেট খুঁজলুম, পেলুম না। তার পর দেখি, তোর পোর্টম্যাণ্ট খোলা রয়েছে, তাই দেখলুম। দিব্বি মেয়েটি। কাদের বল দেখি? সুন্দরী বটে! ঐ রকম একটি আমার শিরীষের জন্যে—

বাধা দিয়া গিরীশ কহিল, ঐ ওদেরই ত বড় মামলা চলছে। কোর্ট খুললেই ত সামনেই দিন। নিজের শরীরটাও খারাপ হয়ে পড়ল। কেস ফিরিয়ে দিলেও লোকে ছাড়বে না। মহা মুস্কিল।

প্রসন্নময়ী গিরীশের মুখে হঠাৎ তাহার এই শরীর খারাপের কথা শুনিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে প্রশ্ন করিলেন, শরীর খারাপ কি রে? ভেতর ভেতর কোন অসুখ বিসুখ হয়েছে না কি তোর?

শরীরে আর যেন তেমন জুত নেই আর কি। ক্ষিদে হয় না—ঘুম হয় না, অসুখ হতে আর কতক্ষণ বল?

তবে ডাক্তার দেখিয়ে একটা ভাল দেখে ওষুধ টষুধ খা বাছা।

গিরীশ আচমন করিয়া উঠিতে উঠিতে কহিল,—পোর্টম্যাণ্ট খুলতে গেলে কেন? চাপকানের পকেটে যখন পেলে না, কোটের পকেট দেখলেই পারতে, খুচরো টাকা ছিল।

সেই দিন সন্ধ্যার পর গিরীশ বৈঠকখানায় বসিয়া সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছিল। সঙ্গীতের চর্চ্চা গিরীশ পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যহই করিত। পত্নী বিয়োগের পর হইতে কয় মাস গিরীশ এই জিনিষটা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিল। তাহার হার্মো-নিয়মের বাক্সের চারিদিকে মাকড়সায় বুনিয়াছিল। এত দিন পরে আজ মাসখানেক হইতে গিরীশ আবার তাহার হার্মোনিয়ম ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া বাহির করিয়াছে।

গিরীশ গাহিতেছিল—

'আমার আঁধার প্রাণের আলো,
তোমার স্বর্ণ-প্রদীপ জ্বালো,
আমার সকল কামনা সার্থক কর তোমারি পুণ্য পরশে!'

কিরণ মিত্তির তাহার তিন বৎসরের শিশুকন্যাটিকে কোলে করিয়া আনিয়া বলিল,——গলাখানি করেছিলে বটে, দাদা! পায়চারী কত্তে কত্তে খুকীটাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা কচ্ছিলুম, কিন্তু তোমার গান শুনতে পেয়ে' না এসে আর পারলুম না! বাস্তবিক, ঐ যে লোকে বলে—ন চ সঙ্গীতাৎ বিদ্যা পরা—তা সে কথা একেবারেই ঠিক! বনের পশুও—! দেখ গিরীশদা, সে দিন তোমার বাইমণি চক্কোত্তির গান শুনলুম! আ হা হা, কি গানই গাইলে! রাইমণি চক্কোত্তির গান তুমি শুনেছ কখন, গিরীশদা?

নেবুবাগানের রাইমণি চক্কোত্তি? যথেষ্ট। তার বাড়ীর একেবারে গায়েই ত গিয়ে হল—

কি গিরীশদা?

বলছি, তাব বাড়ীর একেবারে গায়েই ত আমার সেই ময়মনসিংহের মক্কেলদের বাড়ী! রাইমণির গান শুনতে কি আর আমার বাকী আছে? তাহার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—এত রাত পর্য্যন্ত খুকী ঘুমোয় নি, জেগে রয়েছে?

আরে দাদা, ঘুম পাড়ালে ত ঘুমুবে! কে আর ঘুম পাড়াবে বল? আমার এদিককার কাজ কর্ম্ম না সারা হলে ত আর ওকে আমি নিতে পারি না! এদিকে, ও না ঘুমুলে কোন কর্ম্মই হয় না। ভগবান যে কি—

আরে, তুমি বিয়ে কচ্ছ না কেন? এই রকম করে কখন চলতে পারে?

চলে ত যাচ্ছে এক রকম করে গিরীশদা, এই রকম করেই চলে যাবে!

আরে না—না, ক্ষেপেছ তুমি, কিরণ? বিয়ে না করলে কি চলে? তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি বড় কম। এই ভাবে তুমি কদ্দিন চালাবে? ঘর কত্তে গেলেই ঘরণীর দরকার। জান ত—ন গৃহং গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

বিয়ে কত্তে ত অনেকেই বলছিল। তা করিনি যখন, তখন আর করবো না। তুমিই ত গিরীশদা, অত করে যখন বললে—

আমি অত করে কি বললুম?

বিয়ে না করতে।

তুমি একটা আস্ত পাগল, কিরণ। আমি যে কি ভাবে বলেছিলুম, তা তুমি বুঝতেই পারনি। তোমার নিজের বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তাই দেখছিলুম। পাঁচ জনে যা বলবে, তাই তুমি করবে? তোমার নিজের একটা বোঝবার ক্ষমতা নেই? এই সব কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে, তুমি বেটা-ছেলে,—এ কি কখন হয়? বিয়ে কর, বিয়ে কর, কিরণ,—আর দেরী কোরো না।

তুমি?

আমি কি?

বিয়ে করবে না?

নিশ্চয়ই করতে হবে। যে যাবার, সে ত চলে গেল। তার মুখ চেয়ে, কবিত্ব নিয়ে তুমি যে থাকবে, বলি, সংসারের কাজ কর্ম্মগুলো সে ত আর এসে তোমায় করে দিয়ে যাবে না। বিয়ে না—করাটা শুধুই যে কেবল অসুবিধের, তা নয়—অপরাধেরও। শাস্ত্র হিসেবে এতে পাপও আছে।

অসুবিধেই হোক আর অপরাধই হোক, যখন করিনি, তখন আর করবো না, গিরীশদা। তোমার সেই কথাটা আমার খালি মনে হয় যে, ভগবান যখন এক জনকে টেনেই নিলেন, তখন মানুষে কোন্ সাহসে আবার বাহাদুরী করে সেই যায়গায় আর একজনকে টেনে আনে।—যাক, তুমি আর একখানি গাও দাদা, শুনে যাই, মেয়েটার চোখ এইবার ছোট হয়ে এসেছে।

গিরীশ গান ধরিল,—

'এস এস চির বাঞ্ছিত, মম কুটীর-দুয়ার খুলি।
দিকে দিকে মোর আঁধার নাশ গো—
প্রেম-দীপখানি জ্বালি।'

৪

শিরীষের কাণ্ড

অক্ষুধা ও অনিদ্রাজনিত দুর্ব্বলতা গিরীশের দিন দিন বাড়িতে লাগিল। প্রসন্নময়ী জোর করিয়া কলিকাতা হইতে মকরধ্বজ আনাইয়াছিলেন, তাহাই মাখন মিছরী দিয়া হপ্তা দুই তিন গিরীশকে খাইতে দিলেন। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু উপকার না হওয়াতে ফাল্গুনের প্রারম্ভেই বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিরীশ ঘাটশিলায় চলিয়া গেল।

গিরীশ চলিয়া যাইবার দিন চার পাঁচ পরে এক দিন সকাল সকাল স্নান করিয়া শিরীষ খাইতে বসিল। প্রসন্নময়ী আসিয়া সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁ রে, এই তিন সকালে খেয়ে কোথায় যাবি বাবা?

শিরীষ কহিল,—বর্দ্ধমান যাব পিসিমা, রমেশদের বাড়ী—তাদের পুকুরে মাছ ধরতে; আজ কিন্তু আর ফিরছি না—ফিরতে সেই কাল।

এই ত সেদিন কোথায় মাছ ধরতে গিয়েছিলি? আবার চল্লি বর্দ্ধমান? কি যে সখ বাবা তোদের।

সখ হবে না? চুপটি করে ঘরে বসে কি করব?

তা ঠিক! এত বড় ছেলে হল, তা এমনি ভাই যে, বিয়ে দেবার নামটি নেই। দিন কতক একটু গা করেছিল, তার পর একেবারেই চুপ চাপ। নিজেও সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে, ভাইটাকেও তাই করবার মতলব!

বিয়ে হয়ে আর কি হবে, পিসিমা?

তাই বই কি রে ছোঁড়া! দাদার ভাই কি না। থাকিস চিরকাল আইবুড়ো হয়ে।

তাই মনে করছি থাকবো পিসিমা,—বিয়ে কি?—ছিঃ!

ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখে প্রসন্নময়ী কহিলেন,—দেখ, জ্বালাস নি বলছি।

তা—দুধ দেবে কি না বল, না উঠে যাব?

প্রসন্নময়ী দুধ আনিতে উঠিয়া গেলেন।

* * * *

বেলা প্রায় একটার সময় শিরীষ তাহার বন্ধুর বাটীতে আসিয়া পৌঁছিল। বন্ধুর বাটী বর্দ্ধমান নহে—বর্দ্ধমান জেলায় বটে। মেমারী ষ্টেশনে নামিয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ হাঁটিয়া যাইতে হয়। শিরীষের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রমেশ মাছ ধরিবার সমস্ত আয়োজনই ঠিক করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল।

ফাল্গুনের অবশিষ্ট বেলাটুকু দুই বন্ধুতে পুকুরধারে কাটাইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বৈঠকখানার রোয়াকে বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল।

খানিক পরে দুই হাতে দুই কাপ চা লইয়া বাটীর ভিতর হইতে রমেশ বাহিরে আসিয়া কহিল,—শিরীষ, মাছের চারে বৌ এসে হাজির।

শিরীষ তাহার হাত হইতে একটি পেয়ালা নিজের হাতে লইয়া কহিল,—কি রকম ?

রকম হচ্ছে যে,—মা তোর কনে ঠিক করে ফেলেছে, এখানে তোর ফুল ফুটেছে—বিয়ে হবে !

সত্যি ?

সত্যি।

তুই তা হলে বরযাত্রী না কন্যাযাত্রী হবি ?

ঠাট্টা নয়—মা তোকে চা খেয়ে বাড়ীর ভেতর যেতে বল্লে।

রমেশের জননী শিরীষকে অনেক দিন হইতেই জানিতেন। শিরীষ ইহার আগে এ বাটীতে বহুবারই আসিয়াছে। সুতরাং কিছু পরে যখন সত্যই ভিতর হইতে তাহার ডাক আসিল, তখন শিরীষ বাড়ীর ভিতর আসিয়া কহিল, ডাকছেন জ্যেঠাইমা ?

হ্যাঁ বাবা, বোস। বলিয়া রমেশের জননী কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই কহিলেন, একটি চমৎকার মেয়ে এখানে আছে, বড় গরীব তারা, সেইটিকে তোকে বিয়ে কত্তে হবে। আমাদের ঘরে যে মেলে না, নইলে আমি রমেশের সঙ্গেই দিতুম।

শিরীষ লাফাইয়া উঠিয়া কহিল,—কি বলছেন জ্যেঠাইমা ? বিয়ে ? আমি ? এখন ?

হ্যাঁ,—বিয়ে, তুমি, এখন। তোর ও সব চালাকী তোর এ জ্যেঠাইমার কাছে খাটবে না, বাবা। এ তোকে করতেই হবে। কেন না, মেয়েটিকে আমরা বড্ডই ভালবাসি। আমার নিজের পেটের মেয়ে না হলেও তাকে আমি পেটের মেয়ের মতই ভালবাসি।

সেই জন্যেই কি আমাকে বিয়ে করতে হবে, জ্যেঠাইমা ?

হ্যাঁ, সেই জন্যেই তোকে বিয়ে করতে হবে। নইলে, এমন সোনার প্রতিমে মেয়ে হয় ত কোন একটা লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরের হাতে পড়বে ! হয় ত কি ? সে ত ঠিকই পড়বে। কেন না, সামান্য মাষ্টারী করে সংসার চালায়, একটি পয়সা ব্যয় করবার ত আর ক্ষমতা নেই, তা, ভাল ছেলে কোথায় পাবে ? তোর কথা আমি অনেক দিন থেকেই মনে করে রেখেছি। জ্যেঠাইমার এই কথাটি তোকে রাখতেই হবে, বাবা।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন শিরীষ একটু ভাবিতে লাগিল, তার পর জ্যেঠাইমায়ের দিকে মুখ তুলিয়া কহিল, সত্যি বলছেন জ্যেঠাইমা ?

সত্যিই বলছি, বাবা। ব্রাহ্মণের এ দায় থেকে তোকেই বাঁচাতে হবে। মাছধরার নাম করে, রমেশকে দিয়ে এই জন্যেই তোকে আজ এখানে আনিয়েছি।

কিন্তু জ্যেঠাইমা, দাদা রয়েছেন, তাঁকে তা হলে ত বলতে হয়।

না বাবা। অত সোজাভাবে এ কাজ হবে না। দাদাকে বল্লে এ বিয়ে কিছুতেই হতে দেবে না। কেন না, এম-এ পাশ করিয়ে বিনা পয়সায় তোর দাদা কোথাও তোর বিয়ে দেবে না, সে আমি জানি। তোরা আজকালকার ছেলে, তোরাই এ কাজ পারবি, বাবা। চিরকালের স্রোতকে তোরাই ফেরাতে পারিস, হয় ত ভবিষ্যতে তোরাই ফিরিয়ে দিবি।

কিন্তু জ্যেঠাইমা—

শিরীষের হাতখানা ধরিয়া রমেশের জননী কহিলেন,—তোর কোন কিন্তুই আমি শুনবো না। আয়, দেখবি আয়, বলিয়া শিরীষের হাত ধরিয়া টানিয়া দালানের মধ্যে আনিয়া কহিলেন, দেখ দেখি, সোনার প্রিতিমে কি না ?

শিরীষের মুখে কোন কথাই ফুটিল না। দেখিল, একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে লজ্জায় একেবারে জড়সড় হইয়া দালানের দেওয়াল ধরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

রমেশের মা কহিলেন, এ রকম সুন্দরী মেয়ে এর আগে তুই কোথাও দেখিছিস, বাবা ? সত্যি বলবি।

শিরীষ তেমনই নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রমেশের মা কহিলেন,—বাইরের রূপ যেমন দেখ্‌ছিস, ভেতরের রূপ তারও বেশী।

তাহার পর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রমেশ, তাহার মাতা ও শিরীষ তিন জনে মিলিয়া অনেক কথা, অনেক পরামর্শ হইল এবং শেষে ইহাই স্থির হইল যে, এই ফাল্গুনেরই ২৪শে তারিখে যে দিন আছে, সেই দিনেই গোপনে শিরীষ এখানে আসিয়া শুভকাজ শেষ করিবে। তার পর দুই চারি মাস পরে সমস্ত কথাটা বাটীতে প্রকাশ করিবে।

পরদিন শিরীষ শিবপুর চলিয়া আসিল এবং ২৩শে ফাল্গুন আহারাদি করিয়া শিরীষ প্রসন্নময়ীকে বলিল যে, তাহারা কয় বন্ধু মিলিয়া বেড়াইতে যাইতেছে।

প্রসন্নময়ীর জিজ্ঞাসার উত্তরে শিরীষ কহিল,—প্রথমে তাহারা ভুবনেশ্বর যাইবে এবং তাহার পর পুরী দর্শন। সুতরাং ফিরিতে তাহার হপ্তাখানেক লাগিবে।

তাহার পর ২৪শে ফাল্গুনের শুভদিনে—শুভ গোধূলি লগ্নে, শিরীষ যে পুরী দর্শন করিল, তাহা জগন্নাথের পুরী না হইলেও, তাহা মথুরাপুরী অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ী।

—

৫

দুই ভাই

এক দিন চৈত্রশেষের অপরাহ্ণে গিরীশ তাহার ভগ্নস্বাস্থ্য জোড়া লাগাইয়া, দুর্ব্বলতার স্থানে সবলতা অর্জ্জন করিয়া ঘাটশিলা হইতে গৃহে ফিরিল। আসিয়া প্রসন্নময়ীকে কহিল যে, ঘাটশিলার এক ধনী শাল কাঠের কারবারীর মেয়ের সঙ্গে শিরীষের বিবাহের সকল ব্যবস্থাই সে করিয়া আসিয়াছে। মেয়েটি দেখিতে শুনিতে ভালই, পাঁচ হাজার টাকা নগদ পাওয়া যাইবে। ঘাটশিলায় বাড়ী, কলিকাতায় বাড়ী। দেশে বিষয় আশয়—পুকুর, বাগান।

প্রসন্নময়ী প্রসন্নচিত্তে কহিলেন,—মেয়েটি কত বড় হবে বল্ দেখি?

তা তের চোদ্দ বছরের হবে। বেশ মোটা সোটা বাড়ন্ত গড়ন, তবে সেখানকার জলে রং একটু ময়লা হয়, এখানে থাকলে আবার ঐ রংই বেশ ফুটবে।

প্রসন্নময়ী কহিলেন,—তা হলে শিরীষ না হয় এক দিন গিয়ে নিজে দেখে আসুক,—ওর একবার দেখে আসা ভাল, কেন না, আজকালকার ছেলে,—কি বলিস তুই?

তা বেশ ত, আসছে হপ্তায় এক দিন গিয়ে ও দেখে আসুক। তার পর পাকা দেখার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু বোশেখ মাসের ভেতরই কাজ সারতে হবে! তারা অনেক করে বলে দিয়েছে।

ইহারই দিন তিন চারি পরে প্রসন্নময়ী শিরীষকে ডাকিয়া কহিলেন—আজ দিন ভাল আছে—আজই যাত্রা কর! মেয়েটিকে একবার দেখে আয় তা হলে, বাবা! ও বাড়ীর মতিলালকে বলে রেখেছি, সে সঙ্গে যাবে এখন!

শিরীষ বিরক্তির সহিত কহিল,—হ্যাঃ, ও সব আমি কোথাও যেতে টেতে পারব না!

যেতে টেতে পারব না কি রে? গিরীশ যে যেতে বলছে তোকে!

তেমনই বিরক্তির স্বরে শিরীষ কহিল,—বললে কি হবে, আমি মরছি অসুখের জ্বালায়!

তোর আবার হল কি?

হল কি!—দেখ্‌তে পাচ্ছ না—চেহারা কি রকম হয়ে যাচ্ছে!

কেন রে শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে, চেহারা ত ভালই আছে, বাবা! ওসব অলুক্ষণে কথা বলিস নি ক!

না, বলবো না, লিভার গুটিয়ে যাচ্ছে যে!

লিভার গুটিয়ে যাচ্ছে? তা, এ কথা বলতে নেই এক দিনও?

রাত্রে প্রসন্নময়ী গিরীশের কাছে আসিয়া শিরীষের কথা বলিয়া কহিলেন, বিয়ে টিয়ে এখন বন্ধ রেখে, ওর চিকিৎসা করবার একটা বন্দোবস্ত কর, বাবা! আগে ছেলে আমার বাঁচুক, তারপর বিয়ে! সত্যিই শিরীষের আমার চেহারাটা যেন আগেকার চেয়ে খারাপই হয়েছে—তেমন রং যেন ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে!

গিরীশ শিরীষকে ডাকিয়া কহিল, কি হয়েছে রে তোর?

শিরীষ কহিল, কি আর হবে, লিভার ফংশন খারাপ হয়ে গেছে, ম্যারাসমাস অফ দি লিভার!

গিরীশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর কহিল, তাহলে প্রাণেশকে কাল একবার ডাকিয়ে ভাল করে দেখিয়ে শুনিয়ে, ওষুধ খেতে আরম্ভ কর!

শিরীষ কহিল, খুব ভাল লোককেই দেখিয়ে ওষুধ খাচ্ছি আমি,—লিভারেরই স্পেশালিষ্ট! আগে শ্যামবাজারে থাকতেন, এখন রিটায়ার্ড হয়ে বর্দ্ধমানে থাকেন।

সুতরাং শিরীষের বিবাহ স্থগিতই রহিল। শিরীষ তাহার বর্দ্ধমানের স্পেশ্যালিষ্টের কাছে সপ্তাহে সপ্তাহে হাজিরা দিতে লাগিল, আর গিরীশেরও যে ঝোঁক কখনই ছিল না, সেই থিয়েটার দেখিবার ঝোঁক হঠাৎ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, কোন শনিবারই আর গিরীশের থিয়েটার দেখা বাদ পড়িতে লাগিল না।

এই ভাবে সারা বৈশাখ কাটিয়া গিয়া জ্যৈষ্ঠমাস আসিল। ষষ্ঠীবাটার পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণকালে গিরীশ

সকাল সকাল কোর্ট হইতে বাটী ফিরিয়া আসিল এবং আদালতের ধড়া চূড়া ছাড়িয়া মনোহর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শিরীষের ঘরে আসিয়া দেখিল যে, শিরীষও বেশভূষায় ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় যাবি রে ?

শিরীষ রুমালে সেণ্ট ঢালিতে ঢালিতে কহিল, হুগলী! সাহিত্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে। আপনি কোথায় যাবেন, দাদা ?

আমি একবার যাব জামতাড়ার সেই মক্কেলদের বাড়ী। অনেকগুলো টাকা রয়েছে পাওনা, চিঠি লিখে আর আদায় হয় না দেখছি। কাল পরশু ছুটী আছে দুদিন। যাই একবার, যদি কিছু আদায় হয়।

শিরীষ কহিল, আমাকেও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি করেছে, না গেলে চলবেই না, যাই একবার।

* * *

মেমারী ষ্টেশনে নামিয়া শিরীষ যখন শ্বশুরালয়ে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শ্বশুর মাখন বাবু কহিলেন, এসেছ বাবা, যাও, বাড়ীর ভেতর যাও। বড় জামাইও আসবে। হয় ত পরের ট্রেণেই আসছে। এখানে কখন ত আসে নি বাবাজী আমার। একটু এগিয়ে দেখি একবার। তুমি যাও বাবা, জামা কাপড় ছেড়ে একটু ঠাণ্ডা হও গে।

ঘণ্টা খানেক পরে শিরীষ জলখাবার ও চা খাইয়া বাহিরে আসিতেছিল, মাখন বাবু ব্যস্ত হইয়া আসিয়া কহিলেন, এস বাবাজী, বড় জামাইয়ের সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় করবে এস।

দুজনের মধ্যে এর আগে ত আর দেখা হবার সুযোগই হয় নি। ওই যে বাবাজী আমার নিজেই আসছে। এস বাবা, এইটিই হল তোমার ছোট—

বড় জামাতা আসিতে আসিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই তাহার মুখ হইতে শুধু বাহির হইল,—শিরীষ।

শিরীষেরও মুখ হইতে তেমনই ভাবে উচ্চারিত হইল,—দাদা ?

সকলি গরল ভেল

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

সকলি গরল ভেল

একদিন কাল-বৈশাখীর অপবাহ্নে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রথম বাত্যা উঠিল সরকারদের গৃহ-অঙ্গনে।

ছোট ভাই রামতারণ গোয়ালের আগডের নিরেট এবং পরিপক্ক বংশদণ্ডখানা ভীম বিক্রমে উঁচাইয়া ধরিয়া বড ভাই রামতারকেব উদ্দেশে বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করিল যে, হয় সেই বংশ দ্বারা তাহার অগ্রজের মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তদ্দরুণ সে নিজে ফাঁসি যাইতে হয় যাইবে, আর নয় ত—ইত্যাদি।

নয় ত'র সূত্র টানিয়া যে ভাবে রামতারণ তাহার বক্তব্যের উপসংহার করিল, তাহাব অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় যে, নয় ত সে কলুদের নিকট হইতে আদাযী খাজনা ৪৮/৭॥ গণ্ডার অর্দ্ধেক অংশ রামতারকের নিকট হইতে কড়ায় গণ্ডায় ভাগ করিয়া লইয়া তবে ছাড়িবে। অর্থাৎ খাজনাব চুল চেরা ভাগ পাইলে আর মাথা চিরিবাব আবশ্যক হইবে না।

পাঠক-পাঠিকাগণেব সকলেই যদি জ্যোতিষ গণনায় সিদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে তদ্দারা সহজেই জানিতে পারিতেন যে, রাগের কারণটা ঠিক খাজনার ভাগ লইয়া নহে। আদি এবং অকৃত্রিম কারণ—ভুলু ঠাকুর্দ্দা।

দুই ভাই—তাবক ও তারণ এক-অন্নে না থাকিলেও, এযাবৎ ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন গোলযোগের সৃষ্টি হয নাই। উঠানে রাংচিত্রার বেড়া দিয়া, বাড়ী তুল্যাংশে ভাগ হইয়া গিয়াছিল। তবে হয় ত রাং চিত্রার ক্ষুদ্র রাঙ্গা ফুল, কোনদিন বা দুই চারিটা এদিকে বেশী ফুটে, কোনদিন বা দুই চারিটা ওদিকে বেশী ফুটে। তাহাতে ত্যাগ স্বীকার উভয় পক্ষ বরাবরই করিয়া আসিতেছে। ক্ষেত খামাব, পড়া পতিত, নগদ টাকা, তৈজসপত্র—তাহাও সব ভাগা ভাগি হইয়া গিযাছিল। ঘরের আসবাবপত্র, ঝাঁটা কুলা দা কোদাল কুড়ুল—কিছুরই ভাগবাটোয়ারা হইতে বাকী ছিল না। কুকুরটা পড়িয়াছিল তারকের দিকে, সুতরাং বিড়ালটা লইয়াছিল ছোটবৌ। টিয়া পাখীটির সম্বন্ধে কোন কিছু সুবিধা না হওয়াতে বড়বৌ তাহার খাঁচার দরজা খুলিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিয়াছিল। সুতরাং গোলযোগেব কিছুই ছিল না। সে সময় কথঞ্চিৎ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ গৃহ-দেবতা। পাড়ার পাঁচ জনে ছ মাস করিয়া ঠাকুরসেবার পালা যখন উভয়কে ভাগ কবিয়া দেয়, তখন বড়বৌ ঝঙ্কার দিয়া কহিয়াছিল—বোশেখ জষ্ঠির কাঠ-ফাটা রোদ্দুর আর আষাঢ় শ্রাবণের বর্ষার সেবা পড়লো আমাব পালায়, আর ছোট রাণীর পড়ল গিয়ে খরা শুকনো শীতকাল আর ফাগুন চোত্তের ফুর ফুরে দক্ষিণে হাওয়ার দিনে। মরে যাই আর কি। মাস ভাগের বদলে, ঠাকুরকেই ভাগ করে দেওয়া হোক। আমি লক্ষ্মীকে নোব, ও নারায়ণকে নিয়ে যাক। ছোটবৌ সমান সুরে উত্তর দিয়াছিল,—তাই হোক। কিন্তু আমার নারায়ণের চেয়ে লক্ষ্মী যতটা ভারে বেশী হবে, ততখানি আমি লক্ষ্মীর গা থেকে—বাকীটুকু আর ছোটবৌর মুখ ফুটিয়া বলিবার ভরসা হয় নাই। রাগের মাথায় দেবতার সম্বন্ধে যেটুকু সে বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারই জন্য তিন দিন ধরিয়া তাহার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। অবশ্য ব্যাপারটা পরে মিটমাট হইয়াই গিয়াছিল। সুতরাং ইহাদের মধ্যে নূতন করিয়া গোলযোগের কিছুই ছিল না। কলুদের জমিটা ইহাদের কাহারও নহে, স্বর্গীয় প্রিয ঘোষালেব দেবোত্তর সম্পত্তি। কি একটা ফিকির-ফন্দি করিয়া গত বৎসর তারক ইহা হস্তগত করিয়াছে এবং তাহারই খাজনা ৪৮/৭॥ উপলক্ষে তারকের অন্যকাব এই হয়-ত এবং নয়-ত'র আস্ফালন।

উপলক্ষের কথা ছাড়িয়া লক্ষ্যের কথা বলিতে গেলে ভুলু ঠাকুর্দ্দার কথাটাই সর্ব্বাগ্রে বলিতে হয়।

ভুলু ঠাকুর্দ্দা—অর্থাৎ ভোলানাথ সরকার। ইহাদের জ্ঞাতি-ঠাকুর্দ্দা। বহুকাল যাবৎ তিনি গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন এবং বহু বৎসর যাবৎ মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া

আসিয়াছেন। বৎসর দশ বার হইল স্ত্রী গত হইয়াছেন। সংসারে দ্বিতীয় আর কেহ ছিল না। সুতরাং তিনি নিজে এবং তাঁহার আজীবনের সঞ্চিত অর্থের সিন্দুকটি লইয়া তাঁহার বহুদিন-পরিত্যক্ত ভবনে ফিরিয়া আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বহু বৎসরের অবসরে গৃহের সকল ঘরগুলাই সংস্কারাভাবে ভূমিসাৎ হইয়াছিল। তাহারই একখানাকে কোন রকমে বাসোপযোগী করিয়া লইয়া, তিনি মাস তিন চার হইল বাস করিতেছেন। তাঁহার আহারাদি, পরিচর্য্যা, সেবা-শুশ্রূষার ভার লইয়াছে তারক।

ঠাকুর্দ্দার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধে গাঁয়ের লোকে নানারকম কথা বলিয়া থাকে। কেহ বলে—এক লাখ, কেহ বলে—পঞ্চাশ হাজার। ভুলু ঠাকুর্দ্দা নিজে মৃদু মৃদু হাসিয়া বলেন—ওরে বাপু, অত টাকা থাকবে কোথা থেকে। হাজার আট দশ টাকা আমার পুঁজি। তাই, ব্যাঙ্কে ফ্যাঙ্কে আর রাখি না, কবে ফেল মেরে এই বৃদ্ধ বয়সে আমায় পথে বসাবে। এখন এই মরণকালে যে আমায় দুটি তৈরী ভাত দেবে, দেখবে শুনবে, সেবা যত্ন করবে, তাকেই আমার ঐ যা কিছু আছে দিয়ে যাব। তা তারক ভাই আমায় যে রকম সুখে স্বচ্ছন্দে রেখেচে, তাকেই সব দিয়ে যাব।

তারক ভাইয়ের এই অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনাই তারণ ভাইয়ের মনকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। আট দশ হাজারই যদি হয়, সেও ত বড় কম নয়। তারক হঠাৎ এত বড় একটা দাঁও পাইয়া গেল, ইহা তারণের একেবারেই অসহ্য, ছোট বৌয়ের ততোধিক। তাই সামান্য এক আধটু উপলক্ষ লইয়া দু তরফে আজকাল প্রায়ই সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সংঘর্ষটা দুই বউয়ের মধ্যেই বেশী হয়, তারণও মাঝে মাঝে গর্জ্জাইয়া আসে। কিন্তু তারক চুপ চাপ। তাহার বেশী হাঁক ডাক নাই। অদূর ভবিষ্যতে ভুলু ঠাকুর্দ্দার অর্থ প্রাপ্তির আনন্দে সে স্থির, ধীর এবং গম্ভীর।

সেদিন যৎকালে বংশদণ্ড হাতে লইয়া তারণ উঠানে তাহার রাংচিত্রা বেড়ার সীমানার ধারে আসিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল, তখন তারক ঘরের মধ্যেই ছিল। বড়বৌ আসিয়া কহিল,—কি গো, শুনতে পাচ্চ না?

তারক জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের দিকে কি দেখিতেছিল, কহিল,—পাচ্ছি বই কি।

কি পাচ্চ?

স্থির, ধীর, গম্ভীর তারকের রসিকতা করার অভ্যাস কিন্তু ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা ছিল। তারক বড় বৌয়ের প্রশ্নে কোন উত্তর না দিয়া, কৌতুক-দৃষ্টিতে শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বড়বৌ আবার জিজ্ঞাসা করিল—বল না,—কি পাচ্চ?

তেমনিভাবে চাহিয়া থাকিয়া, মুখ ও চোখের ভঙ্গীর সহিত তারক কীর্ত্তনের সুরে মৃদু মৃদু গাহিল—

> যেন, মুরলীর ধ্বনি শুনি গো—
> পায়ের নূপুর, রুণু ঝুনু ঝুনু
> তার সাথে মিশে বাজে গো॥

বড়বৌ রাগে গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেল! ওদের এত বড একটা ব্যাপারে এ পক্ষ যে এমনভাবে চুপ চাপ থাকিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া লইবে, ইহা সে কোনমতেই সহ্য করিতে পারিল না।

তারক ও তারণদের এক পাঁচিলেই ভুলু ঠাকুর্দ্দার বাড়ী। এক করিয়া অন্দরের প্রাচীরে দরজা লাগান হইয়াছে। তারকের দিকেও হইয়াছে, তারণের দিকেও হইয়াছে! সেই দরজা দিয়া বড়বৌ ঝড়ের মত ঠাকুর্দ্দার ঘরে গিয়া হাজির হইল। ঠাকুর্দ্দা তখন গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিলেন, দুই বউ তাঁহার সহিত নিঃসঙ্কোচে কথা কহিত। বড়বৌ কহিল—সব শুনলেন ত ঠাকুর্দ্দা, কি রকম হুমকীর বহর। কলুদের জমিখানা কি কারও পৈতৃক? শিবু কলুর ঐ জমিখানা কত ফিকির-ফন্দি করে গেল বছর উনি······! এ সব কাণ্ড, শুধু ছোটবৌয়ের পরামর্শে জানবেন। সংসারটাকে জ্বালিয়ে দিলে—জ্বালিয়ে দিলে! ছর ছর করিয়া পিছন হইতে তাহার মাথায় এক ঘটি জল ঢালিয়া দিয়া ছোটবৌ কহিল—জ্বালিয়ে যেমন দিয়েছি, তেমনি জল ঢেলে ঠাণ্ডা করি! মরণ আর কি! ফাঁকি যদি দিবি, হা অন্ন—যো অন্ন করে মরতে হবে! এত দর্প, এত তেজ ভগবান সইবেন না। চক্ষের নিমেষে ছোটবৌ অদৃশ্য হইয়া গেল।

খিড়কীর ঘাট হইতে বড় এক ঘটি জল হাতে করিয়া বাড়ী ঢুকিবার সময় বড়বৌকে ঝড়ের মত ঠাকুর্দ্দার ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া কখন যে ছোটবৌ সকলের অলক্ষ্যে দরজার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই।

সুতরাং সহসা ছোটবৌয়ের এই কাণ্ড দেখিয়া, ঠাকুর্দ্দা ও বড়বৌ উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত হতভম্বের মত উভয়েই নির্ব্বাক হইয়া রহিল!

খিড়কীর পুকুরের পচা জল মাথায় ঢালার অপমান বড়বৌয়ের শেলের মত বাজিয়াছিল! এ অপমান সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না! তারককে কহিল—দেখ, তুমি যদি এর কিছু বিহিত করতে না পার, ত তোমার ভাই-ভাদ্দরবৌকে নিয়ে তুমি থাক, আমাকে নারাণপুরে পাঠিয়ে দাও!

নারাণপুর—অর্থাৎ বড়বৌয়ের বাপের বাড়ী!

পরদিন সকালে তারক ভুলু ঠাকুর্দ্দাকে ঔষধ খাওয়াইয়া তাঁহার নিকট বসিয়া গল্প করিতেছিল। পাড়ার বিনু ঘোষাল, হর চক্কোত্তি এবং দত্তদের মেজকর্ত্তাও সেখানে বসিয়াছিল। ঠাকুর্দ্দা মেজকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—তুমি যা বলচ তিনকড়ি, মন্দ যুক্তি নয়। কিছু টাকা—অর্থাৎ হাজার পাঁচ সাত, গাঁয়ের মধ্যে সুদে খাটালে কিছু কিছু আসে বটে। তবে কি জান বাবা, যে রকম শরীর গতিক আজকাল বুঝতে পারছি, তাতে করে কবে একদিন শীগগিরই পটল তুলে বসবো। তখন টাকাগুলো তুলতে তারক ভাইকে আমার, বেগ পেতে হবে। তবে, তোমরা পাঁচজনে যদি পরামর্শ দাও, না হয় তাই করা যাক। কিন্তু আমি মনে করি যে, আমার ঐ সিন্দুকে যা আছে, তাতে আমার মন ভরা আছে, তারক ভাইকে কোন কষ্ট পেতে হবে না। তবে, ওকে আমি বলে রেখেছি, আর তোমাদেরও সকলের সামনে বলছি, নারাণ-পুরের বৌকে যেন আমার টাকা থেকে দুটি হাজার টাকার গয়না গড়িয়ে দেওয়া হয়।—বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখ ছল ছল করিয়া আসিল। পার্শ্বে রক্ষিত গামছা দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল—নিজের পুত্র কন্যা নেই বটে, কিন্তু থাকলেও, এই অসময়ে এমন সেবা যত্ন বোধ হয় তাদেরও দ্বারা হোত না। আশীর্ব্বাদ করি, আমার ডবল পরমায়ু নিয়ে যেন এরা দুটিতে বেঁচে থাকে।

চক্কোত্তি মশায় জিজ্ঞাসা করিল—রাত্রে কি খান?

ঠাকুর্দ্দা কহিলেন—খানকতক লুচি, একটু মিষ্টি, আর আধসের টাক দুধ। মিষ্টি আর এ পাড়া-গাঁয়ে কিই বা পাওয়া যাবে। তবু তারক ভাই হাট থেকে বায়না দিয়ে, সরেশ যা সন্দেশ আর রসগোল্লা, তাই আমার জন্য নিয়ে আসে। আমার জন্যে ও কি কম করছে? বিকেলে ডাক্তার ফল খেতে বলেচে, তা তারক সমানে কোলকাতা থেকে ভাল ভাল ফল আমার জন্যে আনাচ্চে। তাই ত বলছিলুম যে, নিজের ছেলেতেও এত করত না।

এমন সময় ভিতর দিক হইতে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হওয়াতে তারক উঠিয়া গেল ও এক হাতে একখানি জলখাবারের রেকাবী এবং আর এক হাতে এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিয়া ঠাকুর্দ্দার সম্মুখে রাখিল।

ঠাকুর্দ্দা কহিলেন—দেখ দেখি, একবার নাত বৌয়ের কাণ্ডটা! ওই অতগুলো মিষ্টি, আবার এই এতটা হালুয়া! মিষ্টির মুখে চা মিষ্টি লাগবে না বলে পাঁপরও দিয়েছে! বেটি আমার—

তারক জিজ্ঞাসা করিল—একবাটি গরম দুধ দেবে কি?

হ্যাঁ, সব আমায় খাইয়ে তোরা দুজনে দাঁতে দাঁত দিয়ে থাক। এক বাটি চা খাব, আবার গরম দুধ কেন? তবে বলচ যখন, তখন আধবাটি টাক না হয় নিয়ে আয় ভাই। একটু না খেলে যে তোরা ছাড়বি না, তা জানি।

তারক দুধ আনিতে পাঁচিলের দরজা দিয়া নিজের বাড়ীর মধ্যে গেল।

তারণ দোকান হইতে বড এক ভাঁড় তেল হাতে ঝুলাইয়া খিড়কী দিয়া বাড়ী ঢুকিতেছিল। ছোটবৌ তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া কহিল —বুড়োর অসুখ বোধ হয় সকালে বেড়েচে। পাড়ার সব এসে টাকা কড়ির কি সব ব্যবস্থা হচ্চে। এই সময় একবার যাও না। ঘরের ভেতর চুপ চাপ বসে থাকলে কি হবে। ওদের ত একলার ঠাকুর্দ্দা নয়। শীগগির যাও একবার, যদি কিছু—

ছোটবৌয়ের তাড়াতে তারণ সেই অবস্থাতেই অর্থাৎ তৈলের ভাঁড় হাতে লইয়াই তাহাদের দিকের পাঁচিলের দরজা খুলিয়া উঁকি দিয়া দেখিল যে, তারক ঘরের মধ্যে নাই। তারক না থাকিলে সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া ঠাকুর্দ্দার কাছে বসিত। তারণ ব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছেন আজ, ঠাকুর্দ্দা?

তারক ঘরে ঢুকিতেছিল। তারণের প্রশ্নের উত্তর পিছন হইতে সেই দিল, কহিল—ভাল! বলিয়াই তারণের হাত হইতে ক্ষিপ্রগতিতে তেলের ভাঁড়টা ছিনাইয়া লইয়া, তাহার সমস্ত তেলটা

তারণের মাথায় ঢালিয়া দিয়া কহিল,—কিন্তু তোমাদের ব্যাধিটা এখন সেরে গেলেই বাঁচা যায়।

তারণের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত, আড়াই সের তেলের স্রোত বহিতে লাগিল। ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া সে হুঙ্কার দিয়া উঠিল—দেখুন একবার ঠাকুর্দ্দা।

তারক কহিল—ঠাকুর্দ্দাও দেখুন, এঁরাও সকলে দেখুন। এতেও যদি না হয়, তখন সাহেব ডাক্তারকেও দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তোমরা দিন দিন যে রকম টগ বগ করে ফুলে ফেঁপে উঠছ, তেলই হচ্ছে তার একমাত্র ওষুধ। এ বিজ্ঞানেরই কথা! যার পরামর্শ শুনে লাফা লাফি, দাপা দাপি সুরু করেছ, তাকেই জিজ্ঞাসা কর গিয়ে, বেশী আঁচে ডাল ঝোল ফুলে ফেঁপে উতলে উঠলে তৈল প্রক্ষেপেই তার নিবৃত্তি। পেসিফাইং কোয়ালিটী এ জিনিষটার মত আর কিছুতেই নেই।

তারণ কট মট করিয়া তারকের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া রাগে ফুলিতে লাগিল। বিনু ঘোষাল, হর চক্কোত্তির দল উঠিয়া পড়িয়া আপন আপন জুতা খুঁজিতে লাগিল এবং ভুলু ঠাকুর্দ্দা খাবারের রেকাবীখানার উপর দৃষ্টি আনত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

মিনিট দশেক পরে তারক যাইয়া বড়বৌকে কহিল—কালকের জল ঢালার দাগ তেল দিয়ে তুললুম।

তৈল প্রক্ষেপের ফলে, বৈজ্ঞানিক কারণে, কিছুদিন যাবৎ অবস্থা প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াই ছিল। মধ্যে মধ্যে একটু আধটু বিক্ষোভ যাহা ঘটিত, তাহা প্রবলও হইত না, স্থায়ীও হইত না। যে সময় ঠাকুর্দ্দার রোগ বৃদ্ধি পাইয়া অবস্থা একটু খারাপ হইয়া পড়িত, সে সময়টা বড়বৌয়ের প্রকৃতিতে হঠাৎ প্রসন্নতার একটা ভাব দেখা দিত এবং অপর দিকে ছোটবৌয়ের মেজাজটা একটু বিগড়াইয়া যাইত। আবার ঠাকুর্দ্দা একটু ভালর দিকে ফিরিলে উভয় বধূর এই অবস্থার বিপরীত পরিবর্ত্তন ঘটিত। একদিন রাত্রে ঠাকুর্দ্দার হঠাৎ বুকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হয়। ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে সে যন্ত্রণা ছোটবৌও সমানে ভোগ করিতে থাকে। ছোটবৌ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কেবলই সে রাত্রে নারায়ণকে ডাকিয়াছিল—হে নারায়ণ, হে মধুসূদন, ঠাকুর্দ্দার যেন কিছু না ঘটে। ঠাকুর্দ্দা যেন দুশো বছর বেঁচে থাকে ঠাকুর। বড়বৌও প্রসন্ন মনে সে রাত্রে ঠাকুরের কাছে মনে মনে নিবেদন করিয়াছিল—কি আর বোলব তোমায়, একটু কিপা-দিষ্টিতে চাও হরি, আশায় নৈরাশ কোরো না।

ভূধর ডাক্তারের ঔষধে সে রাত্রে ঠাকুর্দ্দা সুস্থ হইয়া উঠিলে বড়বৌ ক্ষুন্ন মনে তারককে বলিল—ডাক্তার ভাল বটে, কিন্তু ক্যাম্বেলের পাশ ডাক্তার আবার ডাক্তার। যা বল আর যা কও, আমার কিন্তু ভূধর ডাক্তারের ওপর মোটেই ভক্তি নেই। ডাক্তার বটে—আমাদের নারাণপুরের সিদু ডাক্তার। ছোটবৌ পরদিন প্রাতে খিড়কীর ঘাটে নিস্তারিণী ঠাকুরঝিকে প্রসন্ন মনে জ্ঞাপন করিল,—ইচ্ছে করে, আমার অসুখ হোক, আর ভূধর ডাক্তারকে দিয়ে চিকিচ্ছে করাই, ডাক্তার বটে! আহা, বেঁচে থাক!

বাতাস যখন এইরূপ, তখন হঠাৎ একদিন বড়বৌ সমস্ত বাড়ী মাথায় করিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছোটবৌয়ের চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ করিতে লাগিল। ছোটবৌয়ের বিড়াল এ বাড়ীর রান্নাঘরের কুলুঙ্গী হইতে হাঁড়ির সরা ঠেলিয়া সমস্ত ভাজা মাছ খাইয়া গিয়াছে। বড়বৌয়ের হুঙ্কারে ও পদভরে খিড়কীর পুকুরের জীয়ন্ত মাছগুলাও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সে তারককে গিয়া কহিল,—দেখ, মুখ বুজে থেকে ভালমানষির কাজ নয়। এর একটা হেস্ত নেস্ত না করলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। হয় এর বিহিত কর, আর নয় আমাকে—

আর নয় তোমাকে নারাণপুরে পাঠিয়ে দেবো ত?

হ্যাঁ!

দুটোর একটা করা যাবে এখন, নিশ্চিন্ত থাক।

নিশ্চিন্ত হয় ত বড়বৌ হইল, কিন্তু ক্রোধে সে স্থির থাকিতে পারিল না। বড়বৌয়ের ভাগের কুকুর ভুলো পাঁচিলের ধারে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া ছিল। রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে বড়বৌ তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—মুখপোড়া, অকর্ম্মার ধাড়ী কোথাকার! তুমি খালি গিলবে আর শুয়ে শুয়ে ন্যাজ নাড়বে। তুমি ওদের গুষ্টিশুদ্ধকে চিবিয়ে খেয়ে আসতে পার না?—বলিয়াই পৈঠার পাশ হইতে কোদালের বাঁটখানা তুলিয়া লইয়া এমন জোরে তাহাকে ছুড়িয়া মারিল যে, পিছনকার একটা পায়ে গুরুতর আঘাত পাইয়া সে চীৎকার

করিতে করিতে ও খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে খিড়কীর দিকে পলাইয়া গেল।

তারক আসিয়া বড়বৌকে কহিল—বললুম ত, বিহিত একটা যা হোক কোরবই। তবে আজকে হবে না,—কাল।

সত্যই ছোটবৌয়ের বিড়াল বড়বৌয়ের রান্নাঘর হইতে যতগুলি ভাজা মাছ ছিল, তাহার সবগুলাই খাইয়া গিয়াছিল। তারকের মনেও ইহার জন্য যথেষ্ট আঘাত লাগিয়াছিল। কারণ, সকালে অনেক বেলায় তারক যখন সারখেলদের পুকুর হইতে মাছটা ছিপে ধরিয়া আনে, তখন রান্না শেষ হইয়া গিয়াছিল। তবুও বড়বৌ রাঁধিয়া দিবার উদ্যোগ করিতে গেলে তারকই নিষেধ করিয়া বলিয়াছিল যে, ভাজিয়া রাখা হোক, রাত্রে সকলে ভাল করিয়া খাইবে! সুতরাং তারকেরও মনে ইহাতে যৎপরোনাস্তি ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল এবং তাহার ফলে পরদিন সকালে ঠাকুর্দ্দাকে ঔষধ, জলখাবার, চা ইত্যাদি খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সে শিবু জেলের বাড়ীর উদ্দেশে নিষ্ক্রান্ত হইল!

ঘণ্টা দুই পরে কে একজন আসিয়া তারণকে চুপি চুপি খবর দিল—ভুঁই পুকুরের মাছ যে সব উজোড় করে দিলে, একটা চুনো পুঁটিও বুঝি বা রাখলে না!

তারণ তৈল মাখিতেছিল। চমকিত হইয়া এক লাফে দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে?

সেই তৈলাক্ত দেহেই, বাঁশের লাঠীগাছটা হাতে করিয়া তারণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

ইহার ঘণ্টাখানেক পরে যখন তারণের রক্তাক্ত দেহ কয়জনে ধরাধরি করিয়া আনিয়া রোয়াকের উপর শোয়াইয়া দিল, তখন ছোট বৌ ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ওরে, কে এ সর্ব্বনাশ করলে রে?

তাহাদের মধ্যে কে একজন ইসারা করিয়া তারকের ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

ও পাড়ার ভুঁই পুকুরটা তারণদেরই ষোল আনা সম্পত্তি। কয়েক বৎসর হইল সে ইহা চাটুয্যেদের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিল।

তৈলাক্ত কলেবরে বাঁশের লাঠীগাছটা হাতে করিয়া তারণ ছুটিয়া অর্দ্ধ পথে শীতলাতলার নিকটে যাইতেই দেখিল যে, শিবু জেলে ও তারক মাছ ধরিয়া ফিরিতেছে! শিবুর কাঁধে জাল ও এক হাতে একটি সের চারি পাঁচ ওজনের রুই এবং প্রায় ঐরূপ ওজনের আর একটি রুই ছিল তারকের হাতে!

তারণ জ্ঞানশূন্য হইয়াই ছুটিতেছিল! ইহা দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সে সজোরে শিবুর পায়ে এমন লাঠীর আঘাত করিল যে, এক আঘাতেই সে জাল ও মাছশুদ্ধ পথের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল! শিবুর পড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তারক তাহার হাতের মাছ মাটিতে রাখিয়া দিল এবং তারণের হাত হইতে লাঠীটা চক্ষের নিমেষে ছিনাইয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাহার স্কন্ধোপরি প্রচণ্ড এক আঘাত করিল। পথিপার্শ্বে কতকগুলা ফণী মনসার ঝোপ ছিল। ভীষণ আঘাতের ফলে তারণ সবেগে তাহারই মধ্যে গিয়া ঠিকরাইয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কাঁধের আঘাতটা কানের উপর লাগিয়া সেখানটাও গুরুতররূপে জখম হইয়াছিল। সেখান হইতেও রক্তধারা বহিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেখানে লোক জমিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তারণের দিকে, কেহ কেহ তারকের দিকে। যাহারা তারণের দিকে, তাহাদের মধ্যে জন দুই চারি ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাটীতে আনিয়া ফেলিল।

তাহার পর তারণের দলীয় যাহারা, তাহারা তাহাকে পরামর্শ দানের সহিত উত্তেজিত করিতে লাগিল এই বলিয়া যে, দু' নম্বর ফৌজদারী রুজু করিয়া দেওয়া হোক, অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক মৎস্য চুরি এবং সাংঘাতিক ভাবে মারপিট, যেহেতু উভয় মকদ্দমাতেই সাক্ষীর অপ্রতুল হইবে না।

তারকের দলের লোকেরা তারককে বুঝাইতে লাগিল,—কি করবে ওরা করুক না। মারপিটের কেসটায় না হয় বড় জোর গোটা পনের কুড়ি টাকা জরিমানা হবে। তবে চুরি কেসটা নিয়েই কথা। প্রমাণ করতে পারলে, অবশ্য,—কিন্তু কি করে প্রমাণটা করে, দেখা যাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভুলু ঠাকুর্দ্দা কহিলেন—এ সব দিন দিন কি হচ্ছে বুঝতে পাচ্ছি না। আমি দেখছি, আমাকে উপলক্ষ করেই এদের মধ্যে এই সব গোলযোগ সুরু হোয়েছে। ওরে বাপু, আমার কি এমন দুলাখ পাঁচ লাখ আছে যে, তাই নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে লাঠালাঠী, মারামারি, রক্তারক্তি। ঊর্দ্ধসংখ্যা হাজার বিশ পঁচিশই যদি বা আমার

থাকে, ত যার বরাতে আছে সেই তা পাবে। তাই নিয়েই এই রকম। না বাপু, আমার এ সব ভাল লাগে না, আমি না হয় যেমন ছিলুম, তেমনি কোলকাতায় গিয়ে থাকি গে। দেশের মাটিতে মরা আর আমার ভাগ্যে ঘটলো না।

বড়বৌ বলিল,—কি করবে নালিশ-মকদ্দমা করে? করুক না। তোদের বেড়াল আমার মাছ খেয়ে যায় কেন? নালিশ অমনি করলেই হল আর কি!

তারক এ ব্যাপারে কিছুই মন্তব্য প্রকাশ করে নাই। সে নালিশ-মকদ্দমার কথা শুনিয়া মনে মনে বেশ একটু ভয় পাইয়াছিল। সে উদ্ধত-প্রকৃতি, চতুর এবং ফন্দীবাজ হইলেও, নালিশ-মকদ্দমাকে যথেষ্ট ভয় করিত। সুতরাং কয়দিন ধরিয়া ছোট তরফে যখন শলা পরামর্শ চলিতে লাগিল, বড় তরফটা তখন দুর্ভাবনা ও ভয়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া নীরবে ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতে লাগিল।

এইভাবে দুই দিন কাটিয়া গেল।

তৃতীয় দিনে সত্য সত্যই হুগলীর কোর্টে তারকের বিরুদ্ধে দুই দফা নালিশ রুজু হইয়া গেল।

এক দফা, ৩৭৯ ধারা—চুরি, আর এক দফা, ৩২৫ ধারা—গুরুতর মারপিট।

হুগলীর কোর্টে উকীলের নিকট পরামর্শ জানিতে গেলে তারকের উকীল প্রথমে তাহাকে জানাইল, বিশেষ কোন ভয় নাই। তাহার পর সবিশেষরূপে জানাইতে গিয়া জানাইল—মারপিটের কেসটাতে যদি প্রমাণ হয় ত বড় জোর না হয় গোটা পঁচিশ টাকা জরিমানা হবে। কিন্তু চুরির কেসটাতে—

তারক ব্যস্ত হইয়া উকীল বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু চুরির কেসটাতে কি হতে পারে?

তাহার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল। উকীল বলিল—ওটা ৩৭৯ ধারার কেস কি না। আর বোধ হয় প্রমাণও হয়ে যাবে। সুতরাং—

তারকের গলার স্বর ধরিয়া আসিয়াছিল, কহিল—সুতরাং কি হবে?

এমন আর হাতী ঘোড়া কি হবে। মাস দুচ্চার—

বাকী কথা উকীল বাবুর মুখ হইতে বাহির হইলেও তারকের কর্ণে তাহা প্রবেশ লাভ করে নাই। আতঙ্কে তাহার চোখের সামনে যেমন অন্ধকার জমিয়া আসিয়াছিল, কর্ণ-ছিদ্রের মধ্যেও তেমনি কিছু জমিয়া সে পথও যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

দাঁড়াইয়া উঠিতেই তারকের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তবু সে এক পা এক পা করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে আর গৃহে ফিরিল না।

সন্ধ্যার পর ঠাকুর্দ্দার ঘরে বৈঠক বসিয়াছিল।

বৈঠকে ছিলেন ঠাকুর্দ্দা, তারণ, বিমু ঘোষাল, হর চক্কোত্তি, দত্তদের মেজকর্ত্তা প্রভৃতি।

আজ দশদিন হইল তারক নিরুদ্দেশ এবং শুধু নিরুদ্দেশই নয়, আজ চারি দিন হইল কলিকাতা হইতে তাহার মৃত্যুসংবাদ আসিয়াছে। সে ঘৃণায় লজ্জায়, গ্লানিতে আত্মহত্যা করিয়াছে। আজই মকদ্দমার দিন ছিল। তারণ কোর্টে দরখাস্ত করিয়া মকদ্দমা উঠাইয়া লইয়াছে।

ছোটবৌ বাহিরে শোকাচ্ছন্ন হইলেও ভিতরে যাহাতে আচ্ছন্ন তাহা শোক নহে, বরং সুখ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভিতরটাকে সে খুব সাবধানে ও সন্তর্পণে বাহির হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছে। পাঁচ জনের কাছে সে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিতেছে—ঝগড়া হোক, ঝাঁটি হোক, মাথার ওপর একটা ভাসুর ছিল, এমনি পোড়া অদেষ্ট আমার যে, ইত্যাদি।

বড়বৌ হাতের লোহা খুলিয়া, সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া বৈধব্য বেশে নিজের ঘরটির মধ্যেই পড়িয়া থাকে, আর মাঝে মাঝে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠে।

কয়দিন হইতে ঠাকুর্দ্দার ভার তারণের হাতেই আসিয়াছিল। তারণ তাঁহাকে কহিল—আপনার জলখাবার আর চা এনে দি, ঠাকুর্দ্দা? রাত নটায় আবার ওষুধটা খেতে হবে।

ঠাকুর্দ্দা কহিলেন—সে হবেখন তারণ। সেবা যত্নে তুই দেখচি তারককেও হারিয়ে দিলি ভাই। তারপর দত্তদের মেজকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—আমি বলি কি, ওই ভদ্রলোককে, যিনি চিঠি লিখে খবরটা দিয়েছেন, একখানা চিঠি লিখে কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার। কেন না, তিনি সংবাদটি না দিলে আমরা হয় ত কিছুই জানতেও পারতুম না।—কথা কয়টি বলিয়া তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন।

দত্তদের মেজকর্ত্তা কহিলেন—সেটা—উচিত বটে, তাঁর ঠিকানাটা আছে ত?

তারণ কহিল হ্যাঁ,—চিঠিতেই তাঁর ঠিকানা

দেওয়া আছে। বলিয়া পকেট হইতে তারণ চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

বিনু ঘোষাল কহিল—হেঁকেই পড় না কেন, হরনাথ ভায়া শোনে নি ক, শুনুক।

তারণ পড়িল—

'কর্ত্তব্যের অনুরোধে একটি কঠোর দুঃসংবাদ জানাইতে বাধ্য হইতেছি, ক্ষমা করিবেন। আজ দুইদিন হইল রামতারক সরকার নামক একটি লোক আমার আড়তের সম্মুখস্থ মাণিকতলা খালের পোলে দড়ি ঝুলাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর হইবেন। কারণ যে স্থানে তিনি আত্মহত্যা করেন, সেই স্থানে মাটির উপর, আমাদের কয়াল ভূতনাথ ঘোষ একগণ্ড কাগজ কুড়াইয়া পায়। সম্ভবতঃ রামতারক বাবুর জামার পকেট হইতে উহা পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল—ভায়ের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের লজ্জায় আত্মহত্যা করিলাম। নীচে তাঁহার নিজের নাম ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ও ঠিকানা লিখা ছিল। পাছে আপনাদের এই দুঃসময়ে আবার পুলিসের এনকোয়ারীর দুর্ভোগ হয়, এজন্য ঠিকানা লেখা ঐ কাগজটুকু আমরা পুলিসকে না দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি।

'অদ্যকার দৈনিক কাগজগুলিতেও এই সংবাদটি বাহির হইয়াছে। সমাচার সমুদ্র হইতে সেই অংশটুকু কাটিয়া এতৎসহ পাঠালাম। বিপদে ধৈর্য্য ধারণই জ্ঞানবানের কাজ, এইটিই এ সময়ে মনে রাখিবেন। অধিক আর কি লিখিব—ইতি।

শ্রীব্রজবল্লভ সাহা

৩৮।৩বি, রামশঙ্কর পালের লেন,

শ্যামবাজার।

পুঃ—পুলিস লাস সনাক্ত করিতে না পারিয়া এ বিষয়ে চুপচাপ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনারা কেহ আর এ বিষয় লইয়া এখানে আসিবেন না, তাহাতে হয় ত আবার নূতন করিয়া আপনাদিগকে এই হাঙ্গামায় জড়িত হইতে হইবে।'

পত্রখানি পড়িয়া তারণের চোখে জল দেখা দিল। কোঁচার খুঁটে সে চোখ মুছিতে লাগিল। মায়ের পেটের ভাই ত।

বিনু ঘোষাল কহিল—কাগজের সংবাদটুকুও একবার পড়।

চক্কোত্তিমশাই কহিল—ও আর শুনে কি হবে। চল—ওঠা যাক, বড্ড অন্ধকারটা হোয়ে পড়ল। আমায় আবার জেলেপাড়ার তেঁতুলতলাটা দিয়ে যেতে হবে।

একটা ধমক দিয়া দত্তদের মেজকর্ত্তা কহিল—তুমি বুড়ো হোয়ে মরতে চললে চক্কোত্তি, তবু তোমার ভূতের ভয় আর গেল না।—পড় পড়,—তারণ, কাগজটুকু একবার পড়।

সমাচার সমুদ্রের টুকরাটি হাতে লইয়া তারণ পড়িল—

গত সোমবারে একটি হৃষ্ট পুষ্ট মধ্যবয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোক মাণিকতলার খালের পোলের লৌহদণ্ডে দড়ি খাটাইয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। লোকটির—

বাধা দিয়া চক্কোত্তি কহিল—আমায় তেঁতুল তলাটা একটু পার করে দিও বিনু ভাই।

মেজকর্ত্তা কহিল—তারপর? পড়ে যাও।

তারণ পড়িতে লাগিল—

লোকটির বুকে রা তা স লেখা একটি উল্কী ছিল। কপালে বাম ভ্রূর বাঁদিকে একটা বড় জরুল এবং মস্তকের সম্মুখভাগে টাক ছিল। দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় সপ্তধাতু নির্ম্মিত একটি অঙ্গুরীও ছিল। পুলিসের—

মেজকর্ত্তা কহিল—রা তা স টা এই সে বছর লিখেছিল। তারপর?

পুলিসের বহু চেষ্টাসত্ত্বেও লাস সনাক্ত না হওয়াতে, লাস অবশেষে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিনু ঘোষাল কহিল—ও পিঠটাও পড় কি লেখা আছে।

কাগজটুকু উল্টাইয়া তারণ কহিল—ও স্পৃশ্য অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশের একটা খবর। কোথায় এই নিয়ে দু দলে খুব মারামারি হোয়ে গেছে। তাই একজন ঠাট্টা করে লিখচে যে, মন্দিরে মন্দিরে সব তালাবন্ধ করে দেওয়া হোক। স্পৃশ্যতাও ঢুকতে পারবে না, অস্পৃশ্যতাও ঢুকতে পারবে না। বহুদিন পরে দেবতারা সব একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচুন।

চক্কোত্তি কহিল—কোত্থেকে একটা মন্দির প্রবেশের হাঙ্গামার সৃষ্টি করে দেশটাকে একেবারে—ওরে বাবা গো! ধরলে গো! খেলে গো—গো—ওঁ—ওঁ—ওঁ! চক্কোত্তি ঠিকরাইয়া গিয়া একেবারে ঘোষালের উপর পড়িল।

দত্তদের মেজকর্ত্তা কম্পিত কলেবরে রামনাম

উচ্চারণ করিতে করিতে তারণকে জড়াইয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল এবং তারণ হেবিকেনের লণ্ঠন, মেজকর্ত্তা, হুঁকা, বৈঠক ও পিকদানী সমেত সশব্দে গিয়া পড়িল ঠাকুর্দ্দার উপর।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে তখন একদিকে চক্কোত্তির গোঁ গোঁ শব্দ এবং আর এক দিকে মেজকর্ত্তার মুখ-নিঃসৃত রামনাম ছাড়া আর কাহারো কোন সাড়া শব্দই রহিল না।

ব্যাপারটা কিন্তু বিশেষ কিছুই নয়। যৎ-সামান্য। পরলোকগত তারক হঠাৎ সশরীরে পুনরায় ইহলোকে অর্থাৎ ঠাকুর্দ্দার ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছিল।

তারকের মরণ ও বাঁচন কাহিনীটা এইরূপ—

তাহার উকিল পর্য্যন্ত যখন তাহাকে জেল হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানাইল, তখনি তারক আর গ্রামে না ফিরিয়া বরাবর কলিকাতায় চলিয়া যায় এবং তথায় একজনকে দিয়া ঐ পত্রখানি লিখাইয়া লয়। তৎপরে কোন এক ছাপাখানা হইতে এক পৃষ্ঠায় স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের কথাটা ও অপর পৃষ্ঠে তাহার নিজের আত্মহত্যার সংবাদটা ছাপাইয়া লইয়া তাহা ওই পত্রের সহিত তারণের নামে ডাকে পাঠাইয়া দেয়। তারপর সে হুগলীতে আসিয়া, কয়দিন কোন স্থানে লুকাইয়া কাটায়। পরিশেষে মোকর্দ্দমার দিন সে যখন খবর লইয়া জানিতে পারে যে, তারণ তাহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইয়াছে, অমনি সে বাঁচিয়া উঠিয়া বাটী ফিরিয়া আসে এবং হঠাৎ তাহার আগমনে, সে দিন ঠাকুর্দ্দার ঘরে যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা অতীব চমৎকার।

অবশ্য পরে চক্কোত্তি মশায়ের গোঁ গোঁ শব্দ যদিচ থামিয়া গিয়াছিল এবং দত্তদের মেজকর্ত্তারও কম্পিত কণ্ঠে রাম নাম উচ্চারণের আর আবশ্যক ঘটে নাই, কিন্তু বৃদ্ধ, রুগ্ন, ঠাকুর্দ্দার ক্ষীণ দেহের উপর সকলে হুড় মুড় করিয়া আসিয়া পড়ায়, তাঁহার বক্ষোদেশের পঞ্জরে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। এ কয়দিনে সেই আঘাত-জনিত বেদনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং তদ্দরুণ প্রত্যহই এখন একটু করিয়া জ্বর আসিতেছিল। ডাক্তার নিত্যই আসিতেছে। কিন্তু এই একটু জ্বর ও ব্যথা উপলক্ষ করিয়াই হয় ত বা ঠাকুর্দ্দাকে এবার যাইতে হয়, এ আশঙ্কাও তিনি করিতেছেন।

বড়বৌ চোখের জল মুছিয়াছে। আবার তাহার সিঁথিতে সিন্দুর ও হাতে লোহা উঠিয়াছে এবং তাহার বিরস বদনে আবার হাসি ফুটিয়াছে।

সেদিন মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বড়বৌ তারককে কহিল—ধন্যি যা হোক তুমি।

তারক গর্ব্বের ভাবে কহিল—আমি ধন্যি নয় ত কি তারণ ধন্যি? ও হোল গিয়ে একটা মহামুখ্যু—আকাট নিরেট,—ওর কি আমার চালবাজীর কাছে দাঁড়াবার সাধ্যি আছে? মোকর্দ্দমা করতে যে তাল ঠুকে গেলি, কেমন—তুলে নিতে হোল ত? গবাকান্ত এটা বুঝতে পারলে না, কোলকাত্তার কোন জায়গায় কি রামশঙ্কর পালের লেন আছে? তা ছাড়া, খবরের কাগজের কাটাটুকু দেখেও ওর ধরে ফেলা উচিত ছিল যে, সমাচার সমুদ্র পাতলা লালচে কাগজে চিরকাল ছাপা হোয়ে আসচে, ঐ রকম টিটেগড়ের ফুলস্ক্যাপ কাগজে কখন খবরের কাগজ ছাপা হয়?

তারণ চাল-বাজীতে তারকের সমকক্ষ না হইলেও এবং তারক তাহাকে গবাকান্ত বা হাবাকান্ত যেরূপ হউক আখ্যা প্রদান করিলেও, ঠাকুর্দ্দাকে সে কিন্তু এবার হস্তগত করিয়া আর পরিত্যাগ করে নাই। অর্থাৎ তারকের অবর্ত্তমানে সে ঠাকুর্দ্দাকে লাভ করিয়া, তারকের পুনরাগমনে সে ঠাকুর্দ্দার দাবী পরিত্যাগ করে নাই। ফলে, ঠাকুর্দ্দাকে দেখাশুনা এখন তারকও করিতেছে এবং তারণও করিতে ছাড়িতেছে না, যেহেতু ছোটবৌ পরামর্শ দিয়াছে—ওদের ত স্বকৃত উপার্জ্জনের ঠাকুর্দ্দা নয়। পৈতৃক ঠাকুর্দ্দা। আমরাও সমান ভাগের ভাগ নিয়ে ছাড়বো। ভয়ে পেছিয়ে এলে চলবে না। তাই এখন ঠাকুর্দ্দার অসুখ বৃদ্ধির এ সময়টাতে, তারকের ডাক্তার ঠাকুর্দ্দাকে যেমন দেখিয়া চলিয়া যায়, অমনি তারণও তাহার ডাক্তারকে ডাকিয়া আনে। তারকের ডাক্তার খাওয়ায়—এ্যালোপ্যাথিক মিক্সচার, তারণের ডাক্তার গিলাইয়া যায়—হোমিওপ্যাথির গ্লোবিউল্‌স। বড়বৌ খাওয়াইয়া গেলে সাবু, বাতাসা, কমলালেবু, ছোটবৌ আসিয়া খাওয়ায় বার্লি, শটির পালো, শাঁকআলু। যদি কোনদিন তারক ঠাকুর্দ্দার পাশে বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলায়, অমনি তারণ ছুটিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি পাখা লইয়া জোরে জোরে ঠাকুর্দ্দাকে বাতাস করিতে থাকে।

আগে হইলে তারক কিছুতেই এমনটা হইতে দিত না, কিন্তু বড় মারপিটটার পর হইতে তারক

আর এখন কোন গোলযোগ বাধাইবার ইচ্ছা করে না। এ সম্বন্ধে বড়বৌ প্রতিবাদ জানাইলে তারক বলে—যা করে করুক না। মরবার পর আসলের বেলায়—বোঝা যাবে এখন।

এই ভাবে আরও কয়দিন কাটিয়া যাইবার পর ঠাকুর্দ্দার অসুখ হঠাৎ খুব বৃদ্ধি পাইল। ডাক্তারদের ঔষধে এ যাবৎ কোন ফল হয়ও নাই, হইলও না। এ্যালোপ্যাথিক বলেন—হোমিও পরিত্যাগ না করলে ওষুধে কোন ফলই হবে না। হোমিও বলেন—সমস্ত ওষুধের ক্রিয়া এ্যালো সব নষ্ট করে দিচ্চে।

সুতরাং অতি-চিকিৎসার ফলে ঠাকুর্দ্দার রোগ চরম অবস্থায় আসিয়া পড়িল।

একদিন মধ্যাহ্নে ঠাকুর্দ্দার অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হই' পড়ে। তারক তাড়াতাড়ি আসিয়া বড়বৌকে এ খবর দিতে, বড়বৌ প্রথমটা থত মত খাইল এবং পরক্ষণেই দালানে একখানা মাদুর পাতিয়া তদুপরি পা ছড়াইয়া বসিয়া, ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ছোটবৌ খিড়কীর পুকুর-ঘাটে পুঁটির পিসির সহিত হাসিতে হাসিতে কি একটা গল্প করিতেছিল। বড়বৌয়ের কান্নার শব্দ তাহার কানে আসা মাত্র সে বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া আসিল এবং হাতের বালতীটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া দাওয়ায় বসিয়া কাঁদিতে গিয়া কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং বরাবর ঠাকুর্দ্দার ঘরের মধ্যে গিয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন সুরু করিয়া দিল।

তারক ও তারণ ও প্রতিবাসীদের কেহ কেহও সে সময় উপস্থিত ছিল। তারক ঠাকুর্দ্দার কোমর হাতড়াইয়া ঘুনসি হইতে লোহার সিন্দুকের চাবিকাঠিটা লইবার চেষ্টা করিলে, তারণ বাধা দিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আহা—হা, কর কি! এ অবস্থায় ওঁকে আর নাড়াচাড়া কোর না। তারক থত মত খাইয়া সরিয়া আসিয়া বসিল! কিন্তু তারণের নিষেধে তাহার এই ক্ষান্ত হওয়াটা সে দুর্ব্বলতা বলিয়াই মনে করিল! কিন্তু সে কোমর ত্যাগ করিলেও তৎসন্নিহিত স্থান ত্যাগ করিল না, অর্থাৎ ঠাকুর্দ্দার কোলের কাছে শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল!

সে রাত্রে ছোট তরফ এবং বড় তরফ সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ঠাকুর্দ্দাকে ঘিরিয়া রাত কাটাইল! রান্না বান্না,, কাজ কর্ম্ম উভয় পক্ষেই বন্ধ! মধ্যে একবার উঠিয়া এ পক্ষও কিঞ্চিৎ মুড়ি এবং গুড় খাইয়া আসিল, অপর পক্ষও একবার গিয়া ঐরূপ কিছু জলযোগ করিয়া আসিল!

কিন্তু রাত্রে কিছুই হইল না! সারা রাত টাল মাটালে কাটিয়া গিয়া ঠাকুর্দ্দার ঘরে পূবের খোলা জানালা দিয়া পরদিনের সূর্য্যের আলো আসিয়া পড়িল! তখন পাড়ার অনেকেই একে একে দেখিতে আসিতে আরম্ভ করিল! ছোটবৌ তারণকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল—মুখাগ্নিটা তুমিও করো।

শ্মশানে গিয়ে যেন ভ্যাবা গঙ্গারাম হোয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না। বড়বৌ তারককে চুপি চুপি কহিল—তাড়াতাড়ি সব ফেলে রেখে যেন শ্মশানে চলে যেও না! ভাল করে তালা চাবির বন্দোবস্ত করে তবে—বুঝেছ ত?

যাহা হউক, মধ্যাহ্নও কাটিল!

কিন্তু অপরাহ্ন আর কাটিল না! সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে—তারক, তারণ, বড়বৌ, ছোটবৌ, ঘোষালমশাই, হর চক্কোত্তি, দত্তদের মেজকর্ত্তা প্রভৃতির সামনে ঠাকুর্দ্দার জীবন-সূর্য্য চির-অস্তাচলে অদৃশ্য হইল! সঙ্গে সঙ্গেই তারক তাঁহার কোমরের ঘুনসি অধিকার করিল এবং তারণ ক্ষিপ্রতার সহিত তারকের উপর আসিয়া পড়িল! বধূযুগল যথাসময়েই ক্রন্দনের রোল তুলিয়া দিল এবং চক্কোত্তি প্রভৃতি ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল!

কাড়াকাড়ি, ধাক্কাধাক্কি, কোলাহল, ক্রন্দনের মধ্যে পরিশেষে উপস্থিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহাই স্থির হইল যে, দত্তদের মেজকর্ত্তাকেই সিন্দুক খুলিতে দেওয়া হউক! সুতরাং দত্তদের মেজকর্ত্তাই ঠাকুর্দ্দার ঘুনসি হইতে চাবি খুলিয়া লইলেন!

সিন্দুক খোলা হইল!

শূন্য—শূন্য—শূন্য! সিন্দুক যেন হাঁ করিয়া সকলকে ভ্যাংচাইতে লাগিল! হাজার হাজার সঞ্চিত টাকার পরিবর্ত্তে ঠাকুর্দ্দার স্বহস্তলিখিত এক টুকরা কাগজ ভাঁজ করা অবস্থায় সিন্দুকের একধারে পড়িয়াছিল! মেজকর্ত্তা হাঁকিয়া তাহা পাঠ করিল—

'টাকা কড়ি আমার কিছু নেই! তা থাকলে আর এই বনের ভেতর মরবার জন্য আসি? সময়ে যা রোজগার করেছিলুম, অসময় পড়বার আগেই তা ফুঁকে দিয়েছি! তোমরা কিছু মনে করিও না, —আমায় ক্ষমা কোরো!—ঠাকুর্দ্দা!'

'পুঃ—

সিন্দুকটা শিবপুরের এক ভদ্রলোকের! কিছুদিনের জন্যে চেয়ে এনেছিলুম! তিনি নিতে এলে তাঁকে দিয়ে দিও! তাঁর শ' দুই টাকাও আমি ঋণী আছি! দয়া করে দুই ভাই মিলে সেটা শুধে দিও! ইতি!'

চক্কোত্তির একটু আধটু কীর্ত্তন গানের অভ্যাস আলোচনা ছিল! তাহার খুব ইচ্ছা হইতেছিল, সে একবার কীর্ত্তনের সুরে চণ্ডীদাসের গানখানার বদলে গায়—

আহা টাকার লাগিয়া এতেক করিনু
সকলি গরলভেল!
রজত সাগরে সিনান করিতে
কদলী মিলিয়া গেল!

পতি-সংশোধনী সমিতি

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

পতি-সংশোধনী সমিতি

এবার পৌষ মাসে তেমন শীত পড়ে নাই; সারা মাঘ মাসটা মাঝে মাঝে ঝড়-বৃষ্টিতে কাটিয়াছে। তাই ফাল্গুনের শেষের দিকেও বেশ একটু শীত রহিয়াছে। দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর অচিন্ত্য বাবু বৈঠকখানাঘরে র‍্যাগ মুড়ি দিয়া এক ঘুম ঘুমাইবার পর যখন চোখ চাহিলেন, দেখিলেন, ঘড়িতে প্রায় তিনটা বাজে। বাহিরে জোলো ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। র‍্যাগখানাকে ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া তিনি পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু উঠিলেন না। তবে আর ঘুমাইলেন না, শুইয়া শুইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন—

ঋতুর এবার ওলট-পালট অবস্থা সুরু হলো, কি একখানা বইয়ে যে লিখেচে,—আসচে ভাদ্র মাসে কলিযুগ শেষ হয়ে সত্যযুগ পড়বে, তার আগে অনেক রকম অঘটন ঘটবে, হয়তো এ-ও তারি একটা, মেদিনীপুরের বন্যা, উড়িষ্যার ঝড়, হালসী-বাগানের অগ্নি-কাণ্ড, এ সবই হয়তো ঐ অঘটনের সামিল। তার ওপর জগৎ-জোড়া যুদ্ধ ত চলছেই। লোকটার গণনা হয়তো ঠিক। কলির যে শেষ তার আর সন্দেহ নেই। রমানাথের কাণ্ডটা একবার দেখ। চাইতে না চাইতে পঁচিশটে টাকা দিলুম—নইলে তার ইনসিওর বাতিল হোয়ে যায়! বললে, পরশু মাইনে পাবো, পেয়েই আপনার টাকাটা দিয়ে দেবো। তা পরশুর যায়গায় আজ সাতমাস হোয়ে গেল, কিছুতেই আর টাকাটা আদায় করতে পারলুম না! চাইতে গেলে উল্টে মহা বিরক্ত! নাঃ; কলির যে শেষ, তার আর কোন ভুল নেই!

ভাবিতে ভাবিতে অচিন্ত্য বাবুর একটু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রার মাঝে তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন—গভীর রাত; বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া তিনি 'কল্কিপুরাণ' পড়িতেছেন, এমন সময় একটা শব্দ শুনিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দেখেন, প্রকাণ্ড একটা ভাল্লুক অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁর দিকেই লোলুপ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া আছে। ভয়ে তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিতেই ভাল্লুক কহিল—'ভয় নেই, আমি সত্যযুগের ভাল্লুক; নিরামিষ ছাড়া আহার করি না। অতঃপর জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলেন, যেখানে ভাল্লুক দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে আর ভাল্লুক নাই, আছে রমানাথের ভূত দাঁড়াইয়া। তাহার হাতে টাকা ভরা একটা থলি! তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া রমানাথের ভূত বলিতে লাগিল—"আঁমি মঁরে গেঁছি। বঁউটা ইঁন্‌সিঁওয়েঁর চাঁর হাঁজাঁর টাঁকা পেঁয়েছিঁলো, কেঁড়েঁ এঁনেছিঁ। আঁমি তোঁ আঁর মাঁনুষ নঁই—ভূঁত! সুঁতরাঁং আঁমাঁয় তোঁমাঁর আঁর ভঁয়েঁর কাঁরণ নেঁই! নাঁও, এঁসোঁ তোঁমার টাঁকা নাঁও!

আঁৎকাইয়া উঠিয়া তিনি জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহির হইতে তখন রমানাথের ভূত জানালায় ধাক্কা দিতে লাগিল। সেই ধাক্কায় অচিন্ত্য বাবুর তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। তবু জানালায় ধাক্কা থামিল না। বিরক্ত হইয়া অচিন্ত্য বাবু বলিয়া উঠিলেন, "কে হে?"

"আজ্ঞে আমি।"

"আমি কে?"

"আজ্ঞে আপনি ত অচিন্ত্য বাবু?"

"আরে ভালো মুস্কিল!—তুমি কে?" বলিয়া অচিন্ত্য বাবু শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং জানালা খুলিয়া দেখেন, 'বাসন্তিকা বস্ত্রালয়'-এর সরকার, হাতে তাহার একটা 'বিল্'। লোকটি কহিল—মা সেদিন দু'জোড়া শাড়ী এনেছিলেন। এই বিল্‌টা,—৩৪৷৷/১০, 'টাকাটা দেবেন কি?"

"দেবো। আঁকৃষি আছে তোমার কাছে?"

"আজ্ঞে—আঁকৃষি! কি বলচেন?"

"এই আমার উঠোনের গাছে ফলেছে; টাকাটা পাড়তে হবে কি না—তাই আঁকৃষি চাই।"

লোকটি ভ্যাবা-চাকা খাইয়া একদৃষ্টে অচিন্ত্য বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "চেয়ে থাকলে কি হবে! যিনি কাপড় এনেচেন, তিনিই টাকা দেবেন। দাঁড়াও, তাঁকে ডেকেদি। নিমাই! অ-নিমাই!"

"আইজ্ঞা!" বলিয়া নিমাই আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "তোমার মাকে একবার ডেকে দাও দেখি, আইজ্ঞা।"

"আইজ্ঞা তিনি তো ঘরকে নাই। আপনি ঘুমালে পর তিনি······"

"কোথায় গেছেন?"

"আইজ্ঞা বাসকুপ দেখবারে······"

"ওহে, কোথায় গেলে? অ চৌত্রিশ সাড়ে-ন' আনা!"

"কি বলচেন বাবু?" বলিয়া লোকটি পুনরায় আসিয়া জানালার ধারে মুখ বাড়াইল।

অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "ওহে, ফিরে যেতে হলো। তিনি ঘরে নেই, বাসকুপ দেখতে গেছেন।"

লোকটি বিস্মিত এবং বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে আর এক মূর্ত্তি পিঠে ও হাতে বোঁচকা বুচকি ঝুলাইয়া দেখা দিল। লোকটা লেস্-ফিতা-ওয়ালা। সে কিছু বলিবার আগেই অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "মক্কেল গর-হাজির, ফিরতে হবে।"

"আজ্ঞে; মা-ঠাকরুণ বলেছিলেন, চওড়া সাটিনের ফিতের কথা······"

"আহা-হা, বলচি যে মক্কেল গর-হাজির, যাও।"

"বাবু, খুব ভাল সাবান আছে। দামে সুবিধে হবে। একবার দেখবেন কি?

"না।"

"উপন্যাস বই-টই কিছু চাই না বাবু?

একটু বিস্মিত হইয়া অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "লেস-ফিতে সাবানের সঙ্গে উপন্যাসও রাখো না কি?"

"আজ্ঞে, মা-ঠাকরুণরা চান কি না। দেখাবো বাবু দু-একখানা—বলিয়া পাঁটুরি খুলিতে খুলিতে বলিল—'প্রণয়ের ক্ষিদে' নিন বাবু একখানা, এ-রকম কেতাব আর জন্মায় নি। 'বসন্তের কোকিল' নিতেও পারেন, খুব ভাল বই। 'প্রথম প্রিয়া'······"

"চাই না, চাই না। আর বকিও না বাবা! তোমার 'প্রথম প্রিয়া', 'শেষের প্রিয়া' কিছুই দরকার নেই। সরে পড়।"

লেস্-ফিতা-ওয়ালা তাহার বোঁচকা লইয়া চলিয়া গেল।

শ্রীমান্ নিমাইচন্দ্র তখনও তাহার মিশ কালো রংয়ের 'ছিটেবেড়া'র গায়ে কোঁচার কাপড় খানা জড়াইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অচিন্ত্য বাবু ঘড়ির দিকে একবার দেখিয়া লইয়া কহিলেন—"নিমাই চন্দোর!"

"আইজ্ঞা বাবু।"

"এক কাপ চা তৈরী করতে পারবে ধন?"

"আ—ই—জ্ঞা······"

"আইজ্ঞার বহর দেখে বুঝতে পেরেচি। যা বেটা, ওই ঠাকুরকে বল্ গিয়ে—এক কাপ চা করে আনতে।"

নিমাই চলিয়া গেল।

"মায় জি!"

"তুমি আবার কে বাবা?"

"ছিট্-কাপড়াওয়ালা বাবু সাব! মায়জি ওহি রোজ বোলা থা······"

"ও রোজ বোলা থা, কিন্তু আজ রোজ বোলতা যে তোম হিঁয়া আউর মত আও। ছিট্-উট্ আউর নেহি লেগা।"

"কেঁও বাবুজি, কুছ কসুর হুয়া?"

"তোমার মায়জি বিধবা হুয়া! ছিট্-ফিট্‌কা আর দরকার নেহি হোগা। যাও, ভাগো।"

ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া ছিটওয়ালা খানিকক্ষণ অচিন্ত্য বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং তার পর এক-পা এক-পা করিয়া চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যেই ঠাকুর এক-কাপ চা লইয়া হাজির হইল এবং অচিন্ত্য বাবুও পাঁচ-সাত মিনিট ধরিয়া তাহা তোয়াজের সহিত পান করিয়া ডাকিলেন, "নিমাই!"

নিমাই আসিলে কহিলেন—"সিগারেটের বাক্সটা—আইজ্ঞা।" আর, "ম্যাচ বাক্সটা—আইজ্ঞা।"

প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গোটা চার-পাঁচ সিগারেট ধ্বংস করিয়া অচিন্ত্য বাবু উঠিলেন এবং নিকটবর্ত্তী পার্কে গিয়া একখানি বেঞ্চের উপর বসিলেন খানিক পরে ঐ পাড়ারই দেবেশ বাবু আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিয়া কহিলেন—"অচিন্ত্য বাবুকে রোজই মনে মনে চিন্তা করি, কিন্তু দর্শন আর ভাগ্যে মেলে না। আছেন কেমন বলুন?"

গম্ভীর বদনে অচিন্ত্য বাবু কহিলেন—"কেমন অনেক দূরে, আছিই কি না সন্দেহ!"

"ব্যাপার তাই বটে। ৩৯ টাকা দিয়ে দু'মণ চাল কিনলুম মশাই। আচ্ছা, আটা কত করে কিনছেন আপনি?"

"আটা? বলতে পারি না। তবে আটা নামে

একরম সাদা গুঁড়ো চোদ্দ আনা করে সের আনে, দেখেচি।"

"উঃ! কি হবে বলুন তো?"

"বিশেষ কিছুই নয়। যে জিনিষটা অত্যন্ত সত্য, সেইটেই হবে, অর্থাৎ যাকে বলে, মৃত্যু!"—অচিন্ত্য বাবুর গম্ভীর বদন অধিকতর গম্ভীর হইল।

হঠাৎ দেবেশ বাবু অদূরে কাহাকে দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া সেই দিকে চলিয়া গেলেন। অচিন্ত্য বাবু একাকী বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আজ নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে সুরবালার অর্থাৎ স্ত্রীর বিরুদ্ধে যে রাগ তাঁহার মনে একটু একটু করিয়া সঞ্চিত হইতেছিল, এখন তাহা চরমে উঠিল। তিনি বাড়ী ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখেন, সুরবালা আরাম-কেদারায় বসিয়া চা খাইতেছে, হাতে একখানা 'গরমিল'-এর গানের বই। অচিন্ত্য বাবু পাশের চেয়ারখানায় বসিয়া কহিলেন—"তোমার আজ অনেক মক্কেলের আমদানী হয়েছিল। বাসন্তিকা বস্ত্রালয়, ছিটের কাপড়ওয়ালা, লেস-ফিতে-ওয়ালা। তার পর বেড়াতে বেরুচ্চি, এখন সময় 'হ্যাপি বয়' এসে হাজির। বলে, গিন্নীমা প্রায়ই কেনেন, আজ আসতে বলে দিয়েছেন। আমি তাকে বায়োস্কোপে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম,—গিয়েছিল?"

চায়ের শূন্য বাটিটা মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া সুরবালা কহিল—"পাঠিয়ে যখন দিয়েছিলে, তখন নিশ্চয়ই গিয়েছিল বই কি।"

"কিন্তু তোমাকে একটু অনুগ্রহ করতে হবে যে।"

"হুকুম হোক।"

"হুকুম—নয়কো ভিক্ষা! ভিক্ষা এই যে, বর্ত্তমানে এই দুর্দ্দিন যত দিন থাকবে, তত দিন আমার ঘাড় থেকে নেমে তোমার পিত্রালয়ে গিয়ে ভর করতে হবে।"

"তার মানে?"

"তার মানে—'তাহার', সংস্কৃততে—'তস্য', আর ইংরেজীতে—'হিজ,' বা 'হার'।"

"রসের হেঁয়ালী ছেড়ে আসল কথাটা বললেই ভালো হয়।"

"আসল কথা হচ্চে দেড়শো টাকা পাই পেন্সন, আর খরচ মাসে তিনশো। তার ভেতর বেশীর ভাগই তোমার বাজে খরচ! সুতরাং……"

"সুতরাং কি করতে বলো?"

"ঐ সব বাজে খরচ আর কিছুতেই চলবে না। বায়োস্কোপ দেখা, ঐ রং—বেরংএর সাড়ী, ব্লাউজ, ঐ সব লেস-ফিতে, ঐ 'হ্যাপিবয়'—এ সব আর এই আন্‌-হ্যাপি দিনে চলবে না। চাল কিনতে হচ্চে কুড়ি টাকা মণ! কয়লা, তেল, আটা, তরি-তরকারী সব পাঁচগুণ সাতগুণ দাম বেশী! সুতরাং এ সময়ে আর……"

একটু শ্লেষ-মেশানো স্বরে সুরবালা কহিল—"তা সংসার চালাতে যদি অক্ষম হয়েই থাকো, আমাকে দাদার ওখানেই দিয়ে এসো। একটু বললে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত তুমিও ওস্থানে পেতে পারবে। সিঁড়ির নীচে চোরকুটুরীর ঘর আছে। সেখানেও বোধ হয় বলে-কয়ে তোমার শোবার জন্য করে দিতে পারবো।"

মুখখানা কথঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া অচিন্ত্য বাবু কহিলেন—"বটে! অপার দয়া তোমার! তবে দাদার সংসারে গিয়ে আবির্ভাব হলে, আমার ভয় হয়, সে-বেচারার সংসারটিও ছারখার হয়ে যাবে!"

বিষম বিরক্তির সহিত সুরবালা কহিল—"যেমন তোমার সংসার গিয়েচে?"

"না গেলেও, যাবার লক্ষণ দেখা দিয়েচে। তোমার ওসব নবাবী চাল আর চলবে না। কিছুতেই চলবে না।"

"স্ত্রীকে যদি খেতে পরতে দিতে না পারবে তো বিয়ে করেছিলে কেন?"

"খাওয়া-পরা মানে তো নবাবী করা নয়। নবাবী আর চলবে না।" বলিয়া অচিন্ত্য বাবু চোখ দিয়া সুরবালার প্রতি যেন এক ঝলক আগুন ছিট্‌কাইয়া দিলেন।

তেমনি আগুন ছিটাইয়া সুরবালাও লাফাইয়া উঠিল—"আলবৎ চলবে।"

তার পরই তুমুলকাণ্ড। প্রথমে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বচসা, তার পর বাদাবাদি তরজা। শেষে তুবড়ি জ্বলিয়া, হাউই উড়িয়া, বোম ফাটিয়া, সারা বাড়ী ধূমে ধূমাচ্ছন্ন! সুরবালার অনাহারে শয়ন এবং অচিন্ত্য বাবুর দ্বিগুণ আহারের পর বৈঠকখানায় রাত্রি যাপন।

* * *

পরদিন প্রভাতে চা পানের পর সুরবালা সাজগোজ করিয়া বাহির হইয়া গেল। নিতাই উঠানের কলতলায় বাসন মাজিতেছিল, মনে মনে কহিল—আজ সকাল থেকেই মা'র বাসন্তুপ!

অচিন্ত্য বাবু আন্দাজ করিলেন, বোধ হয় শ্যামবাজারে দাদার ওখানেই যাইতেছে। সুরবালা কিন্তু ও-পাড়ায় অর্থাৎ যতীন দাস রোডে তার বন্ধু মীনাক্ষীর বাড়ী গেল। মীনাক্ষী তখন "গরমিল"এর স্বরলিপির বই দেখিয়া গান তুলিতেছিল—

'সেই আমি আর সেই তুমি
সেই কুসুমিত বন-ভূমি।'

ঘরে প্রবেশ করিয়াই সুরবালা কহিল, "সেই তুমি—সেই আমি ঠিক আছি বটে, কিন্তু সেই কুসুমিত বনভূমি আর নেই! বনভূমি শুকিয়ে আসচে।" বলিয়া সুরবালা মেঝের পাতা কার্পেটের উপর মীনাক্ষীর পাশে আসিয়া বসিল।

অতঃপর দুই জনের বহুক্ষণ ধরিয়া বহু কথা আলোচনা এবং বহু শলা-পরামর্শ হইবার পর মীনাক্ষী কহিল—"খুব দরকার। এতে আমার খুব মত আর উৎসাহ সুরোদি। এ রকম না হোলে ওঁরা শায়েস্তা হবেন না। ওঁরা বেটা-ছেলে বলে মনে ভাবেন, ওঁরাই সব, আমরা কিছুই নই!"

"তা হলে তোর মত তো?"

"খুব খুব। কিন্তু আর দেরী করো না।"

ব্যাপারটা এই যে—ইঁহারা স্ত্রীরা স্বামীদের অত্যাচার অবিচার দূরীকরণ-মানসে একটা সমিতি গঠন করিবেন এবং রেজোলিউস্যান পাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণে তাহা প্রচার করিবেন।

মীনাক্ষী জিজ্ঞাসা করিল—"বিজলী সেনের কাছে গিয়েছিলে?"

"কোথাও এখনও যাইনি। তোর কাছেই প্রথম এলুম, দেখ্‌না, সাত দিনের মধ্যেই আমি সমিতি বসিয়ে ফেলবো।"

"কি নাম হবে বলো তো?"

"নাম? নাম হবে—নাম হবে—নাম হবে —'স্বামীসংশোধনী সমিতি'। সোজা নামই ভালো।"

একটু ভাবিয়া লইয়া মীনাক্ষী বলিল—'না দিদি, স্বামী নয়। কথাটা 'পতি' দিতে হবে। কেন না, শাস্ত্রীয় কথাটা যখন—'পতি পরম গুরু', 'পতিই সতীর গতি', তখন ও নাম না হোয়ে······"

"কি নাম হবে বল্।"

"পতি-সংশোধনী সমিতি।"

হাসিয়া সুরবালা কহিল—"বেশ। তাই।"

এক সপ্তাহের মধ্যে বাইশ জন সভ্যার একত্র সংযোগে ও ঐকান্তিক আগ্রহে পতি-সংশোধনীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তবুও গৃহের অভাবে এখনও ইহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যালয় স্থাপিত হয় নাই। পতিদের অনুপস্থিতির সুযোগে সভ্যাদিগের কাহারো-না-কাহারো গৃহেই সমিতির বৈঠক বসে এবং কার্য্যপন্থা বিষয়ে আলোচনা পরামর্শ হয়। সেদিন চাঁদিমা দত্তের গৃহে বৈকালিক বৈঠকে ইহাই স্থির হইয়াছে যে, এই হপ্তার মধ্যেই একখানি ঘর ঠিক এবং সমিতির সাইন-বোর্ড ঝুলাইয়া যথারীতি কাজকর্ম সুরু করিয়া দিতে হইবে।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সুরবালা মীনাক্ষীকে সঙ্গে লইয়া ঘর খুঁজিতে বাহির হইল। সদানন্দ রোডে একখানি ঘরের দেওয়ালে 'টু-লেট্' ঝুলিতেছে দেখিয়া মীনাক্ষী দরজার কড়া নাড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই খোলা গা, গলায় পৈতা, ভুঁড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক হুঁকা হাতে তামাক টানিতে টানিতে বাহিরে আসিয়া কহিল—"কাকে চান্?"

সুরবালা কহিল—"রাস্তার ধারের এ ঘরখানা ভাড়া দেওয়া হবে কি?"

"হবে।"

"ভাড়া কত?

"ঘরটি আগে দেখুন একবার, তার পর ভাড়ার কথা হবে।"

ঘর দেখা হইল। বেশ বড় ঘর। দেওয়ালের গায়ে কাচ দেওয়া দু'টো দেয়াল-আলমারী আছে। মীনাক্ষী বলিল—"বেশ হবে সুরোদি। আমাদের সমিতির খাতা পত্তর, কাগজ-টাগজ রাখবার বেশ সুবিধে হবে।"

ভুঁড়িওলা ভদ্রলোক কহিল—"আপনাদের কিসের সমিতি?"

"পতি-সংশোধনী সমিতি।"

তারপর সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া ভদ্রলোক কহিল —"মাপ করবেন, আপনাদের এ রকম সমিতির জন্য ঘর ভাড়া দিতে পারবো না।" ভদ্রলোক আর সেখানে দাড়াইল না; তামাক খাইতে খাইতে ভিতরে চলিয়া গেল।

অতঃপর প্রতাপাদিত্য রোড, রাণী ভবানী রোড ঘুরিয়া দু'জনে সর্দ্দার শঙ্কর রোডে আসিয়া একখানা ভাল ঘরের সন্ধান পাইল। ভাড়া ১৬৲ টাকা। ঘরখানা খুব প্রশস্ত। বাড়ীওয়ালা কহিলেন—"মাঝে একটা পার্টিশন যদি দিয়ে নেন্ তো দু'টো বেড্‌রুম চলতে পারে। আপনাদের ছোট ছেলেমেয়ে ক'জন?"

"আমরা এখানে থাকবো না কেউ, অফিস হবে।"

"সে হলে ভালই হবে। কোন হাঙ্গামা নেই। কিসের অফিস আপনাদের? সেলাইয়ের কলের?"

"না, আমাদের পতি-সংশোধনী সমিতি।"

"পতি-সংশোধনী সমিতি! পতিদের সংশোধন ······দেখুন, আমার এখানে ওটা সুবিধে হবে না। আপনারা অন্যত্র চেষ্টা করুন।"

কয়েক পা ফিরিয়া আসিয়া মীনাক্ষী কহিল—"সুরোদি' তিল্ তিল্ করে ব্যাপারটা কোথায় উঠেছে, দেখচো তো?"

"খুব দেখেচি। তবে না এতদিন পরে আর সহ্য করতে না পেরে এই কাজে নামলুম! কি সাংঘাতিক স্বার্থপর এই পুরুষ জাতটা, একবার ভাব দেখি। স্ত্রীকে মুখে এরা যেটুকু ভালবাসা দেখায়, জানবি সেটা ওদের নিজেদের স্বার্থে। স্ত্রীর জন্যে স্ত্রীকে ভালোবাসে, এ রকম স্বামী······

"স্বামী বলো না সুরোদি—পতি বলো। স্বামী বল্লেই যেন মনে হয়, আমাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব সব ওঁদেরই দখলে।······এই যে একটা 'টু-লেট্' ঝুলছে! একবার দেখ না।"

দরজার কড়া নাড়িতেই একটি সধবা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ঘোমটা দিয়া দরজা ঈষৎ ফাঁক করিল এবং আগন্তুক দুইজন স্ত্রীলোক দেখিয়া সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া কহিল—" কি চান আপনারা?"

যা তাঁরা চান, তা বলতে স্ত্রীলোকটি কহিলেন—" পতি সং······কি বল্লেন আপনারা? থিয়েটারের দল কি আপনাদের? আপনারা নিজেরা বাস করবেন না?"

মীনাক্ষী কহিল—"থিয়েটারের দল নয়। আমাদের হলো—সমিতি! আমরা রাত-দিন কেউ এখানে থাকবো না, খালি দুপুর বেলায় ঘণ্টা দু'তিন করে আমাদের সমিতির কাজকর্ম······"

অতঃপর সুরবালাই পরিষ্কার ভাবে ও খুব সোজা করিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলে পর স্ত্রীলোকটি একটু বিস্ময় ও ভয়ের সহিত কহিল—"আপনারা কাল সকালে একবার আসবেন। বাড়ীর পুরুষ-মানুষরা এখন আফিসে গেছেন। আমি বোলে রাখবো, আপনারা কাল সকালে একবার এসে দেখা করবেন।"

স্ত্রীলোকটি আর অপেক্ষা না করিয়া ভয়ে ভয়ে দরজায় তালো করিয়া খিল লাগাইয়া চলিয়া গেল।

মীনাক্ষী বলিল—"সুরোদি, এ-ও লক্ষণ ভালো বলে মনে হচ্চে না।"

"আমারও তাই মনে হয়। তবুও কাল সকালে এসে খবরটা জেনে যেতে হবে।"

পরদিন প্রাতঃকালেই সুরবালা মীনাক্ষীকে সঙ্গে করিয়া সর্দ্দার শঙ্কর রোডের সেই বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দেখিতে পাইয়া ভিতর হইতে একটি পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসরের ভদ্রলোক বাহিরে আসিয়া কহিলেন—"ঘর-ভাড়ার জন্য কাল আপনারাই এসেছিলেন?"

সুরবালা কহিল—"হাঁ।"

"আপনাদের কিসের সমিতি বলুন তো?"

সুরবালা সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিলে, ভদ্রলোকটি কহিলেন—"বটে! দেখচি মস্ত বড় কাজে আপনারা হাত দিয়েছেন।"

ভদ্রলোকের চোখে-মুখে যেন অসন্তোষের একটা ঢেউ ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। ভদ্রলোক কহিলেন—"এ দিকে আপনাদের ঘর পাওয়া শক্ত! একটা ঠিকানা বলেদি, আপনারা যান, সেখানে ঘর পেতে পারেন, এই—পার্কষ্ট্রীট্ দিয়ে বরাবর পুব মুখে ঢুকে পশ্চিম দিকে পাবেন একটা প্রকাণ্ড তিন্তিড়ী বৃক্ষ, তাকে ডাইনে রেখে বাঁয়ে চলে গেলেই দক্ষিণ দিকে পাবেন একটা কচু-ক্ষেত। ঐ কচু-ক্ষেতের পশ্চিমে রশি চার-পাঁচ গেলেই দেখতে পাবেন ক'খানা বড় বড় ঘর······।

সুরবালা কহিল—'ওঃ, সে তো আমরা জানি। সেটা একটা গাধার খোঁয়াড়। সেখান থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসেও দেখচি তার পথ-ঘাটের কথা সবই আপনার মনে আছে।" বলিয়া মীনাক্ষীর হাতটা জোর করিয়া ধরিয়া সুরবালা হন-হন করিয়া চলিয়া আসিল।

মীনাক্ষী বলিল—"সুরোদি, অভদ্রলোকটাকে বেশ ভালো করে দু'টোকথা শুনিয়ে দিয়ে এলে হতো। ভদ্রঘরের ঝি-বৌদের এমনভাবে······ বলে আসবো সুরোদি—?"

"বৃথা মীনা, বৃথা। ও বলবে এখন, ভদ্রঘরের ঝি-বৌয়েরা কি এমনি করে পথে বেরিয়ে······ বুঝলি না? এদের দু'কথা শুনিয়ে কিছু হবে না। একেবারে ঢেলে সাজবার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই জন্যই তো এই স্বামী সং······"

"আবার স্বামী! স্বামীতেই তোমাকে পেয়ে বসেছে সুরোদি; তোমার দ্বারা আমাদের সমিতি চলবে না। এদিকে কোথা যাচ্ছ?"

"আয় না; রাজা বসন্তরায় রোডটাও একবার ঘুরে যাই।"

শুধু রাজা বসন্তরায় রোড নয়, পরাশর রোড, সাদার্ন এভেনিউ, রাণীভবানী রোড, শ্রীমোহন লেন প্রভৃতি ঘুরিয়াও যখন সমিতির জন্য কোন ঘর পাওয়া গেল না, তখন বেলা প্রায় এগারটা। সুরবালা—বলিল "চ', এবেলা আর নয়। তবে ঘর আমি যেমন কোরে হোক যোগাড়—করবই।"

* * *

"এত দামদিয়ে এত ভাল সাড়ী আনবার কি দরকার ছিল?"

"তুমি পরবে, লতা!"

"ব্লাউজ ত আমার অনেকগুলো রয়েচে, আবার এত ছিট নিয়ে এলে!"

"তা হোক। তোমাকে সাজাবার জন্যে, তোমার সুখের জন্যই ত আমার পয়সা। নাও, 'হ্যাপি বয়'টা খেয়ে ফেল; ওটা যে গলে যাচ্চে!"

"কী মুস্কিল! ও আবার আনলে কেন? তুমি খাও, আমি কিছুতেই খাব না।"

"খেতেই হবে। তুমি যে 'হ্যাপি বয়' ভালবাস।"

বৈঠকখানা-ঘরের ভিতর দিকের দালানে বসিয়া স্বামী তরুবর দত্ত ও স্ত্রী শ্রীমতী লতিকারাণীর কথা হইতেছিল।

লতিকা কহিল—"এই দুর্মূল্যের দিনে তুমি এত বাজে খরচ করতেও পার! কাল নীলাদের বাড়ী বেড়াতে গেছলুম। নীলার মামী বুঝি নীলার মামাকে এক বাক্স সাবান আনতে বলেছিল; তাইতে নীলার মামার কী কাণ্ড! নীলার মামীকে তেড়ে মারতে এলো! বল্লে 'এই দুর্দ্দিনে সাবান! দিন-কতক পরে যে ভাত-ই আর জুটবে না। নীলার মামী ভয়ে আর লজ্জায় এতটুকু হোয়ে গেল।"

তরুবর কহিল—"অত্যাচার! ঘোর অত্যাচার! আমাদের জাতের এই স্বামীগুলো তাদের স্ত্রীদের ওপর কি অত্যাচারই না করে! তারা এত নিষ্ঠুর, এত স্বার্থপর, যে, তা আর বলবার নয়। এই স্ত্রীজাতি সংসার-মরুভূমিতে সুশীতল বারি স্বরূপ, এরা না থাকলে প্রভুদের······কে?"

বাহির দিক হইতে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন আসিল,—"আপনাদের কোন্ ঘর ভাড়া দেওয়া হবে?"

তরুবর তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া দিতেই সুরবালা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তরুবর একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া কহিল—"বসুন, বসুন।"

"আপনারা ক'খানা ঘর ভাড়া দেবেন?"

"একখানা। এই ঘরের ও-পাশের ঘরখানা। একখানা ঘরে কি আপনাদের চলবে? শুধু স্বামী-স্ত্রী আর দু'টি ছেলে-মেয়ে হলে······

"বসবাসের জন্যে নয়। আমাদের সমিতির অফিস করবো। রাস্তার দিকের একটা জানালা খুলে যদি একটা দরজা······"

"সমিতি! কিসের সমিতি?"

"পতি সংশোধনী সমিতি।"

"একটা অনুরোধ করতে পারি কি? এক কাপ চা···ইনি আমার স্ত্রী। মনে করুন, ওঁরই অনুরোধ······"

"তা আমার আপত্তি নেই! চা ত খেয়েই থাকি।" তরুবর হৃষ্ট চিত্তে উঠিয়া গিয়া লতিকাকে মৃদু স্বরে কি বলিতেই লতিকা ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল এবং মিনিট পনেরো কুড়ি পরে একটা রেকাবীতে কিছু জলখাবার ও এক কাপ চা লইয়া আসিল।

ইতিপূর্ব্বেই সুরবালা তরুবরকে তাহাদের সমিতি গঠনের কারণ এবং উদ্দেশ্য বলিয়াছিল। তরুবর কহিল—"ঘর তো আপনাদের দেবোই! ভাড়া যা ইচ্ছে তাই দেবেন। না দিলেও অসন্তুষ্ট হব না। আপনারা যে কাজে নামচেন, এটা খুব হওয়া উচিত। এ কাজে আমার ষোল আনা সহানুভূতি আছে। আমার দ্বারা এতে আপনাদের যতটা সম্ভব সাহায্য হবার, তা হবে জানবেন। স্ত্রী হলো সংসারে শান্তির নির্ঝরিণী! সেই স্ত্রীর ওপর স্বামীরা যে কি অমানুষিক······"

প্রফুল্ল চিত্তে সুরবালা জলখাবার ও চায়ের প্রতি মনোযোগ অর্পণ করিল।

পরদিনই শ্রীযুক্ত তরুবর দত্তের গৃহে "পতি—সংশোধনী সমিতি'র কার্য্যালয় স্থাপিত হইল। পূর্ব্বেই কয়েকখানি চেয়ার, একখানা টেবিল, একটা আলমারী, কাগজপত্র, দোয়াত-কলম প্রভৃতি কেনা হইয়াছিল; ঐগুলি আনাইয়া অফিস সাজানো

হইল। একখানা অতি বৃহৎ সাইনবোর্ডও লেখান হইয়াছিল; উহাও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

তৎপরদিন দ্বিপ্রহরেই অসীম আনন্দ ও উৎসাহের মধ্যে সমিতির উদ্বোধন হইয়া কার্য্য সুরু হইল। বাইশ জন সভ্যার একমতানুসারে সুরবালাই সমিতির প্রেসিডেণ্ট এবং বিজলী সেন সেক্রেটারী মনোনীত হইল। উদ্বোধন-বক্তৃতায় সুরবালা কহিল—"নর-নারী লইয়াই জগৎ। এই সর্ব্বসুখের আধার পৃথিবী কেবলমাত্র নরের বা কেবলমাত্র নারীর নহে। উভয়েরই সমানাধিকার। এই বিশাল বিশ্বের সর্ব্বদেশেই দেখিবেন, উভয়ের এই সমানাধিকার শুধুই অব্যাহত রাখা হয় নাই; দেখিবেন সর্ব্বদেশের নারীর মান-মর্য্যাদা, আদর কত বেশী! কিন্তু আমাদের এই হতভাগ্য দেশে নারীরা কিরূপ লাঞ্ছিতা, কিরূপ অনাদৃতা, কিরূপ negleated—অর্থাৎ কি না তাচ্ছিল্যক্লতা, আপনারা সকলেই তাহা জানেন। নারীর প্রতি দেশব্যাপী এই দুর্ব্যবহারের প্রতীকার মানসে আজ আমরা······ "—ইত্যাদি।

চাঁদিমা দত্ত উঠিয়া প্রস্তাব করিল—"আমি প্রস্তাব করি, স্ত্রীর প্রতি স্বামীদের আচার-ব্যবহার সংশোধন উদ্দেশ্যে আমাদের এই সমিতির নাম হউক—"পতি সংশোধনী সমিতি'।"

মীনাক্ষী টপ্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"শ্রীযুক্তা চাঁদিমা দত্তের প্রস্তাবের মধ্যে একটি কথার প্রতিবাদ করি। তাঁহার কথাগুলির মধ্যে 'স্বামীদের' এই কথাটির বদলে 'পতিদের' এই কথাটি ব্যবহার করা হউক।"

অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমতীদিগের যত্নে এবং উৎসাহে সমিতির শ্রী পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সভ্যা-সংখ্যা বাইশ হইতে সাড়ে সাতান্নয় আসিয়া পড়িল। কুহেলিকা চ্যাটার্জ্জী নামে একজন সভ্যাকে ঠিক পুরা পত্নী বলা যায় না; যেহেতু তিনি স-পত্নী, তাঁহার সতীন আছে এবং সেই সতীন অত্যন্ত স্বামীগতপ্রাণা। সেই হেতু তিনি সভ্যাশ্রেণীভুক্তা হন নাই। সুতরাং শ্রীমতী কুহেলিকা চ্যাটার্জ্জীকে অর্দ্ধ-সভ্যা ধরা যাইতে পারে এবং এই কারণেই সভ্যার সংখ্যা সাড়ে সাতান্ন।

প্রত্যহই দ্বিপ্রহরে সমিতি বসে; কেবল রবিবারে বন্ধ থাকে। পথিকেরা সাইনবোর্ডখানা দেখিয়া সচকিতে দাঁড়াইয়া পড়ে। ইহা লইয়া পাড়ায় পাড়ায় গৃহে গৃহে বেশ একটু আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল।

লতিকার যদিও সভ্যাশ্রেণীভুক্ত হইবার কোন আবশ্যক বা কারণ নাই; যেহেতু, স্বামী তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত এবং প্রেমশীল, তথাপি সমিতির প্রতি তাহাদের পতি-পত্নীর অগাধ সহানুভূতি। তরুবর লতিকাকে বলিল—"তুমিও ওদের একজন সভ্য হলে পারতে।"

লতিকা মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল—"আমি অসভ্যই থাকি।"

তারপর গুন্‌ গুন্‌ করিয়া সুরের সঙ্গে কহিল—"তুমি তরু, আমি লতা, আবার বলো কিসের কথা!" —আনন্দে গর্ব্বে ও আত্মপ্রসঙ্গে তরুবরের হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

* * *

ঠং ঠং।

সমিতির ক্লকটায় দু'টা বাজিল এবং তখনই সমিতির কাজ আরম্ভ হইল।

রেবা সমাদ্দার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"আজ আমার একটা প্রস্তাব আছে।"

সুরবালা কহিল—"বলুন!"

"দেখুন, পুরুষরা কতদূর আমাদের······"

চঞ্চলা চৌধুরী কথাটায় বাধাদান করিয়া কহিল—"পুরুস বল্‌লে ব্যাকরণ-গত একটু দোষ হযে পড়ে। আমাদের লক্ষ্য সমস্ত পুরুষ জাতি নয়, আমাদের লক্ষ্য শুধু পতিরা।"

প্রেসিডেণ্ট হিসাবে সুরবালা বলিল,—"উনি যে পুরুষদের কথা বলছেন, নিশ্চয়ই তাঁরা কারো না কারো পতি ছিলেন। আপনি বলে যান।"

রেবা সমাদ্দার বলিয়া যাইতে লাগিল—'পুরুষরা আমাদের কি পরিমাণে হেয় জ্ঞান করে আসছে, একবার ভেবে দেখুন। এরা আমাদের হীন প্রতিপন্ন করবার জন্য শাস্ত্রের মধ্যে পর্য্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে—'পথে নারী বিবর্জ্জিতা!' —'স্ত্রী-বুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী' ইত্যাদি। আমাদের বিরুদ্ধে ঘরোয়া প্রবাদ সৃষ্টি হতেও বাকী থাকে নি—

'বনের সাপ বনে থাকে,
ঘরের সাপ নারী।
দুধ-কলা দে পুষবে তবু—
ছোবল্‌ খাবে তারি।

ইংরেজদের বাইবেলে পর্য্যন্ত মানব জাতির

দুঃখের জন্য নারীকে অর্থাৎ ঈভ্‌কে দায়ী করা হয়েচে !—এর একটা বিহিত করা কর্ত্তব্য।"

নীহার গাঙ্গুলী কহিল—"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এ প্রস্তাবের সমর্থন করচি। এ বিষয়ে জোর প্রবন্ধ লিখে সংবাদপত্রে এবং মাসিক পত্রে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।"

এই সময়ে ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া শ্রীমতী স্বস্তিকা সোম সুরবালাকে কহিল—"আমাদের দুঃখের আর পার নেই। দেখুন, আমার পতি হচ্চেন একজন কবি। চব্বিশ ঘণ্টাই তিনি মশগুল হয়ে আছেন; জ্যান্ত কবিতার দিকে একবারও ফিরে তাকান না। লেখবার সময় কাছে গেলে মুখ-টুক সিঁট্‌কে দূর-দূর করে তেড়ে আসেন।"

সুরবালা সমবেদনার স্বরে কহিল—"কবিতা আর বনিতা দুই-ই সমশ্রেণীর আরাধনার বস্তু! এ হলো শাস্ত্রীয় বচন। তবে এটা হলো কলিকাল কিনা, সুতরাং উল্টো বিচার হবে। আপনি বিনা আরাধনাতে যদি কাছে যান, দূর দূর করে পতি ত তেড়ে আসবেই। আপনি কি বলেন?" বলিয়া সুরবালা তাহার এ-পাশের সভ্যাটির দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন—"ওঁকেতো শুধু তেড়ে আসেন, আমাকে মারেন!"

সবিস্ময়ে সুরবালা কহিল—"মারেন!"

"মারেনই তো। সে দিন বই পড়তে-পড়তে হাতের বইখানা ছুড়ে মারলেন।"

"অপরাধ?"

"অপরাধ, একটু বায়োস্কোপ দেখবার সখ আছে! তা আমার দু'একজন পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখতে যাই। তাতে কি অপরাধ, তা এই সাত বছরেও বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না। সে দিন মিষ্টার মুখার্জ্জীর সঙ্গে 'গোপন প্রেম' দেখতে গিয়েছিলুম! বাড়ী ফিরে আসতেই……"

বাধা দিয়া ওধারের একটি সভ্যা—শ্রীমতী বন্দিনী নন্দী বলিয়া উঠিলেন, "আরে, আপনি তো বন্ধুদের সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখতে যান! আমি কোথাও যাই না, দিন রাতই ঘরের কোণে পড়ে থাকি……"

মৃদু হাস্যের সহিত সুরবালা কহিল—"সে তো আপনার নামেতেই প্রকাশ। তা, কি বলছিলেন বলুন।"

"বলছিলুম যে, দিনরাতই ঘরের কোণে বন্দিনী হয়ে আছি। আর উনি রোজ সন্ধ্যা না হতেই সেজে-গুজে সেণ্ট মেখে ঘড়ি-ছড়ি নিয়ে পান চিবুতে চিবুতে বেরিয়ে যান আর ফেরেন রাত একটা দু'টোয়। কোন দিন বা ফেরেনই না। তাই আর থাকতে না পেরে সেদিন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করতে গেলুম—"

"তাতে কি জবাব দিলেন?"

"মুখের জবাব কিছু পেলুম না! পেলুম তাঁর ছড়ির জবাব—পিঠের ওপর!"

রাগে আর দুঃখে সকলেরই মুখের ভাব কি এক রকম হইয়া গেল।

এই সময়ে সভ্যা হইবার ইচ্ছায় তিন জন নবাগতা প্রবেশ করিল। সেক্রেটারী বিজলী সেন তাহাদের নাম-ধাম আদি রেজেষ্ট্রীভুক্ত করিতে বসিল।

"আপনার নাম?"

"মৌমাছি মিত্র।"

"ঠিকানা?"

"৩।২, ফুলবাগান এভেনিউ।"

"আপনার নাম?"

"নিশাথিনী গুপ্ত।"

"আপনার পতির পেশা?"

"পেশা?—দিনরাত আমায় গালাগালি। এখন চাকরী নেই, পেন্সন নিয়েছেন। যতদিন চাকরী ছিল, দুপুর বেলাটা তবু একটু রেহাই পেতুম! এখন চব্বিশ ঘণ্টাই আমার সঙ্গে লেগে আছেন।"

সকলের মিশ্র চাপা হাসিকে ঠেলিয়া মীনাক্ষীর উচ্চ হাসিতে ঘরখানা ভরিয়া উঠিল।

"আপনার নাম কি ভাই?"

"অভাগিনী ব্যানার্জ্জী।

"পতির নাম?"

ফালীফরণ ব্যানার্জ্জী।"

ফের একটা চাপা হাসির রোল উঠিল। সুরবালা কহিল—"বুঝলুম, আপনার পতির নাম 'কালী' উচ্চারণ করবেন না বলে 'ফালী'—কিন্তু 'চরণে'র বদলে 'ফরণ' কেন?"

"ওটা যে আবার আমার শ্বশুরের নাম।"

মৃদুহাস্যে সুরবালা কহিল—"আপনি এত আইন-সঙ্গত হিসেবে চলেও পতির কাছ ছেকে নিশ্চয়ই অবিচার পাচ্ছেন। আপনার ভাগ্যে আর নামে যথার্থই মিল হয়ে গেছে।"

অতঃপর বিজলী সেন খাতার উপর হইতে দৃষ্টি

তুলিয়া কহিলেন—"আর কেউ নতুন সভ্যা নেই তো?"

"আমি আছি"—বলিয়া বিমর্ষ মুখে লতিকা ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রথমটায় সকলে মনে করিয়াছিল—স্বামী-ভাগ্যে ভাগ্যবতী লতিকার ইহা রহস্য মাত্র! কিন্তু তাহার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সহিত সকলে ইহা সত্য বলিয়া স্থির করিল।

লতিকা সুরবালার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরের বারান্দার এক কোণে লইয়া গেল। সেখানে একখানা বেঞ্চ পাতা ছিল, দুই জনে তাহাতে বসিল। লতিকা কহিল—"দিদি, আপনাদের ধারণাই ঠিক। স্বামীরা যে এত স্বার্থপর, এদের ভালোবাসা যে খালি মুখের ভালোবাসা, তার মধ্যে যে কোন আন্তরিকতা নেই, এতদিন পরে আমি তা বুঝলুম।"

"কি হয়েচে বলুন তো?"

"আমি জানতুম অন্তরে আমার স্বামী আমাকে খুবই ভালোবাসেন। কিন্তু আজ তাঁর আসল রূপ বের হয়ে পড়েচে।" বলিয়া লতিকা নীরবে মুখ নীচু করিয়া রহিল। সকল কথা তাহার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না; আবার না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছে না! অবশেষে সুরবালার পীড়াপীড়িতে সব কথা খুলিয়া বলিল। যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

লতিকার পিতা একজন পয়সাওয়ালা কণ্ট্রাক্টর ছিলেন। লতিকা তাঁহার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল বলিয়া মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি লতিকাকে ২১ হাজার টাকা দিয়া যান। টাকাটা লতিকার নামে ব্যাঙ্কে জমা ছিল। সে আজ তের বৎসরের কথা। লতিকার তখন সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে। তরুবর সেই ২১ হাজারের মধ্যে এই কয় বৎসরে ১৫ হাজার টাকা লতিকার দ্বারা ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া লইয়া সংসার খরচ চালাইয়াছে। এদিকে লতিকার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাংসারিক অবস্থা বর্ত্তমানে কোন কারণে হঠাৎ হীন হওয়ায় কোন একটা ব্যাপারে বিশেষ বিপদ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং সে বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য গোপনে সে ভগিনীর শরণাপন্ন হয়। লতিকাও গোপনে তাহাকে ঐ ছয় হাজার টাকার মধ্যে ৫ হাজার টাকা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। গত কাল সে তাহার দাদার বাড়ী গিয়া তাহার সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কাজটা গোপন না থাকিয়া কালই তরুবর কি করিয়া তাহা জানিতে পারে এবং লতিকা সন্ধ্যার পর এ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ দিয়া সে যে কাণ্ড বাধায়, তাহা ইতর শ্রেণীর মধ্যেও দেখা যায় না!

সমস্ত শুনিয়া সুরবালা কহিল—"তা হোলে বিষম রেগেচেন?"

"সাংঘাতিক।"

"তা হোলে বলুন, ১৩ বৎসরের পোষা বেড়াল এক দিনেই বুনো বাঘে পরিণত?"

"ঠিক তাই। সকাল সকাল খেয়ে ব্যাঙ্কে গেছেন, পাকা খবরটা জানবার জন্যে। এসেই আবার কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাবেন! কি ভয়ানক স্বার্থপর বলুন ত? স্বামী জাতটাই দেখচি——বর্ণচোরা! কখন যে কি······

"দেখুন, স্বামীরা নিজের আনন্দের ঝুলি ভরাবার জন্যই স্ত্রীকে ভালবাসে। স্ত্রীকে ভালবেসে তাঁরা নিজেরা আনন্দ পান। স্ত্রীর জন্যে স্ত্রীকে তাঁরা ভালবাসেন না।"

"যাই হোক, আজ থেকে দিদি, আমিও আপনাদের সমিতির সভ্যা হব; আমার নামটাও আপনাদের খাতায় লিখে নিন্।"

"চলুন। আজ শনিবার; সমিতি এখনি বন্ধ হবে।"

"কাল রবিবার; বন্ধ থাকবে?"

"নিশ্চয়।"

তখন দুই জনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে-রাত্রে তরুবর আর গৃহে ফিরিল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত লতিকা অনাহারে জানালার ধারে বসিয়া থাকিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। রাস্তার 'ব্ল্যাক্-আউটে'র সঙ্গে তাহার মনের 'ব্ল্যাক-আউট' মিশিয়া একাকার হইল। রাত প্রায় একটা পর্য্যন্ত এইভাবে থাকিয়া লতিকা শয়ন করিল।

পরদিন বেলা প্রায় একপ্রহরের সময় তরুবর যেন ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অবস্থায় গৃহে ফিরিল। তাহার চক্ষুদ্বয় ভীষণ ক্রোধব্যঞ্জক, দৃষ্টি জ্বালাময়। সঙ্গে তাহার মামাতো ভাই পরেশনাথ। নিষ্কর্ম্মা পরেশনাথ পূর্ব্বে তরুবরেরই অন্ন ধ্বংস করিত, আর চায়ের দোকানে দোকানে আড্ডা জমাইত। লতিকা তাহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না।

অনেক চেষ্টায় তাহাকে সে এ-বাড়ী হইতে তাড়াইয়াছিল। আজ তরুবর তাহাকে লইয়াই গৃহে ফিরিল। তরুবর আসিয়াই হাতের ছাতাটা টান মারিয়া একধারে ফেলিল; জুতা-জোড়াটা বারান্দার কোণে ছুঁড়িয়া দিল। দালানের দড়িতে লতিকার একখানা ভাল সাড়ী শুকাইতেছিল, ফড়্ ফড়্ করিয়া সেখানা ছিঁড়িয়া তাহারই একটা ফালি দিয়া মুখের ঘাম মুছিল; তারপর পরেশনাথের উদ্দেশে কহিল—"পরেশ.! খিচুড়ী য়্যাণ্ড মাংস। লে আও মুরগী, পেঁয়াজ, আদা য়্যাণ্ড এট্‌সেট্‌রা।"—বলিয়া তাহার হাতে একখানা পাঁচ টাকার নোট দিয়া সারা বাড়ীময় বীরদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বেলা প্রায় দুইটার সময় দু'জনের খিচুড়ী য়্যাণ্ড মাংস ভোজন হইয়া গেলে তরুবর বলিল—"এইবার 'পতি-সংশোধনী সমিতি'র শ্রাদ্ধ করতে হবে। আয় পরেশ।"

অতঃপর সমিতি-ঘরের তালা ভাঙ্গা হইল এবং আলমারী, র‍্যাক, টেবিল, কাগজ-পত্র ইত্যাদি সব তচ্-নচ করা হইল।

পরেশ কহিল—"এ সব নষ্ট না কোরে, আসুন না দাদা, এইখানে আমরা একটা সমিতি বসাই।" ঠাট-বাট সবই তৈরী।

"ঠিক বলেছিস পরেশ! আমরা এখানে 'স্ত্রী সংশোধনী সমিতি' বসাবো। আজ থেকেই বসাবো। স্ত্রীদের একবার জব্দ করতে হবে।"

এই সময় একজন আগন্তুক জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই ঘরেই কি 'পতি সং·········

পরেশ কহিল—"এখন আর 'পতি-সং' নয়, এখন 'স্ত্রী-সং'।"

তরুবর ভদ্রলোকটিকে সাদরে আহ্বান করিয়া ভিতরে আনিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এঁদের কর্ত্তা হোলেন কে?"

"কর্ত্তা নয়, কর্ত্রী। তাঁর নাম হোল শ্রীমতী সুরবালা দাসী। চেনেন না কি?"

"বিশেষ ভাবে। চোখে সোনার চশমা আছে ত? বাঁ চোখের ভুরুর পাশে একটা তিলও আছে; কেমন কি না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

একটু হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"সেই 'তিল-উত্তমা'ই এই 'নর-অধম'এর অর্দ্ধাঙ্গিনী।"

"তাই না কি!"

তখন প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া তরুবর ও অচিন্ত্য বাবুর মধ্যে বহু কথা, বহু আলোচনা, বহু পরামর্শ হইল। উভয়ের আনন্দ আর ধরে না!

অচিন্ত্য বাবু আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে কহিলেন—"তা হোলে শুভকাজে বিলম্ব উচিত নয়। আসুন, আজ থেকেই আমাদের 'স্ত্রী সংশোধনী' সুরু করা যাক্। এঁদের এইসব খাতা-পত্রেই কাজ চলবে। আজ হোল রবিবার, আজ আর ওঁরা আসবেন না। কাল এসেই দেখবেন যে·········

"সাইন বোর্ডখানা আজই তা হোলে বদলে ফেলতে হবে।"

পরেশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল—"তার জন্যে আর ভাবনা কি! আমার একজন চেনা লোক আছে; তাকে আমি এখনি ডেকে আনচি।"

তখনই পরেশ বাহির হইয়া গেল এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রং, তুলি প্রভৃতি সমেত সাইন্ বোর্ডওয়ালাকে ধরিয়া আনিল।

বোর্ডখানা দেখিয়া লোকটি বলিল—"আজ আর কি করে হয়! ওটা খুলে নামাতে হবে, তারপর পোঁচড়া টেনে, নতুন একটা জমি কোরে নিয়ে শুকোতে হবে, তারপর তার ওপর লিখতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি কোরলেও দুটোদিনের কমে হবে না, মশাই।"

মহা মুস্কিল!

সকলেরই মন খারাপ হইয়া গেল। তরুবর বলিল—"তাই ত, কি করা যায়! আমাদের এই তেরস্পর্শ-যোগে আজকেই কাজ সুরু করতে পারলে বড় ভাল হোত।"

হঠাৎ অচিন্ত্য বাবু লাফাইয়া উঠিলেন—"আজকেই হবে, এক্ষুনি হবে। দেখ বাপু, এক কাজ করো। তোমায় বোর্ড নামাতে হবে না, জমীও করতে হবে না, নতুন কোরে কিছু লিখতেও হবে না। তুমি শুধু আমাদের পায়ের তলায় একটা পেরেক ঠুকে দাও!"

সকলে অবাক হইয়া অচিন্ত্য বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"বুঝতে পারলে না? সব যেমন আছে, তেমনি থাকবে; শুধু—'পতি'র 'ত'য়ের নীচে একটা 'ন' জুড়ে দাও; আর 'f' কারে একটা পোঁচ ড়া দিয়ে 'ত্ন'য়ের পাশে একটা "ী" বসিয়ে দাও। তা'হলেই কাজ হবে। একেবারে 'পত্নী'

সংশোধনী সমিতি'। ও স্ত্রী আর পত্নী একই কথা। বুঝলে না? তবে, চার ধারে বেশ একটু রং-চংয়ে বর্ডার এঁকে দিও।"

সাফল্যের আনন্দে তখন তরুবর ও অচিন্ত্য বাবু ঘরের বাতাসকে তোলপাড় করিয়া একটা বিকট কোলাহল তুলিল।

তৎক্ষণাৎ একটা মই আসিয়া পড়িল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই 'পতি সংশোধনী সমিতি' 'পত্নী সংশোধনী সমিতি'তে পরিণত হইয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল।

অতঃপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 'পত্নী সংশোধনী'র উদ্বোধন-কার্য্য চলিল। তারপর অচিন্ত্য বাবুর দিকে চাহিয়া সহাস্যে এবং জোড় হাতে তরুবর কহিল—"একটি সবিনয় নিবেদন।"

"অনুমতি করুন।"

আজকের শুভদিনে এইখানে একটু ভোজনের আয়োজন·········

তেমনি হাসিতে হাসিতে অচিন্ত্য বাবু কহিলেন —"কোন আপত্তি নেই।"

সুতরাং তৎক্ষণাৎ পরেশকে বাজারে ছুটিতে হইল। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"এ বেলা তা-হোলে কি হবে, বলুন।"

"ও-বেলা হয়েচে খিচুড়ী য়্যাণ্ড মাংস, সুতরাং এ-বেলা হোক— পোলাও ধ্বংস। যাও, জোগাড় কোরে ফেল।"

* * *

পরদিন প্রাতে পথিকের দল সমিতির নূতন সাইন বোর্ড দেখিয়া সচকিতে দাঁড়াইয়া ভীড় জমাইতে লাগিল। তাহার মধ্য হইতে কে-একজন বলিল—"এ নিশ্চয় ভুতুড়ে কাণ্ড! রাতারাতি ভূতের আমদানী হোয়েচে!"

দেখিতে দেখিতে এ-পাড়া, ও-পাড়া, সে-পাড়া হইতে বহু ভদ্রলোক এবং অভদ্রলোক আসিতে আরম্ভ করিল এবং সেই সকাল বেলাতেই দেখিতে দেখিতে বহু পতি সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া গেল।

'পতি সংশোধনী'র নূতন সভ্যা তিন জন— মৌমাছি, নিশীথিনী ও অভাগিনী—তাহাদেব নূতন উৎসাহের জন্য সেদিন বেলা একটার পূর্ব্বেই সমিতিতে যোগদান করিবার জন্য আসিয়া দেখে, তাহাদের সাইনবোর্ডস্থ 'পতি' বোর্ড ত্যাগ করত আফিস-ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দলবদ্ধ হইয়াছে এবং সকলে মিলিয়া বিষম হট্টগোল সুরু করিয়াছে। ব্যাপার দর্শনে তিনজনে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া অদূরবর্ত্তী এক বকুলতলার ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইল। কিছুপরে আরও পাঁচ-সাতজন সভ্যা আসিল; তাহাদের সঙ্গে ছিল—মীনাক্ষী। তাহাদেরও গিয়া বকুলতলায় আশ্রয় লইতে হইল। তাহার পর আসিল—সুরবালা। সুরবালা আসিয়া দেখিল, ঘরের সম্মুখে ভীড় জমিয়াছে এবং ভিতরে মহা হট্টগোল! সেই হট্টগোলের মধ্যে অচিন্ত্য বাবু উচ্চগলায় বলিতেছেন—" 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'—এই কথাটাকে আমাদের গ্রন্থ থেকে একেবারে বাদ দিতে হবে। আর গভর্ণমেণ্টের কাছে 'ডেপুটেশান্' পাঠিয়ে অনুরোধ করতে হবে যে, যেহেতু, পত্নীদের পতিনিন্দা ছাড়া আর দ্বিতীয় কাজ নেই, সেহেতু, উহাদের 'এ-আর-পি-'তে নিযুক্ত করা হোক্।"

একবার উর্দ্ধদৃষ্টিতে সাইনবোর্ড খানার দিকে চাহিয়া সুরবালাও বকুলতলায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে তাহার বুকের মধ্য হইতে একটা সুগভীর নিঃশ্বাস বাহির হইয়া বকুলতলার বাতাসের সহিত মিশিয়া গেল।

মীনাক্ষী কহিল—"সুরোদি, এই ভীষণ অত্যাচার সামনে দেখেও নেহাৎ অবলারই মত এই বকুলতলায় দাঁড়িয়ে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে?"

"কি কোরব বল?"

"কি করবে! এখনো ভয়ে-ভয়ে থাকা? আজ বাদে কাল যখন 'ডিভোর্স য়্যাক্‌ট্' পাশ হতে যাচ্চে, তখনো তুমি···········

"পারবে তোমরা?"—উৎসাহিত হইয়া সুরবালা কহিল—"পারবে তোমরা? ওই ভূত প্রেতের দলকে গলাধাক্কা দিয়ে সমিতি-ঘর থেকে দূর কোরে দিতে পারবে?"

সকলে সমস্বরে বলিল—"পারবো, নিশ্চয় পারবো।"

তখন অপূর্ব্ব ভঙ্গী এবং বীরত্বের সঙ্গে সকলে সমিতি-ঘরের দিকে ধাবমান হইল।

মাটীর স্বর্গ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

মাটীর স্বর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার মধ্যেই একধারে গোপাল নাপিতের ঘর ছিল। সারা গ্রামখানিতেই তাহার একচেটিয়া ব্যবসা; অর্থাৎ গোপালের কাছেই গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলেই নখ কাটিত, চুল কাটিত, দাড়ি কামাইত। কারণ, দ্বিতীয় ঘর নাপিত গ্রামে আর ছিল না। নাপিত-বৌও সংসারের কাজ-কর্ম্ম সারিবার পর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত না, কিছু কিছু উপায় সে-ও করিত। লোকের বাড়ি-বাড়ি গিয়া, বউদের নখ কাটিয়া, পায়ে ঝামা ঘসিয়া, আলতা পরাইয়া দিত, আর হাসিতে হাসিতে মিঠে কথায় গল্প জমাইয়া আসিত। স্বামীর মত না হইলেও এই কাজে সে-ও বেশ দু'পয়সা ঘরে আনিত। ইহা ছাড়া, নাপিত-বৌয়ের সুমধুর স্বভাবের জন্য ভালবাসা জিনিষটা সকলেরই নিকট হইতে তাহার উপরি-পাওনা ছিল। এদিকে গ্রামের বিয়ে-পৈতা, ব্রত-নিয়ম প্রভৃতি কার্য্যেও গোপালের যথেষ্ট পাওনা ছিল। পাড়ার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মধ্যে মধ্যে তাই গোপালকে তামাসা করিয়া বলিতেন—"গোপলা রে, আমার পুঁথি-পঞ্জিকের ধারের চেয়ে তোর ক্ষুরের ধার এদিকেও বেশী, ও দিকেও বেশী।" গোপাল মাথা নোয়াইয়া যোড়হাত কপালে ঠেকাইয়া, মৃদু-মৃদু হাসিতে হাসিতে স-সম্ভ্রমে জবাব দিত—"সবই ঐ ছিচরণের আশীর্ব্বাদে, ঠাকুর!"

শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে সত্যই গোপাল নাপিতের কোন দুঃখই ছিল না। তাহার ক্ষুদ্র গৃহখানির উপর মা-লক্ষ্মী যেন তাঁহার সচ্ছলতার অঞ্চলখানি বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার বিশ বিঘা মাল জমী এবং তাহার আবাদের জন্য এক যোড়া হেলে গরু ছিল। চাষের সময় সে কৃষাণ ভাড়া করিয়া জো বুঝিয়া, ঠিক সময়ে তাহার জমীগুলির আবাদ করাইয়া লইত এবং তাহার ফলে সেই বিশ বিঘা জমীর সমস্ত সোনাটুকুই মাঠ হইতে বহিয়া আনাইয়া বছর-বছর সে তাহার মরাই ভরাইত। তাহার নিষ্কর ভিটাটুকুর পশ্চাতে খিড়কীর বাগানখানি ও ডোবাটিও তাহার ঐ নিষ্করেরই সামিল ছিল। প্রত্যহ পাড়া ঘুরিয়া কামাইয়া আসিয়া সে তাহার ছোট্ট ঘুরণী জালখানি একবার করিয়া ডোবায় ফেলিত এবং তাহাতেই যে বাটা, পুঁটি, চুনা, মৌরলা প্রভৃতি পড়িত, তাহাতেই তাহার ক্ষুদ্র সংসারে আবশ্যকের অধিক হইয়া যাইত। এ সমস্ত ছাড়া, গ্রামের জমীদারের কাছ হইতে কয়েক বিঘা আউস-জমীও সে 'চাকরাণ' পাইয়াছিল। আশ্বিনে 'আউস্' কাটা হইয়া গেলে পর ঐ জমীতে গোপাল, কলাই বুনিয়া তাহার বছর-খোরাকী কলাইয়ের সংস্থান করিয়া লইত। কোন কোন বৎসর ঐ জমীর ভিতর কিছু জমীতে সে সার খরচ করিয়া, ভালরূপে জমীর পাট ও তদ্বির করিয়া আলু দিবারও ব্যবস্থা করিত। খিড়কীর বিশ পঁচিশটি খেজুরগাছ শিউলীদের শীতের সময় জমা করিয়া বছর শালিয়ানা এক মণ সওয়া মণ হিসাবে গুড়ও গোপাল পাইত। এ সমস্ত বাদে তাহার গোয়ালে দুগ্ধবতী যে দুইটি গাভী ছিল, তাহাদের প্রতি নাপিত-বৌয়ের যত্ন-পরিচর্য্যাব আর অন্ত ছিল না। সুতরাং গোপাল নাপিতের সংসারের ক্ষুদ্র ঠাটখানির উপর মা-লক্ষ্মী যে তাঁহার আলতা পরা রাঙ্গা পা দুইখানি রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও গোপাল হঠাৎ একটি ভুল করিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহা করিয়াছিল বলিয়াই আজ এই গল্পটির উৎপত্তি হইতে পারিল।

গোপালের যে কাজটিকে ভুল বলিয়া বলা হইতেছে, অবশ্য এখনকার দিন হইলে লোক তাহাকে খাঁটি নির্ভুলই বলিত। কিন্তু দেশের তখনকার সে-দিনে আর এখনকার এ-দিনে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তখনকার সে রামও এখন নাই, সে অযোধ্যাও নাই, তখন এই শ্যামসুন্দরপুর গ্রামেই—কিন্তু সে কথা থাক্, যাহা বলিতেছি, তাহাই বলি;

গোপাল একটি ভুল করিয়া ফেলিয়াছিল; অর্থাৎ পুত্র নেপালচন্দ্রের বয়স, বছর দশেক হইল, গ্রামের পাঠশালা হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া কেশব-বাটীর ইংরাজী স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল।

গোপীনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণের বাঁধান বকুল-বেদীর মজলিসে বসিয়া গ্রামের বালকদিগের মধ্যেও এই কথা লইয়া একটা আন্দোলন আলোচনা হইয়া গেল এবং আলোচনার ফলে সর্ব্ববাদিসম্মতক্রমে মন্তব্য প্রকাশিত হইল যে, গোপাল জাত-ব্যবসা এবং চাস-আবাদাদি না শিখাইয়া ছেলেকে ইংরাজী স্কুলে পড়িতে দিয়া যাহা করিয়াছে, তাহা যে শুধু তাহার নিজের পক্ষেই অশুভ তাহা নহে, সমাজের পক্ষেও অশুভ এবং শাস্ত্র হিসাবেও ঘোর অসঙ্গত।

গোপালকে সকলেই যথেষ্ট ভালবাসিত। তাহার মঙ্গলের জন্য কথাটা সকলেই তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে গোপাল সকলকেই সবিনয়ে জানাইল—"একটা ছেলে—শিবরাত্রির সল্‌তে, কখন আছে—কখন্ নেই—বড্ডই ঝোঁকটা ধরেছে ইংরিজী পড়বার জন্যে! ওর গেরোভ্যধারিণীরও বড্ড সাধ যে—আপনারা সব দেবতা, আপনাদের পাঁচজনকার আশীর্ব্বাদে ছেলেটা যদি বাঁচে আর একটু মানুষ হয়!"

'গেরোভ্যধারিণীর' নাম দিয়া গোপাল যাহা বলিল, তাহা নিছক মিথ্যা। কারণ নাপিত-বৌ-ই একদিন গোপালকে কহিল—"ছেলে কি জজ হবে, না হাকিম হবে যে ইংরিজী স্কুলে দিলে? দু'কলম লিখতে শিখেছে, এই ঢের। ওকে ক্ষুর-কাঁচি ধরতে শেখাও, কিষাণের সঙ্গে মাঠে পাঠাও, চাষ-আবাদ-গুলো একটু-আধটু দেখা-শুনো করুক।" স্ত্রীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া গোপাল নীরবে বিজ্ঞের মত শুধু বার দুই মাথা নাড়িল।

পাড়ার হীরু ঠাকুর গাঁজার আড্ডার মালিক ছিল। বত্রিশ ছিলিম করিয়া সে রোজ গাঁজা খাইত। রটনাটার মধ্যে হয় ত অতিরঞ্জন-দোষ একটু থাকিতে পারে, কিন্তু বড় বড় গাঁজাড়ীকে তাহার কাছে যে হার মানিতে হইত, সে বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নাই, তেমনই আশ-পাশের দশ-বিশখানা গ্রামের গঞ্জিকাভক্তেরা তাহাকে যে গুরু বলিয়া স্বীকার করিত, তাহাও সত্য। কিন্তু শুধু এইটুকুমাত্রই হীরুঠাকুরের পরিচয় দিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। তাহার অন্য পরিচয়ও আছে এবং সংক্ষেপতঃ তাহা এই:—

হীরু ঠাকুর তাহার পিতার টোলে সংস্কৃত পড়িতে পড়িতেই কেশববাটীর স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পাশ করিয়াছিল। তাহার পর বর্দ্ধমানে থাকিয়া রাজ-কলেজে যখন এফ-এ পড়িতেছিল, এই সময় তাহার সহিত এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হইয়া উঠে। অতঃপর পরীক্ষার দিন তিনেক বাকী থাকিতে তাঁহার সহিত হীরু তীর্থ-ভ্রমণে চলিয়া যায়। বৎসর দুই তিন পরে, একই সময়ে তীর্থক্ষেত্রে তাহার সন্ন্যাসী গুরুদেবের এবং দেশে পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। সুদূর সন্ন্যাসাশ্রমের বৃক্ষমূলে বসিয়া হীরু পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইল, কারণ, সুদূর ব্যবধানে থাকিলেও বাটীর সংবাদ সে রাখিত। সংবাদ পাইয়াই হীরু বৃক্ষমূল ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল এবং উত্তরাধিকারসূত্রে গুরুদেবের পাইল—গঞ্জিকার কলিকা প্রভৃতি এবং পিতার পাইল—দেশের জমিজমা প্রভৃতি স্থাবর ও অস্থাবর। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত হীরু ঠাকুর উক্ত দুই দ্রব্য নির্ব্বিবাদে ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছে।

নেপালের সম্পর্কে এই হীরু ঠাকুর এক দিন গোপালকে কহিল—"গোপাল, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

গোপাল কহিল—"আমি ত আর ছেলেকে খিরিশ্চেন ক'রে দিতে যাচ্ছিনে, দা'ঠাকুর!" রক্তচক্ষুদ্বয় গোপালের মুখের উপর রাখিয়া হীরু ঠাকুর কহিল—"তারই মানে তাই! নাপ্‌তের ছেলে, নাপ্‌তের কাজ ছেড়ে আফিসের বাবু হবে ত? তাহলেই ভয়াবহ হয়ে উঠবে, বুঝলি না? দেখতে পাবি ব্যাটা, এর ফল কি হয়! শেষকালে হবে কি জানিস? না ধরতে পারবে কলম, না ধরতে পারবে ক্ষুর, একটা কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে মাথা খারাপ ক'রে বসবে আর গাঁ ছেড়ে সহরে বাস করে সহুরে হয়ে পড়বে। ও সব মতলব ছেড়ে দে। এখন থেকে ন্যাপলাকে বরঞ্চ হাঁড়ির তলায় কাদা মাখিয়ে, ভোঁতা ক্ষুর দিয়ে চাঁচিয়ে, কামাতে অভ্যেস করা।"

গোপাল স্ত্রীর কথায় যেমন নীরব ছিল, হীরু ঠাকুরের কথাতেও সেইরূপ নীরব থাকিয়া চলিয়া আসিল। যাহার যে জিনিষটা থাকে না, সেই জিনিষটা সে খুব বড় করিয়া দেখে। ছেলেকে ইংরাজী স্কুলে পড়াইবার মোহ তাহার কিছুতেই

কাটিল না। নেপাল একগাদা বাঙ্গালা ইংরাজী বাঁধান বই, একসারসাইজ বুক, লেড পেন্সিল, কপি-বই প্রভৃতি হাতে লইয়া প্রত্যহ প্রায় চারিক্রোশ পথ হাঁটা-হাঁটি করিয়া কেশববাটীর ইংরাজী স্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর চণ্ডীমণ্ডপের এক ধারে তালপাতার চ্যাটাইয়ের উপর বসিয়া, মোটা সলিতা দেওয়া রেড়ির তেলের প্রদীপের সম্মুখে বই খুলিয়া নেপাল যখন পড়িত—'পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল, পাঁচটি মহাসাগরে পৃথিবী আবৃত', তখন গোপালেরও অন্তর মধ্যে আনন্দের আর এক মহাসাগর উথলিয়া উঠিত। একটি ধারে বসিয়া আনন্দগদ্‌গদ স্বরে হয় ত কহিত, "সবই জল? উঁ-হুঁ। ওটা বোধ হয় মিছে কথা ন্যাপলা, কেমন কেমন যেন লাগছে। একটু জলের জন্যে যার চাষই হয় না, আর তিন ভাগ জল! আর পিরথিবীই বা জল পাবে কোথা, দেবতা ওপর থেকে দয়া করে ঢালবে, তবেই ত—আচ্ছা, যা নেকা আছে, তাই প'ড়ে যা।"

এই ভাবে প্রত্যহ নেপালের পড়িবার সময় গোপাল তাহার ছোট হুঁকাটি হাতে লইয়া একটী ধারে বসিয়া তামাক টানিত আর তাহার একমাত্র পুত্র নেপালের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সহিত নিজের ভবিষ্যৎ মিলাইয়া তাহার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিত।

এই ভাবে বৎসর চারি পাচ কাটিয়া গেল।

এই সময় গোপাল হঠাৎ তাহার আরও একটী মনের সাধ পূর্ণ করিয়া বসিল, অর্থাৎ নেপালের বিবাহ দিয়া ফেলিল। গাঁয়ের রক্ষিতদের বিবাহ দিতে তাহাকে বর্দ্ধমান জেলার কোন একটি গ্রামে যাইতে হয়। তথায় তাহার স্বজাতের একটী ছয় সাত বছরের সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া তাহাকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনিবার পক্ষে তাহার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। এ আকাঙ্ক্ষা তাহার অপূর্ণ রহিল না। সেই বৎসরেরই ভিতর গোপাল তাহার মনের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিল এবং গভীর তৃপ্তিতে তখন নিজেকে সর্ব্ববিষয়েই সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া অন্তরে একটু গর্ব্বানুভব করিল। কিন্তু অন্য দিকে বিধাতাপুরুষ যে অলক্ষ্যে তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, গোপাল তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না।

তাহার সেই হাসির সূত্র ধরিয়া সেই বৎসরেই আশ্বিন মাসে হঠাৎ এ গ্রামে খুব ধুমধাম ও সোরগোল করিয়া ম্যালেরিয়া আসিয়া দেখা দিল এবং গোপাল তাহার জমী-জমা, বাগান-পুকুর, মরাই-পালুই, ক্ষুর-কাঁচি, স্ত্রী-পুত্র, পুত্র-বধূ প্রভৃতি সব ফেলিয়া রাখিয়া, গ্রামের অন্যান্য অসংখ্য সহযাত্রীর সহিত কোন্ এক সুদূর সীমাহীন মহাযাত্রার পথে যাত্রা করিল। অপর দিকে, তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাহার বর্দ্ধমানের বেহাই ও বেহান ঠাকুরাণী কন্যাসহ তীর্থ করিবার উদ্দেশে পুরী যাইল এবং জগন্নাথ দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ সেইখানে কলেরায় আক্রান্ত হইয়া তিন জনেই সমুদ্রতীরে তাহাদের সমস্ত পাপক্ষয় করত জগন্নাথের চরণতলেই নিজ নিজ দেহ রক্ষা করিল।

নেপাল তখন কেশববাটীর স্কুলে থার্ডক্লাসে পড়িতেছিল। নাপিত-বৌ তাহাকে কহিল,—"বাবা, এইবার স্কুল ছেড়ে দাও; দিয়ে জমী-জমাগুলো দেখ আর গাঁয়ের মক্কেলপাতি সব বজায় রাখবার চেষ্টা কর।" —আরও কি সব নাপিত-বৌ বলিতে যাইতেছিল, নেপাল ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও সব আমি পারব-টারব না, আমার কাজ নয়। কোনও 'সেন্স' নেই তোমার, মা! আমি যাব পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ক্ষুর-কাঁচি বগলে লোকের বাড়ী বাড়ী কামাতে!"

"যাবি বৈ কি, বাবা! তুই যাবি নি ত আর এখন কে যাবে বল্? শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে পনর ষোল বছরেরটি হয়েছিস ত? তোকেই কি আর এত তাড়াতাড়ি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এ কাজ কর্ত্তে হোত! কি করবি বল্,—সব দিকেই যে ছন্ন-ভন্ন হয়ে গেল। আমার লক্ষ্মীর ঠাট যে উল্টে গেল, বাবা! হরি মুখ তুলে ত চেয়েছিলেন, সে মুখ যে তিনি ফিরিয়ে নিলেন!"

নাপিত-বৌয়ের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

সে দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া নেপাল পূর্ব্ববৎ রুখিয়া উঠিয়া কহিল—"ও-সব আমার দ্বারা হবে-টবে না। আর কখনো যদি আমায় ঐ সব বলবে, তাহলে—" তাহলে কি যে হইবে, সে কথা আর না জানাইয়া নেপাল আরসি-চিরুণী লইয়া তাহার পমেটমের শিশি খুঁজিতে লাগিল। দিন কয়েক হইল, ঘর হইতে আড়ি-কতক চাউল লুকাইয়া দোকানে দিয়া আসিয়া, তৎপরিবর্ত্তে সে ঐ পমেটমের শিশিটি কিনিয়াছিল।

—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বোক্ত সময়ের পর বার তের বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সুখে দুঃখে এই গ্রামের সুদীর্ঘ দিনগুলি চলিয়া গিয়াছে—দুঃখেই বেশী গিয়াছে, সুখে খুবই কম। এই দীর্ঘ অবসরে ম্যালেরিয়া শিকড় গাড়িয়া গ্রামে তাহার আসন সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছে; বহুলোক তাহাতে গত হইয়াছে, অসংখ্য গৃহ গৃহস্থহীন হইয়াছে। গ্রামের বারোয়ারী, সাধারণের দুর্গোৎসব, গোপীনাথের দোলযাত্রা, রাস প্রভৃতিতে পূর্ব্বের সে পুলক, সে উল্লাস, সে প্রাণ আর থাকে না।

পনর ষোল বছরের কিশোর নেপাল এখন সাতাশ আটাশ বছরের যুবক হইয়াছে। কিন্তু ত্রিশ বত্রিশ বছরের নাপিত-বৌ একবারে আশী বছরের বুড়ী হইয়া পড়িয়াছে। আগেকার দিনের মত তাহার সে প্রফুল্লতাও নাই, আননে পূর্ণ শান্তির সে সহাস্য ভাবও নাই। আল্‌তার চুবড়ী হাতে বাড়ী-বাড়ী গিয়া, মিঠে কথায় গল্প জমাইয়া আসিবার আর তাহার সামর্থ্য নাই, বোধ হয়, ইচ্ছাও নাই। পুত্র নেপাল চন্দ্রই তাহার এই অশান্তি ও অকালবার্দ্ধক্যের কারণ। হীরু ঠাকুরের কথাই অক্ষরে অক্ষরে ফলিযা গিয়াছে। নেপাল কলমও ধরিতে পারে নাই, ক্ষুর-কাঁচিও ধরিতে পারে নাই। পারিবার মধ্যে উপর্য্যুপরি তিনবার এন্‌ট্রান্স ফেল করিয়া কৃতবিদ্য হইতে পারিয়াছে আর বাবু হইয়া বসিয়া বসিয়া খাইয়া পৈতৃক জমি-জমাগুলি একে একে সব নষ্ট করিতে পারিয়াছে। মোট কথা, রাঙ্গা পায় নাপিত-বাড়ীর আল্‌তা পরিবার সখ এতদিন ধরিয়া মিটাইয়া, এখন যেন কমলা তাঁহার পা দুখানি গুটাইয়া লইয়াছেন।

কেশববাটীর স্কুল হইতে পর পর তিন বৎসর ধরিয়া নেপাল পরীক্ষায় ফেল হইয়াছিল। নাপিত-বৌকে বলিয়াছিল যে, কলিকাতার পাশের সাহেবরা তাহার উপর আড়ি করিয়া বারবার তাহাকে এইরূপ ফেল করিতেছে।

স্কুলের কাজ শেষ করিয়া নেপাল বৎসরখানেক ধরিয়া সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়াছিল, তাহার পর তাহাও পরিত্যাগ করিয়া এই কয় বৎসরকাল সে খবরের কাগজ, মাসিকপত্র, লাইব্রেরী, গল্প, কবিতা, সখের থিয়েটার, নাইট স্কুল, যুবক-সমিতি প্রভৃতি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু অন্নাভাবের টান দিন দিন যত অধিক হইয়া আসিতে লাগিল, এই সমস্ত মহৎকার্য্য হইতে ক্রমেই মনকে তাহার বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে বাধ্য করিল। অবশেষে এক দিন হীরু ঠাকুরের আড্ডায় আসিয়া নিতান্ত শরণাগতের মত জিজ্ঞাসা করিল,—"কি করা যায় বল ত হীরুদা?"

হীরু ঠাকুর তখন ছোট একটু কাঠের টুকরার উপর এক দলা গাঁজা রাখিয়া ছুরি দিয়া তাহা কুঁচাইয়া তৈরী করিবার উপক্রম করিতেছিল, কহিল—"বোস্ একটু নাতি, এ সময় অন্যদিকে মন দিলেই মালটা নষ্ট হয়ে যাবে।"

মিনিট পাঁচেক একাগ্রমনে কার্য্য করিয়া হীরু ঠাকুর তাহার মালের বিষয়ে কোন গোলমাল না করিয়া কার্য্য সমাধা করিল এবং যথাস্থানে তাহা রাখিয়া দিয়া, সাঁপির কাপড়টুকু গাড়ুর জলে ভিজাইয়া আনিয়া পাট করিতে করিতে কহিল—"নাতি, অমৃতের আস্বাদ ত পেলি না, কি আর বুঝবি বল্? দু'এক ছিলিম টানা অভ্যেস থাকলে কি আর আজ আমার কাছে এসে তোকে মৎলব জানতে হয়! মৎলব তাহলে আপনি মাথার ভেতর গজগজিয়ে উঠতো!"

মৃদু হাসিয়া নেপাল কহিল,—"তাই বুঝি দেবতারা বিপদে পড়লে মহাদেবের কাছেই পরামর্শের জন্যে ছুটতো?"

হো হো করিয়া উচ্চ হাসির একটা ঢেউ তুলিয়া হীরু ঠাকুর কহিল—"ঠিকই বলেছিস ভায়া, হাজার হোক নাপতের ঘরের ছেলে, চালাক-চতুর, শুদ্ধি-বুদ্ধি আছে, তার ওপর লেখাপড়া শিখেছিস, আবার সবের ওপর মধ্যে মধ্যে একটু-আধটু 'মাই-ডিয়ারী'ও ক'রে থাকিস!"

চমকিত হইয়া নেপাল বলিয়া উঠিল,—"কি! তুমি বলতে চাও, আমি মদ-টদ কিছু খাই?"

"আহা-হা! গায়ে মেখে নিস্ কেন, ভায়া? খাসই যদি, তাব হয়েছে কি! ম্যালেরিয়ার দেশ —খাবি না? একটু আধটু নেশা করলে কি আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? খাবি বৈ কি! আমি ত ডাকসাইটে নেশাখোর, তুই হলি আমার নাতি। পথ ত দু'জনেরই এক ভায়া, তবে, তোর দিকটায় কাদা, আমার দিকটায় ধুলো।"

"মাইরি বলছি হীরুদা—"

"আবার দিব্যি গালে! হ্যা রে, 'ফাষ্টবুক' খানাও একেবারে ভুলে গেলি, 'ডু নট সোয়ার'—

'দি মাউস্ স্থইক্স্'? দেখ, হীরুদার এই আড্ডা চিরঞ্জীবী হয়ে থাক্, এর বাড়-বাড়ন্ত হোক্, আন্দাজ ক'রে যা ব'লে দেবো, জানবি—নির্ঘাৎ। এই তোরই সম্পর্কে তোর বাপকে যা বলেছিলুম, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে! গোপলা যে ভাল লোক ছিল—স্বর্গে গিয়েছে, নইলে একদিন অমাবস্যার রাত্রে 'গাবাড়ি'র শ্মশানে তোকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে সাম্না-সাম্নি ভজিয়ে দিয়ে আসতে পারতুম।"

যে কথার জন্য নেপাল আসিয়াছিল, সে কথা অনেক দূরে যাইয়া পড়িতেছে দেখিয়া কহিল,—"ও সব কথা ছেড়ে দাও হীরুদা', একটা পরামর্শ তুমি দাও দেখি, কিছু উপায়-সুপায় না হ'লে ত আর চলছে না! কোলকাতায় গিয়ে কিছু একটা ব্যবসা-ট্যাবসা করলে হয় না?"

"যদি জিজ্ঞাসা করলি আমায়, তা হ'লে বলি, নাতি। কারও মন রেখে কথা বলা আমার স্বভাব নয়, জানিস ত। ব্যবসা করা খুবই ভাল, কিন্তু যখন তোর নিজের জাত-ব্যবসাই করতে পারলি না, তখন অন্য কোন ব্যবসাতে হাত না দেওয়াই তোর উচিত।"

"সকলকেই যে জাত-ব্যবসা করতে হবে, এমন ত কোন কথা নেই, 'প্রেষ্টিজ' ব'লে একটা জিনিষ আছে ত?"

"দেখ, এই সব পাগলামী ধরণের কথা শুনলেই আমার আপাদ-মস্তক জ্ব'লে ওঠে! সকলকে জাত-ব্যবসাই কর্ত্তে হবে, আর গাঁয়েতেই থাকতে হবে? তেমনি কথাই আছে। আমাদের সমাজ আর তার বিধি-বন্ধনগুলো অনেক বড় বড় মাথার অনেক দিনকার চিন্তায় ঠিক হয়েছিল। তাই দেশে কোন অশান্তি, কোন অনটন ছিল না, সমাজে কোন গোলমাল ছিল না। ওটাকে এক ফুঁয়ে ওড়ালে চলবে না, নাতি। আর ঐ 'প্রেষ্টিজ' ব'লে যা বলছিস, ও কথাটা আমি মোটেই বুঝতে পারি না; ওটা এ দেশের কথাই নয়,• কখন ছিলও না—তোরাই ঢোকাতে আরম্ভ করছিস।"

"তাহলে তোমার পরামর্শ টা কি? বাইরে থেকে কিছু উপায়-সুপায় ক'রে না আনলে ত আর পেট চালানোই দায় হয়ে পড়বে। তোমার জাত-ব্যবসা এমনি চমৎকার যে, বাপ মরতে-না-মরতেই আজ তার মাগ-ছেলেকে 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'র অবস্থায় প'ড়ে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখতে হচ্ছে!"

"শূয়ার, ষ্টুপিড, রাস্কেল কোথাকার, সে জাত-ব্যবসার দোষও নয়, তোর বাপেরও দোষ নয়। অন্ধকার যে দেখছিস, সে নিজেরই দোষে। 'প্রেষ্টিজে'র ভয়ে চোখ বুজিয়ে থাকবি, তা অন্ধকার দেখবি না? বলি, 'প্রেষ্টিজ' তোর বাবার ছিল না? গাঁয়ের লোক কেউ কি তাকে গোপাল নাপতে ব'লে মনে করত, না, শুধু তার সঙ্গে সকলের চুল ছাঁটবার আর দাড়ি কামাবার সম্পর্কই ছিল? সে সকলেরই দাদা, কাকা, জ্যেঠা, ছোট ভাই, ভাইপো হয়েই কাটিয়ে গেছে। এই বাগ্দীপাড়ার ছিমন্ত খুড়োকে দেখলে আমাকেও গাঁজার কলকে লুকিয়ে ফেলতে হয়। কেন? ওকে শুধু ছিমন্ত বাগ্দী বলেই ত মনে করতে পারি? কিন্তু তা ত আর পারি না। আমাদের গাঁয়ে-ঘরে এই জিনিষটার ভেতর অনেকখানি আত্মীয়তা, সমবেদনা আর মাধুর্য্য আছে, ভায়া। গ্রামে 'প্রেষ্টিজে'র ধার কেউ ধারে না। এখানে, ধরিস যদি ও জিনিষটা সকলেরই আছে, আবার এক হিসেবে কারুরই নেই, সবই সমান।"

নেপাল অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল—"কি যে ছাই-পাঁশ বকছো! নেশা ক'রে ক'রে তোমার দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, হীরু-দা।"

"তেমন মাথাই নয় হ্যাপ্‌লা। হাজার বছর ধ'রে গাঁজা খেলেও এ মাথা খারাপ হবার নয়। আসল কথা, দেশটা আর তোর ভাল লাগছে না, কলকাতায় একবার থাকবার ইচ্ছেটা হচ্ছে। তা—ইচ্ছে হয়ে থাকে, যা, কিন্তু গাঁয়ে থেকে, আর কিছু না পারিস, অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশ বিঘে কোবৃপা জমী নিয়েও যদি ভাল ক'রে চাষ-বাস করতে পারতিস! তবে, তোকে ত ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। ঝোঁক যখন হয়েছে, তখন তুই ঠিকই যাবি বুঝতে পারছি আর কিছু একটা ব্যবসাও করবি। তবে এক কাজ কর্। সেখানে গিয়ে খুব বড় ক'রে একটা 'শেভিং সেলুন'ই খুলে দি গে যা। বেশ চালের ওপর থাকবি, লোকজন রাখবি, ইলেকট্রিক লাইট জলবে—ফ্যান্ ঘুরবে, আর তুই শুধু বাবু হয়ে চেয়ারে ব'সে থেকে 'ক্যাশ-মেমো' লিখবি। একটা জমকালো গোছের নাম দিয়ে 'এণ্ড কোং'র একখানা সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে দিবি। আর পারিস ত—"

বিরক্তির সহিত মধ্যপথে বাধা দিয়া নেপাল কহিল—"তোমার কাছে এলুম পরামর্শ নিতে, আর তোমার যত সব উদ্ভুট্টি পরামর্শ।"

"তবে যা ভাই, যা তোর ইচ্ছে করগে যা। তবে এই ব'লে রাখলুম,—দেশ ছেড়ে কোলকাতা গিয়ে কিছুই তুই করতে পারবি না। বলে, কত এম-এ, বি-এ ফ্যা-ফ্যা ক'রে বেড়াচ্ছে। তোর না আছে কোন পাশ,—না আছে কোন সুপারিশ! কিছুই করতে পারবি নি, হয়ত উল্টে—গাড়ী চাপা প'ড়ে ফিরে আসবি।"

"গাড়ী চাপা পড়বো?"

"নিশ্চয়ই। গেল বছর সাতটি দিন গিয়ে ছিলুম। সেই সাত দিনের ভেতর তিনবার মটরের ধাক্কা খাই। সে কোলকাতা আর নেই, এখন বিশ গুণ গাড়ী-ঘোড়া আর তিরিশ গুণ লোক বেড়েছে। এক যোড়া চোখ নিয়ে আজকাল কোলকাতায় চলা-ফেরা করা যায় না ভায়া, দশ যোড়ার দরকার।"

মিনিটখানেক চুপ করিয়া হীরু ঠাকুর আবার কহিতে লাগিল,—"আর তা ছাড়া, কত দিকে কত অসুবিধে! না পাওয়া যায় একটু দুধ, না পাওয়া যায় মাছ, না পাওয়া যায় একটু ঘি! মুড়ি খেলে ছোটলোক মনে ক'রে হাঁ ক'রে মুখের দিকে সব তাকিয়ে থাকে। আর, মাল খাবার এত অসুবিধে যে, তা আর বলবার নয়। তুই অবিশ্যি এ দিকে খুব চালাক-চতুর আছিস, রাস্তা-টাস্তা হয় ত তুই না হারালেও হারাতে পারিস, আমি কিন্তু দুবেলাই পথ হারিয়ে ফেলতুম। এমন সোনার যায়গা ছেড়ে কোলকাতায় কখন মানুষ যায়!"

উচ্চরবে নেপাল হো হো করিয়া তাচ্ছিল্যের একটা হাসি হাসিয়া উঠিতেই হীরু ঠাকুর দাঁড়াইয়া উঠিয়া অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে কহিল—"তবে যা ভাল বুঝিস, তাই কর গে যা ভাই, আমার 'টাইম্' হয়েছে, এখন আর বকিয়ে মাথা খারাপ করাস নি।"

নেপাল যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া অপলক-নেত্রে হীরু ঠাকুরের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল এবং তাহার পরেই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

অতঃপর হীরু ঠাকুর তাহার টাইম্ মত কার্য্য সমাধা করিল এবং কার্য্য-সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই একরাশ চিন্তা আসিয়া তাহার মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া বসিল। ভাবিল, নেপ্লাটাকে বললুম বটে, কিন্তু কালের একটা প্রভাব আছে, দেশের ওপর তা না প'ড়ে পারে না। আশপাশের চারিদিককার নতুন হাওয়া যখন জোরে বইতে সুরু করেছে, তখন এ দেশেও তার ধাক্কা না লেগে পারে না। য়ুরোপ-আমেরিকার ঢেউ ভারত মহাসাগর বেয়ে ভারতের তিন কূলে এসে আছাড় খাচ্ছে। ভারতবর্ষকে আর ভারতবর্ষ ক'রে কেউ রাখতে পারবে না, 'ইণ্ডিয়া' হয়ে যাবেই। আজ বুঝিয়ে সুঝিয়ে জোর করে ন্যাপ্লাকে নাপতের ছেলে ক'রে আটকে রাখলেও, তার ছেলেরা নাতিরা কিছুতেই আটক থাকবে না, বিদ্রোহী হবেই।

এই সূত্রে আরও কত কি কথা তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কে আসিয়া একে একে জমা হইতে লাগিল। গতবার যখন সে কলিকাতায় গিয়াছিল, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে দেখিয়াছিল, এক কোণে নামে মাত্র একটি ক্ষুদ্র ঘৃতের প্রদীপ মিট-মিট করিয়া জ্বলিতেছে, আর চারিদিকের উজ্জ্বল ইলেক্ট্রিকের আলো সমগ্র মন্দিরাভ্যন্তর নাট্যশালার মত সমুদ্ভাসিত করিয়াছে। এক জন পাণ্ডাকে নাকি সেই সময় সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, মায়ের ভোগটা কি মন্দির-সীমানার মধ্যেই রান্না হয়, না, 'গ্রেট্-ইষ্টার্ণ হোটেল' থেকে সেটাও রোজ 'কন্ট্রাক্টে' আসে? হীরু ঠাকুর সে দিন তাহার কাছে মার খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়াছিল।

সে সেবার যখন কলিকাতায় গিয়াছিল, তখন কার্ত্তিক মাস। বাসায় যে আকাশ-প্রদীপ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ইলেক্ট্রিকের বল্‌ব। একদিন ইহা লইয়া তর্ক করিতে যাইলে বাসার কর্ত্তা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, আকাশ-প্রদীপের যা উদ্দেশ্য, তা প্রদীপেও হয়, ইলেট্রিকেও হয়। হীরু উত্তর দিয়াছিল—"হয় ত তা হয়, কিন্তু কাজটার মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধির মাধুর্য্য বা ভাব কিছুই থাকে না।" বাসার কর্ত্তা গাঁজাখোরের সঙ্গে আর বেশী তর্ক করা সমীচীন বোধ করেন নাই।

আজ হীরু ঠাকুর এই সব কথাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিল যে, কোন্ দিকেই বা ঠেকাইয়া রাখা যায়! দেশের ঢেঁকিগুলো সব যাবার দাখিল হয়েছে, তার যায়গায় এক একটা বিরাট কল পাতাল পর্য্যন্ত আসন গেড়ে রাক্ষসের মত দিনরাত হুঙ্কার ছাড়ছে। কলুর গোষ্ঠী ঘানি বন্ধ ক'রে, দিয়ে, তেলকলে গিয়ে চাকরী নিচ্ছে; প্রামাণিকের দল 'গিলেট' 'ভ্যালেট' প্রভৃতি রকমারি 'সেফটি রেজরে'র চাপে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। কুমোরের চাকে আর পেতল-কাঁসার কারখানার

ওপর 'য়্যালুমিনিয়ম্' তার রাজাসন বিছিয়ে বসেছে। দেশের বৈদ্যরা রুগী পায় না, ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণ হয়ে আসছে, তাঁতিরা দুধের ব্যবসা করে, গোয়ালা 'কোর্টে'র পেয়াদা হয়। তীর্থে তীর্থে আর যাত্রী হয় না, সময় ও সুবিধে পেলেই সকলে ছোটে পাহাড়ে। গাঁয়ে গাঁয়ে পণ্ডিতের টোলের যায়গায়, 'ট্রেণিং স্কুলে'র কাঠামো খাড়া হয়েছে। ঘরের মেয়েরা বাইরে যেতে চায়, ছেলেরা 'হাঁ-ডু-ডু'র বদলে ফুটবল খেলে, সন্দেশের বদলে কেক-বিস্কুটেই তাদের বেশী লোভ। সব চেয়ে মজা এই যে, বুড়োরাও ভোরে উঠে সাজি হাতে বাগানে ফুল তোলা ছেড়ে দিয়ে, কুকুরের শেকল হাতে করে 'মর্ণিং-ওয়াক' করতেই ব্যস্ত, আর যাত্রা-কথকতা শোনবার ঝোঁক কাটিয়ে সার্কাস-বায়োস্কোপকেই তারা বাহবা দেয়।

একটি একটি করিয়া এই ধরণের অনেক কথাই আজ হীরু ঠাকুরের মনে উদয় হইতে লাগিল এবং অনেক বেলায় যখন তাহার নেশা ফিকা হইয়া আসিল, তখন বাটীর ভিতর যাইবার উদ্দেশে দাঁড়াইয়া উঠিয়া মনে মনে স্থির করিল যে, আজই সন্ধ্যার পর নেপালদের বাটী যাইয়া সে তাহাকে বলিয়া আসিবে যে, সে কলিকাতাতেই যাউক এবং হয় চাকুরী, নয় ব্যবসা, যাহা সে ভাল বলিয়া বুঝিবে, তাহাই করা তাহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। তবে সে নিজে আমরণকাল পর্য্যন্ত তাহাদের এই শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের মাটীকে সোনা মনে করিয়া তাহার কোলের উপর গড়াগড়ি দিবে, কিন্তু অন্য কাহাকেও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশে থাকিবার জন্য বলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিল যে, দেশ পূরোপূরি যদি য়ুরোপ হয়েই পড়ে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি, কিন্তু পূরোপূরি না হইলেই ক্ষতি। দেশের গরু-বাছুর, ছাগল, কুকুর থেকে আরম্ভ ক'রে চাস-বাস, শিল্প-স্বাস্থ্য, ধন-বিজ্ঞান সব বিষয়েরই, যদি ঐ রকম উন্নতি করতে পারে, ত সে খুব ভাল কথা; কিন্তু কোন দিকে কোন উন্নতির চেষ্টা না ক'রে, খালি পোষাক-পরিচ্ছদ আর কতকগুলো বদ আচার-ব্যবহারের নকল করাই ত সব নয়। দেশ পায় না খেতে, দেশের সে রূপও নেই, সে শ্রীও নেই। লোকের এখন না আছে সম্পদ, না আছে শান্তি! ঘরে ঘরে এখন অন্নাভাব, রোগ, হাহাকার আর চোখের জল! সুতরাং—

ভাবিতে ভাবিতে হীরু ঠাকুর সদর-দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পাড়ার একটি ছেলে পথ দিয়া যাইতেছিল। সে কলিকাতায় চাকুরী করে, কাল শনিবার রাত্রিতে বাটী আসিয়াছে। ছেলেটি কহিল—"খুড়ো, চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে যে?" কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের স্বরে হীরু ঠাকুর কহিল—"আমার 'ওয়াইফ'এর একটি 'গেষ্ট' আসবেন আজ লুম্-ডিং থেকে, তাঁকে 'রিসিভ' করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।" ছেলেটি হাসিতে হাসিতে তাহার পথে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রায় চারি মাস হইতে চলিল, নেপাল কলিকাতায় আসিয়াছে। ভবানীপুরে আদিগঙ্গার ধারে যে অঞ্চলটা আদিযুগেরই মত এখনও পর্য্যন্ত নোংরা ও আলো-বাতাসহীন হইয়া অবহেলায় এক ধারে পড়িয়া রহিয়াছে, সেই কেঠোপটী পল্লীর মধ্যে একটা খোলার বাড়ীর একখানা ঘর লইয়া সে থাকে এবং নিকটের একটা হোটেল হইতে দু'বেলা খাইয়া আসে। যে উদ্দেশ্য লইয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছিল, এই কয় মাসের মধ্যে তাহা তাহার কিছুই হয় নাই। কোন চাকুরীও তাহার যোগাড় হয় নাই, অথবা কোনরূপ ব্যবসা করিবার পক্ষেও কোন সুযোগ তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। তবে 'সুবর্ণ-সুযোগ' যে শীঘ্রই ঘটিবে, সে বিষয়ে নেপালের মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

কোন কাজকর্ম্মের সুবিধা না ঘটিলেও, এই অল্পদিনের ভিতরে তাহার কয়েকটি মিত্র-লাভ ঘটিয়াছিল। বন্ধুবর্গের ভিতর গয়ারামই শ্রেষ্ঠ। গয়ারাম জাতিতে ব্রাহ্মণ, এই বাড়ীর বাড়ীওয়ালীরই সম্পত্তি। তাহার বত্রিশ বৎসর বয়সের অধিকাংশ-কাল কলিকাতাতেই কাটিয়াছে। শুধু বৎসর দুই পূর্ব্বে বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সে পশ্চিম চলিয়া গিয়াছিল এবং নেপাল এ বাটীতে বাসা করিবার অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বেই কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি হইয়া, মাথা নেড়া করিয়া ফিরিয়া আসে।

কথাটার ভিতর কোন গোলমাল থাকিয়া না যায়, সে জন্য আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা ভাল।

গয়ারাম ঝগড়া করিয়া চলিয়া যাইবার সময়, বাড়ীওয়ালী সুখদাকে দম্ভভরে বলিয়া গিয়াছিল যে,

সে একবার যদি বাঁশী বাজায় ত সুখদার মত অমন ষোল শ' সুখদা তাহার কাছে আসিয়া লুটাইয়া পড়িবে এবং ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে লইয়া সে নব আর এক বৃন্দাবনেরও সৃষ্টি করিতে পারে। সুখদা সে সময় উঠান ঝাঁট দিতেছিল, অগ্নিগর্ভ তুবড়ির মত রুদ্ধ ক্রোধে সে শুধু গয়ারামকে তাহার হস্তস্থিত দ্রব্যটি দেখাইয়া কহিয়াছিল, "ছিকেষ্টোর চামর এই তোলা রইল, এর লোভে আবার শীগ্‌গীরই এই পুরোনো বিন্দাবনে ফিরে আসতে হবে।" কিন্তু গয়ারাম শীঘ্র আর ফিরিয়া আইসে নাই। সে কিছু কাল গয়া ও কাশীতে অবস্থান করিয়া তথা হইতে কোনও কারণে প্রয়াগে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়, এবং তথায় যাইয়া গোঁসাইদাস বাবাজী নাম গ্রহণ করিয়া সে তাহার প্রস্তাবিত নূতন বৃন্দাবন সৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করে। এই উদ্যোগপর্ব্বে যে সমস্ত কার্য্যের সে অবতারণা করে, তাহার ফলে, এলাহাবাদের পুলিস দ্রুতগতি তাহার কাছে আসিয়া বিপুল সম্বর্দ্ধনা সহকারে তাহাকে লইয়া যায় এবং উপর্য্যুপরি কয়েক দিন ধরিয়া রাজার বিচারালয়ে হাজিরা দিবার পর তাহার পনের মাসের কারাবাসের সুব্যবস্থা হয়। তাহার পর দীর্ঘ দিন রাজ-অতিথিস্বরূপ থাকিবার পর যে দিন সে জেল হইতে মুণ্ডিতমস্তকে মুক্ত হয়, তাহার পরদিনই সরাসর এখানে চলিয়া আসে এবং যেখানকার সম্পত্তি, পুনরায় সেইখানে আসিয়া আবদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার স্বপক্ষে একটি কথা আছে, এবং কথাটি হইতেছে এই যে, সে মূর্খ ছিল না, সে লেখাপড়া শিখিয়াছিল। বি-এ পাশ কিম্বা ফেল, এই রকম যা হয় কিছু একটা সে করিয়াছিল। তবুও জীবনের ধারাটা তাহার এই দিকেই কেন যে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা শুধু সে-ই বলিতে পারে।

বৈকালের দিকে গয়ারাম পাণ চিবাইতে চিবাইতে হুঁকা হাতে লইয়া নেপালের ঘরে আসিয়া বসিল। নেপাল বিছানায় কাত হইয়া শুইয়া সিগারেট টানিতেছিল, উঠিয়া বসিয়া কহিল "আপনার যুক্তিই ঠিক, দাদা। এখন তুলসী যদি আরও কিছু টাকা বার করতে পারে, তবেই সব হয়। কত টাকা আন্দাজ দরকার হবে, বলুন দেখি?"

গয়ারাম কহিল—"কিছু নয়,—কাগজে বিজ্ঞাপন চালানো আর আফিস অঞ্চলের দিকে একখানা ঘর নিয়ে খানকতক চেয়ার, একটা টেবিল, একটা আলমারী, গোটা দুই র‍্যাক্ কিনে—ভাড়া ক'রে নিলেও চলতে পারবে। তা হলেও শ' চারেক হাতে নিয়ে নামতে হবে বৈ কি। সে দিন তুলসী বাবু দু'শ দিয়েছে, আরও অন্ততঃ শ' দুই চাই।"

কথাটা হইতেছে এই যে, ইহারা একটা কর্ম্মখালির আফিস খুলিবে। প্রথমে দুই টাকা ইহাদের আফিসে জমা দিয়া নাম রেজেষ্ট্রী করিলে এবং তাহার পর প্রতি মাসে এক টাকা হিসেবে চাঁদা দিতে থাকিলে, ইহারা বেকার কর্ম্মপ্রার্থীদের কর্ম্ম জুটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে। তবে সকলকেই অবশ্য ধৈর্য্যসহকারে শুভদিনের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে এবং যদি কখনও সে শুভদিন আগত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রথম মাসের মাহিয়ানা হইতে তাহায় এক-চতুর্থাংশ পারিশ্রমিক হিসাবে কোম্পানীকে দিতে হইবে। গয়ারাম কহিল—"দেখবেন নেপাল বাবু, প্রথম ঝোঁকেই হাজার দরখাস্ত এসে পড়বে, ঐখানেই ত দু'হাজার টাকা, আসল লাভ ত প'ড়ে রইল। তা ছাড়া, মধ্যে মধ্যে ঝোপ বুঝে কোপ ত আছেই। কিন্তু শেয়ারের কথা যা বলেছি—আমার সাত, আপনার পাঁচ, আর তুলসী বাবুর শ্লিপিং পার্টনার হিসেবে চার। দেখুন বুঝে।"

বুঝিতে গিয়াই উভয়ে দেখিল 'শ্লিপিং পার্টনার' তুলসীই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। অতঃপর টাকার কথাটা তাহাকে বলা হইল। তুলসীর পিতার খুব স্বচ্ছল অবস্থা, একটু চেষ্টা করিলেই যে সে আরও শ'দুই টাকা অক্লেশে যোগাড় করিতে পারিবে, এ কথা তাহাকে নেপাল ও গয়ারাম ভালরূপে বুঝাইয়া দিল। তুলসী কহিল—"কিন্তু 'হোপলেশ।' বাড়ী থেকে আর একটি পাই-পয়সাও বার ররবার উপায় নাই। মা'র বাক্স থেকে ঐ দু'শো টাকা সেদিন হারিয়ে যাবার পর থেকে ভয়ানক কড়াকড়ি ব্যবস্থা হয়ে গেছে।" গয়ারাম ও নেপাল যত দিকে যত তাহাকে পথ দেখাইতে লাগিল, তুলসী সবই কাটাইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তুলসীর সম্বন্ধে যখন ইহারা নিজেরাই দু'জনে 'হোপলেশ' হইয়া পড়িল, তখন তুলসী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল—"একটা উপায় আছে, শ'দুই আড়াই টাকা বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে।"

উৎফুল্ল হইয়া গয়ারাম জিজ্ঞাসা করিল—"কি উপায়?"

তুলসী কহিল—"আমাকে একবার তা হ'লে হারাতে হয়।"

নেপাল কহিল—"বুঝতে পারলুম না, হেঁয়ালি ছেড়ে কথাটা খুলে বল।"

"হেঁয়ালি কিছুই নয়, সত্যই আমাকে তা হ'লে চেষ্টা করে একবার হারিয়ে যেতে—অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হতে হয়। তাহলেই,—হাজার হোক বাবার এক ছেলে ত বটে—কাগজে বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দিয়ে একটা পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করবেই। তখন আমায় পুনরুদ্ধার ক'রে সেইটে, নেপাল, তোমরা হস্তগত কোরো।"

গয়ারাম জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে আপনি যাবেন কোথা ?"

"যাব আর কোথা, দিনকতক আপনাদের এইখানেই আস্তানা নিতে হবে।"

এই যুক্তিই স্থির হইল এবং দুই চারিদিনের মধ্যেই তুলসী হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িল। বাটিতে একখানি চিঠি লিখিয়া সে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাতে লিখিয়াছিল যে, বরাবরই সে বাপ-মায়ের নিকট হইতে গঞ্জনা এবং অনাদর পাইয়া আসিতেছে, ইহাতে তাহার অন্তরে চিরকালের দারুণ ব্যথা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। সন্তানের প্রতি বাপ না হয় কঠিন হইতে পারে; কিন্তু মা-ও যে এমন নির্দ্দয় এবং পাষাণ হইতে পারে, ইহা শুধু তাহারই দুর্ভাগ্যের ফল। যাহা হউক, আর সে তাঁহাদের চোখের সামনে থাকিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবে না, সে এমন যায়গায় গিয়া থাকিবে, যেখানে থাকিয়া সে সুখী হইতে পারিবে, যেখানে কেহ তাহকে মন্দ বলিবে না, গঞ্জনা দিবে না, অনাদর করিবে না। জন্মের মত সে চলিয়া যাইতেছে এবং তাহার শেষ অনুরোধ যে, তাহার জন্য কেহ যেন বিচলিত না হয় এবং কেহ তাহার যেন কোন অনুসন্ধান না করে।

কিন্তু যেমন হইয়া থাকে, বাড়ীর লোক বিচলিতও হইল, অনুসন্ধানও চলিল। কিন্তু জাগিয়া কেহ ঘুমাইলে তাহাকে উঠানো বড় শক্ত; সুতরাং নিরুদ্দিষ্টের কোন উদ্দেশই মিলিল না। তখন তুলসীর অনুমান-মতই কার্য্য হইল, অর্থাৎ আড়াই শ' টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়া তাহার পিতা কাগজে এক বিজ্ঞাপন বাহির করিল। রাধাবাজারে তুলসীর পিতার সোনা-রূপার দোকান ছিল, সুতরাং এই সোনা-রূপার দোকান উপলক্ষেই তাহার ঘরে সোণা-রূপার অভাব ছিল না।

কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইবার দুই এক দিন পরেই তুলসীর পিতার সহিত, নামাবলী গায়ে আধা-বয়সী একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া দেখা করিল এবং বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে গোপনে কথাবার্ত্তা হইবার পর লোকটি উঠিবার উপক্রম করিতেই তুলসীর পিতা তাহার হাতে পঁচিশটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া কহিল—"কাশীতে আপনার যাতায়াত আর তার আসবার টিকেট্ এইতে হবে'খন। কিছু বেশী থাকল, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি আছে ত।" টাকা কয়টি নামাবলীর খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া প্রণামের উত্তরে তুলসীর পিতাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া লোকটি বাহির হইয়া গেল।

দিন পাঁচেক পরে লোকটি ফিরিয়া আসিয়া জানাইল—"অনেক ক'রে আপনার পুত্রটিকে বাড়ী ফিরে আসবার জন্যে রাজী করাতে পেরেছি। গুরুদেবের কাছে তিনি শাস্ত্র পড়তে সুরু করেছেন, কিছুতেই ফিরে আসতে চান না। গুরুদেবকে গোপনে সব কথাই জানালুম। তিনিও তুলসী-বাবুকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুজিয়ে ফিরে আসতে রাজী করিয়েছেন। পূর্ব্বে কি রকম স্বভাব-চরিত্র ছিল, অবশ্য জানি না, কিন্তু গুরুদেবের কৃপায় এই ক'দিনের ভেতরেই তাঁর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। কিন্তু একটা গোঁ তিনি বড্ড ধরেছেন," বলিয়া লোকটি একটু সরিয়া বসিয়া অস্ফুটে অনেকগুলি কথা তুলসীর পিতাকে জানাইল। তুলসীর পিতা কহিল,—"ব্রাহ্মণ—মহাত্মা ব্যক্তি—গুরু ব'লে মনে মনে যখন তাঁকে বরণ করেছে—তা বেশ, এত আর অপব্যয় নয়। ঝোঁক যখন ধরেছে একশোটি টাকা গুরুপ্রণামী না দিয়ে আসবে না, দেব আমি। ব্রাহ্মণকে দান—সদ্ব্যয়—এর ওপর আর কথা কি!"

"কিন্তু তিনি যে আপনার কোন জিনিষ কিছুতেই আর নেবেন না, একেবারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। বলেন—'দু'টি খাব আর একখানা পরব, তা ছাড়া তাঁদের একটি পাই-পয়সাতেও আর আমি হাত দেবো না।' হাতের আংটিটা পর্য্যন্ত খুলে ফেলে আপনাকে দেবার জন্যে দিয়েছেন।"

ব্রাহ্মণ নামাবলীর খুঁট হইতে একটি আংটী খুলিয়া তুলসীর পিতার হস্তে দিল। তিনি আংটীটি দেখিয়া কহিলেন, "তারই বটে। অভিমান হয়েছে আর কি! অভিমান হয়েছে, অনুশোচনাও হয়েছে। তা বেশ ত, প্রণামীর টাকাটা যে আমিই দিচ্ছি,

সে কথা আর তাকে বলবার আবশ্যক কি আছে, বলবেন যে, আপনিই যেন তাকে দিচ্ছেন, বুঝলেন না ?"

"বুঝিছি, আমিও সেই কথাই তাঁকে ব'লে এসেছি।"

"বেশ করেছেন। ও এক শ' তাহলে দিয়ে দি আপনাকে, এখনি নিয়ে যান।" বলিয়া তুলসীর পিতা তাঁহার হস্তে কয়েকখানি নোট গণিয়া দিলেন।

অতঃপর আরও দুই চারিটি কথা হইবার পর লোকটি তুলসীর পিতার প্রদত্ত দশ টাকার সেই এগারখানি নোট হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তুলসীর পিতা প্রণাম করিয়া কহিল—"আগেকার রাহাখরচ পঁচিশের ভেতর কিছু আছে, তার ওপর আজ ও জন্যে দশ দিলুম, ওইতেই দু'জনের—— বাকী এক শ গুরু-প্রণামীর জন্যে, বুঝেছেন ত ?— কিন্তু দয়া ক'রে আজই রাত্রির ট্রেণে চ'লে যাবেন, কেন না, তার গর্ভধারিণী বড্ডই চঞ্চল হয়ে পড়েছে। যাই হোক—আপনাকে খুবই খাটাচ্ছি—ক্ষমা করবেন।"

"এর আর খাটান কি, এ ত কর্ত্তব্য। তবে আমার ঐ ঋণটার জন্যে মাথার আর ঠিক নেই, বড্ডই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছে, তাই এর জন্যে আপনার মত লোকের কাছ থেকে পুরস্কারের টাকাটা নেওয়া, নইলে—

"পুরস্কার ব'লে আর মনে করবেন না, ওটা প্রণামী হিসেবেই দেব। এইবার তাকে সঙ্গে ক'রে আনতে পারলেই ওটা দিয়ে দেবো আপনাকে। গুরুদেবকে আমার প্রণাম দেবেন। যদি কখনও ভাগ্যে হয়, কাশী যাই, তাঁর চরণদর্শন হবে। কি নামটি তাঁর ?"

"সুখদানন্দ।"

তারপর ধীরে ধীরে লোকটি নোট কয়খানি নামাবলীর খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িল এবং বরাবর ভবানীপুর কেঠোপটীর বাসায় আসিয়া তুলসীকে ডাকিয়া কহিল—"ভায়া, এইবার গুরু-গৃহে শাস্ত্রপাঠ ছেড়ে দিয়ে স্বগৃহে আত্মপ্রকাশ করবার যোগাড় করুন।"

কিছুপরে সুখদা গয়ারামকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই এক শ' দশ টাকার কথা ওদের কাছে বল্লে না কি ?"

গয়ারাম জিভ ও টাক্‌রা দিয়া একটা শব্দ করিয়া কহিল—"মাইরি আর কি! গয়ারাম তেমন পাত্তরই নয়। আমি ত বলিই নি, ওর বাপও যাতে কিছু না ওর কাছে ভাঙ্গতে পারে, সেই মন্তরও ফুঁকে দিয়ে এসেছি। তবে আগে পঁচিশ টাকার কথাটা অবিশ্যি বলতে হয়েছে।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নেপাল গয়ারামের কাছে আসিয়া প্রস্তাব করিল—"রেল-ভাড়ার পঁচিশটা টাকা, ধরতে গেলে 'একষ্ট্রা' পাওনা! আসুন না, তাহলে ওর থেকে আজ একটু স্ফুর্ত্তি-টুর্ত্তি করা যাক্।"

গয়ারাম বিশেষভাবেই এই প্রস্তাব অনুমোদন করিল এবং তখনই খান দুই নোট হাতে লইয়া পরমোৎসাহের সহিত বাজারে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সুখদারই ঘরে সভা বসিল এবং সে সভায় সুখদাই সভানেত্রী হইয়া—সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরের মাসের গোড়াতেই গয়ারাম কোম্পানীর কর্ম্মখালির আফিস খোলা হইল। আফিস অঞ্চলের দিকে অত্যধিক ভাড়ার কারণ ঘর লওয়া সুবিধা হয় নাই। ভবানীপুর রসা-রোডের উপরেই তাহাদের বেকার-সমস্যা-সমাধানের সাইনবোর্ড ঝুলিল।

সাইনবোর্ড ঝুলিল বটে এবং কাগজে বিজ্ঞাপনও যদিচ সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু সমস্যা-সমাধানের জন্য বেকার বড় একটা আসিয়া জুটিল না। কার্য্যে অবশ্য কোন দিকে কোন প্রকারই ত্রুটি হয় নাই। কার্ড ছাপান হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্যানভাসার যোগাড়, লেটারপ্যাড, বিল বই, প্রস্পেকটাস তৈয়ারী, য়্যাকাউন্ট-বুক, ডে-বুক, লেজার প্রভৃতি কিছুই বাকী থাকে নাই। এ সমস্ত ছাড়া, এই আফিস হইতে ইতিপূর্ব্বে ভাল ভাল কর্ম্ম পাইয়া এক্ষণে যাঁহারা জীবনের উন্নতির পথে চলিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধন্যবাদ-সূচক পত্রের সংক্ষিপ্তসারও পুস্তিকাকারে ছাপান হইয়াছিল। মোট কথা, কিছুই বাকি থাকে নাই, যাহা যাহা দরকার, চার-টোপ্-ফাৎনা-হুইল-সূতা-বঁড়শী—সবই ঠিক করা হইয়াছিল, কিন্তু মাছ তেমন আসিয়া জমিল না।

তুলসী কহিল—"চার খ্যাঁচ্‌ড়া হয়ে গেছে।"

নেপাল কহিল—"লোক ঠকে ঠকে আর ঠকতে চায় না, সাবধান হয়ে পড়েছে।"

গয়ারাম উভয়ের কথাকে আমল না দিয়া কহিল—"কিছু না—কিছু না। এ দেশের লোক চিরকাল ধরেই ঠকে আসছে—চিরকাল ধরেই ঠকবে। আমার বোধ হয়, দেশের লোকের ভাঁড়ে-মা-ভবানী গোছ অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাকরী পেলে, হয় ত মাইনে থেকে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে কাটিয়ে দিতে রাজী হতে পারে; কিন্তু তার আগে একটা ক'রে টাকাও হয়ত দেবার ক্ষ্যামতা নেই। নইলে ব্যবসা নয়, বাণিজ্য নয়, বিদেশ-বিভুঁয়ে যাওয়া নয়, কল-কব্জা-বিজ্ঞান নয, গবেষণা নয়, তাঁত নয়, চরকা নয়,—আপিসের চাকরী, তাতে এত সহজে পাবার ব্যবস্থা—খালি একটা করে টাকা মাসে, এ-ও যে কোন লোকে——যাই হ'ক, নামা যখন গেছে, তখন দেখা যাক, কোথায় এর তল।"

তল দেখিতে গিয়া যখন তুলসীর দরুণ টাকা কয় শত একেবারে নিঃশেষে তলাইয়া যাইবার মত হইল, তখন এক দিন গয়ারাম কহিল—"ধুত্তোর! এ আফিস চলবে না। এর চেয়ে কলের লাঙ্গল-ফাঙ্গল, কি স্বপ্নাদেশের কোন মাদুলী কিম্বা অন্ততঃ 'এক টাকায় ১০৪ দফা'—এই সব নিয়ে কাজ আরম্ভ করলে কিছু না কিছু নিশ্চয়ই হোত। এ লক্ষ্মীছাড়া কাজে চার-পাঁচ-শ টাকাও গেল, ছাপাখানার ঋণ পর্য্যন্ত শোধ হ'ল না। নেপাল বাবু, ঘরভাড়া আর বাড়িয়ে কাজ নেই, বাড়ীওলাকে নোটিশ দিয়ে ঘর ছেড়ে দিন, ফার্ণিচারগুলো সব ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন, সাইনবোর্ডখানা খুলে ফেলুন, বিজ্ঞাপন বন্ধ ক'রে দিন," বলিয়া গয়ারাম বিরক্ত হইয়া বাসায় যাইবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই সব ঠকামির কাজে নেপাল মত দিয়াছিল বটে, কিন্তু ভিতর ভিতর কেমন যেন তাহার বরাবরই একটা বাধ-বাধ ভাব লাগিতেছিল। সুতরাং আফিস উঠাইয়া দিলে সে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পায়। অথচ গয়ারামের কাছে সে এতই দুর্ব্বল যে, তাহার মনের এই কথাটা কোন দিনই সে তাহার কাছে বলিতে পারে নাই। আজ গয়ারামের কথায় সে নীরব হইয়াই রহিল এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে সে বাসায় চলিয়া আসিল। তুলসী একাকী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এ অফিসে তাহার টান উহাদের দুই জনের অপেক্ষা অনেক বেশী।

সন্ধ্যার পর আফিস বন্ধ করিয়া তুলসী নেপালের বাসায় যাইয়া তাহার কোলের উপর একখানা খামশুদ্ধ চিঠি ফেলিয়া দিল। নেপাল জিজ্ঞাসা করিল—"কি ব্যাপার?"

"কর্ম্ম-প্রার্থী। তোমরা চ'লে আসবার পর এসেছে।"

খামের ভিতর হইতে চিঠি খানি বাহির করিয়া নেপাল যাহা পাঠ করিল, তাহা এই :—

"মান্যবর

শ্রীযুত জি, আর, য়্যাচারোজি মহাশয়

মান্যবরেষু।

মহাশয়!

আপনার নামীয় বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানিতে পারিলাম যে, প্রবেশ-ফি দুই টাকা এবং মাসিক এক টাকা হারে চাঁদা দিলে আপনারা উপযোগিতা অনুসারে কর্ম্ম যোগাড় করিয়া দেন, এবং কর্ম্ম করিয়া দিলে প্রথম মাসের প্রাপ্ত বেতন হইতে তাহার সিকি অংশ টাকা আপনাদের পারিশ্রমিক-স্বরূপ দিতে হয়। আমি আপনাদের এই ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া লিখি যে, যদিও ইতিপূর্ব্বে কখন কোথাও আমি কোন চাকুরী আদি করি নাই কিন্তু অবস্থাবিপাকে পড়িয়া এক্ষণে কিছুকাল কলিকাতায় একটী চাকুরী করিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছি। মহাশয়কে কথাটা খুলিয়াই বলি। আমাদের গ্রামে এ বৎসর ভীষণভাবে ম্যালেরিয়া সুরু হইয়াছে। সকলেই এখানে-ওখানে বা কলিকাতায় পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় গিয়া থাকা কখনই আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু দায়ে পড়িয়া অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য বাধ্য হইয়া আমায় কলিকাতায় থাকিতে হইবে। সুতরাং একটি ভাল 'টেম্পোরারী' কর্ম্ম পাইলেই আমার সুবিধা হয়। তাহা হইলে বাটী হইতে খরচাদি লইয়া যাইবার আবশ্যক হয় না; ঐখানকার উপায় দ্বারাই ঐখানকার ব্যায়াদি নির্ব্বাহ হয়। আমি মহাশয়কে প্রথম মাসের মাহিনা হইতে সিকি অংশ দিতে স্বীকৃত রহিলাম; কিন্তু ভর্ত্তির ফি এবং মাসিক ফি হইতে বর্ত্তমানে আমাকে অব্যাহতি দিতে হইবে। অন্ততঃ কর্ম্ম জুটাইয়া দিবার পূর্ব্বে উহা দিতে অক্ষম, সিকি মাহিনা দিবার সময়, উক্ত ফিও ঐসঙ্গে হিসাব করিয়া দিব।

আমি এফ-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছি এবং সংস্কৃত ভালরূপ জানি। কোন স্কুলে পণ্ডিতী অথবা বড়-লোকের কোন ঠাকুরবাড়ীতে ম্যানেজারীর মত কোন কাজ হইলেই আমার পক্ষে সুবিধা হয়।

পত্রপাঠ উত্তরদানে সুখী করিবেন। কিমধিকমিতি।

পুনশ্চঃ—কোন ভাল দেবালয়, যেখানে ঠাকুরের নিত্যভোগাদি, বৈকালী, শীতল প্রভৃতির সুব্যবস্থা আছে, সেইরূপ স্থানই বাঞ্ছনীয় জানিবেন।"

পত্রখানি পাঠান্তে নেপাল বহুক্ষণ ধরিয়া অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। তুলসী জিজ্ঞাসা করিল—"কি, ব্যাপার কি হে, চিঠি প'ড়ে যে হতভম্ব হয়ে রৈলে। হীরালাল দেবশর্ম্মা কি জানা-শুন' কেউ নাকি? কোত্থেকে লিখছে—শ্যামসুন্দরপুর না কি পুর?" নেপাল শুধু বলিল—"হুঁ"।

নেপাল তাহার গ্রামের নাম ইতিপূর্ব্বে কাহারও নিকটে প্রকাশ করে নাই।

পরদিন নেপাল অফিসে যাইয়াই চিঠিখানির জবাবে লিখিল—"মহাশয়, আপনার পত্র পাইয়াছি, আপনি জাতি-ব্যবসা ত্যাগ করিয়া চাকুরী লইতে অগ্রসর হইতেছেন—ইহা উচিত নহে। আপনি ব্রাহ্মণ,—পঠন, পাঠন, যাজন প্রভৃতিই আপনার কার্য্য। যাহা হউক, ঠাকুরবাড়ীর একটি ম্যানেজারী কাজ খালি আছে। যদি আপনি নিষ্ঠাবান্ হয়েন এবং কোনও রূপ ধূমপানাদি অভ্যাস আপনার না থাকে, তাহা হইলে আপনাকেই আমরা তথায় নিযুক্ত করিয়া দিতে পারি। যাঁহাদের দেবালয়, তাঁহাদের এইরূপই অভিলাষ। কিন্তু জানিবেন যে, কার্য্যটি কলিকাতায় নহে। কলিকাতার অপেক্ষা সহস্র গুণ স্বাস্থ্যকর—ত্রিচিনাপল্লীতে। যদি মত হয়, ত্বরায় জানাইবেন। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত

জি, আর, য়্যাচারোজি।"

গয়ারাম—ওরফে গয়ারাম আচার্য্য—ওরফে জি, আর য়্যাচারোজির নামেই অফিসের চিঠিপত্র কাজকর্ম্ম সব চলিত।

পত্রখানি খামে মুড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই নেপাল মুখ তুলিয়া দেখিল, গয়ারাম প্রবেশ করিতেছে। গয়ারাম বসিয়াই কহিল,—"নেপাল বাবু, অফিস যখন চল্‌লই না, তখন—ঝোপ একটা যা পাওয়া গেছে, তাইতেই ঝেড়ে কোপ একটা বসিয়ে দেওয়া যাক।"

নেপাল ও তুলসী বিস্তারিত শুনিবার ইচ্ছায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গয়ারাম কহিল—"এই চার-পাঁচশ টাকা, যেটা অফিস করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেল, অন্ততঃ সেটা ত তুলসী বাবুকে তুলে দিতে হবে। বারাকপুরের সেই স্কুলমাষ্টারটির নাম হ'ল কি, বলাই মিত্তির—না? বার করুন ত তার ঠিকানাটা, তারেই এক কোপ দিয়ে দেওয়া যাক। গুটি দশেক যা মক্কেল পাওয়া গেছে, এইটিই বোধ হয় তার মধ্যে টোপ্ ধরবে।"

নেপাল কহিল—"তার মানে?"

"তার মানে, স্কুল-মাষ্টারই সব চেয়ে বোকা হয়। অর্থাৎ অল্পেই বিশ্বাস, অল্পেতেই হতাশ, একটুতেই সন্তুষ্ট, নিরীহ, উচ্চ আশা-টাশার ধার একেবারেই ধারে না, আর চব্বিশ ঘণ্টাই ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার মত খাটতে মজবুত। জীবন-ভোরই ছুটছে। হোঁচট খাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, কেটে যাচ্ছে, সর্দ্দিগর্ম্মি হচ্ছে, সব সামলে নিয়ে ছোটার তার বিরাম নেই, কেন না, ছুট বন্ধ হলেই তার মৃত্যু। বাস্তবিক যৎসামান্য একমুঠো অন্ন আর একখানা বস্ত্রের জন্যে কি খাটুনিই এদের খাটতে হয়।"

"তাই এই মরাকেই আপনার মারবার ইচ্ছে হচ্ছে?"

"তা কি করব? ভগবান্ হতভাগা ক'রেই যখন ওদের—আরে রাম রাম! নেহাৎ ভাগ্য মন্দ না হোলে আর স্কুল-মাষ্টারি কেউ করে?"

"না, দাদা, তা ঠিক নয়, ওদের সুখের কাজ। বছরের বারো মাসের মধ্যে ওদের ছুটীই সাত—

"পাগল! সেই সাত মাসেই ত আরও খাটুনি। তখন সকালে, দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, সব সময়েই টুইসন্। আসল চাকরীই ত ওদের তাই। কেন না, শুধু স্কুলের মাইনেটিতে শুধু অন্ন বা শুধু বস্ত্র—দুটির একটি হয়। সুতরাং টুইসনি না করলে কারুরই চলে না। কিন্তু এই টুইসনির কি কম হাঙ্গামা! ছেলে রোগা হয়ে যাচ্ছে, মষ্টারমশাইকে তার জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে, ছেলে খেতে ব'সে গোলমাল করে, দায়ী মাষ্টার মশাই, ছেলের পেটের অসুখ হয়েছে—কেন হয়, মাষ্টার মশাই তবে কি করে!"

"পাপের ভোগ আর কি!"

"সত্যিই তাই। তাই ত বলছি যে, উদয়াস্ত

খেটে খেটে সারা হ'তে হয়। বরঞ্চ জিরোবার সময় ওদের স্কুলের ঐ ঘণ্টা পাঁচেক সময়। ১১টা থেকে ৪টা, ঐটুকুই যা বিশ্রাম পায়!"

"কিন্তু দাদা, গরীবই হোক, আর খাটুনি ওদের যত বেশীই হোক, একটা মহৎ কাজ নিয়ে ওরা আছে। সকলের চেয়ে মানী ওরা বেশী, এটা মনে রাখবেন যে, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, হাকিম, উকিল ওরাই তৈরী করে।"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া গয়ারাম কহিল,—"তা করে! কিন্তু সেই হাকিম-হুকিমরা যখন গদিতে বসেন, তখন তাঁরাই আবার সব চেয়ে ঘৃণ্য জীব বলে মনে ভাবেন তাঁদের এই সৃষ্টি-কর্ত্তাদের। যাই হোক, আমি কিন্তু মোটেই এঁদের ঘৃণা করতে পারি না, যেহেতু, এখনই মাননীয় মাষ্টারমশাইকে চিঠির এক বাণ বারাকপুর লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়তে হবে। তাঁর ঠিকানাটা দিন দেখি।"

অতঃপর নেপালের কাছে নিজের চেয়ারখানা সরাইয়া লইয়া গিয়া গয়ারাম বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার সহিত পরামর্শ করিল এবং নেপালের মত না হইলেও জোর কবিয়া তাহাকে বুঝাইয়া সে বারাকপুরে বাবুগঞ্জের শ্রীযুক্ত বলাইচরণ মিত্রকে পত্র লিখিতে বসিল।

ইহারই দিন চারি-পাচ পরে এক দিন দ্বিপ্রহরে বলাই বাবু চিঠিখানি হাতে লইয়া জি, আর, য়্যাচারোজি কোম্পানীর অফিসে আসিয়া দেখা দিলেন। তখন নেপাল, তুলসী ও গয়ারাম তিন জনেই উপস্থিত ছিল। বলাই বাবুকে বসিতে বলিয়া গয়ারাম তুলসীর উদ্দেশে কহিল,—"দেখুন ত 'কাঠবাড়ী' টি-এষ্টেটএ যে ভদ্রলোকটীকে দেওয়া হয়েছে, তাঁর আড়াই শ' টাকা মাইনের ভেতরেই কি হাউস-এলাউন্স—না, সেটা আলাদা?"

তুলসী একখানা মোটা খাতা লইয়া একধারে বসিয়া ছিল, তাহার পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া কহিল,—আড়াই শ' টাকার ভেতরেই হাউস-এলাউন্স।"

"তা হ'লে তাঁকে জানিযে দিন যে, আমাদেরই ভুল হয়েছিল, এলাউন্স আলাদা নেই, আমরা তার জন্যে ম্যানেজারকে অনুরোধ করতে পারব না। আর দিল্লীর পিলটন্ কোম্পানীকে জবাবটা দিয়ে দিন যে, যত শীঘ্র পারি, আমরা তাঁদের জন্যে এক জন এঞ্জিনিয়ার পাঠাচ্ছি। আপনি এই চিঠি দুখানা লিখুন, আমরা ততক্ষণ বলাই বাবুর কাজটা শেষ করি।"

বলাই বাবুর কাজ শেষ করিতে বেশীক্ষণ লাগিল না, যেহেতু তাঁহার সহিত বিশেষ কোন গুরুতর কাজ ছিল না। তিনি বরাবরই স্কুলমাষ্টারী করিয়া আসিতেছিলেন। বি-এ পাশ। কিন্তু আর মাষ্টারী করিতে অনিচ্ছুক। কোন জমিদারী সেরেস্তায় ম্যানেজারী কিম্বা সদাগরী অফিসে একটা ভাল কাজ হইলেই তাঁহার সুবিধা হয়। বেকার সমস্যা অফিস হইতে চারি পাঁচ দিন হইল তাঁহাকে জানান হইয়াছিল যে, রাওলপিণ্ডীতে মেসার্স Albogus Coতে তাঁহার জন্য কেসিয়ারের কার্য্য ঠিক করা হইয়াছে, মাহিনা দুই শত টাকা। সুতরাং অনতিবিলম্বে তিনি যেন তাঁহার বি-এ পাশের ইউনিভার্সিটী সার্টিফিকেট খানি সঙ্গে লইয়া সাক্ষাৎ করেন।

বলাই বাবুর সহিত কিছুক্ষণ কথা হইবার পর গয়ারাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তা হ'লে আপনার কোন অমত নেই ত?"

"অমত? নিশ্চয়ই না। আপনাদের আর কি ব'লে ধন্যবাদ দেব। চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকা ছাড়া আর আমার কোন সম্বল নেই। তবে সিকিউরিটির পাঁচ-শ' আমি সবটা এখনই যোগাড় করতে পারব না। কুড়িয়ে বাড়িয়ে বড় জোর এখন শ' আড়াই দিতে পারি, তা'ও যে কি বেগ আমায় পেতে হবে, তাই শুধু ভাবছি। ওঁদের চিঠিখানা আর একবার দিন ত' দেখি।"

Albogus কোম্পানী হইতে যে চিঠিখানি আসিয়াছিল, বলাই বাবুকে প্রথমেই তাহা দেখান হইয়াছিল, এক্ষণে পুনরায় তিনি তাহা মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিলেন। চিঠির হেডিং দেখিয়াই বলাই বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, খুব বড় কোম্পানীই বটে। হেডিংয়ে কোম্পানীর নাম ছাপান ছিল—মেসার্স অলবোগাস্ এণ্ড কোং—রেলওয়ে এণ্ড গভর্ণমেণ্ট কনট্রাক্টার্স এণ্ড সিপ বিল্ডার্স; তাহার পর মিঃ জি, আর, য়্যাচারোজিকে সম্বোধন করিয়া যাহা লেখা, তাহা ত টাইপ করা। তাহাতে পাঁচ শত টাকা সিকিউরিটির কথা সুস্পষ্টই উল্লেখ আছে। প্রথমবার চিঠিখানি পড়িবার সময়ই বলাই বাবু ইহা দেখিয়াছিলেন এবং এই অংশটা দেখিয়াই তাঁহার হর্ষোৎফুল্ল মুখের উপর হঠাৎ নিরানন্দের একটা ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল।

এক্ষণে গয়ারামের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আপনাদের ওপরেই ত সব ভার। সিকিউরিটি, ইউনিভার্সিটী সার্টিফিকেট প্রভৃতি সে-ও আপনাদের কাছে দাখিল করতে হবে, 'য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার'ও আপনাদের কাছ থেকে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে আপনারা যদি এই দয়াটুকু করেন। আড়াই শ' আমি যেমন ক'রে পারি, এখনই দেব, বাকী আড়াই শ' মাস মাস আমার মাইনে থেকে ওঁরা না হয় কেটে নেবেন। এইটুকু দয়া আপনাদের করতেই হবে।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু একটুখানি হাসিয়া বলাই বাবু গয়ারামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাহিরের এই হাসিটুকুর ভিতর তাঁহার কতটা আকুলতা, কতটা কাতরতা, কত বড় একটা নৈরাশ্যের ভয় যে ছিল, তাহা হয় ত গয়ারাম জানিতে পারিল না; কিন্তু নেপাল কতকটা হয় ত তাহা বুঝিল। নেপাল আর যাহাই হউক, তাহার বুকের ভিতরে একটী কোমল অন্তঃকরণ ছিল। গোড়া হইতেই সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা ঘোর অনিচ্ছা তাহার অন্তর ভেদ করিয়া প্রকাশ হইবার জন্য ছটফট্ করিতেছিল। কিছু একটা সে বলি বলি করিয়াও গয়ারামের ভয়ে ও খাতিরে যেন বলিতে পারিতেছিল না, শুধু একাগ্রমনে সম্মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিত্য বারবার দেখা দেওয়ালের সেই ক্যালেণ্ডার, সেই ঘড়ি প্রভৃতিই দেখিতে লাগিল।

বলাই বাবু কহিলেন—"আপনাদের ঋণ আর জীবনে শুধতে পারব না। ওঁদের সঙ্গে ঐরকম ব্যবস্থাটা দয়া ক'রে করিয়ে দিন। আমার ভেতরের অবস্থাটা যদি আপনারা জানতেন, তা হলে—। দেখুন, চারটী আইবুড়ো মেয়ে গলায়, বড়টি বিয়ের বয়স ছাড়িয়ে গিয়েছে, অথচ একটি আধলার সংস্থান নেই, এক বছর ধ'রে কোন চাকরীই নেই। কি আর আপনাদের বলবো, আজ স্ত্রীর কাছে লুকিয়ে লক্ষ্মীর হাঁড়ির—। যাই হোক, আমার B. A.র সার্টিফিকেটখানা আর টাকা আড়াই শ' যেমন ক'রে পারি, কাল আমি যোগাড় ক'রে নিয়ে আসবো।"

এই 'যেমন করিয়া'র ভিতর কত রকম কি যে থাকিতে পারে, নেপাল চুপ করিয়া বসিয়া অনুমানে তাহাই হিসাব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; অনাহারের এই শীর্ণ দেহ, রুক্ষ কেশ, ঐ মলিন বসন, এই কাতর অথচ সঙ্কোচভাব, আর সর্ব্বোপরি কর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য এই আকুলি-ব্যাকুলি, ইহার মধ্যে হয় ত কত বড় একটা বিরাট দৈন্য ও অভাব তাহার ক্ষীণ বক্ষের অস্থি-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া বিরাজ করিতেছে, কে-ই বা তাহার হিসাব রাখে! তাহার নিজের অবস্থাও ত তাই। সত্যই কি শুধু সখ করিয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছে? কলিকাতার মাটী কি শ্যামসুন্দরপুরের মাটীর চেয়ে তাহার বেশী প্রিয়? না—না—কিছুতেই নয়। হীরু ঠাকুর্দ্দা তাহা বুঝিতে পারে নাই। বড় কষ্টে, বড় দুঃখে, বড় অভাবের তাড়নে সে দেশ ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে; কিন্তু তাহার দুঃখের অপেক্ষা হয় ত এই মাষ্টার-মহাশয়ের দুঃখ শতগুণে বেশী। তাহার দুঃখের একটা সান্ত্বনা আছে, সবই তাহার ছিল, সে না বুঝিয়া নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের দুঃখের হয় ত কোন সান্ত্বনাই নাই। তাহা ছাড়া আরও একটা কথা, এক বুড়া মা ভিন্ন ভরণ-পোষণ করিবার লোক তাহার কেহই নাই, কিন্তু ঐ ভদ্রলোকের শুষ্ক মুখের দিকে অনেকগুলি ক্ষুধিত শুষ্ক মুখ হয় ত চাহিয়া থাকে। হয় ত উহারই—

তাহার চিন্তায় বাধা জন্মাইয়া দিয়া গয়ারাম কহিল—"নেপাল বাবু, তাই হোক, ভদ্রলোকের অনুরোধ অবশ্যই আমাদের রাখতে হবে।" তাহার পর বলাই বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল—"তাই হবে, বলাই বাবু, কালই টাকাটা যোগাড় ক'রে আনবেন তা হ'লে। কালকেই ঐ আড়াই শ' টাকার চেক কোম্পানীর হিসেবে এখানে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেব আর আপনাকেও রসিদ দিয়ে Appointment দিয়ে দেবো। দিন দশ-বারোর মধ্যেই কিন্তু আপনার চ'লে যাওয়া চাই।"

তাহাই হইল। পরদিন প্রায় অপরাহ্নের সময় প্রফুল্লান্তঃকরণে ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলাই বাবু তাঁহার বি-এ পাশের সার্টিফিকেটখানি ও আড়াই শত টাকার নোট রুমাল হইতে খুলিয়া গয়ারামের হাতে দিলেন এবং রাওলপিণ্ডির Albogus কোম্পানীর অধীনে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে কেসিয়ারীর নিয়োগপত্র হাতে লইয়া পরিপূর্ণ অন্তরমধ্যে ভবিষ্যৎ সুখ-স্বচ্ছন্দতার শান্ত চিত্র আঁকিতে আঁকিতে গৃহে যাত্রা করিলেন। যাইবার কালে গয়ারাম তাঁহাকে বলিয়া দিল যে রাওলপিণ্ডি যাইবার পূর্ব্বে আর এক দিন তিনি যেন আসিয়া দেখাশুনা করিয়া যান।

তুলসী সে দিন অনুপস্থিত ছিল। নেপালের

দিকে চাহিয়া গয়ারাম কহিল—"নেপাল বাবু এই বারে খতম্ ক'রে দিন। ব্যস্—আর নয়। কাল থেকেই অফিস উঠিয়ে, সাইনবোর্ড খুলে ফেলুন, নইলে হয় ত আবার 'চিটিং কেশে' পড়তে হবে। মাছ ত হলোই না, কাদা মাখতে হবে তা হ'লে। কালই পাততাড়ি গোটাবার ব্যবস্থা করুন।"

সে দিন একটু সকাল-সকালই গয়ারাম বাসায় চলিয়া গেল। নেপাল একলাটি বসিয়া থাকিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে আজ কেন যে হঠাৎ সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত এই লোকটির দুঃখে এমন করিয়া সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। অবশ্য ফাঁকির ব্যবসাই সে ধরিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার গোড়ায় গয়ারামের প্রভাবই ষোল আনা বর্ত্তমান। গয়ারামের কথা ও কাজের উপর তাহার যেন কোন প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতামাত্র থাকে না। মন যেখানে তাহার অস্বীকার করে, মুখ সেখানে তাহার স্বীকার না করিয়া যেন পারে না। তাহা হইলেও তুলসীর পিতার নিকট ঐ ভাবে টাকা আদায় করা সম্বন্ধে তাহার তেমন বিশেষ অনিচ্ছা ছিল না। যাহার প্রচুর আছে, তাহার লইতে তাহার আপত্তি নাই, দ্বিধা নাই, কিন্তু ঐ বেচারা মাষ্টারমশাই, ওরই মুখে যতটা সে শুনিল, বুঝি ওর মত দরিদ্র হতভাগ্য আর নেই। তাহার কাছ হইতে যে ভাবে এই টাকাটা তাহাদের দ্বারা কাড়িয়া লওয়া হইল, অতি বড় অমানুষও এ কাজ পারে না। হয় ত সত্যই উহার এক আধলারও সঙ্গতি নাই, হয় ত উহার স্ত্রীর গায়ের এক আধখানি গহনা, যাহা বহুমূল্য সম্পত্তি জ্ঞানে সে ব্যবহার না করিয়া কেবল তুলিয়া রাখিত, তাহাই বিক্রয় বা বন্ধক দ্বারা ইহা তাহাকে যোগাড় করিতে হইয়াছে। হয় ত বা তাহাও নহে,—সমস্ত টাকাটা তাহার ক্ষুদ্র ভিটাটুকু বন্ধক দিয়া অথবা কাহারও নিকট হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া তাহাকে লইতে হইয়াছে। হয় ত জীবনে আর তাহার এই ঋণ পরিশোধই হইবে না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সাতপুরুষের ভিটাও তাহাকে ছাড়িয়া তাহারই মত পরের দুয়ারে দুয়ারে দিন কাটাইতে হইবে।

এই সূত্রে নেপালের অন্তর মধ্যে আজ শ্যামসুন্দরপুরের কথা এবং তথাকার পাড়া-প্রতিবেশী ও সঙ্গিসাথীদের কথা উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পীড়িত মন শ্যামসুন্দরপুরের মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর, ঝোপ-ঝাড়ের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিমেষে একবার ঘুরিয়া আসিল। তার পর সুদীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনেই বলিয়া উঠিল—"আহা রে!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাসার পথে আসিতে আসিতে নেপাল অন্তরে হঠাৎ গয়ারামের উপর খুব কঠিন হইয়া পড়িল। মনে করিল, গয়ারাম যে চরিত্রের লোক, উহার কোন কথাই বিশ্বাস করা উচিত নহে। এই আড়াই শ' টাকা যখন উহার পকেটে পড়িয়াছে, হয় ত উহা সে আর বাহির করিতেও না পারে; সুতরাং আজই উহার কাছ হইতে টাকাটা লইয়া রাখিতে হইবে এবং তুলসী আসিলে তাহাকে দিয়া দিতে হইবে। সুতরাং দ্রুতপদে সে বাসায় আসিল এবং নিজের ঘরে না যাইয়া বরাবর সুখদার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল,—"দাদা!"

ঘরের মধ্যে তখন সুখদা ও গয়ারাম উভয়েই ছিল। গয়ারাম বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলে নেপাল কহিল, "টাকাটা তা হলে দিয়ে দিন, তুলসী এলে তাকে দেবো।"

দুই হাতে মাথার দুই পাশ খুব জোরে টিপিয়া ধরিয়া গয়ারাম কহিল—"ভয়ানক মাথা ধরেছে নেপাল বাবু, কাল সকালে যা হয় হবে, এখন আর দাঁড়াতেও পাচ্ছি না, কথা কইতেও পাচ্ছি না।"

নেপালের আর কিছু বলিবার সাহস হইল না; সে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিল।

পরদিন সকালে তুলসী আসিয়া নেপালের ঘরে ঢুকিতেই ও-ঘর হইতে গয়ারাম হুঁকা হাতে করিয়া আসিয়া মেজের উপর উবু হইয়া বসিল এবং কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল,—"নেপাল বাবুর ইচ্ছেটা কি, আমি জেলে যাই?"

বিস্মিত হইয়া নেপাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ—বলাই মাষ্টারের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে আমিই রসিদ দিয়েছি। পরে যদি কোন গোলমাল হয়, তা হ'লে জেলটা আমাকেই খাটতে হবে। দেখুন নেপাল বাবু, কাল আমি স্তম্ভিত হয়ে

গেছলুম যে, টাকাটা আপনি আমার কাছ থেকে চাইলেন কি ক'রে।"

নেপাল টাকা সম্বন্ধে এই রকমই একটা কিছুর আশা করিতেছিল। সে বুঝিল যে, গয়ারামের কথার উপর কোন যুক্তি, কোন কথাই চলিবে না। চলিলেও তাহাতে কোনই ফল হইবে না, সুতরাং নীরবেই বসিয়া রহিল। মুহূর্ত্ত কয়েক পরে শুধু এইটুকুমাত্র জিজ্ঞাসা করিল,—"তা হ'লে টাকাটা নিজের কাছেই আপনি রাখবেন?"

গয়ারাম ভাল করিয়া গা-নাড়া দিয়া বসিয়া ডান হাতের হুঁকা বাঁ-হাতে লইয়া কহিল—"নিশ্চয়ই।'

হঠাৎ সুখদা এই সময়ে দরজার পার্শ্বে একটুখানি দেখা দিয়া, গয়ারামকে লক্ষ্য করিয়া শুনাইল,—"বেশ ত ব'সে ব'সে আড্ডা দিচ্ছ। তোমার ত আর হোটেল নেই, বলি—বাজার-টাজার যেতে হবে, না নিষ্কর্ম্মার মত বাজে আড্ডা দিলেই চলবে? এখনও ত জেলে যাও নি; যখন যাবে, তখন না হয় তৈরী ভাত পাবে, ঘর-সংসার বাজার-হাটের আর দরকার হবে না।"দরদ দেখানোর পক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীকেও হার মানাইয়া দিয়া আরও কি সব বলিতে বলিতে সুখদা উঠান অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল এবং সেইখান হইতে তাহার মুখের শেষ কথাগুলিও শুনিতে পাওয়া গেল, "—ছিঃ—ছিঃ! আমি হ'লে সাত জন্মে অমন বন্ধুদের ছায়া মাড়াতুম না! ঝাঁটা মার—ঝাঁটা মার!"

নেপাল ও তুলসী অবাক হইয়া বসিয়া রহিল, গয়ারাম একান্তমনে তামাক টানিয়া যাইতে লাগিল! কাহারও মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না। এ অবস্থায় লোক উঠিয়া চলিয়া যাইবারও অবসর প্রায় খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু গয়ারামের কাছে কিছুই বাধে না, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"ভাল জ্বালাতনে পড়া গেছে যা হ'ক।"—বলিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গয়ারাম চলিয়া গেলে তুলসী নেপালকে কহিল,—"ব্যাপার গুরুচরণ, নেপাল! সকালেই মেয়েমানুষের হাতের মিষ্টি মিষ্টি ঝাঁটা বেশ খাওয়া গেল। তুমি এর ওপর আজ কিছু খাবে না কি?"

নেপাল খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল মাত্র। তুলসী কহিল—"আমি এখনই গিয়ে অফিস তুলে দেবার ব্যবস্থা করি গে, আজকের মধ্যেই সব খালি ক'রে দেবো। কিন্তু একটা কথা তোমাকে ব'লে যাই। তুমি শীগ্‌গিরই অন্য বাসার ঠিক কর। শুধু তোমার জন্যেই এখানে আসা, নইলে আমি কিছুতেই এ দলের মধ্যে এসে ভিড়তুম না। এর পরেও যদি এ বাসা না ছাড়, তা হ'লে বুঝবো যে, একটা মহাবিপদে না প'ড়ে কিম্বা সাংঘাতিক রকম একটা অপমান না হয়ে তুমি যাবে না।"

এ কথারও নেপাল কোন জবাব দিল না, শুধু একটি সিগারেট লইয়া ধরাইয়া টানিতে লাগিল।

তুলসী চলিয়া গেলে নেপাল শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল। কখন্ দশটা বাজিয়া গেল, এগারটা বাজিয়া গেল, কিছুই সে জানিতে পারিল না। ও-পারের জেলখানার ঘড়িতে যখন বারটা বাজিল, তখন হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল এবং স্নান না করিয়া বা বাসি কাপড় না ছাড়িয়াই হোটেলে খাইতে চলিয়া গেল।

সুখদার সকালবেলাকার সেই গুটি দুই কথা লক্ষ তীক্ষ্ণ ফলা বাহির করিয়া আজ নেপালের অন্তরকে অনবরত বিঁধিতেছিল, তাহার উপর অপরাহ্ণে সে যখন শুনিল যে, সুখদা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া এবং তাহাকেই শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতেছে—"ভারি ত বাবু—ফকিরচাঁদ ভিকনবিশ! দু' মাসের ঘরের ভাড়া জ'মে রয়েচে, দেবার নেই ক্ষ্যামতা, আবার নবাবী করে! এ সব লক্ষীছাড়া হাড়-হাবাতে লোক আমার দরকার নেই। বন্ধু! আহা কিবে বন্ধু গো! বন্ধু হয় ত, নিজের বাড়ীতে যায়গা দাও গে যাও।"—তখন রাগে, অপমানে, ঘৃণায় নেপালের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দ্রুতপদে সুখদার ঘরের সামনে আসিয়া সে ডাকিল—"দাদা!"

গয়ারাম নিদ্রার ভাণ করিয়া বিছানায় শুইয়াছিল। সুখদা কহিল—"ভাই যে ডাকছে গো!" গয়ারাম তেমনই শায়িত অবস্থাতেই কহিল—"কি বলছেন নেপাল বাবু?"

ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়া নেপাল কহিল—"মাসে মাসে ঘরের ভাড়া দিয়ে আসছি, ভাড়া বাকি কি রকম?"

"ও সব কথার ভেতর আমি নেই নেপাল বাবু! ভাড়া দিয়ে আসছেন, কি বাকি প'ড়ে আসছে, আমি তার কি জানি বলুন"—বলিয়া পাশের বালিশ টানিয়া লইয়া গয়ারাম আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

আয়না, চিরুণী, ফিতা, মশলা দেওয়া নারিকেল

তেলের বাটী প্রভৃতি মেজের উপর রাখিয়া সুখদা তখন চুল বাঁধিবার যোগাড় করিতেছিল, কহিল,—"এমনি তাগিদার যে, আড়াইশোতেই নোলা দিয়ে টস্-টসিয়ে জল গড়াচ্ছে। রাম রাম! তোকে বলি মিন্‌ষে, হাতটা যে গন্ধ ক'রে ফেল্‌লি, বলি, মারলি ত একটা ছুঁচো! এখন সেই ছুঁচোর ভাগ নিতে বিশটা কুকুর ল্যাজ নাড়ছে! বলি, জেল যখন খাটবি, তখন তোর কোন্ মার পেটের ভাই গিয়ে দাঁড়াবে বল্ ত?"

কিন্তু এই ব্যাপার সম্পর্কে যে গয়ারামকে জেল খাটিতে হইবে না, তাহা সুখদাও জানিত, গয়ারামও জানিত। কারণ, ইতিপূর্ব্বে সে আরও যে সব কাণ্ড করিয়া বসিয়া আছে, সে সবের তুলনায় জি, আর য়্যাচারোজির অফিস কিছুই নহে। তা ছাড়া তাহার নামই যে গয়ারাম নয়, সে কথা এক সুখদা ছাড়া এ পাড়ার আর কেহ জানেও না। আসল নাম তাহার গয়ারামও নয়, কিম্বা কাশীনাথ, কি বৈদ্যনাথ, কি প্রয়াগচরণও নহে। আসল নাম তাহার জগন্নাথ ঘোষ। দশ বৎসর আগে পর্য্যন্ত তাহার এই আসল নাই ছিল। তখন তাহারা অন্যত্র থাকিত। তাহার পর এই দশ বৎসরের মধ্যে দশ অবতার হইয়া ক্রমাগত তাহাকে নামের পর নাম পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে এই বাসায় আসিবার পর জগন্নাথকে সমুদ্রতীর পরিত্যাগ করিয়া একেবারে গয়া ও অযোধ্যার সম্মিলিত পাহাড় অঞ্চলে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

নেপাল কোনরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর না দিয়াই নিজের ঘরে চলিয়া আসিল এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, আজই রাত্রের মধ্যে সে কোন ভাল মেস্ খুঁজিয়া ঠিক করিয়া আসিবে এবং কালই সে তথায় উঠিয়া যাইবে। এই রকম ছোটলোকদের মধ্যে সে আর একটা দিনও থাকিবে না।

দ্বিপ্রহরে উদ্বেগ, অশান্তি ও চিন্তায় তাহার ভাল করিয়া খাওয়াও হয় নাই, এ বেলা তাহার খুবই ক্ষুধা পাইয়াছিল, কিন্তু সে কিছু না খাইয়াই, ঝোঁকের উপর মেস্ খুঁজিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত ভবানীপুর, কালীঘাট ঘুরিয়াও কোন মেসের সন্ধান করিতে পারিল না—যেখানে সিট খালি আছে।

দুই ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমাগত ঘুরিয়া নেপাল ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। রসারোড হইতে বালিগঞ্জের দিকে যে নূতন রাস্তাটি বাহির হইয়াছিল, তাহারই ধারে এক খণ্ড খালি জমীর উপর সে বসিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। রাস্তার আলোগুলি একে একে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ওদিককার ফুটপাথের উপর কাহাদের একখানি বাড়ী। বৈঠকখানায় অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া হাসি-তামাসা গল্প-গুজব করিতেছিলেন। নেপাল মনে করিল, উহাদের কাছে একটু জল চাহিয়া লইয়া সে খাইয়া আসে। কিন্তু ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া, এতগুলি লোকের মধ্যে একটু জল চাহিতে তাহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। সে নীরবে ঘরের বাহিরে একটি ধারে দাঁড়াইয়া ভিতরে চারিদিকে দেখিতে লাগিল। তাহার সম্মুখেই ঘরের দেওয়ালে স্বর্ণাক্ষরে লেখা চারি ছত্রের একটি ফ্রেমে বাঁধানো মটো ঝুলিতেছিল, নেপাল তাহা পড়িল—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

আর এক দিকে আর একখানি ফ্রেমে আঁটা বোর্ড ঝুলিতেছিল, তাহাতে কাচের আবরণ ছিল না। নিপুণ হস্তে ছাপার মত অক্ষরে তাহাতে নীচে নীচে কয়েকটি নাম লেখা ছিল, নেপাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাও পড়িল:—

দশচক্র-সমিতি

সভ্যগণের নাম

কালীপতি চৌধুরী
বিশ্বদাস রায়
অমূল্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার রায় চৌধুরী
নরেন্দ্রমোহন বসু
কালীনাথ দেব
অস—

আরও দুই চারিটি নাম লেখা ছিল, কিন্তু ইহার পর হইতে বাকি অংশ আর নেপাল পড়িতে পারিল না। কারণ, তাহা পড়িবার উপায় ছিল না। বাড়ীর একটি দুষ্টু ছেলে কোনও নির্জ্জন মধ্যাহ্নে কালি-কলম লইয়া মনের সাধে এইখানে দুষ্টামি করিয়াছে,—অর্থাৎ ইহার পর হইতে নীচের দিকে

সমস্ত কাগজখানিতে মোটা মোটা কালির আঁকে মসীলিপ্ত করিয়া একেবারে অপাঠ্য করিয়া ফেলিয়াছে। শিশু লেখকটি বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব্বভাষা-সমন্বয়ের মহান্ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তাই বোর্ডখানির সর্ব্বাংশেই সে জগতের যাবতীয় ভাষার বর্ণমালার অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটাইয়া বহু লেখা লিখিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এখানে ওখানে তাহার নিজের ছোট নামটিও বড় বড় করিয়া চতুর্দ্দিকে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছে। ছেলেটির পক্ষে এইরূপ করিবার একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। সে জানিত যে, সে যাহাদের কোলে, বুকে, কাঁধে উঠিত, এই কাগজখানিতে তাহাদের সকলেরই নাম লেখা ছিল, ছিল না শুধু তাহার নিজের। তাহার পিতার কাছে একদিন এই অতি বড় অবিচারের আপীল দায়ের করিলে, তিনি কহিয়াছিলেন যে, সে যখন বড় হইবে, তখন তাহার নাম উহাতে নিশ্চয়ই লেখা হইবে। কিন্তু পিতার এই মিথ্যা এবং যুক্তিহীন রায় তাহার মোটেই পছন্দ হয় নাই, কেন না, সে ত বড় হইয়াছে। সে এখন নিজে নিজেই স্নান করিতে ও জামা-কাপড় পরিতে পারে, এক হাতে কুড়ি পর্য্যন্ত গণিয়া যাইতে পারে, অ আ ক খ ঞ জ হ প্রভৃতি পড়িতে পারে এবং দিদির কাছে শিখিয়া এখন বড় বড় অক্ষরে সে তাহার নিজের নাম—শ্রীজয়দেব—লিখিতে পারে, তবুও তাহার বাবা তাহাকে এখনও ছোট বলে কেন? ভাবু, ছোট খুকী—ওরাই ত ছোট। যাহা হউক, তাহাকে এই জোর করিয়া ছোট করিয়া রাখার জন্য অভিমানে সে তাহার পিতার প্রতি যথেষ্টই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং ইহার ফলে এক দিন দ্বিপ্রহরে যখন তাহার মাতা তাহাকে ঘুম পাড়াইবার অভিপ্রায়ে কোলের কাছে লইয়া শুইয়াছিল, তখন কিছুক্ষণ মিছামিছি চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকিবার পর সে উপন্যাসপাঠরতা তন্ময় জননীর পার্শ্ব হইতে সন্তর্পণে উঠিয়া গিয়া নির্জ্জনে বৈঠকখানাঘরে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়াছিল এবং বহুক্ষণ ধরিয়া একান্তমনে এই কার্য্য করিয়াছিল এবং সেই শুভ অবসরে মনে মনে ইহাই বোধ হয় সে বলিয়াছিল যে, রসের সৃষ্টি করিতে কিম্বা তাহার আস্বাদ বুঝিতে তোমরা কি জান—সে জানি আমরা, সুতরাং যাহার নাম তোমরা অবহেলায় বাদ দিয়াছ, তাহারই নাম ইহাতে সর্ব্বাগ্রে এবং সকল স্থানে হওয়া উচিত।

যাহা হউক, প্রায় মিনিট দশ পনর এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ও ইহাদের আলাপ-আলোচনা শুনিয়া নেপাল বুঝিতে পারিল যে, ইঁহারা সকলেই সাহিত্যিক; কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ কবি, কেহ নাট্যকার, কেহ শিল্পী, কেহ বা গল্পী। যে সমস্ত কথা হইতেছিল, প্রধানতঃ তাহা সাহিত্য সম্বন্ধেই। এই সব দেখিয়া শুনিয়া নেপালের মন তখন দশ বৎসর পূর্ব্বেকার দিনগুলিতে পিছাইয়া গেল, ভাবিল তাহারও এক দিন ইঁহাদেরই মত কবিতা ও গল্প লিখিবার অভ্যাস ছিল। সে তাহাদের শ্যামসুন্দরপুরে ইঁহাদের মতই এই রকম সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহার দেশ ছাড়িয়া আসা সত্যই হয় ত ভুল হইয়াছে। হীরু ঠাকুর্দ্দা যা বলিয়াছিল—ঠিকই বলিয়াছিল, কিন্তু—

নেপাল মনে মনে তাহার দেশে থাকার পক্ষসমর্থন করিয়া, যত দিক দিয়া যত রকম চিন্তা করিতে লাগিল, সকল চিন্তার শেষে ঐ কিন্তু কথাটা আসিয়া পড়িতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত 'কিন্তু'র সমাধান আর সে করিয়া উঠিতে পারিল না।

এ দিকে তৃষ্ণায় তাহার ছাতি শুকাইয়া গলা পর্য্যন্ত শুকাইয়া আসিবার মত হইল। সে ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক জনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"একটু জল দিতে পারেন, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, রাস্তার কলে জল পেলুম না।"

একটি কাল রংয়ের ভদ্রলোক টেবলের উপর বসিয়া সিগারেট খাইতেছিলেন। তাঁহার মাথায় বড় বড় কার্লিং চুল, গোঁফ দাড়ি কামান, চোখে শেলের ফ্রেমের চশমা, হাতে সুন্দর একগাছি ছড়ি, বুকের পকেটের মধ্য হইতে সিল্কের একখানি নক্সা-কাটা রুমালের কিয়দংশ বাহির করান আছে। তিনি কহিলেন,—"জলপান করবেন, তাই চান, না জলপান চান?"

ওদিক থেকে একটি ভদ্রলোক একটিপ নস্য লইয়া নাক মুছিতে মুছিতে বাবুটিকে ধমক দিয়া কহিলেন,—"আঃ, কি করেন! আপনি আসুন, আসুন,—বসুন। জল খাবেন না চা খাবেন, আমাদের চাও হচ্ছে, যা ইচ্ছে বলুন। কোথায় থাকেন আপনি?"

নেপাল পাশের চেয়ারখানিতে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"এই ভবানীপুরে। আপনাদের এ দিকে ভাল মেস-টেস সন্ধানে আছে, বলতে পারেন?"

পরক্ষণেই একখানি বড় ট্রে করিয়া কয়েক কাপ

চা আসিল এবং নেপালের প্রশ্নটি চায়েতেই চাপা পড়িয়া গেল! এক কাপ তাহার নিজের হাতেও আসিয়া পৌঁছিল। ইঁহাদের এই দশচক্রের সভ্যগণের মধ্যে এক সিংহ-কবি ছিলেন, তিনি চা-পান সম্বন্ধে সুন্দর একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, সেইটি তিনি সকলকে পড়িয়া শুনাইলেন। চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই চায়ের এই কবিতাটি বিশেষরূপেই উপভোগ করিলেন। কার্লিং-চুল বাবুটি সিংহ-কবিকে দেখাইয়া নেপালকে কহিলেন, "ইনিই হচ্ছেন আমাদের এই চক্রের সভা-কবি। কিন্তু দশচক্রের হাতে প'ড়ে সিংহ-মশাই একেবারে শৃগাল হয়ে যাবার মতই হয়ে গেছলেন, অবশেষে 'চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যো' পন্থা অবলম্বন ক'রে তবে সিংহমহাশয়ের রাজসিংহাসন আবার দখলে আসে।"

নেপাল একটুখানি হাসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনাদের এই সমিতির নাম বুঝি দশচক্র?"

"আজ্ঞে, প্রায় তাই বটে, তবে দশে এখন ভয়ানক রস জ'মে উঠেছে, তাই দশ এখন রসের মধ্যে তলিয়ে গেছে।"

"প্রথমে বোধ হয় দশ জন মিলে সমিতিটি আপনারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাই দশচক্র নাম?"

পাশ থেকে একটি ভদ্রলোক কহিলেন,—"আজ্ঞে হ্যাঁ; এখন সভ্য সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। তাই নামটাও আমাদের বদলে ফেলতে হয়েছে।"

এইরূপে প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া ইঁহাদের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য নেপাল উঠিয়া দাঁড়াইতেই, বাটীর কর্ত্তা সেই বাবুটি আর একটিপ নস্য নাকে গুঁজিয়া নাক মুছিতে মুছিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"রবিবার রবিবার আমরা সকলে মিলে একটু আনন্দ করি। মাঝে মাঝে পারেন ত আসবেন বেড়াতে এই দিকে।"

নেপাল বিনয় প্রকাশ করিয়া কহিল,—"নিশ্চয় আসব। আপনাদের এ ধারটা বেড়াবারই ত যায়গা, বাসাটি আপনি ভালই পেয়েছেন।"

শেলের চশমা চোখে সেই বাবুটি কহিলেন,—"ওঁর ভাগ্য ভাল, ভালবাসাই পান। আমরা ও জিনিসটা ত পেলুমই না, উল্টে সকলের ঘৃণাটাই পাই। তা আপনি উঠে পড়লেন যে—বসুন। আপনি যে মেসের কথা জিজ্ঞাসা করেই নিমেষে আবার তখন অন্য কথা পেড়ে কথাটাকে চাপা দিলেন।"

নেপাল আবার চেয়ারখানি টানিয়া বসিল এবং বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আছে কোন মেস আপনার সন্ধানে?"

"মেস আছে, কিন্তু সিট্ নেই। তবে আমার সঙ্গে আমার মেসে যদি মিলেমিশে থাকতে পারেন, অর্থাৎ আমার সঙ্গে আমার ঘরে থাকতে যদি কোন বাধা আপনার না হয়, তা হ'লে বলুন।"

অতঃপর বাবুটির সহিত নেপালের কিছুক্ষণ ধরিয়া এই বিষয়ে কথা হইল এবং তাহার পর উভয়েই একসঙ্গে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যে বাবুটির সহিত নেপালের সে দিন আলাপ হইয়াছিল, তাঁহারই কালীঘাটস্থ মেসের ঘরে আজ দিন কুড়ি পঁচিশ হইল সে আশ্রয় লইয়াছে। বাবুটির নাম অতুলানন্দ সিংহ। তিনি সঙ্গীত-শিক্ষক। এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই, ভবিষ্যতে কখনও যে করিবেন, তেমন লক্ষণও কিছু তাঁহাতে নাই। সকলকেই তিনি তাঁহার বাদ্যযন্ত্রগুলি এবং গানের খাতা দেখাইয়া বলেন যে, এই সকলের সহিতই তাঁহার সত্যকারের পরিণয় যখন হইয়া গিয়াছে, তখন অনর্থক মিথ্যাকার একটা স্ত্রী ঘরে আনিবার তাঁহার কি আবশ্যক।

অতুল বাবু সদা প্রফুল্ল, সুরসিক, অত্যন্ত বিনয়ী, পরদুঃখকাতর এবং সর্ব্বোপরি অতিমাত্রায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাঁহার সাহচর্য্য নেপালের পক্ষে খুবই সুখের হইয়াছিল।

তুলসী ছাড়া নেপালের অন্যান্য বন্ধুরা কেহ এখানে বড় একটা আসিত না। গয়ারাম নেপালের এই নূতন মেসের কথাই জানিতে পারে নাই। সে জানিত যে, নেপাল তাহার দেশে চলিয়া গিয়াছে, কারণ, ঐ কথা বলিয়াই নেপাল সুখদার সুখ-নিকেতন ছাড়িয়া আসিয়াছিল।

মেসের মধ্যে প্রবেশ করিতেই রাস্তার একেবারে উপরে তাহাদের ঘরখানি ছিল। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অতুল বাবু ঘরে থাকিতেন না, তাঁহার শিক্ষকতা-কার্য্যে এই সময়টা তাঁহাকে বাহিরে থাকিতে হইত। নেপাল প্রায় সমস্ত দিনই

একাকী থাকিয়া, হয় বহি পড়িত, নয় হারমোনিয়ম লইয়া বাজাইত, আর না হয় চিন্তা করিত। আজ-কাল চিন্তা করিবার বিষয় ক্রমেই তাহার বাড়িয়া যাইতেছিল। হাতে তাহার এক পয়সারও সংস্থান নাই, যাহা ছিল, তাহা সুখদাকে ও হোটেলে দিয়া আসিতে হইয়াছে। ইহার উপর অতুল বাবুর কাছে এবং অন্যান্য যায়গাতেও কিছু তাহার ঋণ হইয়া পড়িয়াছে। এ সমস্ত ছাড়া দেশের কথা, বাড়ীর কথা, তাহার মায়ের কথাও আজকাল বেশী করিয়া তাহার মনে পড়িত।

সে দিন সায়াহ্নে নির্জ্জন গৃহমধ্যে বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল যে, প্রায় চারি পাঁচ মাসকাল সে শ্যামসুন্দরপুর ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও অনেকবার সে কলিকাতায় আসিয়াছে বটে, কিন্তু বাটী ছাড়িয়া এত দীর্ঘ দিন কখনও থাকে নাই। তাহাব বাটী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু রিক্ত হস্তে এ অবস্থায় সে বাটী যাইয়াই বা কি করিবে? তাহা হইলে আবার কিছু দিন পরেই বাধ্য হইয়া তাহাকে চলিয়া আসিতে হইবে। একসঙ্গে কিছু টাকা সে যদি এখন কোন রকমে পায়, তাহা হইলে সে বাড়ী চলিয়া যাইতে পারে এবং সেই টাকায় কিছু জমী-জমা খাজনা করিয়া লইয়া দেশে চাষ-বাস করিবার ব্যবস্থা সে করিতে পারে। সুতরাং যেমন করিয়া হউক, কিছু টাকা তাহাকে যোগাড করিতেই হইবে। কিন্তু কি করিয়াই বা যোগাড় হয়? কাল অতুল বাবু একবার তাঁহার ঐ সুটকেসটি খুলিযাছিলেন, সে তাহার মধ্যে একগোছা নোট দেখিয়াছিল। অনুমানে বোধ হয়, চল্লিশ পঞ্চাশ খানির কম হইবে না। এই টাকাটা সে যদি পায়, তাহা হইলেই সে দেশে গিয়া কুড়ি ত্রিশ বিঘা জমী লইয়া চাষ আবাদের কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু—কিন্তু—যে তাহাকে পথ হইতে ডাকিয়া আনিয়া—আদরে আশ্রয় দিয়াছে, সরলান্তঃকরণে যে তাহার উপর সমস্ত বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, এই কয় দিনের পরিচয়েই যে তাহাকে প্রীতির বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহার টাকা এই ভাবে লইলে, তাহার হাত কি সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলিয়া যাইবে না? হাতের সঙ্গে সমস্ত দেহটা কি তাহার পুড়িয়া ছাই হইবে না? সে পারে,—ফাঁকি, প্রবঞ্চনা, চুরি-ডাকাতি করিয়া সে লইতে পারে, কিন্তু অতুল বাবুর মত বন্ধুর পারে না—বলাই বাবুর মত স্কুল-মাষ্টারের সে পারে না,—সে পার ঐ যে মূল্যবান মোটরে করিয়া হগ-মার্কেটে কিংবা সাহেবদের দোকানে যিনি টাকা ছড়াইতে যাইতেছেন, ঐ যে মোড়ের উপরকার প্রকাণ্ড সোনারূপার দোকানের মালিক—যিনি সোনারূপার শয্যার উপর শায়িত থাকিয়া জীবনকে সোনালী-সজ্জায় সাজাইয়া রাখিয়াছেন, কিম্বা সম্মুখের ঐ যে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার অধিকারী, যিনি তাঁহার প্রজাদের বক্ষের ব্যথা ও চক্ষুর জলের উপব তাঁহার বিলাসের এই স্বর্ণমন্দির খাড়া করিয়াছেন —উঁহাদের অর্থ সে লইতে পারে। স্বর্ণের হিমালয় হইতে খণ্ড-পরিমাণ স্বর্ণ লইতে তাহার আপত্তি নাই।

সে আগে যেখানে থাকিত, সেই পাড়ায় গঙ্গার ধারে কে এক মস্ত বড়লোক ভাড়া দিবার জন্য ঠিক এই রকম প্রকাণ্ড একখানি বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছে। স্নান করিতে যাইবার সময় প্রত্যহই তাহা তাহার নজরে পড়িত। বাড়ীটির সমস্ত কার্য্যই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ইচ্ছা ও তদনুরূপ চেষ্টা থাকিলে সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীটি ভাড়া দেওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু নেপাল শুনিয়াছিল যে, কলিকাতার গরম সহ্য কবিতে না পারিয়া বাটীর অধিকারী হঠাৎ সপরিবারে দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছেন এবং দু'মাস পরে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীখানির ভাড়াব ব্যবস্থা করিবেন। দু'দিন কলিকতার গরম সহ্য করিয়া থাকিয়া বাড়ীটি যদি তিনি ভাড়া দিয়া যাইতেন, তাহা হইলে দুই মাসে হয় ত চারি পাঁচ শত টাকা তিনি পাইতে পারিতেন, কিন্তু টাকার স্তূপের উপর যাঁহার সুখাসন স্থাপিত, সামান্য চারি পাঁচ শত টাকা তাঁহার আসিলেই বা কি, আর যাইলেই বা কি? তিনি নিরন্ন দরিদ্রের মত গরম সহ্য করিতে যাইবেন কেন? হায় রে, এক জন যে টাকা মুঠা মুঠা লইয়া হেলায় দুই হাতে ছিনিমিনি খেলিতেছে, হয় ত সেই টাকায় বিশ জন হতভাগ্য চির-অভুক্ত আমরণকাল পর্য্যন্ত পেট পুরিয়া খাইতে পাইয়া অকালমৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘরের ভিতর গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি উঠিয়া নেপাল আলো পর্য্যন্ত জ্বালিতে পারে নাই। সেই অন্ধকারের মধ্যেই বহুক্ষণ ধরিয়া সে বিছানার উপর কাত হইয়া পড়িয়া ঘরের অন্ধকারের সহিত তাহার মনের অন্ধকার

মিশাইয়া একাকার করিয়া দিল। এই ভাবে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা থাকিয়া হঠাৎ সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আলো জ্বালিল এবং এক খণ্ড পিজবোর্ডের উপর বড বড় করিয়া 'টু লেট' লিখিয়া নীচে তাহার নাম ও মেসের এই ঠিকানা লিখিল। তাহার পর তাহার তোরঙ্গের মধ্য হইতে একতাড়া চাবি বাহির করিয়া পকেটের মধ্যে লইল এবং আলো কমাইয়া দিয়া, দরজায় চাবি লাগাইয়া সে কালীঘাটের গঙ্গাতীরেব পথ ধরিয়া ভবানীপুরের সেই বাড়ীখানির উদ্দেশে চলিয়া গেল।

অতুল বাবুর এই ঘরের দুইটি চাবি করিতে হইয়াছিল, একটি অতুল বাবু নিজের কাছে রাখিতেন, একটি নেপালের কাছে থাকিত।

ইহার দিন পাঁচ সাত পরে এক দিন সকালে একটি অপরিচিত ভদ্রলোক মেসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি যেন খুঁজিতেছিলেন। নেপাল ব্যস্ততার সহিত ঘরের বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকে খোঁজেন আপনি?" আগন্তুক ভদ্রলোকটি কহিলেন—"এন, সি, দাস; ১৭১ নং এইটেই ত?"

"হ্যাঁ, আমারই নাম। আপনি কি ভবানীপুর গঙ্গার ধারের বাড়ীটার জন্যে এসেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এই একুশে তারিখে আমাদের একটা বিয়ে আছে—।"

নেপাল তাঁহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া বসাইয়া তাঁহার বাকী কথা শুনিল এবং খানিকক্ষণ তাঁহার সহিত কথা কহিবার পর কহিল—"একে ত বিয়ের ব্যাপার, তার ওপর পনের দিনের জন্যে ওবাড়ী দেবার আমাদের ইচ্ছেই নেই, তবে এত ক'রে যখন বলছেন, তখন আর কি করা যাবে। কিন্তু দু'শ টাকার একটি পয়সা কম আমি নেব না, আর আগেই টাকাটা দিতে হবে।"

ভদ্রলোক তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

নেপাল কহিল—"বাড়ীটার ভেতরটা একবার দেখবেন ত তা হ'লে?"

ভদ্রলোকটি কহিলেন—"না দেখলেও চলতে পারে, বাইরে দেখেই অনেকটা বোঝা যায়। ঘর সবশুদ্ধ ক'খানা আছে?"

"একুশখানা। তা ছাড়া, তিন তলায় তিনটে পাকের ঘর, চারটে পাইখানা, বারান্দা, উঠান, জল, কল, আর গঙ্গা ত ধরতে গেলে একেবারে বাড়ীর উঠানের মধ্যেই। তবে আলোর কনেকসন্‌টা এখনও হয় নি।"

ভদ্রলোকটি খুব ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া পড়িয়া কহিলেন—"তা হ'লে আর দেখবার কোনই দরকার নেই। আমাদের খান্ বার চোদ্দ ঘর হলেই যথেষ্ট। তা হলে সন্ধ্যার সময় এসে আমি টাকাটা দিয়ে যাব, কেন না, কালই আমাদের সব চ'লে আসতে হবে।"

নেপাল কহিল-—"তাই দিয়ে যাবেন। ভগবানের ইচ্ছেয় শুভকর্ম্ম আপনাদের শুভয়-শুভয় হয়ে যাক। নেমন্তন্নটা কিন্তু যেন ফাঁক দেবেন না।" ভদ্রলোকটি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় পুনরায় নেপালের ঘরে আসিয়া ভদ্রলোকটি দেখা দিলেন এবং নেপালকে দুই শত টাকার নোট গণিয়া তাহার নিকট হইতে রসীদ ও বাড়ীর চাবি লইলেন।

রাত্রিতে অতুল বাবু মেসে ফিরিয়া আসিলে নেপাল কহিল—"কালই সকালের ট্রেণে আমাকে একবার দেশে চ'লে যেতে হবে। মায়ের বড় অসুখ, আজ চিঠি পেলুম।"

চিন্তাপূর্ণ-মুখে অতুল বাবু নেপালের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাতার অসুখের নাম করিয়া নেপাল পরদিন তাহাব বাক্স বিছানা প্রভৃতি লইয়া বৌবাজারের একটি মেসে আসিয়া আশ্রয় লইল। অতঃপর সে একটা চাকুরীর জন্য উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই স্নানাহার শেষ করিয়া লইয়া সে কাজের সন্ধানে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া মেসে ফিরিয়া আসে। দিনের পর দিন এই রকম বিফলে ঘুরিয়া নেপাল যখন হতাশ হইয়া পড়িল, তখন একদিন খবর পাইল যে, শিয়ালদহ মডেল হাই স্কুলে পঞ্চাশ টাকা বেতনে, নিম্ন শ্রেণীতে পড়াইবার জন্য দুইজন শিক্ষকের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের সহিত তাহার নিজের কোনই প্রয়োজন ছিল না, যেহেতু, নিম্ন শ্রেণীতে পড়াইবার জন্য হইলেও শিক্ষক দুইজন গ্রাজুয়েট হওয়া চাই। নেপালের মন হঠাৎ একটা অসহ্য বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল। সে ভাবিল, ছোট ছেলেদের পড়াইবার জন্য বি-এ পাশের কি দরকার? সে তিনবার এন্‌ট্রান্স ফেল করিয়া ইউনিভার্সিটির ছাপ

তাহার অঙ্গে লইবার সুযোগ পায় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সে কি ন'-দশ বছরের ছেলেদেরও পড়াইবার পক্ষে অনুপযুক্ত? এই ব্যাপার লইয়া ভাবিতে গিয়া, ঐ স্কুলের হেড-মাষ্টারের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া যাহারা আই-এ—বি-এ পাশ করিয়াছে, তাহাদের উপর, এবং ইউনিভার্সিটী যাহারা স্থাপন করিয়া পাশ ও অ-পাশের মধ্যে এতটা তফাৎ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের সকলেরই উপর তাহার রুদ্ধ ক্রোধ ছড়াইয়া পড়িল।

কিন্তু পরদিন কি ভাবিয়া সে দশটার মধ্যেই স্নানাহার শেষ করিল এবং উক্ত মডেল স্কুলে যাইয়া তথাকার হেড-মাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া নেপালের সহিত হেডমাষ্টার মহাশয়ের কথা-বার্ত্তা হইবার পর নেপাল প্রসন্নমুখে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন হেড মাষ্টার মহাশয় তাহাকে কহিলেন—"তা হ'লে কালই একখানা দরখাস্ত আর ইউনিভার্সিটীর সার্টিফিকেট-খানা নিয়ে আসবেন, কাল থেকেই কাজে লেগে যান। সার্টিফিকেটখানা আমি দু'চারদিন পরে আবার ফিরিয়ে দেব এখন;—কোন্ সালে আপনারা বি-এ দিয়েছিলেন?"

"নাইন্‌টী-নাইন্-এ।"

"আচ্ছা, নমস্কার, আপনার নামটা ভুলে গেলুম।"

"বলাইচরণ মিত্র।"

বলাই মাষ্টারের সেই সার্টিফিকেটখানি নেপালের কাছেই ছিল। গত কল্য অনেক চিন্তার পর সে ইহার এইরূপ সদ্ব্যবহার করাই স্থির করিয়াছিল। যাহা হউক, হেড-মাষ্টার মহাশয়ের কথানুযায়ী সার্টিফিকেটখানি ও তৎসহ একখানি দরখাস্ত দাখিল করিয়া পরদিন হইতে নেপাল পঞ্চাশ টাকা বেতনে মডেল স্কুলের কার্য্যে যোগদান করিল। অবশ্য সার্টিফিকেটখানি দুই চারি দিন পরে আবার সে ফিরিয়া পাইল। চাকুরী পাইয়া নেপাল মনে মনে ভাবিল যে, সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া এই কার্য্য যে তাহার চলিবে না, সে বিষয়ে সে নিশ্চিত, কিন্তু একটা বৎসর—অন্ততঃ ছয়টা মাসও নির্ব্বিবাদে কোনও রকমে যদি এখানে কাটাইতে পারে, তাহা হইলেই সে যথেষ্ট বলিয়া মনে করে। যাহা হউক, একখানা ইংরাজি-বাঙ্গালা ডিক্সনারী কিনিয়া এবং ক্লাসের বইগুলির অর্থ-পুস্তক সংগ্রহ করিয়া সে সকাল-সন্ধ্যায় সেগুলি বাসায় একটু আধটু দেখিতে লাগিল এবং নিয়মিতরূপে স্কুলে হাজিরা দিতে লাগিল।

দিন দশ বারো পরে এক দিন স্কুল বসিয়া গেলে পর হেড মাষ্টার নেপালের ক্লাসে আসিয়া কহিলেন,—"আজ আর আপনাকে হলের এই দু'টো ক্লাস কম্‌বাইণ্ড ক'রে পড়াতে হবে না, নতুন মাষ্টার মশাইটি আজকেই এসে জয়েন করবেন। তবে আজ তাঁর আসতে একটু দেরী হবে, যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ তাঁর ক্লাসটার দিকে একটু নজর রাখবেন।"

নেপাল জিজ্ঞাসা করিল,—"কোত্থেকে ইনি আসছেন?"

"অনেক যায়গাতেই ইনি মাষ্টারী করেছেন, বাড়ী বারাকপুর। ইনিও নাইন্টি-নাইনেই বি, এ দিয়েছেন। সার্টিফিকেটখানা রুইয়ে না ইঁদুরে বুঝি নষ্ট ক'রে ফেলেচে, ইউনিভার্সিটী থেকে একটা কাপি আনতে ব'লে দিয়েছি। আর একটা মজার কথা আছে। আপনার যা নাম, এ ভদ্রলোকেরও তাই। তিনি এলে পরে তাঁর সঙ্গে আপনি সাক্ষাৎ পাতিয়ে ফেলবেন।" বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে তিনি তাঁহার নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

তিনি তাঁহার ঘরে গিয়া বসিতে না বসিতেই নেপাল দরজা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—"কিন্তু আমার যে শরীরটা আজ বড্ডই খারাপ। সকাল থেকে পাঁচ ছ'বার দাস্ত হয়েছে। আপনাকে ব'লে ছুটী নিয়ে চ'লে যাব, এই মনে করেই এসেছিলুম।"

"তাই না কি? তা হ'লে আপনি চ'লে যান। এমন অসুখ যখন, তখন না এসে একটা খবর পাঠিয়ে দিলেই ত পারতেন, বলাই-বাবু।" হেড মাষ্টার মহাশয় চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই বলাই বাবুর মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, চোখের চাহনি দীপ্তিহীন, মুখের কথাগুলিতেও যেন জোর নাই, ক্ষীণ কণ্ঠ কোন রকমে ঠেলিয়া যেন তাহা বাহির হইতেছে।

নেপাল ধীরে ধীরে স্কুল হইতে বাহির হইয়া বাসায় চলিয়া আসিল এবং সত্য সত্যই পীড়িতের মত শয্যায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন বেলা যখন প্রায় তিন প্রহর, তখন নেপাল এক পা এক পা করিয়া স্কুলের সম্মুখস্থ একটি গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে হলের ক্লাস দুইটি অল্প অল্প দেখা যায়।

বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া নেপাল দেখিল, বলাই মাষ্টার অসীম উৎসাহের সহিত তাহার নবীন ছাত্রদের শিক্ষাদান করিতেছে। সেই সময় স্কুলের একটি ছেলে বাহিরে আসিয়া লজেঞ্চুস কিনিতেছিল, নেপাল তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। সে কাছে আসিলে, তাহার হাতে কি একটা রুমালে বাঁধা জিনিষ দিয়া নেপাল কহিল,—"ঐ নতুন মাষ্টার মশায়ের হাতে এইটে দিয়ে আয়। খবরদার আর কারও হাতে দিবি না, তা' হলে মেরে তোকে আধমরা করব।" ছেলেটি ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল। নেপাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল যে, ছেলেটি তাহার নির্দ্দেশমতই পুঁটুলীটি বলাই মাষ্টারের হাতে দিল। তখন আর এক তিল তথায় না দাঁড়াইয়া, দ্রুতগতি তাহার মেসের অভিমুখে চলিয়া গেল।

নূতন মাষ্টার মহাশয় রুমালখানি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে দশ টাকার কুড়িখানি নোট, তাঁহার বি-এ পাশের ইউনিভার্সিটী সার্টিফিকেট, আর একখানি ক্ষুদ্র পত্র রহিয়াছে। পত্রখানির সামান্য দুই ছত্রে লেখা ছিল—'পঞ্চাশটি টাকা বাকী রহিল, ভবিষ্যতে সুযোগমত দিয়া দিব।'

মাষ্টার মহাশয় ছেলেটিকে কি সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উত্তরে সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা ফুটপাথের ওদিককার সেই বৃক্ষতল দেখাইয়া চলিয়া গেল। মাষ্টার মহাশয় খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু বৃক্ষতলে কাহাকেও আর দেখিতে পাইলেন না। সে দিন মাষ্টার মহাশয় ছাত্রদের ভাল করিয়া পড়াইতে পারিলেন না, বরাবরই অনন্যমন হইয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নেপাল ততক্ষণে দ্রুতপদে চলিয়া আসিয়া বড় রাস্তায় পড়িয়াছিল এবং এক মনে সেই অসংখ্য গাড়ী-ঘোড়া চলাচলের মধ্য দিয়া তাহার মেসের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। অল্পসময়ের ভিতর এত বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়িলেও, আজ যেন তাহার ভারগ্রস্ত অন্তর অনেক পরিমাণে হাল্কা হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল—বলাই মাষ্টার ইহারই মধ্যে তা হলে রাওলপিণ্ডি ঘুরিয়া আসিয়াছে। আহা, বেচারার ট্রেণভাড়া, রেলের কষ্ট, মনঃপীড়া—যাক্, তবু দু'শ টাকা ফিরিয়া পাইয়া সে কতকটা অব্যাহতি পাইতে পারিবে। আহা! লক্ষ্মীর হাঁড়ির টাকাটি লইয়া বেচারা সে দিন ট্রেণভাড়া করিয়া আসিয়াছিল। অনটনের সংসারে কোন রকমে ইহা বাঁচাইয়া ওঁর স্ত্রী হয় ত মা লক্ষ্মীর কাছে কত না মনস্কামনা জানাইয়া, কত না আশা করিয়া, টাকাটিতে সিঁদূর মাখাইয়া হাঁড়িতে রাখিয়াছিল। চিঠিতে লিখিয়া দিলে হইত যে, লক্ষ্মীর হাঁড়ির টাকাটি আজই যেন আবার যথাস্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়।—যাহা হউক, বলাই মাষ্টারের বাকী পঞ্চাশটি টাকা ভবিষ্যতে এক সময় দিয়া দিতেই হইবে। কিন্তু এখন সে কি করিবে? কলিকাতা আর তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছে না। পয়সা উপায়ের আর দরকার নাই, সে দেশে ফিরিয়াই যাইবে। শ্যামসুন্দরপুরের মাটী, শ্যামসুন্দর-পুরের বৃক্ষ-লতা, ঝোপ-ঝাড়, তাহার প্রান্তর, কানন, বাঁশঝাড়, নদীতীর, পথ-ঘাট সব যেন একসঙ্গে হাতছানি দিয়া তাহাকে অনবরত ডাকিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে সব ডাক ছাপাইয়া সে যেন তাহার মায়ের কাতর আহ্বান শুনিতে পাইতেছে। মা যেন সকাতরে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অনাহার-শীর্ণ হাত দুইখানি বাড়াইয়া ক্ষীণকণ্ঠে তাহাকে কেবলই ডাকিতেছে—'বাবা রে, তুই আমার ফিরে আয়—তুই ফিরে আয়!'

চিন্তা করিতে করিতে নেপাল যে তাহার মেসের পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল, সে বিষয়ে তাহার হুঁসই ছিল না। কিছুদূর যাইয়াই তাহার হুঁস হইল এবং তাড়াতাড়ি পিছু ফিরিয়া রাস্তা পার হইতে যাইলেই, পশ্চাৎ হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে একখানি মোটর আসিয়া তাহার পার্শ্বদেশে ধাক্কা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে অচৈতন্য হইয়া পথের উপর লুটাইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নেপালের জ্ঞান-সঞ্চার হইল। আঘাত তাহার তেমন গুরুতর হয় নাই, ভয়ানক একটা আতঙ্কে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল মাত্র। শুধু বাম উরুতে ও মাথার একাংশে সামান্য কিছু আঘাত লাগিয়াছিল। যাঁহার মোটরের ধাক্কা লাগিয়াছিল, তাঁহার নাম ভবতোষ ঘোষ। ভবতোষ বাবু তৎক্ষণাৎ নেপালকে আপন গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে লইয়া

গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলে তিনি নেপালকে লইয়া বরাবর নিজ বাটীতে আসিয়াছিলেন এবং পাড়ার একজন ভাল ডাক্তারকে মোতায়েন রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া, কন্যা অর্চ্চনাকে নেপালের শুশ্রূষার ভারার্পণ করিয়াছিলেন।

নেপাল ঈষৎ নড়িয়া উঠিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল, তাহার মাথার ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া একটি উনিশ কুড়ি বৎসরের মেয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। নেপাল কিছু বলিতে যাইবার উপক্রম করিতেই মেয়েটি তাহাকে বাধা দিয়া অত্যন্ত ধীর স্বরে কহিল—"আপনি এখন বেশী কথা কইবেন না, শরীরটা কি খুব দুর্ব্বল ব'লে বোধ হচ্ছে?"

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে নেপাল কহিল—"দুর্ব্বল? না, তেমন কিছু বোধ হচ্ছে না। আমি কি মোটর চাপা পড়েছি?"

"চাপা পড়েন নি, সামান্য একটু আঘাত লেগেছে।"

"হাসপাতালে রয়েছি?"

"না,—আমাদের বাড়ীতে।"

"আপনি কে?"

মুহূর্ত্তখানেক নীরব থাকিবার পর মেয়েটি কহিল—"আমি অর্চ্চনা, যাঁর বাড়ী, তাঁর মেয়ে। আপনি বেশী কথা কইবার চেষ্টা করবেন না। একটু গরম দুধ খাবেন কি?

"দুধ? না,—একটু চা যদি—"

এই সময় ডাক্তার বাবুটি বাহির হইতে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন এবং অর্চ্চনার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"সেন্স হয়েছে, আর কোন ভয় নেই। চা খেতে চাচ্ছেন, চা-ই দিন; তাতেই বেশী ক'রে দুধ মিশিয়ে দেবেন। আর ওষুধ যেমন খাইয়ে যাচ্ছেন, দু'ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন।"

তাঁহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"তা হ'লে কি আপনি এখনি চ'লে যাচ্ছেন, ডাক্তার বাবু?"

"হ্যাঁ, আর আমার আসবার কোনই দরকার নেই,"—বলিয়া তিনি নেপালের কাছে সরিয়া আসিলেন এবং বুকের উপর হইতে তাহার হাতখানি তুলিয়া লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কহিলেন,—"আল্ রাইট!"

ডাক্তার বাবুর চলিয়া যাইবার পর অর্চ্চনা উঠিয়া বাহিরে গেল এবং কাহাকে ডাকিয়া চায়ের জন্য বলিয়া দিয়া আবার তাহার চেয়ারখানিতে আসিয়া বসিল।

পরদিনই নেপাল নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়া বোধ করিল এবং সেই দিনই সে ভবতোষ বাবুর বাটী হইতে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু ভবতোষ বাবু কিছুতেই তাহাকে যাইতে দিলেন না। নেপাল তাঁহাকে কহিল—"আপনার ঋণ জন্মে কখনও শোধ দিতে পারব না। আপনার স্নেহ যত্ন ভালবাসার আর অন্ত নেই।" ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"তবে বাবা, এ অবস্থায় কেন তুমি চ'লে যাবার কথা ব'লে আমায় কষ্ট দিচ্ছ! আমারই মোটরের ধাক্কায় তুমি আঘাত পেলে, এতে যে আমার মনে কি কষ্ট, তা আর তোমায় কি বলবো? এদিকে তোমার কথাও সব শুনলুম। দেশে একবার যাবার জন্যে তোমার মন যে খুবই চঞ্চল হয়েছে, তা-ও বুঝতে পারছি, কিন্তু দিন দশ পনর তুমি এখানে থেকে একটু সুস্থ হয়ে যাও, নইলে আমার মন কিছুতেই স্থির থাকবে না।" অগত্যা নেপালকে ভবতোষ বাবুর বাটীতে আরও দিনকতকের জন্য থাকিতে হইল।

দিন পনর যোল পরে এক দিন সকালে নেপাল শয্যাত্যাগ করিয়াই ভবতোষ বাবুর কাছে আসিয়া কহিল,—"আজকেই খাওয়া-দাওয়ার পর আমি বাড়ী যাব।" ভবতোষ বাবু এ দিনে আর তাহাকে বাধা দিতে পারিলেন না, শুধু কহিলেন,—"কি জানি কেন, তোমার প্রতি এই ক'দিনের ভেতরই আমার বড্ড স্নেহ পড়েছে, বাবা। কিছু দিন বাড়ীতে থেকে তুমি আবার আমার এখানে চ'লে এস, তোমার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।" তাহার পর তিনি অর্চ্চনাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিয়া দিলেন,—"আমি দিতে গেলে বোধ হয়, কিছুতেই নিতে রাজী হবে না, তুমি কোনরকমে শ'খানেক টাকা নেপালকে দিয়ে দেবে। এই ক'দিনে ওর কাছে যতটা শুনেছি, তাতে বুঝেছি যে, এক কপর্দ্দকেরও ওর সঙ্গতি নেই। বুড়ো মাকে দেশে রেখে একটা কাজকর্ম্মের সন্ধানেই ছেলেটি এখানে এসেছিল—"

তাঁহার সব কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়াই অর্চ্চনা কহিল,—"আচ্ছা বাবা, আমাদের জমিদারীতে ওঁকে কোন একটা কাজকর্ম্ম দিতে পারা যায় না?"

ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"আমার কটকের জমিদারী, সে আর কতটুকু মা, ক'টা লোকেরই বা সেখানে দরকার হয়? যে পাঁচ সাত জন আছে, সেখানকার পক্ষে তাই যথেষ্ট। কারুকে ছাড়িয়ে দিয়েও রাখতে পারব না।—আর তা ছাড়া সেখানে গিয়ে নেপাল থাকতেও বোধ হয় পারবে না।"

অর্চ্চনা পিতার পার্শ্বে খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল,—এখানে অবিনাশ বাবু ত আর কাজ করতে পারবেন না বলছেন, তাঁর যায়গায় না হয় নেপাল বাবুকে—"

"আমিও সেই কথাই ভেবেছি মা, তাই নেপালকে কিছুদিন দেশে থেকে আবার এখানে একবার আসবার জন্যে ব'লে দিলুম। ভেবেছিলুম, অবিনাশের যায়গায় আর লোক রাখবো না, কিন্তু দেখছি—তা চলবে না, কেন না, শরীর দিন দিন আমার যে রকম অপটু হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাতে নিজে সব দিক দেখতে শুনতে আর হয় ত পেরে উঠব না। নেপালের সঙ্গে এই ক'দিন কথা-বার্ত্তা ক'য়ে নানা দিক লক্ষ্য ক'রে দেখলুম, ছেলেটি সব দিকেই ভাল। লেখা-পড়া যা জানে, আমার এখানকার সম্পত্তিগুলো দেখা-শোনা করবার পক্ষে যথেষ্ট। তা ছাড়া, বিনয়ী, নম্র, ভদ্র; আর স্বভাবচরিত্র খুব ভাল বলেই ত আমার বিবেচনা হয়। ক'বে টপ করে হয়ত শমনের ডাক এসে পৌঁছুবে মা, এখানকার জন্যে এক জন ভাল লোক রেখে যেতে পারলে মনটা তবু একটু নিশ্চিন্ত থাকে। বিষয়কর্ম্ম তুই ভাল বুঝিস, তা জানি, কিন্তু তা' হলেও তুই স্ত্রীলোক, তায় ছেলেমানুষ। একজন ভাল অভিভাবকের হাতে—। তোর ভাবনাই ত আমার ভাবনা, মা! শুকনো ডালে ফুল ফুটিয়ে সে চ'লে গেল, আর আমাকে—" বলিয়া ভবতোষ বাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন এবং পরক্ষণেই জানালার বাহিরে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়াই আপন মনে কহিলেন,—"আমিও তার সে ফুল দেবতার চরণে দিয়েই রেখেছি, দেবতার চরণে রেখেই চ'লে যাব। যা করবার জগন্নাথই করবেন, মানুষের ভরসা আমি বড় করি না।"

অর্চ্চনা নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া পিতার পার্শ্বেই বসিয়া রহিল।

সেই দিনই নেপাল দেশে আসিবার জন্য হাওড়ার ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণে চাপিল। আসিবার সময় তাহার বার বার নিষেধ সত্ত্বেও জোর করিয়া অর্চ্চনা তাহার পকেটের মধ্যে একতাড়া নোট গুঁজিয়া দিয়াছিল।

এই কয়দিন তাহার বড় তৃপ্তিতেই কাটিয়াছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত এই ক্ষুদ্র পরিবারের কয়দিনকার আদর, যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা তাহার পক্ষে অসীম তৃপ্তি ও সুখের হইয়াছিল। জীবনে এমন করিয়া কেহ তাহাকে ইতিপূর্ব্বে কখন আদর-যত্ন করে নাই। ভবতোষ বাবুও মানুষ, গয়ারামও মানুষ, কিন্তু মানুষে মানুষে কি প্রভেদ! অর্চ্চনাও নারী, আর সুখদাও নারী। এক জন যেন স্বর্গীয় গন্ধামোদিত নন্দনের শুদ্ধ পারিজাত, আর এক জন যেন প্রেতভূমের নগ্ন প্রেতিনী, তাহার নিঃশ্বাসে যেন নরকের পূতিগন্ধপূর্ণ বিষবায়ু বহিতেছে।

অর্চ্চনা যেন নন্দনচ্যুত শুদ্ধ-শুভ্র প্রফুল্ল স্বর্গীয় প্রসূন। যেমন কমনীয় আকৃতি, তেমনি মধুর প্রকৃতি। স্বভাবের এমন মাধুর্য্য, এমন অকপটতা, এমন সরল ভাব ইতিপূর্ব্বে আর কোন নারীতে সে দেখে নাই। কত নিঃসঙ্কোচেই এই মেয়েটি তাহার সহিত কথা কহিত। অথচ সে কথার মধ্যে কত স্নেহ, কত আত্মীয়তা, কত বিনয়, কত সরলতা। কোথাও এতটুকু নির্লজ্জভাব, সামান্য একবিন্দু বেয়াদবী, একতিল অশিষ্টতা তাহার কথার মধ্যে পাওয়া যাইত না,—এমনই শিক্ষিত, ভদ্র, পবিত্র তাহার অন্তর। সে দেখিয়াছিল, অর্চ্চনার সীঁথির সিন্দুর-বিন্দু তাহার আয়তি-লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু ইহাও সে কয়দিনের কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিয়াছিল যে, সে বরাবরই তাহার পিতার কাছেই থাকে। এইখানটায় নেপাল বেশী দূর কিছু বুঝিতে পারে নাই। বুঝিবারও তাহার কোন আবশ্যক ছিল না। তাহার পক্ষে তাহা অনধিকার, সুতরাং সে দিকে বুঝিবার পক্ষে কোন চেষ্টাও সে করে নাই। এত বড় ধনী জমিদার হইয়া, ভবতোষ বাবু যে তাহার মত দরিদ্র পথচারীকে গাড়ীচাপা দিয়া নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত মনে মোটর হাঁকাইয়া সহজ ঔদাসীন্যের সহিত চলিয়া যান নাই, তিনি যে সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে পথ হইতে তুলিয়া লইয়া গভীর উৎকণ্ঠায় ও অসীম যত্নে আপনার বাড়ীতে আনিয়া এমন করিয়া পরমাত্মীয়ের মত তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়াছেন, এক কাঁড়ি টাকা পকেটে জোর করিয়া দিবার কথা বাদ দিলেও, শুধু এইটুকুই যথেষ্ট, এবং

কেবলই যথেষ্ট নয়, তাহা যেমন অসাধারণ, তেমনই মহৎ।

যাহা হউক, সেই দিনই রাত্রিতে নেপাল শ্যামসুন্দরপুর আসিয়া পৌঁছিল। নাপিত-বৌ মনে মনে নিয়তই নেপালের ঘরে ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল, কারণ, তাহার অসুখ, এবং এই অসুখই যে তাহার শেষ অসুখ, এই ধারণাই যেন দিনের পর দিন তাহার অসুস্থ অন্তরে চাপিয়া চাপিয়া বসিতেছিল। এ বৎসর আশ্বিন মাসে, নেপাল এখানে থাকিতে থাকিতেই ম্যালেরিয়া তাহাকে বড় বেশী করিয়াই ধরিয়াছিল, কিন্তু নাপিত-বৌ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তাহারই উপর সমানে স্নানাহার করিয়া আসিয়াছে। পাড়ার লোক তাহাকে ঔষধ খাইবার জন্য বার বার বলিয়াছিল, সে তাহাদের কথাও গ্রাহ্য করে নাই, বলিয়াছিল,—"হ্যা, ওষুধ-পত্তর খেয়ে বাঁচবার যোগাড়টা ভাল করে করতে হবে বই কি!" সুতরাং, একে বিনা-চিকিৎসা, তাহার উপর অত্যাচার, ফলে ভিতরে ভিতরে রোগ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। এক্ষণে কোন সময় সাত আট দিন ধরিয়া জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া থাকে, মধ্যে দুই চারি দিন বা আবার একটু ভাল যায়। এমনই করিয়া পাঁচ ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে একটু আধটু তবু উঠিয়া-হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিত, আজকাল তাহাও আর পারে না। তাই মনে মনে ইদানীং নেপালের জন্য সে একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল! নেপাল আসিলে তাহাকে দেখিয়াই কহিল,—"এলি বাবা! এ সময় যে আসতেই হবে, তা আমি জানি। কেমন তুই আছিস, আগে তুই বল্ দেখি?"

নেপাল মায়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিল, তাহার নিজের সম্বন্ধে কুশল-প্রশ্নের উত্তর আর তাহার মুখে আসিল না। মাতার মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—"এ কি, তুমি কি হয়ে গেছ, মা!"

"হয়ে এখনো যাইনি, বাবা! তুই যে ছিলি না। এইবার এসেছিস,—আর আমার কোন ভাবনা নেই।"

পরদিন দিনের আলোকে নেপাল মাতাকে ভাল করিয়া দেখিল। মায়ের পূর্ব্বেকার সেই নধর, সুডৌল, গোল-গোল আকৃতি অবশ্য ইতিপূর্ব্বে যদিও অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই কয় মাসের মধ্যে সে চেহারা যে কখনও এমন অবস্থায় পরিণত হইতে পারে, নেপাল তাহা স্বপ্নেও কোন দিন ভাবে নাই।

নাপিতবৌ কহিল,—"বাবা, সকাল সকাল রান্না চাপিয়ে দি, ক'মাস কি আর বাইরে গিয়ে তুই কিছু খেতে পেয়েছিস, না খেয়েছিস্! এই অসুখ হয়ে প'ড়ে রয়েছি, কিন্তু ঐ ভাবনাই আমি শুয়ে শুয়ে খালি ভাবতুম যে, মাছ নইলে তার আমার ভাতই খাওয়া হয় না, আর শেষপাতে অন্ততঃ একটু সাদা জলও তার চাই; তা বাছা আমার হয় ত সেখানে না পায় একটু মাছ, না পায় একটু দুধ,"—বলিয়া নেপালের সুপুষ্ট ও বলিষ্ঠ দেহের দিকে তাকাইয়া কহিল,—"চেহারাতেও তাই আর কিছু নেই।" নেপাল নিজের দেহের প্রতি একবার চক্ষু বুলাইয়া লইয়া কহিল,—"আমি ত আরও মোটা হয়েছি মা, কি রকম রং ফুটেছে দেখ না।"

"ছাই ফুটেছে! সেখানে নোণা যায়গা, তাই রংটা একটু ফ্যাস্‌-ফেসে দেখাচ্ছে,"—বলিয়া একখানি গামছা হাতে করিয়া নাপিতবৌ খিড়কী দিয়া জেলে-বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

নেপালের মনে হইল যে, এই সকাল-বেলাতেই গ্রামখানি একবার ঘুরিয়া আসে, কিন্তু ভাল লাগিল না। দাওয়ার উপর একখানি মাদুর বিছাইয়া সে বসিয়া পড়িল। বসিয়া বসিয়া দেখিল যে, তাহার মায়ের শরীরের এই শোচনীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অল্পদিনের ভিতরেই বাড়ীর চতুর্দ্দিকেও একটা শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শয়নঘর দুইটির পৈঠা ধ্বসিয়া পড়িতেছে, তাহাতে আর মাটী ধরানো হয় নাই। নিকানোর অভাবে দাওয়া ও ঘরের মেজেগুলিতে ধূলা উড়িতেছে। তক্তপোষের তলায় ও ঘরের কোণে কোণে রাশীকৃত জঞ্জাল জমিয়া রহিয়াছে। চালের বাতায় ছাঁচের দিকের বাখারি-গুলি বাঁধন অভাবে সব খসিয়া পড়িতেছে। বিছানা-বালিসগুলি ময়লা হইয়া একটি চৌকীর উপর জড় হইয়া আছে, ছিঁচ্‌কে ইঁদুর ও আরসোলাতে ভাগাভাগি করিয়া তাহা ভোগ-দখল করিতে লাগিয়াছে।

উঠানের চারিদিকে নেপাল চাহিয়া দেখিল—ঐ একই দশা। খালি চলা-ফেরার পথটুকু ভিন্ন প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের সর্ব্বাংশই নানারকম জঞ্জালে পূর্ণ, মনে হয়, এই কয়মাসই তাহাতে আর ঝাঁট-জল

পড়ে নাই। রান্নাঘরের অধিকাংশ খুঁটীর গোড়া মাটি হইতে খসিয়া দাওয়ার উপর ঝুলিতেছে। গোয়ালের আগড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, একখানা ছেঁড়া মাদুর তাহার স্থলে ঝোলান রহিয়াছে। মোটের উপর বাড়ীর শ্রী দেখিয়া মনে হয় না যে, সে বাড়ীতে কোন মানুষ বাস করে।

নেপাল বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, যে, এইগুলি অল্পে অল্পে তাহাকে আবার ঠিক করিয়া পূর্ব্বাবস্থায় আনিতে হইবে। মায়ের দ্বারা এসব আর হইবে না। মায়ের এই অবস্থায় তাহার দ্বারা এ-সবের সে যেমন কিছু আর আশাও করিতে পারে না, তাহাকে একাকী ফেলিয়া রাখিয়া সে কোথাও আর চলিয়া যাইতেও পারে না। কিন্তু মায়ের যা অবস্থা, এখন মা বাঁচিলে হয়। কাল রাত্রিতে মা তাহাকে বলিয়াছিল,—"বাবা, তোকে ছেড়ে এ বাড়ীতে কি আমি এ ক' মাস ছিলুম! খালি আমার দেহটাই এখানে প'ড়ে ছিল রে, মন আমার তোর কাছে কাছেই প'ড়ে থাকতো?"

ভাবিতে ভাবিতে নেপাল উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাটীর বাহিরে আসিয়া নিতান্ত অন্যমনস্কের মত এক পা এক পা করিয়া চলিতে চলিতে হীরু ঠাকুরের বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জানালার ফাঁক দিয়া হীরু ঠাকুর তাহাকে দেখিতে পাইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া কহিল—"আরে নাতি, কখন্ এলি রে? খবর সব ভাল ত? আয়—আয় ভাই!"

নেপাল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে কহিল—"ভাল কি আর হয় ঠাকুর্দ্দা! যে অভিসম্পাত যাবার সময় তুমি করেছিলে, মনে আছে ত,—'চাকরীও হবে না, ব্যবসাও হবে না, উল্টে গাড়ী চাপা প'ড়ে ফিরে আসতে হবে।' তা, তাই ঠিক হয়েছে, ঠাকুর্দ্দা,"—বলিয়া নেপাল সংক্ষেপে তাহার বিফলতার বৃত্তান্ত জানাইল এবং সর্ব্বশেষে মোটর চাপা পড়ার কাহিনী সবিস্তারে বলিয়া, বিশেষতঃ অর্চ্চনাদের কথা উল্লেখ করিয়া, তাহার উরু ও মাথার ক্ষতের দাগ দেখাইল।

হীরু ঠাকুর তাহার প্রাতঃকালীন ধুমযাত্রা সবেমাত্র সমাধা করিয়াছিল, সুতরাং মেজাজে তাহার কোনও প্রকার অসন্তোষ বা রুক্ষভাব ছিল না। সমস্ত শুনিয়া আরক্ত লোচনদ্বয় কপালের মাঝা-মাঝি ঠেলিয়া তুলিয়া কহিল,—"বলিস কি! যা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল আমার, সত্যিই তাই ঘটে গেল! তাই হয়—তাই হয়। আমিও তা জানি। আচ্ছা ভাই, যে মুখ দিয়ে ঐ কথা বেরিয়ে সত্যি হয়ে গেছে, সেই মুখেই আজ এই সকালবেলা তোকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তুই মানুষ হ' ভাই, তুই লক্ষপতি হ', এ-দেশের তুই রাজা হ'। দেখিস্ ভাই, এ কথাও আমার ঠিকই ফলে যাবে।"

"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, কিন্তু ঠাকুর্দ্দা, রাজা হয়ে কাকে নিয়ে রাজত্ব চালাবো! তুমিই হলে গিয়ে রাজ্যের প্রধান প্রজা, সেই তুমিই যখন দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে——"

"আমি দেশ ছেড়ে চ'লে যাব!"—বলিয়া আরক্ত চক্ষু প্রসারিত করিয়া হীরু ঠাকুর কবিতার ছন্দে সুর করিয়া কহিল—

"যত দিন দেহে
প্রাণ রহে,
আঁকড়িয়া পদপ্রান্তে রহিব গো জননী——'

না খেয়েই মরি, আর ম্যালেরিয়ায় ভুগেই মরি, দেশ ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছি না ভায়া!"—বলিয়া দেশের উদ্দেশে তাহার যুক্ত-কর সসম্ভ্রমে মাথায় ঠেকাইল। নেপাল কহিল,—"তবে যে শুনলুম, ত্রিচিনাপল্লী না কোথাকার কোন্ ঠাকুর-বাড়ীর ম্যানেজারী——"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হীরু ঠাকুর কহিল,—"ভুষণো বলেছে বুঝি? আরে সে ভায়া, মধ্যে এক মজা হয়ে গিয়েছে।"

অতঃপর হীরু ঠাকুর যে কিছু দিনের জন্য কলিকাতায় থাকিয়া কোন কর্ম্ম করিতে সঙ্কল্প করিয়া তথাকার জি, আর, য়্যাচারোজী কোম্পানীতে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিল এবং পত্রোত্তরে তাহারা যাহা তাহাকে লিখিয়াছিল, তাহাও নেপালকে জানাইয়া কহিল,—"ম্যালেরিয়ায় ভুগে মরতে হয়, এইখানেই মরব। ভগবানের কাছে এই চাই যে, যেখানে জন্মেছি, যেখানকার আলো-বাতাসের ভেতর দিয়ে জীবনের এতগুলো বছর কেটে গেছে, শেষের বাকী ক'টা বছর সেখানেই যেন কেটে যায়। সত্যি বলছি নেপু, সেই আমার পরম সুখ—সেই আমার কামনা, তাতেই আমার পরম তৃপ্তি। ভাই রে, চিরকাল এই আমার সোনার দেশে থেকে, কোথায় বিদেশ বিভুঁয়ে গিয়ে মরব ভাই?"

"যথার্থ হীরুদা, দেশকে বড্ডই তুমি ভাল বাস।

আমিও খুবই ভালবাসি বটে, কিন্তু তবুও বোধ হয় তোমার মত নয়।"

"সত্যিই ভাই, আমি খুবই ভালবাসি। ম্যালেরিয়ায় যদি মরতে হয় ত এইখানেই ম'রবো। ঐ আমার পুবদিককার ঘরখানিতেই যেন আমার মরণের বিছানা পাতা হয়, ওর দক্ষিণের ঐ খোলা জানালা দিয়ে আমার চিরদিনের বন্ধু শ্যামসুন্দরপুরের এই আলো, আকাশ, গাছপালা, পথ-ঘাট, দূরের ঐ মাঠ-বিল, ঐ জলা, প্রান্তর, প্রান্তরের শেষে ভিন-গাঁগুলির ঐ অস্পষ্ট ছায়া, এই সব দেখতে দেখতেই যেন আমি চোখ বুজ্‌তে পারি। নেপু রে, এ সুখ আমি আর কোথাও গিয়ে পাব না। যার ইচ্ছে, ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাক, হীরু শর্ম্মা দেশের এ স্বর্গ ছেড়ে কোথাও আর যাচ্ছে না।

অনেক বেলা পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া নেপাল হীরু ঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিল। জি, আর, ম্যাচারোজীর অফিস কিংবা তাহার সহিত তাহার নিজের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ না করিয়া কলিকাতার অন্যান্য অনেক গল্প সে করিল, তাহার পর বেলার দিকে চাহিয়া যখন সে বাটী আসিল, তখন নাপিত-বৌয়ের রান্না-বাড়া শেষ হইয়া গিয়াছিল এবং দাওয়ার রৌদ্রে মাদুর পাতিয়া শুইয়া গায়ের উপর পর পর খান-দুই লেপ চাপা দিয়া ভীষণভাবে কাঁপিতেছিল। নেপাল কাছে আসিতেই নাপিতবৌ তাহাকে কহিল,—"বাবা রে, আজ বড্ড তোড়েই জ্বর এসেছে।"

নবম পরিচ্ছেদ

নাপিত-বৌয়ের জ্বর আরোগ্যের দিকে না গিয়া ক্রমেই বৃদ্ধির পথেই চলিল। জ্বর কোন সময়ের জন্যই মগ্ন হয় না। সকালের দিকে নামে মাত্র একটু কমিয়াই, যত বেলা বাড়িতে থাকে, জ্বরও ততই বাড়িতে থাকে, তাহার পর সন্ধ্যা হইতে সারা রাত্রি ভোগের আর অবধি থাকে না। তাহার শীর্ণ দেহে যে হাড় ক'খানি অবশিষ্ট ছিল, এবারকার এই কয়দিনের প্রবল জ্বরেই তাহা শয্যার সহিত একেবারে মিশিয়া গেল।

সুবিধার মধ্যে, এই দুঃসময়ে নেপালের হাতে অর্থের অনটন ছিল না। অর্চ্চনার দেওয়া সেই এক শত টাকা প্রায় সবই তাহার কাছে ছিল। সুতরাং মাতার অসুখে নেপাল চিকিৎসার কোনই ক্রটি হইতে দিল না। হীরু ঠাকুরের বাড়ী হইতে দু'বেলা দুটি খাইয়া আসিয়া সে দিবা রাত্রি মাতার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

একদিন নাপিতবৌ নেপালকে কহিল—"বড্ড অ-বিলির ভেতরই তোকে রেখে গেলুম, বাবা।"

তাহার কাতর মুখের দিকে চাহিয়া নেপাল বলিল,—"ও সব কথা তুমি কেন বলছ, মা! তোমায় আমি সারিয়ে তুলবোই। ডাক্তার আজ বলেছে, নাড়ীর অবস্থা কাল থেকে খুব ভাল হয়েছে!"

একটুখানি ম্লান হাসি নাপিত-বৌয়ের শুষ্ক মুখে দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বেদনার অতি ক্ষীণ একটি দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষের পঞ্জর ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইল।

নেপাল ডাকিল,—"মা!"

চক্ষু বুজিয়াই নাপিতবৌ সাড়া দিল—"কেন বাবা?"

"শরীরটা কি অন্য দিনের চেয়ে একটু ভাল বুঝছ না?"

"বুঝছি। কিন্তু বুঝেও যে কোন বিলি ক'রে যেতে পাল্লুম না, তাই বুকের ভেতরটা যে আমার ফেটে যাচ্ছে, নেপু! সংসারের কিছুই জানলি না, কিছুই বুঝলি না, বাবা রে আমার! আজ যদি সে—"

চোয়ালের হাড় বাহিয়া ফোঁটা দুই চারি জল চক্ষু হইতে তাহার গড়াইয়া পড়িল। উত্তপ্ত গণ্ডদ্বয়ে অশ্রুর সেই ধারা দুইটি শুকাইয়া যাইতেও বেশী দেরী হইল না। কারণ, প্রবল জ্বরের তাপে তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছিল। তেমনিই চক্ষু বুজিয়াই নাপিতবৌ আবার কহিল—"আর কিছু না হোক, বৌটাও যদি বেঁচে থাকতো! তবু দু'বেলা দু'টি ভাত সেদ্ধ ক'রেও সে দিতে পারতো। ঠাকুর এমনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন যে, সব দিকেই ওলট-পালট হয়ে গেল। এত দিনে সে সোমত্ত হ'য়ে উঠত, তার হাতে সব ফেলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চ'লে যেতে পারতুম।"

নেপাল মাতার হস্তখানি তুলিয়া লইয়া, মণিবন্ধ ধরিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। সে কেমন করিয়া নাড়ী দেখিতে হয়, কিছুই জানিত না, শুধু দেখিল যে, হাতখানি বড্ডই গরম। কপালেও

একবার হাত রাখিয়া দেখিল, ভিতর হইতে যেন আগুন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। একটা নিঃশ্বাস তাহার হাতে আসিয়া পড়িল, নেপালের মনে হইল, যেন তাহার হাতের সেই স্থানটা ঝলসাইয়া গেল। মাতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, নিমীলিত নেত্র-কোণে দুই ফোঁটা জল দুইটি মুক্তার ন্যায় জমিয়া রহিয়াছে। প্রবল জ্বরের উত্তাপে চোখের ভিতর হইতে উহা গলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। নেপাল মাতার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল—"মা!" নাপিতবৌ কোন সাড়া দিল না, শুধু একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল মাত্র। সে চক্ষু জবাফুলের মত রক্তবর্ণ; মনে হয়, সেই রক্তিমাভা ভেদ করিয়া নিঃশ্বাসের তপ্ত ঝাঁজের মত একটা ঝাঁজ সেখান হইতেও বাহির হইতেছে। চক্ষু চাহিয়া নাপিতবৌ বেশীক্ষণ থাকিতেও পারিল না, সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষুদ্বয় ধীরে ধীরে বুজাইয়া অচৈতন্যের মত পড়িয়া রহিল।

তখন অপরাহ্নকাল। বৈশাখের রৌদ্র-দগ্ধ দ্বিপ্রহরের তপ্তশ্বাস তখনও পর্য্যন্ত ধরণীময় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। কয় দিন হইতে এই সময়টায় কাল-বৈশাখীর একটুখানি ঝড়-জল অনেকখানি ঘটা-আড়ম্বর করিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নেপাল তাহারই আশঙ্কা করিয়া ঘরের জানালা দুইটি সময় থাকিতে বন্ধ করিয়া দিল এবং পুনরায় মাতার শিয়রের ধারে আসিয়া বসিল।

কুমোরদের ঝড়ুর পিসী রোজ সন্ধ্যার সময় আসিয়া সমস্ত রাত নাপিতবৌয়ের কাছে থাকে, নেপাল ঝড়-জল আসিবার পূর্ব্বে তাহার আসিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে আসিলে, তাহাকে রাখিয়া একবার সে ডাক্তারের কাছে যাইবে এবং ফিরিবার সময় অমনই হীরু ঠাকুরদার বাড়ী গিয়া সকাল সকাল আজ যাহা হয় দুটি খাইয়া একেবারে কাজ চুকাইয়া আসিবে। কিন্তু সে দিন সন্ধ্যায় ঝড়ও আসিল না, ঝড়ুর পিসীও আসিল না। সন্ধ্যার অনেক পরে ঝড়ু একবার জানাইতে আসিল যে, তাহার পিসী আজ আসিতে পারিবে না, ওপাড়ায় তেলিদের ছেলের ভাতে নাড়ু পাকাইতে যাইবে। নেপাল তাহাকে কহিল—"আজই আসতে পারবে না? মার জ্বর আজ যে বড্ড বেশী রে, ঝড়ু।" ঝড়ু আশ্বাস দিয়া কহিল—"আজ যে আমাবস্যে দাদামশাই, আজ একটুখানি ত বেশী হবেই। কিছু ভেব নাকো তুমি, কাল সকালেই জ্বর ইমিসন হোয়ে যাবে।"

রাত প্রায় এক প্রহরের পর হঠাৎ আকাশে ঘনঘটা করিয়া আসিল। অমাবস্যার ঘোরান্ধকার চিরিয়া ঘন ঘন বিদ্যুৎ-দীপ্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। একটা দমকা হাওয়ার ঝাপ্টা আসিয়া ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া গেল। নেপাল তাড়াতাড়ি দরজায় খিল লাগাইয়া পুনরায় প্রদীপ জ্বালিতেই নাপিতবৌ একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"কি সব করিস তোরা?" ব্যস্ত হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া নেপাল জিজ্ঞাসা করিল—"কেন মা?"

নাপিতবৌয়ের আর কোন স'ড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, শুধু একবার পাশ ফিরিয়া শুইল। নেপাল মাতাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না, কিন্তু নাপিতবৌ তাহার সাহসের অপেক্ষা রাখিল না, মুহূর্ত্তখানেক পরেই আবার এ-পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে সে কহিল—"তোরা সব কি বাপু, আমি তোদের নিয়ে কি করি বল ত গা সব!" তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া নেপাল কহিল—"কি বলছ এ সব, মা?"

"জ্বালাতন আর করিস নি তোরা। এমন ব্যাটাও গভ্যে ধরেছিলুম যে, হাড় খেলে, মাস খেলে, চামড়া নিয়ে ডুগ্-ডুগি বাজালে। ওরে তুই দূর হয়ে যা, তুই বেরো, তুই যমের বাড়ী যা। সে নেই ব'লে এত বাড় তুই বেড়েছিস—না?" বলিতে বলিতে ধড়মড় করিয়া নাপিতবৌ একেবারে সোজা হইয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। জোর করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া নেপাল ভাবিল—এ কি!—বিকার!—প্রকাশ্যে কহিল—"মা, এ সব কি বকছ তুমি? চুপ ক'রে শুয়ে থাক, বেশী কথা বোলো না।"

নাপিতবৌ গর্জ্জাইয়া উঠিল—"কিসের ভয় দেখাস তোরা? আমি এক বেলার তরে কোথাও যাব না। সোয়ামী শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে আমি যাব গিয়ে—কেন বল্ ত? ওগো মেজ বৌমা, এস বাছা, আল্তা পরিয়ে দি। ও নেপু, কুলুঙ্গী থেকে আমার আল্তার পেতেটা দে ত, বাবা! আর একটি কাজ করতে পারিস, আমার বর্দ্ধমানের বৌমাকে একবার আনতে পারিস, আমার সেই লক্ষ্মী পিরতিমেকে,—আমার বেজরাণীকে? সে আমার সাতটি দিনের মা-জননী হয়েছিল। সাতটি

দিন এসে সে আমার ঘর আলো করেছিল। ওগো, আমার সোণার সংসার!—আমার সোণার সোয়ামী, সোণার পুত্তুর, সোণার বৌ। আমার পাশ-করা ছেলে, ইংরাজী পাশ। হেট্—ম্যাড—গুড্ মণি! হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ।"

"মা মা!"

নেপাল যত তাহাকে ডাকিতে লাগিল, নাপিত-বৌ ততই বকিয়া যাইতে লাগিল—"ঐ ভেড়ের ভেড়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! দূর হ—দূর হ—মুখপোড়া, তোর মুখে মুড়ো জ্বেলে দি। স'রে যা না—দূর হ' না! হারামজাদা, পাজি, ছুঁচো কোথাকার!" তার পর গান ধরিল—"কানাই বলাই, ঐ দুটি ভাই, এসেছে রে!"

নেপাল মনে মনে প্রমাদ গণিল। এই রাত্রিতে, এই অবস্থায়, সে কি করে! রুগীকে একলা ফেলিয়া সে ডাক্তারের কাছে যায়ই বা কি করিয়া, পাড়ার কাহাকেও বা খবর দেয় কি করিয়া! বাহিরে তখন কাল-বৈশাখীর ক্ষণিকের ঝড় ও জল চিরকালের প্রথা ভুলিয়া স্থায়িভাবেই যেন প্রলয়-যুদ্ধে মাতামাতি করিতেছিল। আজিকার এ দুর্য্যোগের প্রকৃতি যেন অন্য রকম। এ যেন তাহার আজিকার এই দুর্দ্দিনের বিপদ বাড়াইবার জন্যই পরামর্শ করিয়া আসিয়াছিল, কেন না, রাত্রি যত গভীর হইতে লাগিল, দুর্য্যোগও ততই বাড়িতে লাগিল। নেপাল মাতার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল—"মা!"

প্রবল একটা বাতাসের গর্জ্জনে নেপালের ডাক চাপা পড়িয়া গেল। নাপিতবৌ তাহার প্রসারিত আরক্ত চক্ষুতে কট্‌মট্ করিয়া দরজার দিকে চাহিয়া কহিল—"খবরদার! ঐখেনে দাঁড়িয়ে থাক্ হারামজাদা, ঘরের ভেতর এসেছিস কি মরেছিস! মা লক্ষ্মী এখানে ছিল জানিস নি? মেজের ওপর তাঁর পায়ের দাগ দেখতে পাচ্ছিস নি?—আল্‌তা? হ্যাঁ, আল্‌ত' আবার পরব না? না—না—ভুলে গেছি, পরব না—পরব না, রাঁড় হয়েছি যে!—অ নেপু, ওঁকে একবার ডাক ত।" সঙ্গে সঙ্গেই বিষম চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওরে, ধর ধর—জাপটে ধর—ঐ এলো—ঐ এলো,"—বলিতে বলিতে আবার নাপিতবৌ চকিতে শয্যার উপর খাড়া হইয়া বসিল।

নেপাল তাহাকে তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিয়া আবার শয্যায় শোয়াইয়া দিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে ভীষণ শক্তিতে আবার উঠিয়া বসিল। তখন নেপাল যতবারই তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দেয়, ততবারই নাপিতবৌ ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠিয়া পড়ে। এই ভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া মাতা-পুত্রে শয়ান ও উত্থানের পালা চলিবার পর নেপাল ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাহার বলিষ্ঠ দেহে ঘর্ম্মের সঞ্চার হইল। অনাহার, অনিদ্রা, উৎকণ্ঠা, পরিশ্রম প্রভৃতিতে তাহার সবল দেহ দুর্ব্বল হইয়াই ছিল, এক্ষণে তাহা অবসন্ন হইয়া পড়িল। রাত্রি কত, আন্দাজ করিবার জন্য একটিবার জানালা খুলিয়া দেখিতে গিয়া, তাড়াতাড়ি তখনই বন্ধ করিয়া দিল। নৈশ প্রকৃতিতেও তখন যেন ঘোর বিকার চলিতেছিল। অমাবস্যার নিশা যেন সেদিন ক্ষেপিয়া গিয়া পৃথিবীকে রসাতলে দিবার প্রাণপণ আয়োজন করিতেছিল। নেপাল মনে মনে ভাবিল, আজিকার এই দুর্য্যোগের পৃথিবীতে সে আর তাহার জননী ভিন্ন তৃতীয় আর কোন জীবের যেন অস্তিত্ব নাই। বাহিরের এই অবিশ্রান্ত বারিধারা আর বাতাসের হুঙ্কারের ভিতর সমস্ত জীবজগৎ যেন নিঃসাড় হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। মাতার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তেমনি ভাবেই সে কট্‌মট্ করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে আড়ার দিকে চাহিয়া ঠায় বসিয়া রহিয়াছে। আর তাহাকে শোয়াইবার জন্য নেপাল চেষ্টা করিল না। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত শয্যার দুই দিকে দুই জন একভাবেই বসিয়া রহিল।

রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার সময় একবার ঔষধ খাওয়াইবার কথা ছিল, কিন্তু নেপালের সে কথা মনেই ছিল না। এক্ষণে হঠাৎ মনে পড়াতে, সে ভাবিল, ঔষধটা পেটে পড়িলে যদি এ ভাবটা কিছু কমিয়া আসে। সে উঠিয়া ঔষধের শিশি ও গেলাস লইয়া প্রদীপের কাছে গিয়া বসিল এবং গেলাসে ঔষধ ঢালিয়া মাতাকে খাওয়াইবার চেষ্টায় তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিতেই, নাপিতবৌ তাহার হাত হইতে গেলাসটা লইয়া সমস্ত ঔষধ নেপালের মাথায় ঢালিয়া দিল এবং পরক্ষণেই ধপ্ করিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। নেপাল আর কোন দিকে কোন চেষ্টা না করিয়া চুপ করিয়া শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া রহিল।

এইরূপ নীরবতার মধ্য দিয়া বহুক্ষণ কাটিয়া গেলে, নেপাল এক সময় মায়ের গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা যেন জুড়াইয়া আসিতেছে। মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া 'মা মা' বলিয়া বার দুই

ডাকিল, কিন্তু মায়ের কোন সাড়া পাইল না। রাত্রি বোধ হয় তখন দেড়টা কি দুইটা। জ্বর ক্রমেই যেন কমিয়া আসিতে লাগিল। নেপাল অনেকটা আশ্বস্ত হইল। একবার দরজা খুলিয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া দেখিল, ঝড়-বৃষ্টির বেগ খুবই কমিয়া আসিয়াছে। মহাযুদ্ধের পর এ যেন আহতদের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ও চোখের জল। সহসা তাহার বুকের ভিতর যেন কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিয়া নেপাল দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং মাতার শয্যার একধারে নিঃসাড়ে শুইয়া পড়িয়া একখানি হাত তাহার বুকের উপর রাখিয়া, রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কয়দিনের রাত্রি জাগরণ ও উদ্বেগ-অনিয়মে তাহার শরীরের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, জাগিয়া থাকিবার জন্য প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও নেপাল কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ঘণ্টা দুই পরে এক সময়ে তাহার তন্দ্রা কাটিয়া গেলে দেখিল, তাহার ডান হাতখানি যাহা সে মায়ের বুকের উপর রাখিয়া শুইয়া ছিল, তাহার তলায় যেন এক খণ্ড কঠিন বরফ জমিয়া আছে! সে লাফাইয়া উঠিয়া মায়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, দেখিল—কঠিন শীতল, ছাইএর মত সাদা মুখখানি কোন্ ফাঁকে ইতিমধ্যে চিরতরে নীরব হইয়া গিয়াছে, আর সেই মুখের উপরকার বড় বড় মৃত্যুনিথর চক্ষু দুইটি যেন তাহারই মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে।

বহু বৎসর আগে, তাহারই সম্মুখে এক দিন এই রকম তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু সেদিন সে বিপদের সময় তাহার মা ছিল, পাড়া-প্রতিবাসীরা ছিল, দিনের আলো ছিল। আজ দুর্য্যোগের এই নিশীথে কোন দিকেই তাহার কেহ নাই। আজ মাতার মৃতদেহ সম্মুখে লইয়া গৃহ-মধ্যে সে একা এবং গৃহের বাহিরে বিকট অন্ধকারের মধ্যে মৃত্যু-দূতরা যেন লাফালাফি দাপা দাপি করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাহিরের চারি-দিক হইতেই যেন তাহাদের নিঃশ্বাস ক্রমাগত তাহার কাণে আসিয়া লাগিতে লাগিল। নেপাল একবার দরজা ও জানালাগুলির খিলের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে পড়িল যে, সন্ধ্যার পর ঝড়ু চলিয়া যাইলে সদরের দরজা আর দেওয়া হয় নাই। তাহার খুবই ভয়-ভয় করিতে লাগিল। সে কিছুতেই আর ঘরের বাহির হইতে পারিল না, তাহার মনে হইতে লাগিল, বাহিরে, দরজা ও জানালার ধারে মুখ লইয়া কাহারা যেন দলে দলে ফাঁক দিয়া ঘরের মধ্যে কেবলই উঁকি দিয়া দেখিতেছে!

ব্রাহ্মণপাড়ার এক ধারে তাহাদের ঘর হইলেও, নিকটে এমন কাহারও বাড়ী ছিল না যে, বদ্ধ-দুয়ার গৃহমধ্য হইতে ডাকিলে কেহ শুনিতে পায়। হয় ত বাহিরে দাওয়ায় দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলে হীরু ঠাকুর্দ্দা শুনিতে পাইতে পারে, কিন্তু বাহিরেও সে যাইতে পারিবে না বা উচ্চকণ্ঠেও ডাকিবার তাহার সাধ্য নাই। সুতরাং নেপাল প্রদীপে মোটা মোটা দুই চারিটা সলিতা দিয়া, মাতার মৃতদেহ সম্মুখে লইয়া বাকী রাতটুকু ঘরের মধ্যেই বসিয়া কাটাইল।

যখন ঊষার আলো পূর্ব্বদিকের পরলের ফাঁক দিয়া অল্প অল্প ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখা দিল, তখন সে উঠিয়া দরজার খিল খুলিয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং বাটীর সর্ব্বাংশে গত রাত্রির ঝড়-জলের অত্যাচার-চিহ্ন দেখিতে দেখিতে খোলা দরজায় পিঠ দিয়া চৌকাঠের ধারে বসিয়া পড়িল।

অতি প্রত্যূষে সর্ব্বপ্রথম যে তাহার সংবাদ লইতে আসিল—সে হীরু ঠাকুর। গত রাত্রিতে সে খাইতে না যাওয়াতে আজ প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া হীরু ঠাকুর তাহার খবর লইবার জন্য আসিল এবং দাওয়ার উপর উঠিয়া মুক্ত দ্বার-পথে গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার মুখের প্রশ্ন মুখেই রহিয়া গেল। দেয়াল ধরিয়া কিছুক্ষণ নীরবে মৃতের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর মৃদুকণ্ঠে শুধু জিজ্ঞাসা করিল—"বোধ হয়, এই ভোর বেলায়?'

নেপাল কহিল—"হুঁ।"

দশম পরিচ্ছেদ

তাহার পর বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এক এক জন করিয়া পাড়ার অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ গোপাল নাপিতের বাড়ী আসিয়া জমিল এবং সকলেই হতভাগ্য নেপালকে তাহার বর্ত্তমান শোকে সান্ত্বনা দান করিল। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেহ বলিল—"আহা! পুণ্যবতী, স্বগ্‌গে গেল।" কেহ বলিল,—"রাঁড় হয়ে থাকার চেয়ে—বেশ গেছে, বেশ গেছে!' কেহ বা বলিল—"গেছলো সে

অনেক দিনই, শুধু দেহটা নিয়ে কোন রকমে ছেলেটার মুখ চেয়ে এদ্দিন পড়ে ছিল!'

পুরুষরা প্রায় সকলেই নেপালকে সাহস দিয়া— কহিল—"তুই কিছু ভাবিস না, নেপু, আমরা তোর রইলুম।" ভবিষ্যতের জন্য হয় ত সকলেই রহিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে একে একে প্রায় সকলেই যে যাহার গৃহে চলিয়া গেলেন। যে দুই চারি জন শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহারা নেপালের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তা হ'লে কি রকম ব্যবস্থাটা করতে চাও, বাবা?" এই ব্যবস্থার অর্থ এই যে, গ্রামের শ্মশানেই মৃতদেহ দাহ করা হইবে, কিংবা তাহা ত্রিবেণী লইয়া যাওয়া হইবে? ত্রিবেণী-গঙ্গাতীরে দাহ করিতে হইলে অনেক ব্যয়ের আবশ্যক হয়। শ্যামসুন্দরপুর হইতে ত্রিবেণী ছয় ক্রোশ পথ, এই ছয় ক্রোশ পথ স্কন্ধে করিয়া মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইলে একটি ছোট-খাট সৈন্যবাহিনীর আবশ্যক, এবং এই বাহিনীর যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করা খুব যে সোজা কথা, তাহা নহে; যেহেতু, এই যাবতীয়র ভিতর সৎ-কারাদির ব্যয় ছাড়া আরও অনেক প্রকারেরই ব্যয় আছে। সুতরাং দরিদ্রের ঘরের মৃতদেহ ত্রিবেণীর পুণ্য শ্মশানে দাহ হইতে না পাইয়া মৃতের সদ্গতিলাভ হয় না, তাহা গাঁয়ের শ্মশানেই পুড়িয়া ছাই হয় এবং তথা হইতে মৃতের চুলীর নীল ধোঁয়াটুকুই শুধু উর্দ্ধে স্বর্গের পথে যাইতে পায় মাত্র। চুলীর অধিকারীর আর স্বর্গ-গমনে কোন অধিকারই থাকে না। তাই নেপালকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, ইঁহাদের মধ্যে একজন পুনরায় কহিলেন—"দেখ বাবা, বেশ ক'রে বুঝে দেখ, সাহস কর কি? খুব কম করেও জন দশেকের দরকার হবেই। তা হলেই মোটা-মুটি ধরে রাখ—পাঁচ দশকে পঞ্চাশ, তার ওপর ঘাট-খরচ ইত্যাদি আছে। সুতরাং ধরে রাখ ষাট, বরঞ্চ দু'চার টাকা বেশী ত কম নয়।"

কিন্তু যাহাকে এই একই প্রশ্ন দুই দুইবার জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহার মন তখন এ সব হইতে অনেক দূরে ছিল, সুতরাং দুইবারের কোন বারেরই প্রশ্ন তাহার কাণে পৌঁছায় নাই। তাহা না পৌঁছাইলেও, মুহূর্ত্তখানেক পরে তাহার চমক ভাঙ্গিল এবং ইঁহাদেরই এক জনের দিকে চাহিয়া সে কহিল—"তা হলে, ব্যবস্থাটা আপনারা ক'রে দিন চক্কোত্তি জ্যেঠা, ছ' কোশ পথ, একটু সকাল সকাল না বেরোলে—"

"আমিও ত সেই কথাই বলছি, বাবা। তা হলে আর বেশী বেলা বাড়িয়ে ফল কি? আমি লোকের যোগাড় করি।"

হীরু ঠাকুর এতক্ষণ একটি ধারে নীরবেই বসিয়া ছিল, কহিল—"কিন্তু শুধু শুধু এক কাঁড়ি টাকা খরচ ক'রে ত্রিবেণী নিয়ে যাবার কি-ই বা দরকার? গাঁয়ে যখন একটা শ্মশান রয়েছে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া চক্কোত্তি জ্যেঠা কহিল—"তুমি হীরু খুড়ো, যা বল, তার কোন মানে হয় না। শ্মশান ত গাঁয়ে রয়েছে। শ্মশান থাকা না থাকার ত এখানে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে এই যে, নেপু যদি পারে ত ওর মাকে গঙ্গাতীরে সদ্গতি করবে না? ওর দ্বারা যদি এই মহৎ কাজটা—"

"মহৎ কাজ ত বটেই। মহৎ কাজে আমি বাধাও দিচ্ছি না। আমি শুধু বলছি যে, স্বর্গ কিম্বা নরক, যেখানে যাবার, নেপুর মা এতক্ষণে চ'লে গিয়েছে; মিছে খরচ-পত্তর ক'রে তার মরা দেহখানা আর অত দূরে টেনে নিয়ে না গেলেই হয়।"

ওপাড়ার বারোয়ারীর পাণ্ডা সিদু ঘোষ মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া হীরু ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কহিল—"দা'ঠাকুর, যদি নেপুর আমাদের সামর্থ্য থাকে ত বৌদির-সদ্গতিটা হোতে দোষ কি?"

"কিছুই না! সদ্গতিটা বৌদির হোক না হোক, বৌদির বাহকদের যে ঘোল আনাই হবে, তার আর কোন সন্দেহ নেই" বলিয়া হীরু ঠাকুরও ভিতর ভিতর খুবই বিরক্ত হইয়া খিড়কীর তালগাছে বাবুই পাখীর বাসার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আজ এতখানি বেলা হইলেও হীরু ঠাকুরের ধূমযাত্রা ঘটিয়া উঠে নাই, সুতরাং মেজাজ তাহার প্রসন্ন ছিল না।

যাহা হউক, মৃতদেহ ত্রিবেণীই লইয়া যাওয়া স্থির হইল এবং সমস্ত যোগাড়-পত্র করিয়া বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় জন দশ-বারো মিলিয়া 'হরিবোল' দিতে দিতে ত্রিবেণীর পথে যাত্রা করিল। ব্রাহ্মণের মধ্যে চক্কোত্তি জ্যেঠাই দলের ক্যাপ্টেন স্বরূপ হইয়া সঙ্গে চলিলেন।···

পরদিন সন্ধ্যার পর যখন দ্বাদশ জনের পানোন্মত্ত মিলিত কণ্ঠের বিকট 'হরিধ্বনি' ষ্টেশনের পথের দিক হইতে গ্রামের ভিতর আসিয়া পৌঁছিল, তখন সকলেই জানিতে পারিল যে, ইহারা কার্য্য শেষ করিয়া সন্ধ্যার ট্রেণে সব ফিরিয়া আসিতেছে।

অনতিকাল মধ্যেই সকলে আসিয়া নেপালের

বহির্বাটিতে জমায়েত হইল এবং ত্রিবেণী হইতে ফিরিবার সময় আনীত ছয়টি বোতলের অবশিষ্ট দুইটি বোতলের সুরাটুকু সেইখানে বসিয়া প্রচণ্ড কলরবের সহিত নিঃশেষে পান করিবার পর বিজয়-গর্ব্বোদ্দীপ্ত বীরের ন্যায় সকলে স্ব স্ব গৃহে যাইবার উদ্দেশে উঠিয়া দাঁড়াইল।

গতকল্য ত্রিবেণী যাইবার সময় ইহাদের স্কন্ধে ছিল ভার, হস্ত ছিল শূন্য, আজ ইহাদের স্কন্ধ ছিল শূন্য—হস্তে ছিল ভার। প্রত্যেকেরই এক হস্তে ছিল নূতন গামছায় বাঁধা কচুরি-সিঙ্গাড়া-লুচি-সন্দেশ-মিহিদানা প্রভৃতির একটি করিয়া পুঁটুলী, আর অপর হস্তে ছিল কাহারও একটি নূতন হেরিকেন, কাহারও একটি বাল্তি, কাহারও একখানি মাদুর, কাহারও বা আব্লুসের নলিচা লাগানো একটি হুঁকা। পেট পুরিয়া পানাহারের উপর এগুলি তাহাদের সম্পত্তির ফাউ। চক্কোত্তি জ্যেঠা যে কাল প্রভাতে হিসাব ধরিয়াছিলেন—পাঁচ দশকে পঞ্চাশ, তার উপর ঘাট-খরচ ইত্যাদি, সে হিসাব যথেষ্ট পরিমাণেই ছাপাইয়া গিয়াছিল এবং নেপালকে তিনি শেষকালে শুনাইয়া দিতেও ভুলেন নাই যে, এষ্টিমেটের চেয়ে আসল খরচ বরাবরই কিছু বেশীই হইয়া থাকে। তবু, নেপাল সঙ্গতিপন্ন নহে বলিয়া সকলে যথাসম্ভব তাহার ব্যয় বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছে অর্থাৎ যেখানে জন পিছু চারি পাঁচ সের করিয়া শুধু মিঠাই খরচ হয়, সেখানে তাহারা প্রত্যেকে দুই সের আড়াই সেরের মধ্যেই কাজ সারিয়াছে এবং অন্যান্য খরচও সেই হিসাবে খুব কমই করিয়াছে। এ সব ছাড়া এ কাজে যাহা প্রধান খরচ, তাহাও তাহারা তেমন বেশী করে নাই, যাহা নহিলে নয়, তাহাই করিয়াছিল মাত্র এবং গা-গতরে ব্যথা না হইলে সেটুকুও তাহারা করিত না।

যাহা হউক, নেপালের মাতৃদায়োদ্ধারের প্রথম পর্ব এইরূপে শেষ হইল, এবং একমাস পরে ইহার দ্বিতীয় পর্ব্বও কোন প্রকারে শেষ হইল বটে, কিন্তু তাহার পর যে পর্ব্ব আসিল, তাহা আর শেষ হইতে চাহিল না, তাহাই হইল তাহার সমস্যা-পর্ব্ব। অর্থাৎ সে অতঃপর কি করিবে এবং কি করিয়া দেশে থাকিয়া সে দু-বেলা দু'মুঠা খাইতে পাইবে, এই কথাই প্রতিনিয়ত সে ভাবিতে লাগিল, কিন্তু ইহার কোন সদুত্তরই সে তাহার মনের মধ্য হইতে কোনদিন কোন দিক দিয়াই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। শুধু একটুখানি মাথা গুঁজিবার স্থান থাকিলে, তাহাতে শুধু মাথা গুঁজিয়া থাকাই চলে, নিত্য দু'বেলা কাহারও পেট তাহাতে চলে না।

মাতৃশোকের প্রবলতা একটু কমিয়া আসিলে, নেপালের মনে তাহার পেটের চিন্তাই অন্য সকল চিন্তাকে ছাপাইয়া উঠিল। পৈতৃক জমী-জমার মধ্যে সামান্য ছিটছাট্ যাহা কিছু ছিল, মায়ের শ্রাদ্ধের সময় সেগুলিও তাহাকে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। সুতরাং বাহির হইতে উপায় করিয়া না আনিলে সামান্য দুটি ডাল-ভাতেরও তাহার যোগাড় হইবে না। সে দিন যাহারা বলিয়াছিলেন —"কিছু তুই ভাবিস নে নেপু, আমরা তোর রইলুম", তাঁহারা সকলে যে ঠিকই ছিলেন, নিঃসন্দেহেই সে কথা বলিতে পারা যায়, কিন্তু গ্রামে নেপুর নিজেরই থাকা সম্বন্ধে আজ দুই মাস পরে তাহার নিজের মনেই একটা ঘোর সন্দেহ জমিয়া উঠিল।

মাতার অসুখের সময় হতেই নেপাল সেই যে হীরু ঠাকুরের বাড়ীতে দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল, হীরু ঠাকুর জোর করিয়া নেপালকে সে ব্যবস্থা এখনও পর্য্যন্ত ভাঙ্গিতে দেয় নাই। হীরু ঠাকুর নেপালকে বলে—"ভাই রে, তুই দু'বেলা দুটি খেলে কি আমার ভাত সব ফুরিয়ে যাবে? আমার ঘরে দু'টি শাক-ভাত নিত্যি যা জুটবে, তার এক মুঠো তুই খাবি, এক এক মুঠো আমরাও খাব।"

মায়ের শ্রাদ্ধের ঠিক পরেই নেপাল কলিকাতায় চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু হীরু ঠাকুর তাহাকে জোর করিয়া যাইতে দেয় নাই। সেদিন হীরু ঠাকুর তাহাকে বলিল,—"তুই মুখ্যু ন'স নাতি, তোর ঐ চণ্ডীমণ্ডপে একটা পাঠশালা বসিয়ে দে, ওপরে ভগবান আছেন, দু'টি অন্নের ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। তার পর একটি সুন্দর নাতবৌয়ের জন্যে আমি ভাল করে কোমর বাঁধব।" মুখে এ কথা বলিলেও, মনে মনে হীরু ঠাকুর ভাবিল যে, কোমর খুব ভাল করিয়া বাঁধিলেও, নেপালের বর্দ্ধমানের সেই মনের মত সুন্দরী মেয়ে তাহাদের নাপিতের ঘর হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ হইবে না। হীরু ঠাকুর মেয়েটিকে দুই চারিবার দেখিয়াছিল ব'লেই এত দিন পরেও মেয়েটির অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি তাহার ভালভাবে মনে ছিল। পরিবার যে তাহার সুন্দর ছিল, তাহা নেপাল

নিজেও দেখেছিল এবং সেই সুন্দর মুখচ্ছবি খুব আব্ছাভাবে এখনও মাঝে মাঝে তাহার মনে পড়ে। বিবাহের পর সাতটি দিন মাত্র মেয়েটি তাহাদের ওখানে ছিল এবং তখন সে ছয়-সাত বৎসরের বালিকা মাত্র। সুতরাং স্বামিস্ত্রীর আলাপ-পরিচয় ভাব-ভালবাসা তখন তাহাদের মধ্যে কিছুই হইবার অবকাশ পায় নাই। শুধু এই সাতটি দিনের ভিতর কয়েকবার মাত্র তাহার বালিকা স্ত্রীর মুখখানা সে আড়াল হইতে দেখিতে পাইয়াছিল। সে নিজেই তখন কিশোরবয়স্ক স্কুলের ছাত্র। মাতার মৃত্যুর পর কয়েকবার তাহার সেই স্ত্রীর কথা নেপালের মনে পড়িয়াছিল, সে ভাবিয়াছিল যে, আজ এ সময় তাহার সেই স্ত্রী ব্রজরাণী তাহার পার্শ্বে থাকিলে তাহার বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল জীবনের দীনতা, নৈরাশ্য ও চিন্তা এমন করিয়া হয় ত মাথা খাড়া করিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু যাহা নাই, তাহাকে লইয়া আকাশ-কুসুমের সৃষ্টি করায় ফল কি? সুতরাং নেপাল এসব কথা আর বড় ভাবিত না। তবে এই কথাটা সে মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে, পুনরায় বিবাহ আর সে করিবে না। সেই দিন হীরু ঠাকুরের কথায় নেপাল কহিল—"কোমর বেঁধে কোনই ফল হবে না, ঠাকুর্দ্দা। এই দুর্ব্বল ক্ষীণ হাতে আর কারও হাত ধ'রে নেবার এখন আর শক্তি নেই। এখন এ ভাবে বসে বসে তোমার ঘাড় ভাঙ্গার বদলে, নিজের ঘাড়েই দু'টি অন্ন উপায়ের ভারটা তুলে নেবার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রেই করতে হবে।"

নেপালের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া হীরু ঠাকুর আর তাহার সম্বন্ধে বেশী কিছু না বলিয়া শুধু কহিল, "তা হলে তুই কি নাতি কলকাতা গিয়ে একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা করাই ঠিক করলি?"

নেপাল কহিল—"হ্যাঁ ঠাকুর্দ্দা, আর তুমি বাধা দিও না। একবার ঝাঁপ দিয়েই দেখি, খড়-কুটো কিছু ধরতে পারি কি না।"

কিন্তু কলিকাতায় যাইবার পক্ষে তাহার প্রধান অন্তরায় হইল অর্থের অভাব। রিক্ত হস্তে সে কলিকাতায় যাইয়া কোথায় দাঁড়াইবে? অর্চ্চনাদের বাড়ী একবার সে যাইতে পারে, ভবতোষ বাবু তাহাকে যাইবার জন্য বলিয়াও দিয়াছিলেন, কিন্তু দুই চারি দশ দিনের জন্য তথায় গিয়া সে থাকিতে পাবে মাত্র; তাহাতেই বা কি ফল? কত দিন পরে যে তাহার কাজকর্ম্মের যোগাড় হইবে, তাহার যখন কোনই নিশ্চয়তা নাই, তখন কিছু অর্থ তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু কোথা হইতেই বা সে এখন এই অর্থের যোগাড় করে? এই লইয়া দিনের পর দিন যখন তাহার চিন্তাই শুধু বাড়িতে লাগিল, কোন দিকে কোন উপায় সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না, তখন একদিন হীরুঠাকুর আসিয়া তাহাকে বলিল,—"নেপু, আমার হাল্-চাল্, ঘরের খবর সবই ত তুই জানিস দাদা, নেশাখোর ব'লে সংসারের টাকাকড়ি তোর ঠান্‌দি কিছুই আমার হাতে রাখতে দেয় না। সে-ই হোল গিয়ে যেন বাড়ীর কর্ত্তা—"

হাসিতে হাসিতে নেপাল তাহার কথার মধ্যেই বলিল,—"আর তুমি হলে গিয়ে ঘরের গিন্নী?"

"সত্যিই তাই। হপ্তায় হপ্তায় নেশার দরুণ ঐ গণ্ডাকতক ক'রে পয়সাই আমার বরাদ্দ, তা ছাড়া আর কোন কিছুতেই আমার অধিকার নেই।"

"অধিকারটা তাই একটু বাড়াবার জন্যে, ঠান্‌দির কাছে একখানা দরখাস্ত পেশ করবার মৎলব করছ না কি?"

"না রে ভাই, শুধু মৎলব নয়; কাজ একেবারে গুছিয়েই ফেলেছি। ক'দিন ধরেই তক্কে তক্কে ছিলুম, কাল সুবিধে পেয়ে তোর ঠান্‌দির বাক্স থেকে এই একশটা টাকা সরিয়ে ফেলেছি"—বলিয়া হীরু ঠাকুর ভাঁজ করা দশখানা নোট নেপালের হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া কহিল,—"তবু দু'চার মাস সেখানে এক রকম চলবে এখন। উঠে-প'ড়ে একবার লাগ্‌গে যা, ভাই। ভগবান তোর ভালই করবেন, হীরুদার এই কথাটা তুই কখনও ভুলিস নি, ভাই।"

নেপাল হাঁ করিয়া হীরু ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আষাঢ়ের শেষ ভাগ। কিন্তু আষাঢ় হইলেও ইতিপূর্ব্বে বৃষ্টির কোন লক্ষণই কোন দিন প্রকাশ পায় নাই। মাত্র সেই দিনই প্রভাত হইতে কলিকাতায় বহু দিনের অনাবৃষ্টির পর বৎসরের প্রথম বর্ষা নামিয়াছিল। সকালে প্রবলবেগে বহুক্ষণ ধরিয়া বর্ষণ হইয়া, দ্বিপ্রহরের পর হইতে

বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু কোন সময়ের জন্যই তাহা একেবারে ক্ষান্ত হয় নাই। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া জমাট মেঘ সঞ্চিত থাকায়, তখন অপরাহ্ণকালেই চতুর্দ্দিক আঁধার করিয়া যেন সন্ধ্যা স্থচিত হইয়া আসিতেছিল এবং দিগ্‌দিগন্ত ঝাপসা করিয়া ক্ষীণ বৃষ্টির ধারা তখনও অবিশ্রান্ত ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া ঝরিতেছিল।

বালিগঞ্জে একটি দ্বিতল বাটীর উপরের একখানি ঘরে বসিয়া অর্চ্চনা মুক্ত জানালার ফাঁকে একান্ত মনে নব-বরষার এই বৃষ্টিধারা দেখিতেছিল। এই দিক্‌টায়, তাহাদের বাটী আসিবার পথের পার্শ্বেই, কিছু দূরে খুব বড় একটা পোড়ো মাঠ ছিল। তাহার পরেই কাহাদের খান দুই তিন চালা-বাড়ী, তাহার পরেই বহু পুরাতন একখানি ছোট একতলা বাড়ী; তাহার বাহিরের দেওয়ালগুলিতে কখনই বালি ধরান হয় নাই, নোণা-ধরা ইঁটগুলি বহু বৎসরের রৌদ্র ও জলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে যেন মুখ বাড়াইয়া দেওয়াল হইতে সব খসিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছিল। গৃহপার্শ্বস্থ গুটী দুই তিন সু-উচ্চ নারিকেল-বৃক্ষ গভীর তৃপ্তিতে যেন বহুদিনের ঈপ্সিত স্নান সমাধা করিতেছিল ও স্বল্প বায়ুতাড়নে আন্দোলিত হইয়া যেন আনন্দে অল্প অল্প দুলিতেছিল। বৃষ্টিধারায় সম্মুখস্থ পথ, পার্শ্বের মাঠ, চালা-ঘর কয়খানি, দূরের সেই জীর্ণ একতলা বাটী এবং তৎপার্শ্বস্থ নারিকেল গাছগুলি সবই তখন ঝাপ্‌সা হইয়া অর্চ্চনার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিতেছিল। বহুক্ষণ হইতেই বসিয়া বসিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া অর্চ্চনা নিবিষ্টমনে এই সব দেখিতেছিল। ছেলাবেলা হইতেই সে বৃষ্টি দেখিতে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহার বাল্যকালে, যে দিন হঠাৎ সারা আকাশ কাল-মেঘে ভরিয়া গিয়া মাঠ-ঘাট-পথ অন্ধকারে ছাইয়া আসিত, তখন সে তাহাদের পাড়া-গাঁয়ের সেই বাড়ীর উঠানে ছুটিয়া আসিয়া সানন্দে হাত-তালি দিয়া নাচিতে থাকিত, কিম্বা ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে মাঠের ধারে আসিয়া দাঁড়াইত এবং সেখান হইতে মহানন্দে সম্মুখের দিগন্তব্যাপী শস্যপূর্ণ মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার সবুজ রঙ্গের সহিত ঘনান্ধকারের কাল রংয়ের মেশামেশি দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া পড়িত। কিছু পরে চতুর্দ্দিক্‌ ভাসাইয়া যখন বৃষ্টি নামিত, তখন দাওয়ার এক ধারে আসিয়া উৎফুল্ল-মনে সে সেই বৃষ্টি দেখিত। তার পর সে বড় হইয়াছে, অনেক বর্ষার অনেক বৃষ্টি সে দেখিয়াছে এবং আনন্দে বিভোর হইয়া হাত-তালি দিয়া না নাচিলেও, একান্তে ঘরের মধ্যে বসিয়া তন্ময়চিত্তে বর্ষার এই রূপ বহুবার সে উপভোগ করিয়াছে।

আজও অপরাহ্ণে নির্জ্জন ঘরের মধ্যে বসিয়া একান্তমনে সে এই দৃশ্যই দেখিতেছিল, কিন্তু সহসা তাহার দেখার বাধা জন্মাইয়া সম্মুখের সেই পথের উপর একটি পরিচিত মূর্ত্তি তাহার চোখের সম্মুখে দেখা দিল এবং সে ছুটিয়া যাইয়া পার্শ্বের ঘরে ভবতোষ বাবুকে জানাইল—"নেপাল বাবু আসছেন, বাবা।"

সামান্য একটু বিস্মিত হইয়া ভবতোষ বাবু কহিলেন—এই বৃষ্টিতে?

"হ্যাঁ বাবা, জামা-কাপড় সব একেবারে ভিজে একাকার!"

ভবতোষ বাবু কয় দিন হইতে অসুস্থ ছিলেন। শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিলেন,—"যা মা, ভিজে কাপড়-চোপড় সব ছেড়ে ফেলতে বল্‌ গে যা, তারপর এইখানে নিয়ে আয়।"

মিনিট পনর কুড়ির মধ্যেই নেপাল বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া এ ঘরে আসিল এবং ভবতোষ বাবুর পায়ের কাছে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"এত দিন গিয়েছে, নিজেও একখানা চিঠি দাও নাই, আর আমি যে চিঠি দিলুম, তারও কোন জবাব দিলে না। যাই হোক, কেমন আছ, বল দেখি বাবা?"

"ভাল আছি" বলিয়াই নেপাল সর্ব্বপ্রথমে তাহার মাতার মৃত্যু-সংবাদ জানাইল এবং তৎপরে সংক্ষেপে নিজের সম্বন্ধে অন্যান্য কথা জানাইয়া এ-বাটীর কুশল জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মাতার সংবাদ শুনিয়া ভবতোষ বাবু যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং তাহাকে অনেক সান্ত্বনার কথা বলিয়া, অবশেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"সমস্ত দিন বোধ হয় খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয় নি? এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে কি ঘর থেকে আজ বেরুতে আছে বাবা?"

নেপাল কহিল,—"বাড়ী থেকে খুব ভোরে যখন বেরিয়েছিলুম, তখন বৃষ্টির কোন লক্ষণই ছিল না, ষ্টেশনে এসে পৌঁছবার পর বৃষ্টি পেলুম। আপনার কি কোন অসুখ করেছে? চেহারা বড্ডই খারাপ দেখাচ্ছে।"

"হ্যাঁ বাবা, ক'দিন ধরেই একটু একটু জ্বর

হচ্ছে, আজ আবার বুকটায় যেন একটু ব্যথা বোধ কচ্ছি। আচ্ছা, তোমাদের শ্যামসুন্দরপুর ত্রিবেণীর ঐ দিকে ত? ত্রিবেণী থেকে কতটা যেতে হয়?"

"অনেকটা; মাইল চোদ্দ পনেরো হবে, কিন্তু আজকাল হাঁটতে হয় না, ছোট রেল হয়েছে।"

"তোমার বিবাহ হয়েছে কোন্ গ্রামে, বাবা?"

নেপাল সত্য গোপন করিয়া কহিল,—"সাতশিমুল।"

"সেটা কোন্ জেলা?"

"বাঁকুড়ো।"

"বৌমাকে এখন একলা বাড়ীতে রেখে এলে ত?"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া নেপাল কহিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, এক বিধবা পিস্-শাশুড়ীকে নিয়ে এসে রেখে দিয়ে এসেছি।"

টপ্ করিয়া এই নিছক মিথ্যাগুলি নেপালের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহা যে সে ভাবিয়া চিন্তিয়া বা কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া বলিল, তাহাও নহে। গয়ারামের সংস্রবে আসিয়া অবধি এইরূপ ধরণের উদ্দেশ্যবিহীন মিথ্যা বলা যেন তাহার স্বভাবই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সে অভ্যাসের হাত হইতে এখনও সে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই।

ভবতোষ বাবু বলিলেন,—"তা বেশই করেছ, চ'লে এসেছ। শীগ্‌গিরই তোমার কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি, কিছু ভেব না। এইখানে এখন থাক, আমি একটু সুস্থ হয়ে নি আগে। যাও বাবা, এখন একটু জল-টল কিছু খাও গিয়ে,"—বলিয়া অর্চ্চনার মুখের দিকে চাহিলেন। অর্চ্চনা ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে চলিয়া গেল এবং কিছু পরেই ঝি আসিয়া নেপালকে জল খাইবার জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল।

নেপাল জল খাইয়া ফিরিয়া আসিলে ভবতোষ বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সহিত অনেক কথা কহিলেন। সমস্ত শুনিয়া মোটের উপর নেপাল এই বুঝিল যে, ভবতোষ বাবুর কাছেই তাহার কাজ হইল। কলিকাতায় তাঁহার খান পাঁচ-সাত বাড়ী, কিছু জমী-জমা প্রভৃতি আছে। সেই সমস্ত দেখা-শুনা করা এবং সাধারণতঃ সকল প্রকার বৈষয়িক কর্ম্মে তাঁহাকে সাহায্য করা, ইহাই তাহার কাজ। অবিনাশ বাবু এই সব কাজ করিতেন, বার্দ্ধক্যের জন্য তিনি আর কার্য্যাদি করিতে অপারগ হইয়া স্বেচ্ছায় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি দেশে চলিয়া গিয়াছেন। বহু দিনের পুরাতন ও বিশ্বস্ত এই কর্ম্মচারীটি যাহাতে দেশে থাকিয়া শেষ বয়সে অর্থাভাবে না কষ্ট পান, সে জন্য ভবতোষ বাবু তাঁহাকে শ পাঁচেক টাকা দিয়া সাহায্যও করিয়াছেন।

যাহা হউক, ভবতোষ বাবুর কাছেই নেপালের কাজ হইল, ইহাতে নেপালও মনে মনে সুখী হইল, ভবতোষ বাবুও সুখী হইলেন।

কিন্তু সামান্য একটু জ্বর ও একটুখানি বুকের ব্যথা মস্ত বড় অসুখের সৃষ্টি করিয়া প্রায় মাসাবধিকাল তাঁহাকে শয্যাগত করিয়া ফেলিয়া রাখিল। এক মাস পরে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং চিকিৎকরা তখন তাঁহার সাগু, বার্লি, হর্লিকের রুটী, বেদানা ও কমলালেবুর রস প্রভৃতি বাতিল করিয়া মাছের ঝোল, ভাত, সুরুয়া, সুজির রুটী, পশ্চিমের হাওয়া প্রভৃতি খাইবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

ভবতোষ বাবুর অসুখের সময় নেপাল আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিল। তাহার ক্লান্তিশূন্য পরিশ্রম, যত্ন, সেবার ঐকান্তিকতা দেখিয়া অর্চ্চনাও মনে মনে বিস্মিত না হইয়া পারে নাই। এক্ষণে সারিয়া উঠিবার পর এক দিন তিনি নেপালকে কহিলেন,—"হয় ত তুমি আর জন্মে আমার ছেলেই ছিলে, বাবা। নইলে প্রথম থেকেই তোমার উপর এতটা স্নেহ আমার পড়বে কেন?" অন্য এক সময়ে অর্চ্চনাকে ডাকিয়া বলিলেন—"নেপালকে ঠিক ভাইয়ের মতই মনে করিস, মা। হীরের টুকরো ছেলে, যেমন সুন্দর ও বাইরে, তেমনি সুন্দর ও ভেতরে। আমার পঁয়ষট্টি বছরের অভিজ্ঞতায় লোক চেন্‌বার যে শক্তিটুকু পেয়েছি, তাতে ক'রে ওর ঐ সুন্দর চোখের শান্ত দৃষ্টির ভেতর দিয়ে আমি একটি নিষ্কলঙ্ক পবিত্র অন্তরেরই পরিচয় পাই।"

পিতার অসুখের জন্য এই এক মাসকাল অর্চ্চনা তাহার নিত্যকার জপ-তপ-পূজায় বেশী সময় দিতে পারে নাই। এমন এক এক দিন গিয়াছে, যে দিন সে পূজার ঘরে ঢুকিতে পর্য্যন্ত অবসর পায় নাই। এক্ষণে অবসর পাইয়া সকাল-সন্ধ্যায় সে এই ক্ষতিপূরণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।

সে দিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজার ঘরে কাটাইয়া বাহিরে আসিতেই সে দেখিল, তাহাদের

বুড়া ঠাকর চিন্তামণির ছেলেটি তাহার অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অর্চ্চনা তাহাকে কহিল—"কি রে কেষ্ট?" সে কহিল,—"ম্যানেজার বাবু অনেকক্ষণ চা চেয়ে পাঠিয়েছেন, ঠাকুর মশাই কইলে, বাইরে আর চা নেই, দিদিমণিরকাছ থেকে চায়ের টিন মেঙ্গে নিয়ে আয়।"

অর্চ্চনা দেরাজ হইতে চায়ের টিন বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বরাবর নীচে নেপালের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। নেপাল তখন কি একটা হিসাবের কাগজ দেখিতেছিল, অর্চ্চনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবাকে হাওয়া বদলাবার জন্যে কোথায় নিয়ে যাওয়া যায় বলুন ত?"

নেপাল কাগজখানি দেখিতে দেখিতেই কহিল, —"আসাম।"

"কি বলছেন, নেপাল বাবু?"

"তবে দার্জ্জিলিং, না হয় জলপাইগুড়ি।"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অর্চ্চনা বলিল, —"সত্যি, বলুন না ঠিক করে?"

কাগজখানি টেবিলের এক পাশে রাখিয়া দিয়া নেপাল কহিল,—"ঠিক ক'রে কিছু বলবার এখন শক্তি নেই, কারণ, কেষ্টকে চায়ের জন্যে ভেতরে পাঠিয়েছি প্রায় আধ ঘণ্টা, চা-ও এল না, কেষ্টও ফিরল না, তাই মনেরও ঠিক নেই—মাথারও ঠিক নেই।"

সেইরূপ সহাস্যে অর্চ্চনা বলিল,—"তাই বুঝি চা চা করতে করতে মনটা এখন আপনার খালি আসাম-দার্জ্জিলিং-জলপাইগুড়ির—"

"চা-বাগানে চা-বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"বাবা! ভাল চা-খোর আপনারা! আচ্ছা, এক মিনিটের ভেতর চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলুন এখন, বাবাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া যায়?"

"আমিও তা' হলে এক সেকেণ্ডের মধ্যেই বলছি,—গিরিডি।"

প্রফুল্ল-মুখে হাসিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"আমিও ঠিক তাই ভেবেছি, নেপাল বাবু।" বলিয়া অর্চ্চনা চলিয়া গেল।

ইহারই কয়েক দিন পরে এক দিন সকালবেলায়, স্নানান্তে তাহার লালপাড়ের মটকার শাড়ীখানি পরিয়া অর্চ্চনা পূজার ঘরে প্রবেশ করিল এবং প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাহির হইয়া বারান্দার একাংশে দাঁড়াইয়া যখন কপালের রাশীকৃত এলোচুলের উপর যুক্ত কর ঠেকাইয়া সূর্য্যের উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিল, তখন ভবতোষ বাবুর ডাকে তাড়াতাড়ি সূর্য্য-প্রণাম শেষ করিয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া কহিল,—"কেন বাবা?"

ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"যদি গিরিডিই যেতে হয়, তা হ'লে দেরী ক'রে ফল কি, মা?"

অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া অর্চ্চনা কহিল, —"কি বলছেন বাবা? এই ভরা ভাদ্দর মাসে আপনাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরুব?"

একটুখানি হাসিয়া ভবতোষ বাবু কহিলেন,— "নেপাল ঠিক এই কথাই বলছিল যে, ভাদ্রমাসে যেতে তুই কিছুতেই মত করবি নি;—কিন্তু একদিন যে আমায় চিরকালের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে, সেদিন তোর তিথি-নক্ষত্র, দিন-ক্ষণ, পৌষ-ভাদ্র কোন কথাই যে টিকবে না, মা!"

অর্চ্চনার প্রফুল্ল মুখভাব নিমেষে ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, চক্ষুও যেন সঙ্গে সঙ্গে একটু সজল হইয়া আসিল; দেওয়ালের দিকে চাহিয়া সে কিছু যেন বলিতে যাইতেছিল, ভবতোষ বাবু তৎপূর্ব্বেই একটু হাসিয়া পুনরায় কহিলেন—"আচ্ছা মা, তাই হবে, এ ক'টা দিন কেটেই যাক্ তা হ'লে।"

দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে অর্চ্চনা ধীরপদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গিরিডি হইতে উত্তরমুখী হইয়া যে রাস্তাটি বরাবর পচম্বার দিকে গিয়াছে, তাহারই উপর একটি নাতিবৃহৎ বাড়ী ভাড়া লইয়া আজ প্রায় এক মাসেরও উপর ভবতোষ বাবু আসিয়া রহিয়াছেন। এক মাসের মধ্যেই তাঁহার দুর্ব্বল শরীর অনেকটা ভাল হইয়াছে। অর্চ্চনার ইচ্ছা যে, আরও মাস দেড়েক এখানে থাকিয়া তাহারা কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। সঙ্গে নেপাল, বামুন ঠাকুর ও কেষ্ট আসিয়াছে এবং এই স্থানের এক জন ঠিকা ঝি রাখা হইয়াছে। এখানে আসিয়া এক কেষ্ট ছাড়া সকলকারই স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। অর্চ্চনা এক দিন কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখানে এসে সকলেরই চেহারা ভাল হ'ল, তোর চেহারা এমন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন রে, কেষ্ট?"

কেষ্ট বলিল,—না দিদিমণি; এ যায়গা ভাল নয়। চারদিকের এই সব পাহাড়-পর্ব্বত আর

উঁচু-নীচু কাঁকরের মাঠ দেখলে কেমন আমার মনের ভিতর হু-হু করতে থাকে ; তার উপর কি দুর্জ্জয়ে শীত পড়েছে, দিদিমণি!"

"বামুন ঠাকুরের চেহারা তবে ভাল হ'ল কেমন করে?"

"কেন হবে না দিদিমণি, দিনরাত ও আগুনের তাতে গরম হয়ে ব'সে আছে, ওকে ত আর পাতকুয়োর ঐ হিম জল লাড়া-চাড়া করতে হয় না। আর তা ছাড়া",—বলিয়া গলার সুর খুব নরম করিয়া কহিল—"ও খায় কত দিদিমণি! ভালমন্দ তোমরা যা খাও, ও-ও ঠিক তাই খায়!"

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অর্চ্চনা বলিল,—"বটে! আর তোকে বুঝি ভাল-মন্দ কিছু দেয় না? দাঁড়া, ঠাকুরকে এই কথা ব'লে দিচ্ছি।"

"হেই দিদিমণি, তোমার দুটি পায়ে চারটী গড় করি, তা হলে ঠাকুর আর আমায় রাখবে না! ব্যাগ্‌গাতা করি দিদিমণি, কিছু বোলোনি ক।"

অর্চ্চনা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কেষ্ট অপ্রস্তুতের মত সেই দিকে চাহিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিপ্রহরে যখন ভবতোষ বাবু ও নেপাল খাইতে বসিয়াছিল, তখন অর্চ্চনা একধারে বসিয়া সকলের জন্য আলাদা করিয়া বাটিতে বাটিতে দুধ ঢালিয়া রাখিতেছিল। সেই সময় ঠাকুর কিছু একটা দিতে আসিলে অর্চ্চনা তাহাকে কহিল,—"ঐ যে একটা একরত্তি ছেলে সঙ্গে এসেছে, ও কিছু খেতে-টেতে পায়, ঠাকুর?"

ঠাকুর তাহার দিকে চাহিয়া, চক্ষু কপালে তুলিয়া, কিছু বলিতে যাইতেছিল, তৎপূর্ব্বেই অর্চ্চনা কহিল—"না, ও, সব কথা শুনতে চাই না। ওকে মাছ-টাছ, তরকারি সব ভাল ক'রে দেখে শুনে দেবে। ছেলেটা যা এসেছিল, তার চেয়েও রোগা হয়ে গেছে। ওর জন্যে আমার কাছ থেকে একটু একটু দুধ রোজ মনে ক'রে চেয়ে নিয়ে যাবে,—বুঝলে?"

"হুঁ। মাছ ত রোজই দেউচি পারা।"

"দেউচি, ত ছেলেটা দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে কাঁইকি?"

ঠাকুর চলিয়া গেল। ভবতোষ বাবু ও নেপাল পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। অর্চ্চনাও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

অপরাহ্ণে অর্চ্চনা দ্বিতলে বারান্দার একাংশে আরাম-কেদারায় বসিয়া সম্মুখের দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। কোথাকার কোন্ অখ্যাত অজ্ঞাত পাহাড় হইতে অতি ক্ষুদ্র একটি ঝরণা বাহির হইয়া তাহাদের বাড়ীর নিকট দিয়াই আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া গিয়াছে। অন্য সময়ে হয় ত তাহাতে মোটেই জল থাকে না, কিন্তু এবার এখানে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বর্ষা থাকায়, এই শীর্ণকায় ঝরণাটির অপ্রশস্ত বালির বুক চিরিয়া ক্ষীণ জলস্রোত সূর্য্যকরে চিক্-চিক্ করিতেছিল। পাহাড়ের উপর অসংখ্য ছোট-বড় প্রস্তরখণ্ড ভূগর্ভ হইতে মাথা-খাড়া করিয়া উঠিয়াছে, আর তাহাদিগকে পাহারা দিবার জন্য নিকটেই বৃহদায়তন একখণ্ড প্রস্তর যেন বিকট দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অদূরে কতকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট শালবৃক্ষ খানিকটা স্থান ছায়া করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহার ও-দিকেই এক স্থানে, গুটি-দুই-চার মহুয়া ও শিরীষ গাছের পর হইতেই কঙ্করময় উচ্চভূমি একবারে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। বামদিকে কিছু দূরে ছোট একটি টিলার উপর কয়েকটি দেবদারু, শিশু, বনঝাউ, পিংড়ী, উনার প্রভৃতি বৃক্ষের মাথায় অস্তোন্মুখ সূর্য্যের নিস্তেজ রৌদ্র পড়িয়াছিল। টিলার পার্শ্ব দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ প্রান্তর ভেদ করিয়া নিকটের কোন সাঁওতালপল্লীতে যাইয়া মিশিয়াছে। পশ্চিমে—দূরে কয়লার খাদগুলির উপর ছোট-বড় অনেকগুলি বিচিত্র বাংলো অস্পষ্ট ছবির মত দেখাইতেছিল এবং তাহাদেরই চারিপার্শ্বে অসংখ্য প্রস্তরময় উচ্চ স্তূপ অগণিত বন্যবৃক্ষ-পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বেলাশেষের আকাশে খণ্ড-মেঘগুলির উপর পড়ন্ত সূর্য্যের শেষ রশ্মি পড়িয়া তথায় যে অপরূপ বিচিত্র চিত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, মনে হয়, নিম্নে ভূ-পৃষ্ঠের এই সকল অনির্ব্বচনীয় দৃশ্যের প্রতিবিম্বই উপরে আকাশের গায় প্রতিফলিত হইয়াছে। সম্মুখে আরও দূরে, সুবিশাল পাহাড়িয়া প্রান্তরের একবারে শেষ সীমায় পরেশনাথের সু-উচ্চ পাহাড়শ্রেণী অস্পষ্ট মেঘরাশির মত দেখাইতেছিল।

বহুক্ষণ পরে এই সব দৃশ্যের উপর হইতে অর্চ্চনা যখন তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল, তখন সম্মুখের সেই ক্ষুদ্র ঝরণাটির শীর্ণ জলধারার উপর ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে এবং তীরের উপরকার একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের উপর বসিয়া তাহাদের ঝি নোনিয়ার

মা'র আট-নয় বছরের ছেলে নোনিয়া আপন মনে নানাপ্রকার সুরের কসরৎএর সঙ্গে সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছে। ঝরণার পাড়ের উপরেই তাহাদের একখণ্ড শাক-সব্জীর ক্ষেত এবং তাহারই এক অংশে তাহাদের শুইবার ছোট একখানি ঘর। ঘরখানির চারি পার্শ্বের দেওয়াল সুন্দররূপে গোবর-মাটী দিয়া লেপা ও তাহার উপর চুণ দিয়া নানা রকমের নক্সা কাটা। অর্চ্চনা দেখিল, দাওয়ার উপর বসিয়া নোনিয়ার মা বৃহৎ যাঁতাতে গম ভাঙ্গিতেছে। অর্চ্চনা উঠিয়া নীচে আসিল এবং খিড়কীর দরজা দিয়া বরাবর নোনিয়ার মা'র ঘরের দিকে চলিল।

হঠাৎ উঠানের মধ্যে অর্চ্চনাকে দেখিয়া নোনিয়ার মা যাঁতা বন্ধ করিয়া উঠিল এবং একখানি ছোট চেটাই দাওয়ায় বিছাইয়া দিয়া তাহার নূতন প্রভুকন্যাকে অভ্যর্থনা করিল।

অর্চ্চনা বসিল না, দাঁড়াইয়া থাকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, নোনিয়াব মা, নোনিয়াব বাবা রোজ কত রাত্রে কাজ থেকে ঘরে ফেরে?"

নোনিয়ার মা উঠানে নামিয়া কহিল,—"এক পোহর দেড় পোহর রাত হইয়ে যায়, অভব্ কা কাম আছে দিদিমণি, জান নিকাল্‌কে তব পনরঠো করকে রোপেয়া দে দেয়।"

"আচ্ছা, অত রাত পর্য্যন্ত তোর একলা থাকতে ভয় করে না?"

"কুছ ডর্ এখানে নেই, দিদিমণি। সাত বরিষ যখন হামার উমের, তবসে এখানে আছি। বহুত রোজ আগড়ি থোড়া থোড়া বাঘ এখানে ছিল, এখন সব ভাগ গিয়াছে।"

"আরে—পোড়ারমুখী, বাঘের ভয়ের কথা বলছি না, আর কোন কিছুর ভয়-টয় করে না?"

"চোর-বদ্‌মাস্‌কা বাত বলছো, দিদিমণি? ওসব কুচ এখানে নেই।"

"দূর পোড়াকপালী! যতক্ষণ না নোনিয়ার বাপ ঘরে আসে, ততক্ষণ একলা ঘরের ভেতর থাকতে তোর গা ছম্-ছম্ করে না?"

মুখ ও চোখের অদ্ভুত একটা ভঙ্গী করিয়া নোনিয়ার মা কহিল,—"আরে রাম রাম! সে সব ডর্ হিঁয়া কভি নেই দিদিমণি। তবে বহুৎ রোজ আগাড়ি, নোনিয়া তখন হামার হুয়া নেই, এক রাতমে, মুখ হাত ধোনে কা আস্তে হামি এই উঠোন পার এসে খাড়া হয়েছি,—তখন শাওন মাস, চাঁদনী রাত,—ঐ যাহা নোনিয়া অভি বৈঠকে গান গাতা হায়, ঐ পাত্থরকা উপর দিদিমণি——"

অর্চ্চনা দাওয়ার চেটাইখানির উপর আসিয়া বসিল এবং একবার সেই পাথরখানার দিকে চাহিয়া কহিল,—"পাথরখানার উপর কি দেখলি?"

"পাত্থরকা উপর সাদা দুধকা মাফিক লুগা পিনকে, এই এৎনাতক্ ঘোমটা দে কে—"

নোনিয়ার মা'র মুখের বাকী কথাগুলি বাহির হইবার পূর্ব্বেই ঝরণার দিক হইতে একটি প্রৌঢ়বয়স্কা স্ত্রীলোক সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দাঁড়াইবামাত্রই নোনিয়ার মা দাওয়ার উপর উঠিয়া গিয়া তাহার সদ্য-ভাঙ্গা আটা হইতে প্রায় অর্দ্ধসের আন্দাজ আটা কাপড়ে করিয়া তুলিয়া আনিয়া স্ত্রীলোকটীর হাতের একখানি পিতলের সরার মধ্যে ঢালিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীলোকটি যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই আবার চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে অর্চ্চনা জিজ্ঞাসা করিল—"কে নোনিয়ার মা?"

"ল্যাণ্ডোহরি বাবুকা লেড়কী, দিদিমণি; তোমাদের বাঙ্গালী আছে।"

অতঃপর অর্চ্চনার জিজ্ঞাসার উত্তরে সে আঙ্গুল বাড়াইয়া ঝরণার পরপারে অদূরে একটি অতি ক্ষুদ্র মঠ দেখাইয়া কহিল, "—ওহিখানে ও থাকে।" তার পর নন্দহরি বাবুর এই লেড়কীর পরিচয়ে সে তাহার সম্বন্ধে হিন্দী ও বাঙ্গলায় মিশাইয়া যাহা বলিল, সংক্ষেপতঃ তাহা এই:—

বহুকাল আগে বাঙ্গলা দেশ হইতে নন্দহরি বাবু এই গিরিডিতে আসেন এবং অভ্রের কাজে খুব ধনী হইয়া পড়েন। তাঁর ছেলে ছিল না, একটি শুধু মেয়ে। খুব গরীবের ঘরে মেয়েটির বিবাহ দিয়াছিলেন। নন্দহরি বাবু জামাইটিকে কাছে রাখিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই শ্বশুরের কাছে সে থাকিতে রাজি হয় নাই। তাই শুধু তিনি মেয়েটিকেই নিজের কাছে রাখিতেন, জামাইয়ের কাছে কখন তাহাকে পাঠাইতেন না। ঐ যে গির্জ্জার কাছে উস্রি নদীর ধারে রাজবাড়ীর মত মস্ত বাড়ী, ঐ ছিল তাঁহার বাড়ী। তার পরে, একবার জামাইয়ের খুব কঠিন ব্যায়রাম হয়, তখন সে তাহার শেষ সময় বুঝিতে পারিয়া, শ্বশুরবাড়ীতে তাহার স্ত্রীর কাছে চলিয়া আসে। কিন্তু নন্দহরি বাবু তাহাকে বাড়ীতে ঢুকিতে না দিয়া ফটক হইতেই

তাড়াইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে নন্দহরি বাবুর মেয়েও বাড়ী হইতে চলিয়া আসে। ঐ যেখানে এখন মঠটা রহিয়াছে, ঐখানে কেষ্ট কাহারের তখন ঘর ছিল। কেষ্ট ছিল নন্দহরি বাবুর অভ্রের কারখানার আগেকার চাকর। সংসারে তাহার কেহ ছিল না। নন্দহরি বাবুর মেয়ে তাহার স্বামীকে লইয়া কেষ্টর ঐ বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইল। তার পর স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য সে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু স্বামী তাহার বাঁচিল না। মেয়েও আর বাপের কাছে ফিরিল না। অনেক চেষ্টা করিয়াও নন্দহরি বাবু মেয়েকে আর নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারেন নাই। তার পর অনেক দিন পরে কেষ্ট কাহার মরিয়া গেল। সে কিছু টাকা জমাইয়াছিল, সেইগুলি নন্দহরি বাবুর মেয়েকে সে দিয়া যায়। সেই টাকা দিয়া নন্দহরি বাবুর মেয়ে ঐখানে ঐ ছোট্ট মঠটি তোলে। ঐ সেই নন্দহরি বাবুর মেয়ে। এখনও পর্য্যন্ত ঐখানেই সে একলা বাস করিতেছে।

ইতিমধ্যে কখন যে সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ছাইয়া গিয়াছিল, গল্প শুনিতে শুনিতে অর্চ্চনার সে দিকে লক্ষ্যই ছিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া অর্চ্চনা কহিল—"সেই নন্দহরি বাবু এখনও আছে?"

"না দিদিমণি, সে বহুত রোজ মারা গিয়েছে। তার বাড়ী-ঘর, পয়সা-টাকা, সব গিয়েছে—কুচ্ছুভি নেই।"

"আচ্ছা, নন্দহরি বাবুর মেয়ের কি ক'রে চলে?"

"পাগল ছাগল মানুষ, দিদিমণি, ভগওয়ান কই ফিকিরসে চালিয়ে দেন।"

"ও কি পাগল?"

"আদ্মি মরবার পর ওর খুব বেমার হয়, তার পর থেকেই মাথা খারাপ হোয়ে গেছে। আমার কাছে কভি কভি আসে, চারটি চারটি আটা হামি ওকে দিয়ে দি।"

এতদিন অর্চ্চনা এখানে আসিয়াছে, অথচ এই নন্দহরি বাবুর মেয়েকে ইতিপূর্ব্বে কোনও দিন সে দেখে নাই।

উঠানের মধ্যে নামিয়া আসিয়া অর্চ্চনা একবার তাহার ওপারের সেই ক্ষুদ্র মঠটির দিকে চাহিয়া দেখিল। অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, শুধু নোনিয়ার সঙ্গীতের ধ্বনি তখনও সেই পাথর-খানার দিক হইতে তাহার কাণে আসিতে লাগিল।

"নোনিয়ার মা?"

"কি দিদিমণি?"

"আমায় একটু দাঁড়াবি? কেন তোর গল্প শুনতে গেলুম, দেখ না কি রকম অন্ধকার!"

"চল আমি দাঁড়াচ্ছি,—তোমার বড্ড ডর, দিদিমণি।"

"হ্যাঁ লো, এই রকম অন্ধকারে তোর ডর্ করে না?"

পরদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর, অর্চ্চনা খিড়কীর দরজা খুলিয়া ধীরে ধীরে নোনিয়ার মা'র উঠানে গিয়া দাঁড়াইল এবং সেখান হইতে এক পা এক পা করিয়া চলিয়া ঝরণার ধারে আসিল। একবার সেই বড় পাথরখানির দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া ঝরণার জলে নামিয়া পড়িল; কি জানি, সাদা ধবধবে কাপড় পরিয়া, বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়া, শ্রাবণের সেই জোৎস্নারাতে নোনিয়ার মা যাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, এখনও পাথরখানার উপর তাহার কোন মায়া আছে কি না, কে বলিতে পাবে। পাথরখানির দিকে অর্চ্চনা আর চাহিয়া দেখিল না। সে বরাবর ঝরণা পার হইয়া ও-পারের সেই মঠের দিকে চলিল।

খানিক পরেই সে মঠের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল এবং খোলা দরজা দিয়া দেখিল ভিতরে সেই স্ত্রীলোকটি মেঝের উপর শুইয়া রহিয়াছে। অর্চ্চনাকে দেখিতে পাইয়াই সে হাতছানি দিয়া ডাকিল এবং অর্চ্চনা মঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, তাহাকে বসিতে বলিয়া কহিল,—"ভাল আছ ত, বোন্? তোমরা আর ক'দ্দিন এখানে থাকবে?"

অর্চ্চনা মেঝের একধারে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"আমাকে আপনি জানেন?"

"তোমরা ঐ 'শিব-নিবাসে' এসে রয়েছ ত? বাবা তোমার সেরেছেন? ঐ নোনিয়ার মা'র কাছেই তোমাদের কথা শুনিয়াছি।"

"হ্যাঁ দিদি, বাবা একটু সেরেছেন।"

"সারবে বৈ কি। তোমার মত সতী-লক্ষ্মী পবিত্র মেয়ে যাঁর, তাঁকে কি কখনও অসুখে ভোগাতে পারে? ভালর যে ভগবান্ আছে বোন্।"

অর্চ্চনা বুঝিতে পারিল না, কাল কেন ইহাকে নোনিয়ার মা 'পাগল' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। বরঞ্চ কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর অর্চ্চনা জানিল যে, এই সৌভাগ্যবঞ্চিতা, দীনহীনা রমণীটি শিক্ষায় দীক্ষায় স্ত্রী-জাতির আদর্শস্বরূপা। প্রায় এক

ঘণ্টাকাল ধরিয়া স্ত্রীলোকটি অর্চ্চনার সহিত নানা-বিষয়ে কথা কহিল,—ধর্ম্মের কথা, সমাজের কথা, নারীর কর্ত্তব্যের কথা, প্রেম ও ভক্তির কথা, শ্রীচৈতন্যের আদর্শ, রাধাকৃষ্ণের লীলাতত্ত্ব;—অর্চ্চনা তাহার সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও, তন্ময় হইয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল। তাহার পর এক সময়ে শীতের স্বল্পপ্রাণ বেলার দিকে চাহিয়া দেখিয়া অর্চ্চনা যখন গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন স্ত্রীলোকটি কহিল,—"আচ্ছা বোন, বেলা গেছে, এস আজ। যদ্দিন এখানে থাক, তোমার এই গরীব দিদির কাছে এসো মাঝে মাঝে। আমার বড় একটা কোথাও বেরুবার উপায় নেই, ভাই। বাপ নেই, মা নেই, ভাই-বোন নেই, শ্বশুর-শাশুড়ী-দেওর-ননদ নেই, শুধু আমাদের স্বামি-স্ত্রীর সংসার, তাও ছেলের কোন ঝক্কিই নেই, তবু ভাই এক তিল কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে থাকতে পারি না। কি জানি, কখন কোন্ সময় হয় ত এসে পড়বেন, ঘরে আমায় দেখতে পাবেন না।"

"কে দিদি?"

কাণের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া স্ত্রীলোকটি ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল,—"তোর ভগ্নীপতি,"—বলিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তেই কহিল,—"এমন লোক, কবে যে আসবে, ঠিক ক'রে কিছুই বলে যায় নি। তাই আমারও আর ঘর ছেড়ে বেরোন হয় না। বল্ না ভাই, বেরোতে পারি?"

এইবার অর্চ্চনা নোনিয়ার মা'র কালকের কথা কতকটা বুঝিতে পারিল। সে গোটা পাঁচেক টাকা সঙ্গে আনিয়াছিল। আঁচল হইতে তাহা খুলিয়া তাহার হাতে দিতে যাইতেই সে কহিল,—"টাকা নিয়ে কি করব, সে এই টাকা-কড়ি নিয়ে ফিরে এসে পড়লো ব'লে। টাকার কি আমার অভাব ছিল? বাপের কুবেরের সম্পত্তি, দু'হাত দিয়ে ঠেলে চ'লে এসেছি। ওরে, তার কাছে আবার টাকা?"—বলিয়া হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্ত পরেই বাহিরের দিকে চাহিয়া যেন একদৃষ্টে কি দেখিতে লাগিল।

অর্চ্চনা টাকা কয়টি জোর করিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল,—"আজ আসি, আবার সময় পেলেই আসবো। তোমার একটু পায়ের ধূলো আমার মাথায় দাও ত, দিদি।" নুইয়া পড়িয়া অর্চ্চনা তাহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। স্ত্রীলোকটি আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল,—"মাথার ঐ সিঁদুর তোমার অক্ষয় হোক বোন্; রাজরাণী হয়ে স্বামি-পুত্তুর নিয়ে ঘর-সংসার কর।" অর্চ্চনা কিছু একটা বলিতে যাইয়া সামলাইয়া লইল এবং সে দিনের মত বিদায় লইয়া তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অর্চ্চনা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন ভবতোষ বাবু, নেপাল ও অক্ষয় বাবু নামে এখানকার একটি ডাক্তার, তিন জনে বসিয়া কি একটা কথার আলোচনা সম্পর্কে বাহিরের ঘরখানিকে মুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবু প্রবীণ চিকিৎসক, বহুদিন হইতেই গিরিডিতে আছেন, নিকটেই তাঁহার বাটী। সময় পাইলেই তিনি ভবতোষ বাবুর নিকট আসেন, গল্প-আলাপ করেন, চা খা'ন এবং তাঁহার শারীরিক ও অন্যান্য সংবাদ লইয়া চলিয়া যান।

অর্চ্চনা দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই, অক্ষয় বাবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কোথায় যাস্, বল্ ত মা? বাবা তোর ঠাকুরকে ডেকে চায়ের কথা বলছিলেন। আমি বললুম,—মা-লক্ষ্মী আমার আসুক, তার হাতের চা না খেলে আমার তৃপ্তি হবে না।"

অর্চ্চনা আর না দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ভিতরে চলিয়া গেল এবং কিছু পরেই তিন কাপ চা তৈয়ারী করিয়া যখন পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন অক্ষয় বাবু জীবের ভাগ্য সম্বন্ধে যে কথা একটু আগে তুলিয়াছিলেন, তাহারই অনুসরণ করিয়া কহিলেন,—"এই দেখুন না কেন, এই গিরিডিতে বাঙ্গালীর মধ্যে ল্যাঙোহরি আর আমি প্রায় এক সময়েই আসি। উঃ, সে কি আজকের কথা। তখন গিরিডির নামই কেউ জানতো না। কিন্তু সে কথা যাক, ভাগ্যের ব্যাপারটা দেখুন একবার। একই সময়ে দু'জনে এলুম। আমি ত রীতিমত পয়সা-কড়ি কিছু সম্বল নিয়েই এসেছিলুম, কিন্তু ল্যাঙোহরি এখানে এসেছিল চৌদ্দগণ্ডা পয়সা হাতে ক'রে। তার পর সেই ল্যাঙোহরি সতের বছরের ভেতর পাঁচ সাত লাখ টাকার মালিক হয়ে গেল, আর আমি—যে অক্ষয় ডাক্তার, সেই অক্ষয় ডাক্তার,—তখনও যে ঘাস-জল—এখনও সেই ঘাস-জল। করবার মধ্যে ঐ বাড়ীটুকুই যা করতে পেরেছি, আর ঐ হাজার

দশেক টাকার লাইফ্ ইন্‌সিওর। একে ভাগ্য বলব না ত কি বলব বলুন ?"

নেপাল জিজ্ঞাসা করিল,—"ল্যাণ্ডোহরি কথার মানে কি ?"

অক্ষয় ডাক্তার কহিলেন,—"ওঁর নামটা হ'ল নন্দহরি, এখানকার হিন্দুস্থানীরা ওঁকে 'ল্যাণ্ডোহরি' ব'লে ডাকত।"

অর্চ্চনা কহিল,—"তাঁর মেয়েটি ও-পারের ঐ ছোট মঠটিতে রয়েছেন না ?"

"হ্যাঁ ; ঐ কালী মেয়েটিই ছিল ত ল্যাণ্ডোহরি বাবুর ঘরের লক্ষ্মী। কালীও বাপকে ছেড়ে এল, আর লক্ষ্মীও যেন সংসার ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেলেন। আশ্চর্য্য মশাই, অত যে টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন ভানুমতীর বাজির মত কোথায় উড়ে গেল !" এই সূত্রে অক্ষয় বাবু নন্দহরি বাবুর মোটামুটি একটা ইতিহাস বর্ণনা করিয়া শেষে কহিলেন,—"কিন্তু বলিহারি যাই এই কালীকে, অমন স্বামিভক্তি মশাই, আমার এতটা বয়সে খুবই কম দেখেছি। একটু মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এই সে দিন পথে দেখা হ'ল, বললুম— সত্যনারায়ণের কথা শুনতে আসিস কালী, প্রসাদ নিয়ে যাস। তা মুখ সিঁটকে জবাব দিয়ে গেল— 'আমার যে সত্যিকারের নারায়ণ, সে আমার স্বামী, সে আমার ঘরে, সে আমার বুকে, তোমাদের ও মিথ্যে নারায়ণ, ও সবের কথা শোনবার আমার কোন দরকার নেই'—বলেই একটু হেসে হন্-হন্ ক'রে চ'লে গেল।"

ভবতোষ বাবু অন্যমনস্ক হইয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ কথাটা শুনিয়া কহিলেন,— "পাগলের মুখের কথা হলেও আদর্শ স্বামিভক্তি বটে। এ জিনিষটা আমাদের দেশ ছাড়া জগতের আর কোন দেশে নেই, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ক্রমেই আদর্শটা নষ্ট হয়ে আসছে।"

অক্ষয় বাবু কহিলেন,—"তা সত্যি, তবে এ বিষয়ে আমার মত একটু অন্য রকম, ভবতোষ বাবু। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তি খুবই যে ভাল, সন্দেহ নেই ; কিন্তু অন্ধভাবে অচলা ভক্তি, তার দোষ-গুণ দেখব না, তার উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা দেখব না— সেই 'রাখিলে রাখিতে পার, মারিলে মারিতে পার' গোছ হয়ে থাকা, সেটা যেন আমার কাছে কেমন কেমন ঠেকে। অর্থাৎ, লক্ষহীরার আদর্শকে আমি কোনমতেই আমল দিতে চাই না।"

ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"স্ত্রী যদি স্বামীকে মনে প্রাণে দেবতা বলেই জ্ঞান করে, তা হলে সে দেবতা, কি করে, না করে, স্ত্রীর তা দেখবার কোন দরকার নেই, তার ভাল-মন্দ বিচার করবারও কোন অধিকার সে রাখে না, সে শুধু তার সেই দেবতাকে সেবা ক'রেই, আর তুষ্ট রেখেই ধন্য হয়।"

"কিন্তু সব স্বামীই ত দেবতা নয়, আর মেয়েমানুষও মানুষ ; সুতরাং তারা যে নির্ব্বিচারে পুরুষের পায়ের তলায় মুখটি বুজে যুগ যুগ ধ'রে দাসী হয়ে প'ড়ে থাকবে, এতে সমাজের বা দেশের যে কি কল্যাণ, তা ত আমার মাথায় আসে না।"

অক্ষয় বাবুর কথাগুলি অর্চ্চনার কাণে বিষ ঢালিতেছিল। এই আলোচনাকে বন্ধ করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সে কহিল,—"মাথায় আপনার কিছুই আসে না, কাকাবাবু, আর এলেও সব ভুলে যান। উস্রি-প্রপাত দেখবার জন্যে একটা গাড়ীর কথা, তা'ও নিশ্চয়ই ভুলে ব'সে আছেন ?"

"না মা-লক্ষ্মি, ভুলি নি ; সেই খবর দেবার জন্যেই ত আজ এসেছিলুম। খুব ভাল গাড়ীরই ঠিক করেছি। ভাড়াও সুবিধে হয়েছে।"

"যাবার আসবার ভাড়া ঠিক করেছেন ত ?"

"হ্যাঁ ; যাবার আসবার ভাড়া হচ্ছে সাড়ে চার টাকা। কাল বারোটা একটার ভেতরেই সে গাড়ী নিয়ে আসবে, তোমরা সব তৈরী হয়ে থেকো।"

কিছু পরেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল, অক্ষয় ডাক্তার সেদিনকার মত বিদায় লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উস্রি জলপ্রপাত দেখিতে যাইবার জন্য পরদিন গাড়োয়ান যখন গাড়ী লইয়া আসিল, তখন বেলা প্রায় দেড়টা। অর্চ্চনা সকাল হইতেই সকলকে তাড়া দিয়া কাজকর্ম্ম সব শেষ করিয়া রাখিয়াছিল এবং নিজেও প্রস্তুত হইয়া গাড়ী আসিবার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। গাড়োয়ানের ডাক কাণে পৌঁছিবামাত্রই অর্চ্চনা তাড়াতাড়ি অক্ষয় ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিবার জন্য কেষ্টকে পাঠাইয়া দিয়া বাহিরের দিকের বারান্দায় আসিয়া দেখিল যে, অক্ষয় ডাক্তার আপনা হইতেই আসিয়া পড়িয়াছে এবং ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গাড়োয়ানের সঙ্গে কি সব কথা বলিতেছে।

বামুন ঠাকুরকে বাড়ী চৌকি দিবার জন্য রাখিয়া, মিনিট পনর কুড়ির ভিতর সকলে গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

উস্রি জলপ্রপাত-সংলগ্ন সেই বিশাল পার্ব্বত্য ভূমির নিম্নদেশে, যে স্থানটায় গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে হয়, এইখান হইতে সেই স্থানটি নয় দশ মাইলের কম নহে। পচম্বার বড় রাস্তা অতিক্রম করিয়া গাড়ী প্রথমে ষ্টেসনের রাস্তায় এবং পরে তাহাও পার হইয়া, বড় কয়লাখাদের পার্শ্ব দিয়া উস্রির সড়কে আসিয়া পড়িল। এই দীর্ঘ পথটি অশ্বযুগলের বিশেষরূপই পরিচিত ছিল। শোণপুর হরিহরছত্রের মেলা হইতে এই গিরিডিতে আসিয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত অসংখ্যবার এই পথটি তাহাদের পাড়ি দিতে হইয়াছে, তাই চির-পরিচিত এই পথটিতে আসিয়া পড়িবার পরই তাহারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিল যে, তাহাদের আজিকার যাত্রা অল্পে শেষ হইবার নহে, তাহা যেমন সুদূরের, তেমনই দীর্ঘকালব্যাপী। সুতরাং যে উৎসাহে এবং বেগে এতক্ষণ তাহারা ছুটিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে হঠাৎ তাহাতে ভাটা পড়িয়া গেল।

পথ অতিমাত্রায় বন্ধুর, সুতরাং দুর্গম। কোথাও বালু-কঙ্করময় পথ প্রস্তরময় ভূমির মধ্য দিয়া একেবারে খাড়াইয়ের উপর উঠিয়াছে, আবার কোথাও বা তাহা ঢালু হইয়া একেবারে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। কোনও স্থানে মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া, কোনও স্থানে বনভূমি অতিক্রম করিয়া, কোথাও বা ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় ঝরণার পার্শ্ব দিয়া, কোথাও বা সাঁওতাল-পল্লীর ভিতর দিয়া, মুহুর্মুহুঃ সারথির কশাঘাত উপভোগ করিতে করিতে রথাশ্বযুগল শম্বুকনীতি অবলম্বন করিয়া মন্থরগতিতে গন্তব্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এক স্থানে দুই পার্শ্বের প্রস্তরময় প্রান্তরমধ্যে একই জাতীয় অসংখ্য বন্য বৃক্ষের চারা জন্মিয়া সমগ্র প্রান্তরকে সবুজবর্ণে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল। সেই স্থান হইতে প্রায় মাইল দুই ব্যাপী এক নিবিড় অরণ্য সুরু হইয়াছিল। গাড়ীখানি এই অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেই হঠাৎ সকলে একটা অস্বাভাবিক শৈত্যানুভব করিল। এই বনভূমি অতিক্রম করিয়াই গাড়ীখানি ক্রমশঃই অল্প অল্প করিয়া উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। তথায় বন্ধুর পার্ব্বত্য ভূমির উপর দিয়া যেন ক্রমাগত তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে এবং সম্মুখের দিকে সেই ভূ-তরঙ্গ যেখানে আসিয়া শেষ হইয়াছে, তাহার পর হইতে সুদূর-বিস্তৃত উচ্চ ভূমি, ঘন-সন্নিবিষ্ট অসংখ্য বন্য বৃক্ষ বক্ষে ধারণ করিয়া যেন তপস্যারত মহর্ষির ন্যায় যুগ যুগ ধরিয়া পরম গাম্ভীর্য্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারই নিম্ন-দেশে একস্থানে কয়েকটি শাল ও দেবদারু গাছের তলায় আসিয়া অশ্বযুগল যখন আপনা হইতেই থামিয়া দাঁড়াইল, তখন অক্ষয় ডাক্তার অর্চ্চনার দিকে চাহিয়া কহিল,—"এইখানেই নেমে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে মা, গাড়ী আর যাবে না। মাইলখানেক পথ হবে, চলতে পারবি ত ?"

বরষার বৃষ্টিধারা এবং আকাশের ঘনান্ধকারের মধ্যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া যাহার চিত্ত তন্ময় হইয়া পড়িত, সেই অর্চ্চনা পার্ব্বত্য প্রদেশের মহান্ ও গাম্ভীর্য্যময় দৃশ্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল, অক্ষয় ডাক্তারের প্রশ্ন তাহার কর্ণেই পৌঁছাইল না, সে শুধু চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সকলের অনুসরণ করিয়া চলিল মাত্র।

যেখানে উস্রির বিশাল জলধারা উচ্চ পর্ব্বতমালা হইতে ভীম-গর্জ্জনে নিম্নে প্রস্তররাজির উপরে অবিরাম পড়িতেছে, সেইখানে আসিয়া অর্চ্চনা একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের উপর বসিয়া পড়িয়া ভবতোষ বাবুর দিকে চাহিয়া কহিল,—"কি সুন্দর, কি চমৎকার! এ দেখলে আর ক্ষিদে-তেষ্টা পায় না বাবা, ঘরের কথা আর মনে থাকে না, মনে হয়, দিন-রাত এইখানে ব'সে ব'সে শুধু এই দেখি।"

অক্ষয় ডাক্তার কহিল,—"তবে এই দেখেই তুই পেট ভরা বেটী, আমাদের সব ক্ষিদে পেয়ে গেছে, আমরা ষ্টোভ জ্বালিয়ে একটু চায়ের যোগাড় করি।"

"সত্যিই কাকা বাবু, পেট ভরুক না ভরুক, মন ভ'রে যায় বটে, পেটের কথা আর মনেই থাকে না"—বলিয়া অর্চ্চনা একদৃষ্টে ও একান্তমনে শৈলরাজিমধ্যস্থ জলপ্রপাতের সেই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল এবং প্রায় মিনিট পনের পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল,—"কাকা বাবু, এইবার আপনাদের চা ক'রে দি।" কিন্তু ফিরিয়া দেখিল, ঠিক তাহার পার্শ্বে যাহারা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারা তাহার কাকা বাবু নহে, বাবাও নহে, তাহারা অপর ব্যক্তি, তাহাদেরই মত দর্শক দুই চারি জন স্ত্রী-পুরুষ। তাহার কাকা বাবু প্রভৃতি তখন অদূরে, যেখানে প্রপাতের ফেনময় জল-স্রোত

উপলরাশি ভেদ করিয়া নিম্নমুখে নদীর আকারে বহিয়া যাইতেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া কি যেন দেখিতেছেন।

অর্চ্চনাও সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, সম্মুখে পরপারে জলের উপর হইতেই কয়েকটি বৃহদাকার প্রস্তর একসঙ্গে গায়ে গায়ে থাকিয়া বহু উচ্চে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের পৃষ্ঠদেশে খড়ি, পেন্সিল, কয়লা বা অন্য কিছু দিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গলায় অসংখ্য নাম লেখা রহিয়াছে। জলপ্রপাত দেখিতে আসিয়া দর্শকদের দ্বারাই এই সমস্ত নাম লিখিত হইয়াছিল। নেপাল সঙ্কীর্ণ জলস্রোত হাঁটিয়া পার হইয়া গেল এবং পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি লাল-নীল পেন্সিল বাহির করিয়া এক স্থানে তাহার নিজের নাম মোটা মোটা করিয়া লিখিয়া রাখিল। তাহার দেখাদেখি অর্চ্চনাও সন্তর্পণে সেই স্থানে গিয়া পৌঁছিল এবং নেপালের হস্ত হইতে পেন্সিলটি চাহিয়া লইয়া কহিল,—"আসল জিনিসটাই লিখলেন না? সন তারিখটা লিখতে হয়, যদি আবার কখনও আসি, তা হ'লে—।" বলিতে বলিতে নেপালের নামের পার্শ্বে তাহার নিজের নামটি লিখিয়া নীচে সেই দিনের তারিখ ও সন লিখিয়া দিয়া কহিল,—"কিন্তু বর্ষার বৃষ্টিতে নামগুলো ত সব মুছে যায় নি, ঠিক রয়েছে, নেপাল বাবু।"

নেপাল উপরের দিকে দেখাইয়া কহিল,—"দেখছেন না, এখানে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা লাগবার কোনই উপায় নেই।" কিন্তু তাহা দেখিবার পূর্ব্বেই ভবতোষ বাবুর ডাকাডাকিতে উভয়কে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে হইল এবং একটি সুবিধামত স্থানে গিয়া অর্চ্চনাকে চায়ের যোগাড়ে মনোযোগ দিতে হইল।

সামান্য কিছু জলযোগের সহিত সকলের যখন চা খাওয়া শেষ হইল, তখন সূর্য্য অস্ত না গেলেও, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-পরিবৃত নিভৃত শৈলশিখরদেশে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া সকলে ফিরিবার পথে যাত্রা করিল এবং সেই প্রায়ান্ধকারে দুর্গম পথাতিক্রম করিয়া যখন সকলে গাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিল, তখন কৃষ্ণপক্ষের ঘোরান্ধকারের মধ্যে পথ, প্রান্তর, আকাশ, কানন, সব হারাইয়া গিয়াছিল। অপর যাহারা সব আজ জলপ্রপাত দেখিতে আসিয়াছিল, সকলেই বহু পূর্ব্বে ফিরিয়া গিয়াছে, তাহারাই সর্ব্বশেষে পড়িয়াছে। এজন্য গাড়োয়ানের নিকট হইতেও কিছু অনুযোগ আসিল, যথা,—পথ অত্যন্ত বিশ্রী, তাহাতে বিকট অন্ধকার, জন্তু-জানোয়ারের ভয়টাকেও একবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা হউক, সেই বিকট অন্ধকারে শকটের ক্ষুদ্র আলো দুইটি ভরসা করিয়া গাড়োয়ান তাহার গাড়ী ছাড়িয়া দিল এবং ফিরিবার পথে ঘরমুখী হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় যথাসম্ভব দ্রুতবেগে সেই নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিল।

প্রায় ক্রোশ দুই আড়াই পথ আসিবার পর, যে স্থলে সড়কের উভয় পার্শ্বে সেই একই জাতীয় অগণিত বন্যবৃক্ষের চারা জন্মিয়া দুই দিকের দূর-ব্যাপী প্রান্তরকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, সেইখানে আসিয়া অশ্বযুগল একবারে দাঁড়াইয়া পড়িল। কয়েক ঘা চাবুকের উপর চাবুক আসিয়া পড়িলেও তাহারা ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না এবং অগ্রসর হইবার পরিবর্ত্তে যখন তাহারা ক্রমাগতই পিছনের দিকে হঠিতে সুরু করিল, তখন অক্ষয় ডাক্তার ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হ'ল রে?" গাড়োয়ান অনুচ্চকণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করিয়া জবাব দিল,—"বাত-চিজ্ করবেন না বাবু—বাঘ দেখা হায়।"

বাত-চিজ আপনা হইতেই সকলের বন্ধ হইয়া গেল এবং 'দেখা হায়'টা ঠিক যে কোথায়, অর্থাৎ খুব নিকটে কিম্বা একটু দূরে, সেই কথাটা জানিবার জন্য যদিও সকলেরই মনে একটা প্রবল ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু কণ্ঠ হইতে কাহারই আর কথা বাহির হইল না এবং সকলেই আড়ষ্ট হইয়া শুধু একটা বিকট হুঙ্কারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু অর্চ্চনা কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়াও থাকিতে পারিল না। জানালার বন্ধ পাখীর কাছে মুখ লইয়া গিয়া চাপাকণ্ঠে সে গাড়োয়ানের উদ্দেশে কহিল,—"তোম্ নিজে কিছু দেখতে পাতা হায়?" তেমনই ফিস্ ফিস্ করিয়া গাড়োয়ান কহিল,—"চুপসে ঠায়রো মায়জি, আঁধারকো ভিতর দোঠো আঁখ জলতা মালুম হোতা হায়।"

ভবতোষ বাবু কন্যাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। অক্ষয় ডাক্তার গাড়ীর দরজা-জানালাগুলি ভাল করিয়া বন্ধ আছে কি না, আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। নেপাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এতক্ষণ একটি কোণে হেলান দিয়া বসিয়াছিল,

এক্ষণে হঠাৎ নড়িয়া উঠিল এবং নিজের আলোয়ানটিকে তাল পাকাইয়া তাহাতে ষ্টোভের সমস্ত কেরোসিনটুকু ঢালিয়া, পকেট হইতে দিয়াশলাইটি হাতে করিয়া বসিল, উদ্দেশ্য—বাঘ আসিয়া পড়িলে, তাহাতে অগ্নি-সংযোগ দ্বারা হঠাৎ এমন একটা প্রবল আলোকের সৃষ্টি করিবে, যাহা দেখিয়া আগন্তুক সঙ্গে সঙ্গেই পিছু ফিরিয়া পলাইতে বাধ্য হইবে। অক্ষয় ডাক্তার অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—"সকলের কাছে এক একটা ছাতা থাকলে এ সময় অনেকটা কাজে লাগতো।" ভবতোষ বাবু স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী ছিলেন, তিনি কহিলেন,—"ভগবানের নাম ছাড়া বিপদের সময় কিছুই কাজে লাগে না অক্ষয় বাবু, তাঁর ভরসাই ভরসা।" অর্চ্চনা চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া কিছু একটা সেও বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সকলের সকল পরামর্শ ও আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিয়া সহসা একটা প্রচণ্ড শব্দে গাড়ীখানি আন্দোলিত হইয়া উঠিল এবং চক্ষুর নিমিষে তাহা পাক খাইয়া ঘুরিয়া গিয়া যে পথে এতক্ষণ আসিয়াছিল, সেই উস্রির পথেই আবার তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। গাড়ীর ভীষণ বেগ ও ঝাঁকানিতে ভিতরের আরোহীদের প্রাণ কণ্ঠাগতপ্রায় হইয়া পড়িল এবং সকল শব্দকে ছাপাইয়া তখন অর্চ্চনার ভয়কাতর কণ্ঠস্বর শুধু শুনিতে পাওয়া গেল,—"এর চেয়ে যে বাঘে খাওয়া ছিল ভাল; এই গাড়োয়ান, কেয়া করতা হায় উল্লুক, জলদি গাড়ী থামাও।" কিন্তু থামাইবে কে? তখন অশ্বযুগলকে সংযত করা গাড়োয়ানের পক্ষে সম্ভবও নয়, কর্ত্তব্যও নয়, সুতরাং জল্দী ত গাড়ী থামিলই না, বরঞ্চ সেই সূচীভেদ্য অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া যেরূপ দুর্দ্দমনীয় বেগে প্রাণপণ করিয়া তাহারা ছুটিতেছিল, সেই ভাবেই তাহারা ছুটিয়া চলিল এবং আরোহীদের প্রতিক্ষণেই তখন মনে হইতে লাগিল যে, গাড়ীর লোহা-লক্কড় কাঠ-কব্জা সবই বুঝি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে এবং এইবার তাহারাও একস্থানে হাত-পা-মাথা ভাঙ্গিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িবে! হয় ত বা বাঘটা তাহাদের গাড়ীর পিছনে পিছনেই তাড়া করিয়া আসিতেছে এবং তাহারা ছিট্‌কাইয়া পড়িলেই সে আসিয়া সকলকেই একসঙ্গে দখল করিয়া বসিবে।

এই ভাবে আন্দাজ বিশ মিনিটকাল ছুটিয়া হঠাৎ যে যায়গাটিতে আসিয়া গাড়ীখানি একেবারেই থামিয়া পড়িল, তাহা পথ, কি মাঠ, কি বন, কি বৃক্ষতল, কিম্বা রসাতল, কিছুই কেহ ঠিক করিতে পারিল না। কিছুকালের জন্য জড়ের ন্যায় সকলে বসিয়া রহিল এবং তাহার পর অক্ষয় ডাক্তার একদিককার জানালার পাখী একটুখানি তুলিয়া ধরিলে যখন একটুখানি ক্ষীণ আলোর রেখা চিক করিয়া গাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়িল, তখন নেপাল দুই হাতে গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিতেই দেখিল, তাহারা প্রকাণ্ড একটি মাঠের মধ্যে আসিয়াছে এবং সম্মুখে অদূরেই একটি বৃক্ষতলে দুই চারি জন সাধু ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া রহিয়াছে ও তাহাদের গাড়ীখানির দিকে তাকাইয়া পরস্পর কি সব বলাবলি করিতেছে।

এদিকে ভজনগাঁও নামে ক্ষুদ্র একটি গাঁও আছে। উস্রি যাইবার রাস্তা হইতে বাঁ দিকে একটি ফেঁকড়া বাহির হইয়া এই ভজনগাঁওয়ে আসিয়া শেষ হইযাছে। গাড়ীখানি যে স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা এই ভজনগাঁওয়েরই সন্নিকটস্থ একটি মাঠ। প্রতি বৎসর ভজনগাঁওয়ের এই মাঠটির মধ্যে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে একটি মেলা বসে এবং কার্ত্তিক মাসের কয়েক দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া উহা ভাঙ্গিয়া যায়। এবৎসরও যথারীতি ঐ সময়ে মেলা বসিয়া আজ দিন কয়েক হইল শেষ হইয়া গিয়াছে। দোকানপত্র হাট-বাজার সব উঠিয়া গিয়াছে, শুধু গাছতলার ঐ সাধু বাবাজীর আশ্রমটি কোন অজ্ঞাত কারণে এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া নিকটবর্ত্তী গাঁওয়ের অধিবাসীদিগকে আশীর্ব্বাদ ছড়াইতেছে।

গাড়োয়ান গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া অক্ষয় ডাক্তারকে কহিল,—"দেখিয়ে হুজুর, কেয়া তক্‌লিফ! সবের্ সবের্ নেহি ফির্‌নেসে এৎনা ঝঞ্ঝাট হুয়া।"

গাড়ীর বাহিরে মুখ ফিরাইয়া অর্চ্চনা কহিল,—"বাঘ বেরায় ত আমরা কেয়া করেগা? বাঘকে আস্‌তে হামলোক বোল্ দিয়া?"

অক্ষয় ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় গাড়োয়ান কহিল,—"অভ্‌ভি হাম্ কেয়া করে, ওহি বাতলাইয়ে।"

অক্ষয় ডাক্তার গাড়ী হইতে অবতরণপূর্ব্বক একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"কি করবি বাবা, সকলকেই ত আমাদের খুব কষ্ট পেতে হ'ল। গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে আবার চালা। কিন্তু কাছের ঐ গাঁও থেকে দু-দশ জন লাঠিওলা লোক আর আলো—"

"ঘোঁড়ে ত আউর এক পাঁও নেহি চলে গা, ভগদর্ বাব্।"

অর্চ্চনা নামিয়া পড়িয়া সম্মুখস্থ সাধুর আশ্রমের দিকে চাহিয়া কহিল,—"আলবাৎ চলে গা। রাতকো এই তেপান্তর মাঠকা মধ্যে হামলোক রহেগা নাকি? দোস্‌রা ভাল রাস্তা দেকে চলো, ও রাস্তামে আর আমরা কিছুতেই নেহি যায়ে গা!"

কিন্তু রাস্তা দোস্‌রাও আর ছিল না, ভালও ছিল না, যাইতে হইলে ঐ পথ ভিন্ন আর উপায় নাই। আর উপায় থাকিলেও, যাহাদের পায়ে উপায়, তাহারা যে আর এক পাও যাইতে কিছুতেই রাজী হইবে না, গাড়োযানের সে কথাও ধ্রুব সত্য। সুতরাং এই অবস্থা-সঙ্কটে পড়িয়া যখন সকলে মিলিয়া তর্ক-বিতর্ক, পন্থা, কর্ত্তব্য প্রভৃতি লইয়া নিষ্ফল আলোচনা করিতেছিল, তখন অদূরের সেই বৃক্ষতল হইতে সাধুর একজন চেলা সেইখানে আসিয়া কহিল,—"ওহি সাধু মহারাজ আপলোককে আশীর্ব্বাদ করনেকো ওয়াস্তে বোলাতেহেঁ!"

সাধুর আশীর্ব্বাদে যদি তাহাদের আজিকার এ বিপদের কোন কিনারা হয়, এই আশা করিয়া সকলে সম্মুখের সেই বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল। স্থানটির তিন দিক কাপড় ও চট্ ইত্যাদি দ্বারা যথাসম্ভব ঘিরিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সম্মুখের দিকেও একখানি মোটা পর্দ্দা খাটানো ছিল, কিন্তু তখন তাহা ফেলা হয় নাই, সেই দিক দিয়াই ধুনীর ক্ষীণ আলোকটুকু সম্মুখের পথে আসিয়া পড়িয়াছিল। মাথার উপর কতকগুলি গাছের ডালপালা বাঁধিয়া দিয়া তদুপরি খান দুই তিন ছেঁড়া কম্বল বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ভিতরে সাধু মহারাজ পাড়ওয়ালা একখানি বেগুনি রংয়ের চেলির কৌপীন পরিয়া ও মাথায় একটি কাণঢাকা গরম টুপী পরিয়া প্রজ্জ্বলিত ধুনীর ঠিক সম্মুখভাগেই বসিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া একজন চেলা তাঁহার সহিত আলাপে রত ছিল এবং কিঞ্চিৎ দূরে একজন একখানি বড় পিতলের থালায় একতাল আটা মাখিয়া ঠাসিতেছিল এবং তাহারই পার্শ্বে আর একজন একটি বড় য়্যালুমিনিয়ম পাত্রে একরাশ তরকারী কুটিয়া রাখিতেছিল। মধ্যস্থলে হেরিকেনের অল্পালোক ধুনীর আলোর কাছে পরাভব মানিয়া যেন মরমে মরিয়া গিয়া ধুঁয়ার মধ্যে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সম্প্রতি বোধ হয় সকলের চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল, কারণ, পানাবশিষ্ট স্বল্পপরিমাণ পরিত্যক্ত চা-সমেত একটি এনামেলের এবং তিনটি পিতলের বাটি ও সিদ্ধ চায়ের পাতাগুলি এক ধারের একটি জলপূর্ণ বালতির পার্শ্বে অবহেলায় পড়িয়া রহিয়াছিল। বাহিরে দুই একটি সুপুষ্ট সারমেয় এক পার্শ্বে শুইয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিল। কার্ত্তিকমাসের হিমে কিসের লোভে যে তাহারা পল্লী ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর এই আশ্রমে আসিয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, তাহা অন্তর্যামী সাধু মহারাজ ছাড়া আর কাহারও জানিবার উপায় ছিল না।

সকলে ভিতরে প্রবেশ করিলে ভবতোষ বাবু সাধুর সম্মুখে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পায়ের ধূলা লইলেন। তাঁহার দেখাদেখি প্রথমে অর্চ্চনা ও পরে নেপাল ও অক্ষয় ডাক্তারও তদ্রূপ করিল। সাধু মহারাজ ভবতোষ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেয়া রে বেটা, কেয়া হুয়া তেরা সব?"

মহারাজকে সকল কথাই সংক্ষেপে বলা হইল। বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়োয়ান সাধুকে উদ্দেশ করিয়া যোড়-হাতে কহিল,—"লেকেন আজ রাত্‌কো, ঘোড়া মেরা উসি রাস্তেপর কোই সুরতসে নেহি যায়েগা, মহারাজ!"

তখন মহারাজ ভবতোষ বাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"কুচ ডর্ নেহি বেটা, আজ রাতকোয়াস্তে সব হিঁপর ঠার্ যা। সাধুকা আস্তানামে কুচ্ তেরা তক্‌লিফ নেই হোগা, বেটা।"

ভবতোষ বাবু মুখে বিশেষ কিছু না বলিলেও, মনে মনে ভাবিলেন, তক্‌লিফ হোক বা নাই হোক, ইহা ছাড়া অন্য উপায়ও নাই। তিনি অর্চ্চনার মুখের দিকে একবার চাহিলেন, অর্চ্চনা কহিল,—"তাই হোক বাবা, আজ আর ও রাস্তা দিয়ে গিয়ে কাজ নেই।" অক্ষয় ডাক্তারেরও তাহাই মত হইল, নেপালেরও ইহাতে অমত হইল না। সুতরাং তিনি সকলকে লইয়া একখানি কম্বলের উপর বসিয়া সাধু মহারাজের কথা শুনিতে লাগিলেন। কথা সবই তাঁহার নিজের সম্বন্ধেই। কবে দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি দৈবাদেশে সংসার ত্যাগ করেন; এখন তাঁহার বয়স এক শত পনর বৎসর; তাঁহার গুরুদেব আছেন, নর্ম্মদাতীরের কোন্ এক দুর্গম পর্ব্বত-গুহায় তিনি তপস্যায় রত, তাঁহার

বয়ঃক্রম তিন শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; তাঁহার দুইবার দাঁত পড়িয়া গিয়া আবার নূতন করিয়া উঠিয়াছে; ভ্রূর উপর হইতে মাংস ঝুলিয়া পড়িয়া চক্ষু ঢাকা পড়িয়াছে; হাত-পায়ের নখ পাঁচ সাত হাত লম্বা হইয়া গুটাইয়া গিয়াছে; এই বার তিনি দেহরক্ষা করিবেন, তাই সেই নিভৃত স্থানে তাঁহার দর্শনে তিনি যাইতেছেন; তিনি নিজেও এখন যোগে বসিয়া শূন্যের উপর বহুদূর উঠেন; বহুবার তামাকে সোনা করিয়া বিলাইয়া দিয়াছেন; মরা মানুষকে তিনি মন্ত্রের দ্বারা তিন চারদিন অবধি বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথা শেষ করিয়া সাধু মহারাজ একজন চেলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আট্টা আউর ভি লে বেটা, সব কইকো আজ হিঁইপর পরসাদ মিলনে হোগা।"

এ পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আপত্তি আসিলেও সাধুমহারাজ সে কথায় কর্ণপাত মাত্র করিলেন না, সুতরাং আহারাদির আয়োজন ভালরূপই চলিতে লাগিল। তখন অর্চ্চনা এক কোণে যাইয়া তাহার প্রাত্যহিক সান্ধ্য জপে প্রবৃত্ত হইল। সাধুমহারাজ ভবতোষ বাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"ইয়ে লেড়কী তেরা জগদ্ধাত্রী হ্যায়, তেরা উপর ভগ্‌ওয়ান বহুৎ খোস্ হ্যায়, আনন্দ রহো বেটা।"

যাহা হউক, ঘণ্টা দুই তিন পরে সকলকেই কিছু না কিছু প্রসাদ লাভ করিতে হইল। কিন্তু গোলমাল বাধিল, শয়নের ব্যবস্থা লইয়া। ভবতোষ বাবুর রুগ্ন শরীর লইয়া এই মাঠের মধ্যে সন্ন্যাসীর এই বস্ত্রাবাসে সারারাত্রির ঠাণ্ডা লাগান অর্চ্চনা মোটেই পছন্দ করিল না, অথচ অন্য উপায়ই বা কি? অক্ষয় ডাক্তার কহিল,—"অর্চ্চনা আর আপনি দাদা, গাড়ীর ভেতর গিয়ে শুলেই ভাল হয়। দরজা দুটো বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেই দিব্বি কৌটোর মত হবে'খন।"

সাধু মহারাজ কহিলেন,—"আরে কুচ ডর্ মত করো বেটা, এ যায়গা বহুৎ গরম হ্যায়। রাতভোর ধুনী জলতা রহে গা। ওহি দোনা কম্বলকা উপর শো যাও, সবেরেমে উঠকে ফুর্ত্তিসে ঘর চলা যাও গে—ব্যস্।"

তাহাই হইল। সেই ছিন্ন বস্ত্রাবাসের চারি কোণে চারিখানি কম্বল বিছান হইল। দুই খানিতে সাধুমহারাজ ও তাঁহার চেলা-চতুষ্টয় এবং বাকী দুইখানার একখানাতে অর্চ্চনা ও ভবতোষ বাবু এবং অপরখানিতে অক্ষয় ডাক্তার শুইলেন। নেপাল ভবতোষ বাবুর বার বার নিষেধ সত্ত্বেও তাহার আলোয়ানখানি লইয়া গাড়ীর অভিমুখেই যাইল। কিন্তু বাকী আর একজনের কথা এ পর্য্যন্ত কাহারই মনে আসিল না। গাড়োয়ান বহুক্ষণ হইল, সেই যে চারিখানি রুটী, একরত্তি দাল, কিছু তরকারী ও একটু হালুয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর তাহার কোনই সাড়াশব্দই পাওয়া যায় নাই। গাড়ীর ভিতরেই সে আস্তানা গাড়িয়াছে, ইহা মনে করিয়া নেপাল বাহির হইতে তাহাকে ডাকাডাকি করিল; কিন্তু কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিতে দেখিল, তন্মধ্যে কেহই নাই। এই গভীর রাত্রিতে, নির্জ্জন মাঠের মধ্যে সে বেচারা যে কোথায় গিয়া রহিল, ইহাই নেপাল শূন্য গাড়ীর মধ্যে শুইয়া ভাবিতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যাহার দুটা আঁখ সে অন্ধকারে বনমধ্যে জ্বলিতে দেখিয়াছিল, তাহাদেরই কেহ আসিয়া তাহার নিরুদ্বেগ নিদ্রার সুব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য তাহাকে ত লইয়া যায় নাই? সমস্ত রাত ধরিয়া নেপালের চক্ষুতে নিদ্রা আসিল না, আসিল শুধু কতকগুলি বাঘ, ভালুক, নেকড়ে, চিতা, ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব এবং মধ্যে মধ্যে উস্রি প্রপাতের ভৈরব জল-কল্লোল। ইহারা যেন পর পর তাহার নিদ্রাতুর চক্ষুর সম্মুখে অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সমস্ত দেখার ফাঁকে যদি বা কখন তাহার একটু তন্দ্রার মত আসে ত তাহার আলোয়ানের বিকট কেরোসিনের গন্ধে তাহার সে তন্দ্রা তখনই ছুটিয়া যায়।

এই ভাবে সমস্ত রাত নেপালের কাটিয়া যাইবার পর অতি প্রত্যুষে গাড়োয়ানের ডাকাডাকিতে গাড়ীর দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিল, ভবতোষ বাবু, অর্চ্চনা, অক্ষয় ডাক্তার সকলেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছে এবং গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। গাড়োয়ান কোথায় গিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করাতে সে অদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র গাঁওয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কি বলিল, তাহার একটি বর্ণও বুঝা গেল না, শুধু তাহার মুখ হইতে একটা বিশ্রী গন্ধ যাহা বাহির হইল,

তাহার পরিচয় বেশই বুঝা গেল এবং তাহাকে এক্ষণে সশরীরে সম্মুখে দেখিয়া ইহাও বুঝা গেল যে, তাহাকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করে নাই, তাহার পরিবর্ত্তে আর কিছুতে আক্রমণ করিয়াছিল।

যাহা হউক, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই গাড়ী জোতা হইল এবং সকলে সাধু মহারাজকে প্রণাম করিয়া গাড়ীর মধ্যে আসিয়া বসিল। ভবতোষ বাবু মহারাজকে প্রণামান্তে তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় লইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি টাকা অসীম ভক্তির সহিত তাঁহার পদপ্রান্তে ধূলার উপর রাখিয়া আসিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সেই দিন বাসায় ফিরিয়া ভবতোষ বাবুর শরীর একটু খারাপ হইয়া পড়িল। পথে আসিতে আসিতেই তিনি গাড়ীর মধ্যে নিজেকে একটু অসুস্থ বোধ করিয়াছিলেন, তখন সকাল বেলা অল্প অল্প তাঁহার গা-ভার, মাথা-ভার হইয়াছিল। তাহার পর দ্বিপ্রহরের সমস্ত সময়ই শয্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং অপরাহ্ণে তাঁহার বেশ একটু জ্বর প্রকাশ পায়।

অর্চ্চনা চিন্তাযুক্ত হইয়া কহিল,—"আমি যা ভয় করেছিলুম, ঠিক্ তাই হ'ল। কার্ত্তিক মাসের এই হিম, তাতে একেবারে ফাঁকা মাঠের মাঝে, এ কি কখনও এই নতুন শরীরে সহ্য হয়?"

ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"হঠাৎ ঠাণ্ডাটা লেগে জ্বরটা হয়ে পড়েছে, দু'একদিন একটু শুকুলেই যাবে এখন।"

"জানি না বাবা। আমার সে ববাত নয়। ছাই উস্রি দেখতে না গেলেই হ'ত।"

"তুই অরু, একটুতেই একেবারে অধীর হয়ে পড়িস্! সামান্য একটু-খানি জ্বর হয়েছে, তার আর হয়েছে কি?"

অর্চ্চনা আর কোন কথা না বলিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল, মনে মনে বলিল, "তাই যেন হয় ঠাকুর, একটুখানি জ্বর, একটুতেই যেন সেরে যায়।" কিন্তু ঠাকুর তাহার এ নিবেদন শুনিলেন না। পরের দিন জ্বরের আর বিরাম হইল না, বরঞ্চ পূর্ব্বদিনাপেক্ষা বেশী করিয়াই হইল। তৃতীয় দিনে বুকে ও পার্শ্বে অল্প অল্প বেদনা অনুভূত হইল। অক্ষয় ডাক্তার ঔষধ দিতে লাগিল, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। তখন অর্চ্চনা আর এক জন বড় ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিল। তিনি পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—নিউমোনিয়া হইয়াছে এবং দুই পাশই আক্রান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। উভয় চিকিৎসকের মিলিত ব্যবস্থানুসারে রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু রোগের উপশম না হইয়া দিন দিন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিকিৎসকরা দুই জনেই বিশেষরূপ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন, অর্চ্চনার দুর্ভাবনা ও উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না, নেপালের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল।

রোগের দশম দিবসে অক্ষয় ডাক্তারের পরামর্শে মধুপুর হইতে একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জেনকে আনা হইল। তিনি দেখিয়া শুনিয়া কহিলেন যে, চিকিৎসা ঠিকই হইতেছে, তবুও নূতন করিয়া তিনি ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। নেপাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ অবস্থায় রোগীকে আমরা কলকাতায় নিয়ে যেতে পারি কি না?" ইহার উত্তরে তিন জনেই একমত হইয়া কহিলেন,—"কিছুতেই না। এ অবস্থায় নাড়ানাড়ি করলে হয় ত ট্রেণের মধ্যেই কোন বিপদ ঘটতে পারে।"

ইহার মধ্যে এক দিন ভবতোষ বাবু অর্চ্চনাকে কহিলেন,—"মা, গিরিডিতেই আমার মাটী কেনা আছে, এইখানেই আমার শেষ। তোরা এত ক'রেও আর আমায় এবার কিছুতেই ধ'রে রাখতে পারবি না, অরু।"

অর্চ্চনা নীরবে বসিয়া রহিল, নীরবে তাহার চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"মা রে, কাঁদিসনিক। চিরকালই কি তুই আমাকে ধ'রে রাখবি, পাগলী? এক কাজ কর, কাশীতে শান্তকে একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দে, সে একবার এই সময় আসুক। তোর একটা ব্যবস্থা না ক'রে এ অবস্থায় একলা ফেলে রেখে ত আর যেতে পারি না, এর জন্যে শান্ত ছাড়া আর দ্বিতীয় কা'কেও ত খুঁজে পাচ্ছি না, মা।"

শান্তময়ী ভবতোষ বাবুর জ্ঞাতি-ভগিনী। সে বিধবা। বয়স তাহার বছর ত্রিশ বত্রিশের বেশী হইবে না। সধবা এবং বিধবা উভয় অবস্থাতেই সে তাহার শ্বশুরবাটীর কাহারও সহিত কখনও মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে নাই। ফলে স্বামীর

জীবিতকাল পর্য্যন্ত যদিও বা কোনপ্রকারে সংসারের মধ্যে তিষ্টিয়া ছিল, কিন্তু বৈধব্য প্রাপ্ত হইবার পর আর একটি দিনও তথায় সে তাহার অধিকার বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই। পরন্তু শ্বশুরবাটির কেহই আর তাহার বড় একটা খোঁজ-খবর রাখিত না। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য হইতেও সে চিরকাল বঞ্চিত ছিল। একমাত্র ভবতোষ বাবুর সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই এ যাবৎ তাহার কাশীবাসের দিন কাটিয়া আসিতেছিল।

কাশীতে যাঁহার বাটীতে এবং তত্ত্বাবধানে শান্ত থাকিত, তাঁহার নাম নিমাই বাবু। নিমাই বাবু শান্তর দূরসম্পর্কীয় এক মাতুলপুত্র। শান্ত তাঁহাকে নিমাই দাদা বলিয়া ডাকিত। আত্মীয়-অনাত্মীয়, আপনার ওপর কাহারও সহিত শান্তর বনিবনা না হইলেও, নিমাই বাবুর সহিত তাহার সদ্ভাব ও সৌহৃদ্যের অভাব ছিল না। নিমাই বাবু ইদানীং কোন কাজকর্ম্মও করিতেন না এবং তাঁহার বিষয়-সম্পত্তিও কিছুই ছিল না, অথচ বেশ স্বচ্ছন্দেই তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। কাশীর প্রত্যেক লোকের নিকটেই নিমাই বাবু বিশেষরূপ পরিচিত ছিলেন এবং সকল রকম কাজের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন, সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন, বিশ্বেশ্বরের মাথায় জল দিতেন, অবসর এবং পাত্র জুটিলে শাস্ত্রালাপ করিতেন এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আরও নানাবিধ কার্য্য করিতেন। কিন্তু কাশীতে তাঁহার প্রশংসা করিবার লোকও যেমন ছিল, গোপনে নিন্দা করিবার লোকেরও তেমনি অভাব ছিল না।

বর্ত্তমানে নিমাই বাবু কোন কাজকর্ম্ম না করিলেও, বছর আষ্টেক আগে পর্য্যন্ত তিনি যাত্রী-তোলার ব্যবসা করিতেন। সেই সময় শান্ত যখন তাহার শ্বশুরবাটীর গ্রামের জনকয়েক স্ত্রীলোকের সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণোদ্দেশে কাশী আসে, তখন সে তাহার সঙ্গিনীগণের সহিত আর দেশে ফিরিয়া না গিয়া নিমাই বাবুর আশ্রয়েই স্থায়িভাবে কাশীবাস করিতে থাকে এবং সাহায্যের জন্য জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভবতোষ বাবুর শরণাপন্ন হইয়া পত্র দেয়। ভবতোষ বাবু তখন হইতে এই আট বৎসরকাল শান্তকে মাসে মাসে দশটি করিয়া টাকা সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এই কয় বৎসরের ভিতর ভবতোষ বাবু অর্চ্চনাকে লইয়া কয়েকবার কাশী গিয়াছিলেন এবং শান্তর নিকটেই উঠিয়াছিলেন। নিমাই বাবুও মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিলে ভবতোষ বাবুর সহিত দেখা না করিয়া যাইতেন না। নিমাই বাবুর ধর্ম্মানুরক্তি, ভদ্রতা, সদাচার প্রভৃতি দেখিয়া ভবতোষ বাবু তাঁহার প্রতি যথেষ্টই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

যাহা হউক, সেই দিনই কাশীতে শান্তকে টেলিগ্রাম করা হইল এবং টেলিগ্রাম পাইয়াই নিমাই বাবুকে সঙ্গে লইয়া শান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে গিরিডি ছুটিয়া আসিল। ভবতোষ বাবু তাহাকে কাছে বসাইয়া কহিলেন,—"দিদি, কাজের সময় কাঁদলে কোন কাজ হয় না। সারা জীবন ধরেই ত তুই কেঁদেই কাটাচ্ছিস্—আর কেন?"

কাঁদিতে কাঁদিতেই শান্ত কহিল,—"জীবন ভোর কাঁদতে কাঁদতে তোমার মুখের দিকে চেয়েই যে আমার কেটে যাচ্ছিল, দাদা; কিন্তু এখন চোখের জলের সঙ্গে দিনও যে আমার আর কাটবে না।"

"অধীর হোস্ নি, শান্ত। দিন যাতে তোর কাটে, তার ব্যবস্থা আমি ক'রে যাচ্ছি। এর পর হয় ত আর কথ' কইবার শক্তি থাকবে না, এই বেলা তোকে একটু ব'লে রাখি। অর্চ্চনাকে একলা বেখে গেলুম, তোরই ওপর তার দেখবার শোনবার ভার রইল। ওকে একলা ফেলে রেখে তুই আর কোথাও থাকিস নি, দিদি। আর তোরও দিন কাটবার ভার অর্চ্চনার ওপর রইল।"

শান্ত কহিল,—"এ সব অলুক্ষণে কথা তুমি কেন বলছ, দাদা? এই শোনবার জন্যেই কি তুমি আমায় টেলিগেরাম ক'রে নিয়ে এলে?" অজস্র ধারে শান্ত কাঁদিতে লাগিল।

ভবতোষ বাবু আর তাহাকে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

সেই রাত্রিতেই ভবতোষ বাবুর যন্ত্রণা বাড়িল, শরীরের গ্লানি খুবই বৃদ্ধি পাইল, কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত আর বড় রহিল না, সারা রাত অস্থিরতার সহিত যাপন করিলেন।

পরদিন ডাক্তাররা নেপালকে অন্তরালে ডাকিয়া যাহা বলিয়া গেলেন, নেপাল বিষণ্ণ-চিত্তে তাহা নিজেই শুনিল, অর্চ্চনা বা শান্তকে সে কথা আর শুনাইতে পারিল না। সে দিন এবং সে রাত্রিও ভবতোষ বাবুর এক ভাবে কাটিয়া গেল। সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য অবস্থাতেই তাঁহার রাত্রি কাটিল। একটিবারের জন্য চক্ষুও চাহেন নাই, কথাও কহিতে পারেন নাই। ভোরের দিকে একটীবার চক্ষু

চাহিতেই অর্চ্চনা ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল,—"বাবা!"

অত্যন্ত দুর্ব্বল কণ্ঠে ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"মা! শান্ত কোথায়? নেপাল, বাবা, একটু কাছে এসে বোস। তুমি কে মা?"

অর্চ্চনা তেমনি ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, চোখ-ভরা জল লইয়া কহিল,—"বাবা, উনি কালী দিদি, তোমায় দেখতে এসেছেন।"

"দেখতে এসেছ, দেখ মা। তোমার সব কথা আমি অর্চ্চনার কাছে শুনেছি। অর্চ্চনাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যেও মা, ওর আমার যেন কিনারা হয়।"

তার পর তিনি ধীরে ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা কহিলেন। নেপালকে কহিলেন যে, অর্চ্চনাকে সে যেন মনিবের মত না দেখে, সে যেন তাহাকে নিজের ছোট ভগিনীর মতই জ্ঞান করে, আর দেশ হইতে যেন সে তাহার স্ত্রীকে আনিয়া অর্চ্চনার কাছেই রাখিয়া দেয়। অর্চ্চনাকেও সেই কথা বারবার করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন। তাহার একখানি হাত নিজের রক্তশূন্য ক্ষীণ হাতের মধ্যে লইয়া, বুকের সঙ্গে তাহা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে নানাপ্রকার বৈষয়িক উপদেশ দিতে লাগিলেন। সমস্ত সময় অর্চ্চনা কেবলই চোখের জল মুছিতে লাগিল। কালীর দিকে চাহিয়া ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"ছেলেকে দেখতে এসেছিস্ মা, কিন্তু যাবার বেলা যেন তোর দেখা পাই, সে সময় একটু সামনে থাকতে ভুলিস নি।"

ইহার পর হইতে ক্রমেই যত বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। অক্ষয় ডাক্তার এই সময় কি একটা ঔষধ খাওয়াইতে গেলে জড়িত কণ্ঠে শুধু কহিলেন,—"আর এ সব নয়।" তাহার পর শান্তর দিকে চাহিয়া কি বলিতে গেলেন, বোধ হয়, স্বর বাহির হইল না। মিনিট কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া নিমাই বাবুকে ইসারা করিয়া কাছে ডাকিলেন এবং তিনি ব্যস্ত হইয়া মুখের কাছে তাঁহার কাণ লইয়া গেলে অত্যন্ত মৃদু এবং অস্পষ্ট উচ্চারণে যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, শান্ত যেন এখন থেকে কাশী ছেড়ে অর্চ্চনার কাছে কাছেই থাকে,—কিন্তু মুমূর্ষুর এই অস্পষ্ট ও অর্দ্ধোচ্চারিত কথাগুলি আর কেহই শুনিতে বা বুঝিতে পারিল না।

বেলা বারোটা একটা পর্য্যন্ত এইভাবে সকলের সহিত কথা কহিবার পর ভবতোষ বাবু শ্রান্ত হইয়া যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্বাস ক্রমশঃই দীর্ঘ হইতে লাগিল।

সমস্ত মধ্যাহ্ন এমনই ভাবেই কাটিল। অপরাহ্নে একবার চক্ষু চাহিলেন এবং সম্মুখে অর্চ্চনাকে দেখিয়া অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট কণ্ঠে কহিলেন,—"মা, দিন এখনও শেষ হয় নি ত? পশ্চিমের জানালাটা খুলে দে অর্চ্চনা, দিনের শেষ আলো শেষের দিনে সর্ব্বাঙ্গে আমার ভাল ক'রে এসে পড়ুক।"

নেপাল উঠিয়া পশ্চিমের জানালাটি খুলিয়া দিতেই নিস্তেজ রবিকর ঘরের মেঝের উপর আসিয়া পড়িল। ভবতোষ বাবু নেপালের মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত অস্ফুটে কি বলিলেন, বুঝা গেল না। অর্চ্চনা তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলছ, বাবা?"

একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া ভবতোষ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার কালী মা?" কালী সরিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিতেই ভবতোষ বাবু কহিলেন,—"মা গো, একটু গীতা প'ড়ে শোনাবি?—একাদশ অধ্যায়। তোর মুখে শুনবো। একটু শোনা মা—একটু শোনা।"

নেপাল একখানি গীতা আনিয়া কালীর হাতে দিল। সুশিক্ষিতা কালীর মুখ হইতে গীতার শ্লোকগুলি সুস্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে উচ্চারিত হইতে লাগিল। সকলে নীরবে বসিয়া রহিল। সেই নিরানন্দ নীরবতার মধ্যে বিষাদের বাতাসই শুধু গাঢ় হইয়া জমিয়া উঠিতে লাগিল এবং গীতার পুণ্য-শ্লোকগুলি, আর কাহারও না হউক, হয় ত মুমূর্ষু ভবতোষ বাবুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মরণোন্মুখ চিত্ত স্পর্শ করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে একটু একটু করিয়া কখন্ যে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু ঘরের মেজের উপর হইতে দেওয়ালের গায়ে উঠিয়া পড়িয়াছিল এবং সেখান হইতে অল্পে অল্পে একবারে অদৃশ্য হইয়াছিল, এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ভবতোষ বাবুর জীবনগীতার শেষ অধ্যায়টিও কখন্ যে অল্পে অল্পে নিঃসাড়ে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা কাহারও জানিবার অবসর হয় নাই। অবসর যখন হইল, তখন অক্ষয় ডাক্তার চমকাইয়া উঠিলেন, কালীর হাত হইতে গীতাখানি খসিয়া পড়িল এবং উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া সেই গীতার উপরই শান্ত ও অর্চ্চনা আছাড় খাইয়া পড়িল। নোনিয়ার মা বাহিরের বারান্দা

হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের দুই জনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিল।

সে রাত্রিতে কালী ও নোনিয়ার মা অর্চ্চনাকে লইয়া এ বাটীতেই কাটাইল। অক্ষয় ডাক্তারও বিদেশে অর্চ্চনার এই বিপদে তাহার অনেক সাহায্য করিল। দুই দিন পরে অর্চ্চনা তাহাকে কহিল,—"কাকাবাবু, এখানে আর এক তিল আমার থাকতে ভাল লাগছে না, আপনি অনুমতি করুন, আমরা কলকাতায় চ'লে যাই।"

অর্চ্চনার কলিকাতা যাইবার কথা শুনিয়াই নিমাই বাবু শান্তকে বিরলে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কি সব বলিলেন, শান্ত মনোযোগ দিয়া তাহা শুনিল এবং সে দিন মৃত্যুর পূর্ব্বে ভবতোষ বাবু তাঁহাকে চুপে চুপে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সেই কথার উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"অতক্ষণ ধ'রে কি বললেন? উইলের মধ্যে কি আমায় কিছু দিয়ে-টিয়ে গেছেন, তাই কি কিছু ব'লে কয়ে গেলেন?" নিমাই বাবু মুখটাকে যৎপরোনাস্তি বিকৃত করিয়া কহিলেন,—"তোর সেই বরাত কি ন'! তবে আমিও নিমাই দত্ত! যাক, তুই আর এ সব নিয়ে যেন কারুর কাছে কিছু বলিস নি। দেখা যাক, কি করতে পারি, কিন্তু মেয়েটাও ধূর্ত্ত কম নয়।"

পরদিন সকলে কলিকাতায় চলিয়া আসিবার জন্য যখন ব্যবস্থা করিতে লাগিল, তখন শান্ত সে ব্যবস্থায় রাজী হইল না। সে অর্চ্চনার মনকে একটু সুস্থ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে লইয়া দিন কতক কাশী থাকিবার প্রস্তাব করিল।

শান্তর প্রস্তাবানুযায়ীই কার্য্য হইল। বামুন ঠাকুর ও নেপালকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া তাহারা কেষ্টকে সঙ্গে লইয়া কিছু দিন কাশী যাইয়া থাকিবে, ইহাই স্থির হইল। কালীকে অর্চ্চনা ধরিয়া বসিল—"দিদি, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কাশী যাও, তা হ'লে মন আমার কতটা যে ভাল থাকে, তা আর বলবার নয়, তোমাকে যেতেই হবে, দিদি।"

অর্চ্চনার কথায় কালী নীরবে যেন কিছু ভাবিতে লাগিল। অর্চ্চনা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"যাবে না, দিদি? তোমার ওপর আমার কোনই জোর নেই, কিন্তু মনে হয়, আমার সব আবদারই তোমার ওপর খাটবে। এই দুদিনের মেলা-মেশায় তোমায় আমি এত বেশী ক'রে আঁকড়ে ধরেছি যে, আর তুমি আমায় ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছ না। চল দিদি, তোমার পায়ে পড়ি।"

কালী কহিল,—"তোর সঙ্গে যেতে বোন্, আমার কোন আপত্তিই নেই, কিন্তু কখন আমি যে কোথাও যাই নি। ঘর ছেড়ে যে যাবার আমার যো নেই বোন্! তোর ভগ্নিপতির জন্যেই ত যত ভাবনা, কি জানি কখন্ এসে পড়ে।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মুখের ভাবপরিবর্ত্তন হইয়া গেল। উদাস চোখের দৃষ্টি বাহিরের চারিদিকে যেন কাহার শুভাগমন সন্ধান করিতে লাগিল। যেন যুগান্তর পরে তাহার নিরুদ্দেশ হৃদয়-দেবতার প্রত্যাবর্ত্তন আসন্ন হইয়া আসিতেছে, তাই আশা ও আনন্দ, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা, চিন্তা ও ব্যগ্রতা সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল। তেমনই বাহিরের দিকে একাগ্র শূন্য-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ধরিয়া নীরবেই তাকাইয়া রহিল।

অর্চ্চনার পীড়িত বক্ষ ভেদ করিয়া মুখ হইতে বাহির হইল,—"তা হ'লে যাবে না দিদি?" পরদুঃখকাতর কালীর কোমল অন্তর অর্চ্চনার এই ব্যথার ডাকে সাড়া না দিয়া আর পারিল না, কহিল,—"যাব বোন্, আমি গেলে যদি তোর মন ভাল থাকে, তাই যাব। কিন্তু টপ ক'রে যদি এসে পড়েন, তা হলেই—নোনিয়ার মা'র কাছে ঘরের চাবি রেখে, ভাল ক'রে ব'লে কয়ে যেতে হবে, এলেই যেন আমায় একখানা চিঠি লিখে দেয়। তা হ'লে কবে যাবি ভাই, বল্।"

যাইতে বেশী দিন আর দেরী করা হইল না। দিন তিন চারেকের মধ্যেই নেপাল, বামুন ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং নিমাই বাবু শান্ত, অর্চ্চনা, কালী ও কেষ্টকে লইয়া কাশীযাত্রা করিলেন।

যাইবার পূর্ব্বক্ষণে সকলের সম্মুখে নিমাই বাবু কহিলেন,—"চলুক দিন কতক মেয়েটা, পাঁচটা ঠাকুর-দেবতা দেখে হেথা-সেথা বেড়িয়ে, মনটা যদি ওর একটু ভাল হয়। আহা! কি বন্ধুই যে হারিয়ে ফেললুম, তা আর বলবার নয়। কি মন, কি মেজাজ! আত্মীয়-বান্ধব সকলের জন্যে কি দরদ! অরুকে আর শান্তকে যে কি ভালই বাসতেন দাদা আমার!"

হঠাৎ তাঁহার গলার স্বর ভারি হইয়া পড়িল,—"মরবার আগে পর্য্যন্ত ডেকে আমায় চুপি চুপি

শাস্তর জন্যে কত কথাই ব'লে গেলেন—'উইলে কিছু ক'রে যেতে পারি নি, সময় আর পেলুম না, শাস্তকে যেন পাঁচ হাজার টাকা অরু দেয়। আর কথা কইতে পাচ্ছি না, অরুকে ব'লে আপনি এটা দিয়ে দেওয়াবেন'—কথা কইবার শক্তি নেই, তবু শাস্তকে পাঁচ হাজার টাকা দেবার কথাটুকু আমায় না ব'লে, যেন দাদা আমার মরতেও পারছিলেন না! এইটুকু ব'লে যাবার জন্যে কি আকুলি-বিকুলি!"—বলিয়াই নিমাই বাবু কোঁচার খুঁটে ঘন ঘন চক্ষু মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর বহুক্ষণ ধরিয়া রাস্তার উপর দণ্ডায়মান গাড়ীর চালকের বার বার আহ্বানে সকলে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মন ভাল হইবার জন্য শাস্তর সহিত অর্চ্চনা কাশী আসিল বটে, কিন্তু তাহার পিতৃবিয়োগজনিত সদ্যোদুঃখের মধ্যে এই নূতন অভিভাবিকার শাসন ও সঙ্গ তাহার পক্ষে সুখের না হইয়া ক্রমেই অসুখের হইয়া উঠিল। একে অর্চ্চনার মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর শাস্তর স্বার্থবিজড়িত অযথা কর্ত্তৃত্ব সে মোটেই সহ্য করিতে পারিত না। ইতিপূর্ব্বে দুই একবারমাত্র শাস্তকে সে তাহাদের কলিকাতার বাড়ীতে দেখিয়াছিল, তাহাও সামান্য দুই চারি দিনের জন্য। সুতরাং পূর্ণভাবে তাহাকে চিনিবার পক্ষে কখনও তাহার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। অর্চ্চনার যেরূপ শিক্ষা, তাহার যেরূপ অন্তর, কথাবার্ত্তা, চাল-চলন,—পুরাতনপন্থী শাস্ত সে সকলের সহিত কোনকালেই পরিচিত নহে, সুতরাং তাহার স্বভাব ও কার্য্যকলাপ শাস্তর নিকট অত্যন্ত অশোভন ও বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইত এবং সে জন্য উভয়ের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ ঘটিয়া উভয়ের মনে একটা নিরানন্দের সৃষ্টি করিতে লাগিল। শাস্ত তাহার চিরকালের স্বভাবানুযায়ী চাহিত যে, তাহার দাদা যেমন তাহাকে অর্চ্চনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারার্পণ করিয়া গিয়াছেন, সে-ও তেমনই সর্ব্ববিষয়েই কর্ত্রী হইয়া থাকিবে এবং অর্চ্চনা তাহার সম্পূর্ণ অধীনে থাকিয়া, তাহার নির্দ্দেশ মতই উঠিবে ও বসিবে। কিন্তু অর্চ্চনা এ-যাবৎ যেমন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, ঠিক তেমনই ভাবেই চলিতে চায়, তাহার শিক্ষিত, সরল, উদার, পরদুঃখকাতর বিশুদ্ধ অন্তর, শাস্তর যুক্তিহীন ও অন্যায় নির্দ্দেশে কর্ণপাত মাত্র করিতে চাহে না।

এই লইয়া শাস্ত ও অর্চ্চনার মধ্যে বচসা ও মনোমালিন্য দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিতে লাগিল এবং নিমাই বাবুর সতর্কীকরণ ও পরামর্শ দান সত্ত্বেও শাস্ত তাহার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারিল না। এই উপলক্ষ্যে একদিন নিমাই বাবু আড়ালে তাহাকে খুবই ধমকাইলেন এবং কহিলেন, —"তুই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে সব দিক নষ্ট না ক'রে ছাড়বিনি। ঐ ছোঁড়াটাকে এষ্টেট্ থেকে সরিয়ে আমি যাতে ঢুকতে পারি, আগে সেই চেষ্টা কর, তার পর যা ইচ্ছে তাই করিস।" তখন শাস্ত কতকটা শান্ত হইল এবং নেপালকে ছাড়াইয়া দিয়া, সেই যায়গায় নিমাই বাবুকে বাহাল করিয়া সকলের একসঙ্গে যাহাতে কলিকাতার বাটীতে থাকা হয়, এই কথাটা প্রায়ই সে অর্চ্চনার কাছে ইসারা-ইঙ্গিত ও ভাব-ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে লাগিল। অর্চ্চনার কাছে এই কথাটা যে দিন সে খুলিয়া প্রকাশ করিয়া বলিল, সে দিন অর্চ্চনা প্রত্যুত্তরে শুধু কহিল,—"পিসী, তোমার যতটুকু অধিকার, তার সীমা ছাড়িয়ে কথা কইতে এস না। কা'কে ছাড়ালে বা কাকে রাখ্‌লে ভাল হয়, সে আমি বুঝবো।" তাহার পর দুই দিন ধরিয়া শাস্ত অর্চ্চনার সহিত আর কোন কথাই কহে নাই। এই দুই দিন নিমাই বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহারই ফলে তৃতীয় দিনে সে সস্নেহে অর্চ্চনাকে কহিল,—"যা বলি, যা কই, সব তোর ভালর জন্যেই মা, অথচ তা তুই কিছুই বুঝতে পারিস না। তোকে ঠিক পেটের মেয়ের মত জ্ঞান করি বলেই, যাতে তোর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে কেবল সেই চেষ্টাই করি।" শাস্তর চোখ দিয়া কয় ফোঁটা অশ্রুও গড়াইয়া পড়িল।

অর্চ্চনা বিস্মিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

শাস্ত কহিতে লাগিল,—"সেই দিন নিমাই দাদাও তোর কত সুখ্যাতি করছিলেন। বলছিলেন —এমন হিসেবী মেয়ে, এমন ভদ্র, এমন শিষ্ট, এত সৎ আজকালকার দিনে চোখেই পড়ে না! অরুর

আমার যেমনই রূপ, তেমনিই অন্তঃকরণ, তেমনই শিক্ষা——”

রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের ন্যায় তাহার শেষ কথার সূত্র ধরিয়া নিমাই বাবু হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—“সে কথা আর একবার ক’রে বলতে, শান্ত! এই কাশী সহরে মেয়েছেলের ত আর অভাব নাই, কিন্তু অরুর মত একটি মেয়ে তুই সারা কাশী ঢুঁড়ে আন দেখি, বোন্। কত বড় দরাজ মন ওর! ‘বাপকা বেটী’ যে, তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। ঐ যে অসির ওদিকে একটা নূতন ঘাট করবার জন্যে সব উঠে প’ড়ে লেগেছে, এইবার ওর শেষ-রক্ষে কে করে একবার দেখি। হাজারখানেক টাকার যে ঘাটতি পড়েছে, এই কাশীর ভেতর রাজা-জমীদারের ত আর অভাব নেই, কিন্তু কার বুকের পাটা কত বড়, সেইটে আমায় একবার দেখতে হবে। তোকে ব’লে রাখি শান্ত, আর একটি পাই-পয়সাও কারুর কাছ থেকে আদায় করতে হচ্ছে না। ও ঘাট শেষ হবে কারে দিয়ে জানিস? ঐ যে, তোর সামনে লক্ষ্মী-প্রতিমাটি ব’সে রয়েছে, ওর দ্বারাই হবে। কিন্তু এটাও জেনে রাখিস শান্ত, যে এখন ওদের আমি কিচ্ছুটি বলছি না। আগে দৌড়টা কত দূর যায়, একবার দেখি, তার পর শেষকালে বলব যে, ঘাটটির নাম ‘অর্চ্চনা ঘাট’ রাখ আর আমার মায়ের কাছ থেকে হাজারটি টাকা নিয়ে যাও।”

শান্ত নিমাই বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “আচ্ছা নিমাইদা, অরুর কাছে দাদার দেওয়া আমার যে পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে, তার থেকে আমিও ত হাজারখানেক টাকা ঘাটটার জন্যে দিয়ে দিতে পারি। এত বড় একটা মহা পুণ্যের কাজ——”

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে নিমাই বাবু শান্তর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—“পুণ্যের কাজে হিংসে জিনিষটাও ভাল। ঘাট ক’রে দেওয়ার পুণ্যির লোভটা বুঝি আর সামলাতে পাচ্ছিস না? সৎকাজে এমনিই হয় বটে। তা তোর ঐ পুঁজিটুকুর মধ্যে থেকে এই টাকা দিতে আমি কিছুতেই মত দিতে পারি না, শান্ত; কেন না, ভবতোষ বাবু তোকে যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গিয়াছেন, তাই দিয়ে একটু তোর মাথা গোঁজবার জায়গা আগে তোকে ক’রে নিতে হবে বোন্, কেন না’ তোর মত অনাথা নিরাশ্রয়া ভূভারতে আর নেই। তাই ত ভাবি যে, যে যত ভাল, তাকেই তুমি তত কষ্ট দাও, ঠাকুর! এক এক সময় তাই মনে করি যে, অরুকে বলি যে, মা, এত ভাল, এত সরল, এত সৎ তুই হোস নি; শান্তর দেখে তোর জন্যে আমার ভয় করে।”

নিমাই বাবুর বদন বিষাদে ভরিয়া উঠিল, চক্ষুতে অশ্রু জমিয়া আসিল। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি কহিতে লাগিলেন,—“জানি যে তুই অর্চ্চনাকে ছেড়ে আর কিছুতেই অন্য কোথাও থাকতে পারবি না, তবু এখানে তোদের নিজের বলতে একটু আস্তানা থাকার দরকার। অরুরই যদি মাঝে মাঝে এসে থাকবার ইচ্ছে হয়। তুই আর অরু ত পৃথক ন’স। তোর হলেও তা অরুর, আর অরুর হলেও তা তোর। এর জন্যে আমিও চুপ ক’রে নেহাৎ ব’সে নেই জানবি। কেদারঘাটে যে বাড়ীখানা দেখছি, বিশ্বনাথের ইচ্ছেয় যদি এইটে হয় ত—দেখাই যাক্। তবে এ বাড়ী আর তোমার পাঁচ হাজারে হবে না, দশ হাজার দশ হাজার করছে, হাজার আষ্টেকের কমে আর হচ্ছে না।”

সঙ্গে সঙ্গেই নিমাই বাবু তাঁহার একটু পূর্ব্বের বিষাদপূর্ণ আননে ও অশ্রু-সজল চক্ষুতে প্রসন্নতার হাসি ফুটাইয়া কহিলেন,—“বাকী তিন হাজার ভাইঝির কাছে খৎ লিখে দিয়ে ধার করবি, কিন্তু সুদ যদি না দিস, তা হলে কোর্টে গিয়ে অরুর হয়ে তোর বিরুদ্ধে আমি সাক্ষী দিয়ে আসব।”—বলিয়াই হো হো করিয়া নিমাই বাবু হাসিয়া উঠিলেন।

অর্চ্চনা আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং এক পা এক পা করিয়া ওদিককার ঘরে, যেখানে মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া কালী কি একখানা বই পড়িতেছিল, সেইখানে আসিয়া কহিল,—“চল দিদি, আজ একটু হরিশ্চন্দ্র-ঘাটে বেড়িয়ে আসি, মাথাটা বড্ড ধরেছে।”

তখন অপরাহ্নকাল। হরিশ্চন্দ্র-ঘাটে আসিয়া উভয়ে গঙ্গা-সৈকতে বসিলে, অর্চ্চনা কালীকে কহিল,—“দিদি, এখানে আর আমি থাকতে পারব না, ভাল লাগছে না।”

কালী পরপারের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া বলিল,—“আমারও লাগছে না বোন্,—অনেক দিন হয়ে গেল।” তাহার পর প্রসারিত দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া তন্ময়ভাবে বলিয়া উঠিল,—“এইখানে।”

অর্চ্চনা জিজ্ঞাসা করিল,—“এইখানে কি দিদি?”

“হরিশ্চন্দ্র রাজার ঘাট যে! একজন ছিল

এইখানে, আর একজন ছিল সেই কোথায় কে জানে, সহরের ভেতর কোন্ বামুনের বাড়ী! তার সেখানে জন্ম ও জীবনের উদ্দাম কোলাহল, এর এখানে মৃত্যু ও লয়ের অনন্ত নীরবতা। কি বিরাট ব্যবধানই দু'জনকে দু'পাশে ঠেলে রেখেছিল! কিন্তু পারলে না! অন্তরের দুর্ব্বার আকর্ষণে তা ভেঙ্গে-চুরে একাকার হয়ে গেল। সেই মহা-মিলনের পুণ্যস্থান এই,—এই সেই মহাশ্মশান"—বলিয়া কালী সম্মুখস্থ মৃত্তিকার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মস্তক ঠেকাইল, অর্চ্চনাকে কহিল,—"তুইও এই মাটীতে মাথা লুটিয়ে দে বোন, আমাদের দু'জনের পক্ষে এমন পুণ্যতীর্থ আর কোথাও নেই।"

কালীর অনুসরণ করিয়া অর্চ্চনাও তত্রত্য ধূলার উপর মস্তক স্পর্শ করিলে কালী কহিল,—"দেখিস্ বোন, তোর সীঁথির সিঁদুরের শোভা শীগ্‌গিরই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবে।" তার পর মৃদু হাসির সহিত কহিল,—"আর আমার ইনি ত কবে এসে পড়েন।"

অর্চ্চনা কালীকে কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, কালী তাহাকে বাধা দিয়া, তাহার একখানা হাত নিজের মুঠার মধ্যে জোরে ধরিয়া কহিল,—"দেখ বোন্, পুরুষের স্ত্রী মারা যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামী কখনও মারা যায় না। বল্ না—যায়? স্ত্রীলোক কখনও বিধবা হয়?"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া অর্চ্চনা ডাকিল—"দিদি!"

"কি বোন্?"

"কিছু আর ভাল লাগে না, কেন বল দেখি? জীবনটা এই চার মাস যেন বড় একঘেয়ে লাগছে। বাবা বেঁচে থাকতে মনে হ'ত, মাথার ওপর যেন অনেক কাজ আছে, একটা সংসার তখন আমার ঘাড়ে, এইটে সর্ব্বদাই মনে হ'ত। এখন যেন মনে হয়, কিছুই আমার নেই, সংসারের কোন কাজকর্ম্মই আমায় যেন আগেকার মত আর তেমন উৎসাহ দিতে পারে না। মনে হয়, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে অনেক দূরের কোন নির্জ্জন দেশে গিয়ে, একটা ছোট কুঁড়ে ঘর বেঁধে থাকি। সংসারের কাজের ভীড়, গোলমাল যেন সেখানে গিয়ে না পৌঁছায়, টাকা-কড়ির হিসেব যেন আর না করতে হয়। ঠাকুরঘরের ঠাকুরটির বদলে আমি যেন সেই বিজন দেশের মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে সর্ব্বত্র সব জিনিসেই ঠাকুরের সন্ধান পাই, আর তাই নিয়েই যেন জীবন আমার সেই নদীকূলের কুঁড়ের ভেতরেই এক দিন চুপি চুপি নিঃশেষ হয়ে যায়।"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কালী কহিল,—"তোর মাথা খারাপ হয়ে আসছে, তুই শীগ্‌গীরই কোলকাতায় যা। এই সব অলুক্ষণে কথা যদি ফের বলবি ত আমি পিঠে তোর গুম্ গুম্ ক'রে সাড়ে পাঁচ গণ্ডা কিল মারবো।"

"সত্যি দিদি, জীবনটা যেন বড্ড বেশী বেশী হালকা বলেই বোধ হচ্ছে, কোন কিছুতেই আর মন লাগে না। বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি, টাকা-কড়ি, লোক-জন, সব যেন আমাকে তাদের কাছ থেকে খালি দূরে ঠেলে দিচ্ছে, কোন উৎসাহ—কোন আকর্ষণই যেন এদের থেকে আর আমি পাচ্ছি না।"

"মন হারিয়ে ব'সে আছিস, তা পাবি কোত্থেকে? চিরকালের চোখের জলে, চূণকাম আর কত দিন টেঁকে! তবে মনের মালিকের তুই দেখা পাবি বোন্, আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি, সে দিন তোর শীগ্‌গিরই আসবে, স্বামীদর্শন তোর শীগ্‌গিরই ঘটবে।

নতমুখে থাকিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত অর্চ্চনা কহিল,—"দিদি, ও কথাটা আর তুমি বার বার ব'লো না। আমার সম্বন্ধে ওটা নেহাৎই বাজে কথা। এ যেন, ঠিক-দুপুরের রোদে খুব বড় একটা জিনিসের খুব ছোট একরত্তি ছায়া!"

একদৃষ্টে অর্চ্চনার আনত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কালী কহিল,—"ছায়া? বাজে কথা? আমার আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হবে? তুই জানিস অচ্চু, জীবনে আমি কখনও কোন অন্যায় করিনি, কখনও কারও অন্তরে ব্যথা দিই নি, মুখ দিয়ে কখনও আমার মিথ্যা বার হয় নি। এত দিন পরে মুখের কথা আমার মিথ্যে হবে? সেই পুণ্যশ্লোক রাজ-রাণীর মিলনের এই পবিত্র ঠাঁই, এই পবিত্র শ্মশান, সামনে ঐ মা-গঙ্গা, আর মাথার ওপর ঐ অনন্ত অমল নীল আকাশ,—যা বল্লুম বোন্, জানবি, এ পরম সত্যি। আমার মুখের এ আশীর্ব্বাদ কখনই মিথ্যে হবে না স্বামীর দেখা তুই শীগ্‌গিরই পাবি—পাবি—পাবি।"

"পাবি—পাবি—পাবি।" পিছন হইতে সহসা কে বলিয়া উঠিল—"পাবি—পাবি—পাবি; কিন্তু পেলে কি হবে মা, ভোগে হয় না। পেলুম ত, কিন্তু ঠেলাঠেলিতে কি রাখতে পারবার যো

আছে, ঝর-ঝরিয়ে সব প'ড়ে গেল, যে-দুটি থাকলো, তাই নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম; বাবা গো বাবা!"

উভয়েই চকিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, একটা পাগলী কোথা হইতে চারিটি ভাত শালপাতায় করিয়া আনিয়াছে ও অনতিদূরে তাহাই মাটীর উপর রাখিয়া খাইবার আয়োজন করিতেছে। কালী ও অর্চ্চনা তাহার দিকে ফিরিয়া বসিলে সে পরমাগ্রহে সেই ভাতগুলি খাইতে খাইতে কহিল,—"সারাদিন কিছু খাই নি গো, মা। দুপুরবেলা ঐ ওদের ছত্তরে গিয়েছিলুম,—ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তাড়িয়ে দিলে। মোটা মোটা জোয়ান মিন্‌সেগুলো রোজ পেট পুরে খেয়ে আসে, আর আমরা গেলেই তাড়িয়ে দেয় মা। আমাদের একটা ছত্তর কারুকে দিয়ে করিয়ে দিতে পারিস্ তোরা? দিস্ মা—দিস্, তোদের ভাল হবে। অন্নপূর্ণার রাজত্বে বাস করেও ক্ষিধের দুটি অন্ন পাই না।"

অর্চ্চনা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কোথায় থাক?"

"তা, থাকি ভাল—ঐ পথে-ঘাটে-মন্দিরে। থাকবার বড একটা কষ্ট নেই, কালভৈরবের দয়া আছে, কিন্তু ঐ বেটি চোখ-খাকীর দয়া বড কম। তুই রোজ দুটি খেতে দিবি, মা?"

পাগলী আর কোন কথা না বলিয়া আহারে মন দিল এবং কালী ও অর্চ্চনা সেইখানে বসিয়া তাহার খাওয়া দেখিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই খুঁটিয়া খুঁটিয়া শেষ অন্ন-কণাটি পর্য্যন্ত যখন সে উদরস্থ করিল, তখন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুখহাত ধুইবার অভিপ্রায়ে সৈকতভূমি অতিক্রম করিয়া ধীরপদে সে গঙ্গাগর্ভের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সেইখানে বসিয়া থাকিয়া অর্চ্চনা পাগলীর প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিল, কিন্তু সে পথে পাগলী আর ফিরিল না। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার শ্মশানঘাটের উপর গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল এবং চতুর্দিকস্থ দেবমন্দিরগুলি হইতে সায়াহ্নের নহবৎ অসীম মাধুর্য্যের সহিত বাজিতে সুরু করিয়াছিল। অর্চ্চনা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কালীর হাত ধরিয়া বলিল, —"চল, দিদি।"

বাসায় ফিরিয়া অর্চ্চনা নিমাই বাবুর ঘরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকাবাবু, এখানে রোজ কুড়ি পঞ্চাশ ক'রে লোক খাওয়াতে হ'লে মাসে কত ক'রে ব্যয় হয়?"

হর্ষোৎফুল্ল আননে মৃদু-মধুর হাসিতে হাসিতে নিমাই বাবু কহিলেন—"এই রকম কিছু একটা যে তুই জিজ্ঞাসা করবি, তা আমি অনেক দিন থেকেই মনে মনে ক'রে আসছি। আমার নিজের ঘরের মেয়ে ব'লে জাঁক করছি না, কিন্তু তোর মত সচ্চরিত্র পুণ্যশীলে মেয়ে আজকালকার দিনে ক'টা মেলে, আমি তাই সকলকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

শান্ত সেখানে জপের মালা হাতে লইয়া বসিয়া ছিল। তাহার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,— "কেমন শান্ত, যা তোকে বলি, ঠিক তাই কি না বল্। অরু আমার—"

"মাসে কত টাকা লাগে, কাকাবাবু?"

"বলি মা"—বলিয়া মিনিটখানেক মনে মনে একটা হিসাব করিয়া নিমাই বাবু বলিলেন,—"তিন চার শ' টাকা ক'রে মাসে হলেই রোজ পঞ্চাশটি ক'রে ব্রাহ্মণভোজন হতে পারবে মা। এর চেয়ে কি আর মহৎ কাজ আছে রে,—না সকলের ভাগ্যে এ পুণ্যি ঘটে। দেখ শান্ত, ভবতোষ দা' যা ক'রে যেতে পারলে না, অরুর দ্বারাই তা হবে। কার দ্বারা কি হয়, তা কি কেউ বলতে পারে?"

অর্চ্চনা কহিল,—"রোজ বিশ পঞ্চাশটি ক'রে এখানে কাঙ্গালী খাওয়াতে, কাকাবাবু, আমার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে।"

"হবেই ত, মা। তোর হবে না ত কার হবে? তা, কাঙ্গালী খাওয়ান,—সে আরও ভাল, মা। এর মত মহাপুণ্য আর কিছু নেই। তা তোকে এর জন্যে কোন হাঙ্গামা পোয়াতেই হবে না, তুই শুধু মাসে মাসে টাকাটা আমার কাছে পৌঁছে দিস্, বন্দোবস্তের ভার—ঝক্কির ভার, সে সব এই বুড়োর ওপরই রইল। তবে মাঝে মাঝে তোকে এসে দেখে-শুনে যেতে হবে, মা লক্ষ্মী, নইলে আমি ছাড়বো না। পয়সা কি জন্যে, মা? এই ত হ'ল পয়সার সার্থক ব্যয়। ইদানীং তোদের বাড়ী তত আমার যাতায়াত না থাকলেও, তোর কথা ত চিরকালই আমি জানি। তাই ত শান্তকে আমি বলি যে, ভবতোষ দাদা এখন গত হ'ল, অরুকে এখন বুক দিয়ে আমাদেরই দেখতে হবে। আর এখানে মা অন্নপূর্ণার কাছে থাকা, আর অরুর কাছে থাকা, একই কথা—দুই-ই মহাতীর্থ।"

অর্চ্চনা নীরবে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল। নিমাই বাবু গুন্ গুন্ করিয়া আরও কি সব তাহার সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।

অর্চ্চনার খাইবার সময় শান্ত সম্মুখে আসিয়া বসিল এবং তাহার অল্পাহারের কথা উল্লেখ করিয়া কহিল,—"এই খেয়ে তুই বাঁচবি কি ক'রে, আমি তাই শুধু ভাবি। দুধ একপলা বেশী—তা খাবি নি, লুচি দু'খানা বেশী খাবি—তা খাবি নি, তোকে নিয়ে আমি কি করি, অরু? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, অমন যে লক্ষ্মীর মত রূপ, যে রূপ আর তোর আছে কি?"

যাহার অল্পাহারের জন্য শান্তর এই বিকট দুর্ভাবনা, তাহার মাথায় তখন কলিকাতা যাওয়ার ভাবনাই বেশী রকম অধিকার করিয়া বসিয়াছিল এবং তাই আহারান্তে সে তাহার শয়নঘরে যাইয়া সেই রাত্রিতেই নেপালকে কলিকাতায় চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠিতে তাহাকে দুই এক দিনের মধ্যেই কাশী আসিয়া তাহাদের সব লইয়া যাইতে লিখিল।

অর্চ্চনা যখন চিঠি লিখিতেছিল, তখন অন্য আর একটি ঘরে নিমাই বাবু অত্যন্ত চাপা এবং মৃদু গলায় শান্তকে কহিতেছিলেন,—"অনেকটা কাজ এগুচ্ছে, এখন যদি তুই সব নষ্ট করিস্, তা হ'লে তোর দুঃখ জীবনে আর যাবে না। কথায় কথায় অভিমান আর অসহি, এ তোকে ছাড়তে হবে, শান্ত। ও মেয়েকে কাঁদা ক'রে আনা বড় সোজা কথা নয়, ও তোর আমার চেয়ে অনেক চতুর, আমাদের সাতবার ক'রে চ'কের বাজারে ও বিক্রী ক'রে আসতে পারে। আমার ভয় হচ্চে যে, কলকাতায় গিয়ে হয়ত তুই সামান্য কিছু একটা উপলক্ষ্য ক'রে ঝগড়া বাধিয়ে বসবি আর সব নষ্ট করবি। তোকে বার বার সাবধান ক'রে দিচ্ছি যে, এখন শুধু কাদায় গুণ ফেলে সব বিষয়েই ওর মন জুগিয়ে চলবি।"

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া নিমাই বাবু নানাপ্রকারে শান্তকে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং শান্ত সমস্তক্ষণই নীরব থাকিয়া তাঁহার কথাগুলি এক মনে শুনিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

প্রায় চারি মাস কাশীতে কাটাইয়া ফাল্গুনের শেষে যখন অর্চ্চনা কলিকাতায় তাহার নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, তখন তার মন হইতে শোকের গুরুভার অনেক পরিমাণেই নামিয়া গিয়াছিল এবং তাহার আননে পূর্ব্ব-প্রফুল্লতা আবার যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কথাবার্ত্তায় আগেকার সরসতাও তেমনই ফিরিয়া আসিয়াছিল। দীর্ঘদিন পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর আব-হাওয়ার মধ্যে বাস করায় তাহার অসামান্য রূপ-লাবণ্যের পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাস তাহার সর্ব্বদেহ ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। সে দিন স্নানান্তে ভিজা কাপড়ে রোয়াকের উপর আসিয়া দাঁড়াইলে, শান্ত একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অর্চ্চনা গামছা নিংড়াইতে নিংড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি দেখছো, পিসী?" শান্ত তেমনি ভাবেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল,—"তোকেই দেখছি, অরু।"

অর্চ্চনা অল্প একটু হাসিয়া কহিল,—"আমাকে নতুন ক'রে দেখবার মত কিছু পেয়ে গেলে না কি, পিসী?"

কথার উত্তর না দিয়া শান্ত একটা টানা নিঃশ্বাস ফেলিল এবং নিজের মনেই কহিল,—"বিধাতাপুরুষের কি যে লেখন, এত যে রূপ, কিছুই সার্থক হ'ল না!"

"এই কথা! আমি বলি বুঝি আর কিছু! কিন্তু যার জন্যে তোমার এ দুঃখ, তা যে ষোল আনাই সার্থক হয়ে গেছে, পিসী। ওপরের ঠাকুরঘরে ঐ যে ক্ষুদে ঠাকুরটি আছেন, ওঁরই পায়ের তলায় যে সবই আমি দিয়ে দিয়েছি, তার সঙ্গে ঐ মহার্ঘ্য জিনিসটিও বাদ পড়ে নি।"—বলিয়া অর্চ্চনা ভিজা কাপড়ে তাড়াতাড়ি দালানে প্রবেশ করিল এবং সেখান হইতে বড় গলা করিয়া বলিল,—"পিসি, এক কাজ কর না হয়। যারা এ জিনিষটার জন্যে আপশোষে সারা হয়ে যাচ্ছে, আমার গা থেকে ঝেড়ে পুঁচে নিয়ে তাদের মধ্যে সব না হয় ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে দাও, এতে তোমারও পুণ্যি হবে, আমিও হাল্কা হয়ে বাঁচবো।"

কেষ্ট দোতলায় পূজার ঘরে অর্চ্চনার পূজার ফুল রাখিয়া নামিয়া আসিতেছিল। কথাটার সব সে শুনিতে পায় নাই, শুধু কিছু একটা ভাগ করিয়া দিবার কথা তাহার কাণে গিয়াছিল মাত্র। সিঁড়ি

হইতে নামিয়া সে অর্চ্চনার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ভাগ ক'রে দেবে দিদিমণি ?"

অর্চ্চনা তাহাকে কহিল,—"তুই এক ভাগ নিবি রে, কেষ্ট ?"

"নেব, দিদিমণি !"

"তবে দাঁড়া একটু"—বলিয়া অর্চ্চনা পাশের ঘরে যাইয়া কাপড় ছাড়িল এবং ভিজা কাপড়খানি কেষ্টর হাতে দিয়া কহিল,—"আয়, ওপরে আমার ঘরে।"

উপরের ঘরে আসিয়া অর্চ্চনা আলমারী খুলিতে খুলিতে কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর বাবা এসেছে, তোর মায়ের অসুখ ?"

"হ্যাঁ দিদিমণি।"

"তাই বুঝি তুই কাল মাইনে চাইছিলি ?"

"হ্যাঁ দিদিমণি। মাইনেটা নিতেই বাবা এসেছে।"

"ক' মাসের মাইনে তোর পাওনা হয়েছে বল্ দেখি ?"

"এই ফাগুন কাবার হ'লে পূরো পাঁচ মাস হবে, দিদিমণি।"

"ঠিক ত ?"

"হ্যাঁ দিদিমণি, ম্যানেজার বাবুকে শুধিও তুমি।"

"তুই ভারি চালাক, ম্যানেজার বাবু ত এখন এখানে নেই, তাই তাড়াতাড়ি যা' তা' ব'লে নেবার চেষ্টা—না ?"

"সত্যি দিদিমণি, কালী-গোঙ্গার দিব্যি, বাবা তারকনাথের দি—"

"আচ্ছা তেত্রিশকোটি দেবতার আর দিব্বি গালতে হবে না। তা হ'লে পাঁচ মাসে তোর পাওনা কত হয় বল্।"

"পনর টাকা।"

"টপ্ ক'রে ব'লে ফেল্লি, মুখের ভেতর জীইয়ে রেখেছিলি—না ? সমস্ত রাত বুঝি শুয়ে শুয়ে হিসেব পত্তর সব একেবারে ঠিক ক'রে রেখেছিস ? কিন্তু ঠকিয়ে নিচ্ছিস না ত, ঠিকই পনর ?"

"দেখ না দিদিমণি, দু'মাসে হল ছয়, আর দু'মাসে ছয়, তা হ'লে হল বারো, আর থাকলো গিয়ে এক মাস, তা হলে——"

"ওরে বাবা, মাথা একেবারে ঘুলিয়ে দিলি যে রে কেষ্টা ! আচ্ছা, হিসেব-টিসেব পরে হবে'খন, সেই ম্যানেজার বাবু এলে,"—বলিয়া অর্চ্চনা আলমারীর মধ্য হইতে পঁচিশটি টাকা বাহির করিয়া কেষ্টর হাতে দিয়া কহিল,—"তোর বাবাকে দি গে যা। বলবি, পনর টাকা তোর মাইনে, আর তোর মায়ের ওষুধ-পত্তরের জন্যে আমি দশ টাকা দিলুম, বুঝিচিস্ ?"

প্রসন্নতায় পূর্ণ হইয়া কেষ্ট বলিল,—"বুঝিছি। কিন্তু বামুনঠাকুরকে তুমি কিচ্ছুটি দিও নাক, দিদিমণি। ও যে তোমার কাছে জানাচ্ছিল যে, দেশে ওর ঘর-বাড়ী পুড়ে গেছে, সব মিছে কথা দিদিমণি, ওর একটি কথাও তুমি পেত্যয় যেও নি।"

বামুনঠাকুরের সম্পর্কে নালিস ও পরামর্শদানের পর মুহূর্ত্তখানেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কেষ্ট মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"ম্যানেজার বাবু কবে আসবে, দিদিমণি ?"

"কেন বল্ ত ?"

"আমাকে দোলের পাব্বুণী দেবে বলেছিল, এখন পেলে বাবাকে এই সাথে দিয়ে দিতুম।"

"সে ত চৈত্রমাসে। কবে দোল তার ঠিক নেই, এখনই তার পার্ব্বণী ? গরজ বড় বালাই—না ?"

কেষ্ট চুপ করিয়া রহিল। অর্চ্চনা কহিল,—"এখন যা, তোর বাপকে টাকা দি গে যা। দোলের সময় তোকে খুব বড় পিচকিরি আমি কিনে দেবো,—কেমন ?"

প্রফুল্লমুখে কেষ্ট কহিল,—"দিও দিদিমণি। তা হ'লে অনুকুলের দোকান থেকে দুপয়সার ফাগ কিনে আনবো।"

"কার গায়ে ফাগ দিবি ?"

"বামুনঠাকুরের গায়ে"—বলিয়া একমুখ হাসিয়া নাচিতে নাচিতে কেষ্ট নীচে নামিয়া গেল।

অর্চ্চনাও তাহার পিছন পিছন ঘর হইতে বাহির হইয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল এবং প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন বহির্ব্বাটীতে নেপালের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া নীচে ভাঁড়ারে ঢুকিয়া শান্তকে কহিল,—"নেপাল বাবু এসেছেন পিসী, বামুনঠাকুরকে একটু খবর দিও।"

কাশী হইতে ফিরিবার সময় অর্চ্চনা কালীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত আনিয়াছিল এবং কয়দিন এখানে রাখিয়া গঙ্গাস্নান ও কালীদর্শন প্রভৃতি করাইয়া, দিন দুই হইল নেপালকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে গিরিডি পাঠাইয়া দিয়াছিল।

শান্ত কহিল,—"তা বলে আসছি, কিন্তু তুই যাচ্ছিস কোথা ?"

চাবির রিং-বাঁধা বস্ত্রাঞ্চল আঙ্গুলে ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে অর্চ্চনা কহিল,—"একবার নেপাল বাবুর কাছে গিরিডির খবরটা শুনে আসি।"

চকিতে একটু কি ভাবিয়' লইয়া, অত্যন্ত অপ্রসন্ন-মুখে শান্ত কহিল,—"থাক, আর যায় না। হাজার হোক পর, যখন-তখন অমনি ক'রে অত মেলা-মেশা ভাল নয়।"

যাইতে যাইতে অর্চ্চনা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার চাবি ঘোরান বন্ধ হইয়া গেল এবং শান্তর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"বিশেষ কোন দোষ এতে হয় না, পিসী; যাদের হয়, তাদের হয়। তা ছাড়া, নিজের মনটা তোমার চেয়ে আমার নিজের বেশী জানা আছে।"

অর্চ্চনার মনটা তখন খুব ভাল ছিল না। কারণ নেপালের গিরিডি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ও তাহার কণ্ঠস্বর শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে তথাকার সব কথা,—অর্থাৎ কালীর কথা, নোনিয়াব ম'র কথা, অক্ষয় ডাক্তারের কথা, উস্রি যাওয়ার কথা, ভবতোষ বাবুর অসুখ ও তাঁহার মৃত্যু, যে সব কথা এই কয় মাসের মধ্যে একটু একটু করিয়া সে ভুলিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে চকিতে একটুখানি সময়ের মধ্যেই সেই সব তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাই, ঠাকুরঘর হইতে পূজা শেষ করিয়া বাহিরে আসার পর নেপালের কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিবামাত্রই ভারাক্রান্ত-মনে সে তাহার কাছে গিরিডির সংবাদ জানিতে যাইতেছিল।

শান্ত কহিল,—"তা, কি আর তোকে বললুম অরু যে, তুই রাগ ক'রে উঠলি?"

"রাগ আমি করি নি, পিসী। কিন্তু নেপাল বাবু ঠিক পরের মত এ বাড়ীতে নেই। আমিও তাঁকে তেমন চোখে দেখি না, বাবাও কখনও দেখতেন না। তা ছাড়া, ওঁর সম্বন্ধে বাবার মুখের শেষ কথাগুলোও এরি মধ্যে বোধ হয় একেবারে ভুলে যাও নি, পিসী,"—বলিয়া বহির্ব্বাটীর বদলে অর্চ্চনা বরাবর উপরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

তরকারি কুটিতে কুটিতে শান্ত নিজের মনেই বলিতে লাগিল,—"তোর বাপের মুখে শেষ কথা তুই নিজেই শুধু ভুলে আছিস্, নইলে যার ওপর তোর দেখবার শোনবার ভার দিয়ে গেল, তার চাইতে ওই ছোঁড়াটাই তোর কাছে বেশী হ'ল! আমার কথার ওপর মুখে মুখে তুই জবাব দিস্—এত অহঙ্কার! বলে—'না ছিল ভাত না ছিল ঘর, তিনিই হলেন রাজ্যেশ্বর।' হাজার হোক আঙুল ফুলে কলাগাছ ত!—"

সেদিন কুটনা কুটিতে শান্তর অযথা দেরী হইতে লাগিল এবং বহুক্ষণ ধরিয়া যে রাশীকৃত তরকারীর স্তূপ বঁটির মুখে সে কুটিয়া ফেলিল, তাহা আবশ্যকের অপেক্ষা পরিমাণে এতই বেশী যে, তাহা দেখিয়া সে নিজেও যেমন চমকাইয়া উঠিল, বামুনঠাকুরের সম্মুখে সেগুলি ধরিয়া দিলে সে-ও মনে মনে তেমনি না চমকাইয়া পারিল না।

যাহা হউক, সে দিনের চিন্তার ধারা তরকারী কুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তর সাঙ্গ হইল না, পরন্তু রান্নাঘরের একাংশে বসিয়া সে আরও অনেক রকম ভাবিতে লাগিল। অনেক চিন্তার পর সে মনে করিল, একবার উপরে অর্চ্চনার কাছে সে যায় এবং তাহার রাগ শান্ত করিয়া আসে। কারণ, তাহার নিমাই দাদা এই সম্বন্ধে তাহাকে যথেষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। যত দিন না অর্চ্চনার নিকট হইতে ঐ পাঁচ হাজার টাকা আদায় হয় এবং তাহাদের অন্যান্য মতলব সিদ্ধ হয়, তত দিন মুখ বুজিয়া থাকিতে হইবে, এই তাঁহার আদেশ, সুতরাং অর্চ্চনার মন যোগাইযা চলা ভিন্ন তাহার পক্ষে এখন গত্যন্তর নাই। কিন্তু শান্ত নিজের মন নিজে বুঝিত না, তাই সে মন যোগাইযা থাকার কথাটা এমন সহজে ভাবিয়া ফেলিল। সে আজীবন স্বাধীনভাবেই কাটাইয়াছে, কখনও কাহারও একটা কথা সে সহ্য করে নাই; এমন কি তাহার স্বামীর পর্য্যন্তও না। সংসারে থাকিয়া পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইলে অতি সাধারণভাবে যে দুই চারিটা কথার আঁচড় পরস্পর সকলেরই গায়ে আসিয়া লাগে, তাহা সে কখনই সহ্য করিতে পারে নাই বলিয়া, আজ সে আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেরই সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। শান্ত নিজের মনের ঠিক সংবাদটি যেমন কখনই পায় নাই, পরের মনের খাঁটি খবরটিও তাহার কাছে অগোচর থাকিয়া যাইত, তাই শুধু আজ বলিয়া নয়, ভবতোষ বাবুর মৃত্যুর পর হইতেই অর্চ্চনার সরল কথাবার্ত্তা, সর্ব্ববিষয়ে তাহার অত্যধিক পরিচ্ছন্নপ্রিয়তা, মিথ্যা লজ্জা ও সঙ্কোচশূন্য ভাব প্রভৃতি বরাবরই তাহার চোখে বিসদৃশ ঠেকিয়া আসিয়াছে এবং এই সব লইয়া অনেক দিনই উভয়ের মধ্যে তর্ক, বচসা, মতান্তর ও মনান্তর

ঘটিয়াছে। অবশেষে নিমাই বাবুর সতর্ক ইঙ্গিতে তাহাকে নীরব হইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু অসহ্য মনঃপীড়ার দুর্ব্বহ ভার তাহাকে বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিতে হইয়াছে।

কিছুক্ষণ রান্নাঘরের মেজের উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিবার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পিছন ফিরিতেই দেখিল, অর্চ্চনা নিঃশব্দে আসিয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উভয়ে মুখোমুখী হইলে অর্চ্চনা অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া কহিল,—"পিসী কি রাগ ক'রে দুদিনের জন্যে কোথাও চ'লে যাচ্ছ না কি?"

শান্ত থতমত খাইয়া কহিল—"এ হেঁয়ালীর অর্থটা কি, অরু?"

"অর্থ এই যে, একেবারে দু'তিন দিনের তরকারী কুটে দিয়েছ, তাই বলছি। কিন্তু যেখানেই যেতে হয় বাপু, একটিনি দিয়ে যেতে যেন ভুলো না, নইলে আমার কথা মনে ক'রে তোমারও ভাত হজম হবে না, আর আমারও মুখ আর কাজের ওপর এই ক'মাসের তোমার হাতের শক্ত বাঁধনগুলো হয় ত সব আলগা হয়ে আসবে।"

শেষের কথাগুলার অর্থ সম্যকভাবে বুঝিবার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি শান্তর ছিল না, সুতরাং সে দিকে কোন কিছু বলিবার চেষ্টা না করিয়া, তাহার প্রথম কথাটির সূত্র ধরিয়া কহিল,—"তা, তরকারী কিছু বেশী না হয় কুটেই ফেলেছি, এইতে কি তোর জমিদারী নষ্ট হয়ে গেল, অরু? বাবা! কথার ধার কি লো! আমি কি তোর সংসার উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতেই এসেছি? একটু আগে তুই যে এক কাঁড়ি টাকা ঐ চাকর ছোঁড়াটাকে দিয়ে দিলি, তার তুলনায় দু'টো তরকারী কি এতই অপব্যয় হয়ে গেল?"

কৃত্রিম মৃদু হাসি হাসিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"কিন্তু সে এক কাঁড়ি টাকার একটা পয়সাও যে অপব্যয় নয় পিসী। তার মধ্যে বেশীর ভাগ ত আমার কাছে তার নিজেরই পাওনা, বাকী যৎসামান্য, ঐ নিরন্ন নিরাশ্রয়দের রোগে এক বিন্দু ওষুধ আর একটুখানি পথ্য।" বলিয়াই অর্চ্চনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং একটু পরেই শান্ত নেপালের ঘরে অর্চ্চনার গলার আওয়াজ শুনিতে পাইল।

সন্ধ্যার পর শান্ত জপের মালা হাতে লইয়া নীচের দালানে থামের আড়ালের অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। অর্চ্চনা সেই সময় উপর হইতে নামিয়া আসিলে তাহাকে কহিল,—"তুই ওপরে ছিলি? কেষ্টা খুঁজে বেড়াচ্ছিল, আমি মনে করলুম, বুঝি বার বাড়ীর ঘরে ঐ এ-র সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প-টল্প কচ্ছিস।"

অর্চ্চনা উপরে তাহার ঘরে বসিয়া এতক্ষণ বাড়ী-ভাড়া আদায়ের কতকগুলি দরকারী হিসাব দেখিতেছিল। কাগজ পত্রগুলি তেমনই ভাবেই খোলা ফেলিয়া রাখিয়া হঠাৎ সে কি একটা কথা শান্তকে বলিবার জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া কহিল,—"গল্প করতে এইবার যাচ্ছি, পিসি। তুমি ত মালা নিয়ে ভগবানের নাম করতে বসেছ, আমার ত সময় কাটাবার কিছু একটা চাই"—বলিয়া অর্চ্চনা বহির্ব্বাটীর দিকেই অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে লাগিল। দু'এক পা যাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"তুমি বরঞ্চ এক কাজ কোরো, নেপাল বাবুর চা-টা ক'রে কেষ্টাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও। আমাদের গল্পটা তা'হলে জমবে ভাল।"

কথাটা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তর মুখ-শ্রীর যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিল, অন্ধকারে অর্চ্চনা যদিও তাহা দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু তাহার মুখের কথাগুলি তাহার কাণে আসিয়া মধু ঢালিয়া দিল—"ওর জন্যে চা-টা তুই তোর নিজের হাতে ক'রে দিলে ভাল হয়, অরু।"

কাছে সরিয়া আসিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"তা হয় জানি। আমারই এষ্টেটের কর্ম্মচারী, আমারই আশ্রয়ে ভদ্রলোকের ছেলে ঘর ছেড়ে এসে রয়েছেন। বাবার স্নেহ, যত্ন, আদর আমার আমলেও যাতে থাকে, আমার সেটা দেখা উচিত বৈ কি। আর তোমরা সব আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, এ সব বিষয়ে যে আমায় পরামর্শ দিচ্ছ, এ-ও আমার কম ভাগ্য নয়। কিন্তু এই কটা দিন বাদে ওঁর স্ত্রী এখানে এলে পরে, তখন আর আমাদের এত ক'রে না দেখলেও চলতে পারবে।"

"তিনিও কি এখানে আসছেন না কি?"

"হ্যাঁ, আসছেন বৈ কি, বাবা কত ক'রে ব'লে গেছেন, জান না।"

শান্ত আর কোন কথা কহিল না, মুখ ফিরাইয়া নীরবে তাহার মালাজপের কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

পরদিন আহারান্তে অর্চ্চনা তাহার কক্ষে বিশ্রাম করিতে যাইলে, শান্ত নীচের একখানা ঘরে বসিয়া কাশীতে পত্র লিখিতে বসিল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক রকম ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেকগুলি ছত্রের পর ছত্র সাজাইয়া যাহা লিখিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, এখানে আর এক দণ্ডও থাকিতে পারিবে না, সুতরাং পত্রপাঠমাত্র সব কাজ ফেলিয়া রাখিয়া তাহাকে যেন এখান হইতে লইয়া যাওয়া হয়।

দিন চারি-পাঁচ পরে তাহার সেই চিঠি পাইয়া যিনি আসিলেন, তিনি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই দালান হইতে উচ্চকণ্ঠে স্নেহের ডাক ডাকিলেন,—"কৈ গো, মা অর্চ্চনা আমার কৈ, অ—শান্ত!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দিন দুই চার পরে একদিন সকালবেলা নীচের দালানে পায়চারি করিতে করিতে নিমাই বাবু শান্ত ও অর্চ্চনাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"স্নেহের টানের যে কত বড় জোর, তা তোরা কি বুঝবি? এই বয়সে, ধর্ম্মের প্রবল স্রোতকেও আমার রুদ্ধ ক'রে দিলে, নইলে তোরা চ'লে আসবার পর নিজের মনের আর নাগালই পাই না। না ভাল লাগে গঙ্গাস্নান, না যেতে ইচ্ছে হয় বিশ্বনাথের মন্দিরে, না লাগে মন জপে-তপে। খালি মনে হয়, এরা দুটো ছেলেমানুষ,—তোর ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স হলেও জগতের তুই কি-ই বা বুঝিস আর কি-ই বা জানিস, সুতরাং অরুও যেমন ছেলেমানুষ, তুইও তাই ছাড়া আর কি,—তা ভাবতুম, এরা দুটী ছেলেমানুষ, কি করছে সেখানে গিয়ে, কেমন আছে, ভগবান্ না করুন, হঠাৎ যদি কোন বিপদ-আপদ হয়,—এই সব দিনরাত্রি খালি মনে হ'ত। এত দিন একরকমে কেটে গিয়েছে, কিন্তু এই ক'মাস সব একসঙ্গে থেকে মায়ার বাঁধন যে কি রকম আমার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে, তা আমিই বুঝতে পারছি—আমিই বুঝতে পারছি। নইলে, কদিনই বা তোরা এসেছিস, এরই মধ্যে আমার মনের ওপর লাগাম ক'সে তোরা ছুট কাটিয়ে আমায় এখানে নিয়ে এসে ফেললি ত?" তাহার পর মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া একটি সুদীর্ঘ শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কহিলেন,—"সবই বিশ্বনাথের ইচ্ছা—সবই বিশ্বনাথের ইচ্ছা!"

তাঁহার কথা ও দীর্ঘনিঃশ্বাস শেষ না হইতেই অর্চ্চনা উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল এবং শান্তও গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বিরক্তিপূর্ণ চাপা গলায় কহিল,—"আমি তা ব'লে কিছুতেই এখানে থাকতে পারব না, এ পাহাড়ী মেয়ের সঙ্গে বনিয়ে থাকা আমার কুষ্ঠিতে লেখে নি।"

হস্ত ও মুখের একটা অত্যদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া রুদ্ধ গর্জ্জনে দাঁতে দাঁতে চাপিয়া নিমাই বাবু কহিলেন,—"তোর মাথা আমি ভাঙ্গবো।" পরক্ষণেই সিঁড়িতে অর্চ্চনার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া সচকিতে কহিয়া উঠিলেন,—"মাথা খারাপ নয়? নিশ্চয়ই তোর মাথা খারাপ, হাজারবার বলব যে, তোর মাথা খারাপ, তুই এতে রাগই কর আর যাই কর। অরুকে প্রাণ দিয়ে ভালও বাসবি, আবার ওর সঙ্গে খিট্-খিট্ করতেও ছাড়বি নি; ছেলেবেলা থেকেই তোকে জানি ত! কিন্তু আমি জানি বলেই না হয় বুঝলুম, কিন্তু হঠাৎ একজন বাইরের লোক, সে ত আর কিছু বুঝবে না, সে মনে করবে, সত্যিই তোর মনের ভেতরটা বুঝি কু'য়ে ভরা। বুদ্ধিশুদ্ধি ত আর কিছুই তোর নেই। অরুর আমার যা বুদ্ধি-শুদ্ধি, জ্ঞান-গম্যি আছে, তার এক কড়াও তোর নেই। অরুর ওপর নিজে তুই রাগ করবি, দু'কথা বলবি, অথচ ওর ওপর আর কেউ যদি তাই নিয়ে রাগ করে বা দুটো কথা বলে, তা আবার তোর সহ্য হবে না। তা এ তোর মাথা খারাপ নয় ত আর কি বলব বল্ না।"

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া হয় ত শ্রোতাদের এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার অবসর দিলেন, কিন্তু উভয় শ্রোতাই যখন পূর্ব্ববৎ নীরবেই বসিয়া রহিল, তখন পুনরায় কহিতে লাগিলেন,—"এই যে নেপাল ছেলেটি, কি সৎ ছেলে বল দেখি! সভ্য, ভব্য, বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র—হীরের টুকরো ছেলে। বাস্তবিক ছেলেটিকে আমি বড্ডই ভালবাসি। গুণেতেই লোক আপন হয় রে শান্ত। পর ত, কিন্তু তা ত মনে হয় না, মনে হয় তুই যেমন, আমার অরু যেমন, নেপালটিও আমার ঠিক তেমনিই। নইলে ভবতোষ দাদা আর বেছে বেছে—আয় রে বাবা, অক্ষয় পরমায়ু হোক তোর, এই বাবাজীর আমার নাম কচ্ছিলুম।"

নেপাল নিকটে আসিয়া কহিল,—"সীতাপতি

মজুমদার ব'লে একটি ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আপনার নাকি অনেক দিনের বন্ধু।"

নিমাই বাবু ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বার-বাটীতে আসিলেন এবং দূর হইতে নেপালের আফিস-ঘরে উপবিষ্ট তাঁহার অনেক দিনের সেই বন্ধুটিকে দেখিয়া, অতীতকালের অনেক দিন ত দূরের কথা, একটি দিনের বন্ধুত্বের কথাও তাঁহার স্মরণপথে উদয় হইল না। নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ম'শায়ের নাম?"

ভদ্রলোকটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিতে করিতে কহিলেন,—"আজ্ঞে, সীতাপতি মজুমদার, জাতি বৈদ্য। আমাকে আপনার বোধ হয় স্মরণ নেই। স্মরণ না থাকাই সম্ভব, নানা কাজের লোক আপনি"—বলিয়া সীতাপতি মজুমদার, জাতি বৈদ্য মহাশয় পরিহিত পাঞ্জাবীর হাতা গুটাইয়া হাতঘড়ীটা একবার দেখিলেন।

নিমাই বাবু কহিলেন,—"ঠিক স্মরণ করতে পারছি না, আপনার নিবাস কোথায় বলুন ত!"

"শ্রীনিবাসপুর, যশোর। আমাকে ততটা আপনি চিনতে পারবেন না, যাঁকে দেখলে চিন্‌তে পারবেন, তিনি যে লজ্জায় গাড়ী থেকে কিছুতেই নামতে রাজী হলেন না। একবার দয়া ক'রে—।" উভয়েই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ পার হইয়া রাস্তার উপর দণ্ডায়মান গাড়ীখানির দিকে অগ্রসর হইলেন।

নিমাই বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠিক বুঝতে পারছি না। যশোর?—যশোরের ক্ষান্তবালা কি?

মজুমদার মহাশয় সহাস্যবদনে কহিলেন,—"আজ্ঞে।"

সেকাণ্ডক্লাস গাড়ীখানির দরজা বন্ধ করা ছিল। নিমাইবাবু আগ্রহ-ভরে তাহা তাড়াতাড়ি হস্ত দ্বারা সরাইয়া ফেলিতেই যেন প্রবল বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। ভিতরে উপবিষ্ট দুই জন কনেষ্টেবল তৎক্ষণাৎ তাঁহার দুই হাত ধরিয়া ফেলিল। তিনি বলপ্রয়োগে ছাড়াইয়া লইতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনেও আরও দুই জন কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া। ব্যাপার দেখিয়া নেপাল তৎক্ষণাৎ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু তাহার আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই শ্রীনিবাসপুরের সীতাপতি বাবুর আদেশে নিমাই বাবুর হাতে হাতকড়া লাগান হইল এবং তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

কয়েক মিনিট পরে নেপালের মুখে সমুদয় শুনিয়া শান্ত আছাড় খাইয়া একেবারে কাঁদিয়া উঠিল, অর্চ্চনা অবাক হইয়া বসিয়া পড়িল এবং নেপাল তখনই কাপড়-চোপড় পরিয়া এই ব্যাপারের সংবাদ জানিবার অভিপ্রায়ে বহির্গত হইল।

অপরাহ্ন পর্য্যন্ত নেপাল কয়েকটি থানা ঘুরিয়া অবশেষে লালবাজারে আসিয়া নিমাই বাবুর সন্ধান পাইল এবং অনেক তদ্বির আয়োজনের পর জানিতে পারিল যে, যে অপরাধের জন্য নিমাই বাবু ধৃত হইয়াছেন, সে অপরাধের মূল আসামী, তিনি নহেন। যিনি মূল আসামী, তাঁহার নাম শুনিয়াই নেপাল ভয়ে ও বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিল। তিনি জগন্নাথ ঘোষ, ওরফে—গয়ারাম আচার্য্য।—তাহাকে কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে ভবানীপুর হইতে ধরিয়া কাশীতে চালান দেওয়া হইয়াছে।

এই ব্যাপারটির আদি অন্ত জানিতে হইলে বৎসর দশ পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত কোন একটি ঘটনার বিষয় জানিতে হয় এবং তাহা শুনিবার পক্ষে যদি কাহারও ধৈর্য্যের অভাব না ঘটে, তাহা হইলে অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহা এইখানে বলা যাইতে পারে।

বৎসর দশ পূর্ব্বে যখন নিমাই বাবুর যাত্রী-তোলা ব্যবসা ছিল, সেই সময় জগন্নাথ ঘোষ নীরদা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে কাশীতে আসিয়া উঠে। নীরদা জগন্নাথের আপন স্ত্রী ছিল না এবং জগন্নাথ তাহাকে পরস্ত্রীর চক্ষুতেও দেখিত না। কেহ বলিত, জগন্নাথ নীরদার স্বামিগৃহ হইতে তাহাকে লইয়া পলাইয়া আসে, আবার কেহ বলিত যে, নীরদাই জগন্নাথের পিতৃগৃহ হইতে তাহাকে সরাইয়া লইয়া আসে। কে কাহাকে লইয়া আইসে, এতৎ সম্বন্ধে মতানৈক্যের মীমাংসাকল্পে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরকে লইয়া গৃহত্যাগী হয় ও ধর্ম্মসঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ করে! যাহা হউক, এই জগন্নাথের সহিত নিমাই বাবুর বিশেষরূপ বন্ধুত্ব জন্মে এবং সে সময় প্রতিদিনই তিনি কোন না কোন সময়ে জগন্নাথের বাসায় আসিতেন কিম্বা জগন্নাথ তাঁহার বাসায় যাইত।

এই সময়ে জগন্নাথের বাসার সন্নিকটে সোনামুখী নামে কলিকাতা সোনাগাছির এক অবসরপ্রাপ্ত রমণী পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশে কাশীবাস করিতে আসে।

সোনামুখীর কিছু নগদ অর্থ ও অলঙ্কারাদি ছিল। জগন্নাথ ও নীরদা প্রায় প্রতিদিনই তাহার গৃহে যাতায়াত করিয়া তাহার শেষ জীবনের অবসর এবং পুণ্যসঞ্চয়ে বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিল। নিমাই বাবুও রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে থাকিয়া কখন কখন অতি গোপনে সোনার সাহচর্য্যলাভ করিতে আসিতেন। এইরূপ সময়ে হঠাৎ এক গভীর রাত্রিতে সোনার ঘরে কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া গেল এবং সেই শব্দে বাড়ীর অন্যান্য দুই একজন ভাড়াটিয়া তাহার ঘরে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে, রক্তাক্ত-কলেবরে সোনার প্রাণহীন দেহ গৃহতলে লুটাইতেছে। পরদিন পুলিস-তদারকে জানা যায় যে, সোনার অর্থ ও অলঙ্কারের লোভে যে লোক তাহাকে খুন করিয়াছিল, ভয়েতেই হউক, কিম্বা লোকজন আসিয়া পড়াতে সময়াভাবেই হউক, সে এতদুভয়ের কিছুই লইয়া যাইতে পারে নাই। যে দুই চারি জন ভাড়াটিয়া সোনার চীৎকারে তাহার ঘরে ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহারা আততায়ীকে ছুটিয়া পলাইয়া যাইবার সময় দেখিতেও পাইয়াছিল এবং চিনিতেও পারিয়াছিল। পুলিস তাহাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা এবং অন্যান্য তদন্তের ফলে যে লোকটিকে আসামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিল, তাহাকে সেই দিন হইতে কাশীতে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই; পুলিসের সকল প্রকার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও সযত্ন অনুসন্ধান ব্যর্থ করিয়া দিয়া জগন্নাথ ও নীরদা সেই হইতেই নিরুদ্দেশ।

দীর্ঘ দশ বৎসর পরে অনেক দিনের অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধানের ফলে, কাশীর পুলিস ভবানীপুর হইতে জগন্নাথ ও নীরদাকে—অর্থাৎ বর্ত্তমানের গয়ারাম ও সুখদাকে গ্রেপ্তার করিয়া কাশী লইয়া গিয়াছে এবং গয়ারাম তাহার পরিত্রাণের আর কোন উপায় যে নাই, তাহা বুঝিতে পারিয়া, নিমাই বাবুকেও এই ব্যাপারে ভাল করিয়া জড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে। গয়ারামেরই একরারমত এক্ষণে পুলিস নিমাই বাবুকে গ্রেপ্তার করিল ও তাঁহাকে কলিকাতা হইতে কাশী লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিল।

এই ঘটনায় শান্ত একেবারে অধীর হইয়া পড়িল; অর্চ্চনাকে কহিল,—"তোর তিনি হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, অরু, তাঁর এই বিপদের সময় তোর একটু দেখা উচিত। ভগবানের ইচ্ছায় তোর টাকার অভাব নেই। তোরই বাড়ী থেকে একজন নিরপরাধ ভাল লোককে চক্রান্ত ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল, তাঁরে বাঁচানো তোরই কর্ত্তব্য মা, এতে তোর পুণ্যি হবে। অমন ভাল লোক যে মিছামিছি একটা দায়ে পড়লেন, মা বসুমতী কখ্‌খনো এ অন্যায়—"

মুখের কথা তাহার কাড়িয়া লইয়া অর্চ্চনা কহিল,—"সহ্য করবেন না পিসী, কখ্‌খনও সহ্য করবেন না। হয় ত ত্রেতাযুগের মত আর একবার তিনি বুক চিরে তাঁর এই সন্তানটিকেও মিথ্যে কলঙ্কের দোষ থেকে বাঁচাবার জন্যে তাঁকে তিনি কোলে টেনে নেবেন। তাই আমি ভাবছি, মা-বসুমতীকে টেক্কা দিয়ে এ কাজে আমার নামা কিছুতেই উচিত হয় না, পিসী;—কি বলেন নেপাল বাবু?"

নেপাল সেইখানে উপস্থিত ছিল, নিরুত্তরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বোধ হয় মনে মনে হাসিতে লাগিল। শান্ত আর কিছু না বলিয়া অন্যত্র উঠিয়া গেল এবং পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"আমি আর নেহাৎ অধর্ম্মটা করতে পারব না, আমারও তিনি অনেক করেছেন। দাদার দেওয়া ঐ পাঁচ হাজার টাকা তুই তা হ'লে আমায় দিয়ে দে, আমার সাধ্যে যতটুকু হয়, একবার গিয়ে করি। দোহাই মা তোর, প্রাতর্বাক্যে তোকে আশীর্ব্বাদ করছি অরু, তোর ভাল হবে, টাকাগুলি এই সময়ে আমায় দিয়ে দে মা।"

অর্চ্চনা আঙ্গুলে কাপড়ের খুঁট জড়াইতে জড়াইতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"ও সবের ভেতর আমি নেই পিসী। টাকা-কড়ির ব্যাপার,—সে সব জানেন ঐ নেপাল বাবু, বাবা যাঁর ওপর তাঁর এষ্টেটের ভার দিয়ে গিয়েছেন। আমি খালি এইটুকু পারি যে, একজন লোক সঙ্গে দিয়ে তোমায় কাশী পাঠিয়ে দিতে পারি, এমন কি, আজই রাত্রিতে যদি যেতে চাও ত তাও পাঠিয়ে দিতে পারি"—বলিয়া অর্চ্চনা বারান্দা পার হইয়া বাগানের দিকে চলিয়া গেল। অগত্যা নেপালকে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিতে হইল,—"টাকা আপনার আমাদের কাছে তোলা থাকলো, পিসীমা। মনে করুন, মকর্দ্দমায় যদি বিলেত আপীলই করতে হয়, তখন ঐ টাকাতেই করতে হবে,—বুঝছেন না? আপনি বরং শীগ্‌গির সেখানে চ'লে যান, তাতেই অনেক কাজ হবে। এখানে আর একটা দিনও আপনার থাকা চলে না।"

শান্তর গলার স্বর ধরিয়া আসিয়াছিল। জোরে একটা টানা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু কহিল,—"আচ্ছা, তাই হবে। জানি আমি যে, এ স্থলে আমার আসাও ঠিক হয় নি, থাকাও ঠিক হয় নি। তা' বেশই হ'ল।"

নেপাল শান্তর অসন্তোষ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, জিজ্ঞাসা করিল,—"তা হলে আজই যাবেন ত?"

কোন উত্তর না দিয়া শান্ত ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

উত্তর না দিলেও, শান্ত সেই দিনই কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল এবং অর্চ্চনাও তদুপযুক্ত ব্যবস্থা করিরা তাহাকে কাশী পাঠাইয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িল। নেপালকে কহিল,—"পাপ কাটলো, নেপাল বাবু। কালকে বাড়ীশুদ্ধ সব গিয়ে গঙ্গায় গোটাকতক ক'রে ডুব দিয়ে আসতে হবে। উঃ! কি সাংঘাতিক! এর ভেতর যে এত ব্যাপার, তা কে জানে বলুন। যাক্——পাপ বিদেয় হ'ল, না বাঁচা গেল!"

নেপাল কহিল,—"কিন্তু আবার ত 'রিটার্ণ জারনি' ক'রে টপ ক'রে এক দিন এসে পড়তেও পারেন, সুতরাং ভয়ের কারণ একেবারে যে কেটে গেল, তাও বলা যেতে পারে না।"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অর্চ্চনা কহিল, —"সর্ব্বনাশ! ও ভয় আর দেখাবেন না, নেপাল বাবু, রক্ষে করুন।"

"তবে এক কাজ করা যাক। ওঁকে এই ব'লে একখানা চিঠি লিখে সাবধান ক'রে দেওয়া যাক যে, আপনি আর এখানে কদাপি আসবেন না, যেহেতু কাশীর সেই সোনামুখী ভূত হয়ে এখানে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে, আপনাদের দলের কাকেও এখানে দেখতে পেলেই হয় ত পেয়ে বসবে আর ঘাড় ভাঙ্গবে।"

ঘড়ীর দিকে চাহিয়া, সহাস্যে অর্চ্চনা কহিল,— "ভূতে কারুকে পেয়ে ঘাড় ভাঙ্গুক আর নাই ভাঙ্গুক, আমার কিন্তু পেটে ক্ষিধেও যেমন পেয়েছে, ঘুমেতে চোখও তেমনই ভেঙ্গে আসছে,"—বলিয়া অর্চ্চনা নেপালের সম্মুখস্থ চেয়ারখানি হইতে উঠিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া যাইতেই ঘড়ীতে ঠং ঠং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল।

কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার পর শান্তর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। সে নিজেও কোন পত্রাদি দেয় নাই, অর্চ্চনারও তাহার সংবাদের জন্য কোনরূপ ঔৎসুক্য ছিল না। তবে নিমাই বাবুর মকর্দ্দমার ফলাফল জানিবার জন্য নেপাল ও অর্চ্চনা উভয়েরই কতকটা আগ্রহ ছিল, সুতরাং এ সম্বন্ধে যেমন করিয়াই হউক, তাহারা কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিত এবং তাহারই ফলে জানিতে পারা গিয়াছিল যে, শান্ত কাশী পৌঁছিয়া কোন রকমে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিমাই বাবুর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য দুই একজন উকীল নিযুক্ত করিয়াছে এবং গয়ারামের পক্ষ হইতেও কে একজন তদ্বির-আয়োজনাদি করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে।

যথাদিনে এই খুনী মামলার বিচার শেষ হইয়া রায় বাহির হইল। সকলে আশা করিয়াছিল যে, গয়ারামের প্রাণদণ্ড হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। দীর্ঘদিন পরে বিচার হওয়ায় অনেক সাক্ষীকে পাওয়া যায় নাই এবং অন্যান্য অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিবার পক্ষেও অনেক অসুবিধা ঘটিল। ফলে, শেষ পর্য্যন্ত ইহাই প্রমাণিত হইল যে, গয়ারামের হস্তস্থিত দা'য়ের আঘাতে সোনার মৃত্যু ঘটিলেও, গয়ারামের খুন করিবার উদ্দেশ্য ছিল না। সোনার নিজের হঠকারিতা এবং দোষেই সে আঘাত প্রাপ্ত হয় ও তাহার মৃত্যু ঘটে। আরও প্রমাণিত হইল যে, এই কার্য্যে নিমাই বাবুই গয়ারামকে পরামর্শদান, উত্তেজিত ও সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিচারে গয়ারামের শুধু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের ব্যবস্থা হইল এবং নিমাই বাবু এই ব্যাপারে পরোক্ষভাবে জড়িত বলিয়া তাঁহার দশ বৎসরের জন্য কারাবাসের হুকুম হইল। কাশীতে অসির ওদিকে অর্চ্চনাঘাট তৈরী, কেদারঘাটের আটহাজার টাকার বাড়ী, কাঙ্গালীদের জন্য অন্নসত্রের আয়োজন, ভবতোষ বাবুর এষ্টেটের পরিচালন প্রভৃতি সৎকার্য্যগুলি আপাততঃ দশ বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিয়া তাঁহাকে বর্ত্তমানে কারাতীর্থ আশ্রয় করিতে হইল। সুখদাকে পুলিস জড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু বিচারে তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সে অব্যাহতি পাইল।

মকর্দ্দমার এই সংবাদ আনিয়া যে দিন নেপাল অর্চ্চনাকে জানাইল, সে দিন অর্চ্চনা কহিল,— "শান্ত পিসীর এ বাড়ীতে 'রিটার্ণ জারনি' বোধ হয় কোনকালেই আর হবে না, কখনও তেমন ইচ্ছা তিনি করলেও, তাঁর টিকিট বন্ধ। এইবার কিন্তু আপনার একটা ক'জের পালা পড়েছে,

নেপাল বাবু। আপনার স্ত্রীকে এইবার এখানে আনতে হবে। আর আপনার কোন ওজরই আমি শুনব না। বাবার শেষ কথা যে আপনি নিশ্চয়ই রাখবেন, তাতে আমি এক তিল সন্দেহ করি না। দেখুন না, বাড়ীতে একটা কথা কইবার কেউ সঙ্গী নেই, কি ক'রে কাটাই বলুন ত? তাঁকে এখানে নিয়ে এলে সত্যি আমি যে কত সুখী হব!"

নেপাল এ কথার কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া একখানা বইয়ের পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।

অর্চ্চনা কহিল,—"তার পর মস্ত একটা কাজ করবার রয়েছে। কটক থেকে নায়েব মশাই একবার সেখানে যাবার জন্যে কেবলই লিখছেন, সেখানে একবার যেতেই হবে। জমীদারী আমার যতটুকু হোক, আর যে কটাই সেখানে আমার প্রজা থাক্, তারা আমার সন্তান, আমি তাদের মা। তাদের যখন একবার আমাকে দেখবার ইচ্ছে হয়েছে, আমি না গিয়ে পারি না,—কি বলেন আপনি?"

অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে নেপাল কহিল,—"সে ত নিশ্চয়ই।"

তাহার পর অর্চ্চনা এই সূত্রে আরও কি সব বলিল, নেপাল তাহার সবটা হয় ত শুনিল, হয় ত শুনিল না, তাহার আনত মুখ খোলা বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া রহিল এবং অর্চ্চনার প্রথম কথাটা লইয়াই তাহার মনে ভাবের পর ভাব আসিয়া চাপিয়া বসিতে লাগিল।

অর্চ্চনা উঠিয়া দাড়াইয়া কহিল,—"পড়ার আর আপনার ব্যাঘাত করব না, কিন্তু আমার কথাগুলো কাণে গিয়েছে ত?"

নেপাল বই হইতে মুখ তুলিয়া লইয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিল,—"চোখ দিয়েই পড়ছি, কাণ আমার ঠিকই আছে।"

আমার কিন্তু পড়বার সময়, চোখ, কাণ, মন সকলে মিলেই পড়ে,—যাক্—এই হপ্তার মধ্যেই আপনার স্ত্রীকে এখানে আনা চাই। তিনি এলেই সকলে মিলে আমরা কটকে যাব।"

অর্চ্চনা উঠিয়া গেলে, একটা কথা অনবরত নেপালকে পীড়া দিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বেও কথাটা মধ্যে মধ্যে তাহার মনে পড়িয়া তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কথাটা এই যে, সে তাহার স্ত্রী বর্ত্তমান আছে বলিয়া ভবতোষ বাবুর কাছে গোড়ায় যে পরিচয় দিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে অনর্থক সত্য গোপন করিয়া একটা অতি বিশ্রী কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন কোন্ ছলে সে তাহা শোধরাইয়া লইবে? এখন এমন সময় আসিয়াছে, যখন একসময়কার সামান্য সেই মিথ্যা, অসামান্য গুরুত্ব সৃষ্টি করিয়া ভিতর ভিতর তাহাকে যৎপরোনাস্তি একটা অসুবিধা ও অতৃপ্তির অবস্থায় ফেলিয়াছে। অথচ এখন নূতন করিয়া সত্যপ্রকাশ করার মত একটা অশোভন হেঁয়ালীর সৃষ্টি করিতেও তাহার যথেষ্ট বাধিতেছে, এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া এত দিন এই ব্যাপারের একটা প্রতিকারের পন্থা চিন্তা করিতে করিতেই তাহার দিনের পর দিন কাটিয়া গিয়াছে এবং যতই দিন গিয়াছে, পন্থা-নির্দ্ধারণের পরিবর্ত্তে ততই তাহার স্ত্রী বর্ত্তমান থাকার অলীক পরিচয়টাই মিথ্যার আসনে নিজের স্থান সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু এত দিনের পর এইবার হয় তাহাকে সত্য প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে, নয় ত এই মিথ্যা উক্তিকেই বজায় রাখিবার জন্য আরও অসংখ্য নূতন মিথ্যার দড়ি-দড়া দিয়া ইহার চারিদিকের বাঁধন কষিতে হইবে।

দিন পাঁচ সাত পরে অর্চ্চনার ক্রমাগত পীড়াপীড়িতে নেপাল শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া দিন দুয়েকের জন্য কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিল এবং অর্চ্চনাকে জানাইল যে, বর্ত্তমান দুই চারি মাস তাহার স্ত্রীর এখানে আসার পক্ষে কতকগুলি অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত, অর্থাৎ বাড়ীতে তাহার পিস্-শাশুড়ির শরীর ভাল নহে, তাঁহাকে অসুস্থ অবস্থায় সেখানে একলা রাখিয়া আসা যায় না, তাহা ছাড়া সম্মুখে বর্ষা আসিতেছে, ঘরদ্বার সব মেরামত, ছাওয়ান আছে, ধান কলাই আলু প্রভৃতি সব একাকার হইয়া পড়িয়া আছে, সম্মুখেই চাষ-আবাদের সময়—ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং পিস্-শাশুড়ির দেহ একটু সারিলে এবং কাজকর্ম্ম সব কতকটা গোছাইয়া লইয়া আশ্বিন মাসের গোড়াতেই তাহার স্ত্রীকে নিশ্চয় এখানে আনা যাইতে পারিবে।

নেপাল ভাবিয়াছিল যে, বর্ত্তমান ধাক্কা সে কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া ভবিষ্যতে ভাল করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা হয় ইহার একটা ব্যবস্থা করিবে।

যাহা হউক, নেপালের কথা শুনিয়া অর্চ্চনা কতকটা মনঃক্ষুণ্ণ হইল ও দুই এক দিনের মধ্যেই

কটকে তাহার জমীদারীতে যাইবার জন্য আবশ্যকীয় উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত অনন্ত নীলাম্বুরাশি, পশ্চাতে—দূরে অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ গৃহ ও তরুরাজি-পরিবেষ্টিত জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবমন্দির, মধ্যে বিস্তীর্ণ সৈকতোপরি অর্চ্চনা ও তাহার হাত কয়েক দূরে নেপাল বসিয়া ছিল।

অপরাহ্নের সূর্য্য পশ্চাতের উচ্চচূড় মন্দিরান্তরালে নামিয়া পড়িয়াছিল। সম্মুখে বহুদূরে আসন্ন সায়াহ্নের অল্পান্ধকার সাগর-জলে মিশিয়া ক্রমেই চতুর্দ্দিকে অল্পে অল্পে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সীমাহীন সিন্ধুর গম্ভীর বিশালতায় আবিষ্ট হইয়া নেপাল সম্মুখের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া তন্ময়চিত্তে নীরবে বসিয়া থাকিবার পর হঠাৎ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল,—"যারা ভগবান্‌কে খুঁজতে গিয়ে যুক্তি-তর্কের কূল-কিনারা পায় না, এ দেশে তারা কি বলে?"

অর্চ্চনা কহিল,—"এ দেখে তারা বলে—সমুদ্র, —চলুন এখন, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। যত দেখবেন, দেখবার সাধ আর মিটবে না, নেপাল বাবু। একবার গোঁসাইজীর আশ্রম হয়ে যেতে হবে, উঠুন।"

নেপাল উঠিয়া দাঁড়াইল।

আজ সাত দিন হইল নেপাল ও অর্চ্চনা পুরী আসিয়াছে। আরও দুই চারি দিন এখানে থাকিয়া সকলে কটক যাইবে। বামুনঠাকুর, কেষ্ট ও এক জন ঝি ছাড়া অর্চ্চনা প্রতিবাসী সত্যর মা ও সত্যচরণকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে। সত্যর মাকে অর্চ্চনা খুবই ভালবাসে, সত্যচরণ কলেজে পড়ে, অর্চ্চনাকে 'মাসী' বলিয়া ডাকে। আজ শান্ত থাকিলে, হয়-ত ইহাদের সঙ্গে করিয়া আনিবার আবশ্যক হইত না।

পথ চলিতে চলিতে নেপাল কহিল,—"এ দেশের লোক ভাগ্যবান যে, এই মহাসৌন্দর্য্যের খনি তাদের চোখের সামনে নিত্য নিয়ত বিরাজ করছে।"

অর্চ্চনা কহিল,—"সে হিসেবে আমাদের ভারতের কোন দেশেরই লোক কম সৌভাগ্যশালী নয়। বাবার সঙ্গে আমি ত অনেক দেশেই বেড়িয়েছি, ভারতবর্ষের মত এমন সুন্দর, এমন শ্রেষ্ঠ, এমন বৈচিত্র্যে ভরা দেশ জগতে যে আর নেই, আমার বোধ হয়, অক্ষরে অক্ষরে সে কথা সত্যি। পাহাড়-পর্ব্বত, সাগর-প্রান্তর, নদ-নদী, হ্রদ-মরু, ঝরণা-প্রপাত কিছুরই এ দেশে অপ্রতুল নেই। এমন শান্ত পল্লীদৃশ্য, এমন সোনার শস্যের মাঠ, এমন ফল-ফুলের শোভা, এমন ধর্ম্ম, এমন ধার্ম্মিক, এমন হৃদয়, এ দেশ ছাড়া আর কোথাও নেই। বাবা বলতেন যে, খালি দু'টি জিনিস এ দেশে নেই, —আগ্নেয়গিরির আগুনের স্রোত আর ভূমিকম্পের সর্ব্বনেশে কম্পন।"

"বাস্তবিকই তাই। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে দেশের এই শ্রী-সম্পদের এক কণাও ভোগে হ'ল না। আমার মনে হয়, জীবনের সুখ টাকা-পয়সা, গয়না-গাঁটী, বিষয়-আশয়, গাড়ী-ঘোড়ার মধ্যে নেই; আছে ভগবানের সৃষ্টির এই সব সৌন্দর্য্যভোগের ভেতর। কিন্তু সংসারের কাজকর্ম্মের মধ্যে থেকে প্রকৃতির এই সব শ্রী-সম্পদের সঙ্গে পরিচয়লাভ আর আমাদের ঘটেই উঠে না। পাহাড়-পর্ব্বত, সাগর-ঝরণা দূরের কথা, মাথার ওপর অনন্ত নীল-আকাশের যে সৌন্দর্য্য-লীলা, তাই বা কখন্ চেয়ে দেখি বলুন। চোখের সামনে, কাণের কাছে দিয়ে বছর বছর ছটা ঋতু যে অনবরত ডাক দিয়ে—সাড়া দিয়ে চ'লে যায়, আসে, তাও কি কখন আমরা ফিরে চাই? কত বসন্ত, কত বর্ষা, কত শরৎ, তাদের মধু ছড়াতে ছড়াতে কখন্ কোন্ সময়ে যে আসে আর যায়, তার আভাস পর্য্যন্ত আমরা জানিতে পারি না। আমাদের অবস্থা ঠিক কি রকম জানেন? যেন সোনা ফেলে আঁচলে গেরো।"

"আপনার ভেতর কবিত্ব দেখছি কম নেই, নেপাল বাবু!"

"আর আপনার ভেতর বুঝি কম আছে বলতে চান? এ দেশের ত সকলেই কবি। স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, মুটে-মজুর, রাজা-প্রজা সকলেরই ভেতর ছন্দভরা। ভগবান এ দেশ কবিতার ছন্দে সৃষ্টি করেছেন, এর আকাশে সুর, মাঠে সুর, পাহাড়-পর্ব্বত জল-স্থল সর্ব্বত্রই এর সুরেভরা। এ দেশের ধোপায় কাপড় কাচে গান গেয়ে, গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকায় গান গেয়ে, কুলী-মজুর কাজ করে গান গেয়ে, দাঁড়ি-মাঝিরা নৌকো বায়, গান গেয়ে। তাই এ দেশের ভিখারী, ফকির, পান্থ,

তীর্থযাত্রী সকলের মুখেই গান। এমন কি, এ দেশের ফুল শুধুই রং ছড়ায় না, গানের সঙ্গে সঙ্গে সে নিত্য ফুটে উঠে, পাখীরা গান গেয়ে গেয়ে আকাশে উড়ে। এমন কবিতার দেশ—এমন গানের দেশ জগতের আর কোথাও আছে বলতে পারেন?"

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত অর্চ্চনা কহিল,—"কিন্তু বাবার মুখে শুনেছি, কে এক জন খুব বড় ইংরাজ পণ্ডিত না কি ব'লে গেছেন যে, দেশ যত বেশী অসভ্য আর মূর্খ থাকে, তাব গান-কবিতাও তত বেশী থাকে। জ্ঞানের দেশে, সভ্যদেশে, কবিতা-গানের জন্ম হয় না। তা দেশ ছিল জংলী, লোক ছিল সব বুদ্ধিশুদ্ধিহীন অজ্ঞান বালকের মত, তাই গানেতেই দেশ ভরে আছে।"

"দেখুন, বেশী লেখাপড়া শিখি নি, কে কি বলে গেছেন, সে সব খবর রাখি না, তবে যিনি বলে গেছেন, তিনি যেই হোন, তিনি মানবজীবনের সত্যকার আসল বস্তুর সন্ধান পান নি। ভারতের বেদ-উপনিষদের গান বাদ দিলেও, তার চল্‌তি মেঠো-গানের ভেতর যে গভীর জ্ঞানের ইঙ্গিত থাকে, তা বুঝতে তাঁর মত সভ্যদেশের পণ্ডিতকে আরও কিছু জ্ঞানী হতে হবে, না হলে তিনি ভারতের সভ্যতার ওজনই ঠিক বুঝতে পারবেন না।"

মৃদু হাসিতে হাসিতে অর্চ্চনা কহিল,—"তা যাই কেন বলুন না, এ দেশেব লোকের মত এমন আল্‌সে জাত ত আর জগতের কোথাও নেই। পরিশ্রম করতে পারবে না, কাজকর্ম্ম করতে পারবে না, দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে পারবে না, পারবে শুধু ব'সে ব'সে গান করতে।"

একটু উত্তেজিত হইয়া নেপাল কহিল,—"পরিশ্রম করবার এ দেশের লোকের কোন কালেই দরকার যে হ'ত না। আপনি জগতের লোকের সঙ্গে তুলনা করছেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে এ দেশের তুলনা হয় না। এ দেশের লোক বিনা পরিশ্রমেই বসে বসে পেট পূরে খেতে পেত, পরতে পেত, খাওয়া-পরার জন্যে এ দেশের লোকের মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌বার দরকারই যে হ'ত না। শুধু সমুদ্রের নোণা জল, পাথরের চাঁই আর বরফের স্তূপ দিয়ে এ দেশকে ভগবান ত তৈরী করেন নি।"

"মস্ত মস্ত কথা ব'লে অন্যমনস্ক ক'রে দিচ্ছেন, আর এই অন্ধকার পথে খালি হোঁচট খেয়ে মরছি! তাই না হয় একটু আস্তে আস্তে চলুন।"

নেপাল চলিবার গতি অপেক্ষাকৃত মৃদু করিয়া কহিল,—"সুতরাং অন্ন-বস্ত্রের জন্যে এ দেশকে কখনই ভাবতে হয় নি ব'লে চিরকাল এরা শুধু পরিপূর্ণ সন্তোষের সঙ্গে গান গেয়ে আনন্দ খুঁজে এসেছে আর ভগবানের সন্ধান বার ক'রে তাঁর পায়ের ধুলোয় জীবন লুটিয়ে দিয়েছে।"

"ভারি কাজ করেছে। কর্ম্মই হ'ল জীবের ধর্ম্ম, সেই কর্ম্মশূন্য হয়ে——"

"কর্ম্মশূন্য কি বলছেন, বুঝতে পারছি না। খালি অন্ন-বস্ত্রের জন্যে হন্নে হয়ে কামড়া-কামড়ি ক'রে মাথাব ঘাম পায়ে ফেল্‌লেই বুঝি মস্ত কর্ম্ম করা হয়, আর সেই সূত্রে দুটো চারটে কল-কব্জা বানালেই বুঝি খুব করা হয়ে গেল? তাই যদি হয় ত পরিপূর্ণ সন্তোষ তারা পায় না কেন? আসল যাকে কর্ম্ম বলে, তা করেছে এই দেশেরই লোক। এরা নিজেরাও যেমন খেয়েছে, পরকেও তেমনি খাইয়েছে। মুষ্টি-ভিক্ষে, অতিথি-সেবা, অন্নসত্র, এ সব শুধু এদেশেরই জিনিস। এরা কখন সত্য ছাড়া মিথ্যা বলে নি, চুরি বাটপাড়ি ডাকাতি জানে নি, পরের জিনিসের লোভে মারামারি কাটাকাটিও করে নি। এরা খেয়ে, খাইয়ে, আনন্দ নিয়ে কাটিয়েছে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যলাভ করেছে, আর সব শেষে পরমানন্দের সন্ধান পেয়ে চ'লে গেছে।"

অর্চ্চনা আর কোন কথা কহিল না, নীরবে চলিতে লাগিল।

নেপাল কহিল,—"অবশ্য দেশের সে অবস্থা যদিও এখন আর নেই—"

"নেই কেন নেপাল বাবু? দেশের সে রূপ নষ্ট হ'ল কিসে?"

"এ বিষয়ে অনেকের অনেক মত; তবে আমার বোধ হয় যে, দেশের লোকের ভেতর কিছু পাপ ঢুকেছে, সেই জাতীয় পাপের জন্যেই দেশের এই অবস্থা। আমাদের শ্যামসুন্দরপুরের আমিই ছেলেবেলা যে রূপ দেখেছি, এখন তার আর এক তিলও নেই। শুধু শ্যামসুন্দরপুরই বা বলি কেন, সব পল্লীগ্রামেরই সমান দুর্দ্দশা। আমিও হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ো জেলার অনেক গ্রাম বেড়িয়েছি, গ্রামের সব অবস্থা দেখলে সত্যিই চোখ ফেটে জল আসে। এখনকার তাদের এই ধ্বংসের ছবি দেখলেই, কি যে তাদের শ্রী ছিল, তা বেশ বুঝতে পারা যায়।"

এই সময় পথিমধ্যে থমকিয়া দাঁড়াইয়া অর্চ্চনা বলিয়া উঠিল,—"ঐ যাঃ!"

নেপাল জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলুন ত ?"

"গোঁসাইজীর আশ্রমে যাওয়া হ'ল না ত।"

বাসার কাছেই প্রায় তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। নেপাল কহিল,—"আজ আর ফিরে এতটা পথ গিয়ে কাজ নেই। কাল সকালে বরঞ্চ একবার যাবেন।"

শ্যামদাস গোস্বামী বহু কাল হইতে পুরীতে আছেন। তিনি সংসারত্যাগী, মুক্ত পুরুষ। এই কয় দিনই সমুদ্রতীরে তাঁহার সহিত অর্চ্চনাদের প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং নানা প্রকার কথাবার্ত্তা আলাপ-আলোচনাদি হইয়াছে। দুই এক দিনের এই একটুখানি মেলা-মেশাতেই অর্চ্চনা তাঁহার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশালিনী হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সত্যর মা'র শরীর ভাল ছিল না বলিয়া অর্চ্চনা সত্যকে বাসায় রাখিয়া আসিয়াছিল এবং সমুদ্রতীরে আসিয়াও আজ তাহারা গোঁসাইজীর সাক্ষাৎ পায় নাই। তাই ফিরিবার পথে তাঁহার সংবাদ জানিবার অভিপ্রায়ে অর্চ্চনা তাঁহার আশ্রম হইয়া আসিবার কথা বলিয়াছিল।

যাহা হউক, পরদিন প্রাতঃকালে অর্চ্চনা স্নানান্তে অভ্যাসমত জগন্নাথের মন্দিরে যাইবার উদ্দেশে সত্যকে সঙ্গে লইয়া বাসা হইতে বহির্গত হইল এবং সরাসর মন্দিরে না যাইয়া প্রথমেই গোঁসাইজীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একটুখানি বাগানের মধ্যে গোঁসাইজীর ক্ষুদ্র কুটীর। বারান্দায় একখানি মাদুরের উপর তিনি তখন কাৎ হইয়া শুইয়া ছিলেন। অর্চ্চনা আসিয়া দাঁড়াইতেই কহিলেন,—"মা, কাল থেকে একটু জ্বরের মত হয়েছে।"

অর্চ্চনা তত্রত্য ধূলার উপর বসিয়া পড়িয়া তাঁহার কপালে ও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। গোঁসাইজী কহিলেন,—"সে আজ পনর বছরের কথা, পাঁচ বছরের একটি ছোট মেয়ের কচি হাত জোর ক'রে ছাড়িয়ে এখানে চ'লে এসেছিলুম। সংসারে সেই ছিল শেষ বাঁধন। তোকে মা দেখে অবধি এত দিন পরে তার কথা আমার মনে পড়ে।" গোঁসাইজীর অন্তর হইতে দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস অল্পে অল্পে বাহির হইল।

অর্চ্চনা জিজ্ঞাসা করিল,—"সে মেয়ে, বাবা, আপনার আছে ?"

"থাকলে এত দিনে ঠিক তোরই মত হত, মা লক্ষ্মী।"—বলিয়া গোঁসাইজী হাত দিয়া আকাশের দিকে দেখাইয়া দিলেন। "তার মামার হাতে দিয়ে এসেছিলুম, বছর দুই পরে খবর পেলুম যে, জগন্নাথ আমায় পুরোপুরিই মুক্তি দিয়েছেন।"

ইহার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত গোঁসাইজী নীরবে রহিলেন এবং অর্চ্চনা বসিয়া বসিয়া তাঁহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

সে দিন গোঁসাইজীর আশ্রম এবং জগন্নাথের মন্দির হইয়া বাসায় ফিরিতে অর্চ্চনার একটু বেলা হইল।

পরদিন অপরাহ্ণে অর্চ্চনা, নেপাল, সত্যর মা ও সত্যচরণ সকলে মিলিয়া গোঁসাইজীকে দেখিতে আসিল। গোঁসাইজীর সে দিন আর জ্বর হয় নাই, ভালই ছিলেন। কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া সকলে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

নেপালের কি একটা কথার উত্তরে গোঁসাইজী বলিলেন,—"বাবা, প্রকৃতির সব জিনিসেরই ওপর তিনি স্বপ্রকাশ। পাহাড় সমুদ্র দেখতে দেখতে তাঁর বিরাটরূপ যেমন চোখের সামনে ভাসে, ছোট একরত্তি একটা বন-যুঁইয়ের মধ্যে তেমনই তাঁর মধুর কচি রূপটি যেন ফুটে ওঠে। লক্ষ রূপে লক্ষ সুরে তিনি আমাদের চোখে-কাণে সাড়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন, আমরা চোখ-কাণের দরজা যদি বন্ধ ক'রে রাখি, তা হ'লে তাঁকে ধরব কি ক'রে বাবা!"

নেপাল কহিল—'আমিও ঠিক তাই বলি, বাবা। তাই সহরে থাকতে বাধ্য হলেও, মন আমার এতে বরাবরই নারাজ। মন আমার অহর্নিশি আমাদের সেই শ্যামসুন্দরপুরের মাঠে-ঘাটেই ছুটে পালিয়ে যায়। সেখানকার সেই পল্লী-শ্রী, পায়ে-চলা সেই মাঠের পথ, সেই আম-কাঁঠালের বাগান, বাঁশ-ঝাড়, ঝোপ-জঙ্গল, নদীপারের সেই কাশ-বন আর পাটের ক্ষেত, গ্রাম-প্রান্তের সেই পদ্ম-ফোটা বিল, এ-সবের যে রূপ, সহরের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সে রূপ আমি খুঁজে পাই না।"

গোঁসাইজী কহিলেন,—"বাঙ্গালার পাড়া-গাঁ রূপেরই খনি ছিল বটে, কিন্তু সে রূপ আর এখন নেই, বাবা। ষোল বৎসর পরে এবার জন্মভূমিকে একবার দেখতে গিয়েছিলুম। দেখলুম, সে রামও নেই—সে অযোধ্যাও নেই। গ্রামের দুর্দ্দশা দেখে চোখে জল এসে পড়ল, বাবা!

নদিয়া জেলার আমাদের সেই নারাণপুরের কি শ্রী-সম্পদই না ছিল, গিয়ে দেখলুম, এই ষোল বছরের ভেতর তার সব গিয়েছে। সিন্দুক ভেঙ্গে কে যেন তার ভেতরকার সোণা-দানা মণি মাণিক্য সব চুরি ক'রে পালিয়ে গিয়েছে। গ্রামের সে আনন্দ নেই ; সে শান্তি, সে সজীবতা, সে কোলাহল, সেই সব উৎসব, সে সবের আর কিছুই নেই ; যেন ভানুমতীর বাজীর মত এই ক'বছরের ভেতরেই নিঃশেষে সব উবে গিয়েছে! যেন এক সর্ব্বনেশে ঝড়ের ঝাপটায় মা কমলার আঁচলখানি গাঁয়ের উপর থেকে কোথায় উড়ে চলে গেছে।"

দুই হাঁটুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে থাকিবার পর গোঁসাইজী আবার বলিতে লাগিলেন,—"পাপ—পাপ, পাপেতেই এই হয়েছে, নইলে তেমন সাজানো বাগান সব এমন ক'রে কখনও শুকিয়ে নষ্ট হয়! দেখলুম, সেই আমাদের বারোয়ারীতলা, মাঠ হয়ে প'ড়ে রয়েছে, সাধারণের পূজোর সেই প্রকাণ্ড মণ্ডপ, ভাঙ্গা ইটপাথরের স্তূপ হয়ে খাঁ খাঁ করছে। গোপীনাথের মন্দির, দোলমঞ্চ, রাস-মণ্ডপ, কদমবেদী, বকুলবেদী, এ সব শুধু ধুলোয় মিশতেই বাকী। পাড়ার পথগুলোতে মানুষের পায়ের দাগ আর পড়ে না, সাপের আঁকা বাঁকা দাগই শুধু দেখতে পাওয়া যায়। তা'ও দু'পাশের ঘন বন এগিয়ে এসে সে পথগুলোকে পর্য্যন্ত যেন গেলবার উপক্রম করছে। পাপে নইলে আর এমনটা কখন হয়, বাবা? শুধু কি আমাদের নারাণপুর, বাঙ্গালার সব গাঁয়েরই এই দুর্দ্দশা! এ যেন সেই গল্পের দেশের অবস্থা, হাতী-শাল আছে—হাতী নেই, ঘোড়াশালে ঘোড়া নেই, বাড়ী আছে মানুষ নেই, বাজার আছে পণ্য নেই! ঐশ্বর্য্যময়ী অম্বিকার এ যেন বিসর্জ্জনের পরের মাটী ছাড়া খড়ের মূর্ত্তি! ম্যালেরিয়া মহামারীতে দেশও যেমন উৎসন্ন গিয়াছে, দেশের লোকও যে দু'একটা বেঁচে আছে, তারাও তেমনি অধঃপাতে গিয়েছে। তারা যেমন অজ্ঞ, তেমনি সঙ্কীর্ণ মন, তেমনি তাদের খল স্বভাব।"

নেপাল কহিল,—"যা বলছেন, তা ঠিকই। গাঁয়ের সে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের এক কড়াও আর নেই, আর লোকেদের অধোগতির ত অন্তই নেই। তবু বাবা, সেই মাটীটুকুর কী যে টান, তা আর বলতে পারি না। মনে হয়, ম্যালেরিয়ায় মরি, আর সাপ-শিয়ালের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যেই বাস করি, কিন্তু তাইতেই যেন সব সুখ, তাইতেই যেন প্রাণের সব তৃপ্তি। প্রায় এক বৎসর ধ'রে কলকাতায় রয়েছি, এতেই যেন আমার হাঁফ ধরবার জো হয়েছে। আমার শ্যামসুন্দরপুরের সূর্য্য,—চিরকাল সকালবেলা তাঁরে বিলের ধার থেকে উঠতে দেখেছি, নদীর পারে ডুবতে দেখেছি, কিন্তু কলকাতায় এসে একটি দিনও তাঁর উদয়-অস্তের খবর পাই নি। মানুষের বাড়ী-ঘর-দোর চারিদিককার বাতাসকে পর্য্যন্ত কাছে আসতে দেয় নি। ভগবানের রাজ্যে মানুষ কী অত্যাচারই যে চারিদিকে ক'রে রেখেছে!"

গোঁসাইজী প্রফুল্ল দৃষ্টিতে নেপালের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"দেশকে তুমি চিনেছ, বাবা; সঙ্গে সঙ্গে তুমি ভগবান্‌কেও চিনেছ। দেশকে সত্যিই তুমি ভালবাস।"

অর্চ্চনা এতক্ষণ পরে কথা কহিল, বলিল—"ওঁর ওপর একজন আছেন, বাবা। উনি তাঁরই ছাত্র। ওঁর মুখে অনেকবার ওঁর সেই হীরু ঠাকুর্দ্দার নাম শুনিছি। মাঝে মাঝে নেপাল বাবুর কাছে সব শুনে, আমার একবার ওঁদের শ্যামসুন্দরপুর যেতে ইচ্ছে করে। যাবও একবার ঠিক, অবিশ্যি নেপাল বাবু যদি নিয়ে যান। কিন্তু বাবার সঙ্গে একবার তারকেশ্বর গিয়ে একরাত ছিলুম, মশা আর শিয়ালের ডাকে সমস্ত রাত ঘুমোতে পারি নি। তা ছাড়া, খোলা জানালার ফাঁকে বাইরেকার মাঠের বিকট অন্ধকারের মধ্যে সারা রাত ধরে কত যে ভূত আর পেত্নী দেখেছিলুম, তা আর কী বলবো!"

গোঁসাইজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সে দিন ইহাদের আর সমুদ্রতীরে বেড়ান হইল না। গোঁসাইজীর আশ্রমে গল্প করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল এবং সন্ধ্যার পর মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিয়া সে দিন সকলে বাসায় ফিরিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

দিন দুই চারি পুরীতে থাকিয়া সকলে কটকে চলিয়া যাইবে, ইহাই সঙ্কল্প করিয়া অর্চ্চনা এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু এক এক দিন করিয়া পনর ষোল দিন অতিবাহিত হইয়া গেলেও পুরী হইতে যাইবার কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হইল না। এখানে আসিয়া সকলেরই যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে দিন কাটিয়া

যাইতে লাগিল। এ স্থান হইতে যে আর কোথাও যাইতে হইবে, সে কথা যেন কাহারও মনেই রহিল না।

কেষ্ট গিরিডিকে অপছন্দ করিয়াছিল, কিন্তু পুরীতে আসিয়া অবধি সে যে বেশ স্ফূর্ত্তিতেই আছে, তাহা তাহার চিরকালের শত্রু বামুন ঠাকুরের সহিত সদ্ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। সে দিন অর্চ্চনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—এখানে ত বেশ আছিস রে কেষ্ট। কেষ্ট বলিয়াছিল,—হ্যাঁ দিদিমণি, গিরিডির মত এখানে ত জাড় নেই। কিন্তু জাড় ছাড়া আর একটা যে কথা ছিল, সেটা সে গোপন করিয়া গেল। গিরিড়িতে আমিষ দ্রব্য বড় দুষ্প্রাপ্য ছিল, পুরীতে সমুদ্রের কল্যাণে উক্ত দ্রব্যটি সুপ্রচুর, এবং তাই অন্য সকলের মত সমুদ্রের উপর প্রীতি তাহারও যথেষ্ট ছিল। সাগরবক্ষে সূর্য্যের উদয়াস্ত কিম্বা সিন্ধুর বিচিত্র তরঙ্গলীলা দেখিবার জন্য না হউক, মধ্যে মধ্যে এক একদিন আসিয়া সে এই অসীম মৎস্যভাণ্ডারটিকে দর্শন করিয়া যাইত।

আর বামুন ঠাকুর ত তাহার গৃহেই আসিয়াছে। কারণ, পুরী জেলাতেই তাহার বাড়ী। সুতরাং ধরিতে গেলে সে ত তাহার গৃহের অঙ্গনের মধ্যেই আসিয়া পা দিয়াছে, এবং প্রতি মধ্যাহ্নেই সে বাসা হইতে বাহির হইয়া গিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিচিত, অপরিচিত সমস্ত আড্ডাতে একবার করিয়া ঘুরিয়া আসিয়া প্রফুল্লচিত্তে রান্নাঘরে প্রবেশ করে।

অর্চ্চনার সহিত সত্যের মার আসিবার উদ্দেশ্যই জগন্নাথদর্শন। সুতরাং যত অধিক দিন পুরীতে থাকা হয়, ততই তাহার ভাল। পুত্র সত্য-চরণের কাছে অবশ্য পুরীও যা, কটকও তা। কিন্তু সে কলেজের ছাত্র, তাহার নবীন বয়স, বর্ত্তমানকেই সে ভাল বুঝে, ভবিষ্যতের তত ধার ধারে না। সুতরাং বর্ত্তমানের পুরী ছাড়িয়া ভবিষ্যতের কটকের নামও সে কোন দিন করে নাই।

অর্চ্চনারও পুরী নিশ্চয়ই ভাল লাগিয়াছিল, নহিলে, যে মুখ্য উদ্দেশ্যে তাহার এ দিকে আসা, সেই নিজের জমীদারীতে যাওয়ার কথা উত্থাপন মাত্র না করিয়া জগন্নাথের মন্দির, বিমলা দেবী, গুণ্ডিচাবাড়ী, সমুদ্রতীর, গোঁসাইজীর আশ্রম প্রভৃতি লইয়া নিশ্চিন্তমনে সে দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিল।

কিন্তু সব চেয়ে পুরীর মাটী যে জায়গাটিতে বেশী করিয়া টান্ দিয়াছিল, তাহা নেপালের অন্তর; কারণ, এখানকার এই মাটীর মধ্যেই যে সে তাহার সর্ব্বস্ব এক দিন হারাইয়া বসিয়াছে! বহুকালের বিস্মৃতপ্রায় এই সংবাদটি যেরূপ বৃহৎ ও সুস্পষ্ট হইয়া আজ তাহার মনে আসিয়া পড়িয়াছে, হয় ত এখানে না আসিলে সে কথা কোন দিনই এমন করিয়া তাহার মনের উপর আসিয়া পড়িত না। কিন্তু এত দিন পরে—কত দিন যে, সে তাহা স্মরণ করিয়া হিসাব করিতেও পারে না—তাহার সেই বালিকা স্ত্রীর মুখখানা সে ভাল করিয়া মনে আনিতেও পারে না। মনে থাকিবার মধ্যে শুধু তাহার নামটিই মনে আছে, আর মনে আছে, তাহার ব্রজরাণী একদিন এইখানেই আসিয়াছিল এবং মুখ ফুটিয়া কিছু না বলিয়া, না জানি সেই শিশু-বয়সেই কিসের অভিমানে এখান হইতে তাহাদের কাছে আর সে ফিরিয়া যায় নাই। অতি বড় দুঃখের এই স্মৃতি তাহাকে শুধু অন্তরে বেদনাই দিতেছিল না, তাহার চির অবরুদ্ধ প্রেমের দুয়ার ভাঙ্গিয়া হৃদয়ের শূন্য রত্ন-সিংহাসনে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমাকে কল্পনায় বসাইয়া ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তির একটা ক্ষীণ অনুভূতি সে পাইয়া আসিতেছিল। ইহাই দুঃখের সুখ। বুক-ফাটা চিন্তার মধ্যে এই যে একরত্তি মধুর সে আস্বাদ পাইয়াছে, তাহাই এ কয়দিন সে সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

সে দিন রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে এই সব কথাই ভাবিতে লাগিল। তাহার নীরস শুষ্ক জীবনে ইহাতে অনেকটা তৃপ্তিবোধ করিতে লাগিল। দুঃখপূর্ণ সত্যকে হাত-চাপা দিয়া, অনেক সময়ে সে কল্পনায় একটা অলীক সুখের অবস্থা সৃষ্টি করিত এবং তাহাতে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। আজও শুইয়া শুইয়া সে সেইরূপই ভাবিতে লাগিল। ভাবিল,—যেন তাহার ব্রজরাণী বাঁচিয়া আছে। পরিপূর্ণ রূপ-যৌবন লইয়া তাহার জীবনের সাথীরূপে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে সে রহিয়াছে। যেন কোথা হইতে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির সে অধিকারী হইয়াছে এবং তাহারই তদারক করিতে সে যেন তাহার স্ত্রীকে লইয়া, তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া অর্চ্চনাদের সঙ্গে এখানে আসিয়াছে। স্ত্রী তাহার যেমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী, তেমনি অশেষ গুণবতী; সুতরাং তাহার মত সুখী কে? অতুলনীয় স্ত্রী,

অগাধ সম্পত্তি, সুস্থ ও সুন্দর দেহ, পরিপূর্ণ সন্তোষ···

কিন্তু কিছু পরেই স্ব-রচিত তাহার এই স্বপ্ন যখন একস্থানে আসিয়া আর পথ না পাইয়া শেষ হইল, তখন ইহার সমস্ত মধুটুকু নিমেষে অন্তর্হিত হইল। প্রতিক্রিয়ার তীব্র একটা আঘাত আসিয়া কেবলই তাহাকে পীড়ার পর পীড়া দিতে লাগিল।

সে রাত্রিতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নেপাল এই সব চিন্তা করিতে করিতে একসময় ঘুমাইয়া পড়িলেও বাকী রাত ধরিয়া এই বিষয়েই সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল এবং অতি প্রত্যূষে কি একটুখানি শব্দে একবার চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল, তাহার মুক্ত জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরে অর্চ্চনা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরস্পর দেখা-দেখি হওয়া মাত্রই চকিতে অর্চ্চনা সরিয়া গেল। তখনও ভাল করিয়া ফর্শা হয় নাই, বাহিরেও ঘরের মধ্যে অল্প অল্প অন্ধকার তখনও রহিয়াছে। নেপাল শুইয়া ভাবিতে লাগিল যে, ইহাও সে স্বপ্ন দেখিল কি না। কিন্তু পরক্ষণেই অর্চ্চনা আবার আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল, কহিল,—"গরমেতে সমস্ত রাত আর চোখে-পাতায় করতে পারি নি, আর আপনারা দেখছি বেশ সব ঘুমুচ্ছেন। শুয়ে শুয়ে দিদির গা ঠেলে, গুণে চোদ্দবার ডাকলুম, সাড়া পেলুম না। ছাদে সত্যর নাক-ডাকারই বা ধুম কি!"

নেপাল চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

তাহার পর একটু বেলা হইলে, কেষ্ট নেপালের ঘরে ঢুকিয়া মেজেয় পাতা পাটীর উপরে জলখাবারশুদ্ধ রেকাবী রাখিতে রাখিতে কহিল,—"দিদিমণি চা তৈরী ক'রে নিয়ে আসছেন, ততক্ষণ জলখাবার খান।"

খানিক পরেই এক কাপ চা হাতে লইয়া অর্চ্চনা এ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তখনও পর্য্যন্ত জলখাবারের রেকাবীতে নেপাল হাত দেয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে একখানা বাঙ্গালা বই হাতে লইয়া চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতেছে। চায়ের কাপটি রেকাবীর পার্শ্বে রাখিয়া অর্চ্চনা মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল—"আজ যেন আপনি কোন একটা বিষয় খুব ভাবছেন, নেপাল বাবু। কি বই ওটা? কৈ, বইও ত পড়ছেন না।"

বইখানা পাটীর উপর রাখিয়া দিয়া জলখাবারের রেকাবীখানি হাতে তুলিয়া লইয়া নেপাল কহিল—"না, ভাল লাগছে না। কাল রাত থেকেই শরীরটা ভাল নেই। সমস্ত রাত ঘুমও ভাল হয় নি।"

"জ্বর-টর কিছু হয় নি ত?" বলিয়া অর্চ্চনা পাটীর উপর হইতে বইখানি তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল।

নেপাল কহিল,—"স্পষ্ট জ্বর না হোলেও একটু জ্বরভাবের মতই হয়েছে, মাথাটাও ধরেছে।"

"তা হ'লে বাজারের কাছে ঐ যে ডাক্তারটি আছেন, ওঁকে সত্য গিয়ে একবার ডেকে আসুক। এই বিদেশ-বিভুঁয়ে আপনার যদি অসুখ হয়ে পড়ে, তা হ'লে আর আমার ভাবনার অন্ত থাকবে না। কেন না, ভাগ্যটা আমার বড় মন্দ।"

"তেমন কিছু ভাববার মত শরীর খারাপ আমার হয় নি। সমস্ত রাত ঘুম হয় নি, মাথা ধরেছে, শরীরটা তাই একটুখানি ম্যাজ-ম্যাজ, করছে।" একটু নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল,—"কিন্তু মাঝে মাঝে এই কথাটা আমি ভাবি যে, খুবই আমি ভাগ্যবান্, তাই আপনাদের মত লোকের আশ্রয় আমি পেয়েছি। জীবনে এত যত্ন, এত আত্মীয়তা আমি আর কোথাও পাই নি, অথচ আমি আপনাদের চাকর ছাড়া আর কিছুই নই।"

"দেখুন, এই সব নেহাৎ বাজে কথা যদি আপনি ফের বলবেন—"

"না, সত্যই বলছি, তাই আমার মনে হয় যে, আপনারা সব পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই আমার পরমাত্মীয় ছিলেন।"

"পূর্ব্ব-জন্মেরই শুধু, এ জন্মের বুঝি আমরা কিছুই নই?" বলিয়া পাতা খোলা বইখানি মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া আড়াল করিয়া অর্চ্চনা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল এবং পরক্ষণেই বইখানি মুখের উপর হইতে নামাইয়া লইয়া চকিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"যাঃ, বইখানা আপনার মাটী ক'রে ফেললুম!"

নেপাল চাহিয়া দেখিল, অর্চ্চনার সীঁথির সিন্দুরের দাগ বইয়ের পাতার উপর তিন চারি স্থানে লাগিয়া গিয়াছে। অর্চ্চনা অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হবে নেপাল বাবু? মুছতে গেলে চারদিকে যে আরও লেগে যাবে।"

"তাই ত, ভয়ানক ক্ষতি ক'রে ফেললেন, কি

করেই যে এ ক্ষতির পূরণ হবে" বলিয়া নেপাল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

"হাসবেন না, নেপাল বাবু! নতুন বইখানা কি ক'রে দিলুম দেখুন দেখি! বাস্তবিক, আমার এ সিঁদুরের দুর্ভোগ যে কেন, তা জানি না। কত দিন মনে ভেবেছি, এ সব মিথ্যে ঝঞ্ঝাট আর রাখবো না, কিন্তু পাঁচ জনের জন্যে কিছুতেই তা হবার জো নেই।"

নিমেষমধ্যেই অর্চ্চনার সমস্ত মুখের উপর বিমর্ষতার একটা কালো ছায়া আসিয়া পড়িল। তাহার কথায় ও ভাবে নেপালকে ভিতরে ভিতরে একটা পীড়া দিতে লাগিল এবং ইহাকে ঠেলিয়া ফেলিবার উদ্দেশে মুহূর্ত্ত পরেই নেপাল তাহার প্রতি চাহিয়া মৃদু হাস্যের সহিত কহিল,—"কিন্তু বইখানার দেড় টাকা দাম এখনি আমাকে দিতে হবে, আর একটু পরে যদি দেন, তা হলে দেড় টাকায় আর হবে না, ডবল দিতে হবে।'

ইহার পর কি কথা বলা যাইতে পারে, কেহই কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পরে ধীরে ধীরে অর্চ্চনা উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে অর্চ্চনা আবার যখন এ ঘরে আসিল, তখন তাহার চোখে প্রফুল্লতা, মুখে হাসি। আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা নেপাল বাবু, যার জীবনে কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন কাজ নেই, কোন বন্ধন নেই, কোন সুখ নেই, সুখের আশা পর্য্যন্ত নেই, সে কি ক'রে জীবন কাটায় বলুন ত? আচ্ছা, ও বলতে হবে না,—আপনার জীবনের কি লক্ষ্য, তাই বলুন।"

নেপাল কহিল,—"পুরুষের জীবনে, স্ত্রীলোকের জীবনে অনেক তফাৎ। সুতরাং—"

"আচ্ছা, যদি আপনার আমার মত টাকা-কড়ি বিষয়-সম্পত্তি থাকতো, তা হলে আপনি কি করতেন?—নাঃ—এ কথা জিজ্ঞাসা করা আমার ঠিক হোল না। এর উত্তর ত আমিই বলতে পারি,—আপনি বাড়ী করতেন, গাড়ী করতেন, বাগান বানাতেন। চাকর-চাকরাণী, লোক-জন, সোনা-দানা, আপনার স্ত্রী, আপনার ছেলে-মেয়ে—আপনার পরিপূর্ণ সংসারের মাঝখানে আপনি হয় ত স্বর্গের সুখ——"

"কিন্তু হয় ত আমি ও-সব কিছুই করতুম না। হয় ত সমস্ত অর্থ আমি আমার দেশ-মায়ের পায়ে ঢেলে দিতুম। হয় ত কেন—তাই ঠিক দিতুম। আমি আমার শ্যামসুন্দরপুরের আগেকার সেই রূপ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতুম। গ্রামের বন-জঙ্গল কাটাতুম, পচা পুকুর-ডোবা সব বুজিয়ে তার জায়গায় নতুন নতুন সব পুকুর কাটাতুম, বাইরে থেকে লোক এনে বসাতুম, রাস্তা-ঘাট করতুম; হাঁসপাতাল, স্কুল, টোল—এই সব বসাতুম; নিরন্নদের অন্নের ব্যবস্থা করতুম, আর বিপন্নদের ব্যথায় বুক পেতে দিতুম।"

শ্যামসুন্দরপুরের কথাপ্রসঙ্গে নেপালের উচ্ছ্বাসে অর্চ্চনা বেশ আমোদ পাইত, কহিল,—"ভবিষ্যতে কখনও সেখানে অন্ততঃ স্কুল করবার পক্ষে আপনাকে আমি সাহায্য করবো; এ সম্বন্ধে এখন থেকেই আমি আপনার কাছে বাক্যি-দত্ত হয়ে থাকলুম।" সঙ্গে সঙ্গেই কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"কিন্তু মেয়ে-স্কুল একটা করবেন ত? তা হ'লে কিন্তু আমাকে মাষ্টার রাখতে হবে।"

নেপাল কহিল,—"স্কুল করার আকাশ-কুসুম, মনে করুন, যদি কখনও পৃথিবীর মাটীতেই সত্যি হয়ে ফুটে উঠে, তা হলে আমি এ রকম স্কুল করব না; আমার স্কুলে সত্যিকারের মানুষ হবার মত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। হাজার হাজার শিক্ষিত লোক দেখিছি, যাদের ডিগ্রীর বহরের সঙ্গে সঙ্গে, নীচতা, স্বার্থপরতা, দম্ভ-অভিমান, অন্যায় অত্যাচার, হিংসাদ্বেষ, দুষ্টুমি প্রভৃতিও ঠিক সমান বহরে থাকে। যে শিক্ষায় এই সব পশুভাব মন থেকে যায় না, বা নতুন করে সৃষ্টি করে, তেমন শিক্ষার ধার আমি ধারি না। আমি ত দেখছি, আজকালকার স্কুল-কলেজের শিক্ষা যারা কিছুই পায়নি, বরঞ্চ তারাই অনেকটা মানুষ আছে।"

"আর যারা লেখাপড়া শিখেছে, তারাই সব অমানুষ হয়ে গেছে? তা নয়, নেপাল বাবু। যারা অমানুষ, তারা লেখাপড়া শিখলেও অমানুষ। এক শ্রেণীর লোক আছে বটে, যারা দেখতে শুনতে বেশ ভদ্রলোক, ভদ্রবংশেও জন্মেছে, অশিক্ষিতও নয়, অথচ দুষ্টের এক-শেষ, কুটিলতায় ভরা। এই সব প্রকৃতির লোকের একরত্তি একটু দৃষ্টান্তের কথা বলি। রেলে যেতে-আসতে নিশ্চয় দেখেছেন যে, যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, তবু ভেতরের বাবু ভদ্রলোক, বাইরে থেকে আর কারুকে উঠতে দেবে না। হয় ত সে বেচারার যাবার সকলের চাইতে বেশী দরকার, হয় ত সে সারাপথ দাঁড়িয়ে যেতে পেলেও

বেঁচে যায়, তবু দরজা চেপে ধ'রে তাকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। এ সব কি কম অত্যাচার! শিক্ষিত লোক হয়ে এ সব কি ক'রে পারে, আমি ত ভাবতেও পারি না।"

"শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ভেতর ও-রকম দৃষ্টান্ত ত হাজার হাজার। এঁদের মধ্যে অধিকাংশের মনে এত সঙ্কীর্ণতা যে, তা আর বলবার নয়। কিন্তু এ দোষ ত পূর্ব্বে ছিল না। নিশ্চয়ই আজকালকার স্কুল-কলেজের শিক্ষার ভেতর এমন কোন ত্রুটি লুকিয়ে রয়েছে, যাতে শিক্ষা পেয়েও অনেক স্থানে মানুষ না হয়ে অমানুষই হয়ে যায়। প্রকৃত মানুষ গড়বার পক্ষে কোন শিক্ষাই দেওয়া হয় না।"

"না নেপাল বাবু, তা নয়, আপনি হয় ত ঠিক বুঝতে পারেন নি। এদের মধ্যে অল্প দু-এক জন হয় ত এ সব দোষে দোষী হ'তে পারে, কিন্তু আপনি যে বলছেন, অধিকাংশ, তা নয়। আমি সামান্য মেয়েমানুষ, অবিশ্যি বেশী কিছু আমি জানি না, তবে এর মূলে অন্য একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে—অর্থ। যেটা এ দেশে কোন কালেই বড় হয় নি, এখন হয়েছে। আর এ দেশের সব চেয়ে বড় যা ছিল—জ্ঞান আর মন, তা ক্রমেই নেবে আসতে সুরু করেছে। এইতেই আজ মানুষের এই দেশে কিছু কিছু অমানুষের——"

হঠাৎ এই মানুষ-অমানুষের প্রসঙ্গ চাপা দিয়া এক অতিকায় মানুষের আকৃতি দরজার বাহিরে দৃষ্ট হইল এবং অর্চ্চনা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল,—"এ কি, নায়েব মশাই!"

নায়েব মহাশয়ের নাম পরমানন্দ সেনাপতি। এ বাড়ীর বাহিরের দিক্‌কার এই কক্ষের বৃহৎ দরজাটি বোধ হয় এই নায়েব মশায়ের দেহের মাপেই প্রস্তুত হইয়াছিল; কারণ, তাঁহার দৈহিক দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সঙ্গে দরজার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় সমান। পুরী হইতে কর্ত্রীঠাকুরাণীর কটক যাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া সেনাপতি মহাশয় এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে গলদ্-ঘর্ম্ম হইয়া তাঁহার সংবাদ লইতে আসিয়াছেন।...

আহারাদির পর নেপাল, অর্চ্চনা ও সেনাপতি মহাশয়ের মধ্যে কটক অভিযান সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। স্থির হইল যে শীঘ্রই কটক যাত্রা করিতে হইবে এবং তৎপূর্ব্বে কলিকাতা হইতে জমিদারীসংক্রান্ত একটা আবশ্যক দলীল আনাইয়া লইতে হইবে। জমিদারীর এক দিক্‌কার একটা সীমানা লইয়া কয় বৎসর হইতে একটা গোলমাল চলিয়া আসিতেছে, সম্ভবতঃ অর্চ্চনার উপস্থিতিতে বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত এ সম্বন্ধে একটা মিটমাট হইয়া যাইতে পারে। দলীলখানি কলিকাতায় অর্চ্চনার উকীলের কাছে আছে। নায়েব মহাশয় পূর্ব্বাহ্লে লিখিয়া জানাইলেও, আসিবার সময় অর্চ্চনা উহা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

নেপালের দিকে চাহিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"আপনি তা হ'লে আজই কোলকাতা গিয়ে দলীলখানা নিয়ে আসুন।"

উত্তরে নেপাল অর্চ্চনাকে বুঝাইল যে, ইহার জন্য কলিকাতা যাইবার কোন আবশ্যক হইবে না, উকীলকে আজই একখানা পত্র দেওয়া হউক। অর্চ্চনা কিন্তু ইহাতে রাজী হইল না। কর্ত্রীঠাকুরাণীর ইচ্ছাকেই সমর্থন করিয়া সেনাপতি মহাশয়ও পত্র দেওয়া সম্বন্ধে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। কিন্তু নেপাল এই জন্য অনর্থক কলিকাতা যাওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিল এবং অর্চ্চনাকে বিধিমতে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, একখানা চিঠির দ্বারা যে কাজ হইতে পারিবে, শুধু তার জন্য কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইবার কি প্রয়োজন? উকীল চিঠি পাইয়া দলীলখানি রেজেষ্ট্রী ডাকে পাঠাইয়া দিলে, সহজেই ত কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে। কিন্তু অর্চ্চনা নেপালের যুক্তিতে বরাবরই ঘাড় নাড়িতে লাগিল এবং তাহাকে কলিকাতা যাইবার জন্যই বার বার অনুরোধ করিয়া বলিল,—"উকীলের সঙ্গে আমাদের কথা আছে যে, দরকারী দলীলপত্র আমাদের নিজেদের লোকের হাতে ছাড়া ডাকে যেন কখন কোথাও পাঠানো না হয়।"

যাহা হউক, নেপালের শরীর আজ এতই খারাপ লাগিতেছিল যে, ঘর হইতে এক পাও বাহির হইতে আজ তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। কিন্তু অর্চ্চনার জিদ দেখিয়া ইহা লইয়া আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না এবং বাকী সময় নীরবেই বসিয়া থাকিয়া মনে মনে ভাবিল যে, ইহাই চাকুরী। অর্চ্চনা যতই কেন না তাহাকে স্নেহ-যত্ন-ভালবাসা দেখাক, সে চাকর—অর্চ্চনা তাহার প্রভু। আজিকার এই ব্যাপারের মত, প্রত্যহ প্রতিক্ষণ যে সে জিদের সহিত প্রভুত্ব দেখায় না, এইটুকুই যথেষ্ট। সুতরাং তাহার দেহ ও মন আজিকার এই অসুস্থতা লইয়া ঘরের বাহির হইতে

নারাজ হইলেও, সে রাত্রির গাড়ীতে কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরই অর্চ্চনা নেপালের খাইবার আয়োজন করিয়া নিজেই তাহাকে ডাকিতে আসিয়া দেখিল, নেপাল যাত্রা করিবার জন্য কাপড়-চোপড় পরিতেছে। খাইবার কথায় কহিল,—"এই জ্বরের ওপর আর কিছু খাব না।"

চমকিত হইয়া অর্চ্চনা কহিল,—"জ্বর! আপনার কি স্পষ্ট জ্বর হয়েছে না কি? কই, ভাত খাবার সময় ত—"

চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া নেপাল কহিল,—"তা হোক, ষ্টেশন পর্য্যন্ত কোন রকমে গিয়ে গাড়ীতে উঠতে পারলেই হ'ল।"

ব্যস্ত হইয়া অর্চ্চনা কহিল,—"না—না, কিছুতেই তা হ'লে আপনার যাওয়া হতে পারবে না, আপনি কাপড়-চোপড় ছাড়ুন, আমি সত্যকে দিয়ে ডাক্তার——"

মেজের উপর হইতে সুটকেশটি তুলিয়া লইয়া নেপাল ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া শুধু কহিল,—"তা হোক, তাতে আর কি," বলিয়া আর দ্বিতীয় কোন কথার অপেক্ষা মাত্র না করিয়া ত্রস্তপদে বাসা হইতে বাহির হইয়া সড়কের উপর পড়িল। অর্চ্চনা মিনিট দুই চারি চৌকাঠ ধরিয়া সেই খানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সুদীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়া পড়িল।······

* * *

অপরাহ্ণ হইতে সত্যই নেপালের জ্বর বেশ ফুটিয়াই প্রকাশ পাইয়াছিল। গাড়ীতে সমস্ত রাত্রির কষ্টের মধ্যে সেই জ্বর তাহার খুবই বৃদ্ধি পাইল, সঙ্গে সঙ্গে মাথার যন্ত্রণাও এত বাড়িয়া উঠিল যে, সারা রাত আর মাথা তুলিতেই পারিল না। ইহার উপর বার দুই তিন বমিও হইল। সুতরাং প্রভাতে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে, গাড়ী হইতে নামিবার পর্য্যন্ত তাহার শক্তি রহিল না। অতি কষ্টে কোন রকমে সে প্ল্যাটফরমে নামিয়া পড়িয়া সম্মুখের একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল।

খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর, পশ্চাৎ হইতে কাহার হস্তস্পর্শে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিতেই নেপাল সোজা হইয়া বসিয়া কহিল,—"এ কি, আপনি! এ যে দেখছি, চেনবার উপায় নেই।"

"তবুও ত চিনতে পেরেছেন। যাক,—আছেন কেমন বলুন?"

নেপাল তাহাকে পার্শ্বে বসাইয়া কহিল,—"ভাল না, খুব জ্বর। পুরী থেকে আসছি, বালীগঞ্জ যেতে হবে, কিন্তু পারছি না।"

অনেক দিন পরে এইরূপ সময়ে অতুলানন্দ বাবুর দেখা পাইয়া নেপাল খুবই আনন্দিত হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে বহু প্রকারের কথাবার্ত্তা হইল। তাহার ফলে নেপাল জানিতে পারিল যে, অতুলানন্দ বাবুর মেস হইতে তাহার চলিয়া আসিবার পরই হঠাৎ তাঁহার মনের গতি অন্য দিকে প্রবাহিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাসা, বাবুয়ানা, বিলাসিতা, শিক্ষকতা—সব পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ নগ্নপদে, একখানি উত্তরীয় মাত্র গায় দিয়া ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। নিজের এই পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গে অতুল বাবু কহিলেন,—"টাকা-পয়সাও যথেষ্ট উপায় করলুম, বাবুগিরি বিলাসিতারও বাকী রাখলুম না। তার পর ভাবলুম, আর কেন, পরমানন্দের রাজত্বে আনন্দের একটু খোঁজ ক'রে দেখা যা'ক না।"

অতুল বাবুর অন্তর মধ্যে ত্যাগের যে এইরূপ একটা ভাবধারা প্রবাহিত ছিল, তাহা নেপাল তাঁহার সহিত অল্প কয়েকদিন বাস করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। নেপাল জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন তা হ'লে কোথায় যাবেন?"

"আপনারই সঙ্গে। কারণ, এ অবস্থায় আপনাকে ছেড়ে দিয়ে কোথাও ত আর যেতে পারি না, নেপাল বাবু।"

তখনই একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া অতুল বাবু নেপালকে লইয়া বালীগঞ্জের বাটীতে আসিলেন।

নেপালের জ্বর সারাদিনের মধ্যেও মগ্ন হইল না, সমান ভাবেই রহিল। শরীরের গ্লানি আরও বৃদ্ধি পাইল। অতুল বাবু একজন ডাক্তারকে আনিলেন। তিনি আসিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া একটুখানি মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন যে, জ্বরটা সোজা নহে।

পরের দিন সকাল বেলা নেপাল অতিমাত্রায় অস্থির হইয়া পড়িল, অতুল বাবুকে কহিল,—"রোগটা আমার শুধু একটু জ্বরই নয়, সুতরাং এখানে এমন ক'রে আমি প'ড়ে থাকবো না, অতুল বাবু। আপনি আমায় বাড়ী নিয়ে চলুন, আজই আমি শ্যামসুন্দরপুর যাব।"

অতুল বাবু অনেক ভরসা দিলেন, দেশে

চিকিৎসা সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুবিধার কথা উত্থাপন করিয়া অনেক বুঝাইলেন ; কিন্তু নেপাল কোন কথাই শুনিল না। তাঁহার মনে এই কথাটাই বার বার আসিয়া ব্যথা দিতে লাগিল যে, পরাধীন হইয়া প্রভুর আদেশ যদি তাহাকে পালন করিতে না হইত, তাহা হইলে আজ তাহাকে হয় ত এরূপভাবে পীড়িত হইয়া পড়িতে হইত না। এক জন এ বাটীর কর্ত্রী, আর সে তাহার ভৃত্য। এই সম্বন্ধ লইয়া এই অবস্থায় এ বাটীতে থাকিতে তাহার পীড়িত মন উত্তরোত্তর বিদ্রোহী হইয়াই উঠিতে লাগিল। এই কথাটার আলোচনা করিয়া যখন তিক্ততায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, তখন এমনও তাহার মনে হইল যে, প্রভুর হুকুম তামিল না করিয়া যদি তৎপূর্ব্বে তাহারই বাটীতে তাহার মৃত্যুও ঘটে, তাহ' হইলে অপর পক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে একটা বিরক্তি ও অনুযোগও ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে একেবারে অসম্ভব নহে। রোগশয্যায় এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে শ্যামসুন্দরপুর যাইবার জন্য নেপাল একবারে যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। অতুল বাবুও দেখিলেন যে, নেপালের অসুখ এই দুইদিনের মধ্যেই যে পথে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়া এখানে পড়িয়া থাকা আর যুক্তিযুক্ত নহে। তিনি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে, দেশে নেপালের মা আছেন। স্ত্রী নাই, তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু অন্যান্য আরও আত্মীয়-স্বজন হয় ত থাকিতে পারে। এ অবস্থায় তাহাদেরই কাছে তাহাকে লইয়া গিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। সুতরাং পরদিন সকালের গাড়ীতেই নেপালকে লইয়া অতুল বাবু শ্যামসুন্দরপুর যাত্রা করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

নেপালের কলিকাতা যাওয়ার পর হইতে অর্চ্চনার মনে অত্যন্ত একটা অস্বস্তি আসিয়া জমা হইয়াছিল। তাহার পর একটি একটি করিয়া যখন পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল, অথচ নেপাল ফিরিয়া আসিল না, কিম্বা তাহার নিকট হইতে কোন পত্রও আসিল না, তখন এই অস্বস্তির উপর বিষম একটা দুর্ভাবনা আসিয়া চাপিয়া বসিল। সে বুঝিয়াছিল যে, নেপাল জেদের বশে রাগ করিয়াই অসুস্থ দেহ লইয়া কলিকাতায় গিয়াছে। একটা অতি সামান্য এবং সোজা ব্যাপারের যে এমন একটা বিশ্রী অবস্থা আসিয়া পড়িবে, তাহা সে কখনও ভাবে নাই। এক্ষণে ভয়ে, উদ্বেগে ও দুশ্চিন্তায় সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এমন হইবে জানিলে সে দলীল আনাইবার চেষ্টাই করিত না। যে ভাবে সীমানার গোলমাল এ কয় বৎসর চলিয়া আসিতেছে, সেই ভাবেই না হয় আরও কিছুকাল চলিত, তাহাতে এমন কোন বিশেষ ক্ষতি ইতিপূর্ব্বে হয়ও নাই, পরেও হয়ত হইত না।

কয়দিন হইতেই তাহার সব কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। জগন্নাথ-দেবের মন্দির-দর্শন বা সমুদ্রতীরে বেড়ান বা গোঁসাইজীর আশ্রমে যাওয়া, কিছুই আর তার ভাল লাগিত না। প্রত্যহ অভ্যাসমত পূজায় বসিত বটে, কিন্তু অস্থির মন তাহার ঘুরিয়া দাঁড়াইত। দেবতার রূপ ধ্যান করিতে যাইলে নেপালের বিদায়ক্ষণের অভিমানভরা মুখখানাই তাহার মুদ্রিত চোখের সম্মুখে বড় হইয়া ফুটিয়া উঠিত।

একবার অর্চ্চনা মনে করিল যে, সত্যকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু ইহার বিপক্ষে আর একটা কথা আসিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়া রাখিল। অথচ সে এই ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও পারিতেছিল না, চারিদিক্ হইতে তাহাকে যেন কিসে অনবরত টানাটানি করিতে লাগিল।

অর্চ্চনার এই কয়দিনের ভাবগতিক সত্যর মা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিল এবং মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও, নিজের মনে সে অনেক প্রশ্নোত্তরই করিল। সত্যর মা সেই ধরণের মানুষ, যে কাহার কাছে কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতে হয় এবং কাহার কাছেই বা করিতে নাই, সে সব কিছুই জানে না। তাই সে দিন সকালে সত্য যখন তাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মাসীমার কি হোয়েছে বল ত ?" তখন তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কহিল,—"বড় লোকের বড় কাণ্ড। অরুকে খুব ভাল মেয়ে বলেই জানতুম, কিন্তু —'যার সঙ্গে ঘর করি নি সে বড় ঘরণী, আর যার হাতে খাই নি সে বড় রাঁধুনী' !

সত্য বলিল,—"নেপাল বাবু কি মাসীমাদের কেউ হয় না ?"

"ছাই হয়। এই বছরখানেক হ'ল ত ছোঁড়াটা এদের বাড়ীতে এসে জুটেছে। জানিস নি ক'

সেই মটর গাড়ীর ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় প'ড়ে যায়, তার পর অরুর বাপ তাকে বাড়ীতে এনে দেখাশুনো করে, সেই থেকেই ত ও এখানে আছে। তাই ত বলি,—লেখাপড়া-জানা মেয়ে, এত বিষয়-সম্পত্তির মালিক, কাঁচা বয়েস, তার ওপর এত রূপ,——যাক্ বাবা, এ সব কোন কথায় আমাদের থাকবার দরকার নেই।"

"কে থাকে মা? তুমিই ত দেখছি সব চেয়ে বেশী রয়েছ"—বলিয়া সত্যচরণ বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

অর্চ্চনা তাহার নিজের ঘরে বসিয়া কি করিতেছিল। সম্মুখ দিয়া সত্যকে যাইতে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিল,—"নেপাল বাবুর সম্বন্ধে কি করা যায় বল্ দেখি? দেখতে দেখতে ক'দিন ত হোয়ে গেল, ফিরেও আসছেন না। জ্বর নিয়ে গেলেন, কি করি বল্ ত বাবা?"

সত্যচরণ কহিল,—"একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দেওয়া উচিত, মাসীমা।"

"তাই না হয় দে, বাবা। তোর নাম দিয়েই দে। একেবারে যাতে জবাব পর্য্যন্ত আসে, তার ব্যবস্থা করিস"—বলিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া একখানি দশটাকার নোট সত্যর হাতে দিল।

সত্য চলিয়া গেলে অর্চ্চনা একাই অত বেলায় বাসা হইতে বাহির হইয়া বরাবর গোঁসাইজীর আশ্রমে আসিয়া উঠিল। গোঁসাইজী কহিলেন, —"ক'দিন আস নি কেন, মা?"

অর্চ্চনা দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল,— "শরীরটা ভাল ছিল না বাবা। তারপর নেপাল বাবু এখানে নেই, কোলকাতা গিয়েছেন, তার আর——"

"নেপাল কোলকাতা গিয়ে চিঠি-পত্র দিয়েছে ত, —ভাল আছে?"

"জ্বর শুদ্ধু জোর ক'রে গিয়েছেন। একখানা দরকারী দলীল সেখান থেকে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরে আসবার কথা, কিন্তু আজ ছ'সাত দিন হ'ল, ফিরেও আসছেন না, কোন চিঠিপত্রও নেই।"

"তা হ'লে ত ভাবনারই কথা। তুই এক খানা চিঠি—না হয় ত সত্যকে একবার পাঠিয়ে দিলে হ'ত না? যা হয় কিছু একটা করা উচিত। ক'দিন তোরা আসিস্ নি ব'লে, পরশু আমি ঐ পাণ্ডার ছেলেটিকে তোদের বাসায় পাঠিয়েছিলুম, সে ফিরে এসে বললে—ডেকে ডেকে কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। আজ নিজেই একবার যাব মনে কচ্ছিলুম।"

অর্চ্চনা অধোবদনে বসিয়া রহিল।

গোঁসাইজী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"এই ক'দিনেই মনের ওপর তুই যে আমার কি টান্ দিয়েছিস্, তা আর বলবার নয়। পনর বছর ধ'রে যা ভুলে রয়েছিলুম, তুই আবার তাই এতদিনের পর আমায় মনে করিয়ে দিছিস, মা।" অতি ধীরে গোঁসাইজী একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তাহার পর কহিলেন,—"ক'দিনের মধ্যে তোরও চেহারাটা বড্ড যেন খারাপ হোয়ে গিয়েছে, মা।"

"হ্যাঁ বাবা, মনটা বড্ড খারাপ হোয়ে রয়েছে। আপনার কাছে ভক্তমালের গল্প শুনব বলে এলুম। ভক্তমাল শুনতে আমার বড্ড ভাল লাগে।"

অতঃপর আরও দুইচারিটি কথার পর গোঁসাইজী ভক্তমালের গল্প বলিতে লাগিলেন। অর্চ্চনা নীরবে বসিয়া রহিল। কিন্তু ঠিক যেখানে গল্পের শেষ হইল, সেইখানেই অর্চ্চনা অন্যমনস্কতার সহিত প্রশ্ন করিল,—"তারপর কি হ'ল, বাবা?"

গোঁসাইজী কহিলেন,—"গল্প ত শেষ হ'ল মা, আর ত তারপর নেই। তুই এক কাজ কর্, ঐ ভক্তমালখানা আমার বইয়ের তোরঙ্গ থেকে নিয়ে যা, রোজ দুপুরবেলা একটু করে পড়িস। ঐ লাল তোরঙ্গটায় আছে, ঘরের ভেতরে গিয়ে নিয়ে আয়, মা।"

তাঁহার সব কথা না শুনিয়াই অর্চ্চনা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল এবং সম্মুখেই একটি ক্ষুদ্র টীনের তোরঙ্গ দেখিতে পাইয়া তাহারই ডালা খুলিল। দেখিল, তাহার মধ্যে দু'একখানি কাপড়, হরিনামের ঝুলি, একখানি সাত হাতি ডুরে শাড়ী, ছোট একখানি আরসি, চুল বাঁধিবার ফিতা, মাথার কাঁটা, নাম খোদাই-করা সোনার একটি সিল আংটী এবং আরও ঐ ধরণের কি সব রহিয়াছে। ভক্তমাল বা অন্য কোন পুস্তকই তন্মধ্যে নাই; থাকিবার মধ্যে কেবল একখানি বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ রহিয়াছে। দ্বিতীয়ভাগ খানি খুলিয়া অর্চ্চনা দেখিতে লাগিল। হঠাৎ বইখানিকে দুই হাতে জোরে ধরিয়া, বুকের সহিত চাপিয়া সে দেওয়ালের উপর মাথা রাখিয়া ঢলিয়া পড়িল। বাহির হইতে গোঁসাইজী হাঁকিলেন,—"বই কি পেলি না, মা? সামনের ছোট তোরঙ্গটা নয়—ওদিকে ঐ যে লাল

রংয়ের বড় তোরঙ্গটা রয়েছে—ঐটে।" কোন কথাই অর্চ্চনার কাণে প্রবেশ করিল না। সে একই ভাবে দেওয়ালে মাথা রাখিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরবে তেমনই ভাবে বসিয়া রহিল, যেন দ্বিতীয়ভাগখানির মধ্য হইতে কোন তীব্র বিষবাষ্প বাহির হইয়া তাহাকে হতচৈতন্যপ্রায় করিয়া ফেলিল। তাহার সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া পড়িল, কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইল।

গোঁসাইজী তাহার কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া ঘরের ভিতর আসিলেন এবং এভাবে প্রস্তরমূর্ত্তির মত তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন,—"এ কি মা!" অর্চ্চনা কিছুই বলিতে পারিল না, শুধু তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—"বাবা!"

হঠাৎ যে কি হইতে কি ঘটিল, গোঁসাইজী তাহা ভাবিবার মাত্র অবসর পাইলেন না। এক মহা রহস্য শুধু তাঁহার চোখের সম্মুখে আসিয়া চিন্তায় ও উদ্বেগে তাঁহাকে বিচলিত করিয়া ফেলিল। তিনি দেখিলেন যে, অর্চ্চনার মূর্চ্ছার মত অবস্থা হইয়াছে। তাড়াতাড়ি তিনি জল আনিয়া তাহার মুখে-চোখে ঝাপটা দিতে লাগিলেন ও জোরে জোরে পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অর্চ্চনা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলে গোঁসাইজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছিল, মা?"

ভূলুণ্ঠিতা অর্চ্চনা অতি ধীরে ধীরে কহিল,—"কিছুই হয়নি, শরীরটা বড় দুর্ব্বল, হঠাৎ ঝিম্-ঝিম্ ক'রে কেমন যেন হয়ে এল।"

"একখানা গাড়ী এনে, চল মা, তোমায় বাসায় নিয়ে যাই।"

"আমি ত এখন কোথাও যেতে পারব না, বাবা।"

"কিন্তু স্নান আহার?"

অর্চ্চনা কোন কথা না বলিয়া নীরবেই রহিল।

গোঁসাইজী কহিলেন,—"আচ্ছা, মা, বাসায় আর গিয়ে কাজ নেই, এইখানেই স্নানাহারের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।" হয় ত এ কথা অর্চ্চনার কাণে যাইল না। গোঁসাইজী উঠিবার উপক্রম করিতেই অর্চ্চনা কহিল,—"আপনি যাবেন না বাবা, আমার কাছে ব'সে থাকুন, শরীরটা এখনও আমার কেমন করছে।" গোঁসাইজী বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে অর্চ্চনা গোঁসাইজীর পায়ের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল,—"বাবা!"

"কি মা।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"আমি কিছুই যে বলতে পারছি না।"

"আমি তোর ছেলে, তুই আমার মা, ছেলের কাছে কোন কথা গোপন রাখিস নি, মা রে আমার।"

অতি ধীরে রহিয়া রহিয়া অর্চ্চনা কহিল,—"যদি ঠিক সেই চোখেই আমায় দেখেন, তা হ'লে———"চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অর্চ্চনা কি যেন ভাবিতে লাগিল। সমস্ত মুখখানার মধ্যে কোথাও যেন এক বিন্দু রক্ত তাহার ছিল না। বোধ হয়, কিছু একটা ভাবিবার পর্য্যন্ত তাহার যেন শক্তির অভাব ঘটিতেছিল।

অন্তরের সমুদয় শক্তি একত্র করিয়া অর্চ্চনা পুনরায় কহিতে গেল,—"বাবা!"

স্নেহ-করুণ কণ্ঠে গোঁসাইজী কহিলেন,—"বল মা, কি হয়েছে বল।"

"কিছু হয় নি বাবা। কিন্তু আমি আর একদণ্ড এখানে থাকতে পারব না। আজই আমায় কোলকাতা নিয়ে চলুন। যদি মেয়ে হই, মেয়ের জন্যে কিছু দিন জপ, তপ, সন্ন্যাস, আশ্রম সব ছাড়ুন।—আজই আমি যাব বাবা, কিন্তু আপনার হাত না ধ'রে আমি কিছুতেই যেতে পারব না।"

"আজই যেতে চাও?"

"আজই,"—বলিয়া অর্চ্চনা প্রসারিত হস্তদ্বয় দ্বারা গোঁসাইজীর পা দুইটি চাপিয়া ধরিল।

যে কথাটা অর্চ্চনা মুখ ফুটিয়া কিছুতেই বলিতে পারিতেছিল না, অভিজ্ঞ গোঁসাইজীর তাহা বোধ হয় বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, নেপাল মাত্র বৎসরখানেক হইতে অর্চ্চনার সংস্রবে আসিয়াছে। কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যেই সে যে অর্চ্চনার মনের উপর এত বড় প্রভাব ভিতরে ভিতরে বিস্তার করিয়াছে, যাহার ফলে আজ তাঁহারও সমক্ষে অর্চ্চনা এভাবে তাহার অন্তরের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিল, এই কথাটাই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বেলা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। এত বেলা পর্য্যন্ত অর্চ্চনা বাসায় ফিরিয়া না যাওয়াতে সত্যচরণ তাহার সন্ধানে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গোঁসাইজী তাহাকে কহিলেন,—"একটু কাজ আছে, অর্চ্চনা এ-বেলা আমার কাছে এইখানেই থাকবে। ও-বেলা আমি নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।"

সত্যচরণ চলিয়া গেল। অর্চ্চনা সমস্ত দিন গোঁসাজীর কাছেই রহিল।

সেই দিনই বাসার সমস্ত জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করিয়া, সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া, রাত্রির গাড়ীতে সকলকে লইয়া গোঁসাইজী কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বাড়ীশুদ্ধ সকলকারই মনে একটা বিস্ময় আসিয়া জমা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। নায়েব সেনাপতি মহাশয় তখনও পর্য্যন্ত সেখানে ছিলেন। তিনি শুধু অর্চ্চনাকে একবার বলিতে আসিলেন যে, দুই চারি দিনের জন্য একবার কটক হইয়া গেলেই ভাল হয়। অর্চ্চনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তরদানে তাঁহাকে জানাইল,—"ভাল-মন্দ আমি বুঝব, আপনি এখন ফিরে যান, নায়েব মশাই।" নায়েব মশাই আর কোন কথা অর্চ্চনাকে বলিবার চেষ্টা করেন নাই।

রাত্রির ট্রেণে উঠিয়া পরদিন প্রভাতে গোঁসাইজী সকলকে লইয়া বালীগঞ্জের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিয়া শুনিলেন যে, ম্যানেজার বাবু খুব অসুস্থ হইয়াই এখানে আসিয়াছিলেন এবং কয় দিন এখানে থাকিয়া অসুখ খুব বাড়িয়া উঠিলে পর আজ তিন দিন হইল তাঁহার দেশে চলিয়া গিয়াছেন। নেপালের সম্বন্ধে সমস্ত শুনিযা তিনি তখনই একবার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া অর্চ্চনাকে কহিলেন, "মা, সবই জেনে এলুম। শ্যামসুন্দরপুর তারকেশ্বরের কাছে। মগরায় নেবে ছোট গাড়ীতে যেতে হয়। এ-বেলা আর ট্রেণই নাই। ও-বেলা তিনটের ট্রেণে গেলে সন্ধ্যার পর সাতটা আটটার সময় সেখানে পৌঁছুতে পারা যাবে। কিন্তু বরাবর রাস্তা আছে, জলকাদারও এখন সময় নয়, বোধ হয় ট্যাক্সি চলতে পারবে। আমি বলি, তাইতেই যাওয়া হোক, তুই ততক্ষণ স্নান ক'রে কিছু খেয়ে দেয়ে নে।"

অর্চ্চনা যেমন বসিয়া ছিল, সেইরূপই বসিয়া রহিল, কোন কথাই তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

—

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আজ দুই দিন হইল নেপাল শ্যামসুন্দরপুর আসিয়াছে। এই দুই দিনে রোগ তাহার যত দূর বাড়িবার বাড়িলেও, রোগের জ্বালা যেন তাহার একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। দুই দিন পূর্ব্বে বেলা দেড় প্রহরের সময় বালীগঞ্জ হইতে সে যখন শ্যামসুন্দরপুরের এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী তাহাদের সেই ছোট্ট ষ্টেশনটিতে আসিয়া নামিয়াছিল, তখনই তাহার রোগকাতর রক্তশূন্য মুখ অতুল বাবুর দিকে ফিরাইয়া কহিয়াছিল,—"আর আমার কোন কষ্ট, কোন দুঃখ নেই অতুল বাবু, আমার সব জ্বালা যেন এখানে এসে জুড়িয়ে গেল। অতুল বাবু একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ীর ভিতর বিছানা পাতিয়া তাহাকে শয়ন করাইয়া তাহার গায় হাত দিয়া দেখিলেন, জ্বরের উত্তাপ ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে। কলিকাতায় কয়দিন এইরূপই হইতেছিল। সকালের দিকে খানিক্ষণের জন্য জ্বর একটু কম থাকে, তাহার পর বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্বর বাড়িয়া অপরাহ্ন হইতে রোগের এত বৃদ্ধি হয় যে, প্রতিক্ষণেই বিপদের একটা সম্ভাবনায় তাঁহাকে সশঙ্ক হইয়া কাটাইতে হয়।

শ্যামসুন্দরপুর আসিবার পর হইতে আজ দুই দিন নেপালের মুখে গভীর একটা প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্তির ভাব দেখা গেলেও, জ্বর তাহার পূর্ব্বেরই মত আসিতেছিল। দেহের ভিতরের যন্ত্রণা হয় ত তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন বাড়িতেছে, কিন্তু বাহিরে আর কিছুই সে প্রকাশ করে না। যে ঘরখানির মেঝের উপর শুইয়া তাহার বাবা চিরকালের জন্য এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল, গেল বছর প্রায় এমনই সময়ে যে ঘরখানির মধ্যে সে তাহার মাকে কাছে থাকিয়া হারাইয়াছে, সেই ঘরের মেঝের উপরই সে তাহার শয্যা বিছাইয়া লইয়াছে। কলিকাতায় থাকিতে সে একটু একটু উঠিয়া বসিতে পারিত, এখানে আসিয়া তাহাও সে আর পারে না। সকালের দিকে যখন জ্বরের প্রকোপ একটু কম থাকে, তখন মাথার কাছের মুক্ত জানালাটি দিয়া গভীর তৃপ্তিতে সে বাহিরের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। তখন সকাল বেলা অদূরের মালীপুকুরে হাঁসের পাল সাঁতার কাটিতে কাটিতে ডুব দিয়া খেলা করে, পুকুরপাড়ে সাঁওতালদের ছেলেরা ধনুকহাতে কাঠবিড়ালের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়ায়,

ও-পারের মনসাতলায় ছেলের দল মিলিয়া 'চু-কবাটি' কিংবা 'ধাম্সি' খেলে। আরও দূরে, নেনোর বট-তলায় রাখালরা গরু ছাড়িয়া দিয়' ওদিককার জামগাছে উঠিয়া গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করে, তাহারই ওদিকে, কেহ হয় ত আউসক্ষেতে লাঙ্গল দেয়, কেহ বা কলাইক্ষেতে কলাই বুনে। পাড়ার ঝি-বউরা মাঠের বিল হইতে স্নানান্তে তখন খাবার-জলের ঘড়া কাঁখে করিয়া ভিজা কাপড়ে ঘরে ফিরে। আর আমবাগানে, বাঁশের ঝাড়ে, শিমুল গাছে, তেঁতুল-ডালে—দোয়েল, শালিক, বুলবুলি, 'গৃহস্থের খোকা হ'ক' 'কেষ্ট গোকুলে' প্রভৃতি পাখীর দল শিস্ দিতে দিতে উড়িয়া বেড়ায়, বৈঁচিবনের ঝোপে ঝোপে ছাতারের দল উল্লাসে নাচিয়া বেড়ায়। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই সব দেখিতে দেখিতে নেপাল নিজের মনেই এক সময় বলিয়া উঠে—"এই আমার স্বর্গ—এই আমার স্বর্গ!"

পাড়ার অনেকেই সকাল-সন্ধ্যায় আসিয়া নেপালকে দেখিয়া যায়। অতুল বাবু আর হীরু ঠাকুর সর্ব্বক্ষণই নেপালের পার্শ্বে বসিয়া থাকে, দুইবেলা খাইবার সময় কেবল একে একে গিয়া খাইয়া আসে। দুই ক্রোশ দূরে তেহাটার গঞ্জে একজন এম-বি ডাক্তার থাকেন, তাঁহাকে এই দুই দিনই আনা হইতেছে। তিনি বলিতেছেন—'পারনিসাস্ ম্যালেরিয়া,' প্রবল জ্বরের তাড়নায় কখন যে রক্ত মাথায় উঠিয়া মৃত্যু ঘটাইবে, বলা যায় না।

নেপালের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে হীরুঠাকুর কহিল—"ভাই রে, কি রোগ নিয়ে এলি বল ত, কি ক'রে তোকে সারাই, ভাই!" নেপাল কহিল,—"রোগ ত আমার হয়েছিল কোলকাতায়, এখানে ত আমি ভাল আছি, ঠাকুর্দ্দা। কত সুখে যে আছি, তা আর তোমায় কি বলব। তুমি কিন্তু এই রকম আমার কাছে সর্ব্বক্ষণ থেকো, আমায় ফেলে রেখে যেন কোথাও যেও না।" তাহার পর নেপাল চোখ বুজিয়া ভাবিতে থাকে। ভাবে—কোন দুঃখই আর তাহার নাই, শুধু অর্চ্চনাকে এই সময় বড় বেশী করিয়া তাহার মনে পড়ে। সে তাহার কেহই নহে, তবু যদি এ সময় একবার সে তাহার দেখা পায়! হীরু ঠাকুর যদি জিজ্ঞাসা করে—"কিছু কি ভাবছিস, দাদা?" নেপাল ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলে—"তারা আমাকে বড় ভালবাসতো, রাগ ক'রেই চ'লে এসেছিলুম, একখানা চিঠি দিলে হয় না, হীরুদা?" পরক্ষণেই জানালার বাহিরে চাহিয়া বলে—"না—থাক্।"

জোর করিয়া অর্চ্চনার কথা নেপাল যত ঠেলিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, ততই তাহার পীড়িত মনের উপর সে কথা চাপিয়া চাপিয়া বসে। সেবার মোটরের ধাক্কা খাইবার পর, তাহার সেই শুশ্রূষা, আর সেই শুশ্রূষার ভিতর কত স্নেহ, কত কোমলতা, কত দরদ! এই এক বৎসর কাল জীবনে কী যে একটা স্নিগ্ধ-শীতল ধারা তাহার সংস্পর্শে বহিয়া গিয়াছে। সত্যই যদি সারিয়া উঠিতে না পারে, তাহা হইলে ত আর কখনও দেখাও হইবে না! সঙ্গে সঙ্গেই নেপাল অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠে। হীরু ঠাকুরের দিকে ফিরিয়া আবার ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করে—"ডাক্তার কি বলে, আমি বাঁচব না, ঠাকুর্দ্দা?"

"ও কথা মুখে আনতে নেই, ভাই; ও-সব কেন ভাব, দাদা?"

নেপাল কিছুক্ষণের জন্য আবার চক্ষু বুজাইয়া নীরবে থাকে, কিন্তু আবার ভাবে। ভাবে যে, পতিগতপ্রাণা অর্চ্চনার পবিত্র অন্তরমধ্যে কোন দিনের জন্য কোন পাপের ছায়াপাত সে দেখে নাই; সে নিজেও কোন দিন অন্য কোন ভাবে তাহার দিকে চাহে নাই। কিন্তু আজ অর্চ্চনার স্নেহ-কোমল মুখ সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বার বার তাহার কেন মনে পড়িতেছে, তাহার মনের তন্ত্রীতে বড় জোরে জোরে মুহুর্মুহু আজ ঘা দিতেছে! নেপাল ভগবানকে স্মরণ করিয়া মনে মনেই কহিল, "যদি এতে কোন পাপ হয়, আমায় ক্ষমা কোরো, আমায় ক্ষমা কোরো ভগবান!"

সেই দিন মধ্যাহ্ন হইতে নেপালের একটা উপসর্গ আসিয়া জুটিল। বেলা দশটা এগারটার সময় হইতে জ্বর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হিক্কা উঠিতে আরম্ভ হইল। বৈকালে ডাক্তার আসিয়া কহিলেন, লক্ষণ ভাল নয়। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া হুগলী থেকে সিবিল সার্জ্জনকে আনিব'র জন্য পরদিন সকালের ট্রেণে এক জন লোক পাঠান হইল।

তখন সকাল বেলা, নেপালের জ্বর খুব প্রবল ছিল না, সিবিল সার্জ্জনের কথায় কহিল,—"তা হ'লে কি সত্যিই আমি বাঁচবো না ঠাকুর্দ্দা?"

হীরু ঠাকুর মৃদু ভৎর্সনার ছলে কহিল,—"আবার তুই ঐ কথা বলবি, ভাই ?"

নেপাল চক্ষু বুজাইয়া স্থির হইয়া রহিল। মুহূর্ত্ত পরে কহিল,—"তা হ'লে——"

"কি তা হলে ভাই ?"

অস্ফুটে নিজের মনেই নেপাল কহিল,—"একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দিলে, তা পেয়ে চলে আসতে কত সময় লাগে ?"

"কোথা থেকে রে ?"

নেপাল কোন উত্তর দিল না, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। অন্তরেব অতি তীব্র একটা বেদনা তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল। অত্যন্ত কাতর হইয়া ডাকিল,—"হীরুদা !"

"কি ভাই ?"

"না—কিছু নয়।"

ইহার পর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত নেপালেব আর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। কেবল মধ্যে মধ্যে হিক্কা, তাহাও খুব বিলম্বে উঠিতেছিল। পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা তাহার প্রবলতা খুবই কম।

তখনও পর্য্যন্ত হুগলী হইতে সিভিল সার্জ্জন আসিয়া পৌছিলেন না। অতুল বাবু এক একবার বাহিরে রাস্তার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া ত্রিবেণীর পথের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। নেপালের যন্ত্রণা যেন ভিতর ভিতর আজ খুবই বাড়িতে লাগিল। হীরু ঠাকুর তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাই, অমন কচ্ছিস কেন রে ?" নেপালের বোধ হয় কথা কহিবার শক্তি কমিয়া আসিতেছিল। মাথার ধারের জানালা দেখাইয়া অত্যন্ত অস্ফুটে—অত্যন্ত ধীরে ধীরে—কি কহিল, কিছুই বুঝা গেল না।

গরম বাতাসের জন্য মাথার দিকের জানালাটি মধ্যাহ্ন হইতে বন্ধ রাখা হইয়াছিল, এক্ষণে খুলিয়া দিতেই হু হু করিরা স্নিগ্ধ বাতাস ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

অতুল বাবু মাথার শিয়রে বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যন্ত্রণা কি বড্ড বাড়ছে ?" নেপাল কোন কথাই কহিতে পারিল না, ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। অতুল বাবু দেখিলেন, নেপালের চোখ জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, আর সে চোখ যেন ক্রমেই ছোট হইয়া বুজিয়া আসিতেছে। ডাক্তারের আদেশে মাথা নেড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন, তাহা অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছে। অসাড় হাতখানি তুলিয়া লইয়া হীরু ঠাকুর একবার নাড়ী দেখিল। নাড়ীর বেগ খুবই তীব্র—খুবই চঞ্চল, নাকের কাছে হাত রাখিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করিল, অগ্নিময় সে শ্বাস সহজভাবেই বহিতেছে। হীরু ঠাকুর মনে ভাবিল, জ্বরের এই অত্যধিক প্রবল অবস্থায় কোন বিপদ হইতে পারে না, তবে এই জ্বরত্যাগেব সময় হয় ত——

এই ভাবে বহুক্ষণ কাটিবার পর হঠাৎ একবার নড়িয়া উঠিয়া নেপাল জড়াইয়া জড়াইয়া কি বলিয়া উঠিল, বুঝা গেল না!

তখনই অতুল বাবু রাস্তায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার যেন বোধ হইল, অনেক দুরে একটা কাল মত পদার্থ এই দিকে আসিতেছে। মিনিট দুই পরে স্পষ্টই দেখিলেন যে, সিবিল সার্জ্জনের মোটরই তীরবেগে ধূলা উড়াইয়া আসিতেছে বটে। তিনি নিশ্চিন্ত মনে ভিতরে আসিয়া হীরু ঠাকুরকে ইহা জানাইলেন। হীরু ঠাকুর বাহিরে আসিয়া পথের মধ্যস্থলে হাত তুলিয়া দাঁড়াইল। দুই এক মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সিখানি আসিয়া তথায় দাঁড়াইয়া পডিল এবং তন্মধ্য হইতে যে দুইটি আরোহী ত্রস্তপদে নামিয়া আসিল, তাহাদের মধ্যে পুরুষ আরোহীটির প্রশ্নে হীরু ঠাকুর কহিল,—"হ্যাঁ, এই বাড়ীই বটে, কিন্তু——"

"কিন্তু কি ?"

হীরু ঠাকুর কোন কথা না বলিয়া উভয়কে পথ দেখাইয়া ভিতরে আনিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল,—"নেপু, কারা এসেছেন, দেখ বে ভাই।" বোধ হয় নেপাল শুনিতে পাইল না, অথবা চাহিয়া দেখিবার তাহার শক্তি ছিল না। শুধু সে ঈষৎ নড়িয়া উঠিল এবং ঠোঁট দুইটি তাহার বার-দুই কাঁপিয়া উঠিল।

অর্চ্চনা কোন দিকে না চাহিয়া অতি ধীরে এক-পা এক-পা করিয়া আবিষ্টের মত অগ্রসর হইয়া নেপালের শিয়রে আসিয়া বসিল, এবং বালিশের উপর হইতে তাহাব মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল।

হীরু ঠাকুর গোঁসাইজীর মুখের দিকে চাহিয়া একবাব তখন জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কে ?"

গোঁসাইজী কহিলেন,—"ওঁরই স্ত্রী—ব্রজরাণী।"

সঙ্গে সঙ্গেই নেপাল ধীরে ধীরে একটি বারের

জন্য চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই তাহার নিষ্প্রভ দৃষ্টির সহিত অর্চ্চনার সজল দৃষ্টির বিনিময় হইল। পলকশূন্য দৃষ্টিতে সে অর্চ্চনার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। বুঝি মনে মনে কিছু বা তাহাকে বলিল, তাহা আর তাহার কণ্ঠের বাহিরে আসিল না, শুধু ফোঁটা দুই জল চোখের কোণ দিয়া তাহার গড়াইয়া পড়িল। তখন আসন্ন সন্ধ্যার আঁধার একটু একটু করিয়া গৃহমধ্যে জমিয়া উঠিতেছিল। সে আঁধারের মধ্যে কেহই কিন্তু লক্ষ্য করিল না যে, অর্চ্চনার মুখের দিকেই চাহিয়া থাকিয়া সে তাহার নিকট হইতে কাতর দৃষ্টিতে অতি কষ্টে শেষ বিদায় গ্রহণ করিল!

* * *

সেই দিনই এই দুঃসংবাদ গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। পরদিন গোলমালে কাটিয়া গেল। তৎপরদিন নাপিত-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পাড়ার দুই-দশ জন লোক, এবং হীরু ঠাকুর, অতুল বাবু, গোঁসাইজী প্রভৃতি নেপাল ও তাহার স্ত্রী ব্রজরাণীর সম্পর্কে আলোচনা করিতে লাগিল। গোঁসাইজীর মুখে ব্রজরাণীর জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস সকলে পরমাগ্রহে শুনিতে লাগিল।

যেটুকু বৃত্তান্ত গোঁসাইজী নিজে জানিতেন এবং বাকী কথা, যাহা সেদিন পুরীতে, সত্যকে বাসায় ফিরাইয়া দিবার পর, তাঁহার আশ্রমের ঘরে বসিয়া অল্পে অল্পে তিনি অর্চ্চনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই সকলের নিকট বর্ণনা করিলেন। প্রথমতঃ, যেটুকু তিনি নিজে জানিতেন, সেইটুকু বলিতে গিয়া বলিলেন যে, প্রায় পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার একমাত্র শিশু-কন্যাকে তাহার মাতুলের কাছে রাখিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া পুরী চলিয়া আসেন। সেই সময়ে পুরীতে এক বৃদ্ধ বৈরাগী ঠাকুরের আশ্রম ছিল। তিনি আসিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে রহিলেন। সেই বৃদ্ধ বৈরাগী এখন আর বাঁচিয়া নাই, বৎসর দশ বার হইল, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। যে বৎসর গোঁসাইজী তাঁহার আশ্রমে আসেন, সেই বৎসরই আশ্বিন মাসে কি একটা বিশেষ যোগের সময় এক দিন বৈরাগী ঠাকুর খবর পান যে, নিকটের এক যাত্রীবাসে একটী স্ত্রীলোক কলেরায় মারা গিয়াছে এবং তাহার স্বামীও মুমূর্ষু। তাহাদের সঙ্গে তাহাদের গ্রামের যে দুই চারি জন সঙ্গী ছিল, তাহারা তাহাদিগকে এই অবস্থায় ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে।

বৈরাগী ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়াই সেই যাত্রীবাসে ছুটিয়া যান এবং গিয়া দেখেন যে, পুরুষটিরও আর বড় বিলম্ব নাই। তাহাদের সঙ্গে মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসরের অতি সুন্দর তাহাদের একটী কন্যা ছিল। কন্যাটির সেই বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল; কারণ, তাহার সীঁথিতে সিন্দুরের চিহ্ন ছিল। মেয়েটি তখনও পর্য্যন্ত রোগাক্রান্ত হয় নাই দেখিয়া, বৈরাগী ঠাকুর তাহাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া আসেন। সেই সময় এক বাঙ্গালী জমীদার সস্ত্রীক আশ্রমে বেড়াইতে আসেন। তাঁহার স্ত্রী মেয়েটিকে দেখিয়া এবং তাহার বিষয়ে সব শুনিয়া সেই দণ্ডেই বৈরাগী ঠাকুরের কাছ হইতে মেয়েটিকে চাহিয়া লইয়া তাঁহাদের বাসায় লইয়া যান। মেয়েটিকে নিরাপদ করিবার পর বৈরাগী ঠাকুর পুনরায় যাত্রীবাসে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার ফিরিবার কিছু পরেই মেয়েটির বাপ মারা পড়ে।

উহার সঙ্গে বেশী কিছু জিনিসপত্র ছিল না। শুধু একটি টীনের লাল রংয়ের তোরঙ্গ ছিল। উহার মধ্যে দুই চারিখানি কাপড়, মেয়েটির একখানি ডুরে রঙ্গীন সাড়ী, চুল বাঁধিবার ফিতা, চিরুণী, মেয়েটির পড়িবার একখানি বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ, একটি এন, সি, ডি, নাম খোদাইকরা সোনার সিল আংটী, গোটাকয়েক টাকা, এবং আরও দুই একটা কি জিনিস ছিল।

মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে বৈরাগী ঠাকুর ঐ লোকটির নাম-ধাম, মেয়েটির নাম, তাহার স্বামীর নাম ও ধাম প্রভৃতি যতটুকু তাহার নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা একটুকরা কাগজে লিখিয়া লইয়া, ঐ কাগজখানি তোরঙ্গের ঐ দ্বিতীয়ভাগ-খানির মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, সবশুদ্ধ ঐ তোরঙ্গটি সেই জমীদারবাবুর কাছে দিয়া আসিবেন, এবং তিনি ঐ ঠিকানা খুঁজিয়া মেয়েটির সম্বন্ধে যাহা হয় কোন ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু সেইদিনই সন্ধ্যার সময় তিনি তাঁহার বাসায় যাইয়া দেখিলেন যে, বাসায় কেহই নাই, তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী মেয়েটিকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বৈরাগী ঠাকুর জমীদারবাবুর অনেক খোঁজ করেন, কিন্তু তাঁহার আর কোনই সন্ধান পান নাই। তখন হইতেই ঐ টিনের তোরঙ্গটি আশ্রমের ঘরের একধারে পড়িয়া ছিল। গোঁসাইজী কখনও

সেটা খুলিয়া দেখেন নাই বা সেই মেয়েটির সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত তিনি কোন খোঁজ-খবরও করেন নাই।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া হীরু ঠাকুর বলিয়া উঠিল,—"নাম-লেখা সেই সিল আংটী আমিই নেপালের বিয়ের সময় কোলকাতা থেকে তৈরী ক'রে আনিয়ে ওর বাপকে দিয়েছিলুম। পরে শুনেছিলুম যে, নেপালের বউটি এখানে যখন একবার এসেছিল, তখন তার হাতে সে পরিয়ে দিয়েছিল। আর সেই সময় নেপাল একদিন কুণ্ডুদের দোকান থেকে একখানা দ্বিতীয়ভাগ কিনে এনে আমারই বাইরেকার ঘরে ব'সে মোটা কাগজের একটা মলাট দিয়ে সেলাই ক'রে দিয়েছিল; আমায় বলেছিল—'ঠাকুর্দ্দা, বউটিকে একটু একটু পড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে'।"

গোঁসাইজী কহিলেন,—"আজ পনর বচ্ছর সে তোরঙ্গটির ভেতর কি আছে, তা দেখি নি। সে দিন দেখলুম যে, বইখানার পাতায় নেপালের আর তার স্ত্রীর দুজনেরই নাম আর নামের নীচে—শ্যামসুন্দরপুর, হুগলী—লেখা রয়েছে। বোধ হয়, নেপালেরই নিজের হাতের লেখা।"

হীরু ঠাকুর কহিল,—"হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, যেন এখানে বসেই লিখেছিল।"

ইহার পর গোঁসাইজী সে দিন অর্চ্চনার নিকট হইতে যেটুকু জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও সকলকে জানাইলেন। তিনি কহিলেন যে, ব্রজরাণীকে যে জমীদারবাবু লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ভবতোষ বাবু। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী হঠাৎ এইভাবে ব্রজর মত একটি সুন্দর মেয়েকে পাইয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং পরম যত্নে আপন কন্যার মতই তাহাকে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রজকে তাহার বাপের নাম-ধাম, তাহার স্বামীর ও শ্বশুরের নাম-ধাম প্রভৃতি বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও বিশেষ কিছুই জানিতে পারেন নাই। কারণ, ছোট বেলায় ব্রজ খুব বোকা-গোছের মেয়ে ছিল। পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা হইলেও সে তখন এত নির্ব্বোধ ছিল যে, ভবতোষ বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর বার বার প্রশ্নে সে শুধু তাহার পিতার ও তাহার নিজের নামটিমাত্র বলিতে পারিয়াছিল, এতদ্ভিন্ন আর কিছুই সে বলিতে পারে নাই। তাহাদের কোন্ জেলায় বাড়ী, কোন্ ষ্টেশনে নামিয়া তাহাদের বাড়ী যাইতে হয়, কিছু সে ঠিক করিয়া বলিতে পারে নাই, শুধু বলিয়াছিল যে, মাঝের পাড়ায় তাহাদের বাড়ী। এই কথার উপর নির্ভর করিয়া যেখানে যত 'মাঝের পাড়া' নামে গ্রাম আছে, ভবতোষবাবু কোথাও আর সন্ধান করিতে বাকী রাখেন নাই।

হীরু ঠাকুর কহিলেন—"বর্দ্ধমান জেলার মায়াপুরে নেপুর শ্বশুড়বাড়ী। বিয়ে দিতে আমিও গিয়েছিলুম কি না। গ্রামের মাঝের পাড়াতেই ওদের বাড়ী ছিল বটে। কিন্তু মাঝের পাড়া ত গ্রাম নয়, গ্রাম—মায়াপুর।"

গোঁসাইজী কহিলেন,—"অর্চ্চনা সে সময়ে খুব বোকা থাকলেও তার স্মরণ-শক্তি খুব বেশী। তখনকার প্রত্যেক কথাটি তার মনে আছে।"

অতুল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর কি হ'ল?

গোঁসাইজী কহিলেন—"তারপর, যখন ব্রজর বাপের বাড়ী বা শ্বশুরবাড়ী কোনটারই কোন সন্ধান ভবতোষ বাবু করতে পারলেন না, তখন তাঁর স্ত্রী বলেন যে, কোন খোঁজের আর দরকার নেই, ও আমারই মেয়ে, আমাদের যা-কিছু সব ওরই। বড় হলে ওর আমি আবার বে দোবো। তিনি বেঁচে থাকলে কি করতেন বলা যায় না, কিন্তু মেয়েটার যে কি অদৃষ্ট!"

গোঁসাইজী সুদীর্ঘ একটি শ্বাস ফেলিয়া কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর, স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে কি ভাবে, কত যত্নে, কত আদরে ভবতোষ বাবু ব্রজকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, কি ভাবে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন, একে একে সবই তিনিই বলিলেন। এ সমস্তই অর্চ্চনার কাছে সে দিন তিনি শুনিয়াছিলেন।

অতুল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"অর্চ্চনা নামটা কি তা হ'লে—"

গোঁসাইজী কহিলেন—"হ্যাঁ, ভবতোষবাবুর স্ত্রীই ব্রজকে ঐ নতুন নাম দিয়েছিলেন।"

এই অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী শুনিয়া সকলেই একদিকে চমৎকৃত হইল, অন্যদিকে চির হতভাগ্য নেপাল ও ব্রজরাণীর জীবনভোর দুঃখে অন্তরে সকলেই একটি তীব্র বেদনা অনুভব করিল।

হীরু ঠাকুরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। একটা মর্ম্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সে বাহিরের দিকে উঠিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এক বৎসর পরে এ কাহিনীর আর কি-ই বলিবার আছে! তবু দুই-একটি কথা এইজন্য বলা যে, তাহা শুনিয়া অর্চ্চনার বর্ত্তমান এই বুক-ফাটা দুঃখে কেহ যদি একটুও সান্ত্বনালাভ করিতে পারে।

এই এক বৎসরের মধ্যে অর্চ্চনা শ্যামসুন্দরপুর ছাড়িয়া আর কোথাও যায় নাই, যাইবেও না। তাহার স্বামী-শ্বশুরের সেই ভিটার উপরে সে তাহার কালীদিদিরই মত এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছে। হাতের লোহা, সীঁথির সিঁদুর, সে-ও খুলে নাই, মুছে নাই। কালীদিদির মত সেও বলে, স্বামীর দেখা পাওয়া অবধি সে তাহার অন্তরমধ্যেই নিশিদিন তাঁহাকে সযত্নে রাখিয়াছে। তথায় তাহার হৃদয়মধ্যে স্বামীর সহিত তাহার একদণ্ডের জন্যও বিচ্ছেদ হয় না।

নেপালের একখানি ফটো হইতে সে খুব বড় একখানা প্রতিকৃতি করাইয়া লইয়া তাহাই অতি যত্নে, অতি শ্রদ্ধায়, অচলা ভক্তিতে সে মঠের একাংশে স্থাপন করিয়াছে এবং পূর্ব্বকার মত ঠাকুর-পূজার পরিবর্ত্তে তাহাই নিত্য দুইবেলা পূজা করিয়া থাকে।

এই এক বৎসরকাল অর্চ্চনা গোঁসাইজীকে ছাড়িয়া দিতে পারে নাই। তাঁহাকে, হীরু ঠাকুরকে ও অতুলবাবুকে এই এক বৎসরকাল নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পর্য্যন্ত অর্চ্চনা দেয় নাই। এতদিনের পর এইবার চলিয়া যাইবার জন্য অর্চ্চনার কাছে গোঁসাইজীর ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে। শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন।

কোম্পানীর কাগজ ও ব্যাঙ্কের জমা প্রভৃতি লইয়া দুই লক্ষাধিক টাকা ভবতোষবাবু তাহার নামে রাখিয়া গিয়াছিলেন। অর্চ্চনা গোঁসাইজীকে দিয়া সেই সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিয়াছে ও এই এক বৎসরে ইঁহাদের দ্বারা সেই সমস্ত টাকা সে শ্যামসুন্দরপুরে একবারে ঢালিয়া দিয়াছে। স্বামীর প্রাণে যে কি সাধ ছিল, তাহা সে জানিত। তাই অর্থবিহনে নেপাল যাহা করিয়া যাইতে পারে নাই, এক্ষণে অর্চ্চনা তাহাই করিল। এই টাকা ব্যয় করিয়া তাহার স্বামীর চিরদিনের মনের ইচ্ছা সে পূর্ণ করিল। তবে, বাঁচিয়া থাকিয়া নেপাল ইহা দেখিয়া যাইতে পরিল না, এই দুঃখ। কিন্তু অর্চ্চনা তাহা বলে না, অর্চ্চনা বলে, স্বামী তাহার নিশিদিন তাহার সঙ্গে থাকিয়া এই সব করিতেছেন, দেখিতেছেন।

অর্চ্চনার দুই লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে এক্ষণে শ্যামসুন্দরপুরের নূতন রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের বন-জঙ্গল সব পরিষ্কার হইয়াছে। পুরাতন জলাশয়গুলির কোন কোনটি বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে কোন কোনটির বা পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অনেক নূতন পুষ্করিণী কাটান হইয়াছে। গ্রামের দেবালয়গুলির সুন্দররূপ সংস্কার হইয়া তথাকার ভোগ-রাগাদির সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পাঠশালা, বালিকা-বিদ্যালয়, হাইস্কুল, টোল বসিয়াছে। এ গাঁয়ে কোন হাট ছিল না, এক্ষণে নদীর ধারে বিস্তৃত ভূমির উপর নূতন হাটতলার সৃষ্টি হইয়াছে। এ সমস্ত ছাড়া, দাতব্য চিকিৎসালয়, অন্নসত্র, অতিথিশালা, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রামের ভিতর অনেকগুলি নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং পুরাতন রাস্তাগুলির সু-সংস্কার হইয়াছে। ষ্টেশনের ও ত্রিবেণীর কাঁচা রাস্তা পাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ গ্রামে প্রায় প্রতিবৎসরই সময়ে বৃষ্টির অভাবে শস্যহানি হইত এবং সে জন্য দরিদ্র চাষীদের প্রতিবৎসরই কষ্টের সীমা থাকিত না। ইহার প্রতিকারের জন্য, ভাল ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা নদীর কয়েক স্থান কাটাইয়া তাহার সহিত কয়েকটি বড় বড় নালার যোগ করিয়া দিয়া, সেগুলি বরাবর মাঠের মধ্য দিয়া এমন ভাবে লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির জন্য এ গাঁয়ে ভবিষ্যতে কখনও শস্যহানির আশঙ্কা নাই।

এই সমস্ত কার্য্য দেখা-শুনার বন্দোবস্ত, তদারক প্রভৃতি করিতে হীরু ঠাকুরের উৎসাহ ও পরিশ্রমের আর অন্ত নাই। তাহা ছাড়া, টোলের সম্পূর্ণ ভারই শুধু তাহার নিজের উপর।

অর্চ্চনার কলিকাতার সম্পত্তি এবং কটকের জমীদারী পরিচালনা করিবার জন্য দুই চারিজন লোক লইয়া এখানে ক্ষুদ্র একটি আফিস করিতে হইয়াছে। সেখানেও হীরু ঠাকুরকে প্রত্যহ যাইয়া দেখা-শুনা করিতে হয় এবং কর্ম্মচারীদের সহিত কারণে অকারণে হাঁক-ডাক করিতে হয়। মোট কথা, অর্চ্চনা তাহারই উপর সকল বিষয়ে নির্ভর করিয়াছে, এই কারণেই একটা গভীর আনন্দ ও

তৃপ্তিতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই তাহাকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। এ জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার নেশার টাইম সংখ্যায় যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে এবং মেজাজও তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে কখন কখন তাহার দুই চোখ ভরিয়া জল ছাপাইয়া আসে। তখন দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে আপন মনেই বলিয়া উঠে—"ভাই রে, এ সব তুই কিছুই যে দেখলি নি রে, ভাই!"

হীরু ঠাকুরের মত অর্চ্চনার নিজেরও কাজের অন্ত নাই। প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া সে মঠ-সংলগ্ন তাহার নূতন বাগানে সাজী ভরিয়া ফুল তোলে। তাহার পর নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়া, বসিয়া বসিয়া সেই সমস্ত ফুলের মালা গাঁথে, তোড়া বাঁধে। তার পর স্বামীর সেই প্রতিকৃতির সম্মুখে বসিয়া ঘণ্টা-দুই ধরিয়া কি ধ্যান, কি পূজা করে, তাহা সেই জানে। পূজান্তে সেই তোড়া, সেই মালা, সেই ফুল দিয়া নেপালের ছবির সর্ব্বাংশ মনোমত করিয়া সাজায়। এই করিতেই তাহার এক প্রহর বেলা উৎরাইয়া যায়। তাহার পর সে পাড়ায় বাহির হয় এবং বাড়ী বাড়ী গিয়া সকলের খোঁজ-খবর লইয়া মঠে ফিরিয়া আসিতে প্রত্যহ বেলা গড়াইয়া যায়। তাহার পর স্বহস্তে একমুঠা চাউল সিদ্ধ,—তাহার পর তাহাই আহার।

কিছু দিন হইল সে অতুলবাবুকে গিরিডি পাঠাইয়া কালীকে একবার আনাইয়াছিল। কালী দিন চারি পাঁচ থাকিয়াই কহিল—"আর ভাই ঘর ছেড়ে এখানে থাকতে পারব না। সে এলে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে তখন অনেক দিন এখানে থাকবো।" পায়ের ধূলা লইতে লইতে অর্চ্চনা মনে মনে কহিয়াছিল,—"পাগল হও, যা হও দিদি, তোমার মত এই রকম বিশ্বাস যেন আমার চিরকাল থাকে।"

অতুলবাবুর এখন আর বিশেষ কোন কাজ রহিল না। থাকিলেও তিনি এই এক বৎসরকাল বহু পরিশ্রম করিবার পর, কাজের কাছে বড় একটা আর ধরা দিতে চাহিতেন না। অথচ অর্চ্চনা তাঁহাকে অন্য কোথাও যাইতে দেয় নাই। সুতরাং সারাদিন ধরিয়া নদীর ধারে, মাঠের আলে, পাড়ায় পাড়ায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেই তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত। যখন সময় কাটিত না, তখন মাঠের একাংশে বসিয়া নিজের মনে প্রাণ ভরিয়া গান গাহিতেন। প্রায়ই গভীর নিশীথে শ্যামসুন্দরপুরের লোক তাঁহার গান শুনিতে পাইত।

অবশেষে এক দিন গোঁসাইজীর ফিরিয়া যাইবার দিন আসিল। যে দিন তিনি যাইবেন, সে দিন সকাল হইতেই অর্চ্চনার চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেও তাহার কষ্ট হইতেছিল অথচ আর ধরিয়া রাখিতেও সে পারে না। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, মেয়েকে মনে থাকবে?"

সংসার-ত্যাগী গোঁসাইজীর চক্ষুও ছল-ছল করিয়া আসিল, কহিলেন,—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, মা?"

"কবে আবার আসবেন?"

"যখনই আবার দরকার হবে, যখনই তুই আসতে বলবি।"

অর্চ্চনা তাঁহার পদপ্রান্তে গড় হইয়া প্রণাম করিল। গোঁসাইজী মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"কিন্তু মা, একটা কথা তোকে বলি। তোর যা সাধ, তা হ'ল। শ্যামসুন্দরপুরকে তুই নূতন সাজে সাজালি। এখন বাকী জীবনটা পুরীতে জগন্নাথের পায়ের তলায়, কিম্বা বৃন্দাবনে গিয়ে থাকলে হত না? বেশ ক'রে ভেবে দেখে পরে না হয় আমায় জানাস, মা। পুরী-বৃন্দাবনের মত পুণ্যস্থানে——"

নতমুখে অর্চ্চনা কহিল,—"না বাবা, অন্য পুণ্যস্থান আর আমি চাই না। আমার মনের কথা ত কিছুই আপনার অজানা নেই। দেশকে যা করবার তাঁর সাধ ছিল, তা হয়েছে। তাঁর শ্যামসুন্দরপুরই আমার সব চেয়ে পুণ্যস্থান—আমার স্বর্গ—আমার মাটীর স্বর্গ।"

গোঁসাইজী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ব্যথার ব্যথী

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

ব্যথার ব্যথী

জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা বড় জোর দেড় প্রহর, কিন্তু এমনি রৌদ্রের তাপ যে, ঘরের বাহির হওয়া কষ্টকর। তখনই বাতাস গরম হইয়া গিয়াছিল, পথের মাটি তাতিয়া উঠিয়াছিল। এই রৌদ্রের মধ্যে এতখানি বেলা পর্য্যন্ত নিস্তারিণী, পাট করা ভিজা গামছাখানি মাথায় দিয়া সারা গ্রামখানি ঘুরিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের খোঁজ করিয়া ফিরিয়া আসিল, কার্ত্তিক গণেশের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না।

ফিরিয়া আসিয়', উঠানে দাঁড়াইয়া নিজের মনে বকিতে লাগিল,—না বাবা, আমার হাড়কালি হোয়ে গেল! মুখপোড়াদের জ্বালায় জ্বলে গেলুম! যে যার চোখ বুজে নিজের নিজের পথ দেখলে, আর এই পোড়ার ভোগ কত্তে রেখে গেল কি না—আমাকে? কি পাপ করে এসেছিলুম গো!—বলিয়া আঁটিকতক খড় লইয়া উঠানে বসিযা কাটিতে আরম্ভ করিল। খড় কাটা হইয়া গেলে, বঁটীখান' সেইখানেই কাত করিয়া রাখিয়া একবার বাহিরে আসিল এবং পথের এদিক ওদিক দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার নিজের মনে বলিল,—দুটী মুড়ি পর্য্যন্ত খেয়ে যায় নি,—এই এতখানি বেলা পর্য্যন্ত কোথায় যে দুটোতে টো টো করে ঘুরচে! অলপ্পেয়েরা আজ আসুক না একবার বাড়ী, দুটোর পিঠের চামড়া তুলে তবে ছাড়বো।

ও বাড়ীর রাঙ্গা গিন্নী ঠাকুরপূজার ফুল তুলিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হোয়েচে লো,—নিজের মনে গজ গজ করে বকচিস কি অত?

দেখ না ভাই একবার ছেলে দুটোর কাণ্ড! সকাল না হোতেই দুটোতে বেরিয়েছে, এই এতখানি বেলা হল, এখনো ফেরবার নামটি নেই। সারা গাঁ খানা ঘুরে এলুম ভাই, লক্ষীছাড়াদের কোথাও খুঁজে পেলুম না। ছোঁড়া দুটোতে মিলে আমায় জ্বালিয়ে খেলে, রাঙ্গা গিন্নী,—আমায় জ্বালিযে খেলে।

তোর কি আজ এরি মধ্যে রান্না বান্না হয়ে গেছে না কি?

তবে আর বলচি কি? আজ আমাদের পাঁচির সেই ব্রেতর বামুণ খাওয়ান না? কত করে দুটী হাতে ধরে বলে গিয়েছিল—মাসিমা, একটিবার যাস মাসিমা—একলা পেরে উঠবো না।—তা কি করে যাই এখন তোমরা বল। কালকের জল দেয়া ভাত আছে। মনে করেছিলাম, সকাল সকাল দুটোকে গিলিয়ে দিয়ে চলে যাব,—তা কেমন এই যে যাওয়ালে! মুখপোড়ারা কী শত্রুতাই সাধচে আমার সঙ্গে। পায়ে যেন আমার বেড়ী পরিয়ে রেখেছে। সোঁত বোশেখ মাসের ভেতর, রাঙ্গাগিন্নী, একদিন তিরবেণীতে গঙ্গাচ্ছানে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসতে পাল্লুম না! কি পাপের ভোগ আমার বল তোমরা? এতখানি বেলা হল, এখনো একটা ডুব পর্য্যন্ত দিয়ে আসতে পারি নি। কখন যে কি কর্ব্ব—

যা—যা, আর বেলা করিস নি, একটা ডুব দিয়ে আয়।

রান্নাঘরের শিকলটা টানিয়া দিয়া, দাওয়া হইতে পিতলের ঘড়া ও গামছাখানি লইয়া নিস্তারিণী মাঠের পুকুরে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

সোজা পথে যাইতে যাইতে নিস্তারিণী ঘুরিয়া গয়লাপাড়ার ভিতর ঢুকিল এবং মনসাতলায় যেখানে ছেলেব দল খেলা করিতেছিল, সেইখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ বাবা নিতাই, আমাদের কেতো গণশাকে দেখেছিস বাবা?

খেলায় তাহারা এতই মত্ত যে, নিস্তারিণীর প্রশ্ন তাহাদের কানেই পৌছিল না। জোলাপাড়ার ফকির, গামছার বস্তা মাথায় করিয়া হাটে যাইতেছিল, কহিল,—তোমার কার্ত্তিক—গণেশকে দেখলুম, দিদিঠাকরুণ, সেই নেনোর বটতলার কাছে। একটা কুকুরবাচ্ছার গলায় দড়ি বেঁধে টানা টানি কচ্চে।

বলিস কি রে ফকির, সেই নেনোর বটতলার কাছে। দাঁড়াও,—আসুক আজ একবার।

পুকুরের ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইতেই, ব্রজ

ভট্টাচার্য্য একগলা জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিস্তারিণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—নিস্তার, ছেলে দুটোকে একটু শাসন কোরো। তোমার না হয় ধরলুম—আদরের,—কিছুতেই কিছু হয় না, কিন্তু একবার স্নান করে, অতদূর চলে গিয়ে আবার এতটা পথ এসে আমায় যে স্নান কত্তে হোলো—

কেন, কি হোয়েছে কাকা?

ব্রজ ভট্টাচার্য্য ডুব দিয়া উঠিয়া কহিল,—সমস্ত লোকে শুনলে, আর তুমি তার কিছুই শুনলে না? বলি, বামুনের ছেলে, আচার বিচেরটা ত আর একেবারে জলাঞ্জলি দিতে পারি না। বলিয়া ব্রজ ভট্টাচার্য্য আর কোন কথা না বলিয়া, গামছা নিংড়াইতে নিংড়াইতে চলিয়া গেল।

মহেন্দ্র ঘোস একধারে স্নান করিতেছিল, কহিল,—ভট্‌চাযি্য মশাই চান করে যাচ্ছিলেন, তোমার কার্ত্তিক গণেশ বুঝি কুকুর শুদ্ধু ওঁনার গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছে, দিদি ঠাকরুণ।

স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া, উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই, গোয়ালের ভিতর হইতে কার্ত্তিক বলিয়া উঠিল,—পিসিমা, শীগগির দেখবে এস—কি এনেছি।

গণেশ ছুটিয়া আসিয়া একেবারে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল,—বিলিতী কুকুর, পিসিমা! দেখবে এসো—কী সুন্দর! কোথায় পেলুম বল দেখি?

নিস্তারিণী একবারটী গোয়ালে উঁকি দিয়া দেখিয়া কহিল,—দূর হোয়ে যা মুখপোড়ারা, দূর হোয়ে যা। বেলা দুপুর পর্য্যন্ত কোন্ যমের বাড়ী ছিলি? বিদেয় করে দিয়ে আয় মুখপোড়া. বিদেয় কোরে দিয়ে আয় এক্ষুণি! একটা নেড়িকুত্তোকে নিয়ে—

নেড়ী কুত্তো কি গো? নখ গুণে দেখ না একবার। মাইরি বলচি, আঠারটা! আর এই দেখ—বলিয়া কুকুরবাচ্ছাটার একটা কাণ ধরিয়া কার্ত্তিক শূন্যে ঝুলাইয়া ধরিয়া কহিল,—দেখলে ত, পাস বিলিতী, একটুও কেঁউ করলে না।

কেঁউ করাচ্চি আমি মুখপোড়া। শীগ্‌গির বিদেয় করে দিয়ে আয় বলচি! বেজ ভটচাযি্যর গায়ের ওপর গিয়ে কুকুরশুদ্ধ কেন পড়েছিলি রে নচ্ছার, পাজি, শূয়ার?—দুটোতে মিলে আমায় তিতি বিরক্ত করে তুললে। পাঠশালা বন্ধ হোয়ে অবধি দুটোতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে একেবারে।

গোয়াল হইতে হাঁকিয়া কার্ত্তিক কহিল,—তুমি বেশী বোকো না বলচি। শীগ্‌গির দুটী ভাত দাও আগে, এর বড্ড খিদে পেয়েছে।

গণেশ কহিল—কি নাম হবে পিসিমা? আমি বলচি টম, কেতো বলচে বুলি। কোনটা ভাল, বল না?

ওরে মুখপোড়া, তোর টমকে ত এক্ষুণি যমের বাড়ী দিয়ে আসবো, তা নাম রেখে আর করবি কিরে ছোঁড়া? বলিয়া নিস্তারিণী ঘরের মধ্যে কাপড় ছাড়িতে যাইল।

কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেই নিস্তারিণী দেখিল, উঠানে ঘোষালদের পঞ্চাননীর বাড়ীর চাকর দাঁড়াইয়া আছে। নিস্তারিণী কহিল,—যুগল, ডাকতে পাঠিয়েছে বুঝি? বড্ড বেলা হয়ে গেল রে বাবা। এই ছেলে দুটোর জন্যে······ দেখনা একবার, কোত্থেকে একটা মড়াখেকো কুকুরছানা এনে···চ বাবা যাচ্চি আমি। এই, ওদের দুটো গিলিয়ে দিয়েই যাচ্চি, বলিয়া নিস্তারিণী রান্নাঘরে প্রবেশ করিল এবং ভাত বাড়িতে বাড়িতে চীৎকার করিয়া কহিল—ওরে হতভাগারা, কুকুর ফেলে দিয়ে হাত পা ধুয়ে শীগ্‌গির এসে খেতে বোস। খেয়ে দেয়ে দুজনে বাড়ী থেকে যদি বেরুবি ত তোদেরই একদিন কি আমায়ই একদিন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিস্তারিণী পঞ্চাননীদের বাটী হইতে গৃহে ফিরিয়া দেখিল, কার্ত্তিক গণেশ কুকুর বাচ্ছাটা লইয়া উঠানে ছুটাছুটি করিতেছে। উঠানের একধারে একটা ভাঙ্গা মাটির সরাতে কতকগুলা জল দেওয়া ভাত, একটা খুরিতে খানিকটা দুধ, একটা বার্লির টিনে খানিকটা জল, মাটীর উপর কতকগুলা মুড়ি, গোটা দুত্তিন কাঁচা পেয়ারা, একখানা কাগজের উপর খান দুত্তিন বাতাসা আর তারি একধারে কতকগুলি কাঁচা কলাইয়ের দাল, একটু গুড়, খানিকটা তেঁতুল প্রভৃতি ছত্রাকারে পড়িয়া রহিয়াছে।

যাহার জন্য এই সব খাদ্য ও পানীয়ের আয়োজন হইয়াছিল, হয় ত সে ক্ষুধার তাড়নে কোন কোন দ্রব্যের কিছু কিছু আহার করিয়াছিল, কিন্তু আহার অপেক্ষা সমস্ত স্থানটার বাহারই হইয়াছিল বেশী। ইহাও নিস্তারিণীর সহ্য হইল। কিন্তু সেই নবাগতটী মরাই তলায় যে অপবিত্র কার্য্যটি করিয়া রাখিয়াছিল,

তাহা নিস্তারিণীর দৃষ্টি এড়াইল না—এবং সারাদিন কর্ম্মবাড়ীতে পরিশ্রম করিয়া আসার পর ইহা দেখিয়াই তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল এবং কার্ত্তিকের পিঠে উপর্য্যুপরি কয়েকটা চড় বসাইয়া দিল। গণেশ ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া কার্ত্তিক গণেশকে দুইপাশে লইয়া নিস্তারিণী শুইয়াছিল। কার্ত্তিকের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—কোত্থেকে একটা কুকুর বাচ্চা এনে, দেখ দেখি বাবা, বিকেলে এই মারটা খেলি ত? যাদের কুকুর তাদের কাল ফিরিয়ে দিয়ে এসো যাদু আমার! ভদ্দর লোকে কি কুকুর পোষে?

গণেশ পিসিমার একখানি হাত ধরিয়া বুকের উপর রাখিয়া কহিল,—কেন পিসিমা, পুষলে কি হয়? কেমন চোর আসতে আর পারবে না।

কার্ত্তিক কহিল,—ভদ্দর লোকে পোষে না? তবে পিসিমা, জগর বাবা পুষেছে যে?

যে পোষে পুষুক বাবা, আমাদের পুষতে নেই। কুকুর কেন বাবা? কাল সকালে ফিরিয়ে দিয়ে এস মাণিক আমার! তেমনি কার্ত্তিকের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিস্তারিণী আবার কহিল,—হ্যাঁরে, খুব লেগেছে?

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কার্ত্তিক কহিল—তখন খুব লেগেছিল পিসিমা, এখন আর লাগেনি।

কোলের কাছে কার্ত্তিককে টানিয়া লইয়া নিস্তারিণী কহিল,—আর ও রকম কোরো না বাবা।

কি করি পিসিমা?

নিস্তারিণী কিছু বলিতে পারিল না। তিনজনেই কিছুক্ষণ নীরবে শুইয়া রহিল।

অনেক্ষণ পরে নিস্তারিণী ধীরে ধীরে কহিল,—দেখ কাতু, দেখ গণু!

কি পিসিমা?

তোদের পিসেমশাইকে তোরা তো দেখিসনি,—তার কত বড় বড় দুটো কুকুর ছিল! তখন আমরা ছিলুম—কটকে! কত লোক সেই কুকুর দেখতে আমাদের বাড়ী আসতো, বলিয়া নিস্তারিণী অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল! কার্ত্তিক তাহার কোলের উপর পা তুলিয়া দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—পিসেমশাই কোথা পিসিমা? সেই কুকুর নিয়ে একবার আসতে বোলো না!

গণেশ এপাশে ফিরিয়া শুইয়াছিল, কহিল,—দূর গাধা! পিসেমশাই বুঝি আছে? সে ত মরে গেছে,—না পিসিমা?

নিস্তারিণী নীরবে গণেশের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

গণেশ কহিল—দেখ পিসিমা, কেতোটা বড় বোকা! ও কি বলে জান?—ও বলে, আমরা নাকি তোমার পেট থেকে হয়েছি!

নিস্তারিণী চুপ করিয়া রহিল! খানিক পরেই কার্ত্তিক গণেশ ঘুমাইয়া পড়িল।

পুরাতন দিনের অনেক কথাই আজ এই নির্জ্জন সন্ধ্যায় একে একে নিস্তারিণীর মনে উদয় হইতে লাগিল! মায়ের স্নেহ, বাপের আদর, তাঁদের মৃত্যু, নিজের বিবাহ, স্বামীর সহিত বিদেশে বাস, বিধবা হওয়া, ভ্রাতার সংসারে ফিরিয়া আসা, একে একে সব কথাই তাহার মনে উদয় হইয়া তাহার শুষ্ক হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিল! তাহার পর, এই সে দিন—এখনো নয় বৎসর পূর্ণ হয় নাই গণেশের জন্ম হইল! আর তাহারই বছর দুই পরে কার্ত্তিক হইল! সে কত আনন্দ—সংসারে সে কী উৎসাহ!

কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে কালবৈশাখীর ঝড় আসিয়া পড়িল! এক বৎসরের ভিতরেই সব আনন্দ আহ্লাদের শেষ হইয়া গেল!

মহামারী যেন তাহাদেরই জন্য সে বছর গ্রামে আসিয়া ঢুকিয়াছিল! নিস্তারিণী আর ভাবিতে পারিল না! সেদিনকার কৃষ্ণপক্ষের ঘনান্ধকারময়ী রজনীর ন্যায়, তাহার শূন্য অন্তঃকরণ গভীর আঁধারে মগ্ন হইয়া গেল। যে শুষ্ক বিষবায়ু তাহার অন্তর-মরুর চারিদিকে জমাট হইয়া ছিল, হা হা শব্দে তাহাতে তরঙ্গ উঠিয়া তাহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিয়া ফেলিল।

হাতের পাখাখানি রাখিয়া উঠিয়া বসিতেই বাহির হইতে কে ডাকিল, মা ঠাকরুণ, শুয়েছ না কি গো?

উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিস্তারিণী সাড়া দিল,—কে রে? মাহিন্দির? দাঁড়া বাবা, দরজা খুলি।

মহেন্দ্র বাগদী হাতের লণ্ঠনটী উঠানে রাখিয়া দাওয়ার পৈঠার উপর বসিয়া কহিল—পশ্চিমের মাঠের বীজতলা খানাতে ত আর বীজ ফেলাতে পারা গেল না, মা ঠাকরুণ।

মহেন্দ্র নিস্তারিণীর জমিগুলি ভাগে চাষ করিত।

নিস্তারিণী কহিল,—যো বয়ে গেলে আর বীজ ফেলবি কবে রে বাবা?

আরে, তবে আর বলতে এসেচি কি? বীজ ফেলতেই ত গিয়েছিলাম। দেখি, আমার যাবার আগে, রায়মশায়ের লোকে জমি চষে বীজ বুনে দিয়েছে। তেনার গোমস্তা ঐ তিনকোড়ে সাঁথটা সেখানে দেঁড়িয়ে বল্লে বহুকাল থেকেই তলাখানা তোমরাই ভোগ করে আসচ বাপু, অথচ এ তোমাদের নয়, এ হোলো রায়মশায়ের কদমপুকুরের পাড়ের সামিল সাড়ে সাত বিঘের ভেতর,—দলিলে লেখা আছে।

নিস্তারিণী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া শুনিল।

রায়মশায় যাহাতে হাত দিয়াছেন, তাহা যে আর কোন মতেই ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, ইহা গ্রামের অন্যান্য সকলে যেমন জানে, নিস্তারিণীও তদপেক্ষা কম জানে না। ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র কহিতে লাগিল,—সারা মাঠটার মধ্যে ঐ বীজতলাখানাই সকলের সেরা বীজ তলা। তা রায়মশায়ের যখন নজর পড়েছে, তখন ও ছাড়তেই হবে। এখন ও মাঠের জন্যে বীজই বা ফেলা যায় কোথায়? পশ্চিম মাঠে ত আর আমাদের তলা নেই।

খুঁটী ধরিয়া অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিস্তারিণী কহিল,—বললে—কদম পুকুরের পাড়ের সামিল—দলিলে লেখা আছে? মাহিন্দির, একটু তুই খোকাদের কাছে বোসতো বাবা, আমি এখুনি একবার যাবো—বলিয়া নিস্তারিণী মহেন্দ্রর লণ্ঠনটী উঠান হইতে তুলিয়া লইয়া, শিবরায়ের বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে নিস্তারিণী ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—ওর আর আশা করিসনি মাহিন্দির—অন্য তলায় বীজ ফেলগে যা।

লাঠি গাছটাকে হাতে করিয়া মহেন্দ্র উঠানে নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি কইলেন রায়মশাই?

আমায় আদালত দেখিয়ে নালিশ কর্ব্বার সৎ-পরামর্শটা দিলেন। নালিশও আমি করবো বটে, কিন্তু সে এখানে নয়, সে নালিশ আমার আর এক জায়গায় পৌঁছুবে—বলিয়া ঊর্দ্ধে অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া কহিল,—নাবালকের কষ্টের ভাতের ওপর যে অন্যায় করে হাত দেবে, তার বিচার তুমি করো—তুমি কোরো—তুমি কোরো।

সে রাত্রে, চিন্তা ও মানসিক উদ্বেগে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তারিণীর চক্ষে নিদ্রা আসিল না। নিদ্রা যখন আসিল, তাহার অল্পক্ষণ পরেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

আশ্বিন মাস পড়িয়াছে। একদিন—জ্যৈষ্ঠের প্রখর রবি তাপে দগ্ধ ধরিত্রীর বিদীর্ণ বক্ষের ভিতর হইতে যে তপ্ত মর্ম্মশ্বাস ধূমাকারে নির্গত হইয়া অগ্নিময় মধ্যাহ্ন বায়ুর সঙ্গে অহরহঃ ভাসিয়া বেড়াইত, আজ বর্ষান্তে—দেবতার স্নেহাশিস-ধারায় তাহার অবসান হইয়াছে। সেদিনের শুষ্ক কঠিন ধরাতল আজ সরস কোমল হইযা উঠিয়াছে এবং তাহার শূন্য নদ নদী, খাল, বিল, ডোবা পুকুরে আজ আর জল ধরিতেছে না,—সে সকল আজ কানায় কানায় ভরা। মাঠে মাঠে শস্যের ভার অপর্য্যাপ্ত। দিকে দিকে একটা নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আকাশের ঘনাবরণ সরিয়া গিয়া আজ তথায় বিচিত্র বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মহামায়ার পূজা আসন্ন। নিস্তারিণী মরাই হইতে মণ দুই তিন ধান্য বাহির করিয়া এবং তাহা বিক্রয় করিয়া যে কয়টা টাকা পাইয়াছিল, তাহা দিয়া কার্ত্তিক গণেশের পূজার কাপড় জামা কিনিয়া দিয়াছে। স্নানাহার ভুলিয়া, দুই ভাই তাহাদের সেই নূতন কাপড় জামা হাতে হাতে করিয়া ফিরিতেছিল। রান্নাঘর হইতে নিস্তারিণী থাঁক দিয়া কহিল,—হ্যাঁরে, ওই জামা কাপড় হাতে নিয়ে নিয়ে ঘুরলেই পেট ভরবে? ও এখন রেখে দাও না বাবা আমার। কাল চান করনি দুজনে, আজ চান করে এস, এসে খেতে বোস। এস মাণিক, দুজনকে তেল মাখিয়ে দি এস। পুকুরে গিয়ে জলে বেশীক্ষণ থেকো না বাবা—নতুন জল।

টম এই কয় মাসে বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছিল। নিস্তারিণীর কথা শুনিতে পাইয়া সে উঠানের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। নিস্তারিণী কহিল,—আর চাইতে হবে না, বুঝতে পেরেচি। তোমাকেও দিচ্চি।—ওরে, যা না তোরা বাবা, তেল মেখে চান করে আয় না। তোদের জন্যে যে ও ক্ষিদেয় সারা হয়ে গেল।

গণেশ কহিল,—কে, পিসিমা?

কে আবার! আমার টমি।

কার্ত্তিক গণেশ স্নান করিয়া আসিলে নিস্তারিণী উহাদের খাইতে দিয়া টমকেও উঠানের একধারে দুধ মাখিয়া ভাত দিয়া আসিল এবং হাত ধুইতে ধুইতে বলিল,—আহা, ওর আমার কদিনই খাবার বড় অসুবিধে হচ্ছে? এমন গাঁ হোয়েছে যে, দুপয়সার মাছ খুঁজলে পাবার জো নেই। মাছ খাওয়া অভ্যেস—ও আমার কি খালি দুধ দিয়ে খেতে পারে?

গণেশ একগাল ভাত মুখে করিয়া কহিল,—টমের মাছ রোজই আমরা আনতে পারি,—কেমন, না রে কেতো? উঃ! কী মাছ ভাই, সেই পাল পুকুরে! ওঃ, পিসি মাগো! তুমি একটু ঘাটে নেবেচ কি তোমার পায়ে এসে ছোবল দেবে! গণাটা ত ভয়ে লাফিয়ে উঠে একেবারে অস্থির! একগাছা ছিপ কেটে যদি দাও পিসিমা, টমের জন্যে তাহলে কত মাছ আনতে পারি।

দুপুরবেলা সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া লইয়া নিস্তারিণী কার্ত্তিক গণেশকে ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের লইয়া, মেজেয় মাদুর পাতিয়া শুইল এবং তাহাদের ঘুম পাড়াইতে গিয়া খানিক পরে নিজেই যখন ঘুমাইয়া পড়িল, তখন গণেশ ফিস ফিস করিয়া ডাকিল,—কেতো রে!

কার্ত্তিকও তেমনি চুপি চুপি উত্তর দিল,—কি দাদা?

চ, পালপুকুরে মাছ ধরতে যাই।

যেমন কথা—অমনই কাজ। দুই ভাই অতি সন্তর্পণে উঠিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। টমও সঙ্গ লইল। প্রথমে খিড়কীর বাঁশ-বাগান এবং তথা হইতে দুই গাছা কঞ্চি কাটিয়া লইয়া একেবারে কেষ্ট বৈরাগীর দোকান। কেষ্টকে তিনটা পয়সা দিয়া দুইটি বঁড়সী ও হাতকতক সুতা কিনিয়া, তাহাকে দিয়াই তাহা ছিপে খাটাইয়া লইল।

তাহার পর সারাদিন ধরিয়া, শুধু পালপুকুরই নয়—পালপুকুর এবং গ্রামের মধ্যে যতগুলি পুকুর ছিল, তাহারই সব কয়টি ঘুরিয়া, কাদা মাখিয়া, কাপড় ছিঁড়িয়া, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে লালমূর্ত্তি হইয়া যখন দুই ভাই উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কোঁচড় হইতে তিনটি ও একটী ন্যাটার বাচ্চা বাহির করিয়া পিসিমাকে দেখাইয়া কহিল,—টমের জন্য এনেছি,—বড় তেষ্টা পেয়েছে পিসিমা; একটু জল দাও না আগে—খাই—তখন নিস্তারিণী শুধু অবাক হইয়া গিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ গণেশের পিঠের উপর নজর পড়িতেই নিস্তারিণী বলিয়া উঠিল,—এ কি রে? সমস্ত পিঠ যে একবারে দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠেছে! এ ব্যাপার কি বল দেখি?

গণেশ ব্যস্ততার সহিত মাছ কয়টি পৈঠার উপর রাখিতে রাখিতে কহিল,—মেরেছে পিসিমা, মেরেছে!

মেরেছে? কে এমন করে মারলে রে?

ঐ বিশু,—রায়মশায়ের ছেলে, যে বোধোদয়ের কেলাসে পড়ে, বলিয়া গণেশ ছিপ গাছটা দাওয়ার এককোণে ঠেসাইয়া রাখিয়া দিল।

নিস্তারিণী কহিল—বিশু? তাহার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কেন মারলে?

দেখ না পিসিমা, আমরা তাদের পুকুর থেকে মাছ ধরি নি,—তাদের পুকুরে আমরা যাই-ই নি,—তবু সে বলে, যে ধরেছিস। আমরা দিব্যি কল্লুম, তবু বিশ্বাস করে না। তাই কেতোর ছিপ গাছটা কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে দিলে আর তাই দিয়ে আমায় মারলে।—টমকে রেঁধে দেবে পিসিমা? ও বেশ খাবে এখন।

সেইখানে তেমনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নিস্তারিণী কহিল,—ছিপ গাছটা কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে দিলে—আর তাই দিয়ে মারলে?

হ্যাঁ পিসিমা।

নিস্তারিণী আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া গণেশের হাত ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে যখন নিস্তারিণী ফিরিয়া আসিয়া দাওয়ার পৈঠার উপর বসিয়া পড়িল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল।

সারখেলদের উপেন্দ্র আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া কহিল,—ব্যাপার দেখলে ত? কিন্তু সাবাস তোমাকে নিস্তার দি, বলে এলেও খুব বটে! কিন্তু ও বলা সব বৃথা। ও হচ্চে শিবু রায়,—ওর লজ্জা নেই, ঘেন্না নেই, পিত্তি নেই।

ঘেন্না পিত্তি থাক না থাক, তাতে আমার কোন দরকার নেই। আমি খালি এই প্রার্থনা করি যে, আমি একটা রাঁড়ি বেওয়া, দুটো কচি নাবালক নিয়ে একধারে পড়ে আছি,—আমার ওপর, আমার বাছাদের ওপর, শুধু শুধু যে অন্যায়, অধর্ম্ম, অত্যাচার কর্ব্বে, তার বিচার যেন ভগবান করেন।

পৈঠার একধারে উপেন বসিয়া কহিল,—হ্যাঁ,

ভগবান বিচার করে ফেললেন আর কি। ও ভগবানের দ্বারা কিছু হয় না, নিস্তার দি। অমন মহাপাপীর বিচার কত্তে ভগবানেরও বোধ হয় লজ্জা হয়। তেমন কোন মানুষ-ভগবানের পাল্লায় একবার পড়ে, তবেই ওর ভালরকম বিচার হয়। তোমার ও ধর্ম্ম-ভগবানের আর আজকাল কিছু হয় না, নিস্তার দি।

না ভাই, অমন কথা বলিস নি। ধর্ম্মও আছে —ভগবানও আছেন,—নইলে কি আর এখনো রাতদিন হয় রে?

তোমাদের কাছে হয় ত আছে নিস্তার দি। তোমরা মায়ের জাত—ধর্ম্মটাকে তোমরাই এখনো বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছো। তোমাদেরই সত্যিকার ডাকে হয় ত তিনি সাড়া দেন, কিন্তু আমরা আর তাঁর ধারও ধারি না, আর আমাদের ফাঁকির ডাকে তিনি সাড়াও দেন না।—বাবা যে—নইলে ও কেমন শিবুরায় একবার—বলিয়া উপেন দাঁড়াইয়া উঠিল।

তোর কলেজ খুলবে কবে? এখনো তোর ডাক্তারী পড়া শেষ হোল না রে উপিন?

চলিতে চলিতে উপেন বলিল,—না দিদি, আরও একটা বচ্ছর। পাশ করে, গাঁয়ে এসে বসে, শিবুরায়ের মত লোকের চিকিৎসে কত্তে হবে কি না, নিস্তার দি, তাই ভাল করে পড়তে একটু দেরী হচ্ছে।

তুই আর জ্বালাস নি, উপিন, বলিয়া নিস্তারিণী উঠিয়া সদর দরজায় খিল দিয়া আসিল।

পূজার সপ্তমী। কার্ত্তিক গণেশকে খাওয়াইয়া দিয়া, গৃহদেবতা শ্রীধরের পূজার ফুল চন্দন ও ভোগের পরমান্ন ঠিক করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া নিস্তারিণী বৎসরকার দিনে একবার ঠাকুর প্রণাম করিবার জন্য—গ্রাম্যদেবী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে গিয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির হইতে অনেক বেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, শ্রীধরের পূজার উপকরণ তেমনই পড়িয়া রহিয়াছে,—তখনো পর্য্যন্ত দয়াল ঠাকুর আসিয়া পূজা করিয়া যায় নাই! আরো খানিকক্ষণ দেখিয়া নিস্তারিণী রাঙ্গাগিন্নীর বাড়ী যাইয়া খোঁজ করিয়া জানিল যে, দয়ালঠাকুর যথাসময়ে আসিয়া তাহাদের পূজা সারিয়া গিয়াছে!

তখনি নিস্তারিণী দয়ালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। দয়াল কহিল, নিস্তার, পূজার জন্যে অন্য লোক দেখো বাছা, আমার দ্বারা আর হবে না!

নিস্তারিণী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দয়াল কহিল, —তোমার যে কুকুর, ওর ভয়ে ত ঢুকতেই ভয় করে! তা ছাড়া, সেদিন দেখলুম কি না, যে, টম তোমার দাওয়ার ওপর উঠে বসে আছে! তা, —যে ঘরের মধ্যে নারায়ণ, তারই দাওয়ায় কুকুর! ঠাকুর দেবতার কাজ! শেষকালে অপরাধী হয়ে পড়বো! কুকুরটিকে তোমার দেখলেই ত ভয় করে বাপু!

নিস্তারিণী কহিল,—তা হলে, পূজো ছাড়বার কোন্ কারণটা ঠিক ভাইপো? কুকুরের ভয়,— না, অপরাধী হওয়ার?

তা—ও দুই ই!

বেশ, বলিয়া নিস্তারিণী মুহূর্ত্তমাত্র না দাড়াইয়া চলিয়া আসিল এবং প্রায় ঘণ্টা দুই ধরিয়া সমস্ত গ্রামখানি ঘুরিয়া আসিল! ব্রহ্মণত্বের আভিজাত্য লইয়া যাহারা গ্রামের ও জাতির মাথার উপর বসিয়াছিল, একে একে প্রায় সকলেরই কাছে নিস্তারিণী—শ্রীধরের পূজার জন্য যাইল কিন্তু তাহারা কেহই নিস্তারিণীর শ্রীধরের পূজা করিতে রাজী হইল না! কাহারো সময়াভাব, কাহারো শরীর ভাল নয়, কাহারও বা অন্য কিছু, ইত্যাদি! বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় নিস্তারিণী শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, পূজার ফুলগুলি রেকাবীতে শুখাইয়া গিয়াছে, ঘসা চন্দনটুকু কলাপাতার উপর কঠিন হইয়া উঠিয়াছে এবং বাটির মধ্যেকার ভোগের পরমান্ন শুকাইয়া ডেল বাঁধিয়াছে!

দাওয়ার খুঁটি ঠেস দিয়া নিস্তারিণী বসিয়া রহিল! বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। এতখানি বেলা পর্য্যন্ত ঘরে ঠাকুরের সেবা হল না। হায়—হায়। না জানি কি অমঙ্গলের সূচনা হয় ত হয়ে আসচে। আবার হয় ত কি সর্ব্বনাশ ঘটবে! নইলে—নিস্তারিণী চারিদিক অন্ধকার দেখিল। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে তাহার অস্নাত অভুক্ত শ্রীধরের অসন্তোষের মূর্ত্তি যেন চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, দেখিতে পাইল। নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতেও পারিল না। আবার একবার দেখিবার জন্য উঠিয়া যাইয়া সদর দরজা খুলিতেই, উপেন ভিতরে প্রবেশ করিয়া কহিল,—সব শুনলুম দিদি। তা আমাকে

গিয়ে বুঝি একবার বলতে নেই? বাবার কাছে যাওয়া বৃথা। জান ত, যে, রায়মশায়ের সঙ্গে বাবার—। চল, আমি এখনো কিছু আজ খাইনি, —তোমার শ্রীধরের পূজো আমি করে দিচ্চি।

শ্রীধরের পূজা শেষ করিয়া উপেন দাওয়ার উপর বসিয়া কহিল,—এ সবের পেছনে যে রায়-মশাই নিশ্চয়ই আছেন, তা বোধ হয় বুঝতে তোমার বাকী নেই নিস্তারদি?

নারায়ণ জানেন, উপীন। তবে, আমায় বড়ই ভাবিয়ে তুলেছিল। যে কটা দিন কোলকাতায় না যাস, শ্রীধরের পূজোটী তুইই করে দিয়ে যাস, দাদা আমার। আজ যদি তুই এসে না পড়তিস, তাহলে শ্রীধরকে আমার হয় ত উপবাসীই থাকতে হোত!

তাতে আর দুঃখটা এমন বেশী কি নিস্তারদি? শ্রীধরকে ত তোমার রোজই উপবাসী থাকতে হয়!

কি বলচিস রে উপীন?

ঠিকই বলচি। যাঁরা তোমার শ্রীধরের পূজো করেন, তাঁদের হাতে কোন দিনই শ্রীধর তোমার পূজোও নেন না—ভোগও খান না! তার চেয়ে তুমি নিজে যদি শ্রীধরের ভোগ পূজো রোজ দিতে কিংবা ঐ বাচ্চা দুটোকে দিয়েও যদি দেওয়াতে তাহলে তাঁর পূজোও হতো—ভোগও হোতো।

কি বলিস যে উপীন, তার ঠিক নেই।

যা বলচি, তার একটাও মিথ্যা নয়—নিস্তারদি। তুমি কি মনে কর, যে গাঁয়ের ঘর ঘর এত যে গোপাল, গোবিন্দ, নারায়ণ, শ্রীধর, লক্ষ্মীকান্ত, লক্ষ্মী-জনার্দ্দন রয়েচেন—কেউ এঁরা কি সত্যই আছেন? কেউ নেই, নিস্তারদি—কেউ নেই! খালি ঐ নুড়িগুলো সিংহাসনের মধ্যে পড়ে আছে, দেবতা কবে পাথর ফুঁড়ে স্বস্থানে প্রস্থান করচেন। অমন যে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির, অমন প্রতিমা,—মা কি ওতে আর আছেন মনে কর? কিছুতেই না। দেবী দেবতারা থাকলে কি আর গাঁয়ের লোক এমন করে উচ্ছন্ন যায়, না, গাঁয়েরই এমন দুর্দ্দশা হয়? হয়ত কখন একদিন ছিলেন তাঁরা, কিন্তু এখন নিশ্চয়ই নেই।

তুই আর বকিস নি উপীন।—হ্যাঁরে দুটি মুড়ি আর একটু গুড় দিয়ে জল দেবো দাদা, খাবি? খা—এতখানি বেলা—বলিয়া নিস্তারিণী রান্নাঘর হইতে একটি বাটি হাতে লইয়া ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করিল।

আজ মহাষ্টমী। সম্বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী সংসারের তিনটী আনন্দের দিনের আজ দ্বিতীয় দিন।

রায় মহাশয়ের বাটী পূজা উপলক্ষে আজ গাঁয়ের সমস্ত ব্রাহ্মণবাড়ীর নিমন্ত্রণ। পূজার তিনদিন ধরিয়াই গাঁয়ের ইতর-ভদ্র সকল লোককেই খাওয়ান হইত। এক্ষণে রায়মশাই, তাঁহার আমলে এই জিনিসটা সংক্ষেপ করিয়া আনিয়াছেন। পৈত্রিক উইলে দুর্গাপূজার জন্য দুই হাজার টাকা ব্যয়ের উল্লেখ থাকিলেও, তিনি কেবল উইলের মান ও আইন রক্ষা করিবার জন্য এখন দুই শত টাকার মধ্যেই সব সারিয়া লয়েন।

নিস্তারিণীর কাল রাত হইতে জ্বর হইয়াছিল। আজ প্রাতে কোন প্রকারে একবার উঠিয়া শ্রীধরের পূজার আয়োজনটী ঠিক রাখিয়া, দাওয়ায় আঁচল বিছাইয়া শুইয়াছিল। রায় মহাশয়ের বাটীর নিমন্ত্রণে আজ কার্ত্তিক গণেশকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। নিস্তারিণী অসুস্থ দেহ মন লইয়া এই কথাই শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল। কার্ত্তিক গণেশ নূতন জামা কাপড় পরিয়া সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে পূজা দেখিতে যাইতেছিল, নিস্তারিণী ডাকিয়া কহিল—খবরদার, রায়েদের বাড়ী যেন যেও না।

খানিক পরেই শ্রীধরের পূজা করিতে উপেন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই নিস্তারিণী উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—অজুহাতটা কি কিছু শুনতে পেলি উপীন?

উপেন দাওয়ার উপর উঠিয়া আসিয়া কহিল—পেলুম বৈকি। প্রকাণ্ড অজুহাত! বড়দা বেঁচে থাকতে, কবে না কি রাঁচি গিয়ে খৃষ্টান মিসনারীদের সঙ্গে তিন দিন ছিলেন।

পাংশুমুখে নিস্তারিণী কহিল—আচ্ছা, এ সব মিথ্যে—

আরে, মিথ্যে বলেই ত দণ্ড! সত্যি হলে ত পুরস্কার পেয়ে যেতে! আমাদের সমাজ যে কত বড়, এতদিনেও তা বুঝতে পারলে না নিস্তারদি! ব্রজ ভটচায্যি তার সেই শালীটাকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই করলে! বিচার মীমাংসা তার শেষ হয়ে গেল, বারোয়ারীতে গোটা পনর টাকা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই! গেল বছর নয়ন গাঙ্গুলীর বিধবা ভাদ্রবৌটার কি হল সব জান ত? যখন সেটাকে আর এখানে কিছুতেই রাখা চললো না, তখন দিলে তাকে দিনকতকের জন্য কাশী পাঠিয়ে। এদিকে রায়মশায়ের বারোয়ারী

ফণ্ডে ঝেড়ে দিলে দুই থাপ্পড়—অর্থাৎ পাঁচ আর পাঁচ—দশ,—ব্যস। এদের বিচার আর রফা, এ যেমন সহজ—তেমনি সস্তা। এঁরা সব দেবতার অংশ দিদি! এঁদের কাছে কিছু এড়াবারও জো নেই, অবিচার হবারও জো নেই। দেখ দেখি, কবে দাদা আমার রাঁচি গিয়ে—উঃ—এ যে ভয়ানক অপরাধ! কিন্তু তারিফ দেখ একবার,—ত্রিশ বচ্ছর পরে ধরে ফেলেছে ঠিক! আর তারই বিচার কত্তে গিয়ে আজ তার কচি ছেলে দুটোকে—! যাই হোক নিস্তারদি, কিছু তোমার খসিয়েছে এবার! কেন না, আমি চলে গেলে, তোমার ঠাকুর সেবাটা ত করিয়ে দিতে হবে, তা ছাড়া আপদ বিপদও ত আছে।

নিস্তারিণী কোন কথা না কহিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় কার্ত্তিক গণেশ যখন বাড়ী আসিল, তখন নিস্তারিণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। গণেশের ডাকে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া বসিয়া কহিল,—এত বেলা পর্য্যন্ত কোথায় ছিলিরে হতচ্ছাড়ারা?

নিস্তারিণীর জ্বর তখন বেশী করিয়া আসিয়াছিল। কহিল,—বেলা আড়াইটে তিনটে হতে চল্লো, গিলতে কুটতে হবে না?

কার্ত্তিক বলিল,—আর খেতে হবে না পিসিমা, আমরা খুব খেয়ে এসেছি।

কোথা থেকে খেয়ে এলি রে মুখপোড়া?

ঐ বিশুদের বাড়ী।

নিস্তারিণী টলিতে টলিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল,—বিশুদের বাড়ী?

হ্যাঁ। আমাদের দেখে রায় মশাই বল্লে—ওদের যখন পাঠিয়ে দিয়েছে, দাও একধারে দুখানা পাতা করে। তারপর—

জোরে কার্ত্তিকের হাতখানা ধরিয়া নিস্তারিণী কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল,— বারণ করে দিয়েছিলুম—সেই তাদেরই বাড়ী গিয়ে ঢুকলি?

টম যে দৌড়ে গিয়ে ঢুকলো, তাই ত তাকে ধর্ত্তে গিয়ে—

কোথায় বসে খেলি দুজনে?

আর সকলে চণ্ডীমণ্ডপের ওপর বসলো। আমাদের দুজনকে উঠোনের শিউলী তলায় বেশ করে ঝাঁট দিয়ে—

সামনেই দেওয়ালে ঠেসান কার্ত্তিকের সেই ছিপ গাছটা লইয়া নিস্তারিণী যত পারিল, কার্ত্তিকের পিঠে, পায়ে, উরুতে, পাছায় সপাং সপাং করিয়া সজোরে মারিতে লাগিল। চীৎকার করিযা কার্ত্তিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল,—টম ছুটে গেল, তাইত তাকে ধরতে,—

তখন কার্ত্তিককে ছাড়িয়া দিয়া নিস্তারিণী টমের দিকে ছুটিয়া গেল এবং গোয়ালের আগড়ের বাঁশখানা লইয়া তাহার পায়ের উপর এমন জোরে মারিল যে, চীৎকার করিয়া সে সেইখানেই শুইয়া পড়িল এবং পরক্ষণে ভাঙ্গা পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গোয়ালের মধ্যে গিয়া লুকাইল। গণেশ ইতিপূর্ব্বেই কোন এক জায়গায় লুকাইয়া পড়িযাছিল।

তাহার পর, জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে নিস্তারিণী সদর দরজায় তালা লাগাইয়া ও পাড়ার পঞ্চাননীদের বাড়ী চলিয়া গেল।

পঞ্চাননী কহিল,—জ্বর এসেছে বুঝি? ছেলে দুটো কোথা মাসিমা?

নিস্তারিণী দাওয়ার উপর শুইয়া পড়িয়া কহিল,—যমের বাড়ী?

আহা বছরকার দিনে আজ ও কি কথা তোমার মাসিমা?

নিস্তারিণী কোন কথা না কহিয়া নীরবে শুইয়া রহিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে নিস্তারিণী সদরের তালা খুলিয়া ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে ঢুকিল এবং উঁকি দিয়া দেখিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। শয়ন-ঘরে যেমন শিকল লাগান ছিল, তেমনই রহিয়াছে। রান্নাঘরের দরজা খোলা ছিল, কিন্তু ভিতরে কেহই নাই। উঠানের চারিদিক তাকাইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অবশেষে, গোয়ালে ঢুকিয়া দেখিল, উঠানের একধারে পাঁচিলের কাছে যে হাড় ভাঙ্গা গাছ ছিল, তাহারই কতকগুলা ডাল পাতা মেজের চারিদিকে ছড়ানো। একধারে একটা বাটির মধ্যে কতকটা হলুদ বাটা, আর তারই কাছে খানিকটা ছেঁড়া নেকড়া পুড়িয়া রহিয়াছে। এদিকে একখানা চেটাইয়ের উপর কার্ত্তিক গণেশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আর তাহাদেরই মাথার দিকে মাথা করিয়া টম তাহার ভাঙ্গা পা খানি সন্তর্পণে গুটাইয়া চিৎ হইয়া ঘুমাইতেছে, তার পায়ে হলুদ ন্যাকড়া বাঁধা।

নূতন খাতা

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

নূতন খাতা

বিঘা চল্লিশ পঞ্চাশ জমীর উপর খান পাঁচ-সাত খোড়ো বাড়ী লইয়া গ্রামের বোষ্টম পাড়াটি একেবারেই রেল্‌-ষ্টেশনের গায়ে ছিল। আম, জাম, শিরীষ, কদম, বকুল প্রভৃতি তরুচ্ছায়াঢাকা এই পাড়াটি যেন গ্রাম ছাড়া একটি কুঞ্জবন। ইহারই উত্তর-পশ্চিমদিকে গাঁয়ের দক্ষিণ মাঠ, আর সেই ক্ষেত কয়খানি পার হইলেই গ্রাম।

দিবসের প্রথম সূর্য্যকিরণপাত এই পাড়ার গাছে গাছে, কুটীরে কুটীরে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া পড়ে। বর্ষার প্রথম বাদলধারা যখন নামে, তখন হয় ত পূবে হাওয়ার ঝাপটাতে, বোষ্টমপাড়ার মাটীই সর্ব্বাগ্রে অমৃতধারায় সিক্ত করিয়া যায়! দক্ষিণে রেললাইন, তার পরই ধূ ধূ মাঠ। সেই মাঠ দিয়া বসন্তের প্রথম বাতাস এই পথ দিয়াই গ্রামে গিয়া ঢোকে। চোখ গেল, বসন্তবাউরী, কেষ্ট গোকুলে, গৃহস্থের খোকা হোক প্রভৃতি পাখীরা এই পাড়াটির গাছে গাছেই সর্ব্বপ্রথমে দেখা দিয়া কলরব সুরু করিয়া দেয়।

বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস বৈরাগী তাহার কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া এই সব দেখে, শুনে, উপভোগ করে। তাহার বৈরাগী জীবনের দীর্ঘ ৬৫ বৎসরকাল ইহারই মধ্যে এমনই করিয়াই কাটিয়া গিয়াছে।

সে শুধু নামেতেই বৈরাগী নহে, সত্যই সে বৈরাগী। তাহার কেহই ছিল না—কিছুই ছিল না। থাকিবার মধ্যে, বাসের এই কুটীর আর গান গাহিবার একটি একতারা, ইহাই ছিল তাহার সম্পত্তি। আর ছিল তাহার সুদীর্ঘ বৎসরের জীর্ণ দেহখানি আর তাহারই মধ্যে পুরাতন দিনের স্মৃতি-বিজড়িত তাহার অন্তর, আর সেই অন্তরের মধ্যে অতি যত্নে অতি গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার অন্তরের অন্তর্য্যামী। কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণেরই দাস, রাধারাণীর চরণাশ্রিত পরম ভক্ত।

গান গাহিয়া, ভিক্ষা করিয়াই তাহার দিন চলে। আগে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিত, এখন আর ঘুরিতে পারে না, সামর্থ্যের অভাব বোধ করে। তাই এখন বৃদ্ধ অন্য পথ ধরিয়াছে। এখন রেল-কোম্পানীর মাস-টিকিক কিনিয়া একতারাটি হাতে লইয়া গাড়ীতে গান গাহিয়া ফিরে! তাহাতেই যাহা কিছু পায়, তাই দিয়াই তাহার দিন চলে।

সে দিন নূতন বৎসরের প্রথম দিনে শরীর তাহার একটু খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল! গান করিতে বাহির হইবার সে দিন তাহার ইচ্ছা ছিল না! কিন্তু একটি টাকা, অন্ততঃ পক্ষে আট গণ্ডা পয়সা সে দিন তাহার চাই-ই, গ্রামে নূতন খাতার নিমন্ত্রণ হইয়াছে—দিতে হইবে!

গাঁয়ের কোন দোকানেই তাহার ঋণ থাকে না, —ছিল না! কিন্তু প্রতিবৎসরই নূতন খাতা উপলক্ষে গ্রামের দোকান কয়খানি হইতে তাহার নিমন্ত্রণ হয়! ভালবাসিয়া সকলে যখন তাহার মত ভিখারীকে নিমন্ত্রণ করে, তখন না গিয়া সে ও পারে না! আর নূতন খাতার নিমন্ত্রণ, যাইলেই কিছু দিয়া আসিতে হয়! চারিটি দোকান—চারি আনা করিয়া দিলেই ভাল হয়,—অন্ততঃ পক্ষে দুই আনা! তাই সকাল সকালই সে দিন কৃষ্ণদাস তাহার একতারাটি হাতে লইয়া কুটীর হইতে বাহির হইয়া পড়িল!

মগরা হইতে ব্যাণ্ডেল, এই পথটুকুই সে গাড়ীতে গাড়ীতে যাতায়াত করে!

সে দিন অসুস্থ শরীরে, ভাল করিয়া গানগুলি সে গাহিতে পারিতেছিল না! চেষ্টা করিয়াও সুরের মধ্যে কোন মাধুর্য্য যেন সেদিন সে আনিতে পারিতেছিল না! তাহার মনে হইতেছিল, কণ্ঠের সঙ্গে একতারাটিও যেন সেদিন একযোগ হইয়া ভাল করিয়া তেমন বাজিতেছে না! তাই অপরাহ্ণ সময়ে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে গাড়ীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া কৃষ্ণদাস ভাবিল, আর সে ক্ষেপ দিবে না, এই গাড়ীতেই বাড়ী ফিরিয়া যাইবে! ভিক্ষার পয়সাগুলি গণিয়া দেখিল, পুরা আট আনা তাহার হয় নাই,—দুই পয়সা কম! ফিরিবার

এই গাড়ীতে দুই চারি পয়সা অবশ্য তাহার উঠিয়া যাইবে!

ঢং ঢং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, গার্ডের বাঁশী বাজিয়া উঠিল! কৃষ্ণদাস একখানি কামরায় উঠিয়া গান ধরিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা আসিয়া পড়াতে সে গান ধরিতে পারিল না! ও দিকে জানালার ধারে একটী স্ত্রীলোককে লইয়া একটা গোলমাল তখন বাধিয়া উঠিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি আধা বয়সী, থান পরা, কপাল পর্য্যন্ত তাহার মাথার কাপড় টানা ছিল। ভয়-ব্যাকুল নেত্রে সম্মুখে দণ্ডায়মান চেকার বাবুর দিকে চাহিয়া সে বলিতেছিল,—দোহাই বাবা—আমি মিথ্যে বলছি না। ছিরামপুর থেকে উঠিছি, মগরায় যাব, টিকিস দুখানা আমার ভেয়ের কাছে আছে।

চেকার তর্জ্জন করিয়া, গাড়ীর কাঠের মেজের উপর বুটের ঠোক্কর মারিয়া কহিল—আরে মাগী, কোথায় তোর ভাই, তাই দেখিযে দে না। ওই ওধারে পা ঝুলিয়ে ওপরে যে বসে রয়েছে—ওই?

স্ত্রীলোকটি একবার উর্দ্ধপানে সেই দিকে তাকাইয়া এক গাড়ী লোকের মধ্যে যেন থতমত খাইয়া কহিল—না বাবা,—ও নয়। গাড়ীতে উঠে তাকে আর দেখতে পাই নি।

তা হলে পয়সা বার কর, ওসব কথা আমি শুনতে চাই না, শীগ্‌গির পয়সা বার কর, বলিয়া চেকার বাম হস্তস্থিত বাঁধান নোট-বইয়ের মলাটের উপর পেন্সিলটি ক্রমাগত ঠুকিতে লাগিল।

পয়সা ত আমার কাছে নেই, বাবা। সবই যে তার কাছে। তুমি এতবার বলছ, থাকলে আর দিই না? ভাই আমার কোথায় গেল গো! বলিয়া স্ত্রীলোকটি গাড়ীর চারিদিকে সেই অসংখ্য লোকের মধ্যে ভীতি-বিহ্বল নয়নে তাহার ভাইয়ের খোঁজ করিতে লাগিল।

কৃষ্ণদাস একটি ধারে দাঁড়াইয়াছিল, দাঁড়াইয়াই রহিল।

প্যাসেঞ্জারদের মধ্য হইতে একজন কহিল, নষ্টামী—নষ্টামী, আজকাল মেয়ে জোচ্চোরের সংখ্যাটা ক্রমেই বেড়ে উঠছে।

আর একজন কহিল,—সে দিন, মশাই, লিলুয়াতে এই রকম একটা মাগী—

তাহার কথায় বাধা দিয়া, ওদিক হইতে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে একটি বাবু বলিয়া উঠিল,—এরা সব পুরুষ জোচ্চোরের ওপরে যায়!—উঃ, কি মতলবটা দেখুন একবার।

আর একটী ভদ্রলোকের হাতে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র ছিল। তিনি চোখের চশমা-খানি খুলিয়া কাপড়ে তাহার কাচ মুছিতে মুছিতে কহিলেন,—দেশের কি দুর্দ্দশা দেখুন সব একবার। এই দেশকে কি না গান্ধীজী—

গাড়ী তখন পূর্ণবেগে ত্রিশবিঘা ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি চেকারের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—দোহাই বাবা, ওপরে ভগবান আছেন, জোচ্চোর নই বাবা। আমায় না হয় এই তিরিশবিঘেতেই নামিযে দাও, বাকী পথ হেঁটেই যাবো, কিন্তু ভাই আমার—

চেকার গর্জ্জাইয়া উঠিয়া কহিল,—ভাড়া না দিলে, তোকে মাগী, গাড়ী থেকে নামতেই দেবো না। আমার সঙ্গে সেই বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত তোকে যেতে হবে। সেখানে তোকে পুলিসের হাতে দোবো। দেখি, কত বড় জোচ্চোর মেয়েমানুষ তুই।

স্ত্রীলোকটি আর কোন কথা না বলিয়া মুখ ঢাকিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তখন প্যাসেঞ্জারদের ভিতরে তাহাকে লইয়া খুব একটা আন্দোলন-আলোচনা চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, পুলিসের হাতে দেওয়াই ঠিক, কেহ বলিল, পুলিসকে ওরা থোড়াই কেয়ার করে, কেহ বলিল, মাগী এই বয়সে হয় ত মগরার গঞ্জে অভিসারে বেরিয়েছে হে।

ইতিমধ্যে গাড়ী ত্রিশবিঘা ষ্টেশনে আসিয়া দুই মিনিট থামিয়া আবার মগরার দিকে ছুটিয়া চলিল।

মগরায় আসিয়া গাড়ী থামিলে, স্ত্রীলোকটি নামিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই, চেকার তাহার হাত ধরিয়া জোরে বসাইয়া দিয়া কহিল,—ভাড়া না দিযে যাস কোথা মাগী, বোস ঐখানে। স্ত্রীলোকটি থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

কৃষ্ণদাস তখন ধীরে ধীরে চেকার বাবুর সম্মুখে আসিয়া কহিল,—কত ভাড়া ওর দিতে হবে বাবু?

সকলের দৃষ্টি তখন কৃষ্ণদাসের উপর পড়িল।

কে একজন অন্য একজনকে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিল,—ভাই যে এইবার দেখা দিয়েছে হে!

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছিল, সে কহিল,—নেড়া-নেড়ীর ব্যাপারই এই রকম।

এতক্ষণ চেষ্টা করে দেখছিলো, ভাড়াটা না দিয়ে চলে কি না। খুব কড়া চেকার, তাই সুবিধে কত্তে পারলে না, নইলে—

কৃষ্ণদাস চেকারের দিকে চাহিয়া আবার কহিল,—আমি অনেক দিন থেকে গাড়ীতে গান গেয়ে, ভিক্ষে করে বেড়াই, আপনাকে এর আগে দেখিনি, আপনি কি নতুন এসেছেন, বাবুমশাই? তা হলে, শ্রীরামপুর থেকে মগরা, মেয়ে লোকটির কত ভাড়া লাগবে?

চেকার কহিল,—হাওড়া থেকে ভাড়া লাগবে, আট আনা দিতে হবে।

ঢং ঢং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কৃষ্ণদাস তাড়াতাড়ি হাতের পয়সাগুলি চেকার বাবুর হাতে দিয়া কহিল,—সাড়ে সাত আনা আছে। দুটো পয়সা আমি একদিন আপনার হাতেই দিয়ে দেবো বাবু,—এস, মা লক্ষ্মী, বলিয়া কৃষ্ণদাস স্ত্রীলোকটির হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

সেই সময় একটি ২৪।২৫ বৎসরের যুবক বিড়ি টানিতে টানিতে, যেখানে কৃষ্ণদাস ও স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে আসিয়া কহিল,—এই যে দিদি, তুমি নেমে পড়েছ। শ্রীরামপুরে বলে যেতে আর সময় পেলুম না। তোমায় তুলে দিয়ে বিড়ি কিনতে গিয়ে দেখি, পাশের গাড়ীতে কঞ্জুলাল বসে রয়েছে। তাই তার গাড়ীতে উঠে, তার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প কচ্ছিলুম। এস।

স্ত্রীলোকটি কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে কৃষ্ণদাসের দিকে একবার চাহিল। কৃষ্ণদাস কহিল,—আচ্ছা, তা হলে এস মা লক্ষ্মী।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

দ্বাদশীর চাঁদ কৃষ্ণদাসের কুটীরের সম্মুখে কদম গাছের মাথায় উঠিয়া, তাহার কুটীর, প্রাঙ্গণ, দাওয়ার সর্ব্বত্র, স্নিগ্ধ মধুর আলোকে ভাসাইয়া তুলিয়াছিল।

কৃষ্ণদাস দাওয়ার উপর একখানি তালপাতার চেটাই বিছাইয়া বসিয়া গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছিল:—

কেলে সোনা কতই চতুর, (ও তোর) কতই চাতুরী,
রাধারাণীর কাছে যে তোর ভাঙ্গলো জারিজুরি॥

তখন দক্ষিণের উন্মুক্ত প্রান্তর বহিয়া নূতন বৎসরের নূতন বাতাস ঝির ঝির করিয়া বহিয়া আসিতেছিল।

বাহির হইতে পাড়ার কে একজন সেই সময় হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—নতুন খাতায় যাবে না দাদা? আমরা যাচ্ছি সব।

কৃষ্ণদাস ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল,—নতুন খাতায় আজ বেলাবেলিই জমা দিয়ে এসেছি ভাই। দুটো পয়সা খালি বাকী রয়ে গেল, বলিয়া কৃষ্ণদাস তাহার গানখানি গাহিতে লাগিল:—

তোকে ধোরবো এবার, বাঁধবো এবার,
পায়ে দেবো বেড়ি।
সেই পায়েতে লুটিয়ে পড়ে—খাবো গড়াগড়ি
(অমন) খাবো গড়াগড়ি॥

সমাপ্ত

———